

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

অনুবাদক

অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী



রা
রাহনুমা
প্রকাশনী™



'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

২য় খণ্ড

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. (১২৬৮-১৩৩৯ হি.)

[সমস্ত কুরআনের তরজমা এবং সূরা ফাতিহা, বাকারা ও নিসা-এর তাফসীর]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. (১৩০৫-১৩৬৯ হি.)

[সূরা আলে ইমরান ও মায়েদা থেকে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহের তাফসীর]

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর

আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ২য় খণ্ড

অনুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা.বা.

শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

তাকরীয্

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.

বিস্তারিত ভূমিকা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা.

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষণ, শিরোনাম সংযোজন ও হাদীস-রেওয়ায়েতের তাখরীজ

মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ

উস্তায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

প্রকাশনায়



রাহনুমা প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ২য় খণ্ড

মূল	শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
অনুবাদ	অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
সম্পাদনা	মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
তাকরীয	শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
বিস্তারিত ভূমিকা	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
বিস্তারিত নিরীক্ষণ	মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ
দ্বিতীয় সংস্করণ	এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০২২
সর্বস্বত্ব	অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন	মুহারেব মুহাম্মাদ
ইনার বিন্যাস	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই	আয়েশা বুক বাইন্ডিং ২৭ রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা ১১০০, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী শোরুম ১ : ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য ঃ ২৪০০.০০ (দুই হাজার চারশ টাকা মাত্র)

TAFSIRE USMANI

by Professor Mawlana Giasuddin Ahmad. Published & Marketed by : Rahnuma Prokashoni.
Price : MRP. 2400.00, US $ 25.00 only. E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com, www.rahnumabd.com

ISBN : 978-984-93859-7-7

সূচিপত্র

সূরা ইউনুস

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০ । ১০৯ আয়াত । ১১ রুকূ । মক্কী

آياتها ١٠٩، ركوعاتها ١١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা-; এগুলি পরিপক্ক* কিতাবের আয়াত[১]।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝

২. মানুষের জন্য কি এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি মানুষকে সতর্ক করুন এবং ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আপন রবের নিকট রয়েছে সত্যিকার মর্যাদা[২]? কাফেররা বলল, 'নিশ্চয় ইনি তো সুস্পষ্ট যাদুকর[৩]।'

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'জ্ঞানগর্ভ'

১. এ আয়াতগুলি এমন মজবুত ও জ্ঞানগর্ভ কিতাবের, যার প্রত্যেকটি বিষয় পরিপক্ক। এর শব্দাবলি পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে। এর উলূম (বা এতে বর্ণিত বিষয়াদি) আকল (সুস্থ বিবেক) ও হেকমতের অনুকূল। এর বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয়, ভবিষ্যতে এর রহিতকারী (ناسخ) কোন কিতাব আসবে না। এতে বর্ণিত সংবাদ ও ঘটনাবলি সম্পূর্ণ সত্য। আর এমনটি কেনই বা হবে না, যখন সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা তাঁরই কামেল ইলম ও হিকমতে সমৃদ্ধ করে এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

২. অর্থাৎ, এতে আশ্চর্যের কোনই কারণ নেই যে, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির ইসলাহ ও হেদায়েতের জন্য একজন মানুষকেই আদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন এবং তার নিকট এমন পয়গাম প্রেরণ করেছেন, যার সম্বন্ধে অন্যরা অবগত নয়। আর তিনি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহর নাফরমানীর ধ্বংসকর ফলাফল ও পরিণাম সম্পর্কে অবগত করেন এবং আল্লাহর বিধান মান্যকারীদের এ সুসংবাদ শোনান যে, মহামর্যাদাশালী রবের দরবারে সৎকর্মের বদৌলতে তাদের জন্য সুউচ্চ মর্তবা ও বুলন্দ মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের জন্য লিখিত আছে সৌভাগ্য ও সফলতা।

৩. অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আলকুরআনের অলৌকিক প্রভাব ও মহিমা দর্শনে কাফেররা একে যাদু এবং এর আনয়নকারীকে যাদুকর বলে।

৩. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে[১]। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন[২]। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন[৩]। কোন সুপারিশকারী (তাঁর কাছে) সুপারিশ করতে পারে না- তবে তাঁর অনুমতির পরেই[৪]। এই আল্লাহই তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি অনুধাবন কর না[৫]?

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে[৬]। (এ) আল্লাহর সত্য ওয়াদা*। নিশ্চয়·

اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ

---

১. অর্থাৎ এতটুকু সময়ে, যা ছয়দিনের সমান ছিল। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর তাফসীর অনুযায়ী সেই ছয়দিনের এক দিন আমাদের এক হাজার বছরের সমান। এ হিসাবে ছয় হাজার বছরে পৃথিবী, আকাশসমূহ প্রভৃতি তৈরি হয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু হেকমতের দাবি এই যে, ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হোক। সম্ভবত বান্দাদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক কাজ ভেবে-চিন্তে, আস্তে-ধীরে করা প্রয়োজন। তদুপরি হঠাৎ সৃষ্টি করার তুলনায় ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করার মধ্যে এ সত্য তুলনামূলক বেশি প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তাআলা কোন কিছু করতে বাধ্য নন, বরং প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারের অধীন। তিনি যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন।

২. সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূর শুরুতে ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সর্বপ্রকার তদবীর, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে।

৪. অর্থাৎ তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে শরীক ও অংশীদার হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশের জন্যও মুখ খোলা সম্ভব নয়।

৫. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, এমন রব ছাড়া যাঁর গুণাবলি উপরে বর্ণিত হল, দ্বিতীয় আর কে আছে- যার দাসত্ব ও পূজা করা যেতে পারে? আর যিনি এমন খালেক ও মালেক, একচ্ছত্র শাহানশাহ ও পরম প্রজ্ঞাবান, তাঁর পয়গম্বরদের ও পয়গামসমূহকে শুধু আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে মিথ্যা বলার সাহস তোমাদের কী করে হয়?

৬. অর্থাৎ তাঁরই কুদরতে তোমাদের সকলের উৎপত্তি এবং পরিশেষে তাঁরই পানে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এর পরও তাঁর বিধান ও দূতদের (পয়গম্বরদের) অবাধ্যতা করা কীরূপে সংগত হতে পারে?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা-** 'আল্লাহ (এ) ওয়াদা করেছেন, (এবং) তাঁর ওয়াদা (খুবই) সত্য'।

إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, তার পর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যাতে যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল তাদের প্রতিদান দেন ইনসাফের সাথে[১]। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফর করত।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ۝

৫. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন[২] এবং তার জন্য নির্ধারিত করেছেন মনযিলসমূহ[৩], যাতে তোমরা বছরের গণনা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার[৪]। আল্লাহ এসব যথার্থভাবেই সৃষ্টি করেছেন[৫]। তিনি নিদর্শনাবলি সবিস্তারে বর্ণনা করেন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য[৬]।

---

১. অর্থাৎ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর নেকীরও প্রতিদান দেওয়া হবে।

২. কারো কারো মতে ضياء থেকে نور ব্যাপক। ضياء সেই نور (বা আলো)-কে বলে, যা অধিক তেজোদীপ্ত ও উজ্জ্বল। কেউ কেউ বলেছেন, যার আলো নিজস্ব তা হচ্ছে ضياء এবং যার আলো অপর থেকে আহরিত তা نور। বস্তুজগতে সূর্যের আলো অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে আহরিত নয়। কিন্তু চাঁদের আলো সূর্য থেকে আহরিত। কোন কোন মুহাক্কিক আলেম উভয়ের পার্থক্য নির্ণয়ে বলেছেন, نور হচ্ছে সাধারণ আলো এবং ضوء বা ضياء হচ্ছে অধিক বিস্তৃত আলো। সূর্যের আলোর বিস্তার যেহেতু অধিক, সেজন্য ضياء শব্দ দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়েছে। والله أعلم بمراده

৩. চাঁদ প্রত্যহ ক্রমে ক্রমে বাড়ে ও কমে। জ্যোতির্বিদগণ চাঁদের আবর্তনকে ভাগ করে আটাশটি মনযিল নির্ধারণ করেছে, যা বারটি তিথিতে বিভক্ত। কুরআনে তাদের পরিভাষায় আলোচনা উদ্দেশ্য নয়; বরং منازل বলে চাঁদের পরিভ্রমণ ও পরিক্রমার সাধারণ স্তরসমূহ বোঝানো উদ্দেশ্য।

৪. অর্থাৎ বছরের গণনা এবং মাস ও দিনের হিসাব সবই চাঁদ ও সূর্যের পরিভ্রমণের সঙ্গে জড়িত। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন না থাকলে রাত ও দিন এবং চান্দ্র ও সৌর মাস, বছর প্রভৃতি নিরূপিত হতে পারত না। অথচ পার্থিব জীবন ও অর্থনৈতিক কাজ-কারবার ছাড়াও শরী'য়তের হুকুম-আহকামেও সময় নির্ধারণের আবশ্যকতা রয়েছে।

৫. অর্থাৎ এই বিশাল সৌরজগতের সৃষ্টি এমনিতেই ঘটনাচক্রে হয়ে যায়নি; বরং বিরাট কৌশল ও শৃঙ্খলার অধীনে, অগণিত ফায়দা ও হেকমত বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ জ্ঞানবান লোকেরা সৃষ্টিরাজ্যের এই বিশাল ব্যবস্থা দেখে মহাশক্তিশালী ও অসীম হেকমতের অধিকারী আল্লাহর অস্তিত্বের ও তাঁর সীমাহীন মহত্ত্বের সন্ধান লাভ করে থাকে।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের আবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা (আল্লাহকে) ভয় করে[১]।

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝

৭. যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাদি সম্বন্ধে উদাসীন[২]—

أُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮. এমন লোকদের বাসস্থান জাহান্নাম- তাদের কৃতকর্মের কারণে[৩]।

তদুপরি বস্তুজগতের ব্যবস্থা থেকে তারা আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধে আন্দাজ করে যে, সেই মহাজগতে কী রকমের চন্দ্র-সূর্য তিনি সৃষ্টি করে থাকবেন! সেই চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে নবী-রাসূলগণ।

১. নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের প্রতিটি ছোট বা বড় বস্তুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কবির ভাষায়-

وفي كل شيء له آية ÷ تدل على أنه واحد

(প্রতিটি বস্তুর মধ্যে তাঁর নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক)

সূরা বাকারার ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তাআলার কুদরতের উক্ত নিদর্শনাদি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ ওরা দুনিয়ার প্রতি এমনই মগ্ন হয়ে আছে যে, আখেরাত ও আল্লাহর নিকট যাওয়ার কোন খবরই নেই। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই ওরা উদ্দেশ্য ও আরাধ্য বানিয়ে নিয়েছে। আর আল্লাহর কুদরতের যেসব নিদর্শনের কথা উপরে বর্ণিত হল, তা নিয়ে ওরা কখনো চিন্তা-ফিকির করে দেখেনি যে, এমন পরিপক্ক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। অবশ্যই এই বিশাল সৃষ্টি-কারখানার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে। তদুপরি যিনি প্রথমবার এ বিরল ও বিস্ময়কর মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোনই কঠিন কাজ নয়।

৩. অর্থাৎ মন ও মস্তিষ্ক দ্বারা, মুখ ও হাত-পা দ্বারা যা কিছু ওরা কামাই করেছে, তার প্রতিফল হচ্ছে দোযখের আগুন।

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় তাদের রব তাদের ঈমানের বদৌলতে তাদেরকে (মন্‌যিলে-মাকসূদ তথা জান্নাতে) পৌঁছাবেন[১]। তাদের পাদদেশে ঝরনামালা প্রবাহিত হবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জান্নাতসমূহে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

১০. সেখানে তাদের দো'য়া হবে*, 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র'[২]; এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'[৩]। আর তাদের দো'য়ার সমাপ্তি* হবে এ কথার মাধ্যমে— 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক'[৪]।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ ঈমানের বদৌলতে ও এর আলোতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আসল উদ্দেশ্যস্থল (জান্নাত) পর্যন্ত পৌঁছাবেন।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সেখানে তাদের কথা হবে...'

২. অর্থাৎ বেহেশতের নে'য়ামতরাজি এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দৃষ্টে 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠবেন এবং যখন তাঁর নিকট কিছু চাওয়ার ইচ্ছা হবে, যেমন কোন পাখি বা ফল দেখে তার প্রতি আকর্ষণ হল– তখন سبحانك اللّٰهُمَّ বলবেন, আর এতটুকু শোনামাত্র ফেরেশতাগণ সেই বস্তু উপস্থিত করে দেবেন। এমন কি, এই এক কথাই সমস্ত দো'য়ার স্থলবর্তী হবে। দুনিয়াতেও ভদ্র লোকদের বাড়িতে রেওয়াজ আছে– মেহমান কোনো বস্তু পছন্দ করে তার প্রশংসা করামাত্র ভদ্র মেযবান সেই বস্তু প্রস্তুত করে মেহমানকে দিতে সচেষ্ট হন।

৩. বেহেশতীরা পরস্পর সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে সালাম দেবেন, যেমন দুনিয়াতেও মুসলমানদের মধ্যে এরূপ দস্তুর আছে। তাছাড়া ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদের সালাম দেওয়া, এবং খোদ রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে তাদের জন্য 'তুহফা'স্বরূপ সালাম এর আগমনের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে- سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَب رَحِيْم {(তাদের জন্য আছে) 'সালাম', তা বলা হবে দয়াময় রবের পক্ষ থেকে। –সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৫৮}, আরো ইরশাদ হয়েছে : وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بَمَا صَبَرْتُم (আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আসবেন প্রত্যেক দ্বার দিয়ে, (তারা বলবেন,) তোমাদের প্রতি সালাম, কারণ, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। –সূরা রা'দ, আয়াত : ২৩-২৪।)

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাদের শেষ কথা এই হবে...'

৪. জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর যখন পার্থিব চিন্তা-ভাবনা ও সব পঙ্কিলতার পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে এবং শুধু سبحانك اللّٰهُمَّ বলার সাথে সাথে মনের কামনা অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তু

[রুকূ - ২]

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑪

১১. আল্লাহ যদি মানুষের জন্য অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেমন তারা কল্যাণ তাড়াতাড়ি চায়, তবে সমাপ্ত করে দেওয়া হত তাদের জীবন-কাল। অতএব যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদের স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে রাখি[১]।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫

১২. যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি তার থেকে সেই কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যায়, যেন সে আমাকে কখনো এমন কোন কষ্টের কারণে ডাকেইনি যা তাকে স্পর্শ করেছিল। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে[২]।

লাভ করতে থাকবে, তখন তাঁদের প্রত্যেক দো'য়ার শেষ শব্দ হবে- الحمد لله رب العالمين ; আর স্বভাবত এমনই হওয়া উচিত।

১. ৭-৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যারা গাফলতে পড়ে আছে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের ঠিকানা দোযখ। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ এমন পাপীদের দুনিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে ধরেন না, বরং অবকাশ দেন। অথচ লোকদের অবস্থা এই যে, কখনো তারা ধৃষ্ট ও নির্লজ্জ হয়ে স্বয়ং নিজেদের উপর তাড়াতাড়ি আযাব আসার কামনা করে। যেমন তারা বলে থাকে- اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ 'আয় আল্লাহ! যদি এ ধর্মই তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য ধর্ম হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর। –সূরা আনফাল, আয়াত : ৩২। আবার কখনো পার্থিব বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে নিজেদের জন্য অথবা আপন সন্তানদের বা অন্য কারো জন্য বদ-দো'য়া করতে শুরু করে, যেমন: অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়।

এখন যদি আল্লাহ তাআলা ওদের দরখাস্ত অনুযায়ী কোন আযাব বা অকল্যাণ এমন তাড়াতাড়ি ও নগদে ওদের উপর পতিত করেন, যেরূপ তাড়াতাড়ি ওরা কল্যাণ লাভ করতে চায়, তবে ওরা পাপের শাস্তি থেকে এক মিনিটও অব্যাহতি পাবে না; বরং ওদের জীবনেরই পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে। কিন্তু খোদার নীতি এই যে, ভাল ও মন্দ উভয়ের ব্যাপারে তাঁর হেকমত অনুযায়ী দেরি করা হয় এবং সহ্য করা হয়, যাতে সৎ লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অসৎ লোকেরা গাফলতে ডুবে থেকে দুষ্কৃতির বোঝা আরো ভারী করে নেয়।

২. অর্থাৎ মানুষ প্রথমে ধৃষ্টতাবশত নিজেই আযাব কামনা করে এবং নিজের মুখেই অমঙ্গল চায়। কিন্তু সে এতই দুর্বল ও ভীতু যে, একটু দুঃখকষ্টে পতিত হওয়া মাত্রই ঘাবড়ে গিয়ে

১৩. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্বে (যুগে যুগে) বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি যখন ওরা জুলুম করেছিল, অথচ ওদের কাছে ওদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ওরা কিছুতেই ঈমান আনয়নকারী ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী লোকদের শাস্তি দিয়ে থাকি[১]।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১৪. অনন্তর, আমি ওদের পর পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যাতে দেখি, তোমরা কিরূপ কাজ কর[২]।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِی الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

আমাকে ডাকতে শুরু করে। যতক্ষণ বিপদ থাকে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখনই বিপদ সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সবকিছু এমনভাবে ভুলে যায়, যেন আল্লাহর সঙ্গে তার কখনো কোন সম্পর্কই ছিল না। সেই পূর্বের ঔদ্ধত্য, অহংকার ও গাফলতের নেশাই আবার তাকে পেয়ে বসে।

হাদীসে আছে, তুমি আল্লাহকে নিজের আরাম-আয়েশের অবস্থায় স্মরণ রাখ, আল্লাহ তোমাকে তোমার দুঃখকষ্ট ও বিপদাপদে স্মরণ করবেন। (মুসনাদে আবদ বিন হুমায়দ, হাদীস : ৬৩৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৬৩০৩; জামেউল উলূমি ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৯) —মুমিনের শান তো এই হবে যে, সে কখনও আল্লাহকে ভুলবে না; বরং বিপদে ধৈর্যধারণ এবং সুখে আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকবে। এটাই সেই ধন, যা মুমিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে না।

১. অর্থাৎ যদি ওদের দরখাস্ত অনুযায়ী শীঘ্র আযাব নাও আসে অথবা কষ্ট ও বিপদ এসে আবার কেটে যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। জুলুম, দুষ্কৃতি ও ঈমানহীনতার শাস্তি তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতে হোক, ভোগ করতেই হবে। পূর্বকাল থেকে আল্লাহর নীতি এমনই রয়েছে যে, নবী ও রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন দেখানোর পরও যখন লোকেরা অন্যায়-অপরাধ ও সত্যের অস্বীকৃতি করতে থেকেছে এবং কোন প্রকারেই ঈমান ও আত্মসমর্পনের প্রতি ঝুঁকেনি, তখন আসমানী আযাব এসে ওদের ধ্বংস করেছে। মোটকথা, সর্বদাই পাপীরা কোন না কোন প্রকারে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের স্থলে এখন পৃথিবীতে তোমাদের আবাদ করা হয়েছে, যাতে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় যে, তোমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির কতদূর হক চিনতে পার এবং আল্লাহর পয়গম্বরদের সঙ্গে কেমন আচরণ কর। ভাল ও মন্দ যেরূপ আমল করবে, তোমাদের সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করা হবে।

সামনে সেই আচরণ বর্ণনা করা হচ্ছে যা ওরা কুরআন কারীম, পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করেছিল।

১৫. যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলি পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'তুমি এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন আন অথবা এ কুরআন পরিবর্তন করে ফেল[১]।' আপনি বলে দিন, 'আমার এই অধিকার নেই যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআন পরিবর্তন করে ফেলি। আমি তো কেবল তার অনুসরণ করি, যা আমার নিকট ওহী করা হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি, তবে আমি এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করি[২]।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾

১৬. আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ চাইলে আমি তোমাদের তা পাঠ করে শোনাতাম না এবং তিনিও তার সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ

১. পবিত্র কুরআনের সাধারণ উপদেশগুলি ওদের ভাল লাগত, কিন্তু মূর্তিপূজা অথবা ওদের বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের খণ্ডন করা হলে ওরা উত্তেজিত হত এবং নাক সিটকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনার আল্লাহকে বলে হয় অন্য কোন কুরআন নিয়ে আসুন, যার মধ্যে এসব বিষয় থাকবে না। আর যদি এই কুরআনই থাকে, তবে মূর্তিপূজা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করে নিন।

যেসব লোক পাথরের মূর্তিগুলিকে খোদায়ী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করত, তাদের মন-মানসিকতার পক্ষে একজন পয়গম্বরকে এহেন শক্তির অধিকারী চিন্তা করা কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না! এমনও হতে পারে যে, নিতান্ত বিদ্রূপ বা বিবাদস্বরূপ ওরা এমন কথা বলত। —যা হোক, এর সদুত্তর সামনে দেওয়া হচ্ছে।

২. অর্থাৎ কোন ফেরেশতা বা পয়গম্বরের এই অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর কালামের মধ্যে সংশোধন করবেন বা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করবেন। পয়গম্বরের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর তরফ থেকে যে ওহী আসে, সামান্য কম-বেশ না করে সেই ওহীর নির্দেশমত চলতে থাকা। তিনি আল্লাহর ওহীর অধীন থাকেন, আল্লাহ তাঁর অধীন নন যে, তোমরা যেরূপ কালাম চাইবে তাই আল্লাহর নিকট থেকে এনে পেশ করবেন। আল্লাহর ওহীর মধ্যে সামান্যতম হেরফের ও কাটছাঁট করা গুরুতর অপরাধ। অতএব যে নিষ্পাপ বান্দাগণ আল্লাহর ভয়ে সর্বাপেক্ষা ভীত, সেই নবীগণ কী করে এমন অপরাধ ও নাফরমানীর নিকট যেতে পারেন? إِنِّيْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ আয়াতাংশে মূলত এই বেহুদা দাবিদারদেরই বলা হচ্ছে যে, এমন কঠিন নাফরমানী করো না, সেই মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় কর।

করতেন না। আমি তো তোমাদের মাঝে এর পূর্বে জীবনের একটি (বড়) সময় অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমাদের কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই[১]?'	فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝
১৭. অতএব ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে	فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

১. অর্থাৎ আল্লাহর যা ইচ্ছা, আমি তাই তোমাদের সামনে পাঠ করি এবং যে পরিমাণ তাঁর ইচ্ছা, সেই পরিমানই তিনি আমার মাধ্যমে তোমাদের অবহিত করেন। যদি তিনি এর অন্যথা ইচ্ছা করতেন, তবে আমার কি এই সাধ্য আছে যে, স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে একটি কালাম তৈরি করে তাঁর নামে চালিয়ে দেই?

রাসূলের জীবনই তাঁর আনীত কুরআনের সত্যতার মহাদলিল

চিন্তা করে দেখ তো, আমার জীবনের চল্লিশটি বছর তোমাদেরই চোখের সামনে গত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার চরিত্রের ব্যাপারে তোমাদের সব রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার সততা, পবিত্রতা, আমানতদারী, সাধুতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলির সুখ্যাতি ও সুনাম তোমাদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়ে আছে। আমার নিরক্ষরতা এবং কোন মানুষের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করা সর্বস্বীকৃত ঘটনা। তদুপরি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে ব্যক্তি কোন কবিতাও লেখেনি, সাহিত্যিকদের আসরেও অংশগ্রহণ করেনি, কখনো কোন কিতাবও খোলেনি, হাতে কলমও ধরেনি, কোন ক্লাশেও বসেনি —তার পক্ষে কি সহসা এমন কালাম রচনা করে আনা সম্ভব, যা ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার লালিত্য-মাধুর্যে, জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তুতে, সাহিত্যিক উৎকর্ষতায় ও ভাষাশৈলীতে এতই সমৃদ্ধ যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠী ও জিনজগতকে পরাভূত ও অক্ষম করে দেয়। যার জ্ঞান-গরিমা ও তত্ত্ব-তথ্যের সামনে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের পাণ্ডিত্য ও জাঁদরেল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানসাধনা নিষ্প্রভ ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যা হেদায়েতের এমন পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন নীতি-পদ্ধতি মানব সম্প্রদায়ের হাতে এনে দিয়েছে, যার সামনে পূর্ববর্তী সমস্ত নীতি-পদ্ধতি অসার হয়ে পড়েছে। যা বড় বড় জাতি ও দেশের নির্জীব সভ্যতার বুকে তাজা রূহ ফুঁকে দিয়ে শ্বাশত হায়াত ও একই সঙ্গে নতুন জীবনের উপায়-উপকরণ পেশ করেছে। বলত, আমার মত নিরক্ষরের পক্ষে এমন মহামহিম কালাম তৈরি করা কীভাবে সম্ভব হবে?

তোমাদের চিন্তা করা উচিত, যে পাক-পবিত্র মানুষটি চল্লিশটি বছর পর্যন্ত কোন মানুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেনি, সে একেবারে (معاذ الله) আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা রচনা ও অপবাদ আরোপ করার মত ধৃষ্টতা দেখাতে পারে কি? কখনো না। অতএব বাধ্য হয়ে মানতে হবে যে, যে কালাম আমি তোমাদের শোনাচ্ছি তা আল্লাহর কালাম, তাতে আমার নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই, না আমি নিজে তা রচনা করেছি, আর না নিজ মর্জিমত তা প্রচার করতে পারি। খোদা যা কিছু ইচ্ছা করেন, তাই আমার যবানীতে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। তাতে এক অক্ষর বা যের-যবর পরিবর্তন করার অধিকার কোন সৃষ্টিরই নেই।

أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতগুলি অস্বীকার করে? নিশ্চয় অপরাধীরা সফল হয় না[১]।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমনসব বস্তুর উপাসনা করে, যা ওদের ক্ষতিও করতে পারে না আর ওদের উপকারও করতে পারে না। এবং ওরা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী[২]।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় জানাচ্ছ, যা তিনি জানেন না– আকাশমণ্ডলীতেও না, পৃথিবীতেও না? ওরা যে শির্ক করে এ থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে[৩]।'

---

১. অর্থাৎ পাপী ও অপরাধীরা প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এখন তোমরা নিজেরাই বিচার করে দেখ, জালেম ও অপরাধী কারা? যদি অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া হয় যে, আমি মিথ্যা বানিয়ে খোদার নামে চালানোর প্রয়াস পাচ্ছি, তবে আমার অপেক্ষা বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু পূর্বের আয়াতে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বাতিল। সুতরাং আমার সত্যবাদিতা যেহেতু প্রমাণিত, আর তোমরা খোদার কালামকে মিথ্যা বলছ, অতএব পৃথিবীর বুকে তোমাদের চেয়ে বড় জালেম কেউই হতে পারে না।

২. আল্লাহ ও পয়গম্বরের সঙ্গে ওদের আচরণ কেমন ছিল, তার বর্ণনা তো শুনলে। এখন ওদের উপাসনার অবস্থা শোন। আল্লাহকে ছেড়ে ওরা এমনসব জিনিসের পূজা করে, যাদের ক্ষমতার গণ্ডিতে লাভ ও ক্ষতি কিছুই নেই। জিজ্ঞাসা করা হলে ওরা বলে, বড় খোদা তো অবশ্যই একজন, যিনি আসমান-যমীন পয়দা করেছেন; কিন্তু এই মূর্তিদের এ জন্য খুশী রাখা প্রয়োজন যে, এরা সুপারিশ করে বড় খোদার দ্বারা দুনিয়াতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সমাধা করে দেবে এবং মৃত্যুর পর আরো কোন জীবন থাকলে সেখানেও আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এছাড়া ছোট-খাট বিভিন্ন কাজ স্বয়ং তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে। এসব কারণে আমাদের উচিত তাদের ইবাদত করা।

৩. অর্থাৎ মূর্তিদের সুপারিশকারী হওয়া এবং সুপারিশকারী হিসাবে উপাসনার যোগ্য হওয়া, এ উভয় দাবিই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। আর এ কথা অতি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে তা-ই থাকবে যা বাস্তব। সুতরাং আল্লাহর শিক্ষার পরিপন্থী এসব অবাস্তব ও মনগড়া বিষয়কে সত্য বলে প্রমাণ করতে যাওয়ার অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ তাআলাকে এমন বিষয়ের বাস্তব হওয়া সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া, যার বাস্তবতা আসমান ও যমীনে কোথাও তাঁর জানা নেই, অর্থাৎ সে সবের অস্তিত্বই নেই। থাকলে অবশ্যই তাঁর জ্ঞানে থাকত এবং সে ক্ষেত্রে তা তিনি নিষেধ করতেন না।

১৯. সমস্ত মানুষ তো একই উম্মত (অর্থাৎ অভিন্ন দীনের অনুসারী) ছিল; অতঃপর তারা মতবিরোধ করেছে। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত একটি কথা না থাকত, তবে তাদের মাঝে সেই বিষয়ে অবশ্যই ফয়সালা করে দেওয়া হত যার ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে[১]।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

২০. ওরা বলে, 'তাঁর (মুহাম্মদের) প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় না কেন?' আপনি বলে দিন, 'গায়বের কথা আল্লাহই জানেন☆। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[২]'।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

১. মুশরিকদের তরফ থেকে মুসলমানদের এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, খোদা তোমাদের ধর্মে শিরক নিষেধ করে থাকবেন, আমাদের ধর্মে নিষেধ করেননি। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দীন আদিকাল থেকে একই রয়েছে। সত্য আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। অতঃপর লোকেরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ ওদের বোঝানো ও সত্য ধর্মে আনার জন্য নবীদের প্রেরণ করেন। কোনো কালে ও কোনো মিল্লাতে আল্লাহ শিরককে জায়েয রাখেননি।

তবে লোকদের পরস্পরের এই মতভেদ জবরদস্তিমূলকভাবে বিলোপ করা হয়নি, বরং দুনিয়ার বুকে একে টিকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। কারণ, পূর্ব থেকেই আল্লাহর জ্ঞানে এ বিষয় সাব্যস্ত ছিল যে, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র এবং পরীক্ষার স্থান। অকাট্য ও শেষ মীমাংসার স্থান নয়। এখানে মানুষকে কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কিছুটা স্বাধীন রাখা হয়েছে, যাতে তারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পরে। যদি এ বিষয় পূর্ব থেকে অবধারিত না থাকত, তবে সকল মতভেদের মীমাংসা এক মুহূর্তেই করে দেওয়া হত।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অদৃশ্য বিষয় তো আল্লাহরই হাতে'।

২. অর্থাৎ যেসব নিদর্শনের ফরমায়েশ ওরা করেছিল, তার মধ্য থেকে কোনো একটি কেন অবতীর্ণ হল না? —উত্তরে যা বলা হচ্ছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, সত্যতার নিদর্শন ইতি পূর্বে অনেক দেখেছ। সুতরাং ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো জরুরী নয়, লাভজনকও নয়। ভবিষ্যতে যে নিদর্শন দেখানো মঙ্গলকর হবে, তা তিনি দেখাবেন। আর ভবিষ্যতে কী মানের ও ধরনের নিদর্শন দেখানো হবে, তার ইলম একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

[রুকূ - ৩]

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ⑳

২১. মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি যখন তাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখনই তারা আমার আয়াতগুলি নিয়ে ছলচাতুরী শুরু করে। আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ (সবার চেয়ে) দ্রুত কৌশল গ্রহণকারী'। নিশ্চয় আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তোমাদের ছলচাতুরী লিখে রাখে[১]।

'মূযেহুল কুরআনে' আছে- 'অর্থাৎ ওরা যদি বলে, আমরা কী করে জানব যে, তোমার কথা সত্য? তবে উত্তরে বলা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা এ ধর্মকে উজ্জ্বল করবেন এবং বিরোধকারীরা অপদস্থ হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত তা-ই হয়েছিল। সত্যের নিদর্শন একবারই যথেষ্ট; আর প্রত্যেকবার বিরোধকারীরা অপদস্থ হলে তো মীমাংসা হয়েই যায়। অথচ (চূড়ান্ত) মীমাংসার স্থান দুনিয়া নয়।

১. মক্কাবাসীদের আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ সাতবছর যাবৎ দুর্ভিক্ষে ফেলে রাখলেন। যখন ওরা ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছল, তখন আতঙ্কিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দো'য়ার দরখাস্ত করল এবং এই আযাব দূরীভূত হয়ে গেলে ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করল। হুযূরের দো'য়ায় আল্লাহ তাআলা অবকাশ দিলেন, দুর্ভিক্ষের বিপদ দূর হল; কিন্তু ওরা পূর্বের ন্যায় দুষ্কৃতি করতে লাগল। খোদার আয়াতকে মিথ্যা বলল এবং তাঁর কুদরত ও রহমতের কথা স্বীকার না করে বরং সবকিছুকে বাহ্যিক কার্য-কারণ ও ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে লাগল।

এরই উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আচ্ছা, তোমরা খুব দূরভিসন্ধি, প্রবঞ্চনা ও ফাঁকিবাজি করে নাও। কিন্তু স্মরণ রেখো, তোমাদের সকল ফাঁকিবাজি এক এক করে লিখিত হচ্ছে, কিয়ামতের দিন তোমাদের সামনে সমস্ত রেকর্ড পেশ করা হবে। আর ফেরেশতাদের নিকটেই যখন তোমাদের কোন হিলা-বাহানা গুপ্ত নয়, তখন আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান থেকে কী করে গুপ্ত থাকতে পারে।— তোমরা নিজেদের ছল-চাতুরী ও ফাঁকিবাজির উপর গর্ববোধ করছ, অথচ আল্লাহর কৌশল (গুপ্ত তদবীর) তোমাদের কূটকৌশল ও তদবীর থেকে অনেক বেশি তীব্র ও দ্রুত ক্রিয়াশীল! বস্তুত তিঁনি অপরাধীর লাগাম এতটা ঢিলা করে দেন যে, সে অবজ্ঞা-উপেক্ষার নেশায় মত্ত হয়ে শাস্তির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। অতঃপর যখন দুর্ভাগ্যের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন অকস্মাৎ ওকে পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেন। সুতরাং আল্লাহর নম্রতা, সহনশীলতা ও অনুকূল অবস্থা দেখে বুদ্ধিমান লোকের গর্বিত হওয়া উচিত নয়। বলা যায় না, নম্রতার পর কী রকম কঠোরতা এসে পড়ে। সম্মুখে এর উদাহরণস্বরূপ সামুদ্রিক সফরের কথা বর্ণিত হচ্ছে।

২২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের স্থলে ও জলে ভ্রমণ করান। অতঃপর (এক সময়) তোমরা যখন নৌযানে আরোহণ কর এবং নৌকাগুলি অনুকূল বাতাসে লোকদের নিয়ে বয়ে চলে, আর ওরা তাতে আনন্দিত হয়ে ওঠে– তখন (সহসা) নৌকাগুলির উপর ধেয়ে আসে প্রবল বাতাস এবং ওদের উপরে চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়ে তরঙ্গ, আর ওরা বুঝে নেয় যে, ওরা (চতুর্দিক থেকে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে; (তখন) ওরা আল্লাহকে ডাকা শুরু করে তাঁর প্রার্থনায় একনিষ্ঠ হয়ে (এবং বলে), 'আপনি যদি আমাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব।'

هُوَالَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

২৩. অতঃপর যখন আল্লাহ ওদের রক্ষা করেন, অমনি ওরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দুষ্কৃতি আরম্ভ করে দেয়[১]। হে মানুষ! তোমাদের

فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'বিপদের সময় মানুষের দৃষ্টি কার্যকারণের দিকে নিবদ্ধ না হয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি থাকে। যখনই বিপদ কেটে গেল, অমনি আল্লাহকে ভুলে কার্যকারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এ ভয় থাকে না যে, আল্লাহ পুনরায় অনুরূপ দুঃখ-কষ্টের একটা কারণ দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। সকল কার্যকারণের লাগাম তাঁরই হাতে রয়েছে।' সামনে সামুদ্রিক সফরের দৃষ্টান্তে তারই একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ প্রথমে বাতাস ছিল মৃদুমন্দ ও অনুকূল। ফলে, আরোহীরা হেসে খেলে আরামে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ প্রবল বায়ু বইতে শুরু করল এবং চতুর্দিক থেকে পাহাড়তুল্য তরঙ্গমালা নৌকাকে আঘাত হানতে লাগল। যখন তারা বুঝতে পারল যে, সকল দিক থেকেই পরিবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুর মুখে এসে পৌঁছেছে, পালানোর বা বের হয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, তখন সমস্ত মনগড়া মা'বূদকে ছেড়ে একক আল্লাহকে ডাকতে লাগল, যা ছিল মানুষের আসল ফিতরত বা স্বভাবের দাবি। সবকিছু থেকে নিরাশ হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করল এবং খুবই পরিপক্ক ওয়াদা-অঙ্গীকার করল যে, যদি এ বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন, তবে সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, নে'য়ামতের অকৃতজ্ঞতা বলতে কিছুই করবে না। কিন্তু যখনি একটু নিরাপত্তা লাভ হল, তীরে পা ফেলামাত্রই সমূহ দুষ্কৃতি ও ফিতনা-ফাসাদ আরম্ভ করে দিল, এক মুহূর্তও অঙ্গীকারের উপর কায়েম থাকল না।

বি. দ্র. এ আয়াতে ইসলামের সেসব দাবিদারের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে, যারা তাদের নৌযান তুফানবেষ্টিত হওয়ার সময়ও সাহায্যের জন্য একক খোদাকে ছেড়ে গাইরুল্লাহকে ডেকে থাকে।

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

দুষ্কৃতি (-র অনিষ্ট) তোমাদের নিজেদেরই উপর পতিত হবে। পার্থিব জীবনের মজা ভোগ করে নাও। তারপর আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যা কিছু তোমরা করতে[১]।

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমন: যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, আর তার কারণে যমীনের উদ্ভিদ সংমিশ্রিত অবস্থায়* উদ্‌গত হল, যা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে[২]। অবশেষে যখন ভূমি তার সৌন্দর্য

হযরত ইকরিমার ঘটনা

মক্কা বিজয়ের পর আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা (তখনো মুসলমান হয়নি), মক্কা থেকে পালিয়ে সামুদ্রিক সফর অবলম্বন করল। কিছুদূর যেতেই জলযান ঝড়ো বাতাসে বেষ্টিত হয়ে গেল। নৌচালক আরোহীদের বলল, এক খোদাকেই ডাক, এখানে তোমাদের উপাস্যরা কোনই উপকার করতে পারবে না। তখন ইকরিমা বলল, এ-ই তো সেই খোদা, যার প্রতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকেন। যদি সাগরের বুকে মুহাম্মদের রব ছাড়া রক্ষা না পেতে পার, তবে স্থলভাগেও তাঁর মদদ ও সাহায্য ছাড়া রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। হে খোদা! যদি তুমি এই বিপদ থেকে রক্ষা কর, তবে আমি প্রত্যাবর্তন করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত দিয়ে দেব। আমার আশা, তিনি তাঁর কোমল চরিত্রগুণে আমার দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেবেন। সে মত তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হাসিল করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।) (সুনানে নাসাঈ, বর্ণনা ৪০৬৭)

১. অর্থাৎ তোমাদের দুষ্কৃতির শাস্তি তোমাদেরই উপর পতিত হবে। মনে কর, যদি কিছুদিন দুষ্কৃতি করে দুনিয়ার কিছু লাভ অর্জন করে নিলে, তবুও শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে তোমাদের সব কৃতকর্ম সামনে এসে যাবে এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত শাস্তি দান করে জানিয়ে দেবেন, তোমাদের কৃতকর্ম কেমন ছিল।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ঘন হয়ে'

২. কোন কোন মুফাসসির فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ এর ব্যাখ্যা করেছেন —'উৎপন্ন শস্যের প্রাচুর্য'। কেননা, যখন জমির ফসল প্রচুর হয় তখন ঘন হয়ে একাংশ অন্য অংশের সাথে জড়িয়ে যায়। কেউ কেউ به শব্দের باء কে مصاحبت বা 'সাথে' অর্থে ধরে এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, যমীনের উদ্ভিদ পানির সাথে মিশে যায়। কেননা, গাছ-গাছড়া পানির

حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

ধারণ করল ও সুশোভিত হয়ে উঠল এবং ভূমির মালিকগণ মনে করল, তা (অর্থাৎ ভূমির ফসল) তাদের হস্তগত হবে[১]– তখন হঠাৎ আমার হুকুম রাতে বা দিনে তার উপরে এসে পড়ল এবং আমি তাকে পরিণত করলাম কর্তিত ফসলের স্তূপে, যেন গতকালও তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি সেই লোকদের জন্য, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে[২]।

অংশসমূহ নিজেদের মধ্যে শুষে নেয়। যেভাবে খাদ্য মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তদ্রূপ পানিও তৃণলতার খাদ্যে পরিণত হয়।

মুতারজিম যে তরজমা করেছেন, তার ভঙ্গিমা থেকে মনে হচ্ছে, তাঁর নিকট اختلاط দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মাটি ও পানির সংমিশ্রনে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তু উভয়ের খাদ্য থাকে। যেমন: গমগাছে যে শস্যদানা রয়েছে তা মানুষের খাদ্য, আর তাতে ভূষিও রয়েছে, যা জীবজন্তুর খাদ্য। অনুরূপ, গাছ-বৃক্ষে ফল ধরে ও পাতা গজায়– একটির আহারকারী মানুষ, অপরটির জীবজন্তু।

১. অর্থাৎ বিভিন্ন রং ও আকৃতির উদ্ভিদরাজি ভূমিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুশোভিত করে তোলে এবং শস্য-ফসল এমন প্রস্তুত হয়ে যায় যে, ভূস্বামীগণ পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে ওঠে যে, এখন তার দ্বারা পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে।

২. অর্থাৎ সহসা খোদার হুকুমে রাতে বা দিনে কোন বিপদ এসে পড়ল (যেমন: ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি) এবং তাতে সমস্ত ফসল এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, যেন এখানে কখনো একটি ঘাসও উৎপন্ন হয়নি—পার্থিব জীবনের উদাহরণ ঠিক এরূপ। দুনিয়ার জীবন যতই সুন্দর ও সতেজ দেখা যাক না কেন, এমন কি নির্বোধ লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বে যতই বিমোহিত হয়ে প্রকৃত সত্যকে ভুলে যাক না কেন, তার এ সজীবতা, শোভা ও সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, যা অতি শীঘ্র ধ্বংসের হাতে বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এই উদাহরণকে অতি সূক্ষ্মভাবে মানব জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন। লক্ষ করুন, পানিরই মত রূহ আসমান (উর্ধ্ব জগত) থেকে এসেছে, মাটির দেহের সাথে মিলে শক্তিশালী হয়েছে, উভয়ের সংমিশ্রনে মানুষ হয়েছে। অতঃপর সে মানবিক ও পাশবিক উভয় রকমের কাজকাম করে। যখন সে সকল গুণে পরিপূর্ণ হয় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ভরসাস্থল হয়ে ওঠে, এমন সময় হঠাৎ মৃত্যু এসে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে সকল আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর সে এমনই নিশ্চিহ্ন হয়, যেন সে পৃথিবীর বুকে কখনো অস্তিত্বই লাভ করেনি।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۵﴾

২৫. আর আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তার নিবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন[১]।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا

২৬. যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী কিছু[২]। আর তাদের

ফায়দা : ليلا أو نهارا (রাতে বা দিনে) সম্ভবত এজন্য বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা অলসতা ও আরামের সময়, আর দিনের বেলায় লোকেরা সাধারণত জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ এদিকে ইশারা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর হুকুম যখন এসে পৌঁছে তখন ঘুমন্ত হোক বা জাগ্রত, উদাসীন হোক বা সচেতন, কোন মানুষ কোন অবস্থাতেই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

১. অর্থাৎ দুনিয়ার ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি অনুরাগী হয়ো না; শান্তির নিবাস অর্থাৎ বেহেশতের দিকে অগ্রসর হও। আল্লাহ তোমাদের শান্তির ঠিকানায় ডাকছেন এবং তা পর্যন্ত পৌঁছার পথও দেখাচ্ছেন। এটাই সেই ঘর, যার বাসিন্দারা সব রকমের চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট,বিপদাপদ, ভয়-ভীতি, ক্ষণস্থায়িত্ব ইত্যাদি থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। ফেরেশতাগণ তাদের 'সালাম' করবেন, এমনকি স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে তোহফাস্বরূপ 'সালাম' ভাগ্যে জুটবে।

২. সৎকর্মশীলরা উত্তম স্থান (অর্থাৎ বেহেশত) পাবে, তদুপরি আরো কিছু পাবে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর 'দীদার' বা দর্শন লাভ করবে।

زيادة শব্দটির তাফসীর আল্লাহর 'দীদার' করা হয়েছে। সহীহ হাদীসসমূহে এমনই রয়েছে এবং বহু সাহাবী ও তাবেয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত সুহাইব (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পড়ে বললেন, যখন বেহেশতীরা বেহেশতে ও দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করে সারবে, তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে, 'হে বেহেশতবাসীরা! তোমাদের জন্য খোদার একটি ওয়াদা বাকী রয়েছে, যা তিনি এখন পূরণ করতে চান।' বেহেশতীরা তখন বলবে, 'তা কী? খোদা তাআলা কি নিজ মেহেরবানীতে আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করে দেননি? তিনি কি আমাদের চেহারাকে শুভ্র ও নূরানী বানাননি? তিনি কি আমাদের দোযখ থেকে রক্ষা করে বেহেশতের মত স্থানে পৌঁছাননি? (এ সব কিছুই তো হয়েছে, এখন আর কোন্ জিনিস অবশিষ্ট রইল?)— তখন হিজাব বা পর্দা তুলে দেওয়া হবে, আর বেহেশতীরা আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে! অতএব, খোদার কসম- তাদের কাছে কোন নে'য়ামতই 'দীদার' এর দৌলতের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে না। তার চেয়ে বেশি আর কোন বস্তুই তাদের চক্ষু শীতল করবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৮১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৭) رزقنا الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله (আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়া ও ফযলে আমাদেরও এ নে'য়ামত দান করুন)।

يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না কালিমা ও লাঞ্ছনা। তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে[১]।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যারা মন্দ কাজকর্ম করেছে, তো (প্রত্যেক) মন্দের শাস্তি তার সমপরিমাণ[২] এবং ওদের আচ্ছন্ন করবে লাঞ্ছনা। আল্লাহ থেকে ওদের রক্ষাকারী কেউই নেই। ওদের চেহারা যেন অন্ধকার রাতের টুকরা দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে[৩]। ওরা জাহান্নামী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. (সেই দিনকে স্মরণ কর), যেদিন আমি ওদের সকলকে সমবেত করব, তারপর আমি শির্ককারীদের বলব, 'তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর'[৪]। অতঃপর আমি ওদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেব এবং ওদের শরীকরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

---

১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কাফের ও পাপীদের চেহারা তো ভীষন অপমান ও অন্ধকারে আচ্ছাদিত হবে, পক্ষান্তরে বেহেশতীদের চেহারা এর উলটা হবে– কালিমা ও হীনতার কোন প্রশ্নই নেই, সেখানে তো নূর আর নূর এবং আলো ও দীপ্তির ছড়াছড়ি হবে।

২. অর্থাৎ পাপের প্রতিফল পাপের চেয়ে বেশি হবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ শাস্তি কম দেন অথবা কোন কোন পাপ সম্পূর্ণই মাফ করে দেন, এ তাঁর ইচ্ছাধীন।

৩. অর্থাৎ ওদের চেহারা এতই কালো ও অন্ধকার হবে, যেন অন্ধকার রাতের কালিমাখণ্ড তার উপর মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. شركاءكم অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ধারণায় যাদের খোদার শরীক নির্ধারণ করে রেখেছিলে; অথবা যাদের খোদার পুত্র-কন্যা বলতে– যেমন: মাসীহ আলাইহিস সালাম, যিনি নাসারাদের নিকট 'ইবনুল্লাহ' (আল্লাহর পুত্র) বরং 'আইনুল্লাহ' (স্বয়ং আল্লাহ) বলে আখ্যায়িত হতেন; অথবা 'আল্লাহর ফেরেশতা' বা 'আহবার ও রুহবান', এদেরও ওরা এক পর্যায়ে খোদার মর্যাদা দিয়ে রেখেছিল; অথবা أصنام وأوثان, যাদের মধ্যে মুশরিকরা খোদায়ী অধিকার বণ্টন করে দিয়েছিল– এদের সবাইকে স্ব স্ব স্তর অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করার আদেশ হবে।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. 'অতএব আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম'[১]।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, পূর্বে সে যা করেছিল তা যাচাই করে নেবে এবং ওরা ওদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, আর ওরা যে মিথ্যা রচনা করত তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে[২]।

---

১. অর্থাৎ তখন বড় পেরেশানী দেখা দেবে এবং প্রত্যেকে 'নাফসী নাফসী' বলতে থাকবে। আবেদ ও মাবূদ তথা উপাসনাকারী ও উপাস্যদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং দুনিয়াতে নিজেদের কল্পনা ও ধারণা অনুযায়ী যেসব সম্পর্ক তৈরি করেছিল সবই ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় সময়ে, যখন মুশরিকরা নিজেদের কল্পিত উপাস্যদের কাছে অনেক আশা-ভরসা পোষণ করতে থাকবে, তখন তারা পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেবে যে, আমাদের সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক! তোমরা মিথ্যা বলছ যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতে। কারণ, তোমরা নিজেদের আকীদা অনুযায়ী যাদের পূজা করতে, এবং তাদের জন্য তোমরা যেসব খোদায়ী গুণ সাব্যস্ত করতে, তা বাস্তবে তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল না। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমাদের ইবাদত ও বন্দেগী 'মাসীহ' বা 'ফেরেশতাদের' জন্য হয়নি এবং তা নির্জীব মূর্তিদের জন্যও ছিল না। আসলে তা ছিল নিতান্তই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা বা অভিশপ্ত শয়তানের উপাসনা! কিন্তু এই উপাসনাকে ফেরেশতা, নবী, কোন নেক মানুষ ইত্যাদির নামে চালিয়ে দিতে। আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন, আমাদের সন্তুষ্টি বা সম্মতি নিয়ে তোমরা এ কাজ করনি। তোমরা সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিহেতু আল্লাহর মোকাবেলায় আমাদের উপাস্য বানিয়ে ফেলবে, এ খবরও আমাদের ছিল না।

বি. দ্র. এ কথোপকথন যদি হযরত মাসীহ বা অন্য কোন আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন মাখলুকের (যেমন ফেরেশতা বা কোন নেক মানুষের) পক্ষ থেকে ধরা হয়, তবে সংশয়ের কোন কারণ নেই। আর যদি মূর্তিদের পক্ষ থেকে ধরা হয়, তবে মুশরিকদের চরম নৈরাশ্য ও দুর্ভাগ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নিজ মহাশক্তি বলে পাথরের মূর্তিকে বাকশক্তি দান করা মোটেই অসম্ভব নয়। সূরা হা-মীম সেজদার ৩ রুকূতে (আয়াত :২১) আছে- قَالُوْٓا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (সেগুলি বলবে, 'আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি বাকশক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে।')

২. অর্থাৎ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনা সবই উধাও হয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি চর্মচোখে দেখে নেবে, প্রকৃত মালিক আল্লাহ ছাড়া প্রত্যাবর্তনের কোনই ঠিকানা নেই, আর প্রত্যেক মানুষ নিজ ভাল ও মন্দ আমলাদি সম্বন্ধে জেনে-বুঝে নেবে যে, সেসবের মূল্য কতটুকু!

[রুকূ - ৪]

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣١

৩১. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'কে তোমাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে[১]? অথবা কে (তোমাদের) কান ও চোখের মালিক[২] এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করে[৩] এবং কে সকল বিষয় পরিচালনা করে[৪]?' (উত্তরে) ওরা অবশ্যই বলে উঠবে, 'আল্লাহ'। অতএব আপনি বলুন, 'তবুও কি তোমরা (তাঁকে) ভয় কর না?'

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٣٢

৩২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতএব সত্যের পর গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকে? অতএব তোমরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ[☆][৫]?

---

১. আকাশের দিক থেকে বৃষ্টি ও সূর্য-তাপ ইত্যাদি আসে এবং এর সাথে মিলিত হয় ভূমিজ উপাদান-উপকরণ, এরপরই মানুষের রিযিক প্রস্তুত হয়।

২. অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন, তারপর আবার সেগুলির হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। এসব মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই প্রকৃত মালিক কে, যিনি যখন ইচ্ছা দান করেন, যখন ইচ্ছা ছিনিয়ে নিতে পারেন?

৩. যেমন, বীর্য বা ডিম থেকে প্রাণী, আবার প্রাণী থেকে বীর্য ও ডিম বের করেন! অথবা রূহানী ও আত্মিকভাবে যে ব্যক্তি বা জাতি মরে গেছে, তার থেকে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর অনেক মানুষ সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে জীবিত জাতিসমূহের উত্তরসূরীদের উপর তাদেরই দুর্ভাগ্যের কারণে মৃত্যু চাপিয়ে দেন।

৪. অর্থাৎ বিশ্বজগতের সকল তদবীর ও ব্যবস্থাপনা কে করে থাকেন?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অতএব (সত্য থেকে) তোমরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?

৫. মুশরিকরাও স্বীকার করত, এ সমস্ত বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। এ জন্য বলা হয়েছে যে, আসল খালিক ও মালিক এবং সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপক যখন তাঁকেই মান, তখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের মা'বূদ বানাতে কি ভয় কর না? মা'বূদ তো তাঁরই হওয়া উচিত, যিনি সকলের স্রষ্টা, রাজত্বের মালিক, নিরঙ্কুশ রব ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তা, স্বীকার করে পিছন দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছ? যখন এ-ই সত্য, তখন

৩৩. এভাবেই নাফরমানদের সম্পর্কে আপনার রবের এ কথা সত্য প্রমাণিত হল যে, ওরা ঈমান আনবে না[১]।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সৃষ্টির সূচনা করে, অতঃপর সে তার পুনরাবৃত্তি করবে?' আপনি বলুন, 'আল্লাহই প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। অতএব তোমরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ[২]?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আপনি (আরো) জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে সত্যের পথ দেখাতে পারে?' আপনি বলুন, 'আল্লাহই সত্যের পথ দেখান।' অতএব যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি আনুগত্যের বেশি উপযুক্ত, না সে, যে নিজেই পথ পায় না তাকে পথ দেখানো না হলে?' অতএব তোমাদের কী হল? তোমরা কিরূপ ফয়সালা কর[৩]?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۚ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

সত্যের পর মিথ্যা ছাড়া আর কী থাকে? সত্যকে ছেড়ে মিথ্যা কল্পনার পেছনে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ এসব অবাধ্য-বিদ্রোহীদের ভাগ্যে ঈমান লেখেননি, যার কারণ ওদেরই সেই অবাধ্যতা ও খোদাদ্রোহিতা, যা পূর্বে থেকেই আল্লাহর অসীম জ্ঞানে রয়েছে। এভাবে পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে ওদের ব্যাপারে আল্লাহর লিখিত বাণী সঠিক প্রমাণিত হল।

২. পূর্বে ছিল مبدأ (সৃষ্টির সূচনা)-এর বর্ণনা। এখন معاد (পুনরুত্থান) সম্পর্কে আলোচনা। অর্থাৎ যখন তোমরা স্বীকার কর যে, আকাশ ও পৃথিবী, চোখ ও কান, জীবন ও মৃত্যু সব কিছুর স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা তিনিই, তখন এও স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পর পুনর্বার সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থান করাও একমাত্র তাঁরই কাজ হতে পারে। অতএব তিনি নিজেই যখন নবীদের যবানীতে পুনর্জীবনের সংবাদ দান করেছেন, তখন তা স্বীকার করে নিতে কী আপত্তি থাকতে পারে? مبدأ-কে যখন স্বীকার করছ, معاد-কে অস্বীকার কর কোন্ যুক্তিতে ?

৩. সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আলোচনার পর এখন মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রথমবারের সৃষ্টিকারী ও দ্বিতীয়বারে জীবিতকারী যেমন এক আল্লাহ, তেমনি সঠিক পথের সন্ধানদাতাও তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আল্লাহই বান্দাদের সত্য ও

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৬. আর ওদের অধিকাংশই শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। অনুমান তো কোন কাজে আসে না সত্যের মোকাবেলায়[১]। নিশ্চয় আল্লাহ ওরা যা কিছু করে তা উত্তমরূপে জানেন।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ

৩৭. এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে রচিত নয়[২]; বরং এটি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারী[৩] এবং সেসব

সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন। সৃষ্টির বড়-ছোট সকলে তাঁরই পথপ্রদর্শনের মুখাপেক্ষী, তাঁরই হেদায়েতের অনুসরণ সকলের করা উচিত। মূর্তি-প্রতিমার মত অসহায়দের তো কথাই নেই, বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্ত (নবী ও ফেরেশতাগণ) পর্যন্ত সর্বদা এ কথা স্বীকার করে এসেছেন যে, 'আল্লাহর হেদায়েত ও সাহায্য ছাড়া আমরা এক কদমও অগ্রসর হতে পারি না।' বান্দাদের জন্য তাঁদের পথপ্রদর্শনও এ কারণে গ্রহণযোগ্য যে, খোদা সরাসরি তাঁদের পথপ্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং এটা কী রকম অবিচার যে, মানুষ সকল সৃষ্টির একচ্ছত্র পথপ্রদর্শনকারী (আল্লাহ তাআলাকে) ছেড়ে বাতিল ও দুর্বল আশ্রয়স্থল তালাশ করবে, অথবা 'আহবার ও রুহবান' বা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের কথা মত পথ চলতে শুরু করবে?

১. যখন জানা গেল যে, সৃষ্টির সূচনাকারী, পুনর্সৃষ্টিকারী ও হেদায়েতকারী একমাত্র আল্লাহই, তখন তাঁর মোকাবেলায় শিরকের পথ অবলম্বনকারীদের চিন্তা করা উচিত যে, ওদের হাতে এমন কী দলীল-প্রমাণ রয়েছে, যার ভিত্তিতে তাওহীদ তথা একত্ববাদের আদি ও শক্তিশালী পথ পরিত্যাগ করে ওরা গোমরাহীর গর্তে পতিত হচ্ছে? আসল কথা এই যে, ওদের নিকট কল্পনা ও অনুমাননির্ভর বিষয়াদি ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ বোঝা উচিত, অনুমান-আন্দাজের তীর সত্য ও সততার বেলায় কী কাজে আসতে পারে?

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা শুধু কল্পনা ও অনুমানের অনুসরণ করে থাকে। অথচ অনুসরণের যোগ্য হচ্ছে তাঁর কথা, যিনি সঠিক পথ বাতলান। এ প্রসঙ্গেই এখানে কুরআন করীমের আলোচনা করা হচ্ছে।

বস্তুত বর্তমান বিশ্বে এই একটিমাত্র গ্রন্থই সঠিক পথের দিশারী এবং সকল অনুমান ও কল্পনার মোকাবেলায় সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনকারী। এর (علوم) জ্ঞান-বিজ্ঞান, হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন এবং অলৌকিক বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষা-মাধুর্য লক্ষ করে এই সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই কুরআন এমন গ্রন্থ নয়, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ রচনা করতে পারে। সম্পূর্ণ কুরআন তো দূরের কথা, এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করাও সমগ্র জিন ও মানবগোষ্ঠীর সাধ্যে নেই। পরবর্তী আয়াতে এ কথাই বলা হবে।

৩. কুরআন যে আল্লাহর কালাম, তা এ থেকেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল আসমানী (ঐশী) কিতাবের সত্যতাকে সমর্থন করে। সেগুলির আসল বিষয়াবলির সংরক্ষণ এবং সেগুলির ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সত্যতা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে।

يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

বিষয় সবিস্তারে বর্ণনাকারী, যা (ঐ কিতাবসমূহে সংক্ষেপে) লিপিবদ্ধ ছিল। এ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই, (এ) সমগ্র বিশ্বের রবের পক্ষ থেকে[১]।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৮. ওরা কি বলে, 'সে (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন রচনা করেছে'? আপনি বলে দিন, 'তবে তোমরা এর মত একটি সূরাই নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'[২]।

---

১. অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেসব জ্ঞান-মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব-তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। সত্য এটাই যে, এ কিতাবে বুদ্ধিমানদের জন্য দ্বিধা-সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই। এ রকম পূর্ণাঙ্গ, জ্ঞানগর্ভ, হেকমতপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল কালাম বিশ্বপ্রভুরই হতে পারে।

২. অর্থাৎ আমি যদি রচনা করে থাকি, তবে তোমরাও আমারই মত মানুষ। তোমরা সকলে মিলে এর ন্যায় একটি সূরা রচনা করে আন। সমস্ত সৃষ্টিকে আহ্বান কর, জিন ও মানব জাতিকে একত্র কর, সমগ্র বিশ্বের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একত্র হয়ে কুরআনের ন্যায় একটি ছোট সূরা পেশ কর। তা হলে বোঝা যাবে, কুরআনও কোন মানুষের কালাম, যার অনুরূপ অন্য লোকেরাও রচনা করতে পারে। কিন্তু কস্মিনকালেও কোন সৃষ্টির পক্ষে এটা সম্ভবপর হবে না।

কুরআনের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনই সেই কিতাব, যার মধ্যে চরিত্র ও নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, হুকুমত ও রাজনীতি, মারেফত ও আধ্যাত্মিকতা, আত্ম-সংশোধন ও রূহানী উৎকর্ষ, এক কথায় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের সমস্ত নিয়ম-নীতি ও কর্মপন্থা বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। বলা বাহুল্য, একটি নিরক্ষর জাতির একজন নিরক্ষর মানুষের দ্বারা এসব কিছু সংকলন ও রচনা করা অসম্ভব ছিল।

অধিকন্তু, এসব জ্ঞানসম্পদ ও হেদায়েত-ভাণ্ডার নিজের মধ্যে ধারণ করা ছাড়াও এই কিতাবের বিস্ময়কর প্রকাশভঙ্গি ও ভাষামহিমা, ব্যাপক ক্রিয়াশীল ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনামাধুর্য, অস্বাভাবিক সরলতা ও প্রাঞ্জলতা, এর অলঙ্কার সম্ভার, বৈচিত্র্য এবং স্বাদ ও মিষ্ট-মাধুর্য এবং রাজকীয় বৈভব- এ সব কিছু এমনি উন্নত-উৎকৃষ্ট যে, এই কিতাব অতি জোরেশোরে ও মহাসমারোহে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে সারা বিশ্বকে মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছে।

কুরআন যখন থেকে বিশ্বসভায় সমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আদম সন্তানদেরকে নিজের সঙ্গে পরিচিত করেছে, তখন থেকে তার শাশ্বত দাবি এই যে, আমি আল্লাহর

৩৯. আসল কথা এই যে, ওরা এমন বিষয়কে অস্বীকার করে বসেছে, যার জ্ঞান-ভাণ্ডার ওরা আয়ত্ত করতে পারেনি[১] এবং এখনো ওদের নিকট আসেনি তার বাস্তবরূপ*[২]। এমনিভাবে

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

তাআলার কালাম (ঐশী বাণী)। বিশ্ব যেমন আল্লাহর পৃথিবীর ন্যায় পৃথিবী, আল্লাহর সূর্যের ন্যায় সূর্য ও আল্লাহর আকাশের ন্যায় আকাশ সৃষ্টি করতে অক্ষম রয়েছে, তেমনি আল্লাহর কুরআনের ন্যায় কুরআন রচনা করতেও বিশ্ব অক্ষম থাকবে।

কুরআনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য লোকেরা নানা ষড়যন্ত্র করবে, দুরভিসন্ধি আঁটবে, সর্ব উপায়ে তার বিরোধিতা করবে, নিজদের সাহায্যার্থে বিশ্বের বড় বড় শক্তিকে আহ্বান করবে, কোন কৌশল, কোন তদবীর ও কোন অভিসন্ধি করায় ত্রুটি করবে না, কিন্তু কুরআনের অনুরূপ ছোট একটি সূরা রচনা করা সম্ভব হবে না। قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا {বলুন, 'সমস্ত মানুষ ও জিন যদি এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এই কুরআনের সদৃশ তৈরি করে নিয়ে আসবে, তবুও তারা কখনই এরূপ কুরআন আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়–বনী ইসরাঈল : ৮৮}

এ বিষয়ে আমরা اعجاز القرآن (কুরআনের অলৌকিকতা) নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছি। যার ইচ্ছা তা দেখতে পারেন। (আমি অধম অনুবাদক– পাঠকদের নিকট সবিনয়ে আরয করছি, আমি কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ করেছি, যা অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।)

১. অর্থাৎ কুরআনকে যে ওরা মানব-রচিত বলে, এটা বুঝে বলে না, বরং শুধু মূর্খতা, অজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার অভাবহেতু বলে থাকে। গোঁড়ামি ও শত্রুতা ওদেরকে শান্ত মনে কুরআনের সত্যতা ও তাৎপর্য এবং অলৌকিকতা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে অনুমতি দেয় না। কুবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধিহেতু অথবা চিন্তা শক্তির সদ্ব্যবহার না করার কারণে পবিত্র কুরআনের দলীল-প্রমাণ ও বিস্ময়কর বিষয়াদি ওরা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, উলটা তাকে মিথ্যা বলতে শুরু করেছে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাতে (উল্লেখিত) পরিণাম'।

২. কোন কোন মুফাসসির تأويل শব্দটির অর্থ করেছেন تفسير, অর্থাৎ কুরআনের অর্থ ও মর্ম ওদের মাথায় ঢোকেনি। আবার কারও মতে এর দ্বারা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন যেসব ভবিষ্যদ্বানী পরিবেশন করেছে, সেগুলির বাস্তবায়নের সময় যেহেতু এখনো আসেনি, তাই কতিপয় সরলমনা লোকের ক্ষেত্রে এটাও কুরআনকে অস্বীকার করার একটি কারণ হয়েছে। তো এগুলির বাস্তবায়ন কখন হবে, ওরা তার অপেক্ষায় আছে। —কিন্তু চিন্তা করা উচিত, এটা কী করে অস্বীকারের কারণ হতে পারে? এ তো বড়জোর অপেক্ষার (অর্থাৎ আপতত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার –অনু.) কারণ হতে পারে।

مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَانۡظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۳۹﴾

ওদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। অতএব দেখে নাও, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يُّؤۡمِنُ بِهٖ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّا يُؤۡمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعۡلَمُ بِالۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿۴۰﴾

৪০. ওদের কেউ কেউ কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে এবং ওদের কতক তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর আপনার রব ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত[১]।

[রুকূ - ৫]

وَاِنۡ كَذَّبُوۡكَ فَقُلۡ لِّىۡ عَمَلِىۡ وَلَكُمۡ عَمَلُكُمۡ ۚ اَنۡتُمۡ بَرِيۡٓـُٔوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَاَنَا بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۱﴾

৪১. ওরা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনি বলুন, 'আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমি যা করি তার দায় তোমাদের উপর নয় এবং তোমরা যা কর তার দায় আমার উপর নয়[২]।'

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّسۡتَمِعُوۡنَ اِلَيۡكَ ؕ اَفَاَنۡتَ تُسۡمِعُ الصُّمَّ وَلَوۡ كَانُوۡا لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪২. আর ওদের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যারা আপনার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আপনি কি বধিরদের শোনাতে পারবেন যদিও ওদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে?

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّنۡظُرُ اِلَيۡكَ ؕ اَفَاَنۡتَ

৪৩. এবং ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে আপনি কি

---

১. অর্থাৎ ভবিষ্যতে ওদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হবে। তারা ছাড়া যারা দুষ্কৃতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহ তাআলা ওদের সকলকে উত্তমরূপে জানেন। সময় এলে ওদের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ এমন দলীল-প্রমাণাদি শোনার পরও যদি এ লোকেরা আপনাকে মিথ্যা বলে, তবে আপনি বলে দিন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। বোঝানোর পরও তোমরা না মানলে আমার ও তোমাদের পথ ভিন্ন- তোমরা তোমাদের আমলের জন্য দায়ী, আমি আমার আমলের জন্য দায়ী। প্রত্যেককে তার আমলের ফল ভোগ করতেই হবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, অর্থাৎ, আমি যদি আল্লাহর হুকুম ভুল পৌছাই, তবে আমি অপরাধী, আর যদি আমি সত্য এনে থাকি এবং তোমরা না মান, তবে তোমাদের পাপের দায় তোমাদের। যা হোক, মানলে কোনক্রমেই তোমাদের ক্ষতি নেই।'

تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ⊙

অন্ধদের পথ দেখাতে পারবেন যদিও ওদের উপলব্ধি-শক্তি* না থাকে[১]?

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ⊙

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেদের উপর নিজেরাই জুলুম করে থাকে[২]।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ

৪৫. (সেই দিনকে স্মরণ কর), যেদিন তিনি ওদের এ অবস্থায় সমবেত করবেন যে, (ওদের মনে হবে)– ওরা যেন দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি[৩]। (সেদিন)

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'দর্শন-ক্ষমতা'

১. কতক লোক বাহ্যত কুরআন শরীফ ও আপনার বরকতময় কথা শুনে থাকে এবং আপনার অলৌকিক কার্যাবলি ও গুণাবলি দেখে থাকে। কিন্তু কেবল সেই দেখা ও শোনাই লাভজনক, যা অন্তরের কানে ও অন্তরের চোখে হয়ে থাকে। অন্তর-অন্ধদের আপনি নিজ কথা শুনিয়ে দেবেন অথবা সৎপথ দেখিয়ে দেবেন, এ আপনার সাধ্যে নেই।

'মূযেহুল কুরআনে' আছে, 'ওরা এ আশায় কান পাতে বা দৃষ্টি করে যে, আপনি নিজ تصرف (মননশক্তি) আরোপের মাধ্যমে ওদের অন্তরের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেবেন– যেমন কারো কারো অন্তরে এমন হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।'

কোন কোন মুফাসসিরের মতে لا يعقلون ও لا يبصرون দ্বারা যথাক্রমে একেবারেই আকল-বুদ্ধি না থাকা ও দর্শন-শক্তি না থাকা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ওরা যে কেবল দেখে না ও শোনে না, তাই নয়, বরং ওরা সব রকমের বুদ্ধি-বিবেচনা থেকে বঞ্চিত। এমন অন্ধ ও বধিরদের আপনি কী করে দেখিয়ে ও শুনিয়ে হেদায়েত করতে পারবেন?

২. অর্থাৎ যাদের অন্তরে তাছীর হয় না, দোষ তাদেরই। নিজেদেরই সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়-অবিচারের কারণে ওরা বোধশক্তিসমূহ ধ্বংস করে ফেলেছে। নতুবা জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তাআলা সত্য বোঝার ও গ্রহণ করার যোগ্যতা দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা দেখে সারা জীবনের আরাম-আয়েশ এত তুচ্ছ ও সামান্য মনে হবে যে, দুনিয়াতে যেন ওরা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থানই করেনি। আর মানুষ যেমন দুই এক ঘণ্টা এমনি গল্প-গুজবে নিরর্থক কাটিয়ে দেয়, তদ্রূপ সারা জীবনটা খুবই অযথা ও বেকার কেটেছে বলে আফসোস করবে এবং সেখানকার ভয়ঙ্কর বিপদাপদ দেখে মনে হবে, যেন দুনিয়াতে একটু অবস্থান করতে না করতেই এ সময় এসে গেল। হায়! দুনিয়ার অবস্থানকাল যদি একটু দীর্ঘ হত, তবে এত তাড়াতাড়ি এ দিন দেখতে হত না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ۝

ওরা পরস্পরকে চিনবে[১]। নিশ্চয় তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে এবং হেদায়েতের পথে আসেনি[২]।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ۝

৪৬. আমি ওদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছি, তার কিছু আপনাকে দেখাই অথবা (তার পূর্বেই) আপনাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় আমারই কাছে ওদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর ওরা যা কিছু করে আল্লাহ তার সাক্ষী[৩]।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের একজন রাসূল আছেন। যখন তাদের রাসূল তাদের নিকট এসেছেন,

---

কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে বরযখ বা কবরে অবস্থানের কালকে বোঝানো হয়েছে, তাকে ওরা এক মুহূর্তের সমান মনে করবে। والله اعلم

১. কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারবে না। সকলেই 'নাফসী' 'নাফসী' করতে থাকবে, ভাই ভাইয়ের এবং পুত্র পিতার উপকারে আসবে না। সূরা মু'মিনূন-এর ষষ্ঠ রুকূতে (আয়াত : ১০১) আছে- فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ (সেদিন ওদের মধ্যে আত্মীয়তাও থাকবে না এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করবে না।) আরো ইরশাদ হয়েছে (সূরা আ'বাসা : ৩৪-৩৬) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ : (যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মাতা, তার পিতা থেকে, তার স্ত্রী ও তার পুত্রদের থেকে।)

২. পক্ষান্তরে যারা لقاء الله (আল্লাহর সাক্ষাৎ)-কে স্বীকার করেছে এবং সরল পথে চলেছে, তারা সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আমি কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদানের এবং ইসলামকে বিজয়ী করার যেসব ওয়াদা করেছি, চাই তা থেকে কোন কোন ওয়াদা আপনার বর্তমানে পূর্ণ করে দেখিয়ে দেওয়া হোক, যেমন 'বদর' প্রভৃতিতে দেখানো হয়েছে; অথবা আপনার ওয়াফাত হয়ে যাক, আপনার সামনে সেসবের কিছু প্রকাশ না হোক— সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল ওয়াদা পূর্ণ হবেই হবে। যদি কোন মঙ্গলহেতু দুনিয়াতে এই কাফেরদের শাস্তি না দেওয়া হয়, তবে আখেরাতে অবশ্যই দেওয়া হবে। আমার থেকে আত্মরক্ষা করে ওরা কোথাও ভেগে যেতে পারবে না, সকলকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং ওদের সমস্ত আমল আমার সামনে রয়েছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "ইসলামের বিজয় কিছু তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অর্জিত হয়েছে। আর বাকীটা হয়েছে তাঁর ওয়াফাতের পর খলীফাদের হাতে।" اونتوفينك এর মধ্যে যেন এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। والله اعلم

رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۝

তখন তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হত না[১]।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

৪৮. ওরা বলে, 'এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে, (বল) যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]?'

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ۝

৪৯. আপনি বলুন, 'আমি আমার নিজেরই ভালো-মন্দের মালিক নই; তবে আল্লাহ যা চান (তাই হয়)। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্ত পেছাতেও পারে না এবং এগোতেও

---

১. পূর্বে এই উম্মত ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা হয়েছে। এখন সকল জাতি ও উম্মতের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ নীতি বর্ণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক জামাত ও সম্প্রদায়ের নিকট খোদার বিধান-বাহক প্রেরিত হয়েছেন, যাঁদের 'রাসূল' বলা হয়। ফলে আল্লাহর হুজ্জত (বা প্রমাণ) পূর্ণ হয়ে গেছে। হুজ্জত পূর্ণ করার পূর্বে কাউকেই আযাব দেওয়া হয় না। লোকেরা পূর্ব থেকেই অন্যায়-অপরাধ করে, কিন্তু দুনিয়াতে ওদের শাস্তি প্রদান করা হয় রাসূলের আগমন ও হুজ্জতের পূর্ণতা বিধানের পর। পূর্বাহ্নে সতর্ক করা ছাড়া এবং দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত পাপীদের ধ্বংস করে দেওয়ার মত জুলুম আল্লাহর দরবারে নেই।

কিয়ামতের দিনেও রীতিমত আদালতে হাযিরা হবে। অন্যায়-অপরাধের তালিকা বা হিসাব পেশ করা হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হবে, প্রত্যেক জাতির সঙ্গে তাদের পয়গম্বর উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের বিবৃতি ও বক্তব্যের পর নিতান্ত ইনসাফের সাথে ফয়সালা হবে।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ. (الزمر :৬৯)

(এবং পৃথিবী তার রবের নূরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং পয়গম্বর ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং ওদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে, আর ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না।)

মুজাহিদ প্রমুখ মুফাসসির বর্তমান আয়াতকে কিয়ামতের ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

২. অর্থাৎ আযাব আসার যেসব সতর্কবাণী শোনানো হচ্ছে, তা নিতান্তই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তা নিয়ে আস না কেন? বল, এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?

পারে না[১]।

৫০. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতে বা দিনের বেলায় এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার পূর্বে কী করতে পারবে*[২]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ۝

৫১. তবে কি যখন আযাব সংঘটিত হয়ে যাবে,

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ

১. অর্থাৎ আযাব ইত্যাদি পাঠানো খোদার কাজ, এ আমার হাতে ও এখতিয়ারে নয়। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির শুধু ততটুকুরই মালিক, যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতএব অন্যদের ভাল-মন্দ ঘটানোর স্বতন্ত্র শক্তি আমার কী করে হবে?

আর প্রত্যেক জাতির একটি সময়কাল ও মেয়াদ আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত রয়েছে। যখন মেয়াদ পূর্ণ হয়ে আযাবের সময় উপস্থিত হবে, তখন এক সেকেণ্ডও বিলম্ব হতে পারবে না। মোটকথা, আযাবের জন্য তাড়াতাড়ি করায় কোন লাভ নেই। আল্লাহর জ্ঞানে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে, তা থেকে এক মিনিটও আগ-পাছ হতে পারবে না।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ দ্বারা এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আযাব তার নির্ধারিত সময়ে আসবেই। এখানে বাস্তব আগ-পাছ হওয়া না হওয়া বিবেচ্য নয়। (অতএব এ প্রশ্ন হবে না যে, সেই সময় এসে যাওয়ার পর তো আগানোর কোন সুযোগই নেই, সুতরাং لا يستقدمون– বলার দরকারই বা কী? বস্তুত কথাকে জোরালো করার জন্য তা উল্লেখ করা হয়েছে– অনু.)

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তবে সেই আযাবের কোন্ জিনিস অপরাধীরা তাড়াতাড়ি কামনা করছে? (অর্থাৎ আযাবের মধ্যে আনন্দ ও মজার কী আছে, যার কারণে ওরা তা দ্রুত কামনা করছে?)

২. অর্থাৎ রাতে নিদ্রাবস্থায় অথবা দিনের বেলায় যখন তোমরা পার্থিব কাজকামে ব্যস্ত থাক, তখন যদি সহসা আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, তা হলে পাপীরা আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা করতে পারবে? যখন আত্মরক্ষার উপায় করতে পারবে না, তখন আযাবের সময় জিজ্ঞাসা করে কী লাভ?— মুতারজিম (র) ماذا يستعجل منه المجرمون-এর তরজমা হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এর অভিরুচি অনুযায়ী করেছেন।

অন্য মুফাসসিরগণ সাধারণত এ অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর আযাব আসার মধ্যে এমন কী আনন্দ ও মজার বিষয় আছে, যার জন্য পাপীরা তা শীঘ্র তলব করছে? অথবা অর্থ এই যে, আশ্চর্যের বিষয়, পাপীরা কী ভয়াবহ বস্তুর জন্য তাড়াহুড়া করছে, অথচ একজন পাপীর পক্ষে তো উচিত ছিল, আসন্ন আযাবের চিন্তায় কেঁপে ওঠা এবং ভয়ের আতিশয্যে হার্ট-ফেইল করা। –আল-বাহরুল মুহীত।

وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾

তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস করবে? (তখন তো তোমাদের বলা হবে), 'এখন (বিশ্বাস করছ)! অথচ তোমরা এটাই তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে[১]।'

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তার পর পাপীদের বলা হবে, 'চিরকালের আযাব আস্বাদন করতে থাক। তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে[২]।'

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۗ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. ওরা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে, 'এ কথা কি সত্য?' আপনি বলুন, 'আমার রবের কসম, অবশ্যই এ সত্য। এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না[৩]'।

---

১. অর্থাৎ আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করার কারণ এই যে, তাতে ওদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে এ লাভ হত যে, আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করত। আযাব এসে যাওয়ার পর বিশ্বাস করলে কী লাভ হবে? তখন খোদার পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হবে, আচ্ছা, এখন স্বীকার করছ, অথচ পূর্বে অস্বীকার করেছ? অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে (সূরা মু'মিন : ৮৪-৮৫)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.

{অতঃপর যখন ওরা আমার প্রেরিত বিপদ দেখতে পেল, তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদের শরীক করতাম, তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু আমার আযাব দেখে ওদের ঈমান আনয়ন ওদের কোন উপকারে আসেনি। আল্লাহ এ রীতি চালু করেছেন, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (পূর্ব থেকে) চলে এসেছে। আর সেখানে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।}

২. অর্থাৎ, যেসব কুফর, শিরক ও মিথ্যারোপ তোমরা করেছিলে, তারই স্বাদ এখন চিরকাল আস্বাদন করতে থাক। —এ কথা কিয়ামতের দিন বলা হবে।

৩. অর্থাৎ গাফলতে বিভোর হয়ে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করে, এ কি সত্য যে, মৃত্যুর পর আমরা পুনর্জীবিত হব এবং চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ ভোগ করব? সত্যিই কি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আমাদের উপস্থিত করা হবে?

আপনি বলে দিন, আশ্চর্যের কী আছে, এ তো নিশ্চিতরূপে হবেই। তোমরা মাটিতে মিশে গেলেও এবং শরীরের অংশসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলা প্রথমবারের মত

[রুকূ - ৬]

৫৪. আর যদি প্রত্যেক পাপী ব্যক্তির কাছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা (সব) থাকে, তবে সে নিজের মুক্তির বিনিময়ে অবশ্যই তা দিয়ে দিবে[১] এবং ওরা লজ্জা-অনুতাপ গোপন করবে (অর্থাৎ গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে) যখন আযাব দেখবে[২]। আর ওদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং ওদের উপর জুলুম করা হবে না।

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৫৫. শুনে রাখ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তোমাদের আবার সৃষ্টি করতে এবং দুষ্কৃতিসমূহের স্বাদ ভোগ করাতে মোটেই অক্ষম নন। তাঁর মুঠি থেকে বের হয়ে এবং পালিয়ে গিয়ে তাঁকে ব্যর্থ ও অক্ষম করে দেবে– এর আদৌ সম্ভাবনা নেই।

বি. দ্র. এ আয়াতের মত আরো দুটি আয়াত কুরআন শরীফে আছে, একটি সূরা সাবায় (আয়াত : ৩) -وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ- (কাফেররা বলে, 'আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না।' আপনি বলুন, 'কেন নয়, কসম আমার রবের অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে।') —আর দ্বিতীয়টি সূরা তাগাবুনে (আয়াত :৭) -زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. (কাফেররা দাবি করে যে, ওরা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, 'কেন হবে না, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, তার পর তোমাদের জানানো হবে যা তোমরা করেছ। এ আল্লাহর জন্য সহজ।)

এ আয়াত দুটি কিয়ামত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে। এ দুটির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে মুফাসসির হাফেজ ইবনে কাছীর বর্তমান আয়াতকেও পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেছেন।

১. অর্থাৎ মনে কর, যদি পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল ধনভাণ্ডারও ওর মালিকানায় হয়, তবে তা সব দিয়ে হলেও আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে।

২. নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হবে এবং চাইবে যে, লোকদের কাছে ওদের লজ্জা প্রকাশ না পাক। কিন্তু কতক্ষণ আর এমন সম্ভবপর হবে? কিছু সময় অনুতাপের আলামতসমূহ প্রকাশ না হলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছার বাইরে প্রকাশ হয়েই যাবে। তখন বলবে- يَا حَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ (হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে কত উদাসীনতা আমি করেছি— যুমার : ৫৬) এবং আরো বলবে : يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا (হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা তো এ থেকে উদাসীন ছিলাম-আম্বিয়া : ৯৭)

আছে, নিশ্চয় তা আল্লাহরই। শুনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য[১]। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না[২]।

أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٥

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।

هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٥٦

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসে গেছে —উপদেশ, অন্তর-ব্যাধির প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত[৪]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧

---

১. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই। সুবিচার হবেই হবে। কোন অপরাধী কোথাও ভেগেও যেতে পারবে না, ঘুষ দিয়ে নিষ্কৃতিও পাবে না।

২. অর্থাৎ অযোগ্যতা, ভুল বুঝ ও অবহেলার কারণে অধিকাংশ লোক এসব সত্য বোঝে না। তাই মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে এবং যা মনে আসে তাই করে।

৩. অর্থাৎ, যেহেতু জীবিত করা ও মৃত্যু ঘটানো তাঁরই কাজ, সুতরাং পুনর্বার জীবিত করা কেন কঠিন হবে?

৪. এসব কুরআন করীমেরই গুণাবলি। কুরআন আগাগোড়া উপদেশ, যে উপদেশ ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে মানুষদের বিরত রাখে। কুরআন মানুষের আত্মিক ব্যাধির আরোগ্যপত্র। কুরআন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার ও খোদার সন্তুষ্টি লাভের রাস্তা বলে দেয় এবং তার মান্যকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত সাব্যস্ত করে।

কোন কোন মুহাক্কিক আলেমের মতে এ আয়াতে মানবাত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষের স্তরসমূহের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন কারীমকে আকড়ে ধরবে ও তার শিক্ষানুসারে চলবে, সে এসব উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পারে– (১) নিজের জাহের (বা বাহ্যিক অবস্থা)-কে অশোভন কার্যাবলি থেকে পবিত্র করা। موعظة শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। (২) বাতেন (বা ভিতর)-কে ফাসেদ আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত করা, যা شفاء لما في الصدور দ্বারা বোঝা যায়। (৩) নফসকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও সৎগুণাবলি দ্বারা সজ্জিত করা। এ বিষয়টি প্রকাশের জন্য هدى শব্দটি খুবই সংগত। (৪) জাহের ও বাতেন এর সংশোধনের পর খোদায়ী রহমতের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করা, যা رحمة শব্দটি থেকে বোঝা যায়।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) এস্থলে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তার আলোকে উক্ত চারটি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে শরী'য়ত, তরীকত, হাকীকত এবং নবুওয়াত ও খেলাফত-এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এস্থলে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার অবকাশ নেই। আর না এ ধরনের বিষয় খালেছ তাফসীরের আওতায় আসতে পারে।

৫৮. আপনি বলুন, (তা এসেছে) 'আল্লাহর ফযলে ও তাঁর মেহেরবানীতে; অতএব তাতেই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত[১]। তা সেসব বস্তু থেকে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে[২]।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٥٨

৫৯. আপনি বলুন, 'আচ্ছা, বল তো! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা অবতীর্ণ করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কোনটা হারাম ও কোনটা হালাল সাব্যস্ত করে নিলে- আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ কি তোমাদের (এরূপ) অনুমতি প্রদান করেছেন, না আল্লাহর প্রতি তোমরা মিথ্যারোপ করছ[৩]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝٥٩

---

১. فرح (আনন্দিত হওয়া) প্রশংসনীয়ও হতে পারে, আবার নিন্দনীয়ও। কোন নে'য়ামত লাভ করে এজন্য আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহর ফযল ও রহমত পাওয়া গিয়েছে- এটা প্রশংসনীয়। এ কারণেই এস্থলে فبذلك فليفرحوا বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, পার্থিব বস্তুসামগ্রী পেয়ে আনন্দিত হয়ে গৌরব করা, বিশেষত এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, নিজ যোগ্যতা বলে তা অর্জিত হয়েছে- এ فرح অত্যন্ত নিন্দনীয়। কারূন নিজ ধন-দৌলত সম্পর্কে বলেছিল- إنما أوتيته على علم عندي (এ ধনসম্পদ তো আমি পেয়েছি সেই বিশেষ জ্ঞানবলে, যা আমার নিকট রয়েছে- কাসাস্ : ৭৮)— তাই তাকে বলা হয়েছিল- لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (৭৬) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا الخ (দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা পরকালের আজর কামাই করে নাও এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না- কাসাস্-৭৬-৭৭

২. অর্থাৎ আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর ফযল ও রহমত। মানুষের তা-ই অন্বেষন করা উচিত। ধন-দৌলত ও শান-শৌকত সেই তুলনায় কিছুই নয়।

৩. অর্থাৎ যে কুরআন উপদেশ, রোগমুক্তি, হেদায়েত ও রহমতরূপে এসেছে, তার উপরই নির্ভর করা উচিত এবং তা-ই আঁকড়ে ধরে রাখার যোগ্য। কুরআনের দ্বারাই আল্লাহর বিধি-বিধান এবং হালাল ও হারাম জানা যেতে পারে। এটা কেমন কথা যে, আল্লাহ তো তোমাদের উপকারের জন্য হরেক-রকম রুযী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা শুধু নিজেদের ইচ্ছা-অভিরুচি ও কামনা-বাসনা অনুসারে সেগুলি থেকে কোন বস্তুকে হালাল, কোনটাকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আচ্ছা, হালাল ও হারাম করণে তোমাদের কী অধিকার আছে? তোমরা কি এ কথা বলার দুঃসাহস করতে পার যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন? না কি তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করছ? —পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, এটা আল্লাহর প্রতি অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬০. আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের কী ধারণা[১]? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না[২]।

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦٠

[রুকূ - ৭]

৬১. আপনি যে অবস্থায়ই থাকেন এবং তা থেকে অর্থাৎ কুরআন থেকে যা কিছু পড়েন এবং তোমরা যে কাজই কর– (সর্বাবস্থায়) আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে রত হও। আর আসমান ও যমীনে অণুপরিমাণ কোন বস্তুও আপনার রব থেকে গোপন থাকে না এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় এমন কোন জিনিস নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই[৩]।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦١

বি. দ্র. যেসব জিনিসকে ওরা নিজেদের পক্ষ থেকে হালাল বা হারাম করেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ সূরা 'মায়েদা' ও 'আনআমে' গত হয়েছে।

১. অর্থাৎ, এরা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে কী ধারণা করে? সেদিন ওদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে? শাস্তি ভোগ করতে হবে, না হবে না– এ বিষয়ে কী ধারণা ওরা করছে? —ওরা যেন স্মরণ রাখে, ওরা যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যোগ্য, তা থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

২. অর্থাৎ খোদা নিজ মেহেরবানীতে অনেক অবকাশ দিয়ে থাকেন, বহু দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেন। কিন্তু বহু লোক তাঁর নম্রতা ও উদারতা লক্ষ করে কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশি উদ্ধত ও নির্ভয় হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওদের শাস্তি দিতে হয়-

حلم حق باتو مواسا ہا کند ÷ چوں تو از حد بگذری رسوا کند

(আল্লাহ তা'আলার সহিষ্ণুতা তোমার সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতে থাকে। যখন তুমি সীমা অতিক্রম করে যাও, তখন তিনি তোমাকে অপমানিত করেন।)

৩. প্রথমে কুরআন করীমের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে আদ্যোপান্ত হেদায়েতের আলো, অন্তরের শেফা, শ্রেষ্ঠ নে'য়ামত ও সর্বোত্তম রহমত। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ হেদায়েত ও প্রজ্ঞার এমন উজ্জ্বল আলো ছেড়ে নিজ অনুমান ও ধ্যান-ধারণার

৬২. স্মরণ রাখ! যারা আল্লাহর ওলী, নিশ্চয় তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১];	اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

অন্ধকারে ঘুরপাক খায় এবং খোদার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের নাশোকরী করে।

বর্তমান আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ কোন্ অবস্থায় আছে এবং পয়গম্বর আলাইহিস সালাম কী শানে আছেন তা সবই আল্লাহর জানা আছে। অর্থাৎ, তিনি দিনরাত যেভাবে প্রকৃত মালিকের কৃতজ্ঞতা ও ওফাদারি করেন এবং সৃষ্টির প্রতি পরম সহানুভূতির যে আচরণ করেন, বিশেষ করে কুরআন কারীম পঠন-পাঠনের সময় তাঁর যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থার প্রকাশ ঘটে, এক কথায়- কুরআনের মাধ্যমে তিনি যে জেহাদ-সংগ্রাম করছেন— তা সবই আল্লাহর জানা রয়েছে। আর মানুষ ভালমন্দ যে সব আচরণ করছে তাও আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। যখন মাখলুক কোন কাজ আরম্ভ করে এবং তাতে মনোযোগসহ রত হয়, তখন সে আল্লাহকে স্মরণ না করুক কিন্তু আল্লাহ তাকে দেখতে থাকেন- فإن لم تكن تراه فإنه يراك (তুমি যদি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।) আসমান ও যমীনে কোথাও অনু বরাবর অথবা তার চেয়ে ছোট-বড় কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানবহির্ভূত। বরং খোদায়ী জ্ঞান অনুযায়ী 'যা ছিল ও যা হবে', সবকিছুরই অবস্থা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূজে) লিখিত রয়েছে, যাকে عالم تدبير বা ব্যবস্থাপনার জগতে খোদায়ী জ্ঞানের 'সহীফা' বলা উচিত। —যখন আল্লাহ তাআলার নিকট কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বস্তুও গোপন নেই, তখন এই মিথ্যারোপকারী ও অবাধ্যদের আচার-আচরণ ও অবস্থা কী করে গুপ্ত থাকতে পারে?

আর বিচার দিবসের কার্যক্রম সম্পর্কে ওরা কী ধারণা পোষণ করে? ওরা উত্তমরূপে বুঝে নিক যে, ওদের প্রতিটি ছোট-বড় আচরণ খোদার সামনে রয়েছে। সেখানে কোনই খেয়ানত বা চুরি চলতে পারে না, প্রত্যেক আমলের প্রতিফল ওরা অবশ্যই পাবে।

আর আল্লাহর দুশমনদের আচার-আচরণ যেমন তাঁর সামনে রয়েছে, তেমনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সকল অবস্থাও তাঁর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। সামনের আয়াতে তাদেরই সুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

১. لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

মুফাসসির ইবনে কাছীর বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরকালে হাশরের ময়দানে বিভিষীকাময় অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কোন ভয়ও আল্লাহর ওলীদের হবে না এবং দুনিয়া হাত-ছাড়া হওয়াতেও তাঁরা দুঃখিত হবেন না।

কোন কোন মুফাসসির আয়াতকে কিছুটা ব্যাপক অর্থে রেখেছেন, অর্থাৎ তারা কষ্টকর ও আশঙ্কাজনক অবস্থার সম্মুখিন দুনিয়াতেও হবেন না, আখেরাতেও না। আর কোন প্রিয়বস্তু হারানোতে তারা দুঃখিতও হন না। অর্থাৎ খোদার ভয় অথবা পরকালের চিন্তা না হওয়া

৬৩. (তারা এমন লোক), যারা ঈমান এনেছে এবং যারা (আল্লাহকে) ভয় করত[১]।	الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۟

উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াতে পার্থিব ভয় ও চিন্তা তাদের হবে না। এ ভয় ও চিন্তা যার সম্ভাবনা দুশমনদের বিরোধিতা প্রভৃতির কারণে হয়ে থাকে, তা কামেল মুমিনদের হয় না। কারণ,সর্বদা তাদের ভরসা থাকে আল্লাহর উপর এবং পার্থিব ঘটনাবলির কোন কিছুই হেকমতশূন্য নয় বলে তারা বিশ্বাস করে থাকেন। এ ভরসা ও বিশ্বাস তাদের অন্তরে থাকায় ভয় ও দুঃখ-কষ্ট তাদের পীড়া দিতে পারে না।

আমার নিকট لاخوف عليهم এর অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহর ওলীদের উপর কোন ভীতিকর বস্তু (ধ্বংস ও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি) দুনিয়া ও আখেরাতে পতিত হবে না। ধরা হোক, যদি দুনিয়াতে বাহ্যত তাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয়ও, তবু যেহেতু তা তাঁদের পক্ষে বিরাট লাভের কারণ হয়ে থাকে, এ জন্য তাকে উল্লেখ্যযোগ্য ক্ষতি বলা যায় না। অবশ্য পার্থিব বা পারলৌকিক কোন কারণে তাঁদের কখনো ভয়-ভীতি দেখা দিলে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে শুধু এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁদের উপর কোন ভীতিকর বস্তু পতিত হবে না; এটা বলা হয়নি যে, কখনো তাঁদের মনে কোন ভয় উদয় হবে না। لا يحزنون এর সঙ্গে মিল রেখে لا يخافون বলার কথা। তা না বলে لاخوف عليهم বলার তাৎপর্য হয়ত এটাই। আর আমার মতে لا يحزنون -এর সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর তাঁরা চিন্তিত হবেন না। যেমন কুরআনের অন্যত্র রয়েছে-

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (حم السجدة : ٣٠)

(তাদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবেন এই বলে যে, তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না।) আরো ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ (الأنبياء: ١٠٣)

(মহাভীতি তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন।) والله اعلم بمراده

১. এতে আল্লাহর ওলীদের পরিচয় বলা হয়েছে যে, মুমিন-মুত্তাকীরাই হচ্ছে আল্লাহর ওলী।

ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে বলা হয়েছে, ঈমান ও তাক্ওয়ার বহু স্তর রয়েছে। সুতরাং কারো মধ্যে যে স্তরের ঈমান ও তাক্ওয়া বর্তমান থাকবে, তিনি সেই স্তরের ওলী হিসাবেই পরিগণিত হবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: দশ-বিশ টাকাও সম্পদ, আর পঞ্চাশ, এক শ, হাজার দু হাজার, এবং লাখ দু লাখও সম্পদ। কিন্তু সাধারণত দশ-বিশ টাকার মালিককে ধনী বলা হয় না, যতক্ষণ না সে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়। অনুরূপ বুঝে নিন যে, ঈমান ও তাক্ওয়া যে পর্যায়েরই হোক, তা (ولايت) বেলায়াতের একটি অংশ এবং এ হিসাবে সকল মুমিনকেই মোটামুটিভাবে ওলী বলা যেতে পারে। কিন্তু লোকসমাজে 'ওলী' তাকেই বলা হয়, যার মধ্যে এক বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঈমান ও তাক্ওয়া পাওয়া যায়।

৬৪. তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে[১]। আল্লাহর বাণীসমূহে পরিবর্তন হয় না[২]। এ-ই বিরাট সাফল্য।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৫. ওদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় সমস্ত শক্তি আল্লাহর। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৩]।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

বিভিন্ন হাদীসে বেলায়াতের কিছু কিছু আলামত ও নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। যেমন: তাঁদের দেখলে খোদার কথা স্মরণ হয়, অথবা খোদার সৃষ্টির প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ মহব্বত থাকে। আরেফগণ নিজ নিজ রুচি মত 'ওলী'র পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। (সুনানে নাসাঈ-কুবরা, হাদীস ১১১৭১)

১. আল্লাহর ওলীদের জন্য দুনিয়াতে কয়েক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলা নবীদের মুখে لاخوف عليهم ইত্যাদি ইরশাদ করে তাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ফেরেশতাগণ মৃত্যুর সময় তাঁদের বলে থাকেন- أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون (তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই বেহেশতের, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছিল।) এছাড়া তাঁরা নিজেরা অনেক সত্য ও বরকতময় স্বপ্ন দেখে থাকেন বা তাঁদের সম্বন্ধে অন্য বান্দাদের দেখানো হয়ে থাকে। আর এরূপ শুভস্বপ্ন সহীহ হাদীস (বুখারী, ২২৬৩) অনুযায়ী নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এটাও بشرى তথা সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা বিশেষ রকমের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে থাকেন, এবং বিশেষ লোকদের মাঝে এবং কখনো সর্বসাধারণের মধ্যেও তাঁরা সমাদৃত হয়ে থাকেন। আর লোকেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে থাকে।

এসব কিছুই পর্যায়ক্রমে পার্থিব সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়াতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর তাফসীর করা হয়েছে শুভ স্বপ্নের দ্বারা (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ২৭৫১০)। والله اعلم

আর ওলী-বুযুর্গদের জন্য পরকালীন সুসংবাদ তো আছেই। খোদ পবিত্র কুরআনেই بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (আজকের দিনে তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমনসব জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত- হাদীদ : ১২) আর হাদীসেও এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর বাণী ও ওয়াদা পরিপক্ক ও অটল। যেসব সুসংবাদ তিনি প্রদান করেছেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

৩. পূর্ব থেকে অবিশ্বাসী শত্রুদের আলোচনা চলছিল। এদের বিপরীতে আল্লাহর বন্ধুদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় জগতে তাঁদের নিরাপদ থাকার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি নির্বোধ

৬৬. শুনে রাখ! আকাশমণ্ডলীতে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই আল্লাহরই। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য শরীকদের ডাকে, ওরা কিসের অনুসরণ করে? ওরা আর কিছুর নয়, শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং ওরা অন্য কিছু নয়, কেবল অনুমানই করে বেড়ায়[১]।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর; এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন দেখার মাধ্যমরূপে☆। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা শোনে[২]।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. ওরা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'! তিনি পবিত্র। তিনি অমুখাপেক্ষী। আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, (সব) তাঁরই।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ الْغَنِىُّ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

ও দুর্বৃত্তদের কথায় দুঃখিত হবেন না। বিজয় ও শক্তি সবই আল্লাহর। তিনি নিজ শক্তি ও সাহায্য দ্বারা সত্যকে জয়ী করবেন এবং বিরুদ্ধাচারীদের পরাজিত ও অপদস্থ করে ছাড়বেন। তিনি ওদের সকল কথা শোনেন ও সব অবস্থা জানেন।

১. অর্থাৎ সমগ্র আসমান ও যমীনে একক খোদারই রাজত্ব। সকল জ্বিন, মানব ও ফেরেশতা তাঁরই সৃষ্ট ও মালিকানাধীন। মুশরিক যে গাইরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে এবং তাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, তা শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমান নির্ভর। ওদের হাতে না আছে কোন সত্য, না আছে কোন দলীল-প্রমাণ। কেবল আন্দাজ-অনুমান ও জল্পনা-কল্পনার অন্ধকারে পড়ে ওরা হোঁচট খেয়ে চলেছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'দিনকে করেছেন আলোয় উজ্জ্বল'।

২. দিন-রাত ও আলো-আঁধারের স্রষ্টাও সেই এক আল্লাহ। এ থেকেই ভাল ও মন্দ এবং সকল বিপরীতমুখী বস্তুর স্রষ্টা কে, তা বুঝে নিতে হবে।— এর দ্বারা অগ্নিপূজকদের শিরকের খণ্ডন হয়ে গেল। আর অপরদিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হল যে, রাতের আঁধারের পর আল্লাহ যেমন উজ্জ্বল দিন আনয়ন করেন এবং দিনের আলোতে সেসব জিনিস দেখা যায় যা রাতের আঁধারে দেখা যেত না, ঠিক তেমনি মুশরিকদের আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার অন্ধকার দুরীভূত করার জন্য তিনি কুরআন করীমের সূর্য উদয় করে দিয়েছেন, যা মানবজাতিকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ؕ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

তোমাদের নিকট এর কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করছ যা তোমরা জান না[১]?

قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۞

৬৯. আপনি বলুন, 'যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হয় না'।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۞

৭০. (ওদের জন্য আছে) দুনিয়াতে সামান্য সম্ভোগ। তার পর আমারই কাছে ওদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অনন্তর আমি ওদের কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাবো, কেননা ওরা কুফর করত[২]।

---

১. এতে খ্রিস্টানদের শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে। ওরা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত।

বোঝার বিষয় এই যে, যদি ওরা মাসীহকে (আল্লাহর পানাহ!) আল্লাহর ঔরসজাত পুত্র মনে করে, তবে এর চেয়ে বড় ধৃষ্টতা আর কী হবে? আল্লাহ পাক সুস্পষ্টরূপে স্ত্রী ও সন্তান অবলম্বন করা থেকে পবিত্র। আর যদি পুত্র বলতে পালকপুত্র বোঝায়, তবে তাঁর কী প্রয়োজন হল একজন সৃষ্টিজীবকে পালকপুত্র বানানোর? আল্লাহর পানাহ! তাঁর কি সন্তানের আফসোস ও পুত্র না থাকার দুঃখ ছিল? অথবা আল্লাহর কি এ চিন্তা ছিল যে, তাঁর পরে ধন-সম্পদের ওয়ারিস এবং তাঁর সুনাম রক্ষাকারী কে হবে? অথবা বৃদ্ধ বয়সে ও দুঃখে-কষ্টে তিনি কার সাহায্য নেবেন? নাউযুবিল্লাহ! তিনি তো এসব থেকে বে-নিয়ায (অমুখাপেক্ষী) এবং অন্য সকলে সর্বদা তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর ছেলে, নাতি বা পালকপুত্র ইত্যাদির প্রয়োজন কী করে হতে পারে? সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি ও মালিকানাধীন। অতএব মালিক ও মালিকানাধীন বস্তু বা ব্যক্তি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এহেন বংশীয় সম্পর্কের অবকাশ কোথায়? জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ সম্বন্ধে নিছক মূর্খতাবশত এরূপ মিথ্যা ও প্রমাণহীন কথা বলা সাংঘাতিক পাপের বিষয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনাকারীরা দুনিয়াতে যতই শক্তিশালী হোক না কেন এবং নিজেদের উপায়-উপকরণের উপর যতই গর্বিত হোক না কেন, ওদের ভাগ্যে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য কিছুতেই লাভ হবে না। অল্পদিন ওরা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করে নিক। অবশেষে ওরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, যেখানে নিজেদের অন্যায়-অপরাধের বদলে অত্যন্ত কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করবে।

[রুকূ - ৮]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝

৭১. আপনি ওদের নূহের বৃত্তান্ত পড়ে শোনান[১], যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের মাঝে) আমার অবস্থান ও আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে দুঃসহ হয়, তবে আমি আল্লাহরই উপরে নির্ভর করলাম। এখন তোমরা (সকলে মিলে) তোমাদের কর্ম-কৌশল স্থির করে নাও এবং তোমাদের শরীকদেরও সমবেত করে নাও। অতঃপর তোমাদের সেই কৌশলের ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে। তারপর আমার সাথে (যা করার) করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না[২]।

---

১. অর্থাৎ আপনি নূহ (আ) ও তাঁর জাতির হাল-অবস্থা মক্কাবাসীদের শোনান, যাতে ওরা অবগত হয় যে, অবিশ্বাসী ও অপবাদ-আরোপকারীরা প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে পারে না। ওদের লম্ফঝম্ফ ও রঙ্গরস কয়েক দিনের মাত্র, পরিণামে তা স্থায়ী ধ্বংসে পর্যবসিত হয়। নূহ (আ)-এর কওমের কাহিনী শুনে মক্কাবাসীদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত যে, যদি ওরা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতা এবং নিজেদের শিরকী কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তবে ওদের পরিণতিও তদ্রূপ হতে পারে, যেরূপ হয়েছিল নূহ (আ)-কে অস্বীকারকারীদের।

অধিকন্তু এ ঘটনা বর্ণনা করে পয়গম্বর (আ)কে সান্ত্বনা দান উদ্দেশ্য যে, আপনি এ লোকগুলোর শত্রুতা ও দুষ্কৃতির কারণে বেশি দুঃখিত হবেন না। প্রত্যেক নবীকেই এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং পরিণামে সত্যই জয়লাভ করেছে এবং সত্য ও সততার শত্রুদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ শ্রোতাদের জন্যও উক্ত ঘটনাবলির এমন বিশদ বর্ণনায় এ শিক্ষা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং কোন সৃষ্টজীবের সামনে এক মিনিটের জন্যও ছাত্র হিসাবে বসা ছাড়াই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের হাল-অবস্থা এমন সঠিক ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন, যা বাহ্যত শিক্ষাগ্রহণ ও দীর্ঘদিন জ্ঞানার্জন ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে মানতে হবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষক কোন মানুষ নয়, বরং সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তাআলা)।

২. অর্থাৎ আমি তোমাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বা সহযোগিতা ও বিরোধিতার একটুও পরোয়া করি না। সকল নবীর ন্যায় আমারও ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। আমার উপদেশ ও শিক্ষা-

৭২. 'এর পরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনি। আমার বিনিময় আল্লাহরই যিম্মায়। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন (আল্লাহর) একান্ত অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি[1]।'

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۷۲﴾

৭৩. তথাপি ওরা তাঁকে অস্বীকার করল। সুতরাং আমি তাঁকে ও যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদের রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে (অস্বীকারকারীদের) স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছিল তাদের ডুবিয়ে দিলাম। অতএব দেখে নাও, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছে[2]?

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّیْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ ﴿۷۳﴾

দীক্ষার কারণে যদি তোমরা ক্ষুব্ধ হও তবে হতে পার, আমি আমার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতে পারি না। তোমরা ক্ষুব্ধ হয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে এবং ক্ষতি করতে চাইলেও তা আমার ইচ্ছা-এরাদায় কোনোই প্রভাব ফেলতে পারবে না। তোমাদের দ্বারা যা কিছু সম্ভব, উৎসাহের সাথে তা করে ফেল। আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত পাকা করে নাও। নিজেদের সাঙ্গপাঙ্গ, বরং মনগড়া উপাস্যদেরও একত্র করে দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্ট রায়ের উপর স্থির হয়ে যাও। তারপর সম্মিলিত শক্তির বলে তা কার্যকর করে ফেল। এক মিনিটের অবকাশও আমাকে দিয়ো না। অতঃপর দেখে নাও, পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও নির্ভরতার পাহাড় কী করে সমগ্র পৃথিবীর কৌশল ও শক্তিকে দলিত-মথিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

১. অর্থাৎ তোমাদের মোকাবেলায় আত্মিক ও দৈহিক কোন দুঃখ-কষ্টেই আমি ঘাবড়াই না এবং আর্থিক ক্ষতিরও কোন চিন্তা করি না। কেননা, আমি তবলিগ ও দাওয়াতের কাজের কোন পারিশ্রমিক তোমাদের নিকট কখনো চাইনি। ফলে তোমাদের অসন্তুষ্টির ফলে আমার বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আমি করি না। এবং তোমাদেরও এ কথা বলার সুযোগ নাই যে, আমার চেষ্টা-সাধনা অর্থ ও টাকা-পয়সার লোভে ছিল। আমি যার কাজ করছি ও হুকুম পালন করছি, তাঁরই দায়িত্বে আমার পারিশ্রমিক। আমি যখন তাঁর আজ্ঞাবহ এবং আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে আমি সম্পাদন করছি, তখন কী করে সম্ভব যে, তিনি আমার জন্য তাঁর দয়া ও রহমতের দুয়ার খুলে রাখবেন না?

২. অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণের মত চোখ যার রয়েছে সে দেখে নিক, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কী হয়েছে। সেই লোকদের শত শত বছর ধরে নূহ (আ) নসীহত করেছেন, লাভ

৭৪. অতঃপর, আমি নূহের পরে বহু পয়গম্বর তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁরা ওদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ওরা ইতিপূর্বে যে বিষয়কে অস্বীকার করেছিল, তার প্রতি ঈমান আনার ছিল না[১]। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘন-কারীদের অন্তর মোহর করে দেই[২]।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৭৫. অতঃপর, আমি তাঁদের পরে মূসা ও হারূনকে ফেরাওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই আমার নিদর্শনাদি দিয়ে। কিন্তু ওরা অহংকার করল, আর ওরা ছিলই অপরাধী সম্প্রদায়[৩]।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

ও ক্ষতি সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। যখন কোন কথাই আছর করল না, বরং উলটা শত্রুতা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পেল, তখন আল্লাহ তাআলা ভয়ঙ্কর জল-প্লাবন প্রেরণ করেন। ফলে সকল অবিশ্বাসীকে পানিতে নিমজ্জিত করে দেওয়া হল। শুধু নূহ (আ) ও তাঁর সঙ্গে নৌকায় আরোহী কিছু সংখ্যক মানুষ রক্ষা পান। তাঁদের থেকে পরবর্তীতে মানব-বংশ বিস্তার লাভ করে এবং তারাই নিমজ্জিতদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

নূহ (আ)-এর কিছু কাহিনী সূরা আ'রাফের ৮ম রুকুতে (আয়াত :৫৯-৬৪) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ নূহ (আ)-এর পর হূদ (আ), সালেহ (আ), লূৎ (আ), ইবরাহীম (আ), শু'আয়ব (আ) প্রমুখ নবী নিজ নিজ কওমের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ প্রেরিত হন। কিন্তু সেই লোকেরা নিজ নিজ পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্বে যে ধরনের মূর্খতা ও কুফরীর অবস্থায় ছিল এবং যেসব বিষয়কে পূর্ব থেকে মিথ্যা বলে আসছিল, নবীদের তাশরীফ আনয়ন ও বোঝানোর পরও সেসব বিষয় মেনে নেওয়ার মত তাওফীক ওদের হল না। বরং যেসব মৌলিক সত্য বিষয়কে ইতিপূর্বে নূহের কওম মিথ্যা বলেছিল, এসব কওমও সেসব মেনে নিতে অস্বীকার করল। আর প্রথমবার যখন মুখ থেকে 'না' বের হয়ে পড়ল, তখন পরে আর কখনো 'হাঁ' বের হওয়া সম্ভব হল না। বেঈমানী এবং সত্যকে মিথ্যা বলার উপরই ওরা শেষপর্যন্ত জেদ ধরে রইল।

২. যারা সত্যকে অস্বীকার এবং সত্যের সাথে শত্রুতায় সীমালঙ্ঘন করে, ওদের অন্তরে মোহর এভাবে লাগে যে, প্রথমে ওরা (সত্যকে) মিথ্যা বলে, তারপর তাতে জিদ ও হঠকারিতা করতে করতে নিছক শত্রুতা ও অবাধ্যতার মনোভাব অবলম্বন করে নেয়। এমন কি, অন্তরের মেশিন অচল হয়ে যায় এবং সত্য গ্রহণের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। (মোট কথা, নিজেদেরই অব্যাহত অপরাধ ও পাপের কারণে অন্তরে মোহর লেগে যায়)।

৩. অর্থাৎ ওরা পেশাদার অপরাধী এবং তাতেই অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং এই নাফরমানীর অভ্যাস সত্যকে গ্রহণ করার অনুমতি কী করে দিতে পারত? আল্লাহর নিদর্শনাদি

৭৬. তো, যখন ওদের নিকট আমার কাছ থেকে সত্য পৌছল, ওরা বলতে লাগল, 'নিশ্চয়ই এটা তো প্রকাশ্য যাদু[১]।'

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧٦

৭৭. মূসা বললেন, 'তোমরা কি সত্য সম্পর্কে (এহেন কথা) বলছ যখন তা তোমাদের নিকট পৌছল? এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা সফল হয় না[২]।'

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝٧٧

৭৮. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছ, যেন আমাদের ঐ পথ থেকে বিচ্যুত করে দাও যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি এবং যেন তোমরা (এ) দেশে নেতৃত্ব লাভ কর'? আমরা তো তোমাদের বিশ্বাস করার নই[৩]।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٨

দেখেও কেবল অহংকারের কারণে তাঁর প্রতিনিধিদের সামনে ওরা আত্মসমর্পন করল না— وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে সেগুলি অস্বীকার করল, অথচ ওদের অন্তর তা বিশ্বাস করেছিল। –সূরা নামল, আয়াত :১৪)

উক্ত অহংকারের কারণেই ফেরাওন এই উক্তি করেছিল- اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ (আমি কি তোমাকে শৈশবাবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের কয়েক বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। –সূরা শুআরা, আয়াত : ১৮)

১. অর্থাৎ 'লাঠি' ও 'শুভ্র হস্ত' ইত্যাদি মুজেযা দেখে এবং মূসা আলাইহিস সালামের তাছীরপূর্ণ কথাবার্তা শুনে বলতে লাগল, 'এসব পরিষ্কার যাদু'। কেননা, ওদের ধারণা মতে অলৌকিক বিষয়ের চূড়ান্ত পর্যায় 'যাদু'ই হতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

২. অর্থাৎ সত্যকে যাদু বলছ, যাদু কি এরূপ হতে পারে? আর যাদুকররা কি নবুওয়াতের দাবি করে সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে কৃতকার্য হতে পারে? যাদু ও মুজেযার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা সেই নির্বোধদেরই কাজ, যারা সোনা ও পিতলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। পয়গম্বরের উজ্জ্বল চেহারা, পবিত্র চরিত্র, তাক্ওয়ার জ্যোতি, মহত্ত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে এই জ্বলন্ত প্রমাণই বিদ্যমান রয়েছে যে, যাদুবিদ্যা ও ভেলকিবাজির সাথে তাঁদের কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। এতদসত্ত্বেও পয়গম্বরকে 'যাদুকর' বলা কোন্ পর্যায়ের নির্লজ্জতা ও পাগলামি!

৩. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া-লোভী ও মতলববাজ— একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধর্মীয় রঙে পেশ করছ। তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মের নামে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে এ দেশে নিজেদের শাসন ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এখানকার পুরনো প্রধানদের (কিবতীদের)

৭৯. ফেরাওন (তার লোকদের) বলল, 'তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে'[১]।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝

৮০. অতঃপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদের বললেন, 'তোমরা যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর[২]।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

৮১. অতঃপর ওরা যখন (লাঠি ও রশি) নিক্ষেপ করল, মূসা বললেন, 'তোমরা যা নিয়ে এসেছ, তা তো যাদু[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ একে এখনই নস্যাৎ করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের কাজ সফল করেন না[৪]।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

হটিয়ে দেওয়া। কিন্তু স্মরণ রেখো! এ আশা পূর্ণ হওয়ার নয়, আমরা কখনো তোমাদের কথা মানব না, তোমাদের প্রাধান্যও কখনো স্বীকার করব না।

১. এ ছিল মূসা (আ)-এর বক্তব্যের জওয়াব। অর্থাৎ যাদু ও মুজেযা নিয়ে যে বিতর্ক, আমরা তার মীমাংসা কার্যত করে দিচ্ছি। এ দেশের বড় বড় দক্ষ যাদুকর একত্র করা হোক। অতঃপর তাদের অলৌকিক বিষয়ের মোকাবেলায় তুমি নিজের মুজেযা দেখাও। দুনিয়া দেখে নেবে, তুমি কি পয়গম্বর না যাদুকর। —এ উদ্দেশ্যে ফেরাওন সারা দেশে সমন জারি করে দিল এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ যাদুকর যেখানেই থাকুক, ওদের উপস্থিত করার জন্য তখনই লোক পাঠিয়ে দিল। এর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে (আয়াত : ১০৯-১২৬) বর্ণিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

২. অন্যত্র (আ'রাফ : ১১৫) উল্লেখিত হয়েছে যে, যাদুকররা মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, নিজের নৈপুণ্য (ইন্দ্রজাল) প্রদর্শনের কাজ তুমি প্রথমে করবে, না আমরা? তার উত্তরে মূসা (আ) বললেন যে, তোমাদের যা দেখানোর দেখাও। কারণ, বাতিলের পূর্ণ শক্তি প্রদর্শনীর পর সত্যের আগমন হলে এবং বাতিলকে পরাভূত ও পদানত করে দিলে তা অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হয় এবং সত্যের বিজয়কে খুব বেশি স্পষ্ট করে তোলে।

৩. যাদুকররা নিজেদের লাঠি ও দড়ি মাটিতে নিক্ষেপ করল এবং ওদের ভেলকিবাজিতে দর্শকদের মনে হল, যেন সমস্ত ময়দানটাই জীবিত সাপে ভরে গেছে। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'যাদু' তো এটা, ফেরাওন ও তার চাটুকাররা যাকে যাদু বলেছিল তা যাদু নয়।'

৪. অর্থাৎ তোমরা তো নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করলে। এখন লক্ষ কর, আল্লাহ কীভাবে নিজ কুদরত ও রহমতে এসব কৃত্রিম খেলা (তেলেসমাতি) খতম করে দেন, যা আমার মোকাবেলায় আর কখনো দাঁড়াতে পারবে না। কেননা, সংশোধনকারী ও ফাসাদকারীর মাঝে যখন লড়াই হয়, আর তা দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হয় হুজ্জত এর পূর্ণতা বিধান (অর্থাৎ

৮২. 'আর আল্লাহ সত্যকে তাঁর আদেশ-নির্দেশ দ্বারা সত্যে পরিণত করেন, যদিও অপরাধীরা (তা) অপছন্দ করে।'

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ۝

[রুকূ - ৯]

৮৩. অতঃপর মূসার প্রতি আর কেউ নয়, শুধু তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু যুবক ঈমান আনল[১] ফেরাওন ও তাদের সরদারদের পক্ষ থেকে এ আশঙ্কা থাকা সত্বেও যে, ফেরাওন তাদের বিচ্যুত করে দিতে পারে[২]। নিশ্চয় সে দেশে ফেরাওন ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের একজন[৩]।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ۝

সত্যের দলিল-প্রমাণ পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা), তখন ফাসাদকারী ও বাতিলকে বিজয়ী করা আর হকের কালিমাকে নীচু ও পরাজিত করে দেওয়া আল্লাহর নীতি ও হেকমতের পরিপন্থী।

১. ফেরাওনীদের হাতে বনী ইসরাঈল চরম মুসিবত ও অপমান সইছিল এবং পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ফেরাওনের জুলুম-অত্যাচারের অবসান এবং রাজসিংহাসন উলট-পালটকারী ইসরাঈলী পয়গম্বরের আবির্ভাবের অপেক্ষা করছিল।

মূসা আলাইহিস সালাম ঠিক তাদের আশানুরূপ শান নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাই সমগ্র বনী ইসরাঈল স্বাভাবিকভাবেই মূসা (আ)এর আবির্ভাবকে বিরাট নেয়ামত বলে মনে করত। তারা অন্তরে হযরত মূসাকে সত্য জ্ঞান করত এবং তাঁর সম্মান করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক ফেরাওন ও ফেরাওনী প্রধানদের ভয়ে ভীত ছিল। এজন্য প্রথম দিকে তারা শরীয়তসম্মতভাবে (ও প্রকাশ্যে) ঈমান আনেনি, বরং সময়ের অপেক্ষায় ছিল যে, সত্যের বিজয় হলে মুসলমান হয়ে যাবে। তবে বনী ইসরাঈলের কতিপয় যুবক ফেরাওনীদের ভয় সত্বেও সাহস করে ঈমান আনার কথা প্রকাশ করে দেয়। পরিশেষে যখন মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব ও সত্যের শান-শৌকত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি মুসলমান হয়ে যায়। তন্মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যাই ছিল প্রায় ছয়লক্ষ। এ আয়াতে প্রথম দিকের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

২. وَمَلَا۠ئِهِمْ–'তাদের সরদাররা বলতে হয় ফেরাওনের কর্মচারী ও আমলারা উদ্দেশ্য, না হয় বনী ইসরাঈলের সেসব সরদার ও প্রধানরা উদ্দেশ্য, যারা ভয় বা লোভ ইত্যাদির কারণে স্বজাতির লোকদেরকে ফেরাওনের বিরোধিতা করতে নিষেধ করত। আর বিচ্যুত করে ফেলার অর্থ এই যে, ফেরাওন ঈমান আনার সংবাদ শুনে তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাবে। ফলে হয়ত কোন কোন দুর্বলমনা লোক ঘাবড়ে গিয়ে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ ওর ভয়ে ভীত হওয়া মোটেই অমূলক ছিল না। কেননা, সে সময় দেশের মধ্যে ফেরাওনের শক্তি খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং দুর্বলদের নির্যাতন করার জন্য সে স্বীয় হাত একেবারে বেসামাল করে রেখেছিল।

৮৪. আর মূসা বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর নির্ভর কর যদি তোমরা (তাঁরই) অনুগত হয়ে থাক[১]।'

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

৮৫. তখন তারা বলল, 'আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম। (এবং তারা দোয়া করল), হে আমাদের রব! আপনি আমাদের জালেম সম্প্রদায়ের জুলুম-নির্যাতনের শিকার বানাবেন না☆[২]।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮৬. 'এবং আপনি নিজ মেহেরবানীতে আমাদের মুক্তি দিন এই কাফের লোকদের থেকে[৩]।'

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। একজন আজ্ঞাবহ মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় মালিকের শক্তির উপর নির্ভর করা। আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও রহমতে যার বিশ্বাস থাকবে, সে নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর উপর আস্থা রাখবে। আর তাঁর উপর আস্থা রাখার দাবি এই যে, বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদার নিকট সোপর্দ করে দেবে, তাঁরই নির্দেশ মত চলবে এবং সমস্ত চেষ্টা-সাধনায় একমাত্র তাঁরই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'জালেম সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষাস্থল বানাবেন না।

২. মূসা আলাইহিস সালামের নসীহত মত তারা এখলাস (ঐকান্তিকতা) প্রকাশ করে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। অতএব তাঁরই নিকট দো'য়া করি— ওগো প্রভু! আমাদের এ জালেমদের নির্যাতনের এমন শিকার বানাবেন না যে, ওরা নিজেদের শক্তির বলে আমাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করতে থাকবে আর আমরা ওদের কিছুই করতে পারব না। এমন অবস্থা হলে আমাদের দীন-ধর্মও শঙ্কায় পড়ে যাবে এবং এই জালেমদের ও তাদের সমর্থকদের জন্য ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, আমরা যদি সত্যের উপর না হতাম, তবে কী করে তোমাদের উপর এরূপ প্রভাব ও প্রাধান্য লাভ হল এবং তোমরা কেন এমন হীন ও অপদস্থ হলে? এমন ধারণা এই পথভ্রষ্টদের আরো বেশি পথভ্রষ্ট করে দেবে। বলতে গেলে, এক বিবেচনায় আমাদের অস্তিত্বটা ওদের জন্য ফেতনা (বা পরীক্ষার বিষয়) হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ ওদের গোলামী ও অধীনতা থেকে আমাদের মুক্তি দিন এবং স্বাধীনতার সৌভাগ্যে ভূষিত করুন।

৮৭. আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি আদেশ পাঠালাম যে, 'তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ী স্থাপন কর*১ এবং নিজেদের ঘরগুলিকে কেবলামুখী বানাও এবং নামায কায়েম কর২, আর ঈমানদারদের সুসংবাদ দাও৩।'

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

৮৮. মূসা বললেন, 'হে আমাদের রব! আপনি ফেরাওন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন৪। হে আমাদের রব! (এ জন্য দিয়েছেন), যাতে ওরা (মানুষকে) আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে৫। হে আমাদের রব! ওদের ধন-সম্পদ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ

* দ্বিতীয় তরজমা– ' তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়কে মিসরের ঘরবাড়ীতেই অবস্থান করাও'।

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যখন ফেরাওনের ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হল, তখন মূসা (আ) এর প্রতি নির্দেশ এল যে, স্বজাতি বনী ইসরাঈলকে ওদের সাথে রেখো না, নিজেদের মহল্লা (বা আবাসস্থল) আলাদা করে ফেল। কারণ, ওদের উপর বিপদাপদ আসবে, তখন যেন তোমাদের জাতি বাহ্যিকভাবেও বিপদাপদ থেকে দূরে থাকে।

মুফাসসিরগণ تبوالقومكما بمصر بيوتا এর এ অর্থ করেছেন যে, তোমরা নিজেদের ঘরবাড়িতেই অবস্থান করতে থাক এবং তার মধ্য থেকে কিছু ঘরকে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করে নাও।

২. ফেরাওন সকল মসজিদ ও ইবাদতখানা ধ্বংস করে ফেলেছিল, কেউ বাইরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারত না। এমন নিরুপায় অবস্থায় হুকুম হল, ঘরেরই কোন স্থান নামাযের জন্য নির্ধারিত করে নাও এবং তা যেন কেবলামুখী হয়। নামায তরক করো না। কারণ, এরই বরকতে আল্লাহর সাহায্য আসে। অন্যত্র (বাকারা : ৪৫) ইরশাদ হয়েছে: وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।) হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে মুসলমানদের অবস্থা এরূপই (বনী ইসরাঈলের অবস্থার মত) ছিল।

৩. দুনিয়াতে সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ এবং পরকালে মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ।

৪. অর্থাৎ শোভা-সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের নানা রকম উপায়-উপকরণ ওদের দিয়েছেন। যেমন: সুন্দর আকৃতি, যানবাহন, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ীঘর নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি এবং ধনদৌলতের ভাণ্ডার ও সোনা-রূপা ইত্যাদির খনি।

৫. যদি ليضلوا শব্দের ل অব্যয়কে কারণবাচক ধরা হয়, তবে অর্থ হবে– সৃষ্টিগতভাবে উক্ত উপায়-উপকরণ এই অযোগ্যদের এ জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে গর্বিত হয়ে নিজেরাও

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾

নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং ওদের অন্তর কঠিন করে দিন, যাতে ওরা যাতনাদায়ক শাস্তি দেখার আগে ঈমান না আনে[১]।'

গোমরাহ হয় এবং অন্যদেরও গোমরাহ করার কাজে এসব ব্যয় করে। কাজেই খুব স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ওরা সর্বশক্তি ব্যয় করুক। পরিশেষে দেখতে পাবে যে, এসব কোন কাজেই আসেনি।

যখন ভাল-মন্দের স্রষ্টা আল্লাহ, আর জানা কথা যে, তাঁর কোন কাজই হেকমতশূন্য নয়, অতএব মন্দের সৃষ্টির মধ্যেও বিশ্ব জগতের মহাব্যবস্থাপনার বিচারে কোন না কোন হেকমত অবশ্যই থাকবে। দুরাত্মাদের এত সব উপায়-উপকরণ দেওয়ার মধ্যে তেমন হেকমতই নিহিত আছে বলে মনে করুন-

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ (بني إسرائيل : ২০) (আমি এদের ও ওদের-প্রত্যেক দলকে আপনার রবের দান থেকে দিয়ে থাকি।) আরো ইরশাদ হয়েছে : إِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا إِثْمًا (آل عمران : ১৭৮) (আমি তো ওদের এজন্য অবকাশ দেই, যাতে ওরা পাপের মধ্যে উন্নতি করে।)

কোন কোন মুফাসসির ليضلوا এর ل অব্যয়কে প্রতিফলবাচক ধরেছেন, যেমন فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا আয়াতের মধ্যে ليكون এর ل হচ্ছে প্রতিফলবাচক। তখন এই অর্থ হবে যে, এসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ তাআলা ওদের এজন্য দিয়েছিলেন যে, সৎকার্যে খরচ করবে এবং নে'য়ামত মনে করে প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে চিনবে, তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। কিন্তু ওরা নিজেদের দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহর নে'য়ামতসমূহ মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহকরণের উদ্দেশ্যে এমনভাবে ব্যয় করল, যেন এসব এ কাজের জন্যই দেওয়া হয়েছিল। আয়াতের এ তাফসীর করলে কোন প্রশ্নের উদয় হয় না।

১. মূসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল যাবৎ সকল উপায়ে তাদের সুপথে আনার চেষ্টা করলেন এবং বড় বড় মুজেযা দেখালেন। কিন্তু তাদের শত্রুতা ও অবাধ্যতা বাড়তেই থাকল, এমন কি অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ সংস্পর্শের আলোকে বা আল্লাহর ওহী মারফত প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ লোকগুলো কখনই ঈমান আনার নয়! তখন মূসা (আ) ওদের ধ্বংসের জন্য দো'য়া করলেন, যাতে ওদের অপবিত্রতা থেকে সত্বর দুনিয়া পাক হয় এবং ওদের অশুভ পরিণাম অন্যদের জন্য শিক্ষার বিষয় হয়। তিনি বদ-দো'য়া করলেন- 'আয় আল্লাহ! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং এদের অন্তরে কঠিন গিরা লাগিয়ে দিন, যাতে তার মধ্যে কখনো ঈমান ও বিশ্বাস ঢুকতে না পারে। তা যেন কেবল তখনই ঢুকতে পারে যখন নিজেদের চোখে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে নেবে।'

ওদের ক্ষেত্রে এ দো'য়া এরূপ, যেমন ইবলিসকে لعنه الله অথবা কাফেরদের ব্যাপারে خزهم الله বলা হয়ে থাকে। অথচ শয়তান ও কাফেরদের এই অভিশপ্ততা ও অপদস্থতার অকাট্য মীমাংসা পূর্ব থেকেই করা আছে।

৮৯. আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের দো'য়া কবুল করা হল[১]। অতএব তোমরা অবিচল থাক এবং যারা অজ্ঞ, কিছুতেই তাদের পথ অনুসরণ করো না[২]।'

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨٩

৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম এবং ফেরাওন ও তার সৈন্যদলগুলো জুলুম ও সীমালঙ্ঘন বশত তাদের পিছু নিল। পরিশেষে যখন সে ডুবে যাওয়ার মুখোমুখি হল, তখন বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ اٰمَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٩٠

৯১. এখন (তুমি এ কথা বলছ)?! অথচ তুমি এর আগে নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত[৩]।

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝٩١

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) আয়াতের তাফসীর অন্যভাবে করেছেন। তিনি বলেন, 'ওদের থেকে সত্যিকার ঈমানের আশা ছিল না। কিন্তু যখনই কোন বিপদ আসত তখন মিথ্যা বলত যে, আমরা এখন মানব। এতে আযাব মওকূফ হয়ে যেত, মীমাংসা হত না। সুতরাং তিনি দো'য়া এজন্য করলেন, যেন ওরা এ রকম মিথ্যা ঈমান না আনে, ওদের অন্তর যেন শক্ত থাকে। ফলে আযাব যেন এসে পড়ে এবং মীমাংসা হয়ে যায়।'

১. বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.) দো'য়া করছিলেন এবং হারূন আলাইহিস সালাম 'আমীন' বলছিলেন। এ হিসাবে دعوتكما বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আপন কাজ দৃঢ়তা ও অবিচলতার সঙ্গে করে যাও। যদি দো'য়া কবূল হওয়ার আলামত প্রকাশ পেতে দেরি হয়, তবে অজ্ঞ লোকদের মত বিচলিত হয়ো না– নির্ধারিত সময়ে এ হবেই হবে।

৩. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কয়েক লক্ষ বনী ইসরাঈলসহ মিশর থেকে বের হয়ে পড়লেন। ফেরাওন সংবাদ পেয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। বনী ইসরাঈল লোহিত সাগরের উপকূলে পৌঁছে দারুণ পেরেশান হল– সামনে সমুদ্র, পিছনে ফেরাওনের সৈন্যরা ছুটে আসছিল। মূসা (আ) সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমে সাগরে লাঠি মারলেন। সাগরের পানি দু'দিকে স্থির হয়ে গেল এবং আল্লাহ মধ্যভাগে বারটি শুকনা রাস্তা করে দিলেন। এরা পার হয়ে গেল। অন্যদিকে ফেরাওন সৈন্যদলসহ সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. 'অতএব আজ আমি তোমার দেহটা রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয়ই বহু মানুষ আমার (কুদরতের) নিদর্শনাবলি সম্পর্কে বে-খবর[১]।'

গেল। শুকনা রাস্তা দেখে ওরা সকলে তাতে ঘোড়া নামিয়ে দিল। যখন সমগ্র বাহিনী সাগরের মধ্যভাগে পৌছল, তখন পানির প্রতি নির্দেশ হল মিশে যেতে। অমনি পানির স্তরসমূহ মিশে গেল, আর সকল সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম তরঙ্গমালার উপহার হয়ে গেল!

ফেরাওন দেখল, সে ডুবে যাচ্ছে। তখন ঘাবড়ে গিয়ে ঈমান ও ইসলামের শব্দাবলি মুখে আনল, এ আশায় যে, হয়ত বনী ইসরাঈলের খোদা ঈমানের শব্দ শুনে তাকে সাগর-তরঙ্গের বাইরে এনে দেবেন! আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হল— آلئٰن وقد عصيت قبل অর্থাৎ সারা জীবন বিরোধী থেকে গোমরাহীর বিস্তার ঘটিয়েছ এবং দুষ্কৃতি-দৌরাত্ম্য করেছ, এখন আযাব দেখে ঈমান আনলে? এই ঈমানের কোনো মূল্য নেই–

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ . (المؤمن : ৮৫) (কিন্তু আমার আযাব দেখে ওদের ঈমান আনয়ন ওদের কোন উপকারে আসেনি। আল্লাহ এ রীতি চালু করেছেন, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (পূর্ব থেকে) চলে এসেছে। আর সেখানে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।)

বি. দ্র. জান কবজ করা ও আযাব চাক্ষুষ দেখার সময় ঈমান আনাকে إيمان غرغرة (গড়গড় করার সময়ের ঈমান), বা إيمان بأس (আযাবের সময়ের ঈমান), বা إيمان يأس (নৈরাশ্যের সময়ের ঈমান) বলে। 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত' এর নিকট এই ঈমান কোন কাজের নয়।

শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী তাঁর কিতাব كتاب اليواقيت والجواهر- এ فتوحات مكية থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তাতে ফেরাওনের ঈমান সম্বন্ধে এ কথাই রয়েছে। আর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, فتوحات এর কপিসমূহে মূলহিদ ও যিন্দীকরা অনেক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমার নিকট فتوحات এর যে প্রামাণ্য কপি রয়েছে, তাতে এসব কথা একেবারেই নেই। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

বি. দ্র. শেষ সময়ে ফেরাওন কর্তৃক آمنت বলিয়ে আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন যে, হযরত মূসার দো'য়া فَلَايُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ (যাতে তখনই ওরা ঈমান আনে যখন যাতনাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।) সত্যিই কবূল হয়েছিল।

১. 'মূযেহুল কুরআনে' আছে, 'অসময়ে ঈমান আনায় (ফেরাওনের) কোন লাভ হয়নি। মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা ওর লাশ সাগর থেকে বের করে টিলার উপর নিক্ষেপ করলেন, যাতে বনী ইসরাঈল দেখে শোকর করে এবং পরবর্তীরা ওর অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। এ

[রুকূ - ১০]

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর আমি বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য উৎকৃষ্ট স্থান দিলাম এবং তাদের দান করলাম পবিত্র বস্তুসামগ্রী[১]। অতঃপর তারা মতবিরোধ করেনি, যাবৎ না ওদের নিকট জ্ঞান এল। নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত[২]।

ফায়দা না থাকলে ওর দেহ রক্ষা পাওয়ায় কী লাভ! যেমন নিষ্ফল ছিল ওর ঈমান আনয়ন, তেমনি নিষ্ফল ওর দেহ রক্ষা পাওয়া'।

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরাওনের লাশ আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে; কিন্তু কুরআন এস্থলে যে শব্দাবলি ব্যবহার করেছে তার প্রামান্যতা ওর লাশ এখন পর্যন্ত রক্ষিত থাকার উপর নির্ভরশীল নয়।

শুভ ঘটনাক্রম : বনী ইসরাঈল মুক্তি পাওয়ার ও ফেরাওন ডুবে মরার ঘটনা আশুরার দিন সংঘটিত হয়েছিল। আর ঘটনাক্রমে আজও (অর্থাৎ যেদিন মূল উর্দূ তাফসীরের এ অংশ হযরত শায়খুল ইসলাম কর্তৃক লেখা হচ্ছিল)– আশুরার দিন (১০ই মহররম, ১৩৪৮ হিজরী)। খোদা তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং দীনের শত্রুদের নৌকা ডুবিয়ে দিন। আমীন।

১. অর্থাৎ ফেরাওনদের ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে প্রথমে মিশর দান করলেন। এর কিছুকাল পর 'আমালিকা' সম্প্রদায়কে বের করে শামদেশও তাদের দেওয়া হল। উভয় দেশ ছিল সবুজ, সতেজ ও শস্যশ্যামল; যেখানে পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল। মোটকথা, বনী ইসরাঈলকে হালাল ও সুস্বাদু নে'য়ামতরাশি দ্বারা ঐশ্বর্যশালী করে দেওয়া হল।

২. অর্থাৎ পার্থিব অনুগ্রহ ও কৃপার সাথে দীনী ও রূহানী নে'য়ামত দ্বারাও তাদের সমৃদ্ধ করা হয়। তাদের তাওরাত শরীফ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়াদির বর্ণনা ছিল এবং ছিল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বৃত্তান্ত।

বনী ইসরাঈলের মতবিরোধ ও ফের্কাবাজি

এসব সুস্পষ্ট সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর দীনের পরিষ্কার বিষয়াদিতে মতবিরোধ করে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং ফের্কাবন্দীর অভিশাপে পতিত হওয়া ওদের জন্য মোটেই উচিত ছিল না। কিন্তু সহীহ ইলম ও সত্য সংবাদ পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তারা নানা রকম মতবিরোধ সৃষ্টি করল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কোন কোন হুকুমের বিষয়ে

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৯৪. আমি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তার বিষয়ে আপনি যদি সন্দেহের মধ্যে থাকেন, তবে যারা আপনার পূর্বের কিতাব পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। নিশ্চয়ই আপনার কাছে আপনার রবের নিকট থেকে সত্য (বাণী) এসেছে, সুতরাং আপনি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৯৫. এবং কিছুতেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা আল্লাহর আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে; তা হলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

নিজেদের পয়গম্বর (মূসা আলাইহিস সালাম)এর সঙ্গেও অযথা হুজ্জতি করল, যেমন গাভী কুরবানীর ঘটনায় ঘটেছে। তদুপরি পরবর্তীকালে আগমনকারী পয়গম্বরদের, বিশেষত সর্বশেষ নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কতক স্বীকার করল আর অধিকাংশই অস্বীকার করল। অথচ তাঁর সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাদের জানা ছিল, বরং আবির্ভাবের পূর্বে তারা শেষ নবী হিসাবে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং মুশরিকদের বলত যে, আমরা শেষ নবীর সঙ্গী হয়ে তোমাদের পরাজিত করব।

আর তাদের মধ্যে শুধু এ বিষয়েই মতবিরোধ হয়নি, বরং তারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে বিকৃতি সাধন করল, মূল ও শাখাগত বিষয়াদি পরিবর্তন করল এবং ক্রমান্বয়ে বহু ফের্কার উদ্ভব হল।

খ্রিষ্টধর্মের বিকৃতি

মাসীহ আলাইহিস সালামের তিনশত বছর পর দার্শনিক প্রকৃতির সম্রাট কনস্টানটাইন মুনাফেকির আশ্রয় নিয়ে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করলে পাদ্রিরা তার খাতিরে নতুন আইন-কানুন রচনা করল ও নতুন ধর্ম তৈরি করল। আর সে তাদের জন্য বড় বড় গির্জা ও ইবাদতখানা নির্মান করাল। মাসীহ (আ)এর আসল ধর্মকে বিকৃত করে ফেলার পর যে নতুন খ্রিস্টধর্ম প্রণীত হল, তা খুবই প্রচার-প্রসার লাভ করল। যে কতিপয় দুনিয়া-বিরাগী 'রাহিব' লোকালয় ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে গিয়ে বসবাস করছিল, তাদের ছাড়া কেউ-ই আসল খ্রিস্টধর্মে কায়েম থাকেনি। ক্রুশের পূজা করা, পূর্বদিকে ফিরে নামায পড়া, গীর্জাসমূহে মাসীহ ও মারয়াম প্রমুখের মূর্তিপূজা করা, শূকর ইত্যাদিকে হালাল করা এবং এ ধরনের অনেক বিকৃতি প্রকৃত খ্রিস্টধর্মকে বিনষ্ট করে দিল। আর বিকৃত খ্রিস্টধর্মই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

এ সেই কালের কথা, যখন শামদেশে, বাইতুল মুকাদ্দাসে, আরব ও রোম শহরে খ্রিস্টানদের আধিপত্য ছিল। অতঃপর ফারূকে আজম উমর (রা) এর খিলাফতকালে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এসব দেশকে খ্রিস্টানদের দখল থেকে উদ্ধার করেন। ولله الحمد والمنة

৯৬. যাদের ব্যাপারে আপনার রবের কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না–

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. যদিও ওদের নিকট সমস্ত নিদর্শন এসে যাক, যে পর্যন্ত না ওরা যাতনাদায়ক শাস্তি দেখে নেবে[১]।

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

---

১. বর্তমান আয়াতগুলিতে (৯৪-৯৫) বাহ্যত পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সম্বোধন করে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য, যারা একজন নিরক্ষর মানুষের মুখে এমন তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বিষয়াদি ও ঘটনাদি শুনে হতভম্ব হয়ে যেত। কিন্তু অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির কারণে সে সবের সত্যতায় দ্বিধা ও সন্দেহ প্রকাশ করত। এ তো অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আনীত কিতাবের ব্যাপারে কী করে দ্বিধা-সন্দেহ করতে পারেন? এবং যার প্রতি তিনি সারা দুনিয়াকে দাওয়াত দিতেন এবং শ্রবণকারীদের অন্তরে পাহাড় অপেক্ষা দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিতেন, স্বয়ং তিনি কিভাবে তাকে মিথ্যা বলতে পারেন?! কয়েক আয়াতের পর পরিষ্কার বলা হচ্ছে— قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي الخ (হে মানুষ! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দেহে থাক...)। এই আয়াত স্পষ্টরূপে বলছে যে, সন্দেহকারী ছিল অন্য লোকেরা, যাদের মোকাবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দৃঢ় ও অটল আকীদার কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা গেল যে, আয়াত ৯৪-৯৫তে আসল সম্বোধন হুযূর (সা) কে উদ্দেশ্য করে নয়।

যা হোক, এই আয়াতগুলির মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে কুরআনের প্রত্যেক শ্রোতা-পাঠককে সতর্ক করা হচ্ছে যে, কুফর ও অস্বীকারের ব্যাধি আরম্ভ হয় সন্দেহ থেকে। যদি কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলিতে তোমাদের দ্বিধা-সন্দেহ হয়, তবে এর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা কর– অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের ইলম রাখে, তাদের জিজ্ঞাসা কর। তাদের মধ্যেও কিছু লোক সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পরায়ন রয়েছে– তারা বলবে যে, উম্মী নবী যা কিছু বলেছেন তা কত সত্য! নিঃসন্দেহে যা কিছু তিনি এনেছেন তা সত্য বৈ আর কিছু নয়, তা প্রভুকর্তৃক অবতারিত, যাতে দ্বিধা-সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই। —অহেতুক সন্দেহের চিকিৎসা যথাসময়ে না করা হলে কিছু দিনের মধ্যেই এ সন্দেহ উন্নতি করে (امتراء) বিতর্কে এবং বিতর্ক উন্নতি করে অস্বীকৃতির সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যার পরিণাম ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

অস্বীকার করার আরেকটি ধাপ আছে, যেখানে পৌঁছার পর অন্তরে মোহর লেগে যায়– সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বরবাদ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি যদি দুনিয়া-জাহানের সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয়, তবুও সে ঈমান আনবে না। একমাত্র মর্মন্তুদ শাস্তি দেখে তার বিশ্বাস হবে– যখন তার বিশ্বাসে কোন উপকার হবে না।

৯৮. তো, কোন জনপদ(-বাসীরা) কেন ঈমান আনয়নকারী হল না, তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনল, তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদের একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম[১]।

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۹۸﴾

বি. দ্র. كلمة ربك (আপনার প্রভুর বাণী) দ্বারা খুব সম্ভব তা-ই উদ্দেশ্য, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা পূর্ণ করব।) তো, দুর্ভাগ্য, অযোগ্যতা, মন্দকর্মের শাস্তিস্বরূপ যাদের ব্যাপারে এ কথা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে বর্তমান আয়াতে বলা হয়েছে– তারা ঈমান আনবে না।

১. অর্থাৎ নবীদের মিথ্যা বলা ও মন্দকর্ম করার কারণে যেসব লোকালয়-(বাসীরা) শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কারো পক্ষে এমনভাবে ঈমান আনার সুযোগ হয়নি, যাতে খোদায়ী আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারত। একমাত্র ইউনুস (আ)এর জাতি ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনে এমন আসমানী আযাব থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে গেল, যা একেবারে তাদের মাথার উপর এসে পড়েছিল। ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর থেকে আসন্ন আযাব অপসারিত করে দিলেন এবং যতদিন দুনিয়ায় থাকা তাদের ভাগ্যে ছিল, ততদিন এখানকার ফায়দা ও বরকতসমূহ উপভোগ করল।

ইউনুস-সম্প্রদায়ের ঘটনা

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, হযরত ইউনুস (আ) মাওসিলের 'নীনাওয়া' এর অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা ছিল পৌত্তলিক। তিনি ওদের অনবরত সাত বছর পর্যন্ত আদেশ-উপদেশ দিতে থাকেন, কিন্তু ওদের কেউই একটি কথাও শুনল না। ক্রমান্বয়ে ওদের অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি বাড়তেই থাকে। অবশেষে হযরত ইউনুস (আ) অসহ্য হয়ে ওদের জানিয়ে দিলেন যে, (বিরত না হলে) তিন দিনের মধ্যে আযাব আসবে। যখন তৃতীয় রাত এল, ইউনুস (আ) অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর লোকালয়ের বাইরে চলে গেলেন। ভোর হওয়ামাত্র আযাবের লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হতে লাগল– অত্যন্ত ভয়াবহ ও কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। তা থেকে কঠিন ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা ওদের বাড়ীঘরের নিকটবর্তী হওয়ায় ছাদগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল।

এ লক্ষণাদি দেখে যখন ধ্বংস সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন ওরা ইউনুস (আ) এর সন্ধান করল। তাঁকে না পেয়ে সকলে পরিবার ও সন্তানাদিসহ, এমনকি জীব-জন্তুও সঙ্গে নিয়ে ময়দানে বের হয়ে এল এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহর প্রতি রুজু করল– ভয়ে চিৎকার করছিল এবং খুবই এখলাস ও কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহকে ডাকছিল। চতুর্দিকে আহাজারির শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তারা বলছিল- آمنا بما جاء به يونس ইউনুস (আ) যা কিছু নিয়ে

৯৯. আর যদি আপনার রব চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যারা আছে নিশ্চয় তারা সকলেই ঈমান এনে ফেলত। এখন কি আপনি মানুষের প্রতি জবরদস্তি করবেন, যাতে তারা ঈমানদার হয়ে যায়[১]?

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾

এসেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। আল্লাহ তাআলা তাদের কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতিতে তাদের প্রতি মেহেরবানী করলেন এবং আযাবের লক্ষণাদি তুলে নিলেন।

এরূপ ঈমান কি গ্রহণযোগ্য?

এখানে পৌছার পর পূর্ববর্তী আলেমদের দুটি বক্তব্য রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, তখনো প্রকৃত আযাব তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, শুধু আলামত ও লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এমন সময়কার ঈমান শরীয়ত মতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হয়। অগ্রহণযোগ্য সেই ঈমান, যা একেবারে আযাব দেখে এবং তাতে ফেঁসে গিয়ে আনা হয়, যেমন ফেরাওন সমুদ্রের তরঙ্গমালায় ফেঁসে গিয়ে ঈমান এনেছিল।—পক্ষান্তরে কোন কোন আলেমের নিকট ইউনুস (আ)এর কওমের ঈমানও ফেরাওনের মত চূড়ান্ত আযাবের সময়ের ঈমান ছিল, যা সাধারণ নিয়মানুসারে উপকারী হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিছক নিজ মেহেরবানীতে সাধারণ নিয়মবহির্ভূতভাবে তাদের সে ঈমানকে গ্রহণ করলেন, ফেরাওনের ঈমানের ন্যায় বাতিল করলেন না।

আবার এ বিষয়েও মতভেদ আছে যে, তাদের ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা কি শুধু পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত, না আখেরাতেও তা নাজাতের কারণ হবে? ইবনে কাছীর (র) দ্বিতীয় মত অবলম্বন করে বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে উপকারী ও গ্রহণযোগ্য হবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) আয়াতের অতি সূক্ষ্ম তাফসীর করে লিখেছেন, 'দুনিয়াতে আযাব দেখে ঈমান আনায় ইউনুস (আ)-এর কওম ছাড়া আর কারো লাভ হয়নি। কারণ, তাদের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ে আযাব নাযিলের হুকুম আসেনি; বরং হযরত ইউনুস (আ) এর তাড়াহুড়ার কারণে আযাবের বাহ্যরূপ প্রকাশ হয়েছিল মাত্র (যাতে তাদের কাছে হযরত ইউনুস (আ) এর কথা মিথ্যা মনে না হয়)। তারা ঈমান আনল ও রক্ষা পেয়ে গেল এবং আযাবের অবস্থা হটিয়ে দেওয়া হল। মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও এমন– মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামী সৈন্যবাহিনী তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের ঈমান কবূল হয়ে গেল এবং তারা নিরাপত্তা লাভ করল।'

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনার বাকি অংশ সূরা 'সাফফাত' ইত্যাদিতে বর্ণিত হবে।

১. অর্থাৎ জবরদস্তি করে কারো অন্তরে ঈমান ঢুকিয়ে দেওয়া আপনার ক্ষমতায় নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে অবশ্যই সকল মানুষের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিতে পারতেন। কিন্তু পূর্বে বিভিন্ন স্থানে যেমন আলোচিত হয়েছে, এমন করা তাঁর (تكويني) সৃষ্টিগত হেকমত ও কল্যাণের পরিপন্থী। তাই এমন করেননি।

১০০. কারো জন্য সম্ভব নয় আল্লাহর হুকুম ছাড়া ঈমান আনা। আর তিনি তাদের উপর (কুফরের) কলুষ-কালিমা আরোপ করে দেন, যারা অনুধাবন করে না[১]।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

১০১. আপনি বলুন, 'তোমরা দেখ তো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত কী রয়েছে! আর নিদর্শনাদি ও সতর্ককারীগণ অবিশ্বাসী লোকদের কোন উপকারে আসে না[২]।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১০২. ওরা আর কিছুর নয়, কেবল নিজেদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দিনগুলির অপেক্ষা করছে। আপনি বলুন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি[৩]।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

১০৩. অতঃপর আমি আমার রাসূলদের ও যারা ঈমান আনে তাদের রক্ষা করি। এভাবেই আমি ঈমানদারদের রক্ষা করব, এ আমার দায়িত্ব[৪]।

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

---

১. আল্লাহর হুকুম ও তাওফীক ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না। আর এই হুকুম ও তাওফীক তাদেরই ভাগ্যে হয়ে থাকে, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে গভীর চিন্তা করে এবং আকল-বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করে। (পক্ষান্তরে) যারা চিন্তা-ফিকির করার ও বোঝার কষ্ট স্বীকার করে না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুফর ও শিরকের ময়লায় ডুবে থাকতে দেন।

২. অর্থাৎ যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, তাদের জন্য আসমান ও যমীনে আল্লাহর কুদরত ও হেকমত এবং তাওহীদ ও একত্ববাদের বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে; বরং প্রতিটি সৃষ্টিকণা ও গাছের পাতা-পল্লব তাঁর একত্ব ও একক সত্তার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু যারা কোন কথা মানতে ও স্বীকার করতে চায় না, তাদের জন্য এসব নিদর্শন ও প্রমাণ অর্থহীন এবং সতর্ককারী পয়গম্বরদের সতর্কবাণী ও ভয় প্রদর্শনও তাদের অন্তরে কোন আবেদন সৃষ্টি করে না।

৩. এমন একগুঁয়ে ও অবাধ্য কওম, যারা কোন প্রমাণ ও নিদর্শন মানে না, তাদের জন্য পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের উপর যেসব বিপদ ও মুসিবত নাযিল হয়েছিল সেসবের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অতএব উত্তম এ-ই যে, তোমরা ও আমরা উভয়ে মিলে সেই সময়ের অপেক্ষা করি, যখন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর শেষ মীমাংসা সামনে এসে যাবে।

৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যেমন আমি অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করে পয়গম্বর ও মুমিনদের রক্ষা করেছি, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যত মুমিনদের সম্বন্ধেও আমার ওয়াদা এই

[রুকূ - ১১]

১০৪. আপনি বলে দিন, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্বন্ধে সন্দেহে থাক, তবে (শুনে রাখ)– তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না, বরং আমি আল্লাহর ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।'

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡ كُنۡتُمۡ فِىۡ شَكٍّ مِّنۡ دِيۡنِىۡ فَلَاۤ اَعۡبُدُ الَّذِيۡنَ تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلٰـكِنۡ اَعۡبُدُ اللّٰهَ الَّذِىۡ يَتَوَفّٰٮكُمۡ ۖۚ وَاُمِرۡتُ اَنۡ اَكُوۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ‏ ﴿۱۰۴﴾

১০৫. এবং এই (আদেশও করা হয়েছে) যে, 'আপনি একনিষ্ঠ হয়ে আপন সত্তাকে দীনের উপর কায়েম রাখুন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَاَنۡ اَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّيۡنِ حَنِيۡفًا ۚ وَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ‏ ﴿۱۰۵﴾

১০৬. 'আর আপনি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করতে পারে না এবং আপনার ক্ষতিও করতে পারে না। আপনি যদি (এরূপ) করেন, তবে তখন আপনিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন[১]।'

وَلَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنۡ فَعَلۡتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيۡنَ‏ ﴿۱۰۶﴾

যে, আমি তাদের পরকালে যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে এবং দুনিয়াতে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষা করব। তবে শর্ত এই যে, মুমিনদের প্রকৃত মুমিন হতে হবে, অর্থাৎ সেসব গুণ ও স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, যা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে।

১. অর্থাৎ যদি আমার দীনী পথ ও পন্থা তোমাদের বুঝে না এসে থাকে এবং এ কারণে তা সম্পর্কে দ্বিধা-সন্দেহ থাকে, তবে আমি আমার ধর্মের মূলতত্ত্ব (অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ) তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সারকথা এই যে, আমি তোমাদের মনগড়া উপাস্যদের পূজাকে চরম ঘৃণা করি এবং আমার পক্ষ থেকে তা অবলম্বনের কোনই সম্ভাবনা নেই। আমার ইবাদত হচ্ছে একমাত্র সেই পবিত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যাঁর মুঠিতে রয়েছে তোমাদের সকলের প্রাণ। যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি তা দেহের মধ্যে রাখেন এবং যখন ইচ্ছা তা একেবারে টেনে (বের করে) নেন। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু যাঁর হাতে, বন্দেগী তাঁরই জন্য হতে পারে। আর বন্দেগী শুধু যে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা করা হবে তা নয়। বরং এও জরুরী যে, অন্তরের মধ্যে তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয়তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে এবং ইবরাহীম খলীলুল্লাহর যে খাঁটি

১০৭. যদি আল্লাহ তোমার উপর কোন কষ্ট আপতিত করেন, তবে এর অপসারণকারী তিনি ছাড়া আর কেউই নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ পৌঁছাতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রদকারী কেউ নেই। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۭ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৮. আপনি বলে দিন, 'হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যে কেউ সুপথে আসবে সে নিজ কল্যাণেরই জন্য সুপথে আসবে, আর যে কেউ বিচ্যুত হবে সে নিজেরই অমঙ্গলের জন্য বিচ্যুত হবে। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই[২]।'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

দীন, তারই উপর পূর্ণ হিম্মত ও নিষ্ঠার সাথে স্থির থেকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সামান্যতম শিরকের স্পর্শ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে।

ইবাদত যেমন একমাত্র তাঁরই করা হবে, সাহায্যের জন্যও তাঁকেই ডাকতে হবে। কেননা, সর্বপ্রকার লাভ ও ক্ষতি, মঙ্গল ও অমঙ্গল এককভাবে তাঁরই মুঠিতে রয়েছে। মুশরিকদের ন্যায় এমন সব জিনিসকে সাহায্যের জন্য ডাকা, যারা কোন লাভ-লোকসানের মালিক নয়, অত্যন্ত গর্হিত বিষয়, বরং চরম অন্যায় (অর্থাৎ শিরক) এর একটি শাখা। নবীর দ্বারা এমন অসম্ভব কাজ হতে পারে- এমন চিন্তা করা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে বিরাট জুলুমই।

১. যাদের হাতে তোমাদের ভাল-মন্দের কিছুই নেই, তাদের যখন ডাকতে নিষেধ করা হল, তখন এর মোকাবেলায় সেই মালিকের উল্লেখ করা সমীচীন, যিনি সুখ ও দুঃখ, ভাল ও মন্দ সব কিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন– যাঁর প্রেরিত কষ্টকে দুনিয়াতে কেউ হটাতে পারে না এবং যার প্রতি তিনি দয়া ও রহমত করতে ইচ্ছা করেন তাকে বঞ্চিত করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই।

২. অর্থাৎ সত্য সুস্পষ্টরূপে দলীল-প্রমাণাদিসহ পৌঁছে গেছে, যা কবূল না করার কোন সঙ্গত ওযর কারো কাছে নেই। অতএব বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ হুজ্জত (প্রমাণ) পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন প্রত্যেকে নিজ লাভ-লোকসান চিন্তা করে নিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ-প্রদর্শিত পথে চলবে, সে ইহ ও পরকালে কৃতকার্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা বর্জন করে এদিক সেদিক বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে, সে নিজে পেরেশান, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় থাকবে। অতএব নিজ ভাল-মন্দ উত্তমরূপে চিন্তা করে প্রত্যেকে নিজ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে নিক এবং যে পথ পছন্দ হয় তা অবলম্বন করুক। পয়গম্বর কোন ক্ষমতাধিকারীরূপে প্রেরিত হননি

১০৯. আর আপনি তার অনুসরণ করুন যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় এবং ধৈর্য ধারণ করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ মীমাংসা করেন। আর তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী[১]।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

যে, তিনি তোমাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী হবেন ও জবাবদিহি করবেন। তাঁর দায়িত্ব শুধু জানিয়ে দেওয়া এবং পথ দেখিয়ে দেওয়া। পথে চলা পথিকের ক্ষমতাধীন।

১. এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যদি এরা সত্য গ্রহণ না করে, তবে আপনি নিজেকে এদের চিন্তায় ফাঁসাবেন না। আপনি আল্লাহ তাআলার আহকামের অনুসরণ করতে থাকুন এবং তবলিগ প্রভৃতি কাজে লেগে থাকুন। আর এ পথে যেসব দুঃখ-কষ্ট আসবে তাতে সবর করুন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে কষ্ট-যাতনা আসলে তাতে ধৈর্যধারণ করা উচিত, যাবৎ না আপনার রব আপনার ও ওদের মধ্যে উত্তম মীমাংসা করে দেন, অর্থাৎ ওয়াদা মত আপনাকে বিজয় ও প্রাধান্য দান করেন। অথবা মীমাংসার অর্থ এই যে, জেহাদের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন।

সূরা হূদ

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১১ । ১২৩ আয়াত । ১০ রুকূ । মক্কী

آياتها ١٢٣، ركوعاتها ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿۱﴾

১. আলিফ-লাম-রা; (এ) এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলি অত্যন্ত পরিপক্ব ও মজবুত, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণিত– প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে[১]।

---

১. (احكمت آياته) অর্থাৎ এ পবিত্র কুরআন এমন এক মহিমান্বিত ও মহামর্যাদাশালী কিতাব, যার আয়াতগুলি ভাষাগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে মাপাজোখা, একেবারে তুলাদণ্ডে পরীক্ষিত। এগুলিতে পারস্পরিক বিরোধও নেই, কোন বিষয় যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার পরিপন্থীও নয়। অলৌকিক ভাষা-মাধুর্য ও সাহিত্য-নৈপুণ্যের দিক থেকে তার একটি হরফেও সমালোচনার অবকাশ নেই, যে বিষয় যে ভাষাশৈলীতে প্রকাশ করা হয়েছে, তার চেয়ে শ্রেয় প্রকাশভঙ্গি হতে পারে না। অর্থ ও ভাবের দেহে ভাষার যে আচ্ছাদন, তা একটু ঢিলাও নয়, আঁটসাঁটও নয়।

এর আয়াতসমূহ যেসব মৌলিক ও শাখাগত বিষয়, চরিত্র ও আমল, মূল্যবান উপদেশ ও নসীহত সম্বলিত এবং তার দাবিসমূহের প্রতিষ্ঠায় এতে যেসব দলীল-প্রমাণ ব্যবহৃত হয়েছে, তা সবই ইলম ও হেকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা)-এর পাল্লায় যাচাইকৃত। কুরআনের তত্ত্ব, তথ্য ও প্রমাণাদি এমনি পরিপক্ক ও সুরক্ষিত যে, যুগ ও কালের যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, তাতে কোনও রদবদল ও ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। জগতের মেজাজ-প্রকৃতির যথাযথ নিরূপণ এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত ঘটিতব্য যাবতীয় পরিবর্তন ও পালাবদলের সার্বিক দিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানবাত্মার এমন ভারসাম্য ও শাশ্বত খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে, যা খাদ্যগ্রহণকারীর জন্য সর্বদা ও সর্বাবস্থায় উপাদেয় ও সুস্বাদু।

(ثم فصلت) এ সমস্ত হেকমতপূর্ণ গুণ ও সৌন্দর্যের সন্নিবেশ সত্ত্বেও এমন হয়নি যে, সংক্ষিপ্ততার কারণে এ মহাগ্রন্থ দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বরং এতে দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিশদভাবে বোঝানো হয়েছে এবং স্থানে স্থানে তাওহীদের প্রমাণাদি, হুকুম-আহকাম, ওয়াজ-নসীহত, কিচ্ছা-কাহিনী প্রত্যেকটি বিষয় উত্তমরূপে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং সব প্রয়োজনীয় বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অবতরণের ক্ষেত্রেও এ হেকমতটি বিবেচ্য থেকেছে যে, সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং সময়ে সময়ে স্থান-কাল ও কল্যাণের চাহিদা অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে আয়াত অবতরণ হতে থেকেছে।

২. (এ কিতাব নির্দেশ দিচ্ছে) যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না[১]। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা[২];'

أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝٢

৩. এবং (নির্দেশ দিচ্ছে) যে, 'তোমরা আপন রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হও*। তাহলে তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তমরূপে জীবন উপভোগ করতে দেবেন[৩]। এবং প্রত্যেক

وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ ۖ

(من لدن حكيم) কুরআনে এ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময়ের কোনই কারণ নেই। কেননা, নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তার বাণীতে যদি সমস্ত হেকমত ও সৌন্দর্যের সমাবেশ না হবে, তবে আর কার বাণীতে তা আশা করা যেতে পারে?

১. অর্থাৎ এ পরিপক্ক ও সুস্পষ্ট কিতাব নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একক খোদার ইবাদতের প্রতি মানবজাতিকে দাওয়াত দেওয়া এবং তার পন্থা শেখানো। এ মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইতিপূর্বে নবীগণ তশরীফ এনেছিলেন- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الأنبياء: ٢٥) (আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি অবশ্যই এ আদেশ পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব আমারই ইবাদত কর।) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: ٣٦) (আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।)

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ কিতাবকে মানে এবং শিরক বর্জন করত এক আল্লাহর ইবাদত করে, তাকে তিনি উভয় জগতের সফলতার সুসংবাদ শোনান। আর যে ব্যক্তি মানে না এবং কুফর ও শিরক অবলম্বন করে, ওকে তিনি আল্লাহর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা-** 'তাঁর অভিমুখী থাক'।

৩. যে ব্যক্তি বিগত গোনাহ-খাতা মাফ করাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহ-অভিমুখী হবে, তার পার্থিব জীবন উত্তমরূপে অতিবাহিত হবে। কেননা, অনুগত মুমিন যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের বুক ভরা আশা রাখে। সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অন্বেষণে ও ভবিষ্যতের মহামর্যাদাশালী সুখী জীবনের চিন্তা-ফিকিরে এতই মগ্ন থাকে যে, এখানকার বড় বড় দুঃখ-কষ্টও মনে স্থান পায় না। সে যখন চিন্তা করে যে, আমি জীবনের কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করছি এবং এর প্রতিফল একদিন অবশ্যই আরশের অধিপতির নিকট লাভ করব, তখন স্বীয় সফলতা ও আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা ভেবে তার অন্তর আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেলিত হতে শুরু করে। দুনিয়ার সামান্য অংশ

وَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡكُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ كَبِیۡرٍ ۝

অধিক আমলকারীকে তাঁর পক্ষ থেকে অধিক দিবেন[১]। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি[২]।

اِلَی اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۝

৪. আল্লাহরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ یَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَهُمۡ لِیَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡهُ ؕ اَلَا حِیۡنَ یَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِیَابَهُمۡ ۙ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَمَا یُعۡلِنُوۡنَ ۚ

৫. শোন! তারা নিজেদের বক্ষ দু'ভাঁজ করে তাঁর থেকে গোপন করার জন্য। শুনে রাখ! যখন তারা কাপড় দ্বারা নিজেদের আবৃত করে, তখনও তিনি জানেন– যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।

পেয়েই সে এমন মানসিক শান্তি ও অভ্যন্তরীণ স্বস্তি বোধ করে, যা রাজা-বাদশাহও অসংখ্য আসবাবপত্র, ধন-সম্পদ ও ধনাগার থাকা সত্ত্বেও পায় না। সে বরং কোন কোন সময় এখানকার সাময়িক বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টের মধ্যে এমন স্বাদ পায়, যা ধনবান ও বাদশাহরা নিজেদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগের মধ্যে থেকেও অনুভব করে না।

একটি উদাহরণ

মনে করুন, একজন দেশপ্রেমিক রাজবন্দীর যদি এ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আমার বন্দিত্বের কারণে দেশ বিজাতীয় লোকদের গোলামী থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং কারাগার থেকে বের হওয়ামাত্র আমাকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেওয়া হবে, তবে জেলখানার বন্ধ কোঠায় থেকেও কি তার আনন্দ ও স্বস্তি সেই বাদশাহর চেয়ে বেশি হবে না, যার জন্য আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের উপায়-উপকরণ মজুদ রয়েছে, কিন্তু সেই সাথে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, সে এক সপ্তাহের মধ্যে অত্যন্ত অপমানের সাথে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হতে পারে। এ দৃষ্টান্ত থেকে দুনিয়ারূপ জেলখানায় একজন অনুগত মুমিনের জিন্দেগীর অবস্থা কী, তা বুঝে নিন।

১. যে ব্যক্তি যে পরিমাণ বেশি নেক আমল করবে, সে ঠিক সেই পরিমাণ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বেশি অংশ লাভ করবে– আখেরাতে ছওয়াব ও প্রতিদান এবং দুনিয়াতে সমধিক শান্তি লাভ করবে।

২. অর্থাৎ আমার কথা যদি না মান, তবে কিয়ামতের আযাব সুনিশ্চিত।

তবে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও اني اخاف– 'আমি আশঙ্কা করি'– এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা সৃষ্টির প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বজনীন মায়া-মমতা ও সমবেদনা প্রকাশ পায়।

তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধেও সম্যক অবগত[১]।	اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১. শাস্তি প্রদানের জন্য অপরাধী ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া, বিচারকের মধ্যে শাস্তি প্রদানের পূর্ণ শক্তি ও এখতিয়ার থাকা এবং অপরাধী ব্যক্তিদের সকল ক্রিয়াকাণ্ড জানা থাকা জরুরী। সে মত إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ এর মধ্যে আল্লাহ বলে দিলেন যে, অপরাধী ও নিরপরাধী সকলকেই আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে। وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এর মধ্যে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপকতা বর্ণিত হল। আর أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ থেকে عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ পর্যন্ত তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের ব্যাপকতার কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন উভয়বিধ বিষয় একরকমই জানেন। এমনকি অন্তরসমূহের ভাঁজে ভাঁজে যেসব ধারণা, ইচ্ছা ও নিয়ত গুপ্ত থাকে, তাও তিনি জানেন। এর পরও কোন অপরাধী নিজ অপরাধকে কী করে গোপন রাখতে ও মুক্তি পেতে পারে?

শানে নুযূল

এ আয়াতগুলির শানে নুযূলের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– কোন কোন মুসলমানের মধ্যে লজ্জার এত প্রাবল্য ছিল যে, ইস্তেন্‌জা বা স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি মানবীয় প্রয়োজনের সময় শরীরের কোন অংশ বিবস্ত্র করতে এই ভেবে লজ্জিত হতেন যে, আসমানওয়ালা তো আমাদের দেখে থাকেন। ফলে বিবস্ত্র হতে হলে লজ্জার আতিশয্যে ঝুঁকে পড়তেন এবং লজ্জাস্থানকে গোপন করার জন্য বুক ভাঁজ (বা কুঞ্চিত) করে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬৮১, ৪৬৮২)

কখনো কখনো আল্লাহ তাআলার প্রতি চরম আদব ও লজ্জার প্রাবল্যের কারণে এরূপ অবস্থা হতে পারে। এ ধরনের লোকদেরকে সুফীদের পরিভাষায় مغلوب الحال বা ভাবাচ্ছন্ন বলা হয়।

উম্মতের আদর্শ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের পক্ষে কোন বিষয়ে এমন বাড়াবাড়ি উম্মতকে সংকীর্ণতায় ফেলতে পারত। তাই পবিত্র কুরআন أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ দ্বারা তাঁদের সংশোধন করে দিল– অর্থাৎ প্রয়োজনকালে শরীর খুলতে যদি আল্লাহর সম্মুখে লজ্জা লাগে এবং এজন্য ঝুঁকে পড়, তবে চিন্তা করে দেখ তো, কাপড় পরে থাকাবস্থায়ও কি তোমাদের জাহের ও বাতেন আল্লাহর সম্মুখে নেই? যেহেতু মানুষ তাঁর থেকে কখনই গোপন হতে পারে না, সুতরাং এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়।

প্রকাশ থাকে যে, আয়াতসমূহের পরস্পরের সামঞ্জস্যের জন্য এটা জরুরী যে, এক আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে অপর আয়াতের বিষয়বস্তুর যেন মিল থাকে, কিন্তু (এক আয়াতের) শানে নুযূলের সঙ্গে (অন্য আয়াতের) মিল থাকা জরুরী নয়।

৬. যমীনে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর (আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের রিযিক নিজের দায়িত্বে রেখেছেন)[১]। এবং তিনি জানেন তাদের অবস্থানস্থল ও তাদের সমর্পনস্থল (যেথায় তারা সমর্পিত হয়)[২]।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط

১. ইতিপূর্বে আল্লাহর জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। এখানে রয়েছে ঐ বিষয়েরই পরিশিষ্ট। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক জীব, যার রিযিকের প্রয়োজন, তার রুযীর ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা নিতান্তই নিজ কৃপায় নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন। যার ভাগ্যে যে পরিমাণ নির্ধারিত, তা অবশ্যই সে পাবে। যেসব উপায়-উপকরণ বান্দা অবলম্বন করে থাকে, তা রুযী লাভের মাধ্যম মাত্র। সমস্ত উপায়-উপকরণের স্রষ্টা যিনি, তাঁর প্রতি আস্থা রেখে ও তাঁকেই রিযিকদাতা বিশ্বাস করে যদি চেষ্টা-তদবীর ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়, তবে এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কিন্তু আল্লাহর কুদরতকে এই স্বাভাবিক উপায়-উপকরণের মধ্যে সীমিত ও সীমাবদ্ধ মনে করা যাবে না। তিনি কখনো কখনো আসবাবের মাধ্যম ছাড়াও জীবিকা পৌঁছিয়ে থাকেন, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন।

যা হোক, যখন সকল প্রাণীর স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী তাদের খাদ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করা আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে, তখন সব কিছুর উপর তাঁর ইলমের ব্যাপ্তিও জরুরী। নতুবা তাদের রুযীর খবরাখবর তিনি কী করে রাখবেন?

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন- مستقر (অবস্থানস্থল) হচ্ছে বেহেশত বা দোযখ, আর مستودع (সমর্পণস্থল) হচ্ছে তার কবর।

পূর্বে وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ الخ আয়াতাংশে পার্থিব জীবনের বর্ণনা ছিল, আর এখানে আছে বরযখ ও আখেরাতের উল্লেখ। অর্থ এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাআলা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের অস্তিত্বের সকল অবস্থার জ্ঞান রাখেন।

مستقر ও مستودع -এর অর্থ নির্ধারণে মুফাসসিরদের অনেক উক্তি রয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা আন'আমেও (আয়াত :৯৮) আমরা কিছু আলোকপাত করেছি। ইবনে কাছীর (র) বলেছেন, পৃথিবীতে যতদিন সে বিচরণ করে, এই বিচরণের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়কালকে مستقر এবং বিচরণ শেষে যেখানে ঠাঁই নেয় তাকে مستودع বলে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, এ জীবনে যেখানে অবস্থান করল তা مستقر এবং মৃত্যুর পর যেখানে কবরস্থ হয় তা مستودع । হযরত মুজাহিদ (র) এর মতে مستقر দ্বারা মাতৃগর্ভ এবং مستودع দ্বারা পিতার পৃষ্ঠদেশ উদ্দেশ্য। আতা (র) এর বিপরীত অর্থ করেছেন।

কোন কোন দার্শনিকের ধারণা এই যে, পৃথিবীতে প্রাণীকুলের বর্তমান বাসস্থানকে مستقر এবং বর্তমান অস্তিত্বে আসার পূর্বে যেসব উৎসস্থল ও অবস্থানস্থল অতিক্রম করেছে সেসবকে

كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۝

সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে[১]।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۝

৭. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে[২]— এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর[৩]— যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম[৪]। আপনি যদি বলেন, 'তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে', তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'এ সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়[৫]।'

مستودع বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বিভিন্ন উৎস, অবস্থা ও সময়কাল সম্বন্ধেও অবহিত, যেসব অতিক্রম করে কোনো প্রাণী তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনিই স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বারা অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে আপন যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাণীকে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুণাবলি দান করে থাকেন।

১. অর্থাৎ লওহে মাহফূজ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানগ্রন্থস্বরূপ, তাতে সব কিছু রয়েছে। অতএব কোন কিছু আল্লাহর জ্ঞানবহির্ভূত নয়।

২. আল্লাহ তাআলার ইলমের বর্ণনার পর এ আয়াতে তাঁর কুদরতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সূরা আরাফের সপ্তম রুকূতে (আয়াত :৫৪) এর তাফসীর লেখা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়, যা সকল বস্তুর জীবনের উৎস– وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ (আমি পানি থেকে প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি- আম্বিয়া : ৩০)। তখন আল্লাহ তাআলার আরশ পানির উপর ছিল, যেরূপ এখন তা আছে আকাশমণ্ডলীর উপর। এতে এ সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে যে, বিশ্বজগতের মূল উপাদান ও জীবনের উপকরণ সম্পূর্ণরূপে আরশের অধিপতির ক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধীন ।

৪. অর্থাৎ এই মহাব্যবস্থাপনার সৃষ্টি ও পরিচালনার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াতে তোমাদের বাস করতে দেওয়া ও পরীক্ষা করা যে, তোমরা এই বিস্ময়কর ও বিরল ব্যবস্থাপনা ও সৃষ্টিধারার মধ্যে কতদূর গভীরভাবে চিন্তা কর এবং খালেক ও মালিকের সঠিক পরিচয় হাসিল কর এবং আকাশ ও পৃথিবীর বস্তু-সামগ্রীর দ্বারা উপকৃত হয়ে উপকারীর অনুগ্রহের কথা কতটুকু স্বীকার কর। দুনিয়া তোমাদের পরীক্ষার স্থান। প্রকৃত মালিক দেখছেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁর দাস হিসাবে সততা ও এখলাস এবং উত্তমরূপে সৎকর্ম করে এবং বন্দেগী ও দাসত্বের দায়িত্বসমূহ পালন করে।

৫. **পূর্বা-পর সম্পর্ক ও মর্ম**

দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার ক্ষেত্র, সুতরাং এর সমাপ্তির পর ফলাফলের (পুরস্কার ও শাস্তির) পালা আসা জরুরি, যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। এ জন্যই এখানে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। —অর্থ এই যে,

৮. আর আমি যদি আযাবকে ওদের থেকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখি, তবে অবশ্যই বলতে থাকবে, 'আযাবকে কিসে আটকিয়ে রাখল?' শুনে রাখ! যেদিন ওদের উপর তা আসবে, সেদিন ওদের থেকে তা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না এবং যে জিনিস নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা ওদের বেষ্টন করে ফেলবে[১]।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۟

[রুকূ - ২]

৯. আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে সম্পূর্ণ নিরাশ, অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে[২]।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۟

১০. আর যদি দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি তাকে সুখ-শান্তি আস্বাদন করাই, তবে সে বলে ওঠে, 'আমার থেকে সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে।' (অতএব) সে হয়ে ওঠে

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ

কাফেরদের বিশ্বাস হচ্ছে না যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন ওরা পবিত্র কুরআনে বা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে পুনরুত্থান সম্বন্ধে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বয়ান শোনে তখন বলে, এই বয়ান সুস্পষ্ট যাদু, যা বহু লোককে প্রভাবিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে, কিন্তু আমাদের উপর এ যাদু চলার নয়। (ইবনে কাছীর)

১. অর্থাৎ যখন আযাব সম্বন্ধে ওদের সতর্ক করা হয়, কিন্তু খোদার হেকমত অনুযায়ী এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তা স্থগিত থাকে, তখন ওরা অস্বীকৃতি ও ঠাট্টাস্বরূপ বলে, সেই আযাব কোথায়? তা আসে না কেন? কিসে তাকে আটকিয়ে রেখেছে? উত্তরে বলা হচ্ছে, বিদ্রূপ করছ? যখন আযাব আসবে তখন কেউ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বরং তা সবদিক থেকে তোমাদের ঘিরে ধ্বংস করে ছাড়বে।

২. অর্থাৎ এখন তো বলে, আযাব কোথায়, কেন আসে না? কিন্তু মানুষ এতই দুর্বল ও ভীরু যে, যদি আল্লাহ তাআলা কিছুদিন নিজ মেহেরবানীতে তাকে আরাম-আয়েশে রাখার পর দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন, তবে পিছনের সমস্ত মেহেরবানী ভুলে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য হতাশ হয়ে পড়ে। অতীত অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে নৈরাশ্য– এই তার জীবনের সম্বল।

إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

উল্লসিত, অহংকারী[১];

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ أُولَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১১. কিন্তু তারা ব্যতিক্রম, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান[২]।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ۝

১২. মনে হয় যেন আপনার নিকট ওহী মারফত যা পাঠানো হয় আপনি তার কিছু অংশ ছেড়ে দেবেন? আর তার কারণে আপনার মন সংকুচিত হয়, কেননা ওরা বলে, 'তাঁর প্রতি ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হল না কেন অথবা তাঁর সঙ্গে ফেরেশতা আসল না কেন?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী। আর আল্লাহ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক[৩]।

---

১. অর্থাৎ মুসিবতের পর যদি আল্লাহ তাআলা আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দেন, তখন মনে করে যে, এখন সর্বদার জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল। পূর্বের অবস্থা কোনো দিন ফিরে আসার নয়। তখন সে গাফেল ও গর্বিত হয়ে আস্ফালন করতে থাকে এবং উল্লাস করে বেড়ায়। অথচ তার উচিত ছিল, পিছনের অবস্থা স্মরণ করে খোদার শোকর আদায় করা এবং তাঁর অনুগ্রহের সামনে অবনত হয়ে যাওয়া।

২. অর্থাৎ, উপরে মানুষের যে সাধারণ অবস্থা বর্ণিত হল, তা থেকে আল্লাহর সেই বান্দারা ব্যতিক্রম, যারা বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে ধৈর্য-অবিচলতার দ্বারা এবং সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে সৎকর্মে অধিক যত্নবান হয়। এরূপ দৃঢ়সংকল্প ও কৃতজ্ঞ দলই মহা অনুগ্রহের উপযুক্ত।

৩. **অবতরণের বিশেষ প্রেক্ষাপট**

শিরক ও মূর্তিপূজার খণ্ডন করা হলে মক্কার মুশরিকরা খুবই রাগ হত। শিরকী কর্মকাণ্ড এবং ওদের বোকামি ও মূর্খতার কথা যত বেশি বলা হত, ততই ওদের ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠত। ফলে ওরা কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে শিথিল করে দেওয়ার চেষ্টা করত এবং তাওহীদের মত সবচেয়ে বড় ও বুনিয়াদী বিষয়ের প্রচার-প্রসারে নম্রতা অবলম্বনে উৎসাহিত করত। কিন্তু যখন এতে বিফল হত, তখন শুধু বিব্রত করণার্থে আজীব ধরনের বেহুদা ফরমায়েশ করতে থাকত– যেমন বলত, আপনি যদি সত্যবাদী হন এবং সত্যিই রেসালাতের পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে আপনার সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধন-সম্পদের বিরাট ভাণ্ডার আসা উচিত ছিল, অথবা আসমান থেকে একজন ফেরেশতা আপনার সদাসঙ্গী হয়ে থাকার জন্য আগমন করা দরকার ছিল- لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۝

১৩. ওরা কি বলে, 'তিনি কুরআন রচনা করেছেন'? আপনি বলে দিন, 'তবে তোমরাও এর মত গোটা দশেক সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে যাকে পার ডেকে নাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

কিন্তু যখন আপনার সাথে কোনো পার্থিব বা রূহানী শক্তি নেই, তখন আপনার কথা আমরা কী করে মানতে পারি?

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অনর্থক সন্দেহ ও ফরমায়েশের কারণে অত্যন্ত দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হতেন। এহেন পরিস্থিতিতে কখনো হয়ত এমন ধারণাও মনে উদয় হয়েছে যে, ওদের উপাস্যদের ব্যাপারে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এত কঠোরতা না করা হত, বরং বর্তমানে কিছুটা নম্রতা ও উদারতার সাথে ওদের মতাদর্শের খণ্ডন করা হত, তবে সম্ভবত প্রচারকার্য অধিক ফলদায়ক হত; অথবা এই লোকেরা জিদবশত যেসব ফরমায়েশ করছে তা যদি কিছুটা পূর্ণ করা হত, তবে হয়ত ওরা মুসলমান হয়ে যেত।

যা হোক, তখন এমন নাযুক ও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ছিল যে, সারা দুনিয়া বাতিল-পূজার গর্জনে গর্জে উঠছিল। সেই কঠিন পরিবেশে একটিমাত্র পবিত্রাত্মাই ছিল, যাঁর কণ্ঠ থেকে সত্যের আওয়াজ বের হয়ে বাতিলের কিল্লাসমূহ প্রকম্পিত করছিল। তিনি চতুর্দিক থেকে প্রাণঘাতী শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। কেউ তাঁকে মিথ্যা বলত, কেউ মন্দ বলত, কেউ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।— এহেন পরিস্থিতিতির কথা চিন্তা করুন এবং সেই মহান প্রচারকের (হুজুর সা.) আধ্যাত্মিক শক্তি-সাহসিকতার কথাও ভাবুন, যাঁর সমস্ত ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহর ওয়াদাসমূহের উপর। তিনি যখন চিন্তিত-দুঃখিত হতেন, তখন একমাত্র সেই প্রভুর আওয়াজেই সান্তনা খুঁজে পেতেন এবং সমগ্র দুনিয়ার মোকাবেলায় নব উদ্যমে উঠে দাঁড়াতেন!

আয়াতের মর্মার্থ

এমন প্রেক্ষাপটেই বর্তমান আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। যেগুলির মর্ম এই যে, আপনি এই লোকদের বাজে কথায় ও বেহুদা ফরমায়েশের কারণে এত চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না এবং ওদের সাথে নম্রতা করার খেয়ালও মনে আনবেন না। এমন কি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ওহীসূত্রে যেসব বিষয় আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তবলিগের নির্দেশ দান করেছেন, এই লোকগুলোর বাজে কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তার কিছু অংশ আপনি বাদ দিয়ে বসবেন? বলাই বাহুল্য, এমন হতে পারে না– কারণ, পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও দৃঢ়তা এমন হতে দিবে না। তো যখন এমন হতে পারে না,তখন মনঃক্ষুণ্ন হয়ে লাভ কী! আপনার দায়িত্ব ভাল-মন্দ সম্বন্ধে শুধু অবহিত করে দেওয়া, ওদের হেদায়েতের দায়িত্ব আপনার উপর নয়। প্রত্যেক বিষয়ের জিম্মাদার আল্লাহ তাআলা, ওদের ব্যাপার তাঁরই নিকট সোপর্দ করুন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তবলিগের কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

১৪. এখন যদি ওরা তোমাদের কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখ যে, কুরআন তো অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহর ইলমের সঙ্গে। এবং এও (জেনে রাখ) যে, তিনি ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা কি আদেশ মান্যকারী হবে[১]?

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

১৫. যারা কেবল দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করবে, আমি দুনিয়াতে তাদেরকে তাদের আমলাদির (ফল) পুরাপুরি দিয়ে দেব এবং এখানে তাদের কম দেওয়া হবে না[২]।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ যেসব ফরমায়েশী মু'জেযা দান করায় কোনই কল্যাণ নেই, ওরা তা-ই চাচ্ছে। অথচ সব চেয়ে বড় মু'জেযা (কুরআন) ওদের সামনে রয়েছে, তা ওরা মানে না। ওরা বলে, এ তো হচ্ছে আপনার মনগড়া ও স্বরচিত কিতাব।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে, তোমরাও তো আরবী ভাষাভাষী, ভাষামাধুর্য ও সাহিত্যনৈপুণ্যের দাবিদার। তোমরা সকলে মিলে এর মত দশটি সূরা তৈরি করে পেশ কর এবং এ কাজে সাহায্য করার জন্য সমগ্র সৃষ্টজীবকে বরং নিজেদের সেই সকল মা'বূদকেও ডেকে নাও, যাদেরকে খোদার শরীক মনে করে থাক।—আর যদি তা তৈরি করতে না পার এবং কখনো পারবে না, তবে বুঝে নাও যে, এরূপ কালাম একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে, যার সমতুল্য রচনা করতে সমস্ত সৃষ্টজগত অক্ষম। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এ সেই কালাম, যা আল্লাহ তাআলা নিজ পরিপূর্ণ জ্ঞানের বলে পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যাঁর কালামের সদৃশ হতে পারে না, তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতেও কেউ শরীক হতে পারে না। এমন অতুলনীয় কালাম সেই অদ্বিতীয় আল্লাহরই হতে পারে, যাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং এমন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের পরও কি তোমরা মুসলমান এবং খোদার আজ্ঞাবহ হবে না?

বি. দ্র. কুরআনের অলৌকিকতা সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সূরা ইউনুসে হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথমে পূর্ণ কুরআনের সদৃশ আনার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, পরে দশটি সূরার সমতুল্য আনার আহ্বান করা হয়—পরিশেষে একটি সূরার চ্যালেঞ্জ করা হয়– সূরা 'বাকারাহ (আয়াত : ২৩), ও 'ইউনুস' (আয়াত : ৩৮) দ্রষ্টব্য। এভাবে ক্রমান্বয়ে ওদের অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ এমন সুস্পষ্ট প্রমাণের পরও যে ব্যক্তি কুরআনের উপর ঈমান আনে না অথবা এর বাতলানো পথে চলে না, বরং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন ও নশ্বর টিপটপকেই আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে সে মত চেষ্টা-তদবীর করে, আর বাহ্যত কোন নেক কাজ যেমন দান-খয়রাত

১৬. ওরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছু নেই[১] এবং যা কিছু ওরা দুনিয়াতে করেছে তা বরবাদ হবে এবং যে আমল ওরা করত তা নিষ্ফল হবে[২]।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

ইত্যাদি করলেও তার দ্বারা সে আখেরাতের কল্যাণ ও খোদার সন্তুষ্টি কামনা করে না, শুধু পার্থিব লাভালাভ হাসিল করাই লক্ষ্য থাকে —এমন লোকদের সম্বন্ধে –চাই ওরা ইহুদী হোক অথবা নাসারা, মুশরিক বা দুনিয়াপূজারী কপট মুসলমান– আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, দুনিয়াতেই ওদের হিসাব-কিতাব মিটিয়ে দেওয়া হবে। যেসব আমল ও চেষ্টা-তদবীর ওরা দুনিয়া লাভের জন্য করবে, সেই সবের ধরন ও পরিমাণ দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইলম ও হেকমত অনুযায়ী যতটুকু সংগত মনে করবেন এবং দিতে চাইবেন, তা এখানেই দিয়ে দেবেন।

কিছু হাদীস

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, কাফের ব্যক্তি যে দান-খয়রাত প্রভৃতি করে থাকে, এই নশ্বর ও বাহ্যিক সৎকর্মগুলির বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, মানমর্যাদা, রাজত্ব ইত্যাদি দান করে সমস্ত হিসাব চুকিয়ে দেন। মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনে এসবের কোন কিছুই ওর কাজে আসবে না। যে কাফেরের জন্য যে স্তরের শাস্তি ধার্য আছে, তা কিছুতেই টলার বা হ্রাস হওয়ার নয়– مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (যে কেউ দুনিয়া কামনা করে, আমি ওকে দুনিয়াতেই যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নগদ দিয়ে দেই। তারপর ওর জন্য জাহান্নাম স্থির করে রেখেছি। সে তাতে নিন্দিত- বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। –বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১৮)

রিয়াকার ও দুনিয়াপূজারী আলেম, দানশীল ও মুজাহিদ সম্বন্ধে হাদীসে এসেছে, হাশরের দিন তাদের বলা হবে, যে উদ্দেশ্যে তুমি ইলম শিক্ষা করেছিলে বা দান-খয়রাত ও জেহাদ করেছিলে, তা দুনিয়াতে হাসিল হয়ে গেছে। এখন আমার নিকট তোমার জন্য কিছু নেই। অতঃপর ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ হবে, ওকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। (আল্লাহ আমাদের বাঁচান।) (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫)

১. অর্থাৎ সেসব আমলের জন্য ওরা দোযখ ছাড়া আর কিছুর যোগ্য হবে না– কাফেররা চিরকালের জন্য এবং রিয়াকার (কপট) মুসলমান সীমিত কালের জন্য। হাঁ, খোদা তাআলা কোন কোন মুসলমানকে নিতান্ত স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে মাফ করে দিলে তা ভিন্ন ব্যাপার।

২. অর্থাৎ আখেরাতে পৌছার পর প্রকাশ পাবে যে, দুনিয়াতে ওরা যেসব কাজ পার্থিব উদ্দেশ্যে করেছিল তা বরবাদ হয়েছে আর কপটতা ও দুনিয়াপূজার ধারাবাহিকতায় বাহ্যত যেসব নেক কাজ করেছিল তাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে গেছে, সেখানে তা কোন কাজেই আসেনি।

১৭. আচ্ছা, যে ব্যক্তি তার রবের সুস্পষ্ট পথের উপর আছে* এবং তার সাথে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাক্ষী এবং এর পূর্বে (আরেক সাক্ষীরূপে) আছে মূসার কিতাব, যা পথপ্রদর্শক ও রহমত— (সে কি অন্যদের সমান হতে পারে?[১] নিশ্চয় না।) এমন

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তার রবের পক্ষ থেকে (আগত) সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম আছে...'

১. অর্থাৎ এ ব্যক্তি আর উল্লিখিত কপট দুনিয়াপূজারী ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? কখনই না।

بينة (পরিষ্কার পথ) বলতে সে পথ উদ্দেশ্য, যার উপর মানুষ নিজের জন্মগত আসল ও সঠিক স্বভাব অনুযায়ী চলতে চায়, যদি সে স্বীয় পরিবেশ,পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মন্দ ধেয়ান-ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে থাকে। আর সে পথ হচ্ছে ইসলাম, একত্ববাদ ও কুরআনের পথ। (এ পথের কথা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে)-(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা দীনের উপর অবিচল রাখ। আর অনুসরণ কর আল্লাহর সেই প্রকৃতির, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন– আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। –রোম, আয়াত ৩০) —এবং হাদীসে আছে- كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه (প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর অর্থাৎ স্বভাব-ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।) [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫]

شاهد– এর ব্যাখ্যা

আর شاهد منه (আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষী) হচ্ছে পবিত্র কুরআন। কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, স্বভাব-ধর্ম (অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলাম)-এর অনুসারী নিশ্চয়ই সঠিক পথে চলছে। আর এ কুরআন নিজেই নিজ সত্যতারও সাক্ষী। কবি সুন্দরই বলেছেন : آفتاب آمد دلیل آفتاب (সূর্যের সাক্ষী সূর্য নিজেই)। —কুরআনের আনয়নকারী (বা বাহক) যেহেতু হযরত জিবরাঈল আমীন এবং গ্রহণকারী (বা ধারক) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এ হিসাবে তাঁদেরও (شاهد) সাক্ষী বলা যেতে পারে। বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান তো এই যে, তাঁর স্বভাব-চরিত্র, অলৌকিক কাজকর্ম, বরকতময় কথাবার্তা, নূরানী চেহারা, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় এ সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে যে, যে দীনের বাহক তিনি তা সম্পূর্ণ সত্য।

পরের অংশ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً এর অর্থ এই যে, কুরআনের পূর্বে নবীগণের প্রতি যা কিছু ওহী নাযিল করা হয়েছিল, তাও 'দীনে ফিতরত' বা স্বভাব-ধর্মের সত্যতার সাক্ষী ছিল; বিশেষত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি যে মহামর্যাদাশালী কিতাব (তাওরাত) অবতীর্ণ হয়েছিল, তাকে এমন লোকদের সত্যতার মহাগুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বলতে হবে, যারা পরিষ্কার পথে তথা দীনে ফিতরতের উপর চলে।

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑰

লোকেরাই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্য দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করবে, দোযখই ওর নির্ধারিত বাসস্থান[১]। অতএব তুমি তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থেকো না[২]। নিশ্চয় তা সত্য, তোমার রবের পক্ষ থেকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ⑱

১৮. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে[৩]? এমন লোকদের আপন রবের মুখোমুখি করা হবে এবং সাক্ষ্যদাতারা বলবে, 'এরাই তারা, যারা আপন রবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল[৪]। শুনে রাখ! জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত'–

---

১. অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক- যে কোন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বী এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য– যে কোন দেশের অধিবাসী হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনকে না মানবে, ততক্ষণ মুক্তি পেতে পারে না, যেমন সহীহ মুসলিম (হাদীস, ১৫৩) প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থের কতিপয় হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্টতা ও ব্যাপকতার সাথে বর্ণনা করেছেন।

২. এ সম্বোধন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে কুরআন শোনে বা পড়ে। অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে অন্যদের এ কথা শোনানো উদ্দেশ্য যে, কুরআনের সত্যতা ও তা যে من الله (আল্লাহর পক্ষ থেকে)– এতে সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই। যারা মানে না, তারা হয় নির্বোধ, নয় তো অবাধ্য।

৩. অর্থাৎ কুরআন মিথ্যা ও মনগড়া নয়। এ খোদার সত্য বাণী, যা গ্রহণ করা জরুরী। ভাল করে বুঝে নাও, সে ব্যক্তি থেকে বড় জালেম কেউ হতে পারে না, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। যেমন: তাঁর কালাম নয় এমন কথাকে তাঁর কালাম বলে। অথবা আসলেই তাঁর কালাম এবং তিনি বারবার বলছেন, এ আমার কালাম, কিন্তু সে অস্বীকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, এ তাঁর কালাম নয়।

৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন সর্বসমক্ষে ওদের উপস্থিত করা হবে এবং ওদের দুষ্কর্মের দফতর খোলা হবে, তখন সাক্ষ্যদানকারীরা (নবী, ফেরেশতা ও সৎলোকেরা, বরং স্বয়ং ওদের হাত-পা) বলবে, এরাই সেই হতভাগ্য জালেম, যারা নিজেদের প্রভু সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল।

১৯. যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে, আর ওরাই আখেরাতে অবিশ্বাসী[১]।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٩

২০. ওরা পৃথিবীতে (কোথাও লুকিয়ে আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং ওদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারীও নেই[২]। ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে[৩]। ওরা শোনারও সামর্থ্য রাখত না এবং দেখতও না[৪]।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۝٢٠

২১. ওরাই তারা, যারা নিজেদের চরম ক্ষতি করেছে; আর ওরা যে মিথ্যা রচনা করত তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে[৫]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢١

---

১. এ আল্লাহ তাআলার উক্তি। অর্থাৎ, যারা অন্যায়ভাবে খোদার কালামকে মিথ্যা বলে এবং বড় কথা হচ্ছে আখেরাত অস্বীকার করে, অন্যদের আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং এই চেষ্টায় থাকে যে, কী করে সোজা পথকে বক্র প্রমানণিত করা যায়— এমন জালেমদের উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অভিশাপ রয়েছে।

২. অর্থাৎ প্রশস্ত পৃথিবীতে কোথাও পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ থেকে আত্মগোপন করতে পারবে না এবং এমন কোন সাহায্যকারী ও সহায়তাকারীও পাবে না, যে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

৩. কেননা, ওরা নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে, অন্যদেরও গোমরাহ করেছে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন অন্ধ ও বধির ছিল যে, সত্য কথা শোনার সামর্থ্য ছিল না, খোদার নিদর্শনাদিও লক্ষ করত না, যা দেখে সত্য পথ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এর এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ সম্বন্ধে ওরা মিথ্যা বলল এবং তাঁর প্রতি ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা আরোপ করল। এসব ওরা কোথা থেকে আনল? ওরা তো গায়ব থেকে শুনতেও পারত না, গায়ব দেখতেও পেত না। তাহলে এ সবের উৎস কী?

৫. 'চরম ক্ষতি' এ-ই যে, চিরকালীন আযাবে ফেঁসে গেছে এবং সেখানে পৌছার পর ওদের সকল মিথ্যা দাবি উধাও হয়ে গেছে।

২২. এতে সন্দেহ নেই যে, ওরাই আখেরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

২৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং আপন রবের সামনে অনুনয়-বিনয় করেছে, নিশ্চয় তারা জান্নাতবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৪. উক্ত দু'টি দলের দৃষ্টান্ত এমন; যেমন (একজন তো) অন্ধ ও বধির এবং (অপর জন) দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন। এই উভয়ের অবস্থা কি সমান? এর পরও কি তোমরা চিন্তা করবে না☆[২]?

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

[রুকূ - ৩]

২৫. আমি তো নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। (তিনি বললেন)– নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এ মর্মে সুস্পষ্ট সতর্ককারী[৩]–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۡ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

---

১. কাফেরদের মন্দ পরিণতির বিপরীতে মুমিনদের শুভ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তাদের বিনয় আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে নিজ সন্তুষ্টির স্থান (জান্নাত) দান করবেন।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

২. অর্থাৎ কাফেররা তো হচ্ছে অন্ধ ও বধির, যেমন: ২০ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে– مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (ওরা শোনারও সামর্থ্য রাখত না এবং দেখতও না!)। অতএব যারা নিজেরাও দেখে না, অন্যরা শোনালেও শোনে না, তাদের সূচনা ও পরিণতি কী করে সে সকল অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ঈমানদারের মত হতে পারে, যারা অন্তরদৃষ্টির আলোকে হক ও বাতিল এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন এবং নিজেদের পথপ্রদর্শনকারীদের কথা মনোযোগের সাথে শুনে থাকেন। চিন্তা করে দেখ, এ উভয় দলের পরিণতি কি এক রকম হতে পারে?

এ বিষয়েরই সমর্থনে সামনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমের কাহিনী বয়ান করা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ আমি অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে সেসব বিষয় জানিয়ে দিচ্ছি, যা করলে ধ্বংসাত্মক আযাব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং সেসব বিষয়ও বলে দিচ্ছি, যা সেই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

أَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না[১]। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যাতনাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় করি[২]।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানেরা বলল, 'আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি এবং আমরা এও দেখছি যে, আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নীচ-হীন, তারাই তোমার অনুগত হচ্ছে– গভীর চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। আর আমরা আমাদের উপরে তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না, বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি'[৩]।

---

১. অর্থাৎ 'ওয়াদ্', 'সুওয়া', 'ইয়াগূছ', 'নাস্র'–এর উপাসনা করো না। সূরা 'নূহ'-এ এদের আলোচনা আসবে। (২৩নং আয়াত দ্রষ্টব্য।)

২. অর্থাৎ গাইরুল্লাহর উপাসনা থেকে বিরত না হলে কঠোর আযাব আসার ভয় রয়েছে। 'যন্ত্রণাদায়ক দিন' বলতে সেই দিন উদ্দেশ্য, যেদিন কষ্টদায়ক আযাব নেমে আসবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন; অথবা সেদিন, যেদিন নূহ (আ)-এর কওমকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ জাতির অন্য সকলের তুলনায় রাসূলের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি যে, তুমি আমাদেরই মত মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। তুমি আসমানের ফেরেশতা নও যে, তোমার সামনে মানুষের মাথা অবনত হয়ে যাবে। তারপর মানুষও এমন নও যে, আমাদের উপর তোমার কোন বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে– তুমি না বিরাট সম্পদশালী, না প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্যের অধিকারী । অধিকন্তু যারা তোমার অনুসারী হয়েছে, তারাও মাশাআল্লাহ সকলেই গরীব, দীন-হীন ও নিম্নস্তরের মানুষ, যাদের সাথে বসাও আমাদের ন্যায় অভিজাত লোকদের জন্য লজ্জা ও সংকোচের কারণ। তবে কি আল্লাহর বিশাল রাজ্যে একমাত্র তোমাকেই পাওয়া গেল, যাকে তিনি নিজ নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? যদি কাউকে এমন দায়িত্ব দিতেই হত, তোমার চেয়ে বেশি বংশ-গৌরব থাকা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচন করা হল না কেন?

কমপক্ষে তোমার অনুসারীরাও যদি কোনো সম্মানিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোক হত (তবুও একটা কথা ছিল)। আচ্ছা, এই মুচি, নাপিতরা তোমার অনুসারী হয়ে যাওয়ায় তোমার জন্য এতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের কী আছে? এবং কী করে এটা তোমার সত্যতার প্রমাণ হতে পারে? এহেন অধম লোকেরা, যাদের দীনতা ও হীনতা দিবালোকের মত স্পষ্ট, যদি না বুঝে-সুঝে ও চিন্তা-ভাবনা না করে ভাসাভাসাভাবে ঈমান এনেও ফেলে, তাতে তোমার

২৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! দেখ তো, আমি যদি আমার রবের সুস্পষ্ট পথের উপর থেকে থাকি* এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে (বিশেষ) রহমত দান করে থাকেন, কিন্তু তা তোমাদের থেকে গোপন রাখা হয়ে থাকে– তবে আমি কি তার জন্য তোমাদের বাধ্য করতে পারি, অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর[১]?

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝

২৯. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট এর বিনিময়ে কোন ধন-সম্পদ চাই

وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

গৌরবেরই বা কী আছে? —বরং আমাদের ধারণা তো এই যে, তুমি ও তোমার সঙ্গী-সাথীরা সকলেই মিথ্যাবাদী। তুমি একটি কথা বানিয়েছ, আর কতিপয় নির্বোধ তা গ্রহণ করে নিয়েছে, যাতে এভাবে একটি নতুন আন্দোলন গড়ে তুলে সমাজে কোন বিশেষত্ব ও প্রাধান্য লাভ করতে পার।

এ ছিল কওমে নূহ এর অভিশপ্ত লোকদের বক্তব্যের সারাসার। এর উত্তরে নূহ আলাইহিস সালাম যা বলেছিলেন, তা সামনে আসছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে (আগত) সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থেকে থাকি...'

১. অর্থাৎ এ কথা সত্য যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় পয়গম্বরদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হতে হবে। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য ধন-দৌলত, রাজত্ব-হুকুমত ও পার্থিব টিপটপের মধ্যে নিহিত নয়, বরং তাঁদের স্বাতন্ত্র্য হাসিল হয় উন্নত স্বভাব-চরিত্র, উত্তম গুণাবলি, তাক্ওয়া, খোদাভীতি, সত্যের অনুসরণ, সৃষ্টির প্রতি মমতাবোধ এবং সেইসব সমুজ্জ্বল নিদর্শন উপস্থাপনের দ্বারা, যা আল্লাহ তাআলা দলীল-প্রমাণ সম্পূর্ণ করতে ও নে'য়ামতরাশি পরিপূর্ণ করণার্থে তাঁদের দান করেন অথবা তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁরা আল্লাহর ওহী এবং আল্লাহ-প্রদত্ত প্রমাণাদি ও নিদর্শনাদির আলোকে পরিষ্কার পথে চলেন। আর দিনরাত তাঁদের উপর খোদার খাস রহমত ও অনুগ্রহ-বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে।

(انلزمكموها...) নূহ আলাইহিস সালাম আরো বললেন, যদি এসব গুণ আমার মধ্যে উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান থাকে, আর নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু অন্ধ যেমন সূর্যের আলো দেখতে পায় না, তোমাদের চোখও তদ্রূপ আল্লাহর আলো দেখতে অক্ষম হয়– তাহলে আমি কি জোরপূর্বক তোমাদের থেকে সেই আলো ও রহমতের স্বীকারোক্তি নিতে পারি? অথচ তার প্রতি তোমাদের এতই ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি যে, চোখ খুলে তা দেখতেও তোমাদের কাছে অসহনীয়। মোটকথা, আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব যে তোমরা দেখতে পাও না তার কারণ, তোমাদের অন্তরের চোখগুলি অন্ধ বা বন্ধ রয়েছে।

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

না, আমার প্রতিদান তো শুধু আল্লাহর যিম্মায়। আর আমি ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে[১]। কিন্তু আমি তো দেখছি, তোমরা অজ্ঞ সম্প্রদায়[২]।

وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ

৩০. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে কে রক্ষা করবে, যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দেই? তোমরা কি

---

১. অর্থাৎ আমি তবলিগের কাজের কোন বেতন তোমাদের নিকট চাই না, যাতে আর্থিক স্বার্থপরতার সন্দেহ হতে পারে। আমি স্বীয় রবের চাকর, তাঁরই নিকট মজুরী পাব। আল্লাহর শোকর, তোমাদের ধন-সম্পদ আমি চাই না, দরকারও নেই। সুতরাং আমি গরীবদের ছেড়ে ধনীদের দিকে ঝুঁকব কেন? তোমরা যদি শুধু দরিদ্র বা পেশার কারণে আমার অনুসারীদের হীন ও হেয় মনে কর, তবে উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, ঈমানের ধনে ধনী ব্যক্তিদেরকে শুধু বাহ্যিক দুরবস্থার কারণে নিজের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো লোক আমি নই। তাদের একদিন নিজেদের প্রভুর সম্মুখীন হতে হবে, আমি এরূপ করলে তারা তাঁর দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে যে, আপনার পয়গম্বর অহংকারী দুনিয়াদারদের খাতিরে আমাদের মত গরীব অনুগতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আর আমি প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীতে এ সন্দেহ কেন করব যে, তাদের ঈমান শুধু বাহ্যিক ও ভাসাভাসা? অন্তর ফেড়ে দেখা তো আমার কাজ নয়। তাদের অন্তরের অবস্থা কী, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এ আমার বিষয় নয়। আমি তো বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ীই আচরণ করতে বাধ্য।

২. অর্থাৎ মূর্খতা ও বোকামিহেতু তোমরা পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করছ না। শুধু বাহ্যিক দুরবস্থা ও দারিদ্র দেখে তাদের হেয় জ্ঞান করছ এবং আবদার করছ যে, তাদের তাড়িয়ে দিলে তোমরা আমার কাছে আসবে। দারিদ্র্য ও (শ্রম দিয়ে) হালাল উপার্জন কি কোন দোষের বিষয়? এ (দারিদ্র) তো বরং সেই বস্তু, যা সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয় না। সাধারণত ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বাধা দিয়ে রাখে। এ জন্যই রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস সম্পর্কিত হাদীসে এসেছে, নবীদের অনুসারী সাধারণত দুর্বলরাই হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭)

যা হোক। তোমরা জান না যে, সকলকে আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরে যেতে হবে, সেখানে পৌছার পর প্রকাশ পাবে যে, এই দরিদ্র মুমিনদের চেয়ে নিজেদের শ্রেয় মনে করা মূলত তোমাদের মূর্খতাজনিত অহংকার ছিল।

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

চিন্তা-ভাবনা কর না[১]?

وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ إِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ أَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۖ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّيْٓ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩১. 'আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে। এবং আমি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানও রাখি না। আমি এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। এবং যারা তোমাদের চোখে নীচ-হীন তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ কখনই তাদের কল্যাণ দান করবেন না। আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, তাদের অন্তরে কী আছে। এরূপ বললে আমি নিশ্চয় জালেমদের মধ্যে গণ্য হব[২]।'

---

১. অর্থাৎ আমি তোমাদের দম্ভ ও অহংকার এবং মূর্খতায় প্রভাবিত হয়ে নিজের ক্ষতি কেমন করে করি? তোমাদের খাতিরে আমি যদি খোদার খাঁটি বান্দাদের তাড়িয়ে দিই, তবে তাঁর শাস্তি ও পাকড়াও থেকে আমাকে কে রক্ষা করতে পারবে?

২. কাফেররা নূহ আলাইহিস সালামকে বলেছিল, তুমি আমাদেরই মত মানুষ। দলবল ও ধন-সম্পদের দিক থেকে তোমার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। এরই উত্তরে তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও ইনসাফের সাথে বলছেন যে—

তোমরা যেরূপ স্বাতন্ত্র্য আমার মধ্যে দেখতে চাও আমি তার দাবি অবশ্যই করি না, আমি নিঃসন্দেহে একজন মানুষ, ফেরেশতা নই। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল ভাণ্ডারও আমার অধিকার ও এখতিয়ারে দিয়ে দেননি। আর গায়বের সব বিষয়ও আমাকে জানানো হয়নি। —কিন্তু এসব বিষয় স্বীকার করলেও আমি তোমাদের মত এ কথা কখনো বলব না যে, যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হীন (অর্থাৎ আমি ও আমার সঙ্গীরা), তাদের আল্লাহ তাআলা কিছুতেই কোন কল্যাণ দান করতে পারেন না। যেমন: তাদের কাউকে নবুওয়াত দিয়ে দেওয়া এবং অবশিষ্টদের ঈমান ও 'মারেফত' (খোদা-পরিচিতি) এর দৌলত দান করা।

খুব ভাল করে বুঝে নাও, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের যোগ্যতা ও অবস্থা সম্যকরূপে জানেন, আর তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে তাকে কল্যাণ দেন এবং বাতেনী হাল ও কাইফিয়ত অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করে থাকেন। আমি যদি এ কথা বলি যে, তোমাদের কাছে যারা অসহায় ও হীন, অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলাও তাদের কোন মর্যাদা ও সম্মান দান করেননি—তবে এ বড়ই নীতিহীন ও অন্যায় কথা হবে।

এই আয়াতের প্রথম তিনটি বাক্য সূরা 'আনআমে' (আয়াত : ৫০) গত হয়েছে, সেখানকার ব্যাখ্যাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৩২. ওরা বলল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করেছ এবং অনেক বিতর্ক করেছ। অতএব তুমি আমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা করছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদী হও'[১]।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٣٢

৩৩. তিনি বললেন, 'তা তো তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা (পালিয়ে গিয়ে তাঁকে) অক্ষম করতে পারবে না[২]।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٣٣

৩৪. 'আর আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকেন। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'[৩]।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٣٤ؕ

---

১. হযরত নূহ (আ) মহাপ্লাবনের পূর্বে সাড়ে নয়শত বছর ওদের মাঝে থেকে দিনরাত প্রকাশ্যে ও গোপনে নসীহত করতে থাকেন এবং ওদের সংশয়-সন্দেহের জওয়াব দিতে থাকেন। দীনের দাওয়াত ও তবলিগ এবং এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্কের ধারা অব্যাহত রাখেন। এভাবেই শত শত বছর কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত কাফেররা তাঁর সত্যনির্ভর বক্তব্য ও দিনরাতের আদেশ-নিষেধের সামনে অক্ষম হয়ে বলল, এখন এ ধারা বন্ধ কর। যদি তুমি সত্য হয়ে থাক, তবে যে আযাবের ধমক দিয়ে চলেছ তা এখনি নিয়ে আস, যাতে প্রতিদিনকার ঝগড়া চুকে যায়।

২. অর্থাৎ এ জিনিস আমার হাতে নয়। আল্লাহ তাআলা যখন স্বীয় হেকমত অনুযায়ী ইচ্ছা করবেন, তখন আযাব নাযিল করবেন। আমার দায়িত্ব শুধু অবহিত করে দেওয়া।

আর আযাব তো এমন ভয়াবহ ও গুরুতর ব্যাপার, যা নাযিল করা বা হটিয়ে দেওয়া উভয়ই মানবশক্তির সীমাবহির্ভূত। যখন আল্লাহর তা নাযিল করার ইচ্ছা হবে, তখন আর পালিয়ে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। এমন কে আছে, যে আল্লাহকে (নাউযুবিল্লাহ) ক্লান্ত ও অক্ষম করে দিতে পারে?

৩. অর্থাৎ কুফরের উপর এত জিদ ও হঠকারিতা এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে আযাব অবতরণের দাবি থেকে বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা এ-ই যে, তিনি তোমাদের গোমরাহীতেই পতিত থাকতে দেবেন এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। সুতরাং তোমাদেরই দুষ্কর্মের

৩৫. ওরা কি বলে, 'তিনি কুরআন রচনা করেছেন?' আপনি বলে দিন[১], 'যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধের (অনিষ্ট) আমারই উপর বর্তাবে, আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত[২]।'

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ اِنِ افۡتَرَیۡتُهٗ فَعَلَیَّ اِجۡرَامِیۡ وَ اَنَا بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تُجۡرِمُوۡنَ ﴿۳۵﴾

কারণে আল্লাহ যদি তা-ই চান, তবে আমি যতই নসীহত করে তোমাদের উপকার করতে চাই না কেন, তা মোটেই লাভজনক ও কার্যকর হবে না। —আর তোমাদের প্রভু তিনিই, যাঁর মালিকানা ও ক্ষমতাধীনে সকল কিছু। যার সঙ্গে যেরূপ আচরণ তিনি করেন, কেউই বাধা দিতে পারে না। সকলকে তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই সকলের আমলের পুরস্কারদাতা ও শাস্তিদাতা।

এই আয়াতগুলির সাথে সামনের আয়াতের যোগসূত্র

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ:) এর কওমের যতগুলো প্রশ্ন ও আপত্তির উল্লেখ হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্প্রদায়ের এই একই প্রশ্ন ও আপত্তি ছিল। সুতরাং এখানে উল্লেখিত উত্তরগুলি পরোক্ষভাবে মক্কার মুশরিকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে এদের একটা নতুন দাবি ছিল, যা সামনে কওমে নূহ (আ:) এর ঘটনার মাঝেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. এ কথোপকথন মক্কার কাফের ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার। ওরা বলত, কুরআন আপনি নিজে রচনা করেছেন, এ খোদার কালাম নয়। হযরত নূহ (আ) তো কোন কিতাব নিয়ে আসেননি যে, তাঁর কওম তাঁকে এ কথা বলবে। ('মূযেহুল কুরআন')

কিন্তু কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতকেও নূহ (আ) এর ঘটনার অংশ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর জাতি বলল, নূহ যেসব কথা খোদার নামে পেশ করছেন, তা স্বয়ং তাঁরই রচিত। —আর কেউ কেউ বলেছেন যে, কথোপকথন তো হুযূরের সঙ্গে মক্কাবাসীরই, কিন্তু এর সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে নূহ (আ) এর ঘটনার সাথে। অর্থাৎ ওরা বলত, (হযরত নূহ আ. সম্বন্ধে) এ কথাগুলো আপনি মিথ্যা বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

২. কুরআনকে বানানো বা স্বরচিত বলার তাত্ত্বিক উত্তর এ সূরাতেই এক রুকূ পূর্বে (আয়াত :১২) দেওয়া হয়েছে। এখানে এ বিষয়ের সর্বশেষ কথা বলা হয়েছে– অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর কালাম, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও পরিপক্ক দলীল-প্রমাণের দ্বারা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এমন সমুজ্জ্বল বিষয়কে মিথ্যা বলে তোমরা যে পাপ করছ, তার শাস্তি তোমাদের উপরই বর্তাবে, তার চিন্তা কর। আমি যথেষ্ট তবলিগ করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন যেসব অপরাধ তোমরা করবে, তার জন্য আমি দায়ী নই। হাঁ, অসম্ভব হলেও যদি ধরা হয় যে, আমি তা রচনা করেছি, তবে এর গোনাহ আমার উপর বর্তাবে। কিন্তু আল্লাহর শোকর, এমনটা আদৌ হয়নি।

[রুকূ - ৪]

৩৬. নূহ (আ)-এর নিকট ওহী পাঠানো হল যে, যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং ওরা যা কিছু করছে, তার জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না[১]।

وَاُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝

৩৭. আর তুমি আমার দৃষ্টি ও হেফাজতে থেকে এবং আমার নির্দেশক্রমে নৌযান তৈরি কর, আর জালেমদের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলো না। নিশ্চয় ওরা নিমজ্জিত হবে[২]।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

---

১. যখন স্বজাতির নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শত শত বছর ধরে জুলুম-অত্যাচার ভোগ করার পর আল্লাহর সমীপে তিনি ফরিয়াদ করলেন- أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (আমি পরাভূত ও দুর্বল, আপনি ওদের থেকে প্রতিশোধ নিন)। [সূরা ক্বামার : ১০]

তখন এরশাদ হল, যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যে ঈমান আনার ছিল, তারা এনেছে। ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব আপনি এদের শত্রুতা ও অস্বীকার এবং অত্যাচারের কারণে বেশি দুঃখিত হবেন না। শীঘ্রই খোদার প্রতিশোধের তরবারি কোষমুক্ত হচ্ছে, তা সব দুরাচার ও দুষ্কৃতিকারীর কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি করে দেবে।

২. আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে বললেন, একটি নৌকা আমার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান, আমার হুকুম, তালীম ও এলহাম অনুযায়ী তৈরি করুন। কেননা, অতি সত্বর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্লাবন আসছে, যার মাধ্যমে এসব জালেম ও অস্বীকারকারীকে ডুবিয়ে মারা হবে। এদের ব্যাপারে এ ফয়সালা এখন বাস্তবায়িত হবেই হবে। আপনি কোন জালেমের জন্য সুপারিশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে কোন কথা বলবেন না। আসন্ন আযাব একেবারে অটল।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন লূৎ (আ)-এর কওমের পক্ষে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁকেও এ রকমেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল- يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (হে ইবরাহীম! এ খেয়াল ত্যাগ করুন। আপনার রবের হুকুম তো এসেই গেছে এবং ওদের উপর অনিবার্য আযাব আসছে। –সূরা হূদ আয়াত ৭৬)

৩৮. তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন[১]। আর যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, তাঁর সাথে উপহাস করত[২]। তিনি বলতেন, 'যদি তোমরা আমাদের উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করছি যেমন তোমরা উপহাস করছ[৩]।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. 'শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে—কার উপর আসে এমন আযাব, যা ওকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার উপর আপতিত হয় স্থায়ী আযাব[৪]।'

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۳۹﴾

---

১. কথিত আছে, নূহ (আ) বহু বছরে এ নৌকা তৈরি করলেন। নৌকা তো নয়, বিরাট জাহাজ। তার মধ্যে পৃথক পৃথক স্তর ছিল।—মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় বহু অতিরঞ্জিত এবং অদ্ভুত ও আজগুবি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যার অধিকাংশই ইসরাঈলী।

২. ওরা হাসিঠাট্টা করে বলত, দেখ! তিনি পয়গম্বর থেকে একেবারে কাঠমিস্ত্রী হয়ে গেলেন! কখনো বা এই আশ্চর্যকর বস্তু দর্শনে নূহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করত, এ কী বানাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বলতেন, একটি ঘর বানাচ্ছি, যা পানির উপর চলবে এবং ডুবে যাওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করবে। এ কথা শুনে ওরা উপহাস করে বলত, শুকনা যমীনে ডুবে মরা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করছে!!!

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ওরা এজন্য হাসিঠাট্টা করত যে, শুকনা যমীনে ডুবে মরা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করছে! আর তিনি এ কারণে হাসতেন যে, মৃত্যু ওদের মাথার উপর খাড়া, আর ওরা কিনা হাসিঠাট্টা করছে।'

এ তাফসীর মতেই বিজ্ঞ মুতারজিম (র) نسخر এর তরজমা বর্তমান কাল দ্বারা করেছেন। আর ইবনে কাছীর প্রমুখ نسخر منكم আয়াতাংশে ভবিষ্যৎকালের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তোমরা আমাদের বোকা বানিয়ে ঠাট্টা করছ, কিন্তু সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন তোমরা নিজেদের অন্যায়-অপরাধের ফলে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আর আমরা তোমাদের বোকামি ও মূর্খতার জন্য হাসিঠাট্টার সুযোগ পাব।

৪. অর্থাৎ এখন আর বেশি দেরি নেই। শীঘ্রই প্রকাশ পেয়ে যাবে যে, দুনিয়ার অপমানকর শাস্তি ও আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব কার উপর পতিত হয়।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ এসে গেল এবং 'তন্নুর' উথলে উঠল[১], তখন বললাম, 'নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক প্রকার পশু থেকে এক জোড়া তথা দুটি[২] এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তবে তারা ছাড়া যাদের ব্যাপারে একটি কথা পূর্বেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে[৩], এবং

১. অর্থাৎ নূহ আলাইহিস সালাম নৌকা তৈরি করতে থাকেন। অবশেষে ওয়াদানুযায়ী খোদার হুকুম এসে পড়ল— মেঘমালার প্রতি এই যে, বৃষ্টি বর্ষিত হোক; ভূমির প্রতি এই যে, পানি উথলে উঠুক এবং ফেরেশতাদের প্রতি এই যে, শাস্তিপ্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন কর। সে মত উপর থেকে বৃষ্টি এল, আর মাটির সমতল ভেদ করে ঝরনাধারার মত টগবগ করে পানি উথলে উঠতে লাগল। এমন কি, রান্নার যে চুলা আগুনে ভর্তি থাকে, তা থেকেও পানি উথলে উঠল।

বি. দ্র. تنور (তন্নুর) এর অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রান্নার সাধারণ চুলাই উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, একটি তন্নুর (চুলা) হযরত হাওয়ার নিকট থেকে স্থানান্তরিত হতে হতে হযরত নূহ (আ)এর নিকট এসেছিল, তাকে প্লাবনের নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, যখন তা থেকে পানি উথলে উঠবে, তখনই নৌকায় আরোহণ করতে হবে। কারো মতে, কূফায় বা জাযীরায় একটি ঝরনাবিশেষের নাম ছিল তন্নুর। আবার কারো দাবি এই যে, 'তন্নুর' বলতে ভোরের দীপ্তি ও আলো বোঝায়– অর্থাৎ যখন ভোরের আলো খুব চমকাতে লাগল। আবু হায়্যান বলেন, فار التنور বাক্যটি আযাবের প্রকাশ ও ভীতির আধিক্য বোঝাতে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন حمي الوطين (চুলা গরম হয়ে গেছে) বাক্য রূপক অর্থে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বোঝায়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'তন্নুর' এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ।

আমরা উপরে وفار التنور এর যে তাফসীর করেছি, তাতে এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং অপর কিছু অর্থের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত) এ ব্যাখ্যা উল্লেখের পর বলেন- وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف (অধিকাংশ পূর্বমনীষী ও উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামের মত এটাই)। والله اعلم

২. অর্থাৎ যেসব জন্তুর প্রয়োজন রয়েছে এবং যাদের বংশ অবশিষ্ট থাকা সাব্যস্ত হয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে এক এক জোড়া (নর ও মাদী) নৌকায় তুলে নাও।

৩. অর্থাৎ এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, ওরা জালেমদের দলভুক্ত হওয়ার কারণে নিমজ্জিত হবে- وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (আর জালেমদের পক্ষে আমার সঙ্গে কথা বলো না। এরা নিশ্চয় নিমজ্জিত হবে।) এ দ্বারা উদ্দেশ্য নূহ (আ)-এর ছেলে '(يام যাম)', যার ডাকনাম ছিল কেন'আন, এবং কেন'আনের মা 'ওয়া-ইলা' (واعلة)। পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে এ দুজন পৃথক থাকে এবং ডুবে মরে।

وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ۝

সকল ঈমানদারদের। আর তাঁর সঙ্গে অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল[১]।'

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

৪১. আর নূহ (আ) বললেন, 'তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟ وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ۝

৪২. তা তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে বয়ে চলল। এবং নূহ (আ) নিজ পুত্রকে– আর সে (সকল থেকে) পৃথক ছিল– ডেকে বললেন, 'হে পুত্র! আমাদের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না[৩]।'

---

১. অর্থাৎ কমবেশি আশিজন মানুষ।

২. নূহ আলাইহিস সালাম নিজ সঙ্গীদের বললেন, খোদার নাম নিয়ে নৌকায় আরোহন কর। কোন চিন্তা করো না। এর চলা ও থামা সবই আল্লাহর অনুমতি ও হুকুম এবং তাঁর নামের বরকতে হবে, ডুবে যাওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই। আমার প্রভু মুমিনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাকারী ও তাঁদের প্রতি সীমাহীন মেহেরবান, তিনি নিজ দয়াগুণে আমাদের নিরাপদে অবতরণ করাবেন।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, নৌকা প্রভৃতিতে আরোহণ করার সময় بسم الله বলা উচিত।

৩. অর্থাৎ নৌকা পর্বতসম তরঙ্গমালা চিরে নির্ভয়ে ও নিরাপদে অগ্রসর হচ্ছিল। নৌকারোহণের পর নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র 'য়াম' (কেনআন) কে, যে স্বীয় বাপ-ভাই প্রমুখ সকল আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে কাফেরদের সাথে থেকে গিয়েছিল, ডেকে বললেন, এই হতভাগ্য কাফেরদের সঙ্গ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর, যাতে এ গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পার।

বি. দ্র. নূহ আলাইহিস সালাম মুমিন ধারণা করতেন বলে তাকে ডেকেছিলেন, যদিও বাস্তবে সে মুমিন ছিল না। অথবা কাফের জানা সত্ত্বেও এই আশায় ডাকলেন যে, এ ভয়ঙ্কর নিদর্শনাদি দেখে মুসলমান হয়ে যাবে। অথবা সম্ভবত وأهلك (আপনার পরিবার-পরিজন) –এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে পিতৃস্নেহের আবেগে তাকে ডেকেছেন এবং اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ কথাটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে ছেলেকে এর বহির্ভূত মনে করেছেন। والله اعلم

৪৩. সে বলল, 'আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে[১]।' তিনি বললেন, 'আজ আল্লাহর আযাব থেকে কোনই রক্ষাকারী নেই, তবে তিনি যার প্রতি দয়া করবেন (সে-ই রক্ষা পাবে)।' (এমন সময়) তাদের উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াল ঢেউ, ফলে সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল[২]।

قَالَ سَاٰوِیۡۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعۡصِمُنِیۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَیۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَکَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِیۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. আর নির্দেশ দেওয়া হল, 'হে ভূমি! তোমার পানি গিলে ফেল এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' আর পানি শুকিয়ে দেওয়া হল*, কার্য সম্পন্ন হল এবং নৌকা 'জূদী' পাহাড়ের উপর থামল। আর বলে দেওয়া হল, 'জালেম সম্প্রদায় (আল্লাহর রহমত থেকে) দূর হোক*[৩]।'

وَقِیۡلَ یٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِیۡ مَآءَكِ وَیٰسَمَآءُ اَقۡلِعِیۡ وَغِیۡضَ الۡمَآءُ وَقُضِیَ الۡاَمۡرُ وَاسۡتَوَتۡ عَلَی الۡجُوۡدِیِّ وَقِیۡلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۴۴﴾

---

১. সে নিজ মূর্খতা ও বোকামির ফলে তখনো ধারণা করছিল যে, মামুলি বন্যায় যেমন কোনো উঁচু স্থানে উঠে গিয়ে মানুষ আত্মরক্ষা করে, তদ্রূপ আমিও কোনো উঁচু পাহাড়ে উঠে জান বাঁচিয়ে নেব।

২. অর্থাৎ তুমি কোন্ ধোঁকায় আছ? এ মামুলি বন্যা নয়, বরং আল্লাহর শাস্তির মহাপ্লাবন। পাহাড়ের কী ক্ষমতা? আজ কোন কিছুই আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। হাঁ, খোদাই যদি কারো প্রতি দয়া করেন, সে বাঁচতে পারে। কিন্তু আযাবের এ সময়ে কট্টর অপরাধীদের প্রতি দয়া কিরূপে হতে পারে?—পিতাপুত্রের এ কথোপকথন সম্পূর্ণ হতে না হতেই পানির একটি ঢেউ মাঝখানে আড়াল হয়ে দাঁড়াল এবং সর্বদার জন্য উভয়কে পৃথক করে দিল।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'কমিয়ে দেওয়া হল'।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ধ্বংস হোক জালেম সম্প্রদায়'।

৩. কিছুকাল যাবৎ এত পানি বর্ষিত হল, যেন আকাশের মুখগুলি খুলে গেছে এবং পৃথিবীর আবরণগুলি ফেটে গেছে। ফলে গাছপালা ও পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেল। নৌকার আরোহীরা ছাড়া অন্য সকল মানুষ যখন পানিতে ডুবে গেল, যাদের (ধ্বংসের) জন্য নূহ আলাইহিস সালাম এ দো'য়া করেছিলেন- رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ('হে রব! আপনি পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটা গৃহবাসীকেও ছাড়বেন না।' –সূরা নূহ, আয়াত- ২৬) —তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে তার পানি গিলে ফেলতে ও মেঘমালাকে থেমে যেতে (অর্থাৎ বর্ষণ বন্ধ করতে) নির্দেশ দিলেন। সুতরাং পানি শুকিয়ে যেতে লাগল। আর

৪৫. এবং নূহ (আ) আপন রবকে ডাকলেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর আপনি সবার চেয়ে বড় বিচারক'।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ۝

৪৬. আল্লাহ বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তো অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেয়ো না, যার বিষয়ে তোমার জানা নেই। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি[১]।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ۝

নৌকা জূদী পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ল। পাহাড়টি কারো কারো মতে মাওসিল অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এবং যে কাজ আল্লাহ চেয়েছিলেন (অর্থাৎ পাপীদের শাস্তি দেওয়া), তা পূর্ণ হল। জালেমদের বলে দেওয়া হল, আল্লাহ তআলার রহমত থেকে দূর হয়ে চিরকালের জন্য মুসিবত ও ধ্বংস-গহ্বরে পড়ে থাক।

প্লাবন কি দুনিয়াব্যাপী ছিল?

নূহের প্লাবন সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ছিল, না বিশেষ অঞ্চলসমূহে– এতে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ের মীমাংসা এখানে সম্ভব নয়। তবে প্রকাশ থাকে যে, دائرة المعارف গ্রন্থে কতিপয় ইউরোপীয় গবেষকের এমন বক্তব্য ও প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী প্লাবনেরই সমর্থন করে। যারা এমন প্লাবনের প্রবক্তা, তাদের অধিকাংশের মতে বর্তমান দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠী হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামেরই তিন পুত্র 'সাম', 'হাম' ও 'ইয়াফেছ'-এর বংশধর। কুরআনেও এরশাদ হয়েছে : وجعلنا ذريته هم الباقين আমি তাঁর বংশধরদেরই দুনিয়াতে অবশিষ্ট রেখেছি। (সাফ্ফাত : ৭৭)

সংশয় নিরসন

এই প্লাবনে যেসব শিশু ও পশু ধ্বংস হয়েছিল, তাদের ধ্বংস শাস্তি হিসাবে ছিল না, বরং আল্লাহ তাআলা অন্যান্য স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে যেরূপ তাদের মৃত্যু সংঘটিত করে থাকেন এবং তা জুলুম বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ এক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও এ উপায়ে সংঘটিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখনো যেসব প্লাবন ও ঝড়-তুফান আসে, তাতে জীব-জন্তু ও শিশু-সন্তান মারা পড়ে।

১. নূহ আলাইহিস সালাম এই প্রার্থনা কখন করেছিলেন– কেন'আন ডুবে মরার পূর্বে না পরে? উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপ, তিনি কেনআনের মুনাফিকী চাল-চলনের কারণে ধোঁকা খেয়ে তাকে মুমিন মনে করছিলেন, না কাফের জানা সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে এ দো'য়া করলেন? উভয় সম্ভাবনাই আছে।

যদি মুমিন মনে করে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা করে থাকেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার নিকট দরখাস্ত করে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।—আর যদি নিমজ্জিত হওয়ার পরে এই দোয়া করে থাকেন, তবে এর অর্থ হল, শুধু বিষয়টির আসল তাৎপর্য জানার উদ্দেশ্যে নিজের দ্বিধা বা সংশয় পেশ করা। অর্থাৎ আয় আল্লাহ! আপনি আমার পরিবারের লোকদের রক্ষা করার ওয়াদা করেছিলেন, আর কেনআন মুমিন হওয়ার কারণে বাহ্যত إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও তার ডুবে মরার রহস্য কী? আপনার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য, কারো মনে এ ধারণাও উদয় হতে পারে না যে, (আল্লাহর পানাহ!) আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি আহকামুল হাকেমীন ও বিশ্বজগতের প্রভু, বুঝে আসুক বা না আসুক, কারো অধিকার নেই আপনার বিচারের সামনে টু শব্দটি করা অথবা আপনাকে ওয়াদা ভঙ্গে বাধ্য করা। কারো এ শক্তিও নেই যে, আপনার অকাট্য ফয়সালা সম্পর্কে একটুও সমালোচনা করবে। একমাত্র মানসিক শান্তির খাতিরে এ ঘটনার (ছেলে ডুবে মরার) রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে চাই।

উত্তরে বলা হল—'সে তোমার এমন পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের রক্ষা করার ওয়াদা ছিল, বরং সে إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার আমল খারাপ। তার কুফর ও শিরক সম্বন্ধে তোমার খবর নেই। আশ্চর্যের বিষয়, কুফরের লক্ষণাদি থাকা সত্ত্বেও পয়গম্বরসুলভ ফেরাসাতের আলোর সামনে একটা কাফেরের অবস্থা অস্পষ্ট রইল! অতএব যার প্রকৃত অবস্থা তোমার জানা নেই, তার সম্বন্ধে আমার নিকট এমন অসংগত দরখাস্ত বা এমন ধরণের প্রশ্ন করো না। নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা না করে মূর্খদের ন্যায় কথা বলতে থাকা অশোভন।'

আয়াতের এই ব্যাখ্যা হবে যদি নূহ আলাইহিস সালাম কেনআনকে মুমিন মনে করে থাকেন।

আর যদি তাকে কাফেরই মনে করে থাকেন, তবে উক্ত দরখাস্ত বা প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, প্লাবন থেকে রক্ষার আলোচনায় নূহ (আ)-এর পরিবারবর্গকে সাধারণ মুমিনদের থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করায় তিনি মনে করে থাকবেন যে, তাঁর পরিবারের লোকদের পার্থিব আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত নয়, তাই পরিবারের সবাই এ থেকে রক্ষা পাবে, এমনকি যারা মুমিন নয় তারাও! অধিকন্তু إلا من سبق عليه القول কথাটি সংক্ষিপ্ত (অর্থাৎ তাতে নামের উল্লেখ না) থাকায় তিনি এর পাত্র নির্ধারণ করতে পারেননি। এ অবস্থায় নূহ (আ) পুত্রস্নেহের আতিশয্যে আরয করলেন, হে বিশ্বপ্রভু! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের রক্ষা করার ওয়াদা আপনি করেছেন। তবুও কেন একে নিমজ্জিত করা হচ্ছে বা নিমজ্জিত করা হল (তা বুঝে উঠতে পারি না।)

উত্তরে বলা হল, 'তোমার প্রথম ভূমিকাই (إن ابني من أهلي) ভুল। যে পরিবারবর্গকে রক্ষা করার ওয়াদা করা হয়েছে, তোমার পুত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তার ক্রিয়াকর্ম খুবই খারাপ। অধিকন্তু إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ এর পাত্র সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই যে, তারা কারা। সুতরাং যে বিষয়ের জ্ঞান তুমি রাখ না, সে বিষয়ে এমন প্রশ্ন বা দরখাস্ত করা তোমার পক্ষে শোভনীয় নয়।'

৪৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে এমন জিনিস চাওয়া থেকে, যার ব্যাপারে আমার জানা নেই[১]। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব[২]।'

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِکَ اَنۡ اَسۡـَٔلَکَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَکُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮. বলা হল, 'হে নূহ! অবতরণ কর- আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ও তোমার সঙ্গে যে দলগুলি আছে তাদের প্রতি নিরাপত্তা ও প্রভূত বরকতসহ। এবং আরো (কিছু) দল রয়েছে, যাদেরকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেব, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে ওদের যাতনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে[৩]।'

قِیۡلَ یٰنُوۡحُ اہۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَکٰتٍ عَلَیۡکَ وَ عَلٰۤی اُمَمٍ مِّمَّنۡ مَّعَکَ ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُہُمۡ ثُمَّ یَمَسُّہُمۡ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۴۸﴾

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মানুষ তা-ই জিজ্ঞাসা করে যা তার জানা নেই, তবে মর্যি বুঝে জিজ্ঞাসা করা উচিত। জিজ্ঞাসা করার মধ্যে মুরব্বির মর্যি আছে কি না, সেদিকে লক্ষ্য না করেই জিজ্ঞাসা করা মূর্খের কাজ।

(এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার) মর্যি কেন ছিল না, তা পূর্ববর্তী টীকায় আমরা বয়ান করেছি।

২. হযরত নূহ (আ) কেঁপে উঠলেন এবং তওবা করলেন। কিন্তু এ কথা বললেন না যে, 'আর এমন করব না'। কারণ, এতে দাবি করার মনোভাব প্রকাশ পায়। বান্দার কী শক্তি আছে? তার উচিত আল্লাহ তাআলারই আশ্রয় প্রার্থনা করা যে, আমার দ্বারা যেন এমনটি আর না হয় এবং অন্তরে না করার দৃঢ় সংকল্প রাখা। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও ইউনূস আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীগণের তওবার যে শব্দাবলি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তাতে এরূপ আদবই রক্ষিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ নৌকা থেকে 'জূদী' পাহাড়ের উপর, তারপর 'জূদী' থেকে ভূপৃষ্ঠের উপর অবতরণ কর। ভবিষ্যতে তোমাদের উপর ও সেই সম্প্রদায়সমূহের উপর বরকত ও নিরাপত্তা থাকবে, যারা তোমার বর্তমান সাথীদের ঔরসে জন্মলাভ করবে। আর বর্তমানে যে পৃথিবী প্লাবনে একেবারে উজাড় হয়ে গিয়েছে, তাকে আল্লাহ তাআলা পুনরায় আবাদ করে দেবেন এবং তার সৌন্দর্য ও বরকত আবার ফিরে আসবে।

(سلام) 'নিরাপত্তা' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেন এই সান্তনাবাণী শুনিয়ে দিলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো সমগ্র মানবগোষ্ঠীর উপর এরূপ ব্যাপক ধ্বংস আসবে না। তবে কোন কোন সম্প্রদায় ধ্বংস হবে। (এজন্যই শেষে বলা হয়েছে- وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ)

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৯. এগুলি গায়বের কিছু সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী মারফত পাঠাচ্ছি। এর পূর্বে এসব আপনিও জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও না[১]। সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয় (শুভ) পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য[২]।

[রুকূ - ৫]

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝

৫০. আর 'আদ' সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হূদকে (পাঠিয়েছিলাম)। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমরা তো (আল্লাহর প্রতি) মিথ্যারোপকারী[৩]।

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۗ

৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো তাঁর দায়িত্বে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন[৪]।

---

১. অর্থাৎ এ নবুওয়াতের একটি প্রমাণ যে, একজন উম্মী মানুষের মুখে পূর্ববর্তী উম্মতদের এমন প্রামাণ্য ও বিস্তৃত ঘটনাবলি শোনানো হচ্ছে।

২. নূহ (আ) ও তাঁর সাথীদের পরিণাম যেমন ভাল হয়েছিল, তদ্রূপ আপনার সঙ্গীদের ভবিষ্যতও অত্যন্ত সফল ও সমুজ্জ্বল। আপনি কাফেরদের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করুন, ঘাবড়ে গিয়ে সংকুচিত হবেন না। নূহ আলাইহিস সালামও তো সাড়ে নয় শ বছর ধৈর্য ধরেছিলেন।

৩. কেননা তোমরা বলছ যে, পাথরের মূর্তিও ক্ষমতাধারী অধিপতি, বরং উপাস্য।—সূরা আ'রাফে (আয়াত : ৬৫-৭২) হূদের কওমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার স্রষ্টাই সমস্ত পার্থিব প্রয়োজন ও পারলৌকিক পারিশ্রমিক ও প্রতিদানের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এ কথা (لااسألكم عليه اجرا) প্রত্যেক পয়গম্বর নিজ জাতিকে বলেছেন, যাতে (তাঁদের) নসীহত নিঃস্বার্থ ও কার্যকর হয় এবং মানুষ তাঁদের পরিশ্রমকে পার্থিব লালসাপ্রনোদিত মনে না করে।

তোমরা কি বোঝ না[১]?

أَفَلَا تَعْقِلُونَ۝

৫২. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর অভিমুখী হয়ে যাও☆[২]। তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে মুষলধারে (বৃষ্টি) বর্ষণ করবেন[৩] এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না[৪]।'

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ۝

৫৩. ওরা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর তোমার কথায় আমরা নিজেদের উপাস্যদের ছাড়তে পারি না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করার নই[৫]।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۝

১. অর্থাৎ তোমরা এতই বুদ্ধিহীন যে, একজন মানুষ নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ হয়ে নিতান্তই তোমাদের দরদী ও হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তোমাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের কথা বলেছেন, আর তোমরা তাঁকে শত্রু ও অনুপকারী ভেবে তাঁর প্রতি মারমুখো হচ্ছ।

২. এ সূরারই শুরুতে (আয়াত : ৩) এ বাক্যের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁর অভিমুখী থাক।'

৩. এ সম্প্রদায় ক্ষেত-খামার করতে ও বাগ-বাগিচা লাগাতে আনন্দ পেত। তাই ঈমান আনয়নের বাহ্যিক উপকার ও বরকতরূপে সেসব জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে, যা ওদের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ ছিল। কথিত আছে, তারা তিন বছর ধরে শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির বিপদে পতিত ছিল। এ অবস্থায় হূদ আলাইহিস সালাম ওয়াদা করলেন, ঈমান এনে আল্লাহ-অভিমুখী হলে এই মুসিবত কেটে যাবে।

৪. অর্থাৎ আর্থিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সন্তানসন্ততিতে বরকত দান করবেন, পার্থিব শক্তির সঙ্গে রূহানী ও ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। তবে এসব পাওয়ার শর্ত এই যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অপরাধীদের ন্যায় তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো যাবে না।

৫. এ কথা—'হে হূদ (আ), তুমি তোমার সত্যতার কোন সুস্পষ্ট সনদ ও দলীল পেশ করনি'— এ ছিল ওদের নিতান্তই হঠকারিতা। আল্লাহ তাআলা যাকে পয়গম্বরের মর্যাদায় ভূষিত করেন, তাঁকে তিনি অবশ্যই নিয়োগপত্র ও পরোয়ানা প্রদান করেন। এ জন্যই হাদীসে

৫৪. 'আমরা তো এ-ই বলি যে, 'আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অনিষ্টে আক্রান্ত করেছে[১]।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক, যাদের তোমরা শরীক কর–

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. 'আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না।

مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾

৫৬. 'আমি তো আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম, যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। (যমীনের বুকে) বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুঠিতে নয়। নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে (অর্থাৎ সরল পথে চললেই তাঁকে পাওয়া যায়)[২]।

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

আছে, যাকে নবীরূপে পাঠানো হয়েছে, তাঁর সঙ্গে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করা হয়েছে, যার প্রতি মানুষ ঈমান আনতে চাইলে আনতে পারে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭২৭৪) তাই নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় যে, হূদ (আ) নিদর্শন পেশ করেছিলেন, কিন্তু সেই লোকেরা হঠকারিতা ও নির্লজ্জতাহেতু বলছিল যে, তুমি কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আননি (সম্ভবত অর্থ এই যে, এমন নিদর্শন আননি, যা সকলের ঘাড় ধরে ঈমান আনতে বাধ্য করে)। যা হোক, শুধু তোমার কথায় আমরা নিজেদের উপাস্যদের বর্জন করতে পারি না এবং কখনো তোমার নবুওয়াতের প্রতি ঈমানও আনতে পারি না।

১. অর্থাৎ তুমি যে উলটা-পালটা কথাবার্তা বল এবং সারা দুনিয়াকে বেকুব বলে নিজের শত্রু বানাচ্ছ—এতে আমাদের ধারণা এই যে, আমাদের দেবতাদের কেউ তোমার উপর ভূত চাপিয়ে দিয়ে তোমাকে পাগল ও বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে। (আল্লাহর পানাহ!) তুমি তো তাদের উপাসনা থেকে মানুষকে বাধা দাও এবং মন্দচারি বল। কিন্তু এই অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ তারা তোমাকে এমন বানিয়ে দিয়েছে যে, তুমি এখন একেবারে পাগলদের ন্যায় কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ।

২. অর্থাৎ বেচারা পাথরের মূর্তিগুলো আমার কী ক্ষতি করতে পারবে? তোমাদের তো বিরাট বাহাদুর, শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী মনে হয়, কিন্তু তোমরা সকলে নিজেদের দেবদেবীর সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে এবং সমগ্র শক্তি নিয়ে একযোগে আমার মত নিঃসঙ্গ মানুষের উপর আক্রমণ করেও আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৭. 'এর পরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো তোমাদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। আর আমার রব তোমরা ভিন্ন অপর সম্প্রদায়কে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার রব প্রত্যেক জিনিসের হেফাজতকারী[১]।'

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾

(انى اشهد الله...) শুনে রাখ, আমি খোদাকে সাক্ষী বানিয়ে ঘোষণা করছি এবং তোমরাও সকলে সাক্ষী থাক যে, আমি তোমাদের মিথ্যা দেবদেবী থেকে অবশ্যই দায়মুক্ত, ওদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। তোমরা সকলে একত্র হয়ে আমার যা করতে পার কর, তাতে একটুও ক্রটি করো না এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।

(انى توكلت..) -আমার ভরসা একক ও লা-শরীক আল্লাহর উপর, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব ও মালিক, যদিও নির্বুদ্ধিতার কারণে তোমরা তা বুঝছ না।

(مامن دابة ...) শুধু আমি ও তোমরাই না, বরং পৃথিবীর উপর বিচরণশীল ছোট বড় প্রত্যেক বস্তুই একমাত্র তাঁরই মুঠিতে ও আয়ত্তাধীনে। বলতে গেলে, তাদের মাথার ঝুটি তাঁর মুঠিতে– যেদিকে ইচ্ছা ধরে টানতে ও ফেরাতে পারেন। কারো সাধ্য নেই, তাঁর ক্ষমতার মুঠি থেকে বের হয়ে পালিয়ে যাওয়া। জালেমরাও তাঁর পাকড়াও থেকে ছুটে যেতে পারে না। আর সত্যবাদীরাও তাঁর আশ্রয়ে থেকে অপদস্থ হতে পারে না।

(ان ربي على ...) আমার প্রভু নিঃসন্দেহে ন্যায় ও ইনসাফের সরল পথের উপর আছেন– তাঁর দরবারে জুলুমও নেই, অপাত্রে অযথা পুরস্কারও নেই। এবং তিনি আপন বান্দাদের নেকী ও কল্যাণের যে সরল পথ বাতলিয়েছেন, তার উপর চললে নিশ্চিতরূপে কল্যাণ লাভ হয় এবং সে পথের পথিকদের রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বদা সেখানে বিরাজমান।

১. অর্থাৎ এমন পরিষ্কার ও সহজ-সরল কথা শুনেও যদি না মান, তবে আমার কোনো ক্ষতি নেই। আমি তবলিগের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করেছি, তোমরা নিজেদের চিন্তা করে নাও। নিশ্চয়ই এরূপ হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার ফলে আসমান থেকে আযাব এসে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। তবে আল্লাহর যমীন তোমাদের ধ্বংসের কারণে বিরান হবে না, তিনি অন্য লোকদের তোমাদের ধন-সম্পদ ইত্যাদির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। মনে রেখো, তোমাদের ধ্বংস করে দিলে আল্লাহর বা তাঁর পয়গম্বরদের কোনই ক্ষতি হবে না, তাঁর রাজত্বও নষ্ট হবে না।

(ان ربي ... حفيظ) -যেহেতু তিনিই প্রত্যেক বস্তুর সংরক্ষক ও হেফাজতকারী, অতএব প্রত্যেক সংরক্ষণযোগ্য বস্তুর হেফাজতের ব্যবস্থা তিনি নিজ কামেল কুদরতের দ্বারা করবেন।

وَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّیۡنَا هُوۡدًا وَّالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّیۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ غَلِیۡظٍ ﴿۵۸﴾

৫৮. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি নিজ রহমতে হূদকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম। আর তাদের রক্ষা করলাম এক কঠোর শাস্তি থেকে[১]।

وَتِلۡكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ وَعَصَوۡا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوۡۤا اَمۡرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیۡدٍ ﴿۵۹﴾

৫৯. এই ছিল 'আদ সম্প্রদায়, যারা নিজেদের রবের আয়াতগুলি অস্বীকার করেছিল, তাঁর রাসূলদের অমান্য করেছিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত, (সত্যের) বিরুদ্ধাচারীর আদেশ মান্য করেছিল[২]।

وَاُتۡبِعُوۡا فِیۡ هٰذِهِ الدُّنۡیَا لَعۡنَةً وَّیَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ

৬০. ফলে এ দুনিয়ায় ওদের অনুগামী করে দেওয়া হয়েছে অভিশাপকে এবং কিয়ামতের দিনেও[৩]। শুনে রাখ! 'আদ সম্প্রদায় স্বীয়

---

১. অর্থাৎ সাত রাত আট দিন ধরে অনবরত সাইমুম ঝড় বইল, যেমন সূরা আরাফে (আয়াত :৭২) আমরা উল্লেখ করেছি। ফলে বাড়িঘর পড়ে গেল, ছাদসমূহ উড়ে গেল, গাছ-বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ল। বাতাস এমনি বিষাক্ত ছিল যে, মানুষের নাক দিয়ে প্রবেশ করে নীচ দিয়ে বের হয়ে যেত এবং শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলত।—এ ভয়ঙ্কর আযাব থেকে আল্লাহ তাআলা হূদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীসাথীকে, যাদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত চার হাজারে পৌঁছেছিল, সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে আখেরাতের কঠিন আযাব থেকেও তাদের মুক্তি দিলেন।

২. অর্থাৎ এদের ধ্বংসাবশেষগুলি শিক্ষাগ্রহণের দৃষ্টি দিয়ে দেখ এবং ভাব, এরা ছিল সেই আদজাতি, যাদের সরদাররা চরম ঔদ্ধত্যের সাথে নিজেদের পরওয়ারদেগারের বাণীর বিরোধিতা করল এবং তাঁর পয়গম্বরদের নাফরমানী করল। আর ছোটরা বড় শয়তানদের অনুসরণ করল। শেষপর্যন্ত সকলেই ধ্বংস ও বরবাদ হল।

বি. দ্র. رسله (তাঁর রাসূলদের) সম্ভবত এজন্য বলা হয়েছে যে, কোনও একজন রাসূলকে অস্বীকার করলে সকল রাসূলকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ, তাওহীদ প্রভৃতি দীনের মৌলিক বিষয়ে সকল পয়গম্বরই ঐক্যধারী ও একে অপরের সমর্থনকারী।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) দুনিয়াতে ওদের পিছনে এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যেখানেই ওরা যাক তা সাথে থাকবে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত যেখানেই ওদের আলোচনা হবে, লা'নতের সাথে হবে। এমনকি কিয়ামতের পরও লা'নত ওদের পিছু ছাড়বে না। লা'নতের গলগণ্ড চিরকাল ওদের গলায় জড়িয়ে থাকবে।

اَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُوۡدٍ ﴿۶۰﴾

রবকে অস্বীকার করেছিল। শুনে রাখ! হূদের সম্প্রদায় আ'দ এর প্রতি অভিশাপ*১।

[রুকূ - ৬]

وَاِلٰی ثَمُوۡدَ اَخَاهُمۡ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَیۡرُهٗ ؕ هُوَ اَنۡشَاَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَاسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیۡهَا فَاسۡتَغۡفِرُوۡهُ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ قَرِیۡبٌ مُّجِیۡبٌ ﴿۶۱﴾

৬১. আর ছামূদ সম্প্রদায়ের কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে[২]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ভূমি থেকে[৩] এবং তাতে তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর অভিমুখী হয়ে যাও*। নিশ্চয় আমার রব নিকটবর্তী, (প্রার্থনা) কবুলকারী[৪]।'

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ধ্বংস হোক হূদের সম্প্রদায় আদ'।

১. কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا الخ -এর সম্পর্ক কিয়ামত দিবসের সাথে। অর্থাৎ সেদিন আওয়াজ দিয়ে এ কথা বলা হবে।

বি. দ্র. 'আদ' এর সাথে 'হূদের কওম' শব্দ সম্ভবত এজন্য সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শ্রোতার মনে একইসাথে এই উভয় চিত্র ভেসে ওঠে যে, 'হূদ' (আ)-এর অবস্থা কী ছিল, আর তাঁরই সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ওদের পরিণাম কী হয়েছিল। অথবা এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, 'আদ' সম্প্রদায় ছিল দুটি– عاد اولى (প্রথম আ'দ) ও عاد اخرى (দ্বিতীয় আ'দ)। এ জন্যই অন্যত্র (সূরা নাজমের ৫০ নং আয়াতে) বলা হয়েছে- وأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًاالْأُوْلَى (আর তিনিই ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রথম আদ সম্প্রদায়কে।) আর এখানেও 'প্রথম আদ' উদ্দেশ্য, যাদের প্রতি হূদ (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। والله اعلم

২. এদের কাহিনী সূরা আ'রাফে (আয়াত :৭৩-৭৯) বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ প্রথমে আদম (আ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন, তারপর জমি থেকে খাদ্যসামগ্রী পয়দা করলেন। এই খাদ্যদ্রব্যাদি থেকেই বীর্য ইত্যাদি তৈরি হয়, আর বীর্যই হচ্ছে মানবসৃষ্টির উপাদান।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** তাঁর অভিমুখী থাক'।

৪. (واستعمركم) -অর্থাৎ তিনি কেবল সৃষ্টিই করেননি। সৃষ্টি করার পর স্থিতি দান করেছেন, তার ব্যবস্থা করেছেন। জমি আবাদ করার প্রণালী এবং অন্যান্য কাজের কলা-কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

৬২. ওরা বলল, 'হে সালেহ! ইতিপূর্বে তুমি আমাদের মাঝে ছিলে (বড়) প্রত্যাশাস্থল। তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ কর, যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপদাদারা? আর যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান করছ, তার ব্যাপারে আমরা তো এমন সন্দেহের মধ্যে আছি যা (আমাদের) দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে[১]।'

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা দেখ তো, আমার কাছে যদি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করে

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً

তিনি যখন এমন নে'য়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারী, অতএব মানুষের উচিত– ঈমান ও আনুগত্যের সাথে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং কুফর, শিরক ইত্যাদি গোনাহর জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি আমাদের একেবারে নিকটবর্তী, প্রত্যেকটি কথা নিজে শোনেন এবং খাঁটি অন্তরে যে তওবা ও এস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করা হয়, তা কবূল করেন।

১. অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে আশা ছিল যে, ভবিষ্যতে তুমি একজন বড় জ্ঞানীগুণী ও সৎমানুষ হবে, যাকে পূর্বপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে জাতি মাথার উপর বসাবে। তোমার কপালে সততা ও কল্যাণের লক্ষণাদি সুস্পষ্ট ছিল। সকলের আশা ছিল, নিকট ভবিষ্যতে তোমাকে দিয়ে বিরাট উপকার হবে। তুমি নিজের সুচিন্তিত মতামত, সততা ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে স্বজাতিকে পথপ্রদর্শন করবে এবং অদম্য সাহসে পূর্বপুরুষদের ধর্মের উন্নতি ও সহযোগিতা করবে। যদিও প্রথম থেকেই মূর্তিপূজার প্রতি তোমার ঘৃণা ছিল এবং তুমি জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করে পৃথক ধর্মমতে আস্থা স্থাপন করেছিলে, তবুও আমাদের আশা ছিল, ভবিষ্যতে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা পরিপক্ক হওয়ার পর এ মনোভাব থাকবে না।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সহসা তুমি এমন কথাবার্তা বলা শুরু করলে, যা আমাদের সকল আশা-ভরসার উপর পানি ঢেলে দিল। আমাদের বাপ-দাদার পুরাতন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ আরম্ভ করে তুমি সকল আশা মাটি করে দিলে। তুমি কি এ-ই চাও যে, আমরা এক আল্লাহকে গ্রহণ করে পুরনো সকল দেবতাকে ছেড়ে দেই? পূর্ববর্তীদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন পথ অবলম্বন করা দারুণ সংশয়ের বিষয়, যা কোনক্রমেই আমাদের অন্তর স্বীকার করছে না।

'মূযেহুল কুরআনে' রয়েছে, 'অর্থাৎ আশা ছিল যে, তুমি বাপ-দাদার পথ উজ্জ্বল করবে, কিন্তু তা না করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে আরম্ভ করলে।'

فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾

থাকেন, তবে কে আমাকে তাঁর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি[১]? সুতরাং তোমরা ক্ষতি ছাড়া আমার কিছুই বৃদ্ধি করছ না[২]।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! এ হচ্ছে আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। অতএব তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে (চরে) খাক। আর তাকে মন্দভাবে স্পর্শ করো না, অন্যথায় তোমাদের পাকড়াও করবে এক আসন্ন আযাব।'

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর ওরা তার পাগুলি কেটে ফেলল✯। তখন সালেহ (আ) বললেন, 'তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। (অতঃপর তোমাদের উপর আযাব আসবে), এ এমন প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হওয়ার নয়[৩]।'

---

১. অর্থাৎ তোমাদের সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে আমি একটি পরিষ্কার পথ কী করে পরিত্যাগ করতে পারি? আল্লাহ তাআলা আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং তাঁর অপার রহমতে আমাকে পয়গম্বরের মর্যাদা দান করেছেন। এখন ধরা হোক, যদি আমি তাঁর নাফরমানী শুরু করি এবং যেসব বিষয় পৌছানোর হুকুম রয়েছে তা না পৌছাই, তবে তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে?

২. অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী বন্ধুর সম্মান ও মূল্যায়ন করার পরিবর্তে তোমরা আমাকে নবীর দায়িত্ব অর্থাৎ দীনের দাওয়াত ও তবলিগের কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছ! এভাবে তোমরা আমার অপূরণীয় ক্ষতি করতে চাচ্ছ।

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী (فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) বাক্যের অর্থ করেছেন– তোমাদের কথাবার্তায় আমার মধ্যে এ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না যে, তোমরা নিজেদের দারুণ ক্ষতি করছ। কিন্তু প্রথম অর্থই অধিক সংগত মনে হয়।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তাকে হত্যা করে ফেলল'।

৩. হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের নিকট তাঁর জাতি মু'জেযা তলব করলে তিনি তা দেখিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ও আয়াতের শব্দাবলির ব্যাখ্যা ৮ম পারার শেষের দিকে সূরা আ'রাফে (আয়াত নং ৭৩) রয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَمِنۡ خِزۡىِ يَوۡمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الۡقَوِىُّ الۡعَزِيۡزُ ﴿۶۶﴾

৬৬. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি নিজ রহমতে সালেহ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম[১]। এবং (তাদের রক্ষা করলাম) সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয় আপনার রবই শক্তিমান, পরাক্রমশালী[২]।

وَاَخَذَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৭. আর জালেমদের পাকড়াও করল ভয়ঙ্কর গর্জন, ফলে ওরা নিজেদের ঘরে অধোমুখ হয়ে পড়ে থাকল—

كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَاۡ كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿۶۸﴾

৬৮. যেন সেখানে (কখনো) বসবাসই করেনি[৩]। শুনে রাখ! ছামূদ সম্প্রদায় আপন রবকে অস্বীকার করেছিল। শুনে রাখ! ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ*[৪]।

[রুকূ - ৭]

وَلَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ بِالۡبُشۡرٰى قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا

৬৯. নিশ্চয় আমার প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) ইবরাহীমের নিকট এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে। তাঁরা 'সালাম' বলল, তিনিও বললেন,

---

১. অর্থাৎ যখন আযাবের আদেশ এল, তখন আমি সালেহ ও তাঁর সঙ্গীদের বাঁচিয়ে নিলাম। কী থেকে বাঁচিয়ে নিলাম? সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে। সুতরাং وَمِنۡ خِزۡىِ يَوۡمِئِذٍ হচ্ছে نجينا এর ব্যাখ্যা।

২. অর্থাৎ তিনি যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করে দিতে পারেন, যাকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

৩. অর্থাৎ তাদের নাম-নিশানা রইল না, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ওদের উপর এভাবে আযাব এল যে, ওরা রাতে ঘুমাচ্ছিল, এমন সময় ফেরেশতা গর্জন (বিকট শব্দ) করে উঠলেন, তাতে সকলেরই কলিজা ফেটে গেল।'

কোন কোন আয়াতে رجفة এর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প বা প্রকম্পনে ওরা ধ্বংস হল। সূরা আ'রাফে (আয়াত : ৭৮) আমরা এর সামঞ্জস্য বিধানে আলোচনা করেছি।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'ধ্বংস হোক ছামূদ (সম্প্রদায়)'।

৪. অর্থাৎ যারা নিজ রবের আয়াত ও আহকাম অস্বীকার করে, তাদের এ দশাই হয়ে থাকে এবং তাদের উপর এরূপ অভিসম্পাতই পতিত হয়। সুতরাং তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۝

'সালাম'। অতঃপর তিনি অবিলম্বে একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলেন[১]।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

৭০. কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, তাঁদের হাত বাছুরের দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তাঁর খটকা লাগল এবং

---

১. এই সূরায় বর্ণিত কাহিনীগুলির ক্রমিকতা সূরা আ'রাফের ক্রমিকতার মতই। তবে এখানে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার পূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটা ছোট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় যে, লূৎ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। যেহেতু এ ঘটনা ও ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার মধ্যে কয়েক ধরনের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাই ভূমিকা হিসাবে ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

লূৎ আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর খালাত ভাই, তাঁর সঙ্গে ইরাক থেকে হিজরত করে এসেছিলেন। ফেরেশতাদের একটি জামাত তাঁদের উভয়ের নিকট প্রেরিত হন। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনের বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদের সঙ্গে বিতর্ক করেন। সামনে তা বর্ণিত হবে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

উল্লিখিত ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন যুবকদের আকৃতি ধারণ করে লূৎ (আ) এর কাছে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম (আ)এর নিকট এ সুসংবাদ নিয়ে এলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ বন্ধু বানিয়েছেন এবং এ বৃদ্ধ বয়সে হযরত 'সারা'র গর্ভে পুত্রসন্তান দান করবেন। অধিকন্তু লূত (আ)এর সম্প্রদায়ের বদমাশ ও লম্পটদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করবেন। কিন্তু তাতে হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূত (আ)এর অনুসারীদের কোনই ক্ষতি হবে না।

ফেরেশতাগণ এসে ইবরাহীম (আ)কে সালাম দিলেন, তিনিও উত্তর দিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁদের চিনতে পারেননি, যেমন লূৎ (আ)-ও প্রথমে তাঁদের চিনেননি। বরং বুখারী শরীফ (৫০) ও মুসলিম শরীফের (৯) হাদীসে আছে, একদা জিবরাঈল (আ) মানুষ বেশে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সওয়াল-জওয়াব করতে থাকেন। যখন উঠে চলে গেলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল যে, ইনি জিবরাঈল ছিলেন।—এতে এ সত্যই বোঝানো হল, ফেরেশতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জরুরী ইলম নবীরও ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন। তিনি কখনো গোপন রাখতে চাইলে কারো শক্তি নেই তা জানতে পারা।

যা হোক, ইবরাহীম (আ) তাঁদের মানুষ মনে করে মেহমানদারী করার জন্য উঠলেন এবং একটি মোটাতাজা বাছুর ভুনা করে সামনে পেশ করলেন।

وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝

তাদের দিক থেকে ভয় অনুভব করলেন[১]। তারা বলল, 'আপনি ভয় করবেন না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি[২]।'

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝

৭১. আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাঁকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম[৩]।

১. ভয় করলেন এ কথা ভেবে যে, এরা কারা, কী উদ্দেশ্যেই বা এসেছেন? আমরা আহার পেশ করছি, আর এরা তাতে হাত লাগাচ্ছেন না। তখনকার রীতি অনুযায়ী, কোন মেহমান খেতে অস্বীকার করলে বোঝা যেত, তার আগমন শুভবার্তা বহন করে না। ইবরাহীম (আ) ঘাবড়ে গেলেন যে, মানুষ হলে না খাওয়ার অর্থ কী, আর ফেরেশতা হলে না জানি কী উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন? আমার কোন অপরাধ হল, না আমার জাতির প্রতি অশুভ কিছু নিয়ে এসেছেন? এহেন পরিস্থিতিতে মুখে বলেও ফেললেন- اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ অর্থাৎ আপনাদের আগমনে আমাদের ভয় হচ্ছে।

অধিকাংশ মুফাসসির ইবরাহীম (আ)-এর ভয়ের এসব কারণই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) আমার মতে এর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ফেরেশতাগণ যে আসমানি আয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন এবং তাঁরা যেরূপ ক্রোধ ও প্রতিশোধের বাহক হয়ে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কলবের মধ্যে এক রকম ভীতির ভাব সঞ্চার হয়েছিল, যার প্রকাশ তিনি إنا منكم وجلون বলে করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা আপনাদের ভয় করছি।' والله اعلم

২. অর্থাৎ ভয় করার কোন কারণ নেই, আমরা ফেরেশতা, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং আপনি কোন ক্ষতির আশঙ্কা করবেন না।

৩. হযরত সারা (রা) মেহমানদের সেবা অথবা অন্য কোন কাজের জন্য সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। উল্লিখিত ভয় দূর হয়ে যাওয়ায় তিনি খুশী হয়ে হেসে উঠলেন। আল্লাহ তাআলা এই খুশীর উপর আরো খুশীর সংবাদ শোনালেন যে, তুমি এই বয়সে এক পুত্র-সন্তান লাভ করবে (অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর বংশ থেকে নাতি ইয়াকূব জন্মলাভ করবেন। এর ফলে এক বিরাট জনবহুল জাতি বনী ইসরাঈলের আবির্ভাব হবে।

হযরত সারাকে এ সুসংবাদ সম্ভবত এজন্য শোনানো হয়েছিল যে, ইতিপূর্বে হযরত হাজেরার গর্ভ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এক পুত্র ইসমাঈল (আ) বর্তমান ছিলেন। বিবি সারার কামনা ছিল, তাঁরও যদি একটি ছেলে হত। কিন্তু তখন তিনি বৃদ্ধা হয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় এ সুসংবাদ লাভ হল।

৭২. সে বলল, 'ওরে সর্বনাশ! আমি কি সন্তান জন্ম দেব, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই যে আমার স্বামী– একদম বৃদ্ধ[১]। এ তো এক আশ্চর্য কথা[২]!'

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۝

৭৩. তারা বলল, 'আপনি কি আল্লাহর হুকুম সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করছেন? হে (খলীলুল্লাহর) পরিবারবর্গ! আপনাদের উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত। নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত, মহিমান্বিত'[৩]।

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভীতি দূর হল এবং তাঁর নিকট সুসংবাদ এল, তখন তিনি লূতের সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে লাগলেন।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ۝

৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহীম (ছিলেন) সহনশীল, অতি কোমলহৃদয়, (আল্লাহ)-অভিমুখী।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

কোন কোন মুফাসসির হযরত সারার হাসির আরো কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমরা যে কারণ বলেছি, তা-ই সুস্পষ্ট। وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ আয়াতাংশ থেকে বিজ্ঞ আলেমগণ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হযরত ইসহাক নয়, বরং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম 'যাবীহ' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁকেই কুরবানীর জন্য পেশ করা হয়েছিল। (তাফসীরে 'ইবনে কাছীর' দ্রষ্টব্য)

১. এখানে يا ويلتى শব্দটির ব্যবহার এমন, যেমন মেয়ে লোকেরা সাধারণত বলে থাকে, 'হায়রে আমার কপাল! আমি কী এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তান জন্ম দেব?' কথিত আছে, হযরত সারার বয়স তখন নিরানব্বই বছর ছিল, আর হযরত ইবরাহীম (আ) একশ' বা ততোধিক বয়সী ছিলেন।

২. অর্থাৎ এমনটি হলে তো একেবারে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক বিষয় হবে।

৩. অর্থাৎ যে পরিবারবর্গের উপর আল্লাহর এত রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে এবং যারা বহু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য কি এ কোন আশ্চর্যের বিষয়? তাঁদের পক্ষে তো এতে আশ্চর্য হওয়াটাই আশ্চর্যের বিষয়। তাঁদের জন্য বরং সমীচীন হচ্ছে, সুসংবাদ শুনে আশ্চর্য বোধ করার পরিবর্তে খোদার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। কেননা, সকল মাহাত্ম্য ও কল্যাণ তাঁরই সত্তা থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে।

বি. দ্র. কোন কোন আলেম লিখেছেন, নামাযে যে দুরূদ শরীফ পড়া হয় তার কিছু কিছু শব্দ এ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে।

৭৬. (আল্লাহ বললেন), হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হোন। নিশ্চয় আপনার রবের হুকুম এসে গেছে এবং ওদের উপর এমন আযাব আসছে, যা প্রতিহত করা যাবে না[১]।

يٰٓاِبۡرٰهِيۡمُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدۡ جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمۡ اٰتِيۡهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُوۡدٍ ﴿۷۶﴾

৭৭. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের নিকট পৌছল, তিনি তাদের কারণে পেরেশান হলেন, অন্তরে কুণ্ঠাবোধ করলেন এবং বললেন, 'এ বড়ই কঠিন দিন[২]!'

وَلَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ ﴿۷۷﴾

---

১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে লূতের কওম সম্বন্ধে ফেরেশতাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিলেন, যার সংক্ষিপ্তসার সূরা আনকাবূতে (আয়াত : ৩২) এভাবে বর্ণিত হয়েছে : ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-কে অবহিত করলেন যে, আমরা ঐ বস্তিগুলো ধ্বংস করতে এসেছি। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো স্বয়ং লূত (আ) বর্তমান আছেন। (সুতরাং একজন পয়গম্বর থাকতে তা কী করে ধ্বংস করা যায়?) ফেরেশতাগণ বললেন, সেখানে যারা আছে আমরা তাদের সকলকে জানি। লূৎ (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর আযাব নাযিল করা হবে।

অনেক তাফসীরে এই বিতর্কের যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা কতদূর সত্য তা আল্লাহই জানেন।—যা হোক, এই বিতর্ককেই অতিশয়োক্তিরূপে يُجَادِلُنَا শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইবরাহীম (আ) আপন স্বভাবগত স্নেহ-মমতা, নম্রস্বভাব ও দয়ার্দ্রচিত্ততার কারণেই ওই সম্প্রদায়ের জন্য করুণা অনুভব করছিলেন এবং এজন্যই আল্লাহ তাআলার সমীপে সুপারিশ করতে চাচ্ছিলেন। এরই উত্তরে বলা হয়েছে যে, এ খেয়াল পরিত্যাগ করুন। এই জালেমদের জীবন-প্রদীপ শেষ হয়ে এসেছে। এখন আর আল্লাহর হুকুম ফিরতে পারে না। আযাব আসবেই, তা কোন সুপারিশ বা দো'য়া ইত্যাদিতে টলবে না।

২. ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন দাড়ি-গোফবিহীন কিশোরাকৃতির ছিলেন। শুরুতে হযরত লূৎ (আ) তাঁদের ফেরেশতা বলে চিনেননি, সাধারণ মেহমান মনে করেছিলেন। অন্যদিকে সেই জাতির নির্লজ্জতা ও দুশ্চরিত্রতার কথা তাঁর জানা ছিল। ফলে এ কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও কুণ্ঠিত হলেন যে, ঐ বদমাশরা এই মেহমানদের পিছনে লাগবে। মেহমানদের (ওদের হাতে) ছেড়ে দেওয়াও মুশকিল, আর ঐ খবীছদের হাত থেকে রক্ষা করাও দুষ্কর। এখন সমগ্র জাতির সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা আর কী!

৭৮. আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে ছুটে এল, আর পূর্ব থেকেই ওরা কুকর্ম করছিল[১]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! এই যে আমার কন্যারা আছে। তারা তোমাদের জন্য অনেক বেশি পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজন নেক মানুষও নেই[২]?'

وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَـكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ۝

১. অর্থাৎ সেই জাতি যেসব অসভ্য আচরণ ও স্বভাববিরুদ্ধ নির্লজ্জ ক্রিয়া-কর্মে লিপ্ত ছিল, তাতে কি ওরা চুপ করে বসে থাকতে পারত? এমন সুশ্রী ছেলেদের খবর পৌঁছতেই ওরা অত্যন্ত বে-হায়ার ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অনতিবিলম্বে লূৎ (আ)-এর বাসস্থানে ছুটে এল এবং মেহমানদেরকে ওদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাল। আর ওরা এও বলল, 'আমরা পূর্বেই তোমাকে মানা করে দিয়েছি কোন পুরুষকে মেহমানরূপে গ্রহণ করতে। এখানে আগমনকারী মেহমানদের আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা যা ইচ্ছা তাই করব।'

২. হযরত লূৎ (আ) মেহমানদের সম্মান রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন এবং ঐ অসভ্য সম্প্রদায়কে শেষ কথা এই বললেন, 'জালেমরা! এই যে আমার কন্যারা তোমাদের জন্য উপস্থিত রয়েছে, তাদের বিয়ে করে বৈধরূপে উপভোগ করতে পার, যা অত্যন্ত পবিত্র ও সমীচীন পন্থা। পবিত্র ও শরী'য়তসম্মত পথ ছেড়ে এহেন স্বভাববিরুদ্ধ গান্ধা কাজে লিপ্ত হতে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত। সম্মানিত মেহমানদের সামনে আমি লজ্জিত ও হেয় হই, অন্তত এ দিক লক্ষ করে তোমরা ক্ষান্ত হও। কারণ, মেহমানের অপমান মানে মেযবানেরই অপমান। তোমাদের মধ্যে কি এমন এক ব্যক্তিও নেই, যে সহজ কথাগুলি বুঝে নেকী ও তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে?'

বি. দ্র. هؤلاء بناتي (এই যে আমার কন্যারা) বলে কওমের মেয়েদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের লূৎ (আ) রূপক অর্থে 'আমার কন্যাগণ' বলেছেন। কেননা, নবী উম্মতের রূহানী পিতা। আর এমনিতেও সাধারণ কথাবার্তায় সমাজের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা সকলের মেয়েদেরই নিজ 'কন্যা' বলে ডাকতে পারেন।—আর যদি শুধু লূৎ (আ) এর মেয়েরাই উদ্দেশ্য হয়, তবে সম্ভবত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিয়ের জন্য তাদের পেশ করেছিলেন। আর সে সময় কাফেরদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিয়ে জায়েয ছিল।

কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, উক্ত কথার দ্বারা লূৎ (আ) বিয়ে ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেননি, বরং ওদের বাড়াবাড়িতে অক্ষম হয়ে মেহমানদের সম্মান রক্ষার চিন্তায় নিতান্ত বিনয়ের সাথে এ কথা বলেছেন, যাতে ওদের মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জা-শরম ও মনুষ্যত্ব বিদ্যমান থাকলে এ কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং নম্রতা অবলম্বন করে।

কিন্তু ওরা এরূপ লজ্জাশীল ছিল কোথায়? 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী'– আগের চেয়ে বেশি নির্ভয় হয়ে নির্লজ্জতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগল।

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ۝

৭৯. ওরা বলল, 'আপনি তো জানেন, আপনার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমরা কী চাই[১]।'

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ۝

৮০. তিনি বলতে লাগলেন, 'হায়, তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম[২]!'

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا

৮১. ফেরেশতারা বলল, 'হে লূত! আমরা আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা আদৌ আপনার কাছে পৌছতে পারবে না[৩]। অতএব রাতের কোন অংশে আপনি আপন পরিবার-

---

১. সুতরাং এত বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা কেন করছ? আমরা আমাদের নাপাক ইচ্ছা পূর্ণ না করে কিছুতেই ফিরব না।

২. চরম পেরেশানী ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় লূৎ আলাইহিস সালামের মুখ থেকে আপনা আপনিই এ কথাগুলি বের হল– 'হায়, আমার নিজের মধ্যে যদি তোমাদের সকলের সাথে লড়াই করার শক্তি থাকত, অথবা কোন শক্তিশালী ও মজবুত আশ্রয়দানকারী যদি থাকত, অর্থাৎ আমার জ্ঞাতী-গোষ্ঠী ও দলবল এখানে থাকত! হাদীসে (সহীহ বুখারী, ৩৩৭২) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد (আল্লাহ লূতের উপর রহম করুন, নিশ্চয় তাঁর তো মজবুত ও সুদৃঢ় আশ্রয় অর্জিত ছিলই।) অর্থাৎ মহান আল্লাহ। কিন্তু তখন চরম পেরেশানী ও সীমাহীন উদ্বেগের কারণে সেদিকে খেয়াল যায়নি। বেমালুম বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিকে দৃষ্টি চলে গেল। —লূৎ (আ)-এর পর যত নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই বড় বড় জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও দলবলবিশিষ্ট ছিলেন।

৩. যখন লূৎ আলাইহিস সালামের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা চরমে পৌছল, তখন মেহমানগণ বললেন, 'হযরত! আপনি কী চিন্তায় আছেন? মোটেই পেরেশান হবেন না। আমরা খোদার প্রেরিত ফেরেশতা, এদের ধ্বংস ও বিনাশ করতে এসেছি। এ খবীছরা আমাদের কিছু করা তো দূরের কথা, আপনার কাছেও পৌছতে পারবে না।'

বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে আছে, দুষ্কৃতিকারীরা দরজা ভেঙে বা প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম খোদার অনুমতি নিয়ে লূৎ আলাইহিস সালামকে পৃথক বসিয়ে দিলেন এবং তাঁর একটি ডানা সেই 'মালাউন'দের দিকে নাড়া দিলেন। ফলে ওদের সকলেই একেবারে অন্ধ হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, 'পালাও! লূতের মেহমানরা তো দারুণ যাদুকর মনে হয়!'

يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

পরিজন নিয়ে বের হয়ে যান। আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, আপনার স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার উপরেও তা পতিত হবে যা ওদের উপরে আপতিত হবে[১]। ওদের প্রতিশ্রুত সময় তো প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়[২]?'

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ

৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি সেই জনপদকে উলট-পালট করে দিলাম (সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলাম)[৩] এবং তার উপর বর্ষণ করলাম থরে থরে রাখা শক্ত মাটির পাথর[*][৪]

---

১. অর্থাৎ ভোরে আযাব আসবে, তাই কিছু রাত থাকতে আপনি নিজ সম্পর্কধারীদের নিয়ে এখান থেকে তশরীফ নিয়ে যান এবং নিজ সাথীদের হেদায়েত করে দিন, যাতে তাড়াতাড়ি করে এবং কেউ পিছনে ফিরেও না দেখে, তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া। কারণ, সে সঙ্গে যাবে না, অথবা সে পিছন ফিরে দেখবে। এভাবে সে ঐ আযাবের থাবায় পতিত হবে, যা সমগ্র জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত।—কথিত আছে, এই মহিলাই লোকদেরকে মেহমানদের আগমন সম্বন্ধে অবহিত করেছিল।

২. অর্থাৎ আনন্দিত হোন। এই জালেমদের ধ্বংস হতে আর দেরি নেই, ভোর হওয়ামাত্র সকলের দফা একেবারে রফা হয়ে যাবে।

৩. জিবরাঈল (আ) সেই বস্তিগুলো উঠিয়ে আকাশের দিকে (শূন্যে) নিয়ে নীচে ছুড়ে দিলেন। এভাবে সমস্ত বস্তি উপর-নীচ (উলট-পালট) হয়ে গেল। তদুপরি, ওদের শাস্তি, লাঞ্ছনা ও অপমানের পূর্ণতার জন্য উপর থেকে পাথর বর্ষিত হল। শহরের আবাদির বাইরে সম্প্রদায়ের যারা যেখানে ছিল সেখানেই পাথর বর্ষণে ধ্বংস করা হল। (আল্লাহর পানাহ!)

বি. দ্র. এ জাতিকে উপর-নীচ করার যে শাস্তি দেওয়া হয়, এর মধ্যে এবং ওদের নির্লজ্জ দুষ্কর্মের মধ্যে বাহ্যিক সামঞ্জস্যও রয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তার উপর বর্ষণ করলাম মাটির পাথর, যা ক্রমাগত পড়ছিল'।

৪. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) منضود এর অর্থ تہ بہ تہ (থরে থরে রাখা) করেছেন। কেউ কেউ এই অর্থ করেছেন যে, পাথর একের পর এক অবিরাম বর্ষিত হচ্ছিল।

৮৩. (যা ছিল) আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত[১]। আর ঐ জনপদটি (এই) জালেমদের থেকে মোটেই দূরে নয়[২]।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝

[রুকূ - ৮]

৮৪. আর মাদয়ান(-বাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শু'আয়বকে (পাঠিয়েছিলাম)। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না[৩]। আমি তোমাদের সুখে-শান্তিতে দেখছি, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এক পরিবেষ্টনকারী দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি[৪]।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝

---

১. অর্থাৎ পাথরের উপর কোন বিশেষ আলামত ছিল, যার অর্থ ছিল– এগুলি কোন সাধারণ পাথর নয়, বরং খোদার শাস্তি-প্রস্তর। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক পাথরের উপর সেই ব্যক্তির নাম খোদিত ছিল, যাকে সেটি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। والله اعلم

২. অর্থাৎ কালের দিক থেকে নিকটবর্তী। কারণ এ ঘটনা নূহের সম্প্রদায় এবং 'আদ', 'ছামূদ', প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহের পরে ঘটেছিল। আর স্থানের দিক থেকেও নিকটবর্তী। কারণ, লুৎ সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো মদীনা ও শামের মাঝে অবস্থিত ছিল, যাতায়াতকারী কাফেলা সেখানে ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করত।

অথবা وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْد বাক্যের অর্থ এই যে, এ ধরণের আযাব এরূপ জালেমদের থেকে বর্তমানেও বেশি দূরবর্তী নয়। সুতরাং সর্বদা খোদার গযব থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

বি. দ্র. এ কাহিনীর কোন কোন অংশ সূরা আ'রাফে (আয়াত নং ৮০-৮৪) বর্ণিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

৩. সূরা আ'রাফে এ কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে (আয়াত নং ৮৫-৯৩)।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব তোমাদের সতর্ক থাকা উচিত, যেন নাফরমানীর কারণে তা ছিন্ন হয়ে না যায় এবং সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে পার্থিব বা পরকালীন আযাব চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইনসাফের সাথে মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দাও[১] এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না[২]। আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়িয়ো না[৩]।'

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾

৮৬. 'আল্লাহ-প্রদত্ত অবশিষ্টাংশই তোমাদের জন্য উত্তম[৪] যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই[৫]।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

৮৭. ওরা বলল, 'হে শু'আয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বাপদাদারা যাদের উপাসনা করত আমরা তাদের বর্জন করি? অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদে আমাদের যা ইচ্ছা, তা করা ত্যাগ করি? তুমি তো বড়ই সহনশীল*, ভাল মানুষ[৬]!'

---

১. অর্থাৎ এখন পর্যন্ত জুলুম ও অন্যায়ের যে মাপকাঠি ও নিয়ম চালু ছিল, তার সংশোধন কর।

২. অর্থাৎ শুধু মাপ ও ওজনেই নয়, বরং কোন জিনিসেই মানুষের হক নষ্ট করো না।

৩. অর্থাৎ শিরক ও কুফর করে অথবা মাপে ও ওজনে কম দিয়ে কিংবা অন্যান্য উপায়ে মানুষের হক নষ্ট করে এবং জুলুম-অত্যাচার করে পৃথিবীতে ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না। কথিত আছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ডাকাতি এবং আমানতে খেয়ানতও করত।

৪. (আল্লাহ ও মানুষের হকসমূহ) ঠিক ঠিকভাবে আদায় করার পর আল্লাহর দেওয়া যা অবশিষ্ট থাকে, তা পরিমাণে কম হলেও মুমিনের জন্য সেই প্রাচুর্য থেকে উত্তম, যা হারাম উপায়ে অর্জন করা হয় অথবা যার মধ্যে মানুষের হক নষ্ট করা হয়। সঠিক মাপ-ওজনের মাধ্যমে যে হালাল মাল লেনদেন করা হয়, তাতে দুনিয়ায় বরকত হয় এবং আখেরাতে আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়া যায়।

৫. অর্থাৎ আমি তোমাদের উপদেশ দিয়ে দিলাম। এখন তোমাদের দ্বারা জবরদস্তিমূলক আমল করানো আমার দায়িত্ব নয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা– বুদ্ধিমান।**

৬. অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ওরা বলল- থাক, বেশী ভাল মানুষ হওয়ার দরকার নেই। সমগ্র জাতির মধ্যে তুমি কি একাই বুদ্ধিমান, সম্মানী ও সাধু ব্যক্তি? অবশিষ্ট আমরা ও আমাদের প্রবীনেরা সব জাহেল ও নির্বোধ?—হযরত শু'আয়ব (আ) নামায খুব বেশি পড়তেন, তাই ওরা বলতে লাগল, সম্ভবত তোমার নামায তোমাকে নির্দেশ দেয়, যাতে তুমি আমাদের

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ

৮৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! দেখ তো, আমার কাছে যদি আপন রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে থাকে এবং তিনি আমাকে উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়ে থাকেন[১]— (তবে তার দাবি কি এই যে, আমি তাঁর আদেশ অমান্য করি এবং তোমাদের নসীহত করা ছেড়ে দেই?)। আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের যে কাজ করতে নিষেধ করি, তোমাদের পশ্চাতে আমি নিজে সে কাজ করি[২]। আমি তো

থেকে পূর্বপুরুষদের পুরনো ধর্ম ছাড়িয়ে নাও এবং আমাদের ধনসম্পদে আমাদের স্বাধীন অধিকার থাকতে না দাও। আচ্ছা, তুমি তোমার নামায নিয়ে থাক, আমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে এবং মাপ-ওজনের ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জাহেলদের রীতি হচ্ছে- নিজেরা সৎলোকদের কাজ না করতে পারলে উলটা তাঁদের জ্বালাতন করে । এটাই কুফরী চরিত্র।

কোন কোন মুফাসসির إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ আয়াতটিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের অর্থে না নিয়ে বাস্তব অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ তুমি একজন জ্ঞানী, সম্মানী ও সদাচারী মানুষ। সুতরাং তুমি কেন এমন অসমীচীন কথাবার্তা বলতে লাগলে? এ যেন সালেহ আলাইহিস সালামের প্রতি (তাঁরই কওমের) এই উক্তির মত— قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا الخ (ওরা বলল, 'হে সালেহ! ইতিপূর্বে তোমার থেকে তো আমাদের বড় আশা ছিল। তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করতে নিষেধ কর, যাদের পূজা করত আমাদের বাপদাদারা?)

১. এর দ্বারা হয় বাহ্যিক জীবিকা উদ্দেশ্য- অর্থাৎ ওজনে কমবেশী করা ছাড়াই হালাল ও পবিত্র উপায়ে আল্লাহ আমাকে জীবিকা প্রদান করেছেন। অথবা আধ্যাত্মিক রুযী উদ্দেশ্য- অর্থাৎ ইলম, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করেছেন।

মোটকথা, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করে সরল পথ দেখিয়ে থাকেন যা তোমরা দেখতে পাও না এবং সেই ঐশ্বর্যে সৌভাগ্যশালী করে থাকেন যার অংশ তোমাদের ভাগ্যে জুটেনি (অর্থা নবুওয়াত), তবে এর দাবি কি এই যে, আমি তোমাদের মত অন্ধ হয়ে যাব এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব, অথবা তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে ঘাবড়ে গিয়ে নসীহত করা ছেড়ে দেব? কিছুতেই নয়।

২. অর্থাৎ যেসব মন্দ বিষয় থেকে আমি তোমাদের বাধা দান করি, তোমাদের পশ্চাতে আমি নিজে সেসব করব, এমন অভিপ্রায় আমার নেই। যেমনঃ তোমাদের দুনিয়াত্যাগী বানাব, আর নিজে দুনিয়া কামাই করে ঘর ভরব, এমনটি হতে পারে না। যে নসীহত তোমাদের করি, আমি তোমাদের পূর্বে তা পালন করে থাকি। তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনতে পারবে না যে, আমার নসীহত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও স্বার্থনির্ভর।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

আমার সাধ্যমত কেবল সংশোধন করতে চাই, আর আমার দ্বারা যা কিছু হয় তা কেবল আল্লাহরই সাহায্যে হয়। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং আমি (সকল বিষয়ে) তাঁরই অভিমুখী হই[১]।

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরোধিতা যেন তোমাদের জন্য এর কারণ না হয় যে, তোমাদের উপরেও সে রকম কিছু আপতিত হল, যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়, হূদের সম্প্রদায় বা সালেহের সম্প্রদায়ের উপরে। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে মোটেই দূরে নয়[২]।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

৯০. 'তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হয়ে যাও। নিশ্চয় আমার রব বড় মেহেরবান, অতি মহব্বতকারী[৩]।'

---

১. আমার সার্বিক চেষ্টা এই যে, তোমাদের দীনী ও পার্থিব অবস্থা সংশোধিত হয়ে যাক। তোমরা বর্তমান নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে বের হয়ে ঈমান ও মারেফতের শীর্ষদেশে আরোহণ কর। এ সংস্কার-উদ্দেশ্য ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং আমি নিজ থেকে এটা কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারি না। অবশ্য কার্যসিদ্ধি হওয়া এবং নিজ প্রচেষ্টায় সফল হওয়া– এসব আল্লাহ তাআলার মুঠিতে। তাঁরই সাহায্য ও তাওফীকে সবকিছু হয়। সুতরাং আমার ভরসা তাঁরই উপর এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

২. অর্থাৎ আমার সঙ্গে জিদ ও শত্রুতাবশত এমন কাজকর্ম করো না, যা তোমাদেরকে বিগত জাতিসমূহের মত চরম ধ্বংসাত্মক আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। অবিশ্বাস ও শত্রুতার কারণে নূহ, হূদ ও সালেহ আলাইহিমুস সালামের উম্মতগুলোর উপর যে আযাব এসেছিল, তা তোমাদের অজানা নয়। আর লূৎ আলাইহিস সালামের জাতির ঘটনা তো নিকট অতীতেই সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনা তোমাদের স্মৃতিশক্তিতে সজীব থাকার কথা। এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

৩. যতই পুরাতন ও দাগী পাপী হোক না কেন, খাঁটি অন্তরে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি নিজ মেহেরবানীতে ক্ষমা করে দেন, বরং তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন।

৯১. ওরা বলল, 'হে শু'আয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না[১] এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখছি[২]। আর যদি তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না থাকত, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলতাম[৩]। তুমি তো আমাদের কাছে সম্মানিত নও*।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

৯২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তোমরা তো তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পশ্চাতে ফেলে রেখেছ।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ

---

১. বস্তুত ওরা বুঝত সব কিছুই, কিন্তু একগুঁয়েমি ও সত্য অস্বীকার করে বলত যে, আমরা আপনার কথা কিছুই বুঝি না; কী সব পাগলের প্রলাপ করছেন (نعوذ بالله)। —আর যদি নিজেদের অমনোযোগিতা বা স্থূলবুদ্ধির কারণে আসলেই এমন সরল ও পরিষ্কার কথা বুঝে না থাকে, তবে বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ একজন দুর্বল ও অথর্ব মানুষ অযথা সারা সমাজকে নিজের শত্রু বানাচ্ছে। তার নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, অহেতুক নিজেকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ায় কী লাভ?

বি. দ্র. পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী থেকে ضعيف শব্দের অর্থ ضرير البصر ('অন্ধ') বর্ণিত আছে। সম্ভবত কোন সময় তাঁর দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেমন: ইউসুফ (আ)-এর বিচ্ছেদে হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর অবস্থা হয়েছিল। মুফাসসিরগণ এ মর্মে কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত শু'আয়ব (আ) খুব বেশি কাঁদতেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বললেন, শু'আয়ব! এত কাঁদ কেন? বেহেশতের আশায়, না দোযখের ভয়ে? তিনি আরয করলেন, পরওয়ারদেগার! আপনার সাক্ষাতের চিন্তা করে কাঁদি—যখন আপনার দীদার হবে তখন না জানি আমার সঙ্গে কী আচরণ করেন। এরশাদ হল, তোমার জন্য আমার সাক্ষাৎ (দীদার) মুবারক হোক। হে শু'আয়ব! এ জন্যই আমি মূসা ইবনে ইমরান (কালীমুল্লাহ)-কে তোমার খেদমতের জন্য নিয়োজিত করেছি।— কথিত আছে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। (এ বর্ণনা কতদূর সহীহ, তা আল্লাহই ভাল জানেন।)

৩. অর্থাৎ আপনার বংশীয় লোকদের মধ্যে যারা আমাদের সঙ্গে আছে তাদের কথা চিন্তা করি, নতুবা এতদিনে আপনাকে পাথর নিক্ষেপে শেষ করে ফেলতাম।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা :** 'আমাদের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী নও'।

نَّ رَبِّىۡ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطٌ ﴿۹۲﴾

নিশ্চয় আমার রব তোমাদের কার্যকলাপ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[১]।

وَيٰقَوۡمِ اعۡمَلُوۡا عَلٰى مَكَانَتِكُمۡ اِنِّىۡ عَامِلٌ ؕ سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ مَنۡ يَّاۡتِيۡهِ عَذَابٌ يُّخۡزِيۡهِ وَمَنۡ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارۡتَقِبُوۡۤا اِنِّىۡ مَعَكُمۡ رَقِيۡبٌ ﴿۹۳﴾

৯৩. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার উপরে আসে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[২]।'

وَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا شُعَيۡبًا وَّالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۙ﴿۹۴﴾

৯৪. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি নিজ রহমতে শু'আয়ব ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদের রক্ষা করলাম এবং জালেমদের পাকড়াও করল ভয়ঙ্কর গর্জন, ফলে ওরা নিজেদের ঘর-বাড়ীতে অধোমুখ হয়ে পড়ে থাকল—

كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّمَدۡيَنَ

৯৫. যেন ওরা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি[৩]। শুনে রাখ! মাদয়ান-(বাসীদের) উপর

---

১. অর্থাৎ আফসোস ও আশ্চর্যের বিষয়! বংশের কারণে তোমরা আমার খাতির করছ, এ কারণে নয় যে, আমি খোদাকর্তৃক প্রেরিত এবং নিজের সত্যতার সুস্পষ্ট ও অকাট্য নিদর্শন দেখাচ্ছি। তাহলে তোমাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ তাআলার চেয়ে আমার বংশের মর্যদা ও প্রভাব বেশি। আল্লাহর মহত্ব ও শক্তি তোমরা এমনি বিস্মৃত হয়েছ যে, তা কখনো তোমাদের চিন্তায় আসে না। যে জাতি আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে নিজেদের পশ্চাতে ফেলে দেয় (তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়), তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের সকল ক্রিয়াকাণ্ড আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কুদরতের আয়ত্তে রয়েছে। তারা যে কাজই করুক এবং যে অবস্থাতেই থাকুক– এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর আওতাবহির্ভূত নয়।

২. অর্থাৎ ঠিক আছে, তোমরা নিজেদের জিদ ও হঠকারিতা নিয়েই থাক। আমি আল্লাহর তাওফীকে হেদায়েতের পথের উপর আছি। শীঘ্রই জানা যাবে, খোদার আযাব এসে আমাদের মধ্য থেকে কাকে লাঞ্ছিত করে এবং কে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়। এখন আমরা ও তোমরা উভয়ে আসমানী ফয়সালার অপেক্ষা করি।

৩. এখানে শু'আয়ব (আ)-এর জাতি গর্জন তথা ফেরেশতাদের প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আ'রাফে (আয়াত : ৯১) رجفة শব্দ এসেছে, অর্থাৎ ভূমিকম্পে ওরা ধ্বংস হয়েছিল। আর সূরা শু'আরায় (আয়াত : ১৮৯) عذاب يوم الظلة এর উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ এই যে, আযাবের মেঘ শামিয়ানার মত ওদের বেষ্টন করে নিয়েছিল।

অভিসম্পাত, যেরূপ অভিসম্পাত হয়েছিল ছামূদ-সম্প্রদায়ের উপর[★১]।

كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ

[রুকূ - ৯]

৯৬. নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম[২]–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

৯৭. ফেরাওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু ওরা ফেরাওনের হুকুমের অনুসরণ করল, অথচ ফেরাওনের কার্যকলাপ মোটেই সঠিক ছিল না[৩]।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ

ইবনে কাছীর (র) লেখেন, এই তিন প্রকার আযাবই ওদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রত্যেক সূরায় সেখানকার প্রসঙ্গ অনুযায়ী একেক আযাবের উল্লেখ হয়েছে।

আ'রাফে ছিল, ওরা শু'আয়ব (আ)-কে বলেছিল, আমরা আপনাকে ও আপনার সঙ্গীদের স্বদেশ থেকে বের করে দেব। তাই সেখানে বলা হয়েছে, যে যমীন থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিল, তারই কম্পনে ওরা ধ্বংস হল। এই সূরায় ওদের মারাত্মক ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তার উল্লেখ ছিল, তাই এর মোকাবেলায় আসমানী صيحة (গর্জন) এর উল্লেখ করা হল। যেন ঐশী শাস্তির একটি মাত্র গর্জনে ওদের সব তর্জন-গর্জন স্তিমিত হয়ে গেল। সূরা শু'আরায় ওদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে – فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ আপনি যদি সত্য হন, তবে আমাদের উপর আকাশের একাংশ পতিত করুন। এর মোকাবেলায় সেখানে عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (চাঁদোয়া-দিবসের শাস্তি) উল্লেখ করা হয়েছে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মাদয়ান-(বাসীরা) ধ্বংস হোক, যেমন ধ্বংস হয়েছে ছামূদ (সম্প্রদায়)'!

১. এই উভয় জাতি একই আযাব- صيحة অর্থাৎ গর্জনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২. নিদর্শনাদি দ্বারা খুব সম্ভব মু'জেযাসমূহ এবং সেই নয়টি নিদর্শন উদ্দেশ্য, যা وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ আয়াতে (বনী ঈসলাঈল : ১০১) উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও শক্তিধর মু'জেযা অর্থাৎ লাঠির মু'জেযাকে সম্ভবত سلطان مبين (সুস্পষ্ট সনদ) বলা হয়েছে।

অথবা سلطان مبين বলতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ প্রভৃতির সেসব উজ্জ্বল প্রমাণ উদ্দেশ্য, যেগুলি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাওনের সামনে পেশ করেছিলেন। এগুলির আলোচনা অন্যান্য স্থানে হবে। এমনও হতে পারে যে, سلطان مبين দ্বারা এর আভিধানিক অর্থ (প্রকাশ্য বিজয়) উদ্দেশ্য। কেননা, ফেরাওনীদের মোকাবেলায় হযরত মূসা (আ) বারংবার সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করতে থাকেন।

৩. অর্থাৎ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দেখেও ফেরাওনীরা আল্লাহর পয়গম্বরের কথা মানেনি, বরং আল্লাহর এই দুশমনের হুকুমের উপর চলতে থাকে। অথচ তার কোন কথা-কাজই সঠিক ছিল না, যা মেনে মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে।

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾

৯৮. সে কিয়ামতের দিন নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে। অতঃপর ওদেরকে আগুনে অবতরণ করাবে। আর (তা) অতি নিকৃষ্ট ঘাট, যাতে অবতরণ করা হবে[১]।

وَاُتْبِعُوْا فِیْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّیَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾

৯৯. আর এ দুনিয়ায় ওদের অনুগামী করে দেওয়া হয়েছে লা'নতকে এবং কিয়ামতের দিনেও। (তা) অতি নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা ওদের দেওয়া হবে[২]!

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰی نَقُصُّهٗ عَلَیْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِیْدٌ ﴿۱۰۰﴾

১০০. এগুলি বিভিন্ন জনপদের কিছু হাল-অবস্থা, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কতক জনপদ (এখনো) বিদ্যমান আছে এবং কতক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে[৩]।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ

১০১. আমি ওদের উপর জুলুম করিনি, বরং ওরাই নিজেদের উপরে জুলুম করে গেছে। ফলে আল্লাহ ছাড়া যে উপাস্যদের ওরা ডাকত, তারা ওদের কোন উপকারে আসল

---

১. দুনিয়াতে যেমন সে কুফর ও অস্বীকারকারীদের নেতা ছিল, কিয়ামতের দিনও তদ্রূপ থাকবে। যারা দুনিয়াতে ওর অন্ধ অনুসরণ করেছিল, তারা ওর পিছনে পিছনে শেষ মনযিল (জাহান্নাম) পর্যন্ত পৌছে যাবে। এ সেই ঘাট, যেখানে শীতল পানির পরিবর্তে ভস্মকারী আগুন ভাগ্যে জুটবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়া যতদিন থাকবে, মানুষ ফেরাওন ও ফেরাওনীদের উপর লা'নত পাঠাতে থাকবে। অতঃপর পরকালে আল্লাহর ফেরেশতা ও হাশরবাসীদের পক্ষ থেকে লা'নত পতিত হবে। মোটকথা, লানতের ধারা অনবরত ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে। এ যেন এক পুরস্কার, যা ওরা স্বীয় কার্যকলাপের কারণে লাভ করল!!

৩. অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহ কীভাবে পয়গম্বরদের অস্বীকার ও তাঁদের সঙ্গে ধৃষ্টতা করেছিল এবং পরিণতিতে কীভাবে ধ্বংস হল, তা আপনাকে শোনানো হচ্ছে। এসব কাহিনী যাদের, তাদের কারো কারো বসতি এখনো বিদ্যমান রয়েছে- যেমনঃ ফেরাওনের বাসস্থান মিশর। আর কোন কোন বসতি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। তবে সেগুলির কিছু ধ্বংসাবশেষ আজো বাকী রয়েছে- যেমনঃ লূতের সম্প্রদায়ের বসতিসমূহ। আর কতকের নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীর বুক থেকে বিলিন হয়ে গেছে।

না যখন আপনার রবের হুকুম এল[১] এবং তারা ওদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করল না[২]।

لَمَّا جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوۡهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيۡبٍ ﴿۱۰۱﴾

১০২. এমনই হয় আপনার রবের পাকড়াও যখন তিনি জনপদসমূহকে এ অবস্থায় পাকড়াও করেন যে, তা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যাতনাদায়ক, অতি কঠোর[৩]।

وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ ﴿۱۰۲﴾

১০৩. নিশ্চয় তার মধ্যে (অর্থাৎ জনপদবাসীদের পাকড়াও করার মধ্যে) নিদর্শন রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে[৪]। তা এমন এক দিন, যেদিন

اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ ۙ

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাউকে বিনা অপরাধে পাকড়াও করেননি যে, তাঁর ব্যাপারে জুলুমের আপত্তি হতে পারে; বরং যখন ওরা অন্যায়-অপরাধ করে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং এভাবে নিজেদের সুস্পষ্টরূপে শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত করেছিল, তখনই আল্লাহর আযাব এসেছে। এখন লক্ষনীয়, যেসব মা'বূদ তথা দেব-দেবীর উপর ওদের বিরাট বিশ্বাস ছিল এবং যাদের নিয়ে ওরা বড় বড় আশা ও স্বপ্নজাল তৈরি করে রেখেছিল, চরম মুসিবতের সময় তারা কোনই উপকারে এল না।

২. বাতিল উপাস্যরা ওদের উপকারে আসবে কী? তারা তো উলটা ওদের ধ্বংসের কারণ হল। ওরা তাদেরকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করত, তাদের উপর আশা-ভরসা রাখত, তাদের উদ্দেশ্যে নিয়ায-মানত করত এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পূজা-পার্বন নিবেদন করত। এসবের পরিণামেই ওদের এমন দুর্দিনের মুখ দেখতে হল। একদিকে নবীদের অস্বীকার প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, উপরন্তু তার সাথে যোগ হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজার শাস্তি। এ জন্যই বলা হয়েছে-وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (ধ্বংসই বৃদ্ধি করল)।

৩. অর্থাৎ অপরাধীদের যথেষ্ট পরিমাণে অবকাশ দেওয়া হয়। যখন কোনভাবেই বিরত না হয়, তখন পাকড়াও করে গলা চেপে ধরা হয় এবং কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। তখন অপরাধী যদি চায় যে, কষ্ট কম হোক অথবা আল্লাহর হাত থেকে পালাতে ইচ্ছা করে– তবে তা হবে অবাস্তব ইচ্ছামাত্র ও পাগলামি।

৪. অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতেই যখন শিরক, কুফর ও নবীদের অস্বীকার করার কারণে এত কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়, তখন এ থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, নির্ভেজাল প্রতিফলের স্থান আখেরাতে এসব অপরাধের কীরূপ শাস্তিই না ভোগ করতে

لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ

সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং তা এমন দিন, যেদিন (সবাইকে) উপস্থিত করা হবে☆[১]।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعۡدُوۡدٍ

১০৪. আর আমি তা বিলম্বিত করছি কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[২]।

يَوۡمَ يَاۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيٌّ وَّسَعِيۡدٌ

১০৫. যেদিন তা আসবে, সেদিন কোন ব্যক্তি তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না[৩]। (সেদিন) তাদের মধ্যে কতক হবে হতভাগ্য, আর কতক হবে ভাগ্যবান।

فَاَمَّا الَّذِيۡنَ شَقُوۡا فَفِى النَّارِ لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّشَهِيۡقٌ

১০৬. অতএব যারা হতভাগ্য, তারা থাকবে আগুনের মধ্যে, সেখানে তারা চিৎকার ও আর্তনাদ করবে–

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ

১০৭. তারা তাতে চিরকাল থাকবে, যতদিন বিদ্যমান থাকবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী; তবে আপনার রব যা চান (তা তিনিই জানেন)☆।

হবে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পরিণামের কথা ভাবে এবং অন্তরে ভয় রাখে, তার জন্য এতে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'যেদিন সাক্ষ্য দেওয়া হবে'।

১. অর্থাৎ সেদিন একসাথে সমগ্র দুনিয়ার ফয়সালা হবে এবং সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে একত্র করা হবে, কোন ব্যক্তিই গর-হাযির থাকতে পারবে না। অর্থাৎ তা হবে আল্লাহর আদালতে সর্ববৃহৎ হাযিরা-দিবস।

২. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানে যে মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে, তা পূর্ণ হওয়ার পরই সেই দিন আসবে। দেরি হচ্ছে বলে এমন মনে করার সুযোগ নেই যে, এসব কেবল অবান্তর কথা।

৩. অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ কথা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বলতে পারবে না। আর হাশরের ময়দানে কিছু কিছু সময় এমনও আসবে, যখন এক অক্ষরও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মুখ থেকে বের করতে পারবে না।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'তবে যখন আপনার রব (ওদের বের করতে) চাইবেন– (তখনকার কথা ভিন্ন। কিন্তু তিনি কখনই তা চাইবেন না)'।

আপনার রব যা ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই করেন।	اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ﴿۱۰۷﴾
১০৮. আর যারা ভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতদিন বিদ্যমান থাকবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী: তবে আপনার রব যা চান (তা তিনিই জানেন)। (তাদের দেওয়া হবে) নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার[১]।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ﴿۱۰۸﴾

১. مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ.. اِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَ –এআয়াতগুলির দুই অর্থ হতে পারে

এক—দুনিয়ার আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকার যে মোট সময়কাল, সেই পরিমাণ সময় দুর্ভাগারা দোযখে এবং সৌভাগ্যবানরা বেহেশতে থাকবে তবে আপনার রবের আরো বেশি রাখার ইচ্ছা হলে, তা তিনিই জানেন।

দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলে অনন্তকাল বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আমরা যখন সবচেয়ে দীর্ঘকালের চিন্তা করি, তখন নিজেদের পারিপার্শ্বিকতা হিসাবে সবচেয়ে দীর্ঘকাল বলতে এর কথাই মাথায় আসে। এ জন্যই আরবী বাকপদ্ধতিতে চিরকালের অর্থ বোঝাতে مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য অনন্তকালের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম আল্লাহ তাআলারই আসীম জ্ঞানে সীমাবদ্ধ, যা ماشاء ربك দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

অথবা আসমান ও যমীন দ্বারা পরকালের যমীন ও আসমান বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা ইবরাহীমের সপ্তম রুকূতে (আয়াত : ৪৮) বলা হয়েছে– يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ (যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও।) অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দুর্ভাগারা দোযখে এবং সৌভাগ্যবানরা বেহেশতে ততদিন বাস করবে, যতদিন পরকালের যমীন ও আকাশ বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ অনন্তকাল। তবে আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে মুলতবী করে দিতে পারেন এবং সেথায় অনন্তকাল থাকতে না দিতে পারেন। কেননা, বেহেশতী ও দোযখীদের চিরস্থায়িত্ব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

তবে তিনি ইচ্ছা করে ফেলেছেন যে, কাফের ও মুশরিকদের আযাব এবং বেহেশতবাসীদের ছওয়াব কখনো মুলতবী হবে না। যেমন : আল্লাহ বলেছেন- وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (আর ওরা কখনো আগুন থেকে বের হওয়ার নয়। –বাকারা, আয়াত ১৬৭)।

আরো এরশাদ হয়েছে- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا. (ওরা আগুন থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না)। (মায়েদা, আয়াত : ৩৭)

আরো এরশাদ হয়েছে–لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ (ওদের উপর থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং ওদের বিরতিও দেওয়া হবে না। –বাকারা, আয়াত ১৬২)।

১০৯. অতএব আপনি সেসবের ব্যাপারে কোন সন্দেহে থাকবেন না, যাদের উপাসনা এরা করে। ইতিপূর্বে এদের বাপদাদারা যেমন উপাসনা করত, এরাও তেমনই উপাসনা করছে। আর আমি অবশ্যই ওদের (আযাবের) অংশ ওদেরকে পুরাপুরি দেব, যাতে কিছুমাত্র কম করা হবে না[১]।

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۟

আরো বলা হয়েছে– إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর শরীক নির্ধারণ করা ক্ষমা করেন না, তবে এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। –সূরা নিসা, আয়াত ১১৬)

এরই উপর সমগ্র উম্মাহর ঐক্যমত রয়েছে। আর বর্তমান কালের তথাকথিত কতিপয় মুফাসসির এর ব্যতিক্রম যা কিছু পেশ করেছেন, তার ভিত্তি হয় 'যঈফ' (দুর্বল) ও 'মওযূ' (বানোয়াট) রেওয়ায়েত; অথবা এমনসব বিচ্ছিন্ন বক্তব্য যেগুলো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, কিংবা কিছু আয়াত ও হাদীস, যার অর্থ সংকীর্ণ দৃষ্টি বা বক্র বুঝের কারণে ভুল বোঝা হয়েছে। যদি আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্র ও বিশদ তাফসীর লেখার তাওফীক দান করেন তবে তাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সংক্ষিপ্ততার খাতিরে এখানে সেই আলোচনার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্নের উত্তর :

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে সকল মুসলমান গোনাহর কারণে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে (نعوذ بالله), তাদের কী হবে? উত্তর এই যে, এদের সম্পর্কে আল্লাহর কী ইচ্ছা তা সহীহ হাদীসে আমাদের অবহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ একদিন অবশ্যই তাদের দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, যে বেহেশত থেকে কোন একজন বেহেশতীকেও আর বের হতে হবে না। সম্ভবত এজন্যই বেহেশতীদের আলোচনায় عطاء غير مجذوذ (এক নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার) এবং দুর্ভাগাদের আলোচনায় إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (নিশ্চয় আপনার রব যা ইচ্ছা করেন তা করে ফেলেন) বলা হয়েছে, যাতে জানা যায় যে, কোন কোন পাপীকে দোযখ থেকে বের করা হবে, কিন্তু সৌভাগ্যবান বেহেশতীদের একজনকেও বেহেশত থেকে বের করা হবে না।

বি. দ্র. إلا ما شاء ربك দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহর অনন্তকাল থাকা আর সৃষ্টির অনন্তকাল থাকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন সৃষ্টজীবের চিরকাল থাকাটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি যখন ইচ্ছা, ফানা (অস্তিত্বহীন) করে দিতে পারেন। তদ্রুপ এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, পুরস্কার ও শাস্তি দান করা তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীন। তিনি এতে (শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানে) বাধ্য নন। বাধ্য মনে করা আর্যসমাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যা সম্পূর্ণ ভুল।

১. অর্থাৎ এত মানুষের শিরক ও মূর্তিপূজার রাস্তা অবলম্বন করা এবং এখন পর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত না হওয়া এমন বিষয় নয়, যা ধোঁকায় ও সন্দেহে পড়ার কারণ হবে। আসলে এই লোকগুলো

[রুকূ - ১০]

১১০. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতে বিভেদ সৃষ্টি করা হল। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত একটি কথা না থাকত, তবে নিশ্চয় ওদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হত। আর ওরা তার ব্যাপারে এমন সন্দেহে আছে, যা (ওদের) দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে[১]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

নিজেদের বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ করছে। এই মিথ্যা মাবূদগুলো তাদের কী উপকারে এসেছিল যে, (এখন) এদের উপকারে আসবে? আর এরা সকলেই পরকালে নিশ্চিতরূপে শাস্তির পূর্ণ অংশ পাবে, যার মধ্যে কোনো কমি হবে না বা কখনো কমিয়ে দেওয়া হবে না, যেন غير منقوص শব্দটি عطاء غير مجذوذ এর বিপরীতে আনা হয়েছে।

কোন কোন মুফাসসির وانا لموفوهم- এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ায় রিযিক প্রভৃতির যে অংশ ওদের জন্য নির্ধারিত আছে তা ওরা পুরাপুরি পাবে, অতঃপর শিরকের পূর্ণ শাস্তি ভোগ করবে।

১. মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাতসহ পাঠানোর পর মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ তা গ্রহণ করল, কেউ গ্রহণ করল না। যেরূপ বর্তমানে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এই মতভেদই হচ্ছে।

অবশ্য এ বিভেদ সৃষ্টি হতে না দেওয়া অথবা বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর সমগ্র অস্বীকারকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করে সমস্ত বিবাদ এক মুহূর্তে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার ছিল, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিগত (তাক্‌বীনি) হেকমতের দাবি এরূপ নয়। আল্লাহর দরবারে প্রথম থেকেই একটি বিষয় নির্ধারিত হয়ে আছে। তা এই যে, তিনি মানুষকে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত কর্ম ও শক্তির স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করবেন- দেখবেন, সে কোন্ পথে চলে। সে কি স্রষ্টা ও সৃষ্টির হকসমূহ যথাযথভাবে চিনে ও আদায় করে আল্লাহর রহমত ও দয়ার অধিকারী হয়, না বক্রতা ও ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করে নিজেকে আল্লাহর গযব ও ক্রোধের পাত্র বনায়? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম।)

এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতি এমন তৈরি করেছেন, যাতে সে ভাল বা মন্দ অবলম্বনে সম্পূর্ণ বাধ্য না হয়। এরই অনিবার্য ফল এই যে, দুনিয়াতে ভাল ও মন্দ, পুণ্য ও পাপের অবিরাম সংঘাত চলতে থাকে। অতঃপর কারা আল্লাহর রহমতের পাত্র আর কারা গজব-ক্রোধের পাত্র, তা নির্ণিত হয়ে যায়, যাতে اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ (তবে

১১১. আর সকল মানুষকে– যখন (সময় হবে)– আপনার রব অবশ্যই তাদের আমলাদির প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন☆। তারা যা কিছু করছে, নিশ্চয় তিনি সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[১]।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۭ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১২. অতএব আপনি (সরল পথের উপর) অবিচল থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আপনার সঙ্গে যারা তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় তিনি তা ভাল করেই দেখেন[২]।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۭ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

যাদের প্রতি তোমার রব দয়া করেন, তাদের কথা ভিন্ন)– এর সঙ্গে لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (আমি জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই)– কথাটিও সত্যে পরিণত হয়।

খুব সম্ভব এটাই (لأملن جهنم...) সেই কথা, যা পূর্বনির্ধারিত না হলে সকল মতভেদ অনতিবিলম্বে খতম করে দেওয়া হত। সাধারণ লোকেরা এসব হেকমত বুঝতে না পারার কারণে এ সংশয়ে আছে যে, ভবিষ্যতেও এসব মতভেদের মীমাংসা হবে কিনা— وانهم لفي شك منه

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আর সকলেই এমন যে, আপনার রব অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন।

১. অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের পুরাপুরি হিসাব নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু যখন সময় আসবে, তখন অবশ্যই পাই পাই হিসাব নেওয়া হবে। আযাব আসতে দেরি হচ্ছে বলে মনে করো না, তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি বেখবর।

২. আপনি এই মুশরিকদের ঝামেলায় পড়বেন না। যারা কুফর প্রভৃতি থেকে তওবা করে আপনার সঙ্গ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাদেরসহ আপনি দৃঢ়তা ও স্থিরতার সাথে খোদায়ী রাস্তার উপর অবিচল থাকুন। আকীদা-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র, ইবাদত-বন্দেগী, কায়কারবার-লেনদেন, দীনের দাওয়াত ও তবলিগ ইত্যাদি সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে দূরে থেকে ভারসাম্য ও সরল পথের উপর আপনারা অটল অবিচল থাকুন এবং অগ্রসর হোন। আর এ বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি মুহূর্তে সবার কাজকাম দেখছেন।

১১৩. এবং তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তা হলে তোমাদের স্পর্শ করবে আগুন। এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না[১]।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৪. আর আপনি নামায কায়েম করুন– দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে[২]। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ দূর করে দেয় মন্দ কর্মগুলিকে। স্মরণকারীদের জন্য তা একটি স্মারক[৩]।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

---

১. প্রথমে لاتطغوا বলে সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, যারা জালেম (সীমালঙ্ঘনকারী), ওদের প্রতি তোমাদের মোটেই ঝোঁক থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে দুস্তি-মহব্বত ও মেলামেশা, ওদের ভক্তিশ্রদ্ধা ও স্তুতি-প্রশংসা, ওদের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য ও কাজে-কর্মে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয় থেকে যথাসাধ্য দূরে থাক। নতুবা ওদের আগুন তোমাদর গায়েও লাগতে পারে। তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোন সাহায্য পাবে না।

২. তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকো না, বরং এক ও লা শারীক আল্লাহর প্রতি ঝোঁক। অর্থাৎ সকাল -সন্ধ্যা ও রাতের অন্ধকারে খুশূ-খুযূর সাথে নামায আদায় কর। কেননা, এটাই খোদার সাহায্য হাসিল করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ –এর ব্যাখ্যা

'দিনের দুই প্রান্তে' অর্থাৎ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, –এর দ্বারা ফজর ও আসরের নামায উদ্দেশ্য। অথবা একপ্রান্তে ফজর, আর দ্বিতীয় প্রান্তে মাগরিবকে রাখা যায়। কারণ, মাগরিবও সূর্যাস্তের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। আর কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষীর নিকট এর দ্বারা ফজর, জোহর ও আসর– এই তিন নামায উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দিনকে দুই অংশে বিভক্ত করে প্রথমাংশে ফজর, আর দ্বিতীয়াংশে যা দ্বিপ্রহর থেকে শুরু হয়ে সূর্যাস্তে গিয়ে শেষ হয়, তাতে জোহর ও আসর উভয় নামাযকে গণনা করা হয়েছে।

আর زلفا من الليل দ্বারা মাগরিব ও এশা উদ্দেশ্য।

ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, طرفي النهار দ্বারা ফজর ও আসর এবং زلفا من الليل দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই তিন নামাযই ফরজ হয়েছিল। পরে তাহাজ্জুদ ফরয থাকেনি, রহিত (منسوخ) হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট দু'নামাযের সাথে আরো তিন নামায বৃদ্ধি পায়।

৩. ذلك ذكرى -অর্থাৎ নামাযসমূহ কায়েম রাখা আল্লাহ তাআলার স্মারক। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে– أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ (আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।) —অথবা অর্থ এই যে,

১১৫. আর ধৈর্য ধরুন। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না[১]।

وَاصۡبِرۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ۝

১১৬. তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন লোকজন কেন হল না, যাদের মধ্যে এ কল্যাণটুকু অবশিষ্ট থাকত যে, তারা (মানুষকে) যমীনের বুকে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত?* তবে অল্প কিছু লোক (এমন ছিল), পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যাদের আমি রক্ষা করেছিলাম। আর জালেমরা যে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছিল তারা তারই পিছনে পড়ে থাকল এবং তারা ছিল অপরাধী[২]।

فَلَوۡ لَا كَانَ مِنَ الۡقُرُوۡنِ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ اُولُوۡا بَقِيَّةٍ يَّنۡهَوۡنَ عَنِ الۡفَسَادِ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّمَّنۡ اَنۡجَيۡنَا مِنۡهُمۡ‌ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مَاۤ اُتۡرِفُوۡا فِيۡهِ وَكَانُوۡا مُجۡرِمِيۡنَ۝

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآت –এই মূলনীতি স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ রাখার বিষয়, যা কখনই ভোলা উচিত নয়। কারণ, এতে মুমিন বান্দার জন্য নেককাজের প্রতি বিশেষ উৎসাহ রয়েছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'নেককাজ অসৎকাজকে তিন উপায়ে দূর করে। যে ব্যক্তি নেককাজ করে তার গোনাহ মাফ হয়। যেই নেককাজ করা হয় তা দ্বারা বদভ্যাস কেটে যায়। তাছাড়া যে ভূখণ্ডে সৎকর্মের রীতি চালু হয়, সেখানে হেদায়েত আসে ও গোমরাহী মিটে যায়। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রেই শর্ত এই যে, নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া চাই– যত ময়লা তত সাবান।'

১. পবিত্র কুরআনে গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে দুটি জিনিসের বিশেষ প্রভাব রয়েছে, নামায ও সবর– وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ –(তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।) এখানেও নামাযের পর সবরের হুকুম করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মুমিনকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং কোন দুঃখ-কষ্টের পরোয়া করা যাবে না, তবেই আল্লাহর মদদ ও সাহায্য হাসিল হবে। তাঁর নিকট কোন সৎকর্মশীলের প্রতিদান বিনষ্ট হয় না, বরং তা ধারণার চেয়েও বেশি পাওয়া যায়।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্যে কল্যাণের অবশেষধারী এমন লোক কেন হল না, যারা যমীনের বুকে ফাসাদ করতে নিষেধ করত?'

অথবা : 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্যে এমন সমঝ-বুঝওয়ালা লোকজন কেন হল না...'

২. পূর্ববর্তীদের অবস্থা শুনিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সৎকাজের আদেশকারী ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারী অধিক সংখ্যায় বর্তমান থাকা

১১৭. আর আপনার রব তো এমন নন যে, তিনি জুলুম করে জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেবেন অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী[১]।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ۝

১১৮. যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী করে দিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি এমন ইচ্ছা করেননি, ফলে) তারা সর্বদা (সত্যের বিষয়ে) মতভেদ করছে–

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ۝

উচিত। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, লোকেরা ব্যাপকভাবে আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে অন্যায়-অপরাধ করতে থাকে। আর বড় বড় প্রভাবশালী লোকরা যাদের মধ্যে কল্যাণ (তথা সমঝ, নৈতিকতা প্রভৃতি) এর কিয়দাংশ অবশিষ্ট ছিল– তারা অন্যায়কারীদের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে কুফর ও পাপাচার এবং জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের ফলে দুনিয়ার অবনতি হচ্ছিল, কিন্তু তার সংস্কারক কেউ ছিল না। অবশ্য মুষ্টিমেয় মানুষ অসৎ কাজের বিরুদ্ধে কিছুটা আওয়াজ বুলন্দ করেছিল, কিন্তু বিরাট হট্টগোলের মধ্যে দুর্বল তোতার আওয়াজ কে শুনত? ফল এই দাঁড়াল যে, এই অল্পসংখ্যক বারণকারীরা আযাব থেকে রক্ষা পায়, অবশিষ্ট সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

(এ ব্যাখ্যানুযায়ী তাদের মধ্যে اولوبقية ছিল, তবে এদের খুব অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকিরা ফাসাদ করতে নিষেধ করত না। আর অনেক মুফাসসির এই তাফসীর করেছেন যে, اولو بقية তারাই, যারা অসৎকাজে বাধাদানকারী। তো তাদের মাঝে এমন লোকজন খুব একটা ছিল না। হ্যাঁ অল্পকিছু লোক ছিল যারা اولو بقية (কল্যাণের অবশেষধারী) ছিল এবং তারাই অসৎকাজে নিষেধ করত— অনুবাদক)

শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, নেককারদের পাল্লা ভারি হলে জাতি ধ্বংস হত না, কিন্তু তারা স্বল্প হওয়ায় শুধু নিজেরা বেঁচে গেল।

সহীহ হাদীসে আছে, যখন জালেমের হাত ধরে জুলুম করা থেকে বারণ করা না হয় এবং লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকর্ম থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দেয়, তখন শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা এমন ব্যাপক আযাব পাঠাতে পারেন যা কাউকেই ছাড়বে না। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩০৯, ৩৩০৯)

১. অর্থাৎ যেসব জনপদের লোকেরা নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী থাকে, সৎকর্মের প্রচলন ঘটায় এবং জুলুম ও ফাসাদ নিবারণ করে, তাদের আল্লাহ তাআলা অযথা জুলুমপূর্বক পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেবেন– এমন হতেই পারে না। আযাব তখনই আসে, যখন লোকেরা কুফর ও পাপাচার অথবা জুলুম ও নাফরমানীতে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১১৯. তবে যাদের প্রতি আপনার রব দয়া করেছেন (তাদের কথা ভিন্ন)[১]। আর এর জন্যই তাদের সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার রবের এ কথা পূর্ণ হবেই যে, 'নিশ্চয় আমি জিন ও মানব উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব[২]।'

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

১. ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে, সমগ্র দুনিয়াকে একই পথে পরিচালিত হতে বাধ্য করা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত (তাক্‌বীনি) হেকমতের দাবি নয়। এ জন্যই সত্য গ্রহণ করা না করাকে কেন্দ্র করে সর্বদা মতভেদ থাকে ও থাকবে। তবে প্রকৃতপক্ষে মতভেদ সৃষ্টিকারী তারাই, যারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ফিত্‌রাত (তথা স্বভাবজাত ধর্মের) বিরুদ্ধে সত্যকে মিথ্যা বলে। যদি সুস্থ ফিত্‌রাত অনুযায়ী সকলে চলত, তবে কোনই মতভেদ হত না। এজন্যই اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ দ্বারা অবহিত করা হয়েছে যে, সত্যানুসরণের বদৌলতে যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া করেছেন, তারা মতভেদকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ-ই যে, আল্লাহ তাআলার সব রকমের গুণ অর্থাৎ তাঁর 'রহমত ও করুণা' এবং 'গযব ও রোষ' প্রকাশিত হোক। এ জন্য দুনিয়াতে প্রকাশক্ষেত্রও বিভিন্ন রকম হওয়া প্রয়োজন, যাতে একদল নিজ মালিকের আনুগত্য করে তাঁর রহমত ও করুণা এবং সন্তুষ্টি ও ক্ষমার প্রকাশক্ষেত্র হয়। এরাই اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ এর পাত্র। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর ন্যায়বিচার ও শাস্তিপ্রদান-গুণের প্রকাশস্থল হয় এবং চির বন্দিত্বের সাজা ভোগ করে, যাতে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ বাস্তবায়িত হয়।

যা হোক, জগত সৃষ্টির বিধানগত উদ্দেশ্য (تشريعي مقصد) হচ্ছে ইবাদত– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। –যারিয়াত, রুকূ ৩ আয়াত ৫৬) —আর সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য (تكويني مقصد) হচ্ছে, এই দুনিয়ায় এমন দু'টি দলের অস্তিত্ব লাভ করা, যার একটি উক্ত বিধানগত উদ্দেশ্যকে (ইবাদত) নিজ ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা পূর্ণ করবে; ফলে তারা আল্লাহর 'জামালী সিফাত' (কোমলতা-সম্পর্কিত গুণরাজির), অন্য কথায় দয়া ও করুণার পাত্র হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল নিজ ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করবে; ফলে তারা আল্লাহর ' জালালী সিফাত' (কঠোরতা-সম্পর্কিত গুণরাজির), অন্য কথায় গজব ও ক্রোধের পাত্র হবে। এভাবে সৃষ্টিজগতে আল্লাহর উক্ত উভয় প্রকার গুণরাজির প্রকাশ ঘটবে! কবি বলেন-

درکارخانہ عشق از کفر نا گزیر است ÷ دوزخ کرا بسوزد گر بولہب نہ باشد

(প্রেমের কারখানায় কুফরেরও প্রয়োজন রয়েছে। আবু লাহাব না থাকলে দোযখ কাকে দহন করত?)

১২০. আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করছি রাসূলগণের ঘটনাবলির মধ্য থেকে এমনসব বিষয়, যার দ্বারা আপনার অন্তরকে দৃঢ় করি। আর আপনার নিকট এই সূরার মাধ্যমে এসেছে সত্য-সঠিক বিষয় এবং ঈমানদারদের জন্য উপদেশ ও স্মারক[১]।	وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. যারা ঈমান আনে না আপনি ওদের বলে দিন, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করছি-	وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. 'এবং প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি[২]।'	وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

আবার মেহেরবানী ও দয়ার প্রকাশক্ষেত্রগুলিও নিজ নিজ যোগ্যতা ও আমলের স্তর হিসাবে বিভিন্ন রকম হবে। কবি বলেন-

گلہائے رنگ سے ہے رونق چمن ÷ اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

(রং-বেরং এর ফুলেই রয়েছে ফুলবাগানের সৌন্দর্য; ওহে যওক! মতভেদের মধ্যেই রয়েছে এ জগতের শোভা-সৌন্দর্য।)

১. পূর্বে বহু নবী ও রাসূলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখন সূরার শেষে কাহিনী বর্ণনার কিছু উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ অতীত জাতি ও রাসূলদের ঘটনা শুনে পয়গম্বর আলাইহিস সালামের অন্তর প্রশান্ত ও স্থির হয় এবং উম্মত সঠিক ও সত্য বিষয় জানতে পারে। সেসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে নসীহত ও স্মরণের বিস্তর উপাদান। মানুষ যখন শোনে যে, আমারই মত মানুষ ইতিপূর্বে অমুক অমুক অপরাধের শাস্তিতে ধ্বংস হয়েছে, তখন সেসব পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। আর যখন দেখে যে, অমুক পথ অবলম্বন করে পূর্ববর্তীরা নাজাত পেয়েছিল, তখন মানুষ স্বভাবতই সেদিকে দৌড়ায়। বস্তুত কুরআন করীমের কাহিনী-অংশ অত্যন্ত ফলপ্রসু ও স্মারকরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্য অংশ এবং দিলের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির এতটুকু স্পন্দনও আছে, এসবের প্রভাবে সে প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

আর কুরআন করীমে বিভিন্ন কাহিনী ও অপরাপর কোন কোন বিষয়ের যে পুনরাবৃত্তি রয়েছে, তার ফায়দা ও অশেষ হেকমত সম্বন্ধে আমি 'আলকাসেম' পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা দ্রষ্টব্য।

২. এ বিষয়ের আয়াত পূর্বে এ সূরাতেই (আয়াত ৯৩) গত হয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তোমরা আমার কথা না মান তবে উত্তম এ-ই যে, তোমরা নিজেদের জিদের উপর জমে

وَلِلّٰهِ غَيۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاِلَيۡهِ يُرۡجَعُ الۡاَمۡرُ كُلُّهٗ فَاعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলির (জ্ঞান) আল্লাহরই নিকট রয়েছে। এবং তাঁরই কাছে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব আপনি তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন। আর তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্বন্ধে আপনার রব অনবহিত নন[১]।

থাক, আমি স্ব-স্থানে দৃঢ় আছি। অনুরূপ, তোমরা আমার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের মন্দ পরিণামের অপেক্ষা করছি। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, জালেমদের পরিণাম কী হয়- وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ (ওরা তোমাদের জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ওদের উপরই আসুক অশুভ বিপর্যয়!)

১. অর্থাৎ আপনি ওদের কুফর ও দুষ্কৃতির কারণে ভারাক্রান্ত হবেন না। নিজের কাজ করে যান এবং ওদের ফয়সালা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিন। তাঁর নিকট আসমান ও পৃথিবীর কোন বিষয়ই গুপ্ত নয়। সমস্ত বিষয় ঘুরেফিরে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে ওরা বুঝে নেবে, ওরা কোন্ বিভ্রান্তিতে ছিল। আপনি জান-প্রাণে স্বীয় প্রভুর বন্দেগী ও আনুগত্যে লেগে থাকুন এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্যের উপর নির্ভর করুন। তিনি তোমাদের (মুমিনদের) এখলাসপূর্ণ আমল সম্বন্ধে বেখবর নন, তিনি তোমাদের সঙ্গে সে মতই আচরণ করবেন।

হাদীসে আছে, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মধ্যে বার্ধক্যের লক্ষণ কি তাড়াতাড়ি এসে গেল?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- شَيَّبَتْنِي هود وأخواتها সূরা হূদ ও এর সমশ্রেণীর সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৮১; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩৩১৪)

কোন কোন আলেম লিখেছেন, সূরা হূদের যে আয়াতখানি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃদ্ধ করে দিয়েছিল, তা হল-

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের উপর কায়েম রাখুন।

সূরা ইউসুফ

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১২ । ১১১ আয়াত । ১২ রুকূ । মক্কী

آياتها ١١١ ركوعاتها ١٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ①

১. আলিফ লা-ম রা-; এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[১]।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ②

২. আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষার কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার[২]।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ

৩. আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি অতি উত্তম বর্ণনা– আপনার নিকট এই কুরআন পাঠানোর মাধ্যমে। আর নিশ্চয় ইতিপূর্বে

---

১. এ কিতাব যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, তা একেবারে সুস্পষ্ট। আর যে হুকুম-আহকাম ও দীনি বিধিবিধান এবং নসীহত ও উপদেশ এতে রয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সমুজ্জ্বল।

২. অর্থাৎ যে আরবী ভাষা সাহিত্যশিল্পে সকল ভাষার চেয়ে মাধুর্যপূর্ণ, প্রাচুর্যশালী ও শৃঙ্খলাপূর্ণ, তাকে কুরআনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আর যখন স্বয়ং পয়গম্বরই আরবীভাষী, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, দুনিয়াতে তাঁর প্রথম শ্রোতারা আরবীভাষীই হবেন। অতঃপর আরবদের মাধ্যমে চতুর্দিকে এই আলো ছড়াবে। لعلكم تعقلون এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেন যে, 'তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ করার একটি কারণ এই যে, তোমরা পয়গম্বর আলাইহিস সালামের জাতি হিসাবে সর্বাগ্রে এর উলূম ও মা'আরেফ (জ্ঞান-রাশি ও তত্ত্ব-তথ্যের) স্বাদ আস্বাদন কর, তারপর অন্যদের আস্বাদন করাও।' বস্তুত এমনই হয়েছিল। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর (র) লেখেন-

أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وابتداء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه.

(সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, সর্বোত্তম ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। আর এ হয়েছিল পৃথিবীর সর্বোত্তম ভূখণ্ড মক্কায় এবং এ কিতাবের অবতরণের সূচনা হয় বছরের সর্বোত্তম মাস রমযানে। এভাবে পবিত্র কুরআন সব দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে।)

مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ۝

আপনি (এ ঘটনা সম্পর্কে) অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন[১]।

১. অর্থাৎ পবিত্র কুরআনরূপে আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হচ্ছে, তার মাধ্যমে আমি অতি উত্তম একটি ঘটনা অতি সুন্দর উপায়ে আপনাকে শোনাচ্ছি, যে ঘটনা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত আপনার জাতির ন্যায় আপনিও বেখবর রয়েছেন। যদিও এ ঘটনা ইতিহাসের বই-পুস্তকে ও বাইবেলগ্রন্থে পূর্ব থেকেই উল্লেখিত আছে, কিন্তু তা নিতান্তই গল্প-কাহিনীর আকারে ছিল। কুরআন কারীম তার জরুরী ও উপাদেয় অংশগুলিকে এমন বিস্ময়করভাবে বিন্যাস করেছে এবং মাধুর্যপূর্ণ ও আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে, যা শুধু ঐতিহাসিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেই অবহিত করেনি, বরং স্থানে স্থানে অত্যন্ত উচ্চমানের ফলাফলের দিকেও পথপ্রদর্শন করেছে এবং কাহিনীর ভিতর দিয়ে উলূম (জ্ঞানরাশি) ও হেদায়াতের বহু দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়াবলি

আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাক্দীরকে কোন শক্তিই প্রতিহত করতে পারে না। তিনি কারো প্রতি দয়া করতে চাইলে সমগ্র জগত মিলেও সম্ভাব্য সকল চেষ্টা-তদবীর দ্বারা তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। ধৈর্য ও দৃঢ়তাই পার্থিব ও পরকালীন সাফল্যের চাবিকাঠি। হিংসা ও শত্রুতার পরিণাম ক্ষতি ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। নানা সমস্যার সমাধানে ও মানবজীবনে সাফল্য আনয়নের উপায় হিসাবে মানববুদ্ধি এক অমূল্য পরশ-পাথর। চারিত্রিক পবিত্রতা ও নৈতিক বিশুদ্ধতা মানুষকে শত্রু ও হিংসুকদের নজরেও শেষ পর্যন্ত সম্মানিত করে তোলে — এ সমস্ত সত্য এবং এ ধরনের অসংখ্য তত্ত্ব ও তথ্য এই অতি উত্তম কাহিনীর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

শানে নুযূল :

মুফাসসিরগণ এ সূরার শানে-নুযূলে কয়েকখানি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সবগুলি একত্র করলে মর্ম এই দাঁড়ায় যে, ইহুদীরা মক্কার মুশরিকদের মাধ্যমে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, হযরত ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানসন্ততি তো শামদেশে থাকতেন। সুতরাং (তাঁরই অধস্তন বংশধর) বনী ইসরাঈল মিশরে কী করে পৌঁছল, যে কারণে মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরাওনের সাথে সংঘাতে আসতে হল? (তাফসীরে বাগাবী ২/৪১১; তাফসীরে যামাখশারী ২/৪৪০ (من غير إسناد)—সম্ভবত মুসলমানরাও শিক্ষাদীক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টিভরা এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শোনার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকবে।

এদিকে এ কাহিনীর ভিতর দিয়ে যেসব অবস্থা ও বিষয় আলোচিত হওয়ার ছিল, তা কয়েকভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর জাতির অবস্থাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল এবং সেসবের আলোচনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে প্রশান্তির কারণ ও তাঁর জাতির জন্য শিক্ষার বিষয় ছিল।

৪. (স্মরণ কর), যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি, আমি ওদের দেখেছি আমার উদ্দেশ্যে সেজদারত অবস্থায়[১]।'

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ۝

৫. তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না। অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু[২]।

قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۝

এ সব কারণে যথেষ্ট তফসীলের সাথে কুরআন কারীমে এ পুরা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাতে প্রশ্নকারীরা জানতে পারে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাই ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ও তাঁর সন্তানসন্ততির জন্য শামদেশ থেকে মিসরে আসার কারণ হয়েছিল। অতঃপর সেখানেই তাদের বংশ প্রসারিত হতে থাকল, যত দিন না হযরত মূসা (আ) এসে ফেরাওন ও কিবৃতীদের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

১. অর্থাৎ এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য আমার সামনে ঝুঁকছে ও অবনত হচ্ছে। এই স্বপ্ন তিনি শৈশবে দেখেছিলেন। সত্য বটে–

ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات

অর্থ : সম্ভাবনাময় চারার চকচকে পাতা।

২. অর্থাৎ শয়তান সর্বদা মানুষের জন্য ওঁত পেতে আছে। সে কুমন্ত্রণা দিয়ে ভাইদের তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। কারণ, স্বপ্নের তাবীর অত্যন্ত স্পষ্ট। এগার তারকা হচ্ছে এগার ভাই এবং চন্দ্র-সূর্য হচ্ছে মাতাপিতা। অর্থাৎ এরা সকলে কোন সময় ইউসুফ আলাইহিস সালামের মহামর্যাদার সামনে মাথা অবনত করবে। সূরার শেষাংশে يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মনে হয়, এ স্বপ্নের পূর্বেই হযরত ইয়াকূব (আ) অনুভব করতেন যে, ইউসুফের প্রতি পিতার সবিশেষ স্নেহ-বাৎসল্য লক্ষ করে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা মনে মনে জ্বলছে। এখন তিনি চিন্তা করলেন, তারা যদি কোন উপায়ে এ স্বপ্নের কথা শুনে ফেলে, তবে শয়তান তাদের অন্তরে ঈর্ষার আগুন প্রজ্বলিত করবে এবং সম্ভবত তারা ঈর্ষাবশে চক্ষু বন্ধ করে এমন কিছু করে বসবে, যা ইউসুফের কষ্ট এবং তাদের নিজেদের অপমান ও অশুভ পরিণামের কারণ হবে। এজন্য তিনি ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সামনে স্বপ্নটি প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিলেন। 'বিনয়ামীন' নামে ইউসুফের একজন আপন (সহোদর) ভাই ছিল, তার সামনেও

৬. 'এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন[১] এবং তোমাকে 'বিবিধ বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যাদান' শিক্ষা দেবেন[২] এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন[৩] যেমন এর পূর্বে

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ

উল্লেখ করার অনুমতি দিলেন না। যদিও তার দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু অসতর্ক হয়ে অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা কি নবী ছিল?!

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র) একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় লিখেছেন যে, 'পবিত্র কুরআন, অভিধান ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল-প্রমাণ — কোন কিছুই এই মতের সমর্থন করে না যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা নবী ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ রকম কোন সংবাদ দেননি, সাহাবীদের (রা) মধ্যেও কেউ এর প্রবক্তা ছিলেন না। আচ্ছা, মাতাপিতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ, মুসলমান ভাইকে হত্যার পদক্ষেপ, তাকে দাস বানিয়ে বিক্রয় করে ফেলা ও অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেওয়া, তারপর ডাহা মিথ্যা ও কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ঘৃণ্য আচরণ কি (হোক না তা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই) কোন নবীর কাজ বলে ভাবা যেতে পারে? (আল্লাহর পানাহ!) যারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের ব্যাপারে নবুওয়াতের ধারণা প্রকাশ করেছেন, তাদের নিকট (কুরআনে ব্যবহৃত) أسباط শব্দ ছাড়া আর কোনই প্রমাণ নেই, অথচ أسباط শব্দটি শুধু ঔরষজাত সন্তানাদি নয়, বরং জাতি ও সম্প্রদায় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর أسباط হিসাবে বনী ইসরাঈলের বিভক্তি হয়েছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সময়ে, এর পূর্বে নয়।

১. অর্থাৎ তোমাকে যেমন এরূপ ভাল স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তদ্রূপ স্বীয় রহমতে নিজ দরবারে তোমাকে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন। সে মত আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন এবং বিভিন্ন রকম জাহেরী ও বাতেনী নে'য়ামত ও অনুগ্রহ প্রদান করলেন।

২. যেমন স্বপ্নের তা'বীর অর্থাৎ স্বপ্ন শুনে মেধা ও বিচক্ষণতা দ্বারা তার অংশগুলির সঠিক ব্যাখ্যাদান, প্রত্যেক বিষয়ের স্থান-কাল উপলব্ধি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পরিণতি ও ফলাফল ঝটপট বুঝতে পারা, অথবা আল্লাহ ও পয়গম্বরদের বাণীসমূহ, জাতিনিচয় ও উম্মতদের ঘটনাবলি এবং আসমানী কিতাবের বিষয়াবলির গভীরে পৌছে যাওয়া —এ সব কিছুই تأويل الأحاديث এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. অর্থাৎ পরকালীন নে'য়ামতের সাথে পার্থিব নে'য়ামতও দান করবেন। নবুওয়াতের সাথে বাদশাহীতে অংশ দান করবেন। এবং দু:খ-কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জীবন দান করবেন। ইয়াকূব (আ)-এর পরিবার-পরিজনকে পার্থিব দুরবস্থা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁদের বংশধর থেকে বড় বড় পয়গম্বর ও বাদশাহ পয়দা করবেন।

مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি তা পূর্ণ করেছিলেন[১]। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[২]।'

[রুকূ - ২]

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۞

৭. নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের (ঘটনাতে) জিজ্ঞাসুদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[৩]–

---

১. হযরত ইয়াকূব (আ) বিনয়বশত নিজের নাম নেননি, নিজের পিতা হযরত ইসহাক (আ) ও তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ তাআলা নিজের দোস্ত (خليل) ও নবী বানালেন, তাঁর দুশমন নমরূদকে ধ্বংস করলেন, অগ্নিশিখাকে তাঁর জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। হযরত ইসহাককে নবুওয়াত দান করলেন। অতঃপর তাঁর ঔরষে হযরত ইয়াকূবের ন্যায় নবী পয়দা করলেন, যাঁর থেকে বনী ইসরাঈলের নবীদের সিলসিলা সামনে অগ্রসর হল। সহীহ হাদীছে রয়েছে :

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم পুত্র নিজে মহৎ, তাঁর পিতাও মহৎ, তার পিতাও মহৎ এবং তাঁর পিতাও মহৎ, অর্থাৎ 'ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৯০)

বি. দ্র. হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তার কিছু অংশ খুব সম্ভব হযরত ইউসুফের স্বপ্ন থেকে বুঝেছিলেন এবং এ থেকে যে, এত অল্প বয়সে এমন সুন্দর ও বরকতময় স্বপ্ন দেখলেন! আর কিছু অংশ বুঝে থাকবেন হযরত ইউসুফের স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলি থেকে; অথবা ওহীর মাধ্যমে এ সব বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকবেন।

২. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের উপযোগিতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত আছেন, তিনি নিজ হেকমতগুণে সে মত ফয়েয দান করে থাকেন।

৩. **এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়াবলি**

অর্থাৎ যারা এ ধরনের ঘটনাবলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে চায়, তাদের জন্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীর মধ্যে হেদায়াত ও শিক্ষার বহু নিদর্শন বিদ্যমান। এ কাহিনী শুনে অন্তরে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরত ও হেকমতের নকশা অঙ্কিত হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। কেননা, তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও এবং কোন কিতাব বা শিক্ষক থেকে সবক গ্রহণ করা ছাড়াই এমন সব পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করছেন, যার বিবরণ দেওয়া খোদায়ী জ্ঞান ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়।

বিশেষত যে মক্কাবাসী কুরায়শরা ইহুদীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এ কাহিনী সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, ওদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে অনেক

৮. যখন তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়, অথচ আমরা শক্তিশালী একটি দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছেন[১]।

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ۝

শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তা হল, হযরত ইউসুফকে তাঁর ভাইয়েরা ঘর থেকে বের করল, হিংসাবশত হত্যা বা দেশান্তর করার পরামর্শ করল, বিভিন্ন রকম দুঃখ-কষ্ট দিল, হেয় ও লাঞ্ছিত করতে কোন ত্রুটি করল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একদিন এল, যখন তারা অনুতপ্ত ও মুখাপেক্ষী হয়ে ইউসুফের শরণাপন্ন হল। ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ তাআলা দীন ও দুনিয়ার মান-মর্যাদার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর তিনি নিজের উন্নতি ও প্রতিপত্তির সময়েও ভাইদের অন্যায়-অপরাধ উপেক্ষা করলেন এবং অত্যন্ত উদারচিত্তে সকলের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞাতিগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অভিসন্ধি করেছিল, তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দিল, মান-ইজ্জতের উপর হামলা করল, এমন কি দেশত্যাগে বাধ্য করল। কিন্তু সত্বর সেদিন আসল, যখন দেশান্তরিত অবস্থায় তাঁর সফলতা ও উচ্চমর্যাদার সূর্য উদয় হল এবং কয়েক বছর পরেই মক্কা বিজয়ের সেই ঐতিহাসিক দিন সমাগত হল, যখন তিনি স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাইদের বিগত অন্যায়-অপরাধের প্রতি হুবহু হযরত ইউসুফের ক্ষমার ভাষা- لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই) উচ্চারণ করে তাদের মাফ করে দিলেন।

১. হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম ইউসুফ (আ.) ও তাঁর আপন ভাই বিনয়ামীনকে খুব বেশী স্নেহ করতেন। কেননা, এরা উভয়ে তাদের বৈমাত্রেয় ভাইদের থেকে ছোট ছিলেন, মাতৃহারা ছিলেন এবং বিশেষ করে হযরত ইউসুফ সম্পর্কে নিজ অন্তর্দৃষ্টির আলোতে অথবা খোদায়ী ইলহাম দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল হবে এবং নবুওয়াতের বংশীয় ধারা তাঁরই সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। স্বয়ং ইউসুফ (আ) এর উত্তম সূরত ও সীরাত (আকৃতি ও প্রকৃতি) এবং জাহেরী ও বাতেনী গুণাবলি তাঁর বৃদ্ধ পিতার বিশেষ মহব্বতকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত। আর এ ছিল অন্য ভাইদের নিকট অসহনীয়। তারা বলত, প্রয়োজনের সময় কাজে লাগব তো আমরা, আমরা একটি শক্তিশালী দল, যা পিতার বার্ধক্যে কাজে আসবে। আর এই ছোট ছেলেদের দ্বারা কী আশা করা যেতে পারে?

এ সব ধারণার বশবর্তী হয়ে আপন বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে তারা বলত, তিনি এ বিষয়ে দারুণ ভ্রান্তি ও স্পষ্ট অন্যায়ের মধ্যে রয়েছেন, নিজ লাভ ও ক্ষতির সঠিক পরিমাপ করতে পারছেন না।

৯. 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন (দূর) দেশে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট থাকবে[১]; আর এর পর তোমরা ভাল মানুষ হয়ে যাবে[২]।'

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِينَ۝

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দাও, যাতে মুসাফিরদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যায়; যদি তোমরা (কিছু) করতে চাও (তবে এ-ই কর)[৩]।'

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِينَ۝

১. অর্থাৎ তারা ভিতরে ভিতরে হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলছিল। অবশেষে পরস্পর পরামর্শ করল যে, ইউসুফের বর্তমানে যেহেতু বৃদ্ধ পিতার বিশেষ মহব্বত ও সুদৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়, অতএব ইউসুফের কাহিনীই খতম করে দিতে হবে, চাই হত্যা করে হোক অথবা কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়ে হোক, যেখান থেকে সে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। তার অবর্তমানে পিতার সমস্ত সুদৃষ্টি ও আদর-স্নেহের পাত্র এককভাবে আমরাই হব।

বিনয়ামীনের ব্যাপারটা সম্ভবত তাদের কাছে কোন গুরুত্ব রাখত না। কেননা, তার প্রতি পিতার মহব্বতকে তারা ইউসুফের প্রতি মহব্বতেরই রেশ বা পরিশিষ্ট মনে করত।

২. অর্থাৎ একবার হত্যা প্রভৃতি পাপ কাজ করতে হবে। এরপর তওবা করে নেব এবং খুবই ভাল মানুষ হয়ে যাব– এ যেন 'মদও না ছাড়লাম, বেহেশতও না হারালাম'।

কোন কোন মুফাসসির وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ এর এই অর্থ করেছেন যে, ইউসুফের পর আমাদের সকল কাজ ঠিক ও দুরুস্ত হয়ে যাবে। কারণ, ইউসুফ থেকে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ পিতার সদয় হাত কেবল আমাদেরই মাথার উপর থাকবে।

৩. এ ব্যক্তি ছিল 'ইয়াহূদা'। সে বলল, হত্যা করাটা সাংঘাতিক ব্যাপার; আর হত্যা ছাড়াও আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। ইউসুফকে নিতান্ত সরাতে হলে সহজ উপায় এই যে, লোকালয় থেকে দূরে কোন অজ্ঞাত কূপে তাকে ফেলে দাও।

মুফাসসির আবু হায়্যান কোন কোন আরবী ভাষাবিদ থেকে নকল করেছেন যে, غَيَابَةِ الْجُبِّ বলা হয় কূপের ভিতর পানি থেকে একটু উপরে নির্মিত তাকবিশেষকে। তাদের কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যার পাপ অযথা মাথায় নিয়ে লাভ কী? বরং এরূপ কূপে ফেলে দেওয়ার পর প্রবল সম্ভাবনা এই যে, সেদিক দিয়ে কোন মুসাফির যাতায়াত করবে এবং খবর পেয়ে তাকে কূপ থেকে বের করে নিয়ে যাবে। এ উপায়ে আমাদের উদ্দেশ্যও হাসিল হবে, আর অন্যায় খুনে হাতও রঙিন হবে না, অর্থাৎ 'সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না'।

১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কী হল যে, আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তো অবশ্যই তার হিতাকাঙ্ক্ষী[১]?

قَالُوۡا یٰۤاَبَانَا مَا لَکَ لَا تَاۡمَنَّا عَلٰی یُوۡسُفَ وَ اِنَّا لَہٗ لَنٰصِحُوۡنَ ﴿۱۱﴾

১২. 'আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন– সে মনভরে খাবে ও খেলবে। আর আমরা তো তার রক্ষণাবেক্ষণকারী আছিই[২]।'

اَرۡسِلۡہُ مَعَنَا غَدًا یَّرۡتَعۡ وَ یَلۡعَبۡ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১৩. তিনি বললেন, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাবে– এ বিষয়টি আমাকে পীড়া দেয় এবং আমি আশঙ্কা করি যে, তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলবে আর তোমরা তার সম্বন্ধে থাকবে উদাসীন[৩]।'

قَالَ اِنِّیۡ لَیَحۡزُنُنِیۡۤ اَنۡ تَذۡہَبُوۡا بِہٖ وَ اَخَافُ اَنۡ یَّاۡکُلَہُ الذِّئۡبُ وَ اَنۡتُمۡ عَنۡہُ غٰفِلُوۡنَ ﴿۱۳﴾

---

১. এতে বোঝা যায়, পূর্বেও তারা পিতার নিকট এ ধরনের আবেদন করেছিল। কিন্তু তাদের সাথে পাঠাতে তাঁর অন্তর সায় দেয়নি।

২. অর্থাৎ ঘরে থেকে থেকে এমন সুদর্শন ছেলের শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের সাথে তাকে ছাগল চড়াতে মাঠে যেতে দিন। সেখানে মাঠের ফলমূল খুব করে খাবে এবং খেলাধুলার দ্বারা শারীরিক ব্যায়ামও হবে। কথিত আছে, তাদের খেলাধুলা ছিল দৌড়াদৌড়ি ও তীর-ছোড়াছুড়ি। আর এমনিতেও, যেমন আবু হায়্যান বলেছেন, শিশুদের জন্য সংগত সীমা পর্যন্ত খেলাধুলা করা স্বাস্থ্য ও আনন্দের কারণ হয়ে থাকে।

মোটকথা, ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াকূব (আ) এর নিকট তারা জোরদার আবদার করল এবং সর্বক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করল। মুফাসসিররগণ লিখেছেন, তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য এবং পিতা থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য স্বয়ং ইউসুফকে তারা আলাদাভাবে উৎসাহিত করেছিল।

৩. অর্থাৎ ইউসুফের বিচ্ছেদ এবং তোমাদের সাথে সে কোথাও যাবে– এ কল্পনাই আমাকে চিন্তিত করে তোলে। তদুপরি এই ভয়ও হয় যে, এখনো সে শিশু। তোমাদের উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার সুযোগে নেকড়ে ইত্যাদি কোন হিংস্র পশু তাকে আক্রমণ করে নাকি। বর্ণিত আছে, সেই জঙ্গলে অনেক নেকড়ে ছিল। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পরবর্তীতে ওরা নেকড়ের বাহানাই করত, সেই আশঙ্কা তাঁর অন্তরে পূর্বেই জেগে উঠল।'

কোন কোন আলেমের ধারণা, اَخَافُ اَنۡ یَّاۡکُلَہُ الذِّئۡبُ – এ উক্তি হযরত ইয়াকূব (আ) এর মত পয়গম্বরের পক্ষে 'তায়াক্কুল ও তাফবীয' (বা আল্লাহ-ভরসা ও তাঁর নিকট সমর্পন) এর

১৪. তারা বলল, 'যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, তবে তো আমরা সবই হারালাম☆১।'

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ⑭

১৫. অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে স্থির করল যে, তাকে কূপের গভীরে ফেলে দেবে– (তখন তার সাথে যা যা করার করল এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে ফেলল)। আর আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে, '(এক সময়) তুমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের এ কর্মের কথা অবহিত করবে, আর তখন তারা (তোমাকে) চিনতে পারবে না২।'

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑮

উচ্চস্তর থেকে সামান্য নিম্নের ছিল। পরিণতি এই হল যে, ছেলেরা তাঁরই মুখের কথা লুফে নিল এবং যে আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করছিলেন, তাকেই বাস্তব ঘটনা বানিয়ে উপস্থিত করল।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তবে তো আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলাম'। বা– 'তবে তো আমরা অতি দুর্বল সাব্যস্ত হলাম'।

১. অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী একটি দল থাকতে ছোট ভাইকে যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তবে বুঝতে হবে আমরা একেবারেই অপদার্থ। এর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ততা আর কী হতে পারে যে, দশ-বারজন সবলদেহী ভাইয়ের চোখের সামনে থেকে একটি দুর্বল শিশু একটা নেকড়ের মুখে পৌঁছে যাবে? এমনটি হলে বলতেই হবে যে, আমরা নিজেদের সবকিছুই হারিয়ে বসেছি।

২. মুফাসসিরগণ এস্থলে মধ্যবর্তী অনেক কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারকভাবে বর্ণনা করেছেন, যেগুলো শুনে পাথরও গলে যায়। সেসব কতদূর সত্য তা আল্লাহই জানেন। কাহিনী বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তার প্রেক্ষাপটে কুরআন এ ধরনের ইতিবৃত্তকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মনে করে না। কারণ, এ অংশের সাথে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট নয়। কুরআন কারীম নিজ শ্রোতাদের অন্তরে সেই কান্না ও ভাবের সৃষ্টি করতে চায়, যার উৎস হচ্ছে একমাত্র ঈমান এবং আল্লাহর মুহাব্বত ও মারেফত। যে দয়া ও মমত্ববোধ প্রত্যেক কাফের ও মুমিন, এমন কি জীবজন্তুর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান রয়েছে, সাধারণ বক্তাদের মত তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া কুরআনের বৈশিষ্ট্য নয়।

এ ক্ষেত্রেও কুরআন মাঝখানের ঘটনাবলি বাদ দিয়ে শেষ কথা বলে দিয়েছে যে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে সূক্ষ্ম কৌশলে পিতার নিকট থেকে নিয়ে গেল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী

১৬. রাতের অন্ধকার নেমে এলে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল[১]।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۝١٦

১৭. তারা বলতে লাগল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে[২]। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই[৩]।'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝١٧

কুয়ায় ফেলে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সেই সময় আমি (আল্লাহ তাআলা) ইউসুফকে অন্যরা মোটেই বুঝতে না পারে এমনভাবে ইশারায় বলে দিলাম, তুমি ঘাবড়িয়ো না। এমন এক সময় আসবে, যখন এ সব কর্মকাণ্ড তুমি তাদের স্মরণ করাবে। আর তখন তুমি এমন উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, এরা তোমাকে চিনতে পারবে না, অথবা অনেক দিনের ব্যবধানের ফলে তোমাকে চিনে উঠতে পারবে না।

উক্ত ইশারা কি স্বপ্নে ছিল, না জাগ্রত অবস্থায়, ইলহামের দ্বারা না ফেরেশতার মাধ্যমে — এর বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে নেই। অবশ্য বাহ্যিক শব্দাবলি (واوحينا اليه) দর্শনে বলা হয়েছে যে, ওহীর আগমণ চল্লিশ বছর বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়, যেহেতু হযরত ইউসুফ তখন খুবই অল্পবয়স্ক ছিলেন।

১. হয় তাদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার নেমে এল, অথবা তারা ইচ্ছা করেই অন্ধকার হওয়ার পর এল। কারণ, দিনের আলোতে পিতাকে মুখ দেখানো বেশ কঠিন ছিল। আর রাতের আঁধারের চাদরে নির্লজ্জতা, পাষান হৃদয় ও মিথ্যা হায়-হুতাশ কিছুটা হলেও ঢাকা সম্ভব ছিল।

ইমাম আ'মাশ (র) চমৎকার বলেছেন, 'ইউসুফের ভাইদের কান্নাকাটির কাহিনী শোনার পর এখন শুধুমাত্র অশ্রুসিক্ত চোখ দেখে কোন ব্যক্তিকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।

২. অর্থাৎ তার রক্ষণাবেক্ষণে আমরা কোনো ত্রুটি করিনি। আমাদের জামা-কাপড় ইত্যাদি হেফাজতযোগ্য জিনিসপত্র যে স্থানে রেখেছিলাম, সেখানে ইউসুফকে বসিয়ে আমরা পরস্পর দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলাম। ব্যস, চোখের আড়াল হওয়ামাত্র নেকড়ে এসে তাকে নিয়ে গেল। এতটুকু সময়ের মধ্যে নেকড়ে এসে তাকে শিকার করে নিয়ে যাবে এটা আমরা কল্পনাও করি নাই।

৩. অর্থাৎ ইউসুফের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই আমাদের প্রতি আপনার কুধারণা রয়েছে, আমরা সম্পূর্ণ সত্য হলেও আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।

১৮. আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে এনেছিল[১]। ইয়াকুব (আ) বললেন, '(কক্ষনো এমন নয়), বরং তোমাদের নফ্স তোমাদের জন্য একটি কথা সাজিয়ে দিয়েছে। এখন ধৈর্যই উত্তম* । আর তোমরা যা বলছ, তার ব্যাপারে আমি আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি[২]।'

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

১৯. (সেই কূপের ধারে) এক যাত্রীদল এল। এবং তারা নিজেদের পানিসংগ্রাহককে পাঠাল। সে

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ

১. একটি বকরি বা হরিণ যবেহ করে এর রক্তে ইউসুফের জামা রঙিন করে এনেছিল। তারা মিথ্যা রক্ত পেশ করে পিতাকে নিশ্চিত করতে চাইল যে, নেকড়ের আক্রমনেই এই জামা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'এখন উত্তমরূপে ধৈর্য ধরাই (আমার কাজ)।

২. যিনি শামে বসে সুদূর মিশর থেকে ইউসুফের জামার খুশবূ পান, তিনি ছাগলের রক্তকে ইউসুফের রক্ত মনে করতে পারেন কী করে? তিনি শোনামাত্র তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন। এবং (কতিপয় তাফসীরের বর্ণনা অনুযায়ী) বলতে লাগলেন, সেই নেকড়েটি বাস্তবে বড়ই সহনশীল ও ধীরস্থির যে, সে ইউসুফকে তো নিয়ে গেছে কিন্তু রক্তমিশ্রিত জামাটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অক্ষত অবস্থায় খুলে রেখে গেছে!! সত্যই دروغ گورا حافظ نباشد (মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না)।

তারা রক্তের দাগ লাগিয়েছিল বটে, কিন্তু জামাটি ছেঁড়া-ফাড়া অবস্থায় পেশ করতে মনে ছিল না। হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম পরিষ্কার বলে ফেললেন, এ সব কিছু তোমাদের দুরভিসন্ধি ও মনগড়া কথা। যা হোক, আমি সব্‌রে-জামীল (উত্তম ধৈর্য) ধারণ করছি, যার মধ্যে অন্য কারো কাছে অভিযোগও হবে না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টাও হবে না। একমাত্র আমার আল্লাহর দরবারে দো'য়া করছি। ধৈর্যধারণে তিনি যেন আমাকে মদদ করেন এবং নিজ গায়বী সাহায্য দ্বারা তোমাদের কথাবার্তার প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করে দেন, যাতে পুনরায় ইউসুফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

মনে হয়, ইয়াকুব (আ) কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তা পূর্ণ হবেই এবং নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে খোঁজা-খুঁজি করে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফায়দা নেই। কেননা, ইউসুফকে তো এখন পাওয়া যবে না। হ্যাঁ, খোঁজাখুঁজির কারণে অন্য ছেলেরা সারা দুনিয়ায় অপদস্থ হবে। ফলে আশঙ্কা আছে যে, তারা রাগ হয়ে স্বয়ং ইয়াকুব (আ) এর কোন ক্ষতি করবে।

فَاَدْلٰی دَلْوَهٗ ؕ قَالَ یٰبُشْرٰی هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ⑲

(কূপে) নিজ বালতি ঝুলিয়ে দিল। (তখন) সে বলে উঠল, 'কী খুশির কথা, এ যে একটি বালক[১]!' এবং তারা পণ্যদ্রব্য মনে করে তাকে গোপন করল[২]। আর তারা যা কিছু করছিল, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন[৩]।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ

২০. এবং তার ভাইয়েরা তাকে সামান্য মূল্যে–মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল[৪]।

---

১. কথিত আছে, তিন দিন পর্যন্ত ইউসুফ কুয়ায় থাকেন। আল্লাহর কুদরত তাকে রক্ষা করে। 'ইয়াহূদা' নামক ভাইয়ের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়, সে প্রতিদিন সেখানে খাদ্য পৌছিয়ে আসত। এছাড়া অন্য ভাইয়েরাও খবর নিত, যাতে মারা না যায়। তারা এ অপেক্ষায় ছিল যে, কোন বিদেশী মুসাফির তাকে তুলে নিলেই আমাদের কাঁটা দূর হয়ে যায়। কবি সত্যই বলেছেন-

گل است سعدی و در چشم دشمناں خار است

(সা'দী তো একটি ফুল, কিন্তু দুশমনদের চোখে একটা কাঁটা)।

অবশেষে মাদয়ান থেকে মিশরগামী একটি কাফেলা সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কূপ দেখতে পেয়ে নিজেদের এক ব্যক্তিকে পানি তুলতে পাঠাল। সে বালতি ফেলল, আর হযরত ইউসুফ ছোট হওয়ায় বালতিতে চড়ে বসলেন এবং হাত দিয়ে রশি ধরে রাখলেন। এভাবে উপরে উঠে আসলেন। বালতিওয়ালা তাঁর সৌন্দর্য দর্শনে আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'এ যে সুদর্শন এক বালক! অনেক মূল্যে বিক্রি হবে।'

২. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) কে কুয়া থেকে উত্তোলনকারী (ও তার বিশিষ্ট সাথীরা) ঘটনাটি যাত্রীদলের অন্যদের থেকে গোপন করতে চাইল। কারণ, অন্যরা জানতে পারলে সকলেই অংশীদার হয়ে বসবে। সম্ভবত তারা বলেছিল, 'এই গোলামকে তার মুনিবেরা আমাকে দিয়েছে মিসরের বাজারে বেচার জন্য।'

৩. অর্থাৎ ভাইয়েরা তাঁকে দেশান্তরিত করতে চাচ্ছিল আর যাত্রীদলের লোকেরা তাঁকে বিক্রয় করে মূল্য উসূল করার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে মিশরের রাজকোষের মালিক বানাতে চাচ্ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের এ সব কার্যকলাপ প্রতিহত করে দিতে পারতেন। কিন্তুবিলম্ব করার মধ্যে-ই তাঁর হেকমত নিহিত ছিল। তাই সবকিছু জানা ও দেখা সত্ত্বেও তাদের অবকাশ দিলেন।

৪. ভাইয়েরা জানতে পারল, যাত্রীদলের লোকেরা ইউসুফকে বের করে এনেছে। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, এ আমাদের গোলাম, পালিয়ে এসেছে। তবে যেহেতু তার পালানোর

وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ

আর তার ব্যাপারে তারা ছিল নিরাসক্ত[১]।

[রুকূ - ৩]

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ؗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

২১. মিসরে যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, সম্ভবত এ আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব[২]। আর এভাবেই আমি (সেই) ভূখণ্ডে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এবং এ জন্যও (প্রতিষ্ঠিত করলাম), যাতে তাকে 'বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যাদান' শিক্ষা দেই[৩]।

অভ্যাস, তাই আমরা রাখতে চাই না। তোমরা কিনতে চাইলে কিনতে পার। কিন্তু খুব সতর্ক থাকা চাই, যাতে পালাতে না পারে। কথিত আছে, আঠার বা এর চেয়ে কিছু কমবেশি দেরহামে তারা তাকে বিক্রি করে দিল এবং নয় ভাই দুই দেরহাম করে বণ্টন করে নিল। ইয়াহূদা নামের ভাই অংশ নেয়নি।

১. অর্থাৎ এত কম দামে বিক্রি করায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তারা তাঁর ব্যাপারে এতই নিরাসক্ত ছিল যে, বিনামূল্যেই বিক্রি করে ফেলত, পয়সা যা পেল তাই তাদের নিকট গনীমত (বাড়তি) মনে হল।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতে সেই বেচাকেনার কথা বলা হয়েছে, যা যাত্রীদল মিসরে গিয়ে সম্পন্ন করেছিল। যদি এমনই হয়, তবে বলতে হবে যে, তারা মুফতে যে বস্তু (হযরত ইউসুফ) পেয়েছিল তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। আর এই আশঙ্কাও ছিল যে, কেউ এসে দাবি করে বসতে পারে। তদুপরি পলাতক হওয়ার দোষের কথাও তারা শুনেছিল। এ সব কারণে সস্তা মূল্যেই বিক্রয় করে দিল। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

২. কথিত আছে, মিসরে পৌছার পর ইউসুফকে নিলামে তোলা হয়। মিসরের আযীয, যিনি সেখানকার উচ্চ পর্যায়ের শাসক ছিলেন, সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করায় তার ডাকের উপর নিলামপর্ব সমাপ্ত হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রী যুলায়খা বা রাঈলকে বললেন, 'ছেলেটি অতি আদরের, সুদর্শন ও সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে। একে পূর্ণ সমাদরে ও সম্মানে রাখ, দাসের মত ব্যবহার করো না। সম্ভবত বড় হয়ে সে আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমাদের সন্তানাদি নেই বলে তাকে পুত্র বানিয়ে নেব।'

৩. অর্থাৎ আমি আমার পূর্ণ কুদরত ও সূক্ষ্ম তদবীর দ্বারা ইউসুফকে ভাইদের হিংসাত্মক পাষণ্ডতা ও কূপের বন্দিত্ব থেকে বের করে মিসরের আযীযের কাছে পৌছিয়ে দিলাম।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾

আর আল্লাহ তাঁর কাজে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

২২. অতঃপর তিনি যখন পরিণত বয়সে উপনীত হলেন, আমি তাঁকে বিচারশক্তি ও প্রজ্ঞা দান করলাম[২]। আর এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি[৩]।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ

২৩. তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন, সে তাঁকে আত্ম-সংযম ত্যাগে প্ররোচিত করল (মন্দ

অতঃপর তার অন্তরে ইউসুফের মহব্বত ও মর্যাদা সঞ্চার করলাম। এভাবে আমি তাঁকে মিসরে সম্মানজনক স্থান দান করি এবং মিসরবাসীদের দৃষ্টিতে তাঁকে সম্মানিত ও প্রিয় করে তুলি, যাতে এ সব বিষয় তার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মর্যাদার অগ্রদূত হিসাবে কাজ করে এবং বনী ইসরাঈলকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম হয়। সেই সাথে আরো উদ্দেশ্য ছিল, মিসরের আযীযের কাছে থেকে তিনি যেন নেতৃস্থানীয় লোকদের সংস্পর্শ লাভ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি-নীতি ও ইশারা-সংকেত বুঝতে পারেন এবং প্রত্যেক বিষয় যথাস্থানে স্থাপন করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন।

বি. দ্র. এই সূরারই প্রথম রু'কূতে (আয়াত : ৬) تأويل الأحاديث শব্দটি রয়েছে। সেখানে এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ ভাইয়েরা ইউসুফকে নীচে ফেলতে চেয়েছিল, আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চতার চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দিলেন। অধিকাংশ মানুষ সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে লক্ষ করে না, মানবীয় কলা-কৌশলের মোকাবেলায় কীভাবে খোদায়ী ব্যবস্থা বিজয়ী হয়।

২. অর্থাৎ যখন ইউসুফের সকল শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণতা লাভ করল, তখন আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি আজিমুশ শান ইলম ও হেকমতের বারিধারা বর্ষিত হল। অত্যন্ত কঠিন সমস্যাদি তিনি নিজের গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করতেন, খুব সুন্দরভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে মানুষের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দিতেন, দীনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতেন। যা কিছু মুখে বলতেন তা কার্যে পরিণত করে দেখাতেন, অশ্লীল চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র এবং শরী'য়তের জ্ঞান-গরিমায় দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। স্বপ্নের তা'বীরে (স্বপ্নব্যাখ্যায়) তো তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেনই।

৩. যারা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দিকনির্দেশ মেনে বা নেক লোকদের অনুসরণে এবং আল্লাহপ্রদত্ত তাওফীক বলে সকল বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং উন্নত চরিত্র ও নেক চাল-চলন অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাদের এমনি পুরস্কারে ধন্য করেন।

وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

কাজের জন্য ফুসলাল) এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, 'তাড়াতাড়ি আস[১]।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পানাহ! তিনি তো (অর্থাৎ আযীযে মিসর) আমার মালিক, তিনি আমাকে উত্তমরূপে রেখেছেন। নিশ্চয় অন্যায়কারীদের মঙ্গল হয় না[২]।'

---

১. একদিকে তো গায়বী মদদ ও অনুগ্রহে হযরত ইউসুফ বিস্ময়কর পন্থায় লালিত-পালিত হচ্ছিলেন, অন্যদিকে আযীযের স্ত্রী (যুলায়খা) তাঁর সামনে মারাত্মক পদস্খলনকারী পরীক্ষাক্ষেত্র মেলে ধরল। অর্থাৎ হযরত ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে যুলায়খা বিমোহিত হয়ে গেল এবং হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর সকল উপায়-উপকরণ একত্র করে ইউসুফের আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চাইল।

একদিকে ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করার সব রকম সহজ উপায়-উপকরণ, যুলায়খার ঘরে ইউসুফ (আ)-এর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, নিতান্ত পিয়ার ও মহব্বতের সাথে তাঁকে প্রতিপালন, নির্জনতার সময়ে স্বয়ং মহিলার পক্ষ থেকে অদম্য কামনার প্রকাশ, অন্য কারো আসা-যাওয়ার সকল দ্বারের রুদ্ধতা; অন্যদিকে (ইউসুফের) যৌবনকাল, শক্তি-সামর্থ্যের পূর্ণ মৌসুম, অবিবাহিত জীবন— (কামরিপু চরিতার্থ করণের) এত সব চাহিদা ও আয়োজন একত্র হয়েছিল যে, সেসবের সাথে আঘাত খেয়ে অতি বড় সাধু পুরুষের তাক্ওয়াও ভেঙ্গে খানখান হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাঁকে অনুগ্রহভাজন সাব্যস্ত করে ইলম ও হেকমতের রঙে রঞ্জিত করলেন এবং পয়গম্বরসুলভ ইসমত বা নিষ্পাপতার শীর্ষদেশে তুললেন, তাঁর উপর শয়তানের আক্রমন কী করে চলবে? তিনি একটি মাত্র বাক্য معاذ الله (আল্লাহর পানাহ!) উচ্চারণ করলেন, আর শয়তানের সকল বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যিনি খোদার আশ্রয় নিলেন, তাঁর উপর কার আক্রমণ চলতে পারে?

২. অর্থাৎ আল্লাহর পানাহ, আমি এমন জঘন্য কাজ কী করে করতে পারি? তা ছাড়া 'আযীয' আমার মুরব্বী, তিনি আমাকে এমন সম্মান ও আরামে রেখেছেন। আমি কি আমার অনুগ্রহকারীর ইজ্জতের উপর আঘাত হানব? অনুগ্রহকারীর প্রতি এহেন অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকেরা কখনো কল্যাণ ও সফলতার মুখ দেখতে পারে না।

তদুপরি, আমাদের নিকট বাহ্যিক মুরব্বীর যখন এত মর্যাদা, তখন বুঝে নিতে হবে যে, প্রকৃত রবকে কতটুকু লজ্জা ও সমীহ করা উচিত, যিনি নিজ করুণায় আমাদের প্রতিপালন করেছেন এবং আমাদের খেদমত ও আরামের ব্যবস্থা করার জন্য নিজ বান্দাদের নিয়োজিত করেছে।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসিরের মতে انه এর ضمير (বা সর্বনাম) দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২৪. নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটি তাঁর ফিকির করেছিল। এবং তিনি স্ত্রীলোকটির ফিকির করেছিলেন*১; | وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'স্ত্রীলোকটি তাঁর বিষয়ে সংকল্প করেছিল এবং তাঁর মনেও ওর ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা জেগেছিল।

১. **همت به وهم بها – এর ব্যাখ্যা**

অর্থাৎ মহিলা চিন্তা করল তাঁকে ফাঁদে ফেলার, আর তিনি (ইউসুফ) চিন্তা করলেন, যেন মহিলার ফন্দি চলতে না পারে। যদি তিনি স্বীয় প্রভুর দলীল ও কুদরত প্রত্যক্ষ না করতেন, তবে তাঁর পক্ষে দৃঢ়পদ থাকা মুশকিল হত।

কোন কোন মুফাসসির وهم بها আয়াতাংশকে ولقد همت به থেকে পৃথক করত لَوْ لَا أَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যেমন: কুরআনের আয়াত (কাসাস : ১০) إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا (তিনি তাঁর অস্থিরতা প্রকাশ করেই ফেলতেন, যদি না আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে দিতাম)-এর মধ্যে অনুরূপ تركيب (বাক্যবিন্যাস) রয়েছে। এ হিসাবে ইউসুফ (আ)-এর জন্য همّ (মহিলার কামনা) সাব্যস্ত করা নয়, বরং খণ্ডন করা উদ্দেশ্য । আয়াতের তরজমা হবে, মহিলা ইউসুফকে কামনা করল, আর ইউসুফও মহিলার কামনা করতেন যদি না তিনি নিজ প্রভুর কুদরত ও হুজ্জত প্রত্যক্ষ করতেন, (তা প্রত্যক্ষ করায় তাঁর মনে কামনা জাগেনি)।

কেউ কেউ همّ بها আয়াতাংশে همّ শব্দের অর্থ আগ্রহ ও আকর্ষণ করেছেন, অর্থাৎ ইউসুফের অন্তরে কিছুটা আকর্ষণ ও আগ্রহ অনিচ্ছাকৃতভাবে পয়দা হয়েছিল। আর গরমের সময় ঠাণ্ডা পানির প্রতি রোযাদারের স্বাভাবিক আকর্ষণ যেমন কিছুমাত্র ক্ষতিকর নয়, বরং স্বাভাবিক আকর্ষণ সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা অধিকতর ছওয়াবের কারণ– তদ্রুপ বোঝা উচিত যে, এহেন শক্তিশালী চাহিদা ও উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকতে এখতিয়ার ও এরাদার বাইরে মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যদি কোন প্রকার আকর্ষণ ও আগ্রহ পয়দা হয়ে থাকে, তবে তা নিষ্পাপতারও পরিপন্থী নয় এবং তাঁর মর্যাদারও হানিকর নয়। বরং মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, যদি কোন মন্দের প্রতি বান্দার আগ্রহ হল, কিন্তু সে মত আমল করল না, তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, সে ব্যক্তি (আকর্ষন ও আগ্রহ সত্ত্বেও) আমার ভয়ে সেই মন্দ কাজে হাত লাগায়নি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৯)

যা হোক, উভয়ের ব্যাপারে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও যুলায়খার همّ ও ইউসুফের همّ এর মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে। এ জন্যই কুরআন কারীম উভয়ের هَمّ কে একই শব্দে প্রকাশ না করে দুই শব্দে প্রকাশ করেছে; এবং যুলায়খার هَمّ এর মত ইউসুফের জন্য ব্যবহৃত هَمّ এর সঙ্গে তাকীদের অর্থপ্রকাশক لام ও قد সংযুক্ত হয়নি। অপরদিকে আগে-পরে ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষিতার বহু দলীল-প্রমাণ কায়েম করা হয়েছে, যা চিন্তাশীলদের নিকট অস্পষ্ট নয়। তাফসীরে 'রূহুল মা'আনী', 'কাবীর' প্রভৃতিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾

যদি না তিনি আপন রবের নিদর্শন দেখতেন (তবে তাঁর জন্য অবিচল থাকা কঠিন হত)[১]। এরূপই হল, যাতে আমি তাঁর থেকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা দূরীভূত করি। নিশ্চয় তিনি আমার বিশেষ মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত[২]।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾

২৫. আর তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন থেকে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল, আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার নিকট পেল[৩]। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে চায়, তার শাস্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা (অন্য) যাতনাদায়ক আযাব ছাড়া আর কী[৪]?'

---

১. برهان বলা হয় দলীল ও প্রমাণকে। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) যদি তখন স্বীয় প্রভুর দলীল না দেখতেন, তবে অন্তরের গতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে শুরু করতেন। দলীল কী ছিল? যিনা যে হারাম ও জঘন্য, সে সম্পর্কে আল্লাহপ্রদত্ত দিব্যপ্রত্যয়। অথবা সেই দলীলই উদ্দেশ্য, যা তিনি যুলায়খার (আহ্বানের) উত্তরে পেশ করেছেন-إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (আল্লাহর পানাহ! আযীয হচ্ছেন আমার মালিক, তিনি আমাকে উত্তমরূপে রেখেছেন। নিশ্চয় যারা অন্যায়কারী, তারা কল্যাণ লাভ করে না।)

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর কুদরতে সেই সময় তিনি হযরত ইয়াকূব (আ)-কে দাঁতে আঙ্গুল দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, তিনি কোন গায়বী লেখা দেখতে পেলেন, যার মধ্যে তাঁকে সেই কর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছিল। والله اعلم

২. অর্থাৎ তাঁকে উক্ত برهان দেখানো এবং এভাবে অটল রাখার কারণ এই ছিল যে, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য কোন ছোট-বড় মন্দকর্ম, ইচ্ছার পর্যায়ে হোক বা আমলের পর্যায়ে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৩. আগে ছিলেন ইউসুফ, যাতে শীঘ্র দরজা খুলে বের হয়ে যেতে পারেন। আর পিছনে যুলায়খা তাঁকে ধরার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করছিল। ঘটনাক্রমে ইউসুফের জামার পিছনের অংশ যুলায়খার হাতে লেগে গেল। অমনি তা ধরে টান দিল এবং সেই টানাটানিতে জামা ছিঁড়ে গেল। কিন্তু ইউসুফ যে রকমেই হোক, ঘর থেকে বের হতে সক্ষম হলেন। এদিকে এ দুজন আগে-পিছে দরজায় গিয়ে পৌছলেন, ওদিকে মহিলার স্বামী আযীযও সেখানে এসে পৌছলেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ কথা বানাতে শুরু করল।

৪. মহিলা ইউসুফকে অভিযুক্ত করে বলল, সে আমার সঙ্গে কুকর্ম করার ইচ্ছা করেছিল। এমন ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি হল তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া, অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি প্রদান করা।

২৬. ইউসুফ বললেন, 'সে-ই আমাকে আত্মসংযম ত্যাগে প্ররোচিত করেছিল।' আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল[১]—'তাঁর জামা যদি সম্মুখ থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত্য বলেছে এবং তিনি মিথ্যাবাদী।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

২৭. 'আর যদি তাঁর জামা পিছন থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং তিনিই সত্যবাদী।'

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

২৮. অতঃপর যখন আযীয দেখল যে, তাঁর জামা পিছন থেকে ছেঁড়া তখন সে বলল, 'নিশ্চয় এ তোমাদের (স্ত্রীলোকদের) একটা চক্রান্ত। নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত গুরুতর।'

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝

২৯. 'ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটা বাদ দাও। আর (হে নারী!) তুমি নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই ছিলে পাপী[২]।

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۜ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ۝

---

১. উক্ত অবস্থায় ইউসুফকে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশার্থে বলতে হল, 'মহিলাই আমাকে সংযমহারা করতে চেয়েছিল, আমি ভেগে জান বাঁচালাম।' এ বাকবিতণ্ডা চলছিল, এমন সময় স্ত্রীলোকটির বংশীয় এক সাক্ষী আজীব তরীকায় ইউসুফের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। কোন কোন রেওয়ায়াতসূত্রে জানা যায় যে, সে দুধের শিশু ছিল। আল্লাহর কুদরতে সেই শিশু হযরত ইউসুফের নির্দোষিতা ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠল (তাফসীরে তবারী ১৩/১০৫-১০৭)। আর কোন কোন আলেম বলেছেন, শিশু নয়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল, যে এমন বুদ্ধির কথা বলতে পারল।

২. যদি সাক্ষী দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে থাকে, যেমন কোন কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে রয়েছে, তবে তার কথা বলা এবং ইউসুফের পক্ষে উপকারী সাক্ষ্য দেওয়াটাই ইউসুফের সত্যবাদিতার একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। এ অবস্থায় সম্মুখ ভাগে বা পিছন দিকে জামার ছেঁড়া হওয়াটা সাক্ষ্যের অতিরিক্ত একটি আলামত ও লক্ষণস্বরূপ।

পক্ষান্তরে সাক্ষী যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে থাকে তবে বাহ্যত মনে হয়, সে অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত ঘটনা কী, তা সম্বন্ধে অবগত ছিল। কিন্তু সে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এমন কৌশলে সাক্ষ্য দিল যে, তার সাক্ষ্যকে তাৎক্ষণিকভাবে কারো পক্ষপাতিত্বও বলা সম্ভব ছিল না, আবার শেষপর্যন্ত তা ইউসুফের নির্দোষিতাও প্রমাণ করল।

[রুকূ - ৪]

وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ امۡرَاَتُ الۡعَزِیۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۳۰﴾

৩০. সেই শহরে মহিলারা বলতে লাগল, 'আযীযের স্ত্রী নিজ গোলামকে আত্মসংযম ত্যাগে প্ররোচিত করে। গোলামের প্রেম তার অন্তরকে মোহিত করে ফেলেছে। আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি[১]।

فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَکۡرِهِنَّ اَرۡسَلَتۡ اِلَیۡهِنَّ

৩১. অতঃপর সে যখন তাদের চক্রান্তের কথা শুনল[২], তাদের ডেকে পাঠাল এবং তাদের

প্রকৃত ঘটনা প্রকাশে সাক্ষী যে পদ্ধতি অবলম্বন করল, তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অত্যন্ত যুক্তিসংগত ছিল। কেননা, মহিলার দাবি অনুযায়ী যদি ইউসুফ (আল্লাহর পানাহ!) তার প্রতি অগ্রসর হয়ে থাকেন, তবে তাঁর চেহারা মহিলার দিকে থাকবে। ফলে হাতাহাতিতে জামা সম্মুখভাগেই ছিঁড়বে। পক্ষান্তরে, ইউসুফের কথা সত্য হলে অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি যদি তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে এবং তিনি আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করে থাকেন আর সে পিছন থেকে তাঁকে ধরার জন্য ধাওয়া করে থাকে, তবে অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, জামা পিছন দিকেই ছিঁড়বে। কারণ, এক্ষেত্রে ইউসুফের মুখ তার দিকে ছিল না, বরং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করেছিলেন।

যা হোক, যখন দেখা গেল, জামা সম্মুখ দিক থেকে নয়, বরং পিছন থেকেই ছেঁড়া, তখন 'আযীযের' বুঝতে বাকী রইল না যে, এ সব হল স্ত্রীর চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজি, ইউসুফ দোষী নন। ফলে তিনি পরিষ্কার বলে ফেললেন, যুলায়খার চক্রান্তপূর্ণ কার্যক্রম ঠিক অনুরূপ, যেরূপ স্ত্রীলোকেরা সাধারণত করে থাকে। তাই তিনি ইউসুফকে অনুরোধ করে বললেন, যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে এর চর্চা করো না, তাতে অত্যন্ত অপমান ও দুর্নাম হবে। আর স্ত্রীকে বললেন, ইউসুফের কাছে অথবা আল্লাহর নিকট নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, নিশ্চিতরূপে অপরাধ তোমারই।

১. অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে শহরের মহিলারা বলাবলি শুরু করল, আযীযের স্ত্রী নিজের যুবক দাসের প্রেমে আত্মহারা হয়ে গেছে। সে তাকে সংযমহারা করে দিতে চাচ্ছে, গোলামের প্রেম তার গভীরে ঢুকে পড়েছে। অথচ এমন উচ্চপদস্থ লোকের স্ত্রীর জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, তিনি একজন গোলামের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। আমাদের মতে এ ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।

২. নারীদের কথাবার্তাকে مكر (চক্রান্ত) এজন্য বলা হয়েছে যে, ওরা চক্রান্তকারীদের মত চুপে চুপে এ সব কথা বলছিল, আর যুলায়খাকে দোষারোপ করে প্রকারান্তরে নিজেদের সতীত্ব ও সাধুতা প্রকাশ করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। অথচ ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্যের খ্যাতি যে নারীরই কানে পড়ত, সেই তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

জন্য এক বৈঠক প্রস্তুত করল। আর তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুড়ি দিল এবং বলল, '(ইউসুফ!) এদের সামনে বের হয়ে আস'। অনন্তর যখন তারা তাঁকে দেখল, তাঁর উপর অভিভূত হয়ে পড়ল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল[১] আর বলতে লাগল, 'আল্লাহর লীলা! এ তো মানুষ নয়, এ তো কোন মহিমান্বিত ফেরেশতা[২]!'

যুলায়খার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশকারী ও তার সমালোচনাকারীদের অন্তরে এ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে যে, যুলায়খাকে উত্তেজিত করে তাকে দিয়ে এমন কাজ করিয়ে ফেলা, যাতে ইউসুফকে এক নজর দেখার সৌভাগ্য হয়ে যায়, কিংবা যুলায়খার অন্তরে তাঁর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। আর এরও সম্ভাবনা আছে যে, যুলায়খা কতক স্ত্রীলোককে এ বিষয়ে নিজের বিশ্বস্ত বানিয়েছিল, কিন্তু পরে তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েছিল। এদের কার্যকলাপকেই مكر বলা হয়ে থাকতে পারে।— যা হোক, ওদের কথাবার্তাকে مكر শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করার পিছনে এ সব সম্ভাবনা রয়েছে।

১. অর্থাৎ দাওয়াত করে ঐ নারীদের ডেকে পাঠাল এবং একটি ভোজসভার আয়োজন করল, যার মধ্যে কোন কোন খাদ্যবস্তু চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল প্রভৃতি তাদের সামনে সাজিয়ে রেখে প্রত্যেক মহিলার হাতে একটি করে চাকু দিয়ে দিল, যাতে কেটে খাওয়ার দ্রব্যাদি খাওয়ার জন্য কাউকে চাকুর অপেক্ষা না করতে হয়। এ সব ব্যবস্থার পর নিকটেই কোথাও অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে সে আওয়াজ দিল, 'এদিকে বের হয়ে আস'। বাইরে আসামাত্র যেন বিদ্যুত চমকে উঠল। হঠাৎ করে ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্য দেখে মহিলারা সকলেই বোধশূন্য ও দিশাহারা হয়ে গেল এবং সম্মোহিত অবস্থায় চাকু দিয়ে ফলের স্থলে হাত কেটে ফেলল।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেন ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও সততার একটি স্বতন্ত্র দলীল কায়েম করে দিলেন। কেননা, যার অতুলনীয় সৌন্দর্যের খানিক ঝলকের সামনে নারীরা অনুভূতিশূন্য হয়ে গেল, সেই ইউসুফ (আ) তাদের রূপ-মাধুর্যের প্রতি চোখ তুলেও দেখেননি। এতে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় যে, যুলায়খা তাঁর মনোহরী রূপ-মাধুর্য দেখে আত্মহারা হয়ে গেলেও তিনি নিষ্পাপ ফেরেশতার মত নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে যান।

২. অর্থাৎ রূপ ও সৌন্দর্য এবং নূরানী আকৃতির দিক থেকে তাঁকে ফেরেশতা মনে হয়। কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

قوم إذا قُوبِلوا كانوا ملائكة ÷ حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا

৩২. আযীযের স্ত্রী বলল, 'এ-ই সেই ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা আমার নিন্দা করেছিলে[১]। নিশ্চয় আমি তাকে আত্মসংযম ত্যাগে প্ররোচিত করেছিলাম, কিন্তু সে সংযত থেকেছে[২]। তবে সে যদি তা না করে যা আমি তাকে বলছি, তবে নিশ্চয় সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং হবে অপমানিত[৩]।'

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

('তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের সৌন্দর্যের তুলনা করা হলে, তারা যেন ফেরেশতা। আর তাদের সঙ্গে লড়াই করা হলে, তারা যেন অমিত শক্তির জিন্ন')।

অথবা তাঁর চেহারা ও চাল-চলনে যে অসামান্য লাজুকতা, পবিত্রতা ও সংযমশীলতার আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা দেখে তারা বলল, ইনি মানুষ নন, কোন নিষ্পাপ ফেরেশতা হবেন।

১. এবার যুলায়খার হাতে সুযোগ আসল। সমালোচনার যে তীর নারীরা এতদিন তার প্রতি নিক্ষেপ করছিল, এখন সে তীর তাদেরই প্রতি ফিরিয়ে দিল। এ সময় فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ বলে সে যেন এই কবিতারই মর্মের প্রতিধ্বনি করছিল :

ایں است کہ خوں خوردہ ودل بردہ بے را ÷ بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسے را

(এ তো সে-ই, যে অনেকের রক্ত পান করেছে এবং অন্তর করেছে বন্দী। যদি কারো দেখার সাধ্য থাকে, তবে আল্লাহর নাম নিয়ে একবার দেখ না তার রূপ!)

২. সভার পরিবর্তিত রূপ দেখে যুলায়খা নিজের ভিতর একেবারে খুলে দিল এবং ঘটনার সত্যাসত্য প্রকাশ করত বলল, আমি অবশ্যই তাঁর দিল নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহর বান্দার এমনি সংযম ও অটলতা যে, কিছুতেই সে তা দিল না।

তার এ উক্তি দ্বারা আল্লাহ তাআলা শহরের নারীদের মজলিসে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরিপূর্ণ নিষ্পাপতা, পবিত্রতা, পরম সাধুতা ও সংযমশীলতার স্বীকৃতিপূর্ণ প্রমাণ পেশ করে দিলেন। যুলায়খার অবস্থা তখন নিম্ন কাব্যেরই অনুরূপ ছিল :

لا تخف ما صنعتْ بك الأشواقُ ÷ واشرح هواك فكلنا عُشاق

(প্রেমাসক্তি তোমায় যা করেছে তার জন্য ভয় করো না, বরং তোমার প্রেমের কথা খুলে বল, কেননা আমরা সবাই তো প্রেমিক।)

৩. এই কথাবার্তার মাধ্যমে একদিকে মহিলাদের কাছে নিজের অপারগতা ও অকৃতকার্যতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাদের সহানুভূতি লাভ করতে পারে; আর অপরদিকে ইউসুফ (আ)-কে শাসনসুলভ ধমক-ধামকের দ্বারা ভীত করাও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ভীত হয়ে ভবিষ্যতে তিনি তার মতলব চরিতার্থ করেন। অথচ কবির ভাষায়-

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّیْ كَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِیْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. ইউসুফ বললেন, 'হে আমার রব! ওরা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার নিকট বেশি পছন্দ। আর যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত হটিয়ে না দেন, তবে আমি ওদের প্রতি ঝুঁকে পড়ব এবং হয়ে যাব অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত[১]।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۴﴾

৩৪. অতএব তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁর থেকে ওদের চক্রান্ত অপসারিত করে দিলেন[২]। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা,

---

عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں ÷ کانجا ہمیشہ باد بدستست دام را

(আনকা কখনো কারো শিকার হয় না, সুতরাং জাল ফেলে কোনো লাভ নেই। জালগুলো এখানে সর্বদা বাতাসের সাথে মিশে যায়)।

১. মনে হচ্ছে, যুলায়খার ক্রোধ এবং তার কথাবর্তায় নারীরা প্রভাবিত হল। আর এমনও হতে পারে যে, তারা আগে থেকেই ফন্দি-ফিকির করে রেখেছিল! সে মত এখন মহিলারা ইউসুফকে বুঝাতে আরম্ভ করল যে, আপনার উচিত নিজের উপকারী মনিব-স্ত্রীর কথা মান্য করা, এই বেচারীর উপর এত জুলুম কেন করেন? —বলা হয়, বাহ্যত মুখে তারা যুলায়খার জন্য সুপারিশ করছিল, কিন্তু অন্তরে প্রত্যেকেই ইউসুফকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিল।

ইউসুফ যখন দেখলেন, স্ত্রীলোকেরা তাঁর পিছনে পড়েছে এবং শয়তান সর্বদিক থেকে নিজের ফাঁদ পাততে শুরু করেছে, তখন নেহাত সংকল্প ও দৃঢ়তা এবং পয়গম্বরসুলভ সংযমশিলতার সাথে এক আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করলেন, আমাকে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন। যদি আমাকে কারারুদ্ধ হতে হয়, তবে আমি কারাবাসকে পাপে লিপ্ত হওয়ার উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আপনি আমার সাহায্য না করলে আমার ভয়, আমি না জানি বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে এদের ছলনার প্রতি ঝুঁকে পড়ি।

এস্থলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের যবানীতে আল্লাহ তাআলা এ সত্যও জানিয়ে দিলেন যে, নবীদের নিষ্পাপতাও আল্লাহ তা'আলারই সাহায্যে সম্ভব হয়, আর তাঁরাও নিজেদের নিষ্পাপতার উপর গর্বিত হন না, বরং নিষ্পাপতার যে আসল উৎসস্থল (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হেফাজত ও সংরক্ষণ), তারই দিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিষ্পাপতা ও পবিত্রতার উপর পূর্ণরূপে স্থির রাখলেন, কারো প্রতারণা সফল হতে দেননি।

সর্বজ্ঞ[১]।

৩৫. অতঃপর, বহু নিদর্শন দেখার পরও তাদের (অর্থাৎ আযীয ও তার লোকজনের) কাছে সমীচীন মনে হল যে, তাঁকে কিছুকাল কারারুদ্ধ রাখতেই হবে[২]।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ۝

[রুকূ - ৫]

৩৬. তাঁর সঙ্গে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখি যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি'। আর অপরজন বলল, 'আমি নিজেকে দেখি যে, আমি নিজের মাথায় রুটি বহন করছি, যা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। আপনি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ

---

১. অর্থাৎ তিনি সকলের দো'য়া শোনেন ও খবর রাখেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বাহ্যত মনে হয়, নিজ প্রার্থনার কারণে তিনি কারাগারে পতিত হলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এতটুকুই কবুল করলেন যে, ওদের চক্রান্ত হটিয়ে দিলেন। আর বন্দী হওয়া তাঁর ভাগ্যে ছিল। মানুষের উচিত, ঘাবড়ে গিয়ে নিজের জন্য অমঙ্গল প্রার্থনা না করা, বরং পরিপূর্ণ মঙ্গল প্রার্থনা করা। যদিও হবে তাই, যা ভাগ্যে আছে।'

তিরমিযী শরীফের হাদীছে (৩৮৩৭) আছে, এক ব্যক্তিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'য়া করতে শুনলেন- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الصبر (আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ধৈর্য প্রার্থনা করি)। তিনি এরশাদ করলেন- سألت الله البلاء فاسئله العافية (তুমি আল্লাহর নিকট বিপদ চেয়েছ, কারণ ধৈর্য তো হয় বিপদে। এখন তুমি তাঁর নিকট 'আফিয়ত তথা মুক্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর)।

২. অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষিতার বহু প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও তাদের নিকট সমীচীন মনে হল যে, ইউসুফকে কিছুকাল কারাগারে রাখা হোক, যাতে জনসাধারণ মনে করে যে, অপরাধ ইউসুফেরই ছিল, বেচারী মহিলা অযথাই দুর্নামের ভাগী হয়েছে। এভাবে স্ত্রীলোকটি কারাবাসের যে ধমক দিয়েছিল, তা যেন পূর্ণ করিয়ে ছাড়ল।

তাদের উদ্দেশ্য তো এ-ই ছিল যে, মহিলার এই দুর্নাম দূর হোক, তদুপরি কিছুকাল ইউসুফ তার দৃষ্টির বাইরে থাকুক। আর মহিলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সম্ভবত কারাজীবনের দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে ইউসুফ কিছুটা নম্র হবে, ফলে সে তার বাসনা পূর্ণ করতে পারবে।

إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

একজন নেক মানুষ দেখছি[১]।'

قَالَ لَا يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهٖ قَبْلَ أَنْ يَّأْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۚ إِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তিনি বললেন, 'তোমাদের যে খাবার দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমাদের বলে দেব। এ হচ্ছে সেই ইলম, যা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আমার রব। আমি ঐ লোকদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা আখেরাতেও অবিশ্বাসী[২]।

১. অর্থাৎ সেই সময় দুজন যুবক বন্দীকে কারাগারে আনা হয়। দুজনের একজন মিসরের বাদশাহ (রায়্যান ইবনে ওলীদ) এর বাবুর্চি ও দ্বিতীয়জন তার সাকী (শরাব পরিবেশক)। বাদশাহকে বিষ প্রদানের অভিযোগে তারা ধৃত হয়। কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভদ্রতা, সততা, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, ইবাদতের আধিক্য, স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা ও মানবপ্রেমের খ্যাতি ছিল। ফলে উভয় কয়েদী হযরত ইউসুফ (আ)-এর খুবই অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তারা তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা দেখাতে লাগল। একদিন উভয়ে তাঁর নিকট নিজ নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করল। সাকী বলল, আমি স্বপ্নে দেখি, বাদশাহকে শরাব পান করাচ্ছি। বাবুর্চি বলল, আমি দেখি– আমার মাথার উপর কয়েক টুকরা রুটি, তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ইউসুফ (আ) এর কাছে তারা (নিজ নিজ স্বপ্নের) তাবীর চাইল।

২. ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রথমে তাদের সান্ত্বনা দিলেন যে, নিশ্চয় স্বপ্নের তাবীর তোমরা অতিসত্বর জানতে পারবে। এমন কি দৈনন্দিন যে খাদ্য তোমরা পেয়ে থাক, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যার চেয়ে জরুরী ও উপকারী একটি বিষয় তোমাদের শোনাচ্ছি। তা এই যে, তাবীর প্রভৃতির এ জ্ঞান আমি কোথা থেকে লাভ করলাম? স্মরণ রেখো, আমি কোন পেশাদার গণক বা দৈবজ্ঞ নই, বরং আমার জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ওহী ও ইলহাম, যা আমাকে তিনি এর বদৌলতে দান করেছেন যে, আমি সর্বদা কাফের ও বাতেলপূজারীদের দীন-ধর্ম পরিহার করে চলেছি, আমার পুণ্যাত্মা বাপ-দাদা (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকূবের) মত নবী-রাসূলদের তাওহীদের ধর্ম অনুসরণ এবং তাঁদের আদর্শ অবলম্বন করে রেখেছি। আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য এ-ই যে, দুনিয়ার কোন কিছুকেই কোন পর্যায়েও খোদার শরীক করব না– না তাঁর সত্তায়, না গুণাবলিতে, না কার্যাবলিতে, না রুবূবিয়্যতে ও না ইবাদতে; একমাত্র তাঁরই সামনে মাথা নত করব, কেবল একক পরওয়ারদেগারের কাছে সবকিছু সোপর্দ করব।

মোটকথা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত কার্যকর ও আকর্ষণীয় পন্থায় উক্ত বন্দীদের ঈমান ও তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিলেন। বলা বাহুল্য, সত্যের প্রতি দাওয়াত ও তবলিগের কোন সুযোগই পয়গম্বরগণ হাতছাড়া হতে দেন না। ইউসুফ (আ)

৩৮. 'আর আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দীনের অনুসারী হয়েছি। আমাদের জন্য আদৌ সংগত নয় যে, আমরা কোন বস্তুকে আল্লাহর শরীক করি। এ আমাদের প্রতি ও (সমস্ত) মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না'[১]।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْٓ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝

দেখলেন, এ বন্দীদের অন্তর আমার প্রতি নিবিষ্ট ও আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে আছে। কারাগারের মুসিবতে পড়ে সম্ভবত কিছুটা নম্রও হয়ে আছে। এ অবস্থায় তবলিগের দায়িত্ব আদায় করার এ এক মহা সুযোগ। তাই প্রথম কাজ হচ্ছে তাদের দীনের বিষয় শিক্ষা দেওয়া, অতঃপর তাবীর বলে দেওয়া।

আর খাবার আসার পূর্বেই তাবীর জানতে পারবে বলে সান্ত্বনা দিলেন, যাতে তারা নসীহত শুনতে বিরক্ত না হয়।

বি. দ্র. বহু মুফাসসির لايأتيكما طعام ترزقانه الخ এর এই অর্থ করেছেন যে, তোমাদের নিকট খাদ্য পৌছার পূর্বেই আমি তোমাদের তার অবস্থা বলে দেই– অর্থাৎ অদ্য কী খাদ্য আসবে, কী রকম হবে। সুতরাং তাবীর বলা আর কঠিন কী? বস্তুত প্রথমে হযরত ইউসুফ (আ) মু'জেযার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে নিজের নবুওয়াতের বিশ্বাস জন্মাতে চাইলেন, যাতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যেসব নসীহত করবেন, তা অধিক ফলপ্রসু ও হৃদয়গ্রাহী হয়। এ তাফসীর অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-এর এ মু'জেযা ঠিক তেমন, যেমন ছিল হযরত মাসীহ (আ)-এর মু'জেযা– وانبئكم بما تأكلون وماتدّخرون في بيوتكم (আর যা তোমরা নিজেদের ঘরে খেয়ে আস ও যা রেখে আস তা তোমাদের জানিয়ে দেই।) — কিন্তু বিজ্ঞ মুতারজিম প্রথম তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। والله اعلم

হযরত শাহ আবদুল কাদের সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা কারাবাসে এ উপকারিতা রেখেছেন যে, কাফেরদের ভালবাসা থেকে (অর্থাৎ কাফেররা যে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করত এবং তাঁর সাথে সৌজন্যের সম্পর্ক রাখত, তা থেকে) যখন তাঁর অন্তর ছিন্ন হল, তখন তাঁর মাঝে আল্লাহর ইলম প্রজ্বলিত হল। তিনি চাইলেন, প্রথমে তাদের দীনের কথা শোনাবেন, পরে স্বপ্নের তাবীর বলবেন।

১. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ ও ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর আমাদের কায়েম থাকাটা শুধু আমাদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র জগতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহের বিষয়। কেননা, ইবরাহীমী বংশধরেরই প্রদীপ থেকে সমগ্র মানবগোষ্ঠী নিজেদের অন্তরে প্রদীপ জ্বালাতে পারে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, বহু সংখ্যক মানুষ আল্লাহ তাআলার এই মহান নেয়ামতের কদর করে না। উচিত তো ছিল, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে তাওহীদের পথে চলা। কিন্তু তারা নাশোকরী করে শিরক ও পাপের পথ অবলম্বন করছে।

৩৯. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু মা'বূদ উত্তম, না একক পরাক্রমশালী আল্লাহ[১]?

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪০. 'তোমরা তাঁকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের উপাসনা করছ, যে নাম তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি[২]। হুকুম তো কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ করেছেন যে, 'তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না[৩]। এ-ই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৪]।'

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন তো তার প্রভুকে মদ পান করাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ

১. অর্থাৎ যে বিভিন্ন শ্রেণী ও আকৃতির ছোট-বড় দেবদেবীর মধ্যে তোমরা খোদায়ী শক্তিকে ভাগ করে রেখেছ, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা উত্তম- না সেই একক শক্তিশালী খোদার সঙ্গে, সমগ্র সৃষ্টির উপর যাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য, সর্বময় কর্তৃত্ব ও অধিকার রয়েছে, এবং যাঁর সামনে কারো হুকুম ও কর্তৃত্ব চলতে পারে না এবং যাঁর হাত থেকে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে না, আর মোকাবেলা করে তাঁকে পরাজিতও করতে পারে না? নিজেরাই চিন্তা করে দেখ, এদের মধ্যে কার সামনে মাথা অবনত করে দেওয়া ভাল?

২. অর্থাৎ এমনি সনদহীন ও ভিত্তিহীন কিছু নাম রেখে নিয়েছ, যেসবের পিছনে বিন্দুমাত্র সার পদার্থ নেই। এমন নামসর্বস্ব দেব-দেবীরই পূজা-অর্চনা করছ তোমরা। এহেন মূর্খতার জন্য মানুষের লজ্জিত হওয়া উচিত।

৩. অর্থাৎ আদিকাল থেকে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ হুকুমই পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহর ইবাদতে কাউকেই শরীক করো না- وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (আমি আপনার পূর্বে আমার যে রাসূলদের পাঠিয়েছি, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কি কখনো দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য উপাস্য স্থির করেছি, যাদের উপাসনা করা হবে? -যুখরুফ, রুকূ ৪, আয়াত ৪৫)

৪. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদের পথে পেঁচ-মোচড় কিছুই নেই, তা সরল ও পরিষ্কার পথ, যার উপর চলে মানুষ নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে। কিন্তু বহু লোক নির্বুদ্ধিতা বা গোঁড়ামির কারণে এমন সহজ কথাও বোঝে না।

الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ؁

পাখিরা তার মস্তক থেকে আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলে, তার ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে[১]।'

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۡ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ؀

৪২. ইউসুফ (আ) সেই দু'জনের মধ্যে যার ব্যাপারে ধারণা করেছিলেন যে, সে মুক্তি পাবে– তাকে বলে দিলেন, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করো[২]।' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে তিনি কারাগারে কয়েক বছর রইলেন[৩]।'

---

১. তাবলিগের দায়িত্ব পালন করার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের স্বপ্নের তাবীর বললেন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে মদ পান করাতে দেখেছে, তার তাবীর এ-ই যে, জাগ্রতাবস্থায় সে বাদশাহকে মদ পান করাবে। আর যে ব্যক্তি মাথার উপর থেকে পাখিদের রুটি খেতে দেখেছে তার অর্থ এই যে, তাকে শূলে দেওয়া হবে। অতঃপর পাখিরা তার মাথা থেকে (মগয) ঠুকরে ঠুকরে খাবে। তক্দীরের মীমাংসা এটাই, যা কারো দ্বারা খণ্ডন করা সম্ভব নয়। যে কথা তোমারা জিজ্ঞাসা করেছিলে তা আমি বলে দিলাম। এটা সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত বিষয়, যার অন্যথা হতে পারে না।

বস্তুত তাই হল। সাকী বিষদানের অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি পায় ও নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আর বাবুর্চির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

২. এখানে ظن এর ব্যবহার একীন বা বিশ্বাস অর্থে হয়েছে, যেমনটি হয়েছে এ আয়াতে— اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ (যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের আপন রবের সম্মুখীন হতে হবে- বাকারা : ২৪৯)

অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে যার সম্বন্ধে ইউসুফ (আ)-এর বিশ্বাস ছিল যে, সে মুক্তি পাবে তাকে কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, তোমার বাদশাহর নিকট আমার কথা উল্লেখ করে বলো যে, এমন একজন মানুষ নির্দোষভাবে বহু বছর যাবৎ কারাগারে পড়ে আছে। অতিরঞ্জনের প্রয়োজন নেই, আমার যে অবস্থা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ তাই সরাসরি বলবে।

৩. অর্থাৎ কারামুক্ত লোকটার অন্তরে শয়তান নানা ধরনের খেয়াল ও ওয়াসওয়াসা ঢেলে এমন গাফেল করে দিল যে, বাদশাহর নিকট তার উপকারী বন্ধু (ইউসুফ আ.)-এর কথা উল্লেখ করতে স্মরণ রইল না। ফলে ইউসুফ (আ)-কে আরো কয়েক বছর জেলে থাকতে হল। দীর্ঘকাল পরে যখন বাদশাহ এমন একটি স্বপ্ন দেখল, যার তাবীর কারো বুঝে এল না, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা সে লোকটার মনে এল, যেমন সামনে আসছে- وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ ।

[রুকূ - ৬]

৪৩. বাদশাহ বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী- ওদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণ গাভী। এবং (দেখলাম) সাতটি

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ

ভুলিয়ে দেওয়ার বিষয়টা শয়তানের সঙ্গে এজন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, সে দিলের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ইত্যাদি সঞ্চার করে, যা ভুলে যাওয়ার কারণ হয়। (সূরা কাহাফে নবম রুকূতে, আয়াত : ৬৩) মূসা আলাইহিস সালামের সফরসঙ্গীর উক্তি রয়েছে- وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَان أن أذكره (এবং শয়তানই আমাকে তার কথা বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে।)

কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মন্দের মধ্যে কল্যাণের একটা দিক নিহিত রাখেন। এখানেও উক্ত বিস্মৃতির কারণে যদিও কারাবাস দীর্ঘায়িত হল, তথাপি হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে এ সতর্কীকরণ রয়েছে যে, একজন পয়গম্বরের অন্তর বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

ذكر ربه- এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

বরং ইবনে জারীর ও বাগাবী প্রমুখ মুফাসসিরগণ কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষীর মত উল্লেখ করেছেন যে, ذكر ربه -তে যে ضمير (সর্বনাম) রয়েছে, তা দ্বারা ইউসুফ (আ) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে- 'শয়তান তাঁকে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে আপন প্রভুর স্মরণ ভুলিয়ে দিল'। অর্থাৎ, واذكرني عند ربك বলাটা ইউসুফ (আ)-এর জন্য এক ধরনের গাফলত ছিল। তিনি বন্দীকে বললেন, তোমার মনিবের নিকট আমার কথা উল্লেখ করো। অথচ তাঁর উচিত ছিল বাহ্যিক সব উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করে আপন প্রভুর নিকট প্রার্থনা করা।

বিপদাপদের সময় মানুষের নিকট বাহ্যিক সাহায্য চাওয়া ও উপায়-উপকরণের শরনাপন্ন হওয়া সর্বতোভাবে হারাম নয়। কিন্তু সাধারণ নেক ব্যক্তিদের কিছু পূণ্য বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের পক্ষে মন্দ বলে বিবেচিত। কতক বিষয় সাধারণ লোকেরা দ্বিধাহীনভাবে করতে পারে, কিন্তু তাই নবী (আলাইহিমুস সালাম)-দের জন্য তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রকার দূষণীয় সাব্যস্ত হয় — حسنات الأبرار سيئات المقربين — তো, পরীক্ষা ও বিপদাপদের সময় নবীদের উচ্চ মর্যাদার দাবি এটাই যে, তাঁরা অবকাশ বা رخصت অনুযায়ী কাজ না করে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে উঁচু আদর্শ (عزيمت)-এর পথে চলবেন। যেহেতু হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে اذكرني عند ربك উক্তিটি عزيمت এর অনুকূল ছিল না, সেজন্য সতর্কীকরণস্বরূপ কয়েক বছর অতিরিক্ত কারাজীবন ভোগ করতে হল। এবং এ জন্যই انساء বা 'ভুলিয়ে দেওয়া'কে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। والله أعلم بالصواب। অধিকতর তফসীলের জন্য 'রূহুল মাআনী' দ্রষ্টব্য।

سُنۡۢبُلٰتٍ خُضۡرٍ وَّاُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الۡمَلَاُ اَفۡتُوۡنِیۡ فِیۡ رُءۡیَایَ اِنۡ کُنۡتُمۡ لِلرُّءۡیَا تَعۡبُرُوۡنَ ﴿۴۳﴾

সবুজ শীষ ও আরো সাতটি শুষ্ক শীষ[১]। হে পারিষদবর্গ! আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান কর যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা হয়ে থাক[২]।'

قَالُوۡۤا اَضۡغَاثُ اَحۡلَامٍ ۚ وَمَا نَحۡنُ بِتَاۡوِیۡلِ الۡاَحۡلَامِ بِعٰلِمِیۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. তারা বলল, '(এ তো) অসংলগ্ন স্বপ্ন, আর (এরূপ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত নই[৩]।'

وَقَالَ الَّذِیۡ نَجَا مِنۡهُمَا وَادَّکَرَ بَعۡدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُکُمۡ بِتَاۡوِیۡلِهٖ فَاَرۡسِلُوۡنِ ﴿۴۵﴾

৪৫. সেই দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে (ইউসুফের কথা) তার স্মরণ হল, সে বলল, 'আমি আপনাদের এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করব। অতএব আপনারা আমাকে (ইউসুফের কাছে) পাঠান[৪]।'

---

১. শুষ্ক শীষগুলো সবুজ শীষগুলির উপর লেপটে রয়েছে এবং সেগুলিকে শুকিয়ে ফেলছে। স্বপ্নটি মিসরের বাদশাহ 'রায়্যান ইবনে ওলীদ' দেখেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারামুক্তি ও বাহ্যিক উন্নতির কারণ হল।—ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কোন বিষয়ের ইচ্ছা করলে তার জন্য এমন উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন, যা মানুষের কল্পনায়ও আসে না।

২. অর্থাৎ তোমাদের যদি এ শাস্ত্রে কিছু দক্ষতাও থাকে, তবে আমার স্বপ্নের তাবীর বল।

৩. মনে হয়, তারা এ শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিল। পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকারে লজ্জা, তাই কথা বানিয়ে বলল যে, এ কোন তাবীরযোগ্য স্বপ্নই নয়, নিতান্ত দুশ্চিন্তাজনিত কল্পনা-জল্পনা। অনেক সময় ঘুমের মধ্যে এমন সব অবস্থা মানুষের কল্পনার জগতে উদিত হয়। এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আমরা এরূপ স্বপ্নের তাবীর জানি না। কারণ, স্বপ্ন-তাবীরের যে মৌলিক নীতিমালা, এটা তার আওতায় আসে না।

৪. এ স্বপ্নকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল পর কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সাকীর হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথা মনে পড়ল। সে বাদশাহ ও পারিষদবর্গের নিকট বলল, আমাকে একটু যেতে দিলে আমি স্বপ্নের তাবীর এনে দিতে পারি। কারাগারে এক ফেরেশতাতুল্য পবিত্র বুযুর্গ রয়েছেন, তিনি তাবীর-শাস্ত্রে পারদর্শী। (সম্ভবত সে তখন নিজ স্বপ্নের কথাও বলে থাকবে)। আমি তাবীর আনার জন্য তাঁর খেদমতে যেতে চাই। তাকে অনুমতি দেওয়া হল, সে ইউসুফ আলাইহিস সালামের খেদমতে হাযির হয়ে যা আরয করল, তা সামনে আসছে।

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৬. (সে গিয়ে বলল,) 'হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী[১]! আপনি আমাদের এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী– ওদের খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও আরো সাতটি শুষ্ক শীষ, যাতে আমি (ব্যাখ্যা নিয়ে) লোকদের নিকট ফিরে যাই, যেন তারা জানতে পারে[২]।'

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ۝

৪৭. তিনি বললেন, 'তোমরা লাগাতার সাত বছর চাষাবাদ করবে। অতঃপর যে শস্য তোমরা কাটবে, তা শীষসহ রেখে দেবে– তবে সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা তোমরা খাবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ۝

৪৮. 'এরপর আসবে কঠিন সাতটি বছর, যা এ সাত বছরের জন্য তোমরা যে (ফসল) সঞ্চয় করে রেখেছিলে তা খেয়ে ফেলবে– তবে সামান্য পরিমাণ ছাড়া, যা তোমরা (বীজের জন্য) সংরক্ষণ করবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ۝

৪৯. 'অনন্তর, তার পরে আসবে এমন একটি বছর, যাতে মানুষের উপরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তাতে তারা (রস) নিংড়াবে[৩]।'

---

১. أيها الصديق বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আপনি আপাদমস্তক সত্য– যখন যে কথা আপনার মুখ থেকে বের হয়েছে, তা অবশ্যই সত্যে পরিণত হয়েছে। আশা করি, এ স্বপ্নের যে তাবীর আপনি দেবেন, তা হুবহু পূর্ণ হবে। —এই শব্দটি প্রমাণ করছে যে, নবীগণের (আ) সত্যতা ও সাধুতার চিত্র সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল মানুষের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ স্বপ্নের তাবীর এবং এই সুবাদে আপনার মান-মর্যাদা সম্বন্ধে তারা অবগত হোক।

৩. ইউসুফ (আ) তাবীর বলতে দেরি করেননি, কোন শর্তও আরোপ করেননি। এমনকি, 'এতদিন পর এখন আমার কথা মনে পড়ল' বলে সে ব্যক্তিকে লজ্জিতও করেননি। এ দ্বারা নবীদের চরিত্র ও ভদ্রতা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। অধিকন্তু সে ব্যক্তি শুধু স্বপ্নের তাবীর চেয়েছিল, কিন্তু ইউসুফ (আ) তিনটি জিনিস দান করলেন– তাবীর, তদবীর (দুর্যোগ থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা) ও তবশীর (সুসংবাদ)।

[রুকূ - ৭]

৫০. বাদশাহ বলল, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আস'। অতঃপর যখন তাঁর নিকট (বাদশার) প্রেরিত ব্যক্তি পৌছল, তিনি বললেন, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর-'সেই মহিলাদের প্রকৃত ঘটনা কী, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল'?

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ

তাঁর আলোচনার সারাসার এই ছিল যে, সাতটি স্থূলকায় গাভী ও সাতটি সবুজ শীষ হচ্ছে এমন সাতটি বছর, যখন অনবরত স্বচ্ছলতা থাকবে- চাষের জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে, গৃহপালিত পশু ও উদ্ভিদ খুব বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে, তখন তোমরা পূর্বের সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে শেষ করে ফেলবে, শুধু ভবিষ্যতে বীজ বপনের জন্য সামান্য কিছু অবশিষ্ট থেকে যাবে। এই সাত বছর হচ্ছে শীর্ণকায় গাভী ও শুষ্ক শীষ, যেগুলো স্থূলকায় গাভী ও সবুজ শীষগুলিকে খতম করে দেবে।

দুর্যোগ থেকে উত্তরণে করণীয়

তাবীর বলার ভিতর দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ) জনগণের প্রতি সহানুভূতিস্বরূপ একটি তদবীরও শিক্ষা দিলেন যে, প্রথম সাত বছর যে ফসল ফলবে, তা খুবই হেফাজতের সাথে রেখো এবং মিতব্যয়িতা অবলম্বন করো। খাওয়ার জন্য যে-পরিমাণ শস্যদানার প্রয়োজন হবে, তা পৃথক করে নিয়ো এবং সাবধানতার সাথে অল্প অল্প খেয়ো। অবশিষ্ট শস্যদানা শীষসহ রেখো, যাতে কীট প্রভৃতি থেকে রক্ষা পায় এবং সাত বছরের ফসলে চৌদ্দ বছর চলে। এমনটি না করলে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করা কঠিন হবে।

সুসংবাদ

উক্ত তাবীর ও তদবীর বাতলানোর পরে তাদের সুসংবাদ শোনালেন, যা খুব সম্ভব তিনি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সাত বছর দুর্ভিক্ষ থাকার পর যে বছরটি আসবে, তাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিকার হবে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাবে, ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হবে, জীব-জন্তুর ওলান দুধে ভরে যাবে, আঙ্গুর প্রভৃতি নিংড়ানোযোগ্য ফল থেকে লোকেরা রস বের করবে। এই শেষ কথাটি হযরত ইউসুফ (আ) প্রশ্নকারীর অবস্থানুযায়ী বললেন- কেননা, সে এ কাজই করত।

১. বাদশাহ ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে সাকীর বিভিন্ন আলোচনা শুনে আগেই তাঁর প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাশীল হয়ে গিয়েছিলেন। এখন যখন এমন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক তাবীর এবং জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির পরিচায়ক তদবীরের কথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁর জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও চরিত্র-মাধুর্যের প্রভাব বাদশাহর অন্তরে গেঁথে গেল। তৎক্ষণাৎ আদেশ হল, এমন ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস, যাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে আমি ধন্য হতে পারি এবং

আমার রব তো ওদের চক্রান্ত সম্বন্ধে সম্যক অবহিত'[১]।	اِنَّ رَبِّیْ بِکَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ ۞

তাঁর মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। সে মত দূত রাজ-সংবাদ নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ) এর খেদমতে উপস্থিত হল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দূরদর্শিতা ও ধৈর্য-সহনশীলতা

কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর পার্থিব মর্যাদা ও চাকচিক্য অপেক্ষা নিজের দীনী ও চারিত্রিক উচ্চতা ও পবিত্রতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, খোদার পয়গম্বর সম্পর্কে মানুষের সামান্যতম কুধারণা দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজে বিরাট প্রতিবন্ধক। তিনি চিন্তা করলেন, আজ যদি আমি বাদশাহর নির্দেশ অনুসারে কারাগার থেকে চুপচাপ বের হয়ে যাই এবং যেসব মিথ্যা অপবাদের কারণে বছরের পর বছর কারাজীবনের দুঃসহ মুসীবত ভোগ করলাম, তার মূলোৎপাটন অকাট্যরূপে না হয়– তাহলে প্রবল সম্ভাবনা থাকবে যে, অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিষ্পাপতা সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে থাকবে এবং ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা কিছুকাল পরে এ সব ভিত্তিহীন প্রতিক্রিয়াকে সম্বল করে আমার বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিসন্ধি দাঁড় করিয়ে দেবে।

এ সব কল্যাণকর দিক লক্ষ্য করে হযরত ইউসুফ (আ) রাজ-নির্দেশ পালনে তাড়াহুড়া করলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে দূতকে বললেন, তোমার মালিক (বাদশাহ)-এর নিকট ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, আপনার কি সেই স্ত্রীলোকদের ঘটনা সম্পর্কে জানা আছে, যারা নিমন্ত্রন-জলসায় নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? হযরত ইউসুফের (আ) সেই স্ত্রীলোকদের নাম-ধাম জানা থাকার কথা নয়। তবে তিনি ধারণা করে থাকবেন যে, এমন ঘটনা অবশ্যই ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছে। এ জন্য ঘটনার একটি বিশিষ্ট অংশ (হাত কর্তন) উল্লেখ করে এই প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য বাদশাহর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। আশা করা যায়, এখন সেই স্ত্রীলোকেরা বলে দেবে, দোষ কার ছিল।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইউসুফ (আ) এর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন- لو لبثت في السجن مالبث يوسف لاجبت الداعي (আমি যদি ততদিন কারাগারে থাকতাম যতদিন ইউসুফ ছিলেন, তবে আমি বাদশাহর দূতের ডাকে সাড়া দিতাম। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে বের হয়ে আসতাম)। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৬৯৪)—মুহাক্কেক আলেমগণ বলেন, উক্ত হাদীছে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রশংসা যেমন করা হয়েছে, তেমনি অতি সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের (নবীজীর) চরম 'আবদিয়াতের প্রকাশ রয়েছে। মুসলিম শরীফের শরাহর মধ্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। এখানে কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অধিক লিখতে পারলাম না।

১. হযরত ইউসুফ (আ) ('ওর চক্রান্ত' না বলে) 'ওদের চক্রান্ত' বলেছেন। কারণ, চক্রান্ত যদিও ছিল একজনেরই, কিন্তু অন্যরা তার সাহায্যকারী ছিল। আর প্রকৃত চক্রান্তকারীর নাম সম্ভবত

৫১. বাদশাহ (মহিলাদের) বলল, 'তোমাদের আসল ঘটনা কী, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংযম ত্যাগ করতে ফুসলিয়েছিলে'?' তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! তাঁর সম্পর্কে কোন দোষ আমাদের জানা নেই।' আযীযের স্ত্রী বলল, 'এখন সত্য প্রকাশ পেল, আমিই তাঁকে আত্মসংযম ত্যাগ করতে ফুসলিয়েছিলাম, আর নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী[২]।'

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২. (কারাগারে এসব জেনে ইউসুফ বললেন), 'এসব (করলাম) এ জন্য, যাতে আযীয জানেন যে, আমি তাঁর অগোচরে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং এও (জেনে নেন) যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল হতে দেন না[৩]।'

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

এজন্য উল্লেখ করেননি যে, সে তাঁকে লালন-পালন করেছিল। তাই সংকোচহেতু অস্পষ্টভাবে 'ওদের চক্রান্ত' বলেছেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, প্রকৃত তথ্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যাবেই। (মূযেহুল কুরআন)

১. বাদশাহ জিজ্ঞাসাবাদের এমন ভঙ্গি অবলম্বন করলেন, যেন তিনি আগে থেকেই সব জানতেন, যাতে কারও মিথ্যা বলার সাহস না হয়। তা ছাড়া, নির্দোষিতা প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের হব না— ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই দৃঢ়তা ও ধৈর্যও প্রভাব ফেলে থাকবে বাদশাহর উপর। অধিকন্তু ইউসুফ (আ) اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ (আমার রব তো ওদের চক্রান্ত সবই জানেন।) বলে তাদের চক্রান্ত করার কথা প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে সাকী ও অন্য কেউ বাদশাকে আসল ঘটনাবলি শুনিয়ে থাকবে, তাতেও ইউসুফের পবিত্রতা এবং স্ত্রীলোকদের চক্রান্তের পক্ষে সমর্থন মিলে থাকবে। এ সব কারণে 'তোমরা ইউসুফকে ফুসলিয়েছ কি না? এ জাতীয় প্রশ্ন না করে বাদশাহ প্রথমেই বললেন- ঘটনা কী, যখন তোমরা ফুসলিয়েছিলে?!

২. সকল মহিলার সম্মিলিত সাক্ষ্যের পর স্বয়ং যুলায়খাও পরিষ্কার স্বীকার করল, দোষ আমার, ইউসুফ সম্পূর্ণ সত্যবাদী। নিশ্চয় আমি তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তো আমার ফাঁদে পড়ার মত লোক আদৌ ছিলেন না!

৩. অর্থাৎ তিনি এই পরিমাণ অনুসন্ধান এজন্য করালেন, যাতে পয়গম্বরসুলভ নিষ্পাপতা ও সততা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং (আযীয ও অন্যান্য) লোকেরা জেনে নেয় যে, বিশ্বাসঘাতক ও দাগাবাজদের চক্রান্ত আল্লাহ তাআলা সফল করেন না।

পারা - ১৩

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۵۳﴾

৫৩. 'আমি নিজ নফ্সকে পবিত্র বলে দাবি করি না। নিশ্চয় নফ্স মন্দ কর্মের প্ররোচনা দেয়। কিন্তু যার প্রতি আমার রব দয়া করেছেন (তার কথা ভিন্ন)। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।'

১. নিজ নির্দোষিতার উপর হযরত ইউসুফের এত বেশি জোর দেওয়াকে কোন স্বল্প বুদ্ধির মানুষ অহংকার ও আত্মপ্রসাদ বলে সন্দেহ করতে পারত। তাই তিনি এর স্বরূপ স্পষ্ট করণার্থে বলছেন যে, আমি কোন গৌরব করছি না, পাক-পবিত্র থাকার ব্যাপারেও নিজ নফসের উপর ভরসা করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহর রহমত ও সাহায্যই কোন নফসকে মন্দ থেকে বিরত রাখে। এ বিশেষ রহমতই নবীদের নিষ্পাপতার কারণ। নতুবা সাধারণত মন্দের প্রতি উৎসাহ প্রদানই মানুষের নফসের কাজ। আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাওফীক ও সাহায্য না হলে আমার নফসও অন্যান্য মানুষের নফসের মতই হত।

إن رَبِّي غَفُوْرٌ رَحِيْم দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نفس أمَّارة যখন তওবা করে لوَّامة (তিরস্কারকারী বা অনুতপ্ত) নফসে পরিণত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার পিছনের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেন, বরং ক্রমান্বয়ে নিজ মেহেরবানীতে نفس مطمئنّة তথা আল্লাহর বিধানের উপর দৃঢ় ও প্রশান্ত নফসের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন।

বি. দ্র. হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইবনে কাছীর (র) প্রমুখ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ থেকে غفور رحيم পর্যন্ত অংশকে যুলায়খার উক্তি বলে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ যুলায়খা أنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ স্বীকার করে বলল, এ স্বীকারোক্তি দ্বারা 'আযীয'-কে আমি জানাতে চাই যে, আমি তাঁর অগোচরে বড় কোন খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করিনি। অবশ্য ইউসুফকে আমি ফুসলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ফুসলানো তার উপর কার্যকর হয়নি। আমি এর চেয়ে বেশি খেয়ানত করে থাকলে অবশ্যই তা ফাঁস হয়ে যেত। কেননা, আল্লাহ তাআলা খেয়ানতকারীদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র চলতে দেন না। হাঁ, আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলি না– যতটুকু অন্যায় আমার দ্বারা হয়েছে, আমি তা স্বীকার করছি। অন্যান্য মানুষের মতই নফসের দুষ্কৃতিসমূহ থেকে আমিও পবিত্র নই। এ সব থেকে তো ইউসুফের মত পবিত্র মানুষই নিরাপদ থাকতে পারে, যার উপর আল্লাহর খাস রহমত ও মেহেরবানী রয়েছে।

আবু হায়্যানও একে যুলায়খার উক্তি বলেছেন, তবে ليعلم ও لَمْ أَخُنْهُ এর ضمير (বা সর্বনাম)-কে আযীযের পরিবর্তে ইউসুফের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ (যুলায়খা বলছে), আমি নিজ অন্যায়ের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এ জন্য করছি, যাতে ইউসুফ জানতে পারেন যে, তাঁর অবর্তমানে আমি খেয়ানত করিনি অর্থাৎ কোন মিথ্যা কথা বলিনি এবং আমার অপরাধকে তাঁর উপর চাপাইনি।

৫৪. আর বাদশাহ বলল, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাঁকে শুধু আমার জন্যই একান্ত করে নেবো[১]।' অতঃপর যখন বাদশাহ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তখন বলল, 'নিশ্চয় আপনি আজ থেকে আমাদের নিকট বিশেষ মর্যাদাশালী, বিশ্বাসভাজন[২]।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝

৫৫. ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োগ করুন। আমি রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী ও সুবিজ্ঞ[৩]।'

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝

---

১. অর্থাৎ তিনি আমার বিশিষ্ট উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন।

২. বাদশাহ পূর্ব থেকেই কিছুটা ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সাক্ষাতে হযরত ইউসুফের কথাবার্তা শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আজ থেকে আপনি আমাদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত হয়ে থাকবেন। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'তখন থেকে আযীযের সঙ্গে সম্পর্ক মুলতবী করে বাদশাহ ইউসুফ (আ)-কে নিজ সংস্পর্শে রাখলেন।'

৩. অর্থাৎ ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণও ভালোভাবে করব। আর আমি আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত এবং হিসাব-কিতাব সম্বন্ধেও খুবই অবগত।

ইউসুফ (আ) স্বয়ং দরখাস্ত করে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিলেন, যাতে এই উপায়ে জনসাধারণের পরিপূর্ণ উপকার করতে পারেন, বিশেষত আসন্ন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ দক্ষতার সাথে জনগণের খোঁজ-খবর এবং রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মজবুত রাখতে পারেন।

এ থেকে বোঝা যায়, নবীগণের (আ) পার্থিব বিষয়াবলির জ্ঞান-বুদ্ধিও কামেল হয়। এবং তাঁরা গণমানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আর্থিক বিষয়াবলিতে অংশগ্রহণকে নবুওয়াত বা বুযুর্গীর পরিপন্থী মনে করেন না। আরও বোঝা গেল, একজন মানুষ যদি নেক নিয়তে মনে করে যে, অমুক দায়িত্বটির জন্য আমিই যোগ্য এবং অন্যদের দ্বারা এ কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হবে না, তবে মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে সে তা কামনা করতে পারে বা তার জন্য দরখাস্ত করতে পারে। আর যদি প্রয়োজনবোধে নিজের কোন ভাল অভ্যাস বা গুনের কথা বলতে হয়, তবে তা বলাও অবৈধ গুণকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব নিজ থেকে চেয়ে নেয়, তার বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় (অর্থাৎ গায়বী সাহায্য-সহযোগিতা লাভ হয় না)। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৬২২) এই হাদীসটি সেই ক্ষেত্রের জন্য,যখন শুধু প্রবৃত্তির বাসনা ও সম্মানের মোহ ইত্যাদি কারণে নেতৃত্ব চাওয়া হয়। والله أعلم

৫৬. এভাবেই আমি ইউসুফকে (সে) দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম– তিনি দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারতেন[১]। আমি যাকে ইচ্ছা নিজ রহমত পৌঁছিয়ে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۭ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৭. আর নিশ্চয় আখেরাতের ছওয়াব অধিক উত্তম তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে ও পরহেযগারী অবলম্বন করে রয়েছে[২]।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

[রুকূ - ৮]

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তাঁর নিকট প্রবেশ করল। তখন তিনি তাদের চিনে ফেললেন, অথচ তারা তাঁকে চিনেনি[৩]।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

---

১. তিনি (মিসরে) যেখানে খুশী অবস্থান করতেন এবং ইচ্ছামাফিক কর্তৃত্ব করতে পারতেন। রায়্যান ইবনে ওয়ালীদ নামেমাত্র বাদশাহ ছিলেন, আসলে ইউসুফই (আ) বাদশাহী করছিলেন এবং 'আযীয' নামে আখ্যায়িত হতেন, যেমনটি সামনে বলা হবে।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, বাদশাহ তাঁর হাতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আর সে কালেই মিসরের আযীযের মৃত্যু হয়ে যাওয়ায় ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গে তার স্ত্রী যুলায়খার বিয়ে হয়। তবে মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। والله اعلم

২. যে ব্যক্তি কল্যাণ ও পুণ্যের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেই সুফল দান করেন– তা ধন-ঐশ্বর্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হোক, অথবা উত্তম ও পবিত্র অন্তরের ঐশ্বর্য হোক। এ সব কিছুই হযরত ইউসুফকে তিনি দান করেছিলেন। আর পরকালের প্রতিদান– তা তো একজন ঈমানদার ও পরহেজগারের জন্য দুনিয়ার প্রতিদান অপেক্ষা কতই না উত্তম।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ ছিল ওদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মাধ্যমে ইহুদীদের পরীক্ষামূলক) প্রশ্নের উত্তর যে, ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানসন্ততি এভাবে 'শাম' থেকে মিসরে আগমন করেন। তদুপরি মূল প্রশ্নের উত্তরের সাথে সাথে আরেকটি বিষয়েরও বর্ণনা দেওয়া হল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তো তাঁকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে দেশান্তরিত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে মর্যাদা দান করলেন এবং কর্তৃত্ব প্রদান করলেন। আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও এ রকমই হয়েছিল।'

৩. 'মুযিহুল কুরআনে' আছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ) মিসর রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব হাসিল করলেন, তখন টানা সাত বছর জোরদারভাবে চাষাবাদ করান এবং দেশের উৎপাদিত শস্য

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের জন্য তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন বললেন, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে নিয়ে এসো। তোমরা দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি (মেহমানদের) উত্তমরূপে সমাদরকারী[১]।

গুদামজাত করাতে থাকেন। অতঃপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষে একটা নির্ধারিত মাঝারি দামে তা বিক্রি করেন- দেশী ও বিদেশী সকলের নিকট সমান দামে, তবে কোন বিদেশীকে এক উট বোঝাই খাদ্যের বেশি দিতেন না। এতে দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষ বাঁচল এবং বাদশার রাজভাণ্ডার ভরে গেল। মিসরে খাদ্যশস্য সস্তায় পাওয়া যায়, এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর ভাইয়েরাও কিনতে গেল।

তখনো তাদের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, আকার-আকৃতি ও চাল-চলনে তেমন পরিবর্তন হয়নি। এদিকে হযরত ইউসুফ (আ) সর্বদা নিজ বাপ-ভাইদের খোঁজ-খবর নিয়ে থাকবেন এবং সেখানে তারা পৌছলে তাদের নাম-ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, যেমনটি দাওয়াতকারী রাজা-বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সাধারণত হয়ে থাকে। কোন কোন তাফসীরে আছেও, তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজেদের নাম, বংশ ইত্যাদি বর্ণনা করল। এভাবে ইউসুফ (আ) তাদের চিনে ফেললেন। কিন্তু ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ইউসুফ (আ) খুব ছোট ছিলেন এবং আগে থেকে ভাইদের এদিকে খেয়াল যায়নি। অধিকন্তু রাজা-বাদশাহর দরবারে এসে সাধারণ লোকদের পক্ষে তাদের নাম, বংশ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করার মত সাহস হয় না। এ সব কারণে তারা তাঁকে (ইউসুফ আ.-কে) চিনতে পারেনি।

১. হযরত ইউসুফ (আ) আপন ভাইদের খুবই সমাদর ও মেহমানদারী করলেন। প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দিলেন। কথিত আছে, এ বিশেষ মেহেরবানী ও চরিত্রমাধুর্য দেখে তারা আরজ করল, আমাদের এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে (বিনয়ামীন)। আমাদের দুঃখ-পীড়িত পিতা মানসিক প্রশান্তির জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কারণ, তার অপর আপন ভাই যে পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক দিন পূর্বে জঙ্গলে কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। যদি বিনয়ামীনের অংশের খাদ্যদ্রব্যও আমাদের কাছে দিয়ে দেন, তবে খুবই মেহেরবানী হয়।

ইউসুফ (আ) বললেন, এভাবে অনুপস্থিত কারো অংশ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। তোমরা পুনরায় আসলে বিনয়ামীনকে সঙ্গে নিয়ে এসো, তাহলে তার অংশ পেতে পারবে। আমার ভদ্রতা ও মেহমানদারী তোমরা নিজ চোখে দেখেছো। এর পরও কি তোমাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসতে কোন দ্বিধা হতে পারে?

৬০. 'আর যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না আন, তবে তোমাদের জন্য আমার নিকট কোন বরাদ্দ নেই এবং আমার কাছে আর এসো না[১]।'

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۞

৬১. তারা বলল, 'আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা অবশ্যই (এ কাজ) করব[২]।'

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۞

৬২. আর তিনি নিজ চাকরদের বলে দিলেন, 'তাদের পুঁজি (পণ্যমূল্য) তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে রেখে দাও। হয়ত তারা তা চিনতে পারবে যখন নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (ফলে) সম্ভবত তারা পুনরায় আসবে[৩]।'

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۞

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (শস্যের) বরাদ্দ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠান, যাতে আমরা

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا

---

১. অর্থাৎ না আনলে বোঝা যাবে, তোমরা মিথ্যা বলে এবং ধোঁকা দিয়ে এক উট বোঝাই অতিরিক্ত খাদ্য নিতে চেয়েছিলে। এর শাস্তি এই হবে যে, ভবিষ্যতে স্বয়ং তোমাদের অংশও বাতিল হয়ে যাবে, এমনকি আমার কাছে বা আমার সাম্রাজ্যে তোমাদের আসার অনুমতি হবে না।

২. অর্থাৎ যদিও পিতার নিকট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল, তবুও আমরা যে কোন উপায়ে পিতাকে রাজি করিয়ে ভাইকে আনার পুরোপুরি চেষ্টা করব। আশা করি, কোন না কোন উপায়ে আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হবই।

৩. অর্থাৎ যে পুঁজি দিয়ে তারা শস্য কিনেছিল, তাও গোপনভাবে তাদের মালামালের ভিতর রেখে দিতে নির্দেশ দিলেন, যাতে বাড়ি ফিরে যখন মালামাল খুলবে এবং দেখবে যে, শস্যের সঙ্গে মূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার এখানে আসার অধিকতর উৎসাহ পাবে। মনে করবে, এমন দয়ালু বাদশাহ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আর এমনও হতে পারে যে, মূল্যের অভাবে পুনরায় আসতে পারবে না, তাই মূল্য ফেরত দিয়ে দিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইউসুফ (আ) ভাইদের নিকট থেকে মূল্য নেওয়াও দয়ামায়া ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করলেন।

نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾

(শস্যের) বরাদ্দ নিয়ে আসতে পারি;, আর আমরা অবশ্যই তার পূর্ণ হেফাজতকারী[১]।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰۤى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তিনি বললেন, 'আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের তেমনই বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম? আচ্ছা! আল্লাহই উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সকল দয়ালু থেকে বেশি দয়ালু[২]।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল, তাদের পুঁজি তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী চাই? এই যে আমাদের পুঁজি, তা আমাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। (এবার গেলে) আমরা নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য (আরও) রসদ আনতে পারব; আর আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা এক উট-বোঝাই (শস্য) বেশি আনতে পারব[৩]। তা সহজলভ্য (শস্য) বরাদ্দ[৪]।'

---

১. অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর মত বিনয়ামীনের ব্যাপারে কোন ইতস্তত করবেন না। এখন আমরা সতর্ক হয়ে গিয়েছি, আমরা পরিপূর্ণরূপে তার হেফাজত করব।

২. অর্থাৎ তোমরা ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় এই একই শব্দ وِإِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ বলেছিলে। অতএব তোমাদের অঙ্গীকারের উপর ভরসা করি কীভাবে? তবে এবারকার প্রয়োজন যেহেতু খুব বেশি, যা কোন রকমেই উপেক্ষা করা যায় না, এজন্য তোমাদের সাথে পাঠানো জরুরি মনে হচ্ছে। সুতরাং আমি তাকে আল্লাহ তাআলার হেফাজতে দিচ্ছি, তিনিই নিজ মেহেরবানীতে তাকে হেফাজত করবেন। এবং আমাকে ইউসুফের বিচ্ছেদের পর নতুন মুসিবতে ফেলা থেকে রক্ষা করবেন।

৩. অর্থাৎ বিনয়ামীনের অংশ।

৪. অর্থাৎ এরূপ সহজলভ্য মাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যেভাবেই হোক, বিনয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠান।

কেউ কেউ বলেন- ذلك كيل يسير দ্বারা ইতিপূর্বে তারা যে শস্য এনেছিল তা উদ্দেশ্য এবং يسير কে قليل (কম, স্বল্প) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বে যা এনেছি তা প্রয়োজন

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِیْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৬. তিনি বললেন, 'আমি কিছুতেই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না যে পর্যন্ত না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে– তবে তোমাদের (সকলকে) ঘিরে ফেলা হলে (ভিন্ন কথা)। 'অতঃপর তারা যখন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিল, তিনি বললেন, 'আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক[১]।'

وَقَالَ یٰبَنِیَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِیْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং প্রবেশ করো ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে। আর আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (কোন ফয়সালা) থেকে রক্ষা করতে পারব না, ফয়সালা একমাত্র আল্লাহরই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং ভরসাকারীদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত[২]।'

অনুপাতে কম, দুর্ভিক্ষের সময়ে যথেষ্ট নয়। তাই যেভাবেই হোক আমাদের পুনরায় গিয়ে সকলের অংশ নিয়ে আসা উচিত।

১. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলার পূর্ব-নির্ধারিত তকদীর অনুসারে এমন কোন মুসিবত এসে পড়ে, যার মধ্যে তোমরা সকলে ধৃত হয়ে গেলে, তবে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু তোমরা নিজেরা সাধ্যানুযায়ী বিনয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ত্রুটি করতে পারবে না।

এ সব পরিপক্ক ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়ে এবং আল্লাহর নামে শপথ করিয়ে অধিকতর তাকীদ ও সতর্কতামূলকভাবে বললেন, اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ– অর্থাৎ আমরা এ সময় যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করছি তা সবই আল্লাহর হাওয়ালা। বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গ করলে তিনিই শাস্তি দেবেন। —অথবা অর্থ এই যে, ওয়াদা-অঙ্গীকার তো আমরা নিজেদের সাধ্যানুসারে পরিপক্ক করছি। কিন্তু এ সকল কথাবার্তা দ্বারা যে মৌলিক উদ্দেশ্য,তা তো আল্লাহ তাআলার হেফাজত ও তত্ত্বাবধানেই পূর্ণ হতে পারে। তিনি না চাইলে সকল চেষ্টা-তদবীর ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'তারা জাহেরী উপায়-উপকরণ পাকা করলেন, কিন্তু ভরসা করলেন আল্লাহর উপর। এটাই সকলের প্রতি নির্দেশ।

২. ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা প্রথমবার যখন মিসরে গিয়েছিল, তখন সাধারণ মুসাফিরদের মত স্বাভাবিকভাবেই শহরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর সুদৃষ্টি ও অনুগ্রহ দেখে

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. অতঃপর যখন তারা সেখান দিয়ে প্রবেশ করল যেখান দিয়ে তাদের পিতা (প্রবেশ করতে) আদেশ করেছিলেন[১], তখন এই কৌশল আল্লাহর (কোন ফয়সালা) থেকে তাদের রক্ষা করার ছিল না; তবে ইয়াকুবের মনে একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করলেন। আর নিশ্চয় তিনি সেসব বিষয়ে পূর্ণ অবগত (ছিলেন), যা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না[২]।

নিশ্চয়ই তাদের প্রতি সেখানকার লোকদের কৌতূহল জেগে থাকবে। এখন দ্বিতীয়বার যাওয়াটা ছিল বিশেষ গুরুত্ববহ, বরং বলতে গেলে তারা এবারে ইউসুফ (আ)-এর এক রকম দাওয়াতী মেহমানরূপে যাচ্ছিল। হযরত ই'য়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-এর পর যে বিনয়ামীনের খুবই হেফাজত ও মহব্বত করতেন, এবারকার সফরে সেও ছিল ভাইদের সফরসঙ্গী। ইয়াকূব (আ)-এর ধারণা হল, এক বাপের এগারটি সুদর্শন ছেলের একত্রিত হয়ে বিশেষ শানের সাথে শহরে প্রবেশ করা এমন একটা বিষয়, যা অবশ্যই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিশেষত তাদের প্রতি আযীযে মিসরের সেই সমাদরের পর, যা সেখানকার লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছিল। العين حق-নজর লাগা তো একটি অনস্বীকার্য সত্য (বর্তমান কালের 'মেসমিরিজমে'র বিস্ময়সমূহ এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিরই কারিশমা)। এ সব কারণে ইয়াকূব (আ) ছেলেদেরকে বদনজর, ঈর্ষা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ও বাহ্যিক তদবীররূপে তাদের বললেন, তারা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণভাবে শহরের ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, যাতে অযথাই তাদের প্রতি সাধারণ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

সেই সঙ্গে তিনি এও প্রকাশ করে দিলেন যে, আমি কোন তদবীরের দ্বারা তক্‌দীরের ফয়সালা বা লিখন খণ্ডন করতে পারি না। কেননা, সারা সৃষ্টিজগতে একমাত্র আল্লাহরই হুকুম চলমান, তাঁর হুকুমের সামনে আমাদের সকল ব্যবস্থাপনা নিষ্ক্রিয়। হাঁ, তদবীর করাও তিনিই শিখিয়েছেন এবং জায়েয রেখেছেন। মানুষের উচিত আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা, কিন্তু ভরসা রাখবে আল্লাহর উপর। বস্তুত তিনি ছেলেদের শিক্ষা দিলেন যে, তোমরাও আমার মত অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর হেফাজতের উপর ভরসা রেখো, নিজেদের তদবীরের উপর নির্ভরশীল হয়ো না।

১. তিনি ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক হয়ে প্রবেশ করার আদেশ করেছিলেন।

২. অর্থাৎ যেভাবে তিনি প্রবেশ করতে বলেছিলেন, সেভাবেই তারা প্রবেশ করল। এতে যদিও নজর বা 'চোখ লাগা' থেকে তারা রক্ষা পেল, কিন্তু তকদীর এর মার অন্যদিক দিয়ে এল। (বিনয়ামীন চুরির অভিযোগে ধৃত হল)।

তক্‌দীর অখণ্ডনীয়। অতএব যারা ইলমের অধিকারী, তারা তক্‌দীরেও বিশ্বাস করে এবং তদবীরও অবলম্বন করে। কিন্তু জ্ঞানহীন ব্যক্তি দ্বারা একটি হলে অন্যটি হয় না– হয়

[রুকূ - ৯]

৬৯. তারা যখন ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, তখন তিনি আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমিই তোমার (আপন) ভাই, অতএব তারা যা কিছু করেছে তার কারণে দুঃখ করো না[১]।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৭০. অতঃপর তিনি যখন তাদের জন্য তাদের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন তার ভাইয়ের আসবাবপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিলেন। অতঃপর এক ঘোষনাকারী উচ্চস্বরে বলল, 'হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর[২]।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

সর্বতোভাবে উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করে এবং তকদীর অস্বীকার করে, না হয় তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের এই অর্থ বুঝে যে, উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করতে হবে। আরেফ ও অবহিত ব্যক্তিবর্গ তকদীর ও তদবীর উভয়ই অবলম্বন করে থাকে এবং প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে।

১. হযরত ইউসুফ (আ) বিনয়ামীনের সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার করলেন এবং নিভৃতে চুপেচুপে তাকে জানিয়ে দিলেন, আমি তোমার আপন (সহোদর) ভাই (ইউসুফ)। এই বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা যেসব জুলুম-অত্যাচার আমাদের উপর করেছে, যথাঃ আমাকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কূপে ফেলেছে, দাস বানিয়ে বিক্রয় করেছে এবং আমাদের পিতা, ভাই প্রমুখকে বিচ্ছেদ-ব্যথায় পতিত করেছে, অথবা এখানে আসার পথে তোমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করে থাকবে– এ সবের কারণে দুঃখিত হয়ো না। সময় এসে গেছে, আমাদের সব দুঃখের অবসান হবে এবং দুঃখ-কষ্টের পর আল্লাহ তাআলা আমাদের সুখ-শান্তি ও সম্মান দান করবেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ ভাইকে যে ইউসুফ (আ) খুব আগ্রহের সাথে ডেকে পাঠালেন, তাতে অন্য ভাইদের ঈর্ষা হল। তাই এ সফরে তারা তাকে কথায় কথায় ধমকাত ও খোঁটা দিত। এখন ইউসুফ (আ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দিলেন'।

২. অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ)-এর হুকুমে তাদের খাদ্যশস্য বোঝাই করা হল এবং সফরের মালামাল প্রস্তুত করা হল, তখন রৌপ্যনির্মিত একটি পেয়ালা নিজের আপন ভাই বিনয়ামীনের মালপত্রে অগোচরে রেখে দিলেন। যখন কাফেলা যাত্রা করতে উদ্যত, তখন পরিচারকরা পেয়ালাটি তালাশ করে। শেষ পর্যন্ত কাফেলার লোকদের ব্যাপারেই তাদের

৭১. তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ[১]?'	قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ۝
৭২. তারা বলল, 'আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না। আর যে ব্যক্তি তা এনে দেবে সে এক উট-বোঝাই (মাল) পাবে। এবং আমি এর জামিন[২]।'	قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ۝
৭৩. তারা (অর্থাৎ ভাইয়েরা) বলল, 'আল্লাহর কসম! তোমরা তো জান, আমরা (এই) দেশে দুষ্কৃতি করার জন্য আসিনি এবং আমরা কখনো চোর ছিলাম না[৩]।'	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ۝
৭৪. তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তবে তার শাস্তি কী[৪]?'	قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ۝
৭৫. তারা বলল, 'তার শাস্তি এই যে, যার আসবাবপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময় হবে (অর্থাৎ চুরির	قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ

সন্দেহ হয়। কাফেলা কিছুদূর চলে গিয়েছিল, এমন সময় পরিচারকদের মধ্য থেকে কেউ উচ্চস্বরে ডেকে বলল, 'থাম, তোমরা নিশ্চিতরূপে চোর বলে মনে হচ্ছে'।

বি. দ্র. যদি এ শব্দ ('চোর') ইউসুফ (আ)-এর হুকুমে বলা হয়ে থাকে, তবে এ অর্থ হবে যে, কেউ কেউ তো মাল চুরি করে। আর তোমরা এমন লোক, যারা পিতার কাছ থেকে চুরি করে ভাইকে বিক্রয় করে দিয়েছিলে!!

১. অর্থাৎ আমাদের অযথা চোর বানাচ্ছ কেন? তোমাদের কোনো জিনিস হারিয়ে থাকলে তা বল। আমরা তো এখনো কোথাও চলে যাইনি। আমাদের মালপত্রে তালাশ করে দেখ।

২. পরিচারকরা বলল, বাদশাহর পানি পান করার পেয়ালা বা শস্য মাপার পাত্র হারিয়ে গেছে। যদি কেউ বাহানা ও হুজ্জতি না করে তা এনে দেয়, তবে সে এক উট-বোঝাই শস্যদানা পুরস্কার পাবে, আর আমি এর দায়িত্ব নিলাম।

৩. অর্থাৎ মিসরে আমাদের চাল-চলন সম্বন্ধে সকলে জানে। কেউ কি বলতে পারবে যে, আমরা কখনো কোন দুষ্কৃতি করেছি? আমরা দুষ্কৃতির নিমিত্ত এখানে আসিওনি, আর আমরা চোর-বংশও নই।

৪. পরিচারকরা বলল, 'তোমরা নিরর্থক তর্ক-বিতর্ক করছ। যদি চুরির মাল তোমাদের নিকট থেকে বের হয়ে আসে, তবে কী করবে?'

كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ۝

প্রতিফলস্বরূপ তাকে গোলাম বানিয়ে নেওয়া হবে)। এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি[১]।'

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ

৭৬. অতঃপর ইউসুফ নিজ ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলেগুলো (তল্লাশি করা) শুরু করলেন[২]। অবশেষে পাত্রটি নিজ ভাইয়ের থলে থেকে বের করলেন। এভাবেই আমি ইউসুফকে কৌশল বাতলিয়ে দিলাম[৩]। বাদশাহর আইনে তিনি আপন ভাইকে কখনো আটক করতে পারতেন না, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে (ভিন্ন কথা)[৪]। আমি যাকে ইচ্ছা বহু মর্যাদায় উন্নীত করি[৫], আর প্রত্যেক

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'য়তে চোরের এই শাস্তি ছিল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চুরিতে ধরা পড়ত, তাকে এক বছর গোলাম হয়ে থাকতে হত। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা বিনাদ্বিধায় নিজেদের শরী'য়তের আইন অনুযায়ী শাস্তির কথা বলে দিল। কারণ, তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমরা চোরও নই, আর আমাদের নিকট থেকে চুরির মাল বেরও হতে পারে না। এভাবে নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই তারা ধরা পড়ল।

২. অর্থাৎ উক্ত কথাবার্তার পর পরিচারকরা মিসরের আযীয (ইউসুফ আলাইহিস সালাম)-এর নিকট তাদের নিয়ে গেল এবং সকল ঘটনা শোনাল। তিনি তল্লাশির হুকুম দিলেন। প্রথমে অন্য ভাইদের বোচকা (থলি, ব্যাগ ইত্যাদি) তালাশ করা হল, পেয়ালা বের হল না। অবশেষে বিনয়ামীনের আসবাবপত্র তালাশ করা হলে তা থেকে পেয়ালা বের হয়ে এল।

৩. অথবা অর্থ এই যে, 'আমি এরূপ তদবীর করলাম ইউসুফের জন্য।'

৪. অর্থাৎ ভাইদের মুখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কথা এসে গিয়েছিল যে, যার নিকট মাল পাওয়া যাবে তাকে দাস বানিয়ে নিয়ো। এ কথায় তারা ধরা পড়ল, নতুবা মিসর সরকারের আইন এ রকম ছিল না। অতএব নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ার মত তদবীর না করা হলে সেখানকার দেশীয় আইন অনুযায়ী বিনয়ামীনকে আটক করার কোন উপায় ছিল না।

৫. অর্থাৎ যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, হেকমত ও তদবীর শিক্ষা দান করেন। অথবা, নিজের সূক্ষ্ম কৌশল দ্বারা তাকে মর্যাদা দান করেন। লক্ষ করার বিষয় এই যে, যারা বাপের কাছ থেকে চুরি করে ইউসুফকে মাত্র কয়েকটি দেরহামে বিক্রয় করে দিয়েছিল, আজ তারাই ইউসুফ (আ)-এর সামনে চোররূপে দণ্ডায়মান। সম্ভবত এভাবে তাদের পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

জ্ঞানবানের উপর আছেন একজন মহাজ্ঞানী[১]।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ

৭৭. তারা বলল, 'যদি সে চুরি করে থাকে, তবে ইতিপূর্বে তার এক ভাইও চুরি করেছিল[২]।'

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে একজনের চেয়ে দ্বিতীয়জন, দ্বিতীয়জনের চেয়ে তৃতীয়জন বেশি জ্ঞানী। কিন্তু সকল জ্ঞানীর উর্ধ্বে আর একজন জ্ঞানী রয়েছেন, যাঁকে عالم الغيب والشهادة (দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা) বলা হয়।

ইউসুফ সিদ্দীক (আ.) সত্য-পরিপন্থী কোনও কথা বলেননি

প্রকাশ থাকে যে, এই পুরো ঘটনার মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর মুখ থেকে একটি কথাও সত্যের পরিপন্থী বের হয়নি। এমনকি, তাঁর কোন আচরণও শরী'য়তবিরোধী হয়নি। বেশির চেয়ে বেশি তিনি (تورية) 'তাওরিয়া'র আশ্রয় নিয়েছেন। তাওরিয়ার অর্থ হচ্ছে, এমন বিষয় বলা বা করা, যা দেখে বা শুনে দর্শক বা শ্রবণকারীর মনে একটি বাহ্যিক ও নিকটবর্তী অর্থ বুঝে আসে, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, যা বাহ্যিক অর্থ থেকে অন্য রকম। এই 'তাওরিয়া' যদি কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে বৈধ বরং প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে, কোন মন্দ ও অসৎ উদ্দেশ্যে করা হলে 'তাওরিয়া' নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা।

এস্থলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ইয়াকূব আলাইহিস সালামের পরীক্ষা পরিপূর্ণ করা। তিনি চাইলেন, ইউসুফ (আ)-এর পর বিনয়ামীনও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, অন্যদিকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন দুই আপন (সহোদর) ভাই পরস্পর এক হয়ে থাকুক আর ইউসুফ পরীক্ষার বিভিন্ন ঘাঁটি অতিক্রম করে প্রথমে বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে, তারপর সহোদরের সাথে, তারপর শ্রদ্ধেয় পিতা ও সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনর্মিলিত হোক। অন্যদিকে ইউসুফের ভাইদের দ্বারা যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল, তারাও কিছু আছাড়-পাছাড় খেয়ে ক্ষমা ও মার্জনার দ্বারে পৌঁছে যাক। এ সব ছাড়াও আরো বহু হেকমত থেকে থাকবে, যার জন্য ইউসুফ (আ)-কে কিছু 'তাওরিয়া' করার আদেশ দেওয়া হল।

তিনি পেয়ালাটি নিজের ভাইয়ের মালপত্রের ভিতর রেখে দিলেন। তারপর তা চুরি হওয়ার অভিযোগে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে অভিযুক্তও করেননি অথবা এও বলেননি যে, আমরা অমুককে চুরির শাস্তিস্বরূপ আটক করছি। বরং এমন সব অবস্থা সামনে আসতে থাকল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত বিনয়ামীনের জন্য নিজের ভাইয়ের নিকট আদর-আপ্যায়ন ও মান-মর্যাদার সাথে থাকার পথ বের হয়ে এল। অবশ্য মঙ্গল বিবেচনায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য ছিল না, অথবা এমন কিছু বিষয়ে চুপ রয়েছেন, যা সম্বন্ধে কিছু বললে রহস্য ফাঁস হয়ে যেত এবং আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হত। والله اعلم

২. এই ইঙ্গিতটি ছিল ইউসুফ (আ)-এর প্রতি। নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ও হঠকারিতাবশে তারা বিনয়ামীনের অন্যায়কে পরিপক্ক করে দিল এবং এতদিন পরও নিষ্পাপ ইউসুফ (আ)-কে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করতে লজ্জিত হল না।

قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝

তখন ইউসুফ একটি কথা নিজ অন্তরে গোপন করলেন এবং তা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, 'মর্যাদায় তোমরাই হীনতম এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন[১]।'

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৭৮. তারা বলল, 'হে আযীয! তার বৃদ্ধ, অতি বয়স্ক পিতা আছেন। অতএব আপনি তার পরিবর্তে আমাদের কাউকে রেখে দিন, আমরা তো আপনাকে একজন দয়ালু ব্যক্তি দেখছি[২]।'

মুফাসসিরগণ এস্থলে কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন, ইউসুফের ভাইয়েরা 'চুরি' শব্দ দ্বারা যেগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছিল। সেগুলির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১. অর্থাৎ এমন কঠোর শব্দ শুনেও ইউসুফ (আ) ধৈর্যহারা হননি এবং আসল ঘটনা ফাঁস করে দেননি। কারণ, আল্লাহর হেকমতের দাবি ছিল রহস্য ফাঁস না করা । সুতরাং ইউসুফ (আ) কথাটি অন্তরে লুকিয়ে রাখলেন, জওয়াব দিয়ে তাদের অপবাদের স্বরূপ খুললেন না। তিনি মনে মনে বললেন– أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ অর্থাৎ চোরে উলটা পুলিশকে ধমকায়, আমাকে চোর বানাচ্ছ? অথচ তোমরা এমন চুরি করেছ যে, ভাইকে পিতার অগোচরে চুরি করে বিক্রি করে ফেলেছ। আর আমাকে চুরির যে অপবাদ দিচ্ছ, তার হাল তো আল্লাহর জানা আছে।

কোন কোন মুফাসসির قال أنتم شر مكانا الخ এর এই অর্থ করেছেন যে, ইউসুফ (আ) তাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বড়ই নিকৃষ্ট লোক। একটু পূর্বেই তো বলছিলে- وما كنا سارقين আমরা চোরদের অন্তর্ভুক্ত নই। এখন যখন এক ভাইয়ের আসবাবপত্র থেকে (চুরির) মাল বের হয়ে এল, তখন তার সঙ্গে অন্য অনুপস্থিত ভাইকেও চুরিতে জড়াতে শুরু করলে– অর্থাৎ চুরি করা যেন তোমাদের বংশীয় পেশা, নাউযুবিল্লাহ। বস্তুত আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন, তোমরা নিজেদের কথায় কতটুকু সত্যবাদী। তিনিই তোমাদেরকে মিথ্যা বলার শাস্তি প্রদান করবেন।

২. অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতার নিদারুণ কষ্ট হবে। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে তাকে ও তার ভাই (ইউসুফ)-কে বেশি আদর করতেন। ইউসুফের পর এখন তাকে নিয়েই নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। আপনি যদি তার স্থলে আমাদের কোন একজনকে রেখে দেন, তবে খুবই মেহেরবানী হবে। আপনি সর্বদা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন এবং আমাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ করে এসেছেন। আশা করি, আপনি নিজ দয়া থেকে আমাদের নিরাশ করবেন না।

৭৯. তিনি বললেন, 'আমরা এ থেকে আল্লাহর পানাহ চাই যে, আমাদের জিনিস যার নিকট পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক করি[১]। তা হলে তো আমরা অবশ্যই জালেম হয়ে যাব[২]।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

[রুকূ - ১০]

৮০. তারা যখন তাঁর নিকট থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শ করার জন্য নির্জনে গিয়ে বসল। তাদের বড়জন বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং (জান না), পূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে কী ত্রুটি করেছিলে? অতএব আমি কিছুতেই (এ) দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফয়সালা করে দেন। আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী[৩]।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾

---

১. অর্থাৎ আমরা কাউকে অকারণে অন্যের বদলে গ্রেফতার করব, এমন কাজ থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। আমরা তো কেবল সে ব্যক্তিকেই রাখব, যার কাছে আমাদের জিনিস পাওয়া গেছে। (সে হচ্ছে বিনয়ামীন, সেই আমাদের নিকট থাকবে।)

লক্ষ্যনীয় যে, এখানেও তিনি إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ বলেছেন, إلا من سرق বলেননি, যা খুবই সংক্ষিপ্ত শব্দ হত। কারণ, তা বললে সত্যের পরিপন্থী হত।

২. অর্থাৎ অপরাধীর স্থলে নিরপরাধকে পাকড়াও করে রাখলে তো তোমাদের নীতি ও আইন অনুযায়ী আমরা অন্যায়কারী সাব্যস্ত হব।

৩. হযরত ইউসুফ (আ)-এর উত্তর শুনে তারা নিরাশ হয় গেল এবং সভাস্থল থেকে সরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। অধিকাংশের মত এই ছিল যে, দেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তাদের মধ্যে যে ভাই বয়স বা বুদ্ধি প্রভৃতির দিক দিয়ে বড় ছিল সে বলল, 'পিতার সামনে আমরা কোন্ মুখ নিয়ে যাব, আমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার কী জওয়াব দেব? এক অন্যায় তো আমরা পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে করেছি, যার আছর ও প্রভাব আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এখন বিনয়ামীনকে রেখে সকলের চলে যাওয়া সাংঘাতিক নির্দয়তার

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা তা-ই বললাম যা আমরা জেনেছি। আর আমরা তো গায়বের বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না[১]।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

৮২. 'আপনি সেই জনপদের (লোকদের) জিজ্ঞাসা করে দেখুন যেখানে আমরা ছিলাম এবং সেই কাফেলাকেও, যার সাথে আমরা এসেছি। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী[২]।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৮৩. তিনি বললেন, 'না, বরং তোমাদের নফ্স তোমাদের জন্য একটা কথা সাজিয়ে নিয়েছে। এখন ধৈর্যই উত্তম*। সম্ভবত আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সম্যক অবহিত, প্রজ্ঞাবান[৩]।'

কাজ হবে। সুতরাং জেনে নাও যে, আমি কোন অবস্থাতেই এখান থেকে নড়ব না। তবে যদি স্বয়ং শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে এখান থেকে যাওয়ার হুকুম দেন, অথবা ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা হয়ে যায়– যেমন: তকদীর মোতাবেক আমি এখানেই মরে যাই, অথবা কোন তদবীরে বিনয়ামীনকে ছাড়িয়ে নিতে পারি, তবে ভিন্ন কথা।

বি. দ্র. এ বক্তা সম্ভবত সেই ভাই-ই ছিল, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে নম্র পরামর্শ দিয়ে বলেছিল- لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ (তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না)।

১. অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে দাও এবং তোমরা সকলে গিয়ে পিতার নিকট আরয কর যে, এমন ঘটনা ঘটেছে যা ছিল চিন্তার সম্পূর্ণ বাইরে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ আপনাকে আমরা কথা দিয়েছিলাম আমাদের জানা অনুসারে। এ তো জানা ছিল না যে, বিনয়ামীন চুরি করে ধরা পড়বে। অথবা অর্থ এই যে, আমরা আমাদের শরীয়ত মতে চোরকে আটকে রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু ভাই যে চোর, এ তো আমাদের জানা ছিল না।'

২. অর্থাৎ আপনি বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে সেই বসতির লোকদের নিকট থেকে সংবাদ নিন, যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে। তা ছাড়া কাফেলার অন্য লোকদেরও জিজ্ঞাসা করে নিন, যারা আমাদের সঙ্গে ছিল এবং ফিরে এসেছে। এতে আপনার নিকট প্রমাণিত হবে যে, আমাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'উত্তমরূপে ধৈর্য ধরাই আমার কাজ'।

৩. প্রথমবারের মিথ্যার কারণে এবারও হযরত ইয়াকূব (আ) ছেলেদের বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু নবীর কথা মিথ্যা নয়। বিষয়টা ছেলেদেরই সাজানো ছিল, কেননা হযরত ইউসুফও তো

৮৪. অতঃপর তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য[১]!' এবং শোকে তাঁর দুই চোখ সাদা হয়ে গেল[২]। বস্তুত তিনি অতি কষ্টে (শোক) সংবরণ করছিলেন[৩]।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾

ছেলেই ছিলেন, (তিনিই তদবীর করে বিনয়ামীনকে রেখে দিয়েছিলেন-অনুবাদক)। (-মূযেহুল কুরআন) যেন لكم শব্দ দ্বারা 'পুত্রজাতি' (جنس ابناء)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, ইউসুফ (আ) ও বিনয়ামীন ছাড়া শুধু অন্য ভাইদেরকে নয়। والله أعلم

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অর্থ এই যে, তোমরা বিনয়ামীনকে হেফাজতের ওয়াদা করে পীড়াপীড়ি করে এখান থেকে নিয়ে গেলে। সেখানে যাওয়ার পর এতটুকুও বললে না যে, তার মালপত্র থেকে পেয়ালা বের হয়ে আসায় চুরি প্রমাণিত হল কী করে? হয়ত অন্য কেউ গোপনে রেখে দিয়েছে। তোমরা অভিযোগ খণ্ডন তো করলেই না, অধিকন্তু 'ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল'- এই কথা বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিপক্ক করে দিয়েছ। তোমাদের অন্তরে ময়লা না থাকলে এরূপ করতে না। এখন কথা বানানোর জন্য এসেছ।

হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ধৈর্য-তাওয়াক্কুল

যা হোক, আমি তো এ বিষয়ে সবরই করব- অভিযোগের কোন শব্দই মুখে আনব না। আল্লাহর কুদরত ও রহমতে মোটেই অসম্ভব নয় যে, তিনি ইউসুফ, বিনয়ামীন ও বিনয়ামীনের নিমিত্ত রয়ে যাওয়া ভাই— সকলকে আমার নিকট এনে একত্র করে দেবেন। তিনি সকলের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত এবং প্রত্যেকের সঙ্গে নিজ হেকমত অনুযায়ী আচরণ করে থাকেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সব রকমের নৈরাশ্যজনক অবস্থা এবং কালের আবর্তন যতই সংঘটিত হোক, তারপরও নবীদের অন্তর নিরাশ হয় না। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর অপার রহমতের উপর আস্থা রাখেন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে আশাবাদী থাকেন।

১. নতুন আঘাতে পুরাতন আঘাত তাজা হয়ে উঠল। না পেরে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন- يا أسفى على يوسف (হায় আফসোস! হায় ইউসুফ!)

২. অর্থাৎ নিষ্প্রভ বা অন্ধ হয়ে গেল- উভয় মতই রয়েছে।

৩. হাদীছে আছে, نَحْنُ معاشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে নবীদের জামাতকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন করানো হয়'। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৫৬১)—তারপর পরীক্ষারও শ্রেণীভেদ রয়েছে, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত ও তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী পরীক্ষায় ফেলে থাকেন।

ইয়াকূব আলাইহিস সালামের অন্তরে ইউসুফের অস্বাভাবিক মহব্বত ঢেলে দিলেন। অতঃপর এরূপ প্রিয় ও সম্ভাবনাময় ছেলেকে, যিনি ছিলেন ইবরাহীম-বংশের নয়নতারা ও প্রদীপ, এমন

৮৫. তাঁর পুত্রগণ বলতে লাগল, 'আল্লহর কসম, আপনি ইউসুফের কথা স্মরণ করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না আপনি মরণাপন্ন হয়ে যান অথবা মৃত্যুই বরণ করেন।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝

৮৬. তিনি বললেন, 'আমি তো নিজের অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানি, যা তোমরা জান না[১]।

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮৭. 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর, আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফের লোকেরাই নিরাশ হয়[২]।'

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

হৃদয়বিদারক উপায়ে বিচ্ছিন্ন করা হল। দুঃখ-ভারাক্রান্ত ইয়াকূবের কলিজাকে এই প্রানান্তকর দুঃখ একেবারে নিঃশেষ করে ফেলছিল। কিন্তু মানুষের সামনে তাঁর মুখে না ছিল কোন অভিযোগ, না ছিল মনে কারো প্রতি কোন প্রতিহিংসা এবং ছিল না রাগের প্রকাশ। দুঃখ-বেদনার কোনো কথাই তিনি মুখ থেকে বের করতেন না। তবে যখন মর্ম-বেদনায় খুবই পীড়িত হয়ে পড়তেন, তখন অন্তরজ্বালার বাষ্প চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ত। বছরের পর বছর ধরে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছেন, অন্তর্জ্বালায় পুড়েছেন– এতদসত্ত্বেও নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে কোনই ত্রুটি হতে দেননি। ইউসুফের বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় যতই কাঁদছিল, ততই তিনি আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিলেন। দুঃখ-বেদনার আতিশয্য ও অশ্রুজলের আধিক্য তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে যে পরিমাণ দুর্বল করছিল, সেই পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করছিল। অশান্তি ও অস্থিরতার যতই ঝড় উঠুক না কেন, তিনি অন্তর্জ্বালা অন্তরেই এবং মর্মপীড়া ভিতরেই রেখে দিতেন– মুখে 'উহ' শব্দটিও বের করতেন না। বিনয়ামীনের বিচ্ছেদে যখন পুরাতন আঘাতে নতুন আঁচড় লাগল, তখন অপারগ অবস্থায় يا أسفى على يوسف–শুধু এ কয়েকটা শব্দ মুখ থেকে বের হল। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এর ভাষায়– 'এমন বেদনা এতকাল যাবৎ চেপে রাখা পয়গম্বর ছাড়া আর কার কাজ হতে পারে?'

১. 'মূযেহুল কুরআন'-এ আছে, 'অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ধৈর্য শিখাবে? অধৈর্য তো সে ব্যক্তি, যে সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার প্রেরিত ব্যথা-বেদনার অভিযোগ করে। যিনি আমাকে বেদনা দিয়েছেন আমি তো তাঁকেই বলছি। এবং আমি এও জানি যে, (ইউসুফ জীবিত আছে, তাকে অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং তার স্বপ্ন পূর্ণ হবেই হবে–) এ আমার জন্য পরীক্ষা। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে এর সমাপ্তি হয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া কাফেরদের কাজ, যাদের পক্ষে তাঁর সর্বব্যাপী রহমত ও পরিপূর্ণ কুদরতের সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয় না।

৮৮. অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, তারা বলল, 'হে আযীয! আমাদের ও আমাদের পরিবার-পরিজনকে চরম কষ্ট আক্রান্ত করেছে এবং আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদের পূর্ণমাত্রায় রসদ দিন এবং আমাদের দান-খয়রাত করুন। নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন[১]।'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝

একজন মুসলমানের কাজ হচ্ছে, পাহাড়ের অজস্র কঙ্কর ও সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউসম নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেও আল্লাহর রহমত সম্বন্ধে আশাবাদী থাকা এবং সম্ভাব্য চেষ্টা-তদবীরে ত্রুটি না করা। তোমরা যাও, ইউসুফের সন্ধানে সচেষ্ট হও এবং তার ভাই বিনয়ামীনকে ছাড়ানোর কোনো উপায় বের কর। এ মোটেই অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পুনরায় একত্র করে দেবেন।

তৃতীয় ভাইয়ের উল্লেখ সম্ভবত এ জন্য করেননি যে, সে তো স্বেচ্ছায় শুধু বিনয়ামীনের খাতিরে থেকে গিয়েছিল– বিনয়ামীন ছাড়া পেলে সে আর থেকে যাবে কেন?

১. পিতার কথা মত তারা পুনরায় মিসর রওয়ানা হল। কেননা, ইউসুফ (আ) কোথায় আছেন তা তাদের জানা ছিল না, তাই তারা ভেবে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে (অর্থাৎ বিনয়ামীন) প্রথমে তার চিন্তা করি। আর দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, এ দিকেও আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। যদি লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁকে নম্র পাই, তবে বিনয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করব।

সে মত তারা আযীযে মিসর (ইউসুফ আলাইহিস সালাম) এর সঙ্গে প্রথম কথা এ-ই বলল, হে মিসরের আযীয! বর্তমানে দুর্ভিক্ষ ও অভাবের কারণে আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গের উপর দিয়ে খুবই দুঃখ-কষ্টের দিন যাচ্ছে। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রি হয়ে গেছে, কিছু তুচ্ছ ও নগন্য পুঁজি অবশিষ্ট রয়েছে, তা-ই খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার মহানুভবতা ও বিগত দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে আমাদের আশা, আমাদের তুচ্ছ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ না করে স্বল্প মূল্যেই খাদ্যশস্যের পরিমাণ পূর্বের মতই পুরাপুরি দেওয়াবেন। আমাদের প্রতি আপনার এই রেয়াত (ছাড়) বস্তুত এক ধরনের দানরূপে গণ্য হবে। অথবা (وتصدق علينا) এর অর্থ এই যে, এ ছাড়াও আপনি দান-খয়রাত হিসাবে আমাদের কিছু দিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা আপনার মঙ্গল করবেন।

এ অবস্থা শুনে হযরত ইউসুফ (আ) কেঁদে ফেললেন, মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালবাসার ঝরনাধারা অন্তরের মধ্যে উথলিয়ে উঠল এবং চোখ দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। আর কত? এবার তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন। বললেন, 'আমি কে এবং

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমাদের কি জানা আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কী করেছিলে[১] যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ[২]?'

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ

৯০. তারা বলল, 'তবে তুমিই কি ইউসুফ[৩]?' তিনি বললেন, 'আমি ইউসুফ এবং এ আমার

তোমরা আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিলে? তার পর আমি কোন্ মর্যাদায় পৌছেছি? — সামনের আয়াতে এই আত্মপ্রকাশেরই ভূমিকার বর্ণনা রয়েছে।

বি. দ্র. কেউ কেউ تَصَدَّقْ এর অর্থ করেছেন, যে কোন অনুগ্রহ করা। যেমন: কসরের নামায সম্পর্কিত হাদীছে এ অর্থেই বলা হয়েছে- صدقة تصدق الله بها عليكم (এ একটি অনুগ্রহ, আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন)। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৬৮৬)

১. অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ এবং উভয়ের প্রতি চরম বিদ্বেষ-বৈরিতা পোষণ করেছ।

২. আল্লাহু আকবার! ধৈর্য, ভদ্রতা ও মহানুভবতা আর কাকে বলে! সারাজীবন ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি অক্ষরও মুখে আনেননি। আর (هل علمتم ما فعلتم)-এতটুকু প্রশ্নও এজন্য করেছেন, যেন তারা পূর্বের এত বছরের ঘটনাবলি মনে মনে একবার স্মরণ করে নেয়, যাতে অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সেইসব অনুগ্রহের তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়, যেগুলি ইউসুফ (আ)-এর প্রতি বহুবিধ মুসিবত ও দুর্ঘটনার পর বর্ষিত হয়েছিল, এবং যেগুলোর দিকে পরবর্তী قد منّ الله علينا আয়াতাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তদুপরি উক্ত প্রশ্নটুকু করলেও তাতে এমন নম্রতা অবলম্বন করেছেন, যার মধ্যে তাদের দোষের চেয়ে নির্দোষিতার দিকটাই বেশি প্রকাশমান। কারণ, هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ-এর সঙ্গেই বলেছেন– اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ– অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা যে আচরণ হল, তা নিতান্তই অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণেই হয়েছিল। তোমাদের কি আর জানা ছিল, ইউসুফের স্বপ্ন পূর্ণ হবেই এবং নবচন্দ্র একদিন পূর্ণিমার চন্দ্রে পরিণত হবেই?

৩. সম্ভবত ইউসুফের উক্ত প্রশ্নে তারা ঘাবড়ে গেল। ভাবল যে, এ আবার ঘরের রহস্যের কোন গুপ্তচর? ইউসুফের ঘটনার সাথে মিসরের আযীযেরই বা কী সম্পর্ক? তাছাড়া নিজেদের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক দয়া-অনুগ্রহ ও বিনয়ামীনের সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার প্রথম থেকেই তারা লক্ষ করেছিল। এ সব অবস্থা ও প্রেক্ষাপটে হঠাৎ উক্ত প্রশ্নে তাদের মনে এ কথা উঁকি দিল যে, যে ইউসুফকে আমরা মিসরীয় কাফেলার নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিলাম, এ সে নয় তো? এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ামাত্র তারা আযীযের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে থাকবে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইউসুফ (আ) এবার নিজেকে অধিকতর স্পষ্টরূপে পেশ করেছিলেন, অথবা স্পষ্টত বলেই দিয়েছিলেন যে, আমি ইউসুফ।

মোটকথা, তারা অত্যন্ত আশ্চর্য ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলে উঠল– ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ (সত্য করে বল, তুমিই কি ইউসুফ?)

أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

ভাই[১]। আল্লাহ আমাদের উপর খাস অনুগ্রহ করেছেন[২]। যে ব্যক্তি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধরে, নিশ্চয় আল্লাহ (এমন) পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না[৩]।'

قَالُوا۟ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী[৪]।'

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّٰحِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. তিনি বললেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন[৫] এবং তিনিই সকল দয়ালু থেকে বড় দয়ালু[৬]।

---

১. অর্থাৎ সেই ভাই, যার থেকে তোমরা আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছিলে। দেখ, আজ সে আমার কাছে বসে আছে!

২. তিনি বিচ্ছেদকে মিলনে, অপমানকে সম্মানে, দুঃখ-কষ্টকে আরাম-আয়েশে ও অভাব-অনটনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। যাকে গোলাম বানিয়ে মাত্র কয়েকটি দেরহামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, আজ আল্লাহ তাআলা তাঁকে মিসর রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রদান করেছেন।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যার উপর কষ্ট পতিত হয় আর সে শরী'য়তের সীমা লঙ্ঘন না করে ও না ঘাবড়ায়, তার প্রতি শেষ পর্যন্ত বিপদের চেয়ে দানই বেশি হয়।'

৪. অর্থাৎ তিনি তোমাকে সর্বদিক দিয়ে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তুমি এর যোগ্যই ছিলে। আমাদের ভ্রান্তি ও অন্যায় এই ছিল যে, আমরা তোমার মর্যাদা বুঝতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তোমার স্বপ্ন সত্য এবং আমাদের হিংসা নিষ্ফল প্রমাণিত হল।

৫. ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের কাছ থেকে এতটুকুও শুনতে চাচ্ছিলেন না। তাই তিনি বললেন, এ সব বলো না, আজ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না, তোমাদের সকল অন্যায় মাফ করে দিয়েছি। যে কথাগুলি আমি বলেছি, তা নিতান্তই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং সবর ও তাক্‌ওয়ার ফল প্রকাশ করার নিয়তে বলেছি। আজকের পর তোমাদের ত্রুটির কোনো আলোচনা হবে না। আমি দো'য়া করি, তোমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে যেসব অন্যায় করেছ, তিনি যেন তাও ক্ষমা করে দেন।

৬. আমার দয়াও তাঁরই দয়ার একটি প্রতিবিম্ব বা ছায়ামাত্র।

৯৩. 'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার উপর রেখো– তিনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে এসো[১]।'

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

[রুকূ - ১১]

৯৪. অতঃপর যখন কাফেলা রওনা হল, তখন তাদের পিতা বললেন, 'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি[২]।' যদি না তোমরা

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ

---

১. অর্থাৎ আমি বর্তমান অবস্থায় শামে (যেখানে হযরত ইয়াকুব আ.পরিবার-পরিজনসহ থাকতেন) যেতে পারছি না। তোমরা গিয়ে পিতামাতা এবং নিজেদের সকল নিকটজনদের এখানে নিয়ে আস।—যেহেতু ইউসুফ (আ) শ্রদ্ধেয় পিতা সম্পর্কে ওহী দ্বারা অথবা ভাইদের মুখে জেনে থাকবেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে বা তাতে দুর্বলতা এসে গেছে, সেজন্য নিজের জামা তাদের দিয়ে বললেন, এ জামা তাঁর চোখে লাগিয়ে দেবে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহর নিকট প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে। এক ব্যক্তির বিচ্ছেদে চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারই শরীরের একটি জিনিসের পরশে আবার চোখ ভাল হল। এ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারামত ছিল।'

আর একে কারামত না বললেও আজকাল বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোন নিদারুণ দুঃখ বা অস্বাভাবিক আনন্দের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কোন কোন অন্ধ ব্যক্তি হঠাৎ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে গেছে।

২. আল্লাহর কুদরত লক্ষ করুন! ইউসুফ মিসরে বর্তমান, অথচ কখনো তিনি (ইয়াকূব) বলেননি যে, ইউসুফ (আ)-এর খুশবু আসছে। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল পরীক্ষা পূর্ণ করা (তাই পূর্বে খুশবু পাননি)। এখন মিলনের পালা– তাই ইউসুফের জামা নিয়ে কাফেলা মিসর থেকে বের হল, অমনি ইউসুফ (আ)-এর জামার খুশবু ইয়াকূব (আ)-এর মস্তিষ্ককে সুবাসিত করতে লাগল। —শুধু এটি কেন? গোটা ঘটনাটিই হল কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনাদির একটা প্রদর্শনী। ইয়াকূব (আ)-এর মত খ্যাতনামা পয়গম্বর শামে বাস করছেন এবং ইউসুফ (আ) এর ন্যায় মহা মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব মিসরে রাজ্য পরিচালনা করছেন। ইউসুফ-ভ্রাতারা কয়েকবার মিসরে আগমন করছে, স্বয়ং ইউসুফের মেহমান হচ্ছে, তবুও আল্লাহ তাআলার নিগূঢ় হেকমত ও দুর্জয় ইচ্ছা পিতাকে পুত্র থেকে বহু বছর ধরে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং রক্তাশ্রু ঝরানোর পরই পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটায়, তার আগে নয়– جلت قدرته وعز سلطانه (তাঁর কুদরত মহান এবং তাঁর ক্ষমতা পরাক্রান্ত)।

اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

আমাকে বিকারগ্রস্ত মনে কর[১]।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আপনি তো নিজের পুরাতন বিভ্রান্তিতেই আছেন[২]।'

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তারপর যখন সুসংবাদবাহক পৌছল, তখন সে সেই জামাটি তাঁর চেহারার উপর রাখল, ফলে তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন হয়ে গেলেন[৩]। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব বিষয় জানি যা তোমরা জান না[৪]?

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম অপরাধী[৫]।'

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

৯৮. তিনি বললেন, 'শীঘ্র আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৬]।'

---

১. অর্থাৎ এ কথা বলে আমি সংকুচিত হচ্ছি। কেননা, এ তোমাদের বুঝে আসবে না। তোমরা বলে উঠবে, বুড়ার মাথা ঠিক নেই।

২. অর্থাৎ ইউসুফের ভালবাসা, তার জীবিত থাকার আশা ও তার সাথে পুনর্মিলনের বিশ্বাস আপনার অন্তরে প্রোথিত হয়ে আছে। এই পুরাতন ধ্যান-কল্পনাই ইউসুফের খুশবুতে পরিণত হয়ে মস্তিষ্কে আসছে!

৩. অর্থাৎ দৃষ্টি ফিরে এল, ফলে তিনি পুনরায় পূর্বের মত দেখতে লাগলেন।

৪. অর্থাৎ আমি কি বলিনি, ইউসুফের খুশবু আসছে? এ কথাই সত্য হল। অথবা তোমাদের বলেছিলাম যে, ইউসুফকে তালাশ কর, আমাদের সকলকে পুনর্মিলিত করে দেওয়া আল্লাহর রহমতের জন্য মোটেই অসম্ভব নয়। দেখে নাও, তাই হল।

৫. অর্থাৎ 'সুদৃষ্টি দিয়ে ও দো'য়া করে আল্লাহর নিকট আমাদের গোনাহ ক্ষমা করিয়ে দিন। আমাদের দ্বারা গুরুতর অন্যায় হয়েছে।' উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে আপনি ক্ষমা করুন, অতঃপর পরিষ্কার মনে মহাপ্রভুর দরবারে ক্ষমা করিয়ে দিন। কারণ, যে নিজে ক্ষমা করে না, সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা করাবে কী করে?

৬. অর্থাৎ দো'য়া কবূল হওয়ার সময় আসতে দাও, তখন মেহেরবান আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্য হাত ওঠাব।—কথিত আছে যে, জুমার রাত বা তাহাজ্জুদের সময়ের অপেক্ষা ছিল।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

৯৯. অতঃপর যখন তারা (সকলে) ইউসুফের নিকট পৌছল, তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের কাছে বিশেষ স্থান দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা প্রশান্ত মনে মিসরে প্রবেশ করুন[১]।'

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ

১০০. আর তিনি নিজের পিতা-মাতাকে উঁচু সিংহাসনে বসালেন এবং তারা (সকলে) তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল[২]।

---

১. অভ্যর্থনার জন্য তিনি শহরের বাইরে গেলেন এবং পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন। ইউসুফ (আ)-এর মায়ের বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইতিপূর্বে তাঁর মায়ের এন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল, এখানে খালার কথা বলা হয়েছে। আর কেউ বলেন, মাতা জীবিত ছিলেন এবং হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সঙ্গে মিসরে গমন করেছিলেন।

যা হোক, ইউসুফ (আ) সকলকে বললেন, শহরে চলুন, এখন আর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কোন আশঙ্কা করবেন না। ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ শান্তি, আরাম ও নিশ্চিন্ততার সাথে বাস করবেন।—কোন কোন মুফাসসির বলেন, তিনি এ কথাগুলি শহরে প্রবেশ করার পর বলেছিলেন। তা হলে اُدْخلوا مصر এর অর্থ হবে, আপনারা এখন নিশ্চিন্তে মিসরে বসবাস করুন।

২. ইউসুফ (আ) নিজে পিতামাতার সম্মান করলেন, সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আ)-এর যে সম্মান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা তিনি কী করে ঠেকাবেন? তখনকার রীতি অনুযায়ী পিতামাতা ও সকল ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে সেজদা করলেন।

গাইরুল্লাহর প্রতি সেজদার হুকুম

এ ছিল সম্মানসূচক সেজদা। হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী, এ সেজদা আদম (আ)-এর সময় থেকে মাসীহ (আ)-এর সময়কাল পর্যন্ত জায়েয ছিল। কিন্তু শরী'য়তে মুহাম্মদী একে নিষিদ্ধ ও হারাম সাব্যস্ত করেছে। বহু সংখ্যক হাদীস এর সাক্ষী। এমন কি, হযরত শাহ আবদুল কাদির (র) وان المساجد لله আয়াত থেকেও নিষিদ্ধতার ইঙ্গিত বের করেছেন।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে সেজদার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধু ঝুঁকে যাওয়া উদ্দেশ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত সেজদা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ছিল না, বরং তাঁর মর্যাদা ও সম্মান লক্ষ্য করে সকলে আল্লাহর সামনে কৃতজ্ঞতার সেজদা আদায় করেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী وخرّوا له এর ل অব্যয়টি হচ্ছে 'কারণ নির্দেশক'-অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা ও কর্তৃত্বের কারণে আল্লাহর সামনে সকলে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

তিনি বললেন—'হে আমার পিতা! এ হচ্ছে আমার সেই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব আমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন[১]। আর তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং গ্রাম থেকে আপনাদের (এখানে) নিয়ে এসেছেন- শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, সুকৌশলে তা আঞ্জাম দেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[২]।

বি. দ্র. তা'জীম (সম্মান প্রদর্শন) ও ইবাদত দুটি ভিন্ন জিনিস। غير الله এর তাজীম একেবারে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু গাইরুল্লাহর ইবাদত হচ্ছে স্পষ্ট শিরক (شرك جلي) , যার অনুমতি কখনো এক মুহূর্তের জন্যও দেওয়া হয়নি, হতে পারেও না। ইবাদতমূলক সেজদা অর্থাৎ গাইরুল্লাহকে যে কোন পর্যায়ে লাভ ও লোকসানের স্বতন্ত্র মালিক মনে করে সেজদা করা প্রকাশ্য শিরক, যার অনুমতি কস্মিনকালেও কোন আসমানী ধর্মে দেওয়া হয়নি। হাঁ, সম্মানসূচক সেজদা অর্থাৎ উপরোক্ত বিশ্বাস না রেখে শুধু শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপনার্থে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরী'য়তসমূহে জায়েয ছিল। কিন্তু শরী'য়তে মুহাম্মদী এরও গোড়া কেটে দিয়েছে।

হযরত শাহ (ওয়ালিউল্লাহ) সাহেব (র) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত حجة الله البالغة গ্রন্থে শিরকের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন, তা পড়ে দেখার মত।

১. অর্থাৎ এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, স্বপ্নের তাবীর পূর্ণ হওয়ার ছিল, তা আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দেখালেন।

২. তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ উল্লেখ করত এবং তাঁর সূক্ষ্ম কৌশলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলছেন যে, দেখুন—আল্লাহ কীভাবে আমাকে কারাগার থেকে বের করে দেশের শাসক ও ক্ষমতাবান বানিয়ে দিলেন! এবং আমার ও ভাইদের মধ্যে মিলনের কেমন উপায়-উপকরণ তৈরি করে দিলেন! অথচ শয়তান আমাদের মাঝে এমন বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যার ফলে পুনর্মিলনের কোন আশাই ছিল না।

হযরত ইউসুফ (আ) এস্থলে নিজের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের কোনই উল্লেখ করেননি, অভিযোগের একটি শব্দও মুখে আনেননি, বরং ভাইদের সাথে যা কিছু ঘটেছে তার প্রতি এমন বাচনভঙ্গিতে ইশারা করলেন, যেন কোন পক্ষেরই বাড়াবাড়ি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না পায়। কেননা, সেসব শুনে ভাইয়েরা লজ্জিত হত। আল্লাহু আকবার! এমন চরিত্রমাধুর্য পয়গম্বরদের ছাড়া আর কার হতে পারে?

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১. 'হে আমার রব! তুমি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছ এবং আমাকে 'বিবিধ বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যাদান' শিক্ষা দিয়েছ[১]। (হে) আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার কার্যনির্বাহক। আমাকে এ অবস্থায় মৃত্যু দান করো যে, আমি (তোমারই) অনুগত[২], এবং আমাকে মিলিত করো পুণ্যবানদের সঙ্গে[৩]।'

---

১. এই সূরারই প্রথম রুকূতে (আয়াত : ৬) تأويل الأحاديث এর তাফসীর লেখা হয়েছে।

২. হয় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলন-আকাঙ্ক্ষায় তিনি তখনি মৃত্যু কামনা করেছিলেন; অথবা অর্থ এই যে, যখনি মৃত্যু আসে, ইসলামে (আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর বিধানে সন্তুষ্টি) থাকা অবস্থায় যেন আসে।

মৃত্যু কামনা করা

হাদীছে আছে, কোন ব্যক্তি কোন বিপদ বা কষ্টের কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৬৭১)—এতে বোঝা যায়, প্রভু-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অথবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে মৃত্যু কামনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ফেরাওনের যাদুকররা দো'য়া করেছিলেন- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ। (হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্যের দ্বার খুলে দিন এবং আমাদের মৃত্যু দান করুন মুসলমানরূপে- আ'রাফ : ১২৬) হযরত মারয়াম বলেছিলেন- يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (হায় কোনভাবে যদি আমি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যেতাম– মারয়াম : ২৬)।

হযরত মুআয (রা) এর হাদীছে আছে– وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون (ইয়া আল্লাহ! আপনি যদি কোন কওমকে ফেতনার সম্মুখীন করার ইচ্ছা করেন, তবে সে ফেতনায় পতিত হওয়ার পূর্বেই আমাকে আপনার নিকট তুলে নিয়েন।) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫১৪, ৩৫১৬)। 'মুসনাদে আহমাদ' এর এক হাদীছে (২৩৬২৫) রয়েছে– يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتن (মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মুমিনের জন্য ফেতনার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।)। হযরত আলী (রা) ফেতনার আধিক্যের সময় দো'য়া করেছিলেন- اللّٰهُمَّ خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني (ইয়া আল্লাহ! আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন। আমি ওদের দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি এবং ওরাও আমাকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।) খুরাসানের শাসকের সঙ্গে ইমাম বুখারী (র)-এর বিবাদ হলে তাঁকে এ দো'য়া করতে হল– اللّٰهُمَّ توفّني إليك (আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন।) হাদীছে আছে, দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় একজন মানুষ কোন কবরের নিকট দিয়ে যাবে এবং ফেতনা-ফাসাদ লক্ষ করে বলবে– ياليتني مكانك হায়, আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম! (মুয়াত্তা মালিক, হাদীস : ৯৭৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর)

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় যেরূপ বলেছিলেন– اللّٰهُمَّ في الرفيق الأعلى (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৪৩৭){আয় আল্লাহ! আমাকে উচ্চ শ্রেণীর দোস্তদের

১০২. এগুলি গায়বের কিছু সংবাদ, আমি তা ওহী মারফত আপনার নিকট প্রেরণ করি। আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজেদের কর্ম-কৌশল স্থির করছিল, আর তারা পাকাচ্ছিল ষড়যন্ত্র[১]।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয় যদিও আপনি মনে-প্রাণে চান না কেন[২]।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

সঙ্গে রাখবেন তথা নবী, শহীদ ও অন্য নেককারগণের সঙ্গে।} ইউসুফ (আ)-এর এই দোয়া অনুরূপ।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ইলমের পরিপূর্ণতা ও ধনদৌলতের প্রাচুর্য লাভ করার পর এবার নিজের বাপদাদার অনুরূপ মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা হল।' অর্থাৎ ألحقني بالصالحين এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, আমার মর্যাদাকে ইসহাক (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদার সাথে মিলিত করে দিন।

হযরত ইয়াকূব (আ) জীবিত থাকা পর্যন্ত ইউসুফ (আ) মিসর রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকেন, পিতার ওয়াফাতের পর তিনি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করেন।

মুফাসসিরগণ লেখেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ওসীয়ত করেছিলেন, তাঁর লাশ যেন শাম দেশে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। সে মত তাই করা হয়। হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন বনী ইসরাঈল মিসর ছেড়ে চলে যাবে, তখন যেন তারা আমার লাশও সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মত হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবূত (বা সিন্দুক-কফিন)ও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। والله اعلم

১. অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন তাঁকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ও কূপে ফেলার পরামর্শ ও কূট-কৌশল করছিল, তখন আপনি তাদের কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন না যে, তাদের কথাবার্তা শুনতে ও অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। এমতাবস্থায় এরূপ সঠিক ঘটনাবলি আল্লাহপ্রেরিত ওহী ছাড়া আপনার কাছে কে বর্ণনা করল? আপনি গতানুগতিক উপায়ে লেখাপড়া শেখেননি, কোন পার্থিব শিক্ষকের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও এ সব তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বিষয়াদি, যেগুলির এমন বিশদ বিবরণ বাইবেলেও নেই, আপনাকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে জানাল?

২. অর্থাৎ আপনার সত্যতা সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ লোক এমন, যারা কোন মতেই ঈমান আনার নয়।

১০৪. আর আপনি তাদের নিকট এর জন্য কোন বিনিময় চান না। এ (কুরআন) তো সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়[১]।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

[রুকূ - ১২]

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কত নিদর্শন রয়েছে, যার কাছ দিয়ে ওরা যাতায়াত করে থাকে, কিন্তু ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২]।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৬. আর ওদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু এভাবে যে, (তাঁর সঙ্গে) শিরকও করে[৩]।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

---

১. অর্থাৎ ওরা মানে না, না মানুক– তাতে আপনার ক্ষতি কী? আপনি তো ওদের নিকট তবলীগের জন্য কোন বেতন চান না যে, ওরা তা বন্ধ করে দেবে। লক্ষ্য ছিল উপদেশ ও নসীহত, তা হয়ে গেছে ও হচ্ছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতসমূহ শুনে যেমন ওরা আপনার প্রতি ঈমান আনে না, তদ্রূপ সৃষ্টিগত নিদর্শন দেখেও আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা লাভ করে না। আসলে ওদের শোনা ও দেখা একেবারে ভাসাভাসা। যদি আল্লাহর নিদর্শনাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তবে কিছু উপকার হত। তা না করলে ঈমান কী করে আনবে?

৩. অর্থাৎ মুখে সকলেই বলে যে, খালেক ও মালেক আল্লাহ তাআলাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তো মূর্তি-প্রতিমাকে আল্লাহর অংশীদার বানাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ: আরবের মুশরিকরা 'তালবিয়া' পড়ার সময় বলত– لبيك اللّٰهُمَّ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك। কেউ আবার আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করে থাকে। কেউ তাঁকে আত্মা ও পদার্থের (مادہ) মুখাপেক্ষী বলে জানে। কেউ বা 'আহবার' ও 'রুহবান' (অর্থাৎ পাদ্রি ও ধর্মযাজক)-কে খোদায়ী শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে বসেছে। অনেকে তাযিয়াপূজা, কবরপূজা, পীরপূজার আবর্জনা দ্বারা তাওহীদের স্বচ্ছ প্রস্রবণকে মলিন করছে। তাওহীদবাদীদের মধ্যেও এমন কয়জন, যারা রিয়া (লোক দেখানো) ও প্রবৃত্তিপূজা থেকে পবিত্র?

মোটকথা, ঈমানের মৌখিক দাবিদারদের মধ্যেও খুব কমসংখ্যক এমন, যারা আকীদা বা আমলের পর্যায়ে, প্রকাশ্য বা গুপ্ত (সূক্ষ্ম) শিরকের অপরাধে লিপ্ত হয় না। أعاذنا الله من سائر أنواع الشرك (আল্লাহ সব ধরনের শিরক থেকে আমাদের রক্ষা করুন)।

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝١٠٧

১০৭. তবে কি ওরা এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, ওদের উপর আল্লাহর আযাবের কোন আপদ আসতে পারে? অথবা ওদের কাছে সহসা উপস্থিত হতে পারে কিয়ামত আর ওদের খবরও থাকবে না[১]?

قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝١٠٨

১০৮. আপনি বলে দিন, 'এ-ই আমার পথ— আমি ও আমার অনুসারীগণ বুঝেশুনে আল্লাহর প্রতি আহবান করি। আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই[২]।'

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠٩

১০৯. আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদ-বাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরই প্রেরণ করেছি (ফেরেশতাদের নয়), যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তবে কি ওরা যমীনে ভ্রমণ করেনি? তা হলে দেখতে পেত— ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল। আর পরহেযগারদের জন্য আখেরাতের নিবাসই উত্তম। এখনো কি তোমরা বুঝবে না[৩]?

---

১. অর্থাৎ ওরা এরূপ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় কেন হচ্ছে? ওরা কি খোদায়ী আযাব বা কিয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকার কোন ব্যবস্থা করে নিয়েছে?

২. অর্থাৎ আমার পথ হচ্ছে নির্ভেজাল একত্ববাদের পথ। আমি সমগ্র বিশ্বকে সকল ধারণা ও কল্পনা বর্জন করে এক আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর গুণাবলি ও বড়ত্ব-মাহাত্ম্য এবং তাঁর হুকুম-আহকামের সঠিক পরিচয় সঠিক পন্থায় লাভ করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। (على بصيرة)–আমি ও আমার সঙ্গীসাথীরা দলীল-প্রমাণ, অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞানের আলোকেই এ সরল পথে চলছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন একটি আলো দান করেছেন, যার ফলে আমার সকল সঙ্গীসাথীর মস্তিষ্ক আলোকিত হয়ে গিয়েছে। এখানে কারো অন্ধ অনুকরণের অবকাশ নেই। নির্ভেজাল একত্ববাদের পথিক প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের অভ্যন্তরে মা'রেফত ও অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ আলো এবং নির্মল 'আবদিয়াতের বিশেষ স্বাদ অনুভব করে, ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার দিয়ে ওঠে– سبحان الله وما أنا من المشركين

৩. অর্থাৎ পূর্বেও আমি আসমানের ফেরেশতাদের নবী বানিয়ে পাঠাইনি। পূর্ববর্তী নবীগণ এ সব মানব বস্তিরই অধিবাসী ছিলেন। এখন দেখে নাও, যারা তাঁদের মিথ্যা বলেছিল,

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হতে লাগলেন এবং লোকেরা ধারণা করল যে, তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে– তখন রাসূলগণের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছল। অতঃপর আমি যাদের ব্যাপারে চাইলাম তারা রক্ষা পেল। আর অপরাধী লোকদের থেকে আমার আযাব টলানো যায় না[১]।

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ۝

দুনিয়াতে তাদের কী পরিণাম হয়েছে। অথচ দুনিয়ায় অনেক সময় কাফেরদের ভোগ-বিলাস নসীব হয়ে থাকে। —আর আখেরাতের কল্যাণ একমাত্র তাদেরই জন্য, যারা শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে থাকে।

বস্তুত এতে মক্কার কাফেরদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে, যাতে তারা পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

বি. দ্র. এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোনো নারীকে নবী বানানো হয়নি। হযরত মারয়ামকেও কুরআন 'সিদ্দীকা'র মর্যাদা দান করেছে (নবীর নয়)। অধিকন্তু আয়াত থেকে এও প্রকাশ পায় যে, নিছক অরণ্য-মরুচারী বেদুঈনদের মধ্য থেকেও কোনো নবী প্রেরিত হননি।

১. অর্থাৎ আযাব আসতে বিলম্ব দেখে ধোঁকায় পড়ো না। পূর্ববর্তী উম্মতদেরও দীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল এবং আযাব আসতে এতই বিলম্ব হয়েছিল যে, কাফের-মুনাফিকরা একেবারে নির্ভয় হয়ে বেশি বেশি দুষ্কৃতি করতে থাকে। এহেন অবস্থা দেখে পয়গম্বরগণ ওদের ঈমান আনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েন। অন্যদিকে আল্লাহর তরফ থেকে কাফেরদের এ পরিমাণ অবকাশ দেওয়া হয় যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত আযাবের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না।

মোটকথা, একদিকে কাফেরদের পাপাচার-দুরাচার, অন্যদিকে আযাব আসায় অতি বিলম্ব-এ সব অবস্থা ও লক্ষনাদি পয়গম্বরদের জন্য খুবই নৈরাশ্যজনক ছিল।(ظنوا انهم قد كذبوا) এ দৃশ্য দেখে কাফেররা নিশ্চিতরূপে মনে করে নিল যে, নবীদের সাহায্য ও আমাদের ধ্বংসের যেসব ওয়াদা করা হয়েছিল, তা সবই মিথ্যা। আযাবের ফাঁকা বুলি শুধু ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল।

(استيئس الرسل) এমন নৈরাশ্যকর ও উদ্বেগজনক অবস্থায় নবীদের অন্তরেও এমন ধারণা এসে থাকতে পারে যে, আযাবের ওয়াদাকে আমরা যেরূপ বুঝেছিলাম তা ঠিক নয়। অথবা তাঁদের মনে নিতান্ত অনিচ্ছায় ওয়াসওয়াসা ও দুর্ভাবনার পর্যায়ে এই চিন্তা উদয় হয়ে থাকতে পারে যে, আমাদের সাহায্য ও কাফেরদের ধ্বংসের যে ওয়াদা করা হয়েছিল, তা কি পূর্ণ করা হবে না? যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে– وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ (এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল, এমনকি রাসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলতে শুরু করল, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য'? –সূরা বাকারা, রুকূ ২৬, আয়াত ২১৪)

১১১. নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলিতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ[১]। এ (কুরআন) কোন মনগড়া কথা নয়, বরং এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক, প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত[২]।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

যখন পাপীদের নির্ভয়তা এবং নবীদের দুশ্চিন্তা উক্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন হঠাৎ আসমানী সাহায্য এসে গেল। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (অর্থাৎ আজ্ঞাবহ মুমিনদের) নিরাপদ রাখলেন এবং পাপীদের সমূলে ধ্বংস করে দিলেন।

সতর্কবাণী (১) : আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত ও মেহেরবানী থেকে নিরাশ হওয়া কুফর, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা ও উপায়-উপকরণের বিবেচনায় নৈরাশ্য কুফর নয়। অর্থাৎ এরূপ বলা যেতে পারে যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের সাথে অমুক বিষয়ের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, তাতে নৈরাশ্য জাগে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার অপার রহমত থেকে নিরাশ নই, (তিনি স্বীয় রহমতে যে কোন অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারেন)। حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ আয়াতে এ নৈরাশ্যই উদ্দেশ্য, যা জাহেরী হাল-অবস্থা ও লক্ষণাদির হিসাবে হয়ে থাকে। নতুবা পয়গম্বরগণ আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হতে পারেন না।

সতর্কবাণী (২) : কুফরের ওয়াসওয়াসা কুফর নয়। এমন কি, তা কোন পর্যায়েই ঈমান ও নিষ্পাপতার পরিপন্থী নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নিজেদের দিলের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখে আনার চেয়ে আমরা জ্বলেপুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি এরূপ অনুভব কর? তাঁরা আরয করলেন, জী, হাঁ। তিনি বললেন– ذاك صريح الإيمان (এ তো সুস্পষ্ট ঈমান)। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৭১)

১. অর্থাৎ এ কোন গল্প বা উপন্যাস নয়, বরং ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ, যা থেকে বুদ্ধিমানদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

২. অর্থাৎ কুরআন কারীম, যার মধ্যে এ সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কোন মিথ্যা মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্ববর্তী সমস্ত সত্য আসমানী কিতাবের সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক জরুরী বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যাদানকারী। ঈমানদার ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয় বলে তাদের জন্য এ কুরআন বিশেষভাবে হেদায়াত ও রহমতের কারণ।

نفعنا الله بعلومه ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا علينا آمين

(আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের জ্ঞানরাজি দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন, দিন-রাত এর তেলাওয়াতের তাওফীক দিন এবং একে আমাদের পক্ষে প্রমাণ বানিয়ে দিন, আমাদের বিপক্ষে নয়।)

সূরা রা'দ

সূরা ১৩ । ৪৩ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ٤٣، رُكُوعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ①

১. আলিফ লা-ম মী-ম রা। এগুলি (মহান) কিতাবের আয়াত। আর আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না[১]।

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ

২. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলীকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন– তোমরা দেখ এমন স্তম্ভ ছাড়াই[২]। অতঃপর তিনি আরশের উপর

১. অর্থাৎ এ সূরার মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সবই আজীমুশ শান (মহান কিতাব)-এর আয়াত। আপনার প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব নিশ্চিতরূপে সত্য ও সঠিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট সত্যকে গ্রহণ করতেও অনেকে অস্বীকার করে থাকে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার এমন বিরাট, উঁচু ও মজবুত ছাদ বানিয়েছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এমন কোনো খুঁটি, স্তম্ভ বা গার্ডার দৃষ্টিগোচর হয় না, যার উপর এ বিরাট ছাদ দাঁড় করানো হয়েছে। অতএব এ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর কুদরতের অদৃশ্য স্তম্ভই আকাশের স্থিতির একমাত্র কারণ? যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে– ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه (এবং তিনিই আকাশকে পৃথিবীর উপর পড়ে যাওয়া থেকে সামলিয়ে রেখেছেন, তবে তাঁর হুকুম হলে ভিন্ন কথা –সূরা হজ্জ, আয়াত ৬৫)।

উল্লেখ্য, পদার্থনিচয়ের মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতবাদ সত্য হলেও তা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কারণ, মধ্যাকর্ষণকে প্রচলিত অর্থে স্তম্ভ বলা হয় না। আর যদি স্তম্ভ বলা হয়, তবে তা দেখা যায় না।

رُوِيَ عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا لها عمد ولكن لا نرى

অর্থাৎ এই মনীষীগণ বলেছেন, আসমানসমূহের স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। (ইবনে কাছীর)।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

'অধিষ্ঠিত' হয়েছেন[১] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ে পরিভ্রমণ করে*[২]। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা আপন রবের সাক্ষাৎকে বিশ্বাস কর[৩]।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۖ وَمِنْ كُلِّ

৩. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী[৪], আর তাতে

---

১. استواء على العرش সম্বন্ধে সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে'।

২. অর্থাৎ সূর্য নিজ পরিক্রমণ (বা আবর্তন) এক বছরে এবং চন্দ্র এক মাসে পূর্ণ করে।

আর لأجل مسمى এর অর্থ যদি 'নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' ধরা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই হবে যে, চন্দ্র-সূর্য এভাবে কিয়ামতকাল পর্যন্ত বিচরণ করতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ যিনি এরূপ বিরাট-বিশাল সৃষ্টিজগত পয়দা করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা কেন মুশকিল হবে?

অধিকন্তু কোন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সচেতন ও শক্তিশালী সরকার বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের যেমন সব সময়ের জন্য ছাড় দিয়ে রাখে না, তদ্রূপ নিজের বাধ্য ও শান্তিকামী প্রজাদের সুখ-শান্তির প্রতি সে অবজ্ঞাও প্রদর্শন করতে পারে না। (মোটকথা, প্রজাদের মধ্যকার অনুগত আর বিদ্রোহী, উভয় দলের সাথে সরকারের আচরণ একরকম হয় না)। অতএব, যিনি পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একমাত্র অধিপতি এবং যিনি স্বকীয় শক্তি ও কৌশলের দ্বারা সমগ্র ঊর্ধ্ব ও অধোঃজগতের সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তম উপায়ে চালু রাখছেন, তিনি কী করে বাধ্য ও অবাধ্য দু দলকে এমনি অর্থহীনভাবে ছেড়ে রাখবেন? এমন একদিন আসতেই হবে, যেদিন অনুগতদের আনুগত্যের পুরস্কার এবং অবাধ্যদের শাস্তি পেতে হবে। এ জীবনে যেহেতু বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে এমন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না, অতএব অবশ্যই মানতে হবে যে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন রয়েছে, যেখানে সকলকে আল্লাহর আদালতের সামনে উপস্থিত হয়ে সারা জীবনের আমলের ফল ভোগ করতে হবে।

৪. অর্থাৎ (পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছেন) পাহাড়-পর্বত, যা আপন স্থানে স্থির এবং নদী-সাগর, যা সদা প্রবহমান।

الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

প্রত্যেক ফলের দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করেছেন[১]। তিনি দিনকে রাতের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন[২]। নিশ্চয় এসবে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۣ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৪. আর পৃথিবীতে আছে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন ভূখণ্ড এবং আঙ্গুরের বাগ-বাগিচা; আরো আছে শস্য ও খেজুর বৃক্ষ– (কতক এমন যে,) একটির মূল অন্যটির সঙ্গে মিলিত, আর (কতক) মিলিত নয়। তা একই পানিতে সিঞ্চিত হয়। আর আমিই সেসব ভূখণ্ডের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি ফল-ফসলের দিক থেকে☆। নিশ্চয় এসবে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বোঝার চেষ্টা করে[৩]।

---

১. অর্থাৎ ছোট-বড়, তিতা-মিঠা, সাদা-কালো, গরম-ঠাণ্ডা। আর আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটির মধ্যে নর-মাদিও পাওয়া যায়।

২. এর অর্থ সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দেখে নিন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তার (অর্থাৎ ফল-ফসলের) একটিকে অপরটির উপর স্বাদে (ও বর্ণে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করি'।

৩. ঊর্ধ্ব আকাশসমূহের বিপরীতে এখানে নিম্ন ভূমণ্ডলেরও উল্লেখ করা হল। আকাশের সাথে চন্দ্র-সূর্যের কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের গতি ভিন্ন এবং প্রত্যেকর কাজও ভিন্ন। একটির উষ্ণ ও তীব্র রশ্মিসমূহ যে কাজ করে, দ্বিতীয়টির স্নিগ্ধ ও মৃদু জ্যোৎস্নার দ্বারা সে কাজ হয় না।

অনুরূপ, এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বস্তুরাজির উল্লেখ করা হচ্ছে। কোথাও পাহাড়-পর্বত দণ্ডায়মান; কোথাও বা নদী-সাগর প্রবহমান। পৃথিবীতে যেসব ফলমূল উৎপাদিত হয়, সেগুলিতে আকার-আকৃতি, রং, স্বাদ, ছোট-বড়, এমনকি নর-মাদির পার্থক্য রয়েছে। কখনো পৃথিবী দিনের আলোতে আলোকিত হয়, কখনো রাতের কালপর্দায় ঢেকে যায়। তারপর মজার ব্যাপার এই যে, কতিপয় ভূখণ্ড একে অপরের সাথে মিশে রয়েছে, সেগুলি একই পানিতে সিক্ত হয়, একই সূর্য-কিরণ তাতে পৌছে, একই বায়ু সকলের উপর প্রবাহিত হয়– তা সত্ত্বেও এসব ভূখণ্ডে বিভিন্ন রকম ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় এবং তাতে উৎপন্ন ফল-ফসলে এত বেশি তারতম্য হয় যে, দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করে।

৫. আপনি যদি বিস্মিত হয়ে থাকেন, তবে (আসলেই) ওদের এ কথা বিস্ময়কর– 'কী, যখন আমরা মাটি হয়ে যাব, তখনো আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হব?" এরাই এমন লোক, যারা আপন রবকে অস্বীকার করেছে এবং এরাই তারা, যাদের গলদেশে থাকবে শিকল। এবং ওরা দোযখবাসী, ওরা তাতে চিরকাল থাকবে[২]।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৬. ওরা আপনার নিকট দ্রুত অমঙ্গল চায় মঙ্গলের পূর্বে[৩], অথচ ওদের পূর্বে (শাস্তির) বহু নজীর গত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল– ওদের জুলুম সত্ত্বেও। এবং নিশ্চয় আপনার রব কঠোর শাস্তিদাতাও[৪]।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ) চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এসব নিদর্শন দেখে বুঝে ফেলেন যে, একই রহমত-বৃষ্টির বর্ষণ সত্ত্বেও বা একই হেদায়েত-সূর্যের বর্তমানে মানুষের মাঝে বস্তুগত ও রূহানী দিক থেকে পার্থক্য হতে পারে। এটা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তারা এও বুঝে নেন যে, অসীম কুদরতের কোন শক্তিশালী হাত আকাশরাজ্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে এবং যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতএব এরূপ সীমাহীন কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর পক্ষে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জীবিত করা এবং এ জগতের মিশ্র উপাদানসমুহের বিভাজন করে প্রত্যেক ভাল ও মন্দকে যথাস্থানে পৌছিয়ে দেওয়া কোনই কঠিন কাজ নয়

১. অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্য কথা আর কী হবে যে, যিনি প্রথমে একটি বস্তু সৃষ্টি করলেন, তিনি দ্বিতীয়বার তা সৃষ্টি করতে পারবেন না?

২. বস্তুত এ লোকেরা بعث بعد الموت (মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া)-কে অস্বীকার করে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশ করছে। সুতরাং এহেন বিদ্রোহীদের পরিণাম এ-ই হওয়া উচিত যে, গলায় শিকল, হাতে কড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে চিরস্থায়ী কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, যা প্রকৃতপক্ষে এরূপ অপরাধীদের জন্যই বানানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ ওরা সত্য গ্রহণ করে না, যে সত্য গ্রহণ করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ (الحسنة) লাভ হত। বরং ওরা কুফর অবলম্বন করে এবং বলে, আযাব নিয়ে আস।

৪. অর্থাৎ পূর্বে বহু জাতির উপর আযাব এসেছে, তোমাদের উপরও তা নাযিল করা কঠিন নয়। ব্যাপার এতটুকুই যে, আপনার প্রভু নিজের ধৈর্য ও ক্ষমাগুনে প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহর

৭. আর কাফেররা বলে, 'তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন[১]?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্যই ছিল পথপ্রদর্শক[২]।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۟

[রুকূ - ২]

৮. প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে, আল্লাহ তা জানেন[৩] এবং (জানেন) গর্ভাশয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি। আর তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর রয়েছে একটি পরিমাপ[৪]।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۟

জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন না। তিনি মানুষের জুলুম-অত্যাচার দেখেন এবং ক্ষমা করতে থাকেন। কিন্তু যখন তা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আর তাঁর ধ্বংসাত্মক আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

১. অর্থাৎ যে নিদর্শন আমরা চাই তা কেন অবতীর্ণ হল না, যা দেখে আমরা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যেতাম?

২. অর্থাৎ নিদর্শন অবতীর্ণ করার ক্ষমতা আপনার নেই। এ তো আল্লাহর কাজ। পয়গম্বরের সত্যতা প্রমাণের জন্য যখন যে নিদর্শন সমীচীন, তা তিনি দেখাবেন। আপনার কর্তব্য শুধু কল্যাণের কথা শুনিয়ে দেওয়া এবং পাপাচারের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করা।

পূর্বেও প্রত্যেক জাতির নিকট হাদী (পথপ্রদর্শক) ও নাযীর (সতর্ককারী) এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কারো এ দাবি ছিল না যে, অবাধ্যরা যে কোন নিদর্শন তলব করবে, তা অবশ্যই দেখিয়ে দেব। হাঁ, তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহর পথ দেখানো– আপনার কাজও তাই। অবশ্য তাঁরা বিশেষ বিশেষ জাতির জন্য হাদী ছিলেন, আর আপনি দুনিয়ার সকল জাতির জন্য হাদী মনোনীত হয়েছেন।

৩. নারী গর্ভে যা ধারণ করে– তা কি ছেলে না মেয়ে, পূর্ণাঙ্গ না বিকলাঙ্গ, ভাল না মন্দ ইত্যাদি অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ অবগত।

৪. অর্থাৎ গর্ভধারিণীর পেটে এক বাচ্চা না একাধিক, পূর্ণাঙ্গ না অপূর্ণাঙ্গ, অল্প না বেশি সময়ে ভূমিষ্ঠ হবে, মোটকথা, গর্ভবৃদ্ধি ও সংকোচনের সকল রহস্য ও কারণ এবং সময় ও অবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন। আর তিনি নিজের সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে সর্বাবস্থায় তার নির্ধারিত পরিমাপ ও যোগ্যতা অনুযায়ীই রাখেন।

অনুরূপ, তিনি নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) সত্যতা প্রমাণের জন্য যেসব নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন, তাতে বিশেষ পরিমাপ এবং সমূহ বিচার-বিবেচনা ও হেকমত নিহিত রয়েছে। সে

৯. (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য বস্তুর পরিজ্ঞাতা, মহান, অতি মর্যাদাশালী[১]।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝

১০. তোমাদের মধ্যে যে আস্তে কথা বলে এবং যে সশব্দে বলে, যে রাতে লুকিয়ে থাকে এবং যে দিনে ঘুরে বেড়ায়– সবাই (আল্লাহর নিকট) সমান[২]।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝

১১. প্রত্যেকের জন্য তার সামনে ও পিছনে প্রহরীরা রয়েছে, তারা আল্লাহর আদেশে তার তত্ত্বাবধান করে[৩]। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

মত বনী আদমের যোগ্যতা ও গ্রহণ-ক্ষমতা মোতাবেক যখন যে পরিমাণ নিদর্শন প্রকাশ করা সমীচীন ছিল, তাতে কমতি হয়নি। অবশ্য গ্রহণ করা ও উপকৃত হওয়ার দিক থেকে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয় (কেউ তা থেকে উপকৃত হয়, কেউ হয় না), যেরূপ গর্ভবর্তীদের পেট থেকে যেসব বাচ্চা পয়দা হয়, তারা এক রকম হয় না, বরং যোগ্যতা ও লালন-পালনের ভিত্তিতে তাদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে।

১. এর দ্বারা আল্লাহর জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা তুরে ধরা হল। অর্থাৎ, বিশ্বজগতের প্রকাশ্য ও গোপন কোন বস্তুই তাঁর থেকে লুক্কায়িত নয় এবং সমগ্র বিশ্বজগত তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণনা করার পর প্রসঙ্গত এখানে তিনি বলছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম আমার জ্ঞানের আয়ত্তে রয়েছে। যে কথা তোমরা অন্তরে গোপন রাখ বা আস্তে বল এবং যে কথা তোমরা জোরে বল, অনুরূপ তোমরা যে কাজ রাতের আঁধারে লুকিয়ে কর এবং যা দিনের বেলায় সর্বসমক্ষে কর, আল্লাহর জ্ঞানের দিক থেকে সব সমান।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে আয়াতটিতে তিন রকমের মানুষের কথা বলা হয়েছে– (এক) مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ (যে ব্যক্তি কথা গোপন করে)। (দুই) مَنْ جَهَرَ بِهِ (যে প্রকাশ করে)। (তিন) مَنْ هُوَ مُسْتخف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (যে ব্যক্তি রাতে নিজের কাজ গোপন করে, যেমনঃ রাতে চুরি করা; এবং দিনে প্রকাশ করে, যেমন– দিনে নামায-কালাম পড়া)। আল্লাহ তাআলা এদের সকলকে সমানভাবে জানেন।

৩. অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দার সঙ্গে আল্লাহর ফেরেশতারা নিযুক্ত রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তার আগের ও পরের সব আমল লিপিবদ্ধ করেন, আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম অনুসারে সেইসব বিপদ দূর হওয়ার মাধ্যম হন, যেগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে রক্ষা করতে

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের উপর আপদ (পতিত করার) ইচ্ছা করলে তা রদ করা যায় না। আর তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই[১]।

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّیُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۲﴾

১২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের বিদ্যুত-চমক দেখান ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য এবং সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ[২]।

চান। বস্তুত, আল্লাহর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– তিনি এ জগতে কোন কিছু পয়দা করতে চাইলে তার জাহেরী উপায়-উপকরণ তৈরি করে দেন। তদ্রূপ তিনি কিছু বাতেনী উপকরণ ও মাধ্যমও পয়দা করেছেন যেগুলি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা কার্যকর হয়ে থাকে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অবিরত যে মেহেরবানী ও রক্ষণাবেক্ষণ হতে থাকে, তা থেকে তিনি কোন জাতিকে মাহরূম করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের আচরণ পরিবর্তন না করে। যখন পরিবর্তন করে ফেলে তখন বিপদ আসে। আর বিপদ এসে পড়লে কেউ তা রোধ করতে পারে না, কারো সাহায্যও তখন কোনো কাজে আসে না।

বি. দ্র. এস্থলে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের নীতি বর্ণিত হয়েছে, ব্যক্তি ও এককের উত্থান-পতনের নীতি নয়। জাতির ভাল-মন্দ অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতারই বিচারে নির্ধারিত হয়।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

প্রথমে বান্দাদের তত্ত্বাবধানের উল্লেখ ছিল, পরে বদ আমলের কারণে যে বিপদাপদ আসে তার উল্লেখ হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, আল্লাহর সত্তা অনুগ্রহ প্রদান ও প্রতিশোধ গ্রহণ– এ উভয় গুণসম্বলিত। এ হিসাবেই এখানে তাঁর কুদরতের এমন কিছু নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে একই সময়ে আশা ও ভয়ের দুই বিপরীতমুখী অবস্থা সৃষ্টি করার যোগ্যতা রয়েছে।

অর্থাৎ যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন আশার সঞ্চার হয় যে, বৃষ্টি হবে। আবার ভয়ও লাগে যে, বজ্রপাত হয়ে ধ্বংসের কারণ না হয়। ভারী মেঘের আগমন হলে খুশী লাগে যে, রহমত-বৃষ্টির অবতরণ হবে। সেই সাথে দুশ্চিন্তাও হয় যে, ঝড়-তুফান শুরু হয়ে যায় কিনা।

ঠিক এভাবে মানুষের উচিত আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া, কিন্তু আল্লাহর কৌশল ও আযাব থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত না থাকা।

১৩. আর গর্জনকারী* তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে (তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে)[১] এবং

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মেঘ-গর্জন'।

১. অর্থাৎ গর্জনকারী মেঘ বা ফেরেশতা আপন অবস্থার মাধ্যমে বা মুখের ভাষায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্যত্র বলা হয়েছে- وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (আর এমন কোন জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ-পাঠ অনুধাবন করতে পার না। –বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৪৪)। এবং সকল ফেরেশতা ভয় ও ভীতির সাথে তাঁর প্রশংসা ও গুণগান এবং পবিত্রতা ও মহিমাকীর্তনে ব্যস্ত থাকে।

বি. দ্র. رعد ও برق প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্তমান কালের গবেষণালব্ধ ফল এই যে, মেঘমালার মধ্যে Positive (বা ধনাত্মক) আর মাটির মধ্যে Negative (বা ঋণাত্মক) বিদ্যুত-শক্তি পাওয়া যায়। সে মত যে মেঘ মাটির অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তাতে কখনো কখনো মাটির ঋণাত্মক বিদ্যুত-শক্তি অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর এ মেঘের উপর দিয়ে প্রায়ই এমন মেঘের অতিক্রম হয়, যার মধ্যে বিদ্যুতশক্তি বর্তমান থাকে। আর অভিজ্ঞতা থেকে এ নিয়ম জানা গেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিদ্যুতশক্তিবিশিষ্ট দুটি পদার্থ যখন কাছাকাছি হয়, তখন প্রত্যেকটি দ্বিতীয়টির বিদ্যুতশক্তিকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে, যাতে উভয়ের বিদ্যুতশক্তি একীভূত হয়ে যায়। এই নিয়মানুসারে উপর ও নীচের মেঘ দুটি যখন একে অপরের বিদ্যুতশক্তি নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তখন উভয়টির মিলনের ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় এবং এই চরম উষ্ণতা থেকে মেঘ দুটির ঘনত্ব অনুযায়ী একটি অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়, যাকে صاعقة (বজ্র) বলা হয়। আর صاعقة-এরই চমক ও আলোকচ্ছটাকে برق বলা হয় এবং বায়ুতে এর অনুপ্রবেশের ফলে যে ধ্বনি নির্গত হয় তা হচ্ছে رعد

বিদ্যুতের উক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গই কখনো মেঘমালা ও বায়ুর স্তর ভেদ করে নীচে পতিত হয়, যার বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘরবাড়ি ধসিয়ে দেওয়া, পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ করা এবং প্রাণীকুলের ধ্বংস সাধন ছাড়াও কোন কোন সময় দেখা গেছে যে, তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একজন মানুষের দেহ থেকে পোশাক খুলে কোন গাছের ডালের উপর রেখে দিয়েছে। কিন্তু পোশাক পরিহিত মানুষটির দেহে কোন আঘাত পৌঁছেনি (دائرة المعارف فريد وجدي) –এসব দেখে ধারণা হয় যে, বিদ্যুতের এ অগ্নি-শিখার মধ্যে কোন বিবেক-বুদ্ধি ও ক্ষমতাধারী শক্তি অদৃশ্য উপায়ে কাজ করছে।

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী নয়

উপরে বর্ণিত 'মতবাদ' অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর প্রবক্তাগণ নিজেরা স্বীকার করেছেন যে, 'রূহ' (বা আত্মার) মত 'বিদ্যুতশক্তি'রও মূলরহস্য এখন পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এবং আধ্যাত্মিক জগতের কাশফধারী ও

وَيُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيۡبُ بِهَا مَنۡ يَّشَآءُ وَهُمۡ يُجَادِلُوۡنَ فِى اللّٰهِ‌ۚ وَهُوَ شَدِيۡدُ الۡمِحَالِ ؕ

তিনি বজ্র প্রেরণ করেন, অতঃপর যার উপর ইচ্ছা তা পতিত করেন। আর ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে ঝগড়া-বিবাদ করে, অথচ তিনি কঠোর পাকড়াওকারী[১]।

তত্ত্বধারীগণের বর্ণনা মতে সমগ্র বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনায় বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ছাড়াও অদৃশ্য উপায়-উপকরণেরও একটা বিরাট অংশ সক্রিয় রয়েছে। বস্তুজগতে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তা খোলসমাত্র। কিন্তু এ আকৃতির পিছনে যে অদৃশ্য রহস্য রয়েছে তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলিও তো (যেমনঃ এ বিদ্যুত-শক্তিরই পজিটিভ নেগেটিভ হওয়া ইত্যাদি) কতিপয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ছাড়া অন্যদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। সুতরাং কমপক্ষে এতটুকু বিশ্বাসও যদি নবীদের দর্শন ও অভিজ্ঞতার প্রতি স্থাপন করে নেওয়া হয়, তবে অনেক মতভেদের পরিসমাপ্তি হতে পারে।

হাদীস থেকে জানা যায়, অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মতই মেঘ ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত আছেন, যারা মেঘমালাকে সঠিক স্থানসমূহে পৌঁছান এবং তাদের দ্বারা প্রয়োজন-মাফিক ও যথাযথ কাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। বিজ্ঞানীদের বর্ণনা মত মেঘ ও মাটিতে 'বিদ্যুতশক্তি' রয়েছে। তো এর ব্যবস্থাপক যদি কোন কোন অদৃশ্য ফেরেশতা হন, তবে একে অস্বীকার করার কী কারণ আছে? যাকে তোমরা (বিজ্ঞানীরা) شراره كهربائية (বিদ্যুত-স্ফুলিঙ্গ) বল, তা যেহেতু ফেরেশতাদের বিশেষ হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্টি হয়, সুতরাং তাকে ওহীর ভাষায় مخاريق من نار (বা ফেরেশতার অগ্নি-চাবুক) বলায় কিয়ামত ঘটে যাবে কেন? এই অগ্নিশিখার প্রচণ্ডতা ও তীব্র বিচ্ছুরণের কারণে যে গর্জন ও বজ্রের সৃষ্টি হয়, তাকে যদি বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ফেরেশতার হুঙ্কার বলে প্রকাশ করা হয়, তবে তা অত্যন্ত সংগত প্রকাশভঙ্গিই বটে।

যা হোক, বিজ্ঞান যে জিনিসের শুধু বহিরাঙ্গটা বুঝেছে, 'ওহী' তারই অন্তরাত্মা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছে। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানকে অযথা পরস্পর-বিরোধী (selt-contradictory) সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লামা মুহাম্মদ আলুসী (র) [তাঁর রচিত তাফসীরে রূহুল মাআনীতে] সূরা বাকারার শুরুতে এ বিষয়ের উপর যুক্তিসংগত আলোচনা করেছন। তা দ্রষ্টব্য।

১. না জানি কখন আল্লাহ এই ঝগড়া-বিবাদকারীদের উপর আযাবের বজ্রপাত করেন! হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের এক অহংকারী প্রধানের নিকট লোক পাঠালেন তাকে ডেকে আনার জন্য। বার্তাবাহক তাকে বলল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' তখন সে বলে কি, 'রাসূলুল্লাহ আবার কে? আর আল্লাহই বা কী জিনিস– সোনার না রূপার, না কি তামার?' (নাউযুবিল্লাহ!) তিনবার সে এ উক্তি করল। তৃতীয়বার যখন সে এ বেআদবীমূলক শব্দাবলি উচ্চারণ করছিল, তখন একখণ্ড মেঘ ভেসে এল। তৎক্ষণাৎ বজ্রপাত হল এবং তার মাথা থেকে খুলি বিচ্ছিন্ন করে দিল। (সুনানে নাসাঈ-কুবরা, হাদীস ১১১৯৫; তাফসীরে তবারী ১৩/৪৮০)

১৪. তাঁকেই ডাকা সঠিক; আর তাঁর পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে, তারা ওদের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না, কিন্তু তদ্রূপ- যেমন কেউ তার হাত দু'টি প্রসারিত করল পানির দিকে, যেন তা তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে, অথচ তা কখনো মুখ পর্যন্ত পৌঁছবে না। আর কাফেরদের ডাক কেবল বৃথাই যায়[১]।

لَهٗ دَعۡوَةُ الۡحَقِّ ؕ وَالَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا يَسۡتَجِيۡبُوۡنَ لَهُمۡ بِشَىۡءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيۡهِ اِلَى الۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ ۝١٤

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, আমের ইবনে তুফায়ল ও আরবাদ ইবনে রাবীআ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমরা এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করছি যে, আপনার পরে আমরা খলীফা হব।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার করলে তারা এ কথা বলে উঠে গেল, 'আমরা আপনার বিরুদ্ধে পদাতিক ও আরোহী সৈন্য দিয়ে মদীনার উপত্যকা ভরে ফেলব।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তা প্রতিহত করবেন এবং মদীনার আনসাররা প্রতিরোধ করবে।' ওরা দুজন প্রস্থান করলে পথিমধ্যে আরবাদের উপর বজ্রপাত হল এবং আমের প্লেগজনিত গলার ফোঁড়ায় ধ্বংস হল। (তাফসীরে তবারী : ১৩/৪৮১-৪৮২; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, বর্ণনা ১২১৯৩)

বি. দ্র. মেঘের গর্জন শুনে এ দো'য়া পড়া উচিত-

سُبْحَانَ مَنْ يُّسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِه، اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

১. অর্থাৎ তাঁকেই ডাকা উচিত, যিনি সব রকম লাভ ও ক্ষতির মালিক, অক্ষমকে ডেকে কী লাভ? আল্লাহ ছাড়া কে আছে, যার হাতে নিজের বা অন্যদের লাভ-লোকসানের ক্ষমতা আছে? গাইরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের সাহায্যের জন্য ডাকা ঠিক এরূপ, যেমন কোন পিপাসিত ব্যক্তি কূপের মুখে দাঁড়িয়ে পানির দিকে হাত বাড়ায় এবং তোষামোদ করে বলে যে, আমার মুখে চলে আয়! বলা বাহুল্য, কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে পানি সাড়া দিতে পারে না, বরং পানি যদি তার মুঠিতেও হয় তবু পানি নিজে তার মুখে পৌঁছতে পারে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা যাদের ডাকে, তাদের কতক তো ওদের ধারণা ও কল্পনার ফলমাত্র, কতক জিন ও শয়তান, আর কতক এমনসব জিনিস, যাদের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি আছে, কিন্তু তারা নিজেরা এসবের মালিক নয়। এ অবস্থায় তাদের ডেকে কী লাভ?' যেমন: আগুন বা পানি। আর সম্ভবত গ্রহ-নক্ষত্রও এ শ্রেণীভুক্ত।

১৫. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা আল্লাহকে সেজদা করে– স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং (সেজদা করে) তাদের ছায়াগুলিও– সকালে ও সন্ধ্যায়[১]।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۞

১৬. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে?' বলুন, 'আল্লাহ'। বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাঁকে ছাড়া এমনসব সাহায্যকারী অবলম্বন করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয়[২]?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকাররাশি ও আলো কি সমান[৩]?' ওরা কি আল্লাহর জন্য এমন শরীকদের স্থির করেছে, যারা (কোন

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর হুকুমে মাথা নত করে। আর যে ঈমান আনেনি, তার উপরও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহরই হুকুম জারী রয়েছে। আর সকাল–সন্ধ্যায় ছায়া মাটির উপর প্রসারিত হয়ে যায়। এটাই ছায়ার সেজদা।

অর্থাৎ 'বস্তু' হোক বা 'আপতন', কোন কিছুই সৃষ্টিজগতে কার্যকর আল্লাহ তাআলার নিয়ম-নীতি থেকে বের হতে পারে না। যেন, আল্লাহর হুকুম ও কর্তৃত্বের সামনে সকলেই অনুগত ও সেজদাবনত। ছায়ার সম্প্রসারন ও সংকোচন, ডানে-বাঁয়ে হেলা– সবই তাঁর ইচ্ছা ও এরাদায় হয়ে থাকে। আর সকাল ও সন্ধ্যার উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, এ দুই সময়ে মাটির উপর ছায়ার বিস্তার অধিকতর দৃশ্যমান থাকে।

২. অর্থাৎ 'রুবুবিয়্যাত' (প্রভুত্ব) এর বিষয়টি যখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য স্বীকার করছ, তখন সাহায্যের জন্য অন্যান্য সাহায্যকারী সাব্যস্ত করছ কেন? অথচ তারা তিল পরিমাণ লাভ-লোকসানের স্বতন্ত্র ক্ষমতা রাখে না।

৩. অর্থাৎ একত্ববাদী ও মুশরিকের পার্থক্য ঠিক চক্ষুষ্মান ও অন্ধের মধ্যকার পার্থক্যের মত। আর তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে তেমন পার্থক্য রয়েছে, যেমন রয়েছে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে। এ অবস্থায় একজন অন্ধ মুশরিক, যে শিরকের অন্ধকাররাশির মধ্যে ডুবে আছে এবং কেবল ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে– সে কি সেই মাকামে পৌছতে পারে যেখানে পৌছতে সক্ষম হয় একজন একত্ববাদী, যে সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ঈমান ও মা'রেফতের আলোতে আল্লাহ-প্রদর্শিত সরল পথে চলছে? কস্মিনকালেও না। এরা উভয়ে একই মর্যাদা ও ফলাফল লাভ করতে পারে না।

كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

কিছু) সৃষ্টি করেছে যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, ফলে ওদের দৃষ্টিতে (উভয়ের) সৃষ্টি সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে? আপনি বলুন, 'আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একক, পরাক্রমশালী[১]।'

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۭ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاۗءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ڛ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۗءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝

১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলেন। ফলে নদী-নালা নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হল, তার পর জলস্রোত স্ফীত ফেনাকে উপরে নিয়ে আসল। এবং তারা যে (ধাতু) আগুনে পোড়ায় অলঙ্কার বা আসবাবপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে, তাতেও অনুরূপ ফেনা থাকে। এভাবে আল্লাহ হক ও বাতিলের বর্ণনা দেন। অতএব ফেনা, তা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য উপকারী, তা যমীনে অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন[২]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেরূপ মাখলূকাত পয়দা করেছেন, তোমাদের দেব-দেবীরাও কি সেরূপ কোন কিছু পয়দা করেছে, যা দেখে তাদের খোদা হওয়ার সন্দেহ হচ্ছে? তারা তো একটি মাছির ডানা বা একটি মশার ঠ্যাংও বানাতে পারে না। বরং অন্যান্য সৃষ্টির মত তারা নিজেরাও একক মহাশক্তিশালী আল্লাহর সৃষ্টি। এর পরও এরূপ অক্ষম ও অপারগ জিনিসসমূহকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা কত বড় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা!

২. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল, তাতে নদী-উপত্যকা ভরে গেল। প্রত্যেক উপত্যকার মধ্যে তার আয়তন ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ পানি আল্লাহ চাইলেন প্রবাহিত করে দিলেন। ছোট উপত্যকায় স্বল্প পানি এবং বড় উপত্যকায় বেশি। পানি যখন জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হল, তখন ধুলাবালি ও আবর্জনা মিশে তা ঘোলা হয়ে গেল। অতঃপর ফেনা ও আবর্জনা ফুলেফেঁপে পানির উপরিভাগে চলে এল। যেরূপ অলঙ্কার ও তৈজসপত্র, অস্ত্র-সস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করার জন্য সোনা-রূপা, তামা-লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ আগুনে গলানো হলে, তাতেও ফেনা (বা গাদ) ওঠে। কিন্তু অল্প সময় পরেই তা শুষ্ক বা বিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যা প্রকৃত কাজের জিনিস (অর্থাৎ পানি বা গলিত ধাতু), তাই জমিতে বা মালিকের হাতে অবশিষ্ট থেকে যায়, যা দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

হক-বাতিলের উদাহরণ

হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত ঠিক এরূপ। যখন সত্য ধর্ম নিয়ে আসমানী ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন মানবগোষ্ঠী নিজ নিজ পাত্র (অন্তর) ও যোগ্যতা অনুযায়ী ফয়েয হাসিল করে

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ

১৮. যারা আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ[১]। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, ওদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা সবই থাকে এবং তার সাথে থাকে আরো সমপরিমাণ– তবে তা সবই নিজেদের মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দেবে[২]। ওদের জন্য রয়েছে মন্দ

থাকে। অতঃপর হক ও বাতিলের পরস্পর সংঘর্ষে অসত্যের আবর্জনা ফুলে ওঠে এবং বাহ্যত ফেনার ন্যায় হকের উপর চেপে বসে। কিন্তু এই উত্থান নিতান্তই সাময়িক ও ভিত্তিহীন। কিছু সময় পর বাতিলের শৌর্য-বীর্য উধাও হয়ে কোথায় যে যায় তা আল্লাহই জানেন। ফেনার নীচে যে আসল ও উপকারী বস্তু চাপা পড়েছিল (অর্থাৎ হক ও সত্য), তাই রয়ে যায়।

كذلك يضرب الله الامثال

লক্ষ করুন, আল্লাহ-বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ কেমন চমৎকার! কত হৃদয়গ্রাহী পন্থায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, দুনিয়াতে যখন হক ও বাতিলের সংঘর্ষ হয়, তখন যদিও স্বল্প সময়ের জন্য বাতিলকে ফুলে-ফেঁপে উপরে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু পরিণামে বাতিলকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে হকই প্রবল ও বিজয়ী হয়। সুতরাং বাতিলের সাময়িক জয়জয়কার দর্শনে কোন মুমিনের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়।

অনুরূপ কোন মানুষের অন্তরে যখন সত্য প্রবেশ করে, তখন কিছু সময়ের জন্য দ্বিধা-সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার জোরশোর দেখা দিলে তাতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। কেননা, একটু পরেই বাতিলের এ জোয়ারে ভাটা পড়বে এবং নির্ভেজাল সত্য দৃঢ় ও স্থির হয়ে যাবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে তাওহীদ ও শিরকের তুলনামূলক আলোচনা ছিল, আর বর্তমান আয়াতে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংঘর্ষের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সামনে উভয়ের পরিণাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে।

১. অর্থাৎ যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে। অন্তরের শান্তি ও প্রকৃত আনন্দ তাদের ছাড়া আর কারো হাসিল হয় না।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেভাবেই জীবন অতিবাহিত হোক, কিন্তু আখেরাতে ওদের অবস্থা এমন অশান্তির ও ভয়ঙ্কর হবে যে, যদি সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদও ওদের অধিকারে থাকে, বরং সেই পরিমাণ আরো থাকে, তবুও ওরা সমস্ত সম্পদ মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে উক্ত পেরেশানী থেকে রেহাই পেতে চাইবে– وأنّٰى لهم الذكرى (কিন্তু কোথায় পাবে ওরা সে সুযোগ?)

হিসাব[১] এবং ওদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর (তা) অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।	وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

[রুকূ - ৩]

১৯. আচ্ছা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য- সে কি ওর সমান হতে পারে, যে অন্ধ[২]? উপদেশ কেবল বুদ্ধিমানরাই গ্রহণ করে-	اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۭ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾
২০. যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না[৩];	الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾
২১. এবং যারা তা জুড়ে রাখে যা জুড়ে রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন[৪] এবং স্বীয় রবকে ভয়	وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ

১. অর্থাৎ ওদের হিসাব-নিকাশে কোন প্রকার রেয়াত ও শিথিলতা করা হবে না, এক একটি বিষয়ে পুরাপুরি হিসাব ও ধর-পাকড় হবে।

২. মুমিন ও কাফের উভয়ের পরিণাম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করার পর এখন বলা হচ্ছে যে, এমন পরিণতি হওয়া নিতান্তই যুক্তিযুক্ত ও হেকমতপূর্ণ। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে না যে, সম্পূর্ণ অন্ধ একটা মানুষ, যে নাকি অন্ধকারে এদিক-সেদিক হাতড়িয়ে ফিরছে, সে এমন মানুষের সমকক্ষ হতে পারে, যার অন্তর্চোখ উন্মিলিত এবং যে পূর্ণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সত্যের আলো দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। (এ দু'জন কখনো সমকক্ষ নয়। অতএব উভয়ের পরিণতিও এক নয়)।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আদিকালে যে অঙ্গীকার (عهد اَلَسْتُ) হয়েছিল, যার সাক্ষ্য মানবস্বভাব নিজেই বহন করছে- তারা তা পূর্ণ করে এবং যেসব ওয়াদা-অঙ্গীকার নবীদের সঙ্গে মৌখিকভাবে করা হয়েছে, সেসবও তারা পূর্ণ করে থাকে, কোনটাই ভঙ্গ করে না। অনুরূপ, নিজেরা কোন বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে বা বান্দার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করে, শর্ত হচ্ছে গোনাহর অঙ্গীকার না হওয়া, তারও খেলাপ করে না।

৪. অর্থাৎ যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। অথবা অর্থ এই যে, ঈমানকে আমলের সাথে বা বান্দার হককে আল্লাহর হকের সাথে জুড়ে রাখে। অথবা : ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। অথবা : নবীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে না যে, কাউকে মানল, কাউকে মানল না।

করে ও মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে[১];

سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২. এবং যারা স্বীয় রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করেছে[২], নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করেছে– গোপনে ও প্রকাশ্যে[৩] এবং যারা মন্দের মোকাবেলা ভাল দ্বারা করে[৪]। এমন লোকদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের (শুভ) পরিণাম–

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩. (তথা) অনন্তকাল বসবাসের বাগানরাজি[৫]– যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্যে যারা পুণ্যবান তারাও[৬]। আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আসবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

---

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার মহিমা ও পরাক্রমের কথা চিন্তা করে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং সর্বদা এ আশঙ্কায় থাকে যে, আখেরাতে যখন তিলে তিলে হিসাব নেওয়া হবে তখন না জানি কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

২. অর্থাৎ বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট ও দুনিয়ার অপ্রীতিকর ঘটনাদিতে ধৈর্যধারণ করেছে, বিপদে অধীর হয়ে আনুগত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, অবাধ্যতার প্রতিও ধাবিত হয়নি। আর এ সবর ও দৃঢ়তা তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই প্রদর্শন করেছে। দুনিয়াবাসী তাদের অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বাহাদুর বলবে, অথবা ধৈর্য ছাড়া কোন উপায় ছিল না বলে অগত্যা ধৈর্য ধারণ করেছে, এমনটি নয়।

৩. গোপনে দান করার কথা আগে এজন্য বলা হয়েছে যে, দান গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু শরী'য়তের বিচারেই যদি ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম হয়, তবে ভিন্ন কথা।

৪. অর্থাৎ মন্দের জওয়াব ভালোর দ্বারা দেয়, কঠোরতার মোকাবেলায় নম্রতা দেখায়, কেউ জুলুম করলে ক্ষমা করে (তবে শর্ত এই যে, ক্ষমা করায় যেন মন্দ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা না থাকে)। আর মন্দ থেকে বেঁচে নেকী অবলম্বন করে, এবং কখনো মন্দ কর্ম হয়ে গেলে তার পরিবর্তে সৎকর্ম (অর্থাৎ তওবা ও পাপের প্রতিকার) করে।

৫. অর্থাৎ যেগুলির মধ্যে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে।

৬. اٰبَاء শব্দটি এস্থলে আরবী ব্যাকরণের 'তাগলীব' (প্রাধান্যদান)-এর নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব اٰبَاء (বাপ-দাদা)-এর মধ্যে اُمَّهَات (মা-নানী-দাদী)-ও শামিল রয়েছে।

২৪. (তারা বলবে,) 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। আর আখেরাতের (এই) পরিণাম কত উত্তম[১]!'

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

বেহেশতের সুসংবাদের সাথে এখানে একটি বাড়তি সুসংবাদ শোনানো হল যে, উল্লিখিত গুণাবলিবিশিষ্ট কামেল বান্দারা বেহেশতে আরেকটি নে'য়ামত ও আনন্দের বিষয়ও লাভ করবে। তা এই যে, তারা এবং তাদের মাতাপিতা, সন্তানাদি ও স্ত্রীরা, যারা নিজেদের নেকীর বদৌলতে বেহেশতে প্রবেশের যোগ্য হবে, তারা সকলে একত্রে থাকবে। এমনকি, এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ যদি তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদার হয়, তবু আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে সেই কামেল বান্দার স্তরে পৌঁছে দেবেন। যেমন এরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (সূরা তূর, আয়াত ২১)

(ومن صلح) –এ থেকে জানা গেল, ঈমান ও নেক আমল ছাড়া শুধু কামেল বান্দাদের আত্মীয় হওয়া যথেষ্ট নয়। হাঁ, ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে আত্মীয়তার কারণে মর্যাদার মধ্যে কিছুটা উন্নতি সম্ভব। والله أعلم

১. সহীহ হাদীসে (বুখারী, ৩২৫৭) বেহেশতের আট দরজার কথা বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের মর্ম এই যে, সেই কামেল বান্দাদের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলার পবিত্র ফেরেশতাগণ সকল দিক থেকে উপস্থিত হবেন এবং তাদের অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ জানাবেন।

হাদীসে আছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বাগ্রে সেই গরীব মুহাজিরগণ বেহেশতে প্রবেশ করবেন, যারা দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধ-জেহাদে ইস্পাত কঠিন থাকতেন এবং সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন নির্দেশ হত, তা পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। দুনিয়ার প্রয়োজনাদি, অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখেই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমার সেই বান্দারা কোথায়, যারা আমার পথে যুদ্ধ করেছে, আমার জন্য দুঃখ-কষ্ট সয়েছে ও জেহাদ করেছে? তোমরা যাও এবং বিনাদ্বিধায় বেহেশতে প্রবেশ কর। অতঃপর ফেরেশতাদের হুকুম করবেন, আমার এই বান্দাদের নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম কর। ফেরেশতাগণ তখন আরয করবেন, খোদাওয়ান্দ! আমরা আপনার উত্তম সৃষ্টি। আপনি কি আপনার এই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মাটির মানুষদের কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করার হুকুম দিচ্ছেন? এরশাদ হবে, হাঁ, এরা আমার সেসব বান্দা, যারা তাওহীদের জন্য জান দিয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তরে নিয়েই চলে এসেছে, আমার পথে জেহাদ করেছে এবং সমস্ত দুঃখ-যাতনা খুশীচিত্তে সয়েছে। এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ সকল দিক থেকে তাঁদের খেদমতে হাযির হবেন এবং سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ বলতে থাকবেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৫৭০-৬৫৭১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৪২১)

২৫. আর যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তা দৃঢ় করার পর, এবং তা ছিন্ন করে যা জুড়ে রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে– এমন লোকদের জন্যই রয়েছে লা'নত এবং ওদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট নিবাস[১]।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করেন[২]। আর ওরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত, অথচ আখেরাতের সামনে দুনিয়ার জীবন (তুচ্ছ) ভোগ্যবস্তু বৈ কিছু নয়[৩]।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছরের শুরুতে শহীদদের কবরস্থানে তশরীফ নিতেন এবং বলতেন- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ। হযরত আবু বকর, উমর ও উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের আদর্শও এমনই ছিল। (মুসান্নাফে আ. রায্যাক, হাদীস ৬৭১৬; তাফসীরে তবারী ১৩/৫১৩)

১. সৌভাগ্যবানদের বিপরীতে এখানে পাপিষ্ঠ-হতভাগাদের স্বভাব-চরিত্র ও শেষ পরিণামের কথা বলা হয়েছে। ওদের কার্যকলাপ হচ্ছে– আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, যেসব জিনিস জুড়ে রাখার হুকুম ছিল সেগুলি ছিন্ন করা, দেশের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদের আগুন প্রজ্বলিত করা, অন্যদের ও নিজেদের জানের উপর জুলুম করা। (لهم اللعنة)-এরাই হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানে তাদের পৌঁছতে হবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগবিলাস ও প্রাচুর্য দেখে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ফয়সালা করা যায় না। যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে রিযিক ও ধন বেশি দিয়েছেন, সে-ই তাঁর দরবারে মকবূল– এ জরুরী নয়। অনেক মকবূল বান্দা পরীক্ষাস্বরূপ এখানে অভাবের জীবন যাপন করে থাকেন, আর হতভাগা পাপীদের ঢিল দেওয়া হয়– ওরা ভোগ-বিলাসে মেতে থাকে। এটাই প্রমাণ করে যে, এ জীবনের পর আরো একটি জীবন রয়েছে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেক ও বদ আমলের পরিপূর্ণ ফল অবশ্যই দেওয়া হবে।

যা হোক, দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য আল্লাহ তাআলার নিকট মকবূল ও বিতাড়িত হওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ পার্থিব জীবনকে ওরা মূল লক্ষ্য মনে করে গর্ব ও উল্লাসে মেতে থাকে। অথচ আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ। যেমন: একজন মানুষ নিজ আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবাল, এখন সমুদ্রের পানির তুলনায় আঙ্গুলে লেগে আসা এক ফোঁটা পানির কী মূল্য আছে? বলা বাহুল্য, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার এতটুকু মূল্যও নেই।

[রুকূ - ৪]

২৭. আর কাফেররা বলে, 'তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন?' আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন আর তিনি নিজের দিকে তাদেরকেই পথ দেখান যারা (তাঁর) অভিমুখী হয়'[১]–

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝

সুতরাং চিরস্থায়ী বস্তুকে ক্ষনস্থায়ী বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ফসল-ক্ষেত্র, মূল উদ্দেশ্য নয়। অতএব সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ন্যায় এ দুনিয়ার উপায়-উপকরণ এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে এগুলি আখেরাতের সফলতার মাধ্যম হয়।

১. শত শত নিদর্শন ওরা দেখত, কিন্তু ওদের একই কথা: আমরা যে নিদর্শনের কথা বলি, তা দেখান। যথা– মক্কার পাহাড়গুলিকে স্ব স্ব স্থান থেকে একটু সরিয়ে চাষবাসের নিমিত্ত যমীন প্রশস্ত করে দিন। অথবা জমি ফেড়ে ঝরনা ও নদী বের করে দিন। অথবা আমাদের পূর্বপুরুষদের পুনর্জীবিত করত আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিন। মোটকথা, এমন কোন নিদর্শন দেখান, যা ঈমান আনতে আমাদের বাধ্য করে।

ফরমায়েশী মু'জেযা না দেখানোর তাৎপর্য

এর উত্তরে বলা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এরূপ নিদর্শন দেখাতে সক্ষম। কিন্তু তোমাদের এসব ফরমায়েশ পূর্ণ করা আল্লাহর নীতি ও হেকমতের পরিপন্থী। পয়গম্বরদের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে পরিমাণ নিদর্শনের প্রয়োজন, তারও অধিক দেখানো হয়েছে ও হচ্ছে। অন্য শত শত মুজেযার কথা রেখে এক কুরআনই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার পক্ষে কত মহামর্যাদাশালী নিদর্শন! এ নিদর্শন দেখেও যখন তোমরা সঠিক পথে আসলে না, তখন বোঝা গেল যে, চিরাচরিত নিয়মানুসারে তোমাদেরকে নিজেদের অবলম্বিত গোমরাহীতে ছেড়ে রাখাই আল্লাহর ইচ্ছা। তোমরা যদি এত বড় নিদর্শন দেখে তাঁর অভিমুখী হতে, তবে তিনি নিজ নীতি অনুযায়ী তোমাদেরকে আরো সামনে বাড়াতেন এবং প্রকৃত সফলতা পর্যন্ত পৌঁছার পথ দেখাতেন। যখন তোমরা নিজেরাই তা চাইলে না, তখন তোমাদের বাধ্য না করাই আল্লাহর হেকমতের দাবি। এ অবস্থায় ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানোর কী প্রয়োজন রইল?

বরং তা না দেখানোতেই তোমাদের মঙ্গল। কারণ, আল্লাহর নীতি এই যে, ফরমায়েশী নিদর্শন তখনই দেখানো হয়, যখন কোন জাতির ধ্বংসসাধন উদ্দেশ্য হয়। হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি চান, তবে আমি ওদের ফরমায়েশী নিদর্শন দেখিয়ে দিই। কিন্তু তাতেও না মানলে এমন আযাব পাঠানো হবে, যা দুনিয়ায় কারো উপর আসেনি। আর যদি আপনি চান, তবে (ওদের জন্য) রহমত ও তওবার দরজা খোলা রাখি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। (মুসনাদে

২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি পায়[১]। জেনে রাখ! অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্তি পায়[২]।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

২৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য* ও উত্তম বাসস্থান[৩]।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ

৩০. এমনিভাবে আমি আপনাকে এমন এক জাতির মধ্যে পাঠিয়েছি যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আপনি তাদের তা পড়ে শোনান যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি[৪]।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ

আহমদ, হাদীস : ২১৬৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ১৭৪) পরবর্তীতে এ বিরুদ্ধাচারী ফরমায়েশকারীদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়।

১. এ হল আল্লাহ-অভিমুখী বান্দাগণের বর্ণনা, অর্থাৎ তারা ঈমানের দৌলত লাভ করে এবং যিক্রুল্লাহ (আল্লাহর স্মরণের) দ্বারা শান্তি ও স্বস্তি হাসিল করে। সর্বাপেক্ষা বড় যিকির তো কুরআন– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ। এই কুরআন পাঠ করে তাদের দিলে বিশ্বাসের ভিত পয়দা হয়, এবং দ্বিধা-সন্দেহ ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়ে স্থিরতা ও স্বস্তি লাভ হয়। একদিকে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার করে, আর অন্যদিকে তাঁর সীমাহীন রহমত ও ক্ষমার স্মরণ অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দেয়।

মোটকথা, তাদের অন্তর সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকিরের নূর তাদের অন্তর থেকে সব রকমের পার্থিব ভয়-ভীতি ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে দেয়।

২. অর্থাৎ সম্পদ, রাজত্ব, পদ-মর্যাদা, জমিদারী বা ফরমায়েশী নিদর্শন– কোন কিছুতেই মানুষের প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি আসতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর স্মরণের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক পয়দা হয়, তাতেই অন্তরের অস্থিরতা ও অশান্তি দূরীভূত হতে পারে।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'তূবা' (জান্নাতের বৃক্ষবিশেষ)।

৩. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) طوبى শব্দটির আভিধানিক অর্থ (خوش حالي) গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বেহেশতের সেই বৃক্ষও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যাকে সহীহ হাদীসে طوبى নামে অভিহিত করা হয়েছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৪১৪)

৪. অর্থাৎ আমি যেমন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের সফলতার পথ দেখাই, তদ্রূপ এ উম্মতের পথপ্রদর্শনের জন্য আমি আপনাকে আবির্ভূত করেছি, যাতে আমি আমার অপার

يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

আর ওরা 'রহমান' (পরম দয়াময় আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে[১]। আপনি বলুন, 'তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমি ফিরে আসি[২]।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ

৩১. যদি এমন কোন কুরআন হত যার দ্বারা পাহাড়-পর্বতকে গতিশীল করা যেত, অথবা যার দ্বারা পৃথিবীকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যেত, কিংবা যার দ্বারা মৃতরা কথা বলত- (তবে কী হত? তখনও ওরা ঈমান আনত না)। বস্তুত সকল বিষয় আল্লাহরই ক্ষমতাধীন[৩]।

রহমতে আপনার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা আপনি তাদের পড়ে শোনান। পয়গম্বর হিসাবে আপনার প্রেরিত হওয়া কোন নতুন বিষয় নয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। তখন অস্বীকারকারীদের যে পরিণাম হয়েছে, তা এদেরও স্মরণ রাখা উচিত।

১. অর্থাৎ রাহমান (দয়াময় আল্লাহ) স্বীয় কামেল রহমতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন- اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ এবং আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু ওরা কোমর বেঁধে না-শোকরী ও নে'য়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে নেমেছে, রাহমানের হক মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। এমন কি, 'রাহমান' নামটি পর্যন্ত ওরা শুনতে প্রস্তুত নয়। আর এ জন্যই (ঐতিহাসিক) হুদায়বিয়ার চুক্তিনামায় بسم الله الرحمن الرحيم লিখতেও ওরা আপত্তি করেছিল। ইরশাদ হয়েছে- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ (যখন ওদের বলা হয়, 'রাহমান'-কে সেজদা কর, তখন ওরা বলে, 'রাহমান' (আবার) কী? -ফুরকান, রুকূ ৫)

২. অর্থাৎ যে رحمن কে তোমরা অস্বীকার করছ, তিনিই আমার রব এবং তিনিই আল্লাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। এরশাদ হয়েছে : قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (বলুন, 'তোমরা আল্লাহ বলে ডাক, বা রাহমান বলে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকবে সকল সুন্দর নাম তো তাঁরই। -বনী ইসরাঈল, আয়াত ১১২) -আমার সূচনা ও সমাপ্তি সব কিছু তাঁরই হাতে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি। তোমাদের অস্বীকৃতি ও না মানার কারণে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আমার নেই, তাঁর সাহায্য-সহায়তা থেকে আমি নিরাশও নই।

৩. এখানে কুরআন দ্বারা যে কোন আসমানী কিতাব বোঝানো হয়েছে। যেমন: একটি সহীহ হাদীসে (বুখারী ৩৪১৭) 'যাবুর' কিতাবের উপর কুরআন শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে- যদি এমন কোন কিতাব অবতীর্ণ করা হত, যার দ্বারা তোমাদের এসব ফরমায়েশী নিদর্শনের দাবি পূর্ণ হত, তবে তা এই কুরআন ছাড়া আর কোন্ কিতাব হত?

ঈমানদাররা কি এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সুপথে নিয়ে আসতে পারেন*[১]? আর কাফেরদের কার্যকলাপের কারণে সর্বদা আপদ পতিত হতে থাকবে স্বয়ং ওদের উপর, অথবা তা আপতিত হতে থাকবে ওদের ঘর-বাড়ীর নিকটে, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা আসছে।

اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۭ

এটাই সেই কুরআন, যা পর্বতসম অটল মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে তাদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দিয়েছে, বনী আদমের অন্তরভূমি বিদীর্ণ করে তাতে আল্লাহর মারেফতের ঝরনাধারা বইয়ে দিয়েছে, মৃত জাতির অন্তরে শ্বাশত জীবনের রূহ ফুঁকে দিয়েছে। তো, এরূপ কুরআনের দ্বারাও যখন তোমরা রোগমুক্তি ও হেদায়েত লাভ করলে না, তখন তোমাদের দাবি অনুযায়ী যদি এ কুরআন বাহ্যিকভাবেও তোমাদেরকে উক্ত ফরমায়েশী বিষয়বস্তু দেখিয়ে দেয়, তবুও এ আশা করা যায় না যে, তোমরা ঈমান এনে ফেলবে এবং নতুন হুজ্জত ও বক্র বিতর্ক শুরু করবে না। তোমরা এমনি জেদী ও অবাধ্য যে, কোন নিদর্শনেই তোমরা ঈমান আনার নও।

আসল ব্যাপার এই যে, সকল কাজ (হেদায়েত করা ও গোমরাহ করা) আল্লাহর হাতে রয়েছে। যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা তাঁর নেই, কিয়ামত পর্যন্তও সে হেদায়েত লাভ করতে পারে না। কিন্তু তিনি তাকেই হেদায়েত করতে চান, যে নিজের তরফ থেকে সত্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ পোষণ করে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ঈমানদাররা কি (উক্ত কাফেরদের ঈমান আনয়ন থেকে) নিরাশ হয়নি (এবং জেনে নেয়নি) যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সুপথে আনতে পারেন?'

১. মুসলমানদের কেউ কেউ সম্ভবত এমন ভেবেছিলেন যে, একবারের মত ওদের ফরমায়েশ যদি পূর্ণ করে দেওয়া হয়, তবে হয়ত ওরা ঈমান গ্রহণ করবে। –তাদের এ ধারণার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো নিদর্শন ছাড়াই সকল মানুষকে সৎপথে আনতে পারেন। কিন্তু এ তাঁর নীতি ও হেকমতের খেলাফ। তিনি মানুষকে একটি সীমা পর্যন্ত ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে হেদায়েতের যথেষ্ট উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। এখন যার ইচ্ছা সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হেদায়েতের যথেষ্ট উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবাধ্য লোকেরা যদি না মানে এবং নিজেদের ঈমানকে অযথা ফরমায়েশ-নির্ভর করে, তবে সারা দুনিয়াকে মানতে বাধ্য করা আমার নীতি নয়। শেষ পর্যন্ত لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।) –এ ঘোষণাটিকে তো সত্যে পরিণত হতে হবে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না[১]।

[রুকূ - ৫]

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

৩২. নিশ্চয় আপনার পূর্বেও বহু রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। তখন আমি কাফেরদের ঢিল দিয়েছি, অতঃপর ওদের পাকড়াও করেছি। অতএব (দেখ), কেমন ছিল আমার শাস্তি[২]?

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ

৩৩. আচ্ছা, যিনি এমন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে তিনি তা পর্যবেক্ষণ করেন- (তিনি কি অন্যদের সমান হতে পারেন?) আর ওরা আল্লাহর জন্য বিবিধ শরীক স্থির করেছে[৩]।

---

১. অর্থাৎ মক্কার এই কুরায়শরা ফরমায়েশী নিদর্শন দেখেও ঈমান আনার নয়। ওরা তখনই আনুগত্য গ্রহণ করতে পারে, যখন একাধারে কোন না কোন বিপদ ও মুসিবত স্বয়ং ওদের উপর অথবা ওদের প্রতিবেশীদের উপর পতিত হতে থাকবে, যা দেখে ওদের সমুচিত শিক্ষা হবে- যথা, জেহাদে মুসলমানদের হাতে কতক নিহত হবে, কতক বন্দী হবে, কতক অন্য ধরণের বিপদের শিকার হবে। বিপদাপদের এই ধারাই চলতে থাকবে- যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ মক্কা বিজয় হয় এবং 'জাযিরাতুল আরব' শিরকের দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা অটল, তা পূর্ণ হবেই হবে।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ বাক্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে- অর্থাৎ 'আপনি ওদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবতরণ করবেন,' যেমনটি হুদায়বিয়ার অভিযানে হয়েছিল। আয়াতের এই অর্থ ধরলে قارعة দ্বারা সেসব অভিযান উদ্দেশ্য হবে, যেগুলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে অংশ নিতেন না।

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত শুধু মক্কার কাফেরদের জন্য নয় বরং সমগ্র কাফেরজগতের জন্য প্রযোজ্য। والله أعلم

২. অর্থাৎ শাস্তি আসতে দেরি হলে মনে করো না যে, ওরা নিষ্কৃতি পেয়ে গেছ। পূর্ববর্তী পাপীদেরও প্রথমে অবকশ দেওয়া হয়েছিল; পরে যখন আল্লাহ পাকড়াও করলেন তখন পরিণামটা কেমন হল দেখে নাও। আজ পর্যন্ত ওদের ধ্বংসের কাহিনী মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ যে মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি আমলের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন, এক মুহূর্তের জন্যও কারো থেকে গাফেল নন, একটু দুষ্কৃতি করলে সঙ্গে সঙ্গেই যিনি সতর্ক করতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন- তাঁর হাত থেকে ছুটে পাপীরা কোথাও পালাতে

قُلْ سَمُّوْهُمْ ۭ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۭ

আপনি বলুন, 'তোমরা ওদের নাম বল'[১]। তোমরা কি আল্লাহকে এমন বস্তুর কথা বলছ, যা তিনি পৃথিবীতে (আছে বলে) জানেন না[২]; না কি তোমরা ভাসা-ভাসা কথা বলছ[৩]? না,

---

পারে কি? অথবা পাথরের মূর্তিগুলি তাঁর সমকক্ষ হতে পারে কি, যেগুলো দেখেও না, শোনেও না এবং নিজেদের বা অন্যদের লাভ ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও রাখে না? আশ্চর্যের বিষয়, এমন মহামহিম আল্লাহর বর্তমানে মানুষ এরূপ অক্ষম ও তুচ্ছ সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতায় শরীক করে! এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী যে, এমন সৃষ্টিকে সর্বজ্ঞ ও সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহর শরীক করা হচ্ছে, যারা নিজেদের অস্তিত্বেরও খবর রাখে না? উত্তমরূপে বুঝে নাও, যা কিছু তোমরা গোপনে বা প্রকাশ্যে করছ, তা সবই আল্লাহর চোখের সামনে রয়েছে। মানুষের এসব শিরকপূর্ণ ধৃষ্টতা সম্বন্ধে তিনি বেখবর নন, শীঘ্র বা দেরিতে শাস্তি অবশ্যই হবে।

১. অর্থাৎ একটু অগ্রসর হয়ে এই শরীকদের নাম ও পরিচয় দাও দেখি। আল্লাহ পাকের উল্লিখিত গুণাবলির কথা শুনে কোন লজ্জাশীল ব্যক্তি ঐ পাথরগুলোর নামও নিতে পারে কি? আর যদি বা লজ্জার মাথা খেয়ে 'লাত' ও 'উয্যা'র নাম নিতে শুরু করে, তবে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি সেদিকে মনোযোগ দিতে পারে?

২. অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার বুকে তাঁর প্রভুত্বের কোন অংশীদার আছে বলে আল্লাহর জানা নেই। (কারণ, আসলেই নেই, থাকলে জানতেন)। তবে কি তোমরা তাঁকে এমন জিনিসের কথা বলবে, যা তিনি জানেন না?

বি. দ্র. শুধু 'পৃথিবী'র কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজকদের মতে ওদের শরীকদের (অর্থাৎ মূর্তিদের) অবস্থান এ পৃথিবীতেই ছিল।

(প্রখ্যাত মুফাসসির) আবু হায়্যান এর মতে لَا يَعْلَمُ এর কর্তবাচক সর্বনাম ما এর দিকে ফিরেছে। সে মত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– তোমরা কি আল্লাহকে এ কথা জানাচ্ছ যে, আপনার খোদায়ীর অংশীদার হচ্ছে সেসব মূর্তি, যারা সামান্যতম জ্ঞানও রাখে না?

৩. প্রথমে বলা হয়েছে যে, সেই শরীকদের একটু নাম বল। অতঃপর বাতলানো হয়েছে যে, বাস্তবে যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই, তার নাম বলা যায় কেমন করে? এখন বলা হচ্ছে যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা শুধু শব্দ ও নিছক ধ্বনি ছাড়া কিছুই নয়। এ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সারশূন্য কথা এবং নিছক কল্পনা, অনুমান ও বাতিল চিন্তাভাবনাপ্রসূত গুটিকয়েক অর্থহীন শব্দ।

بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ দ্বারা সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওরা যেসব শিরেকী কথাবার্তা বলছে, যদি অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অন্তরের দিকে লক্ষ করে, তবে ওদের অন্তরও এসব নিরর্থক বিষয় প্রত্যাখ্যান করবে। এজন্য বলা উচিত, এসব হচ্ছে স্থূল কথা, যাকে মানবাত্মা ও মানবীয় স্বভাব উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে।

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

বরং কাফেরদের নিকট ওদের কূট-কৌশল সুশোভিত করে তোলা হয়েছে এবং (সরল) পথ থেকে ওদের বিরত রাখা হয়েছে[১]। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই[২]।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

৩৪. ওদের জন্য দুনিয়ার জীবনে রয়েছে শাস্তি[৩] এবং আখেরাতের শাস্তি তো অনেক বেশি কঠিন। আর আল্লাহ থেকে ওদের রক্ষাকারী কেউ নেই[৪]।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝

৩৫. জান্নাত– যার প্রতিশ্রুতি পরহেযগারদের দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার তলদেশে নহরমালা প্রবাহিত, তার ফলমূল চিরস্থায়ী[৫] এবং তার ছায়াও[৬]। এ তাদের পরিণাম, যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে[৭]; আর কাফেরদের পরিণাম আগুন[৮]।

---

১. অর্থাৎ শিরকের স্বপক্ষে ওদের এহেন অবস্থান এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে এরূপ উদ্যম ও সংগ্রাম আর কিছু নয়, নফসের ধোঁকা ও শয়তানের প্রবঞ্চনা মাত্র। শয়তানই ওদেরকে সত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েতের তাওফীক না দেন, তাকে কে পথে আনতে পারে? আর তিনি তাকেই তাওফীক দেন, যে স্বেচ্ছায় হেদায়েতের দরজা নিজের জন্য বন্ধ না করে।

৩. মুজাহিদদের হাতে কিংবা সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে ওদের শাস্তি হবে।

৪. অর্থাৎ শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না। আর আখেরাতের শাস্তি যে কত কঠোর, তা আর বলার কী!

৫. বিভিন্ন প্রকার ফলের কোনটিই কখনো শেষ হবে না এবং যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যাবে– لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ (শেষও হবে না, নিষিদ্ধও হবে না)।

৬. অর্থাৎ ছায়াও সর্বদা আরামপ্রদ ও মনোরম থাকবে, কখনো রোদেরও তাপ লাগবে না, ঠান্ডারও কষ্ট হবে না- لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا (দাহ্‌র, আয়াত ১৩)।

৭. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে শিরক ও কুফর বর্জন করেছে।

৮. এখানে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের পরিণামের তুলনামূলক বিবরণ দান করা হল। কারণ, وبضدّها تتبيّن الأشياء (সব জিনিসই তার বিপরীত জিনিস দ্বারা চেনা যায়)।

৩৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়[১]। আর কতক দল এমন, যারা এর কিছু বিষয় অস্বীকার করে[২]। আপনি বলুন, 'আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে শির্ক না করি। তাঁরই দিকে আমি আহবান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন[৩]।

وَالَّذِيۡنَ اٰتَيۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ يَفۡرَحُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَمِنَ الۡاَحۡزَابِ مَنۡ يُّنۡكِرُ بَعۡضَهٗ ؕ قُلۡ اِنَّمَاۤ اُمِرۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ اللّٰهَ وَلَاۤ اُشۡرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيۡهِ اَدۡعُوۡا وَاِلَيۡهِ مَاٰبِ ۝

১. বর্তমানে যাদের কুরআন দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ মুসলমানগণ) এবং পূর্বে যাদের 'তাওরাত' ও 'ইনজীল' প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা)– তারা সে বিষয় শুনে খুশী হয় যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে। মুসলমানদের খুশী হওয়াটা তো সুস্পষ্ট। কারণ, তারা এ কিতাবকেই উভয় জগতের সফলতার চাবিকাঠি বলে জানে। আর ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ইলম ও ন্যায়ের অধিকারী এবং মূলত সত্যের অনুসারী ছিল, তাদের জন্যও এটি একটি খুশীর বিষয় ছিল। কেননা, তারা দেখছিল যে, কুরআন কারীম খুবই উদারতার সাথে তাদের আসল কিতাবের সমর্থনে এবং তাদের নবীর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মুক্তকণ্ঠ। বরং তাদের সত্যপরায়ণ আহবার ও রুহবান তথা ধর্মযাজক ও আলেমদের অস্তিত্বের কথা প্রশংসাসুলভ ভঙ্গিতে বর্ণনা করছে। ইরশাদ হয়েছে– ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيۡسِيۡنَ وَرُهۡبَانًا (এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে বহু পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী রয়েছে)।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপ্রিয় ইহুদী ও খ্রিস্টানরা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়।

২. অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টান বা আরব জাহেলদের মধ্যে এমন দলও আছে, যারা কুরআনের প্রতি এজন্য নাখোশ যে, এর কোন কোন বিষয়ের সাথে ওদের দ্বিমত রয়েছে। ইহুদী-খ্রিস্টান কর্তৃক নিজেদের আসমানী কিতাবের বিকৃতি ও পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অথবা আরব-জাহেলদের ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে কুরআন যা কিছু বলেছে, 'কোন কোন বিষয়' দ্বারা তাই উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ কেউ খুশী হোক বা অখুশী, আমি তো সেই একক ও লাশরীক আল্লাহরই বন্দেগী করি, যাঁকে সকল নবী ও মিল্লাত সর্বসম্মতিক্রমে মেনে এসেছে। আমি তাঁরই হুকুম-আহকাম ও মর্যির বিষয়গুলির প্রতি সারা দুনিয়াকে দাওয়াত দিচ্ছি। আর আমি উত্তমরূপে জানি যে, আমার পরিণাম তাঁরই হাতে। আমি তাঁরই পানে রুজু করছি, তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। তিনিই আমাক শেষ পর্যন্ত বিজয়ী ও কৃতকার্য এবং আমার বিরোধীদের পরাজিত ও অপমানিত করবেন। অতএব কারো বিরোধিতা ও অস্বীকৃতিতে আমার মোটেই পরোয়া নেই।

وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ بَعۡدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. এভাবেই আমি এই কুরআনকে এক ফয়সালাকারীরূপে, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি[১]। আর আপনি যদি আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরও ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তবে আপনার কোন সাহায্যকারী ও আল্লাহর কবল থেকে কোন রক্ষাকারী নেই[২]।

[রুকূ' - ৬]

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ اَزۡوَاجًا وَّذُرِّیَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنۡ یَّاۡتِیَ بِاٰیَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾

৩৮. নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি। আর কোনো রাসূলের জন্য এ সম্ভব নয় যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করবেন। প্রত্যেক কালের জন্য রয়েছে এক লিখিত ফয়সালা[৩]।

---

১. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন অন্যান্য কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তেমনি বর্তমানে এ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা মহামর্যাদাশালী জ্ঞান-গরিমা ও হুকুম-আহকামসম্বলিত এবং হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী কিতাব। আর প্রত্যেক পয়গম্বরকে যেমন তাঁর জাতীয় ভাষায় কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবী কুরআন প্রদান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে কুরআন যেমন অলৌকিক ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব, তদ্রূপ তা এমন ভাষাতেই নাযিল হওয়া সমীচীন ছিল, যা হবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ, বলিষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ, সমৃদ্ধ, সুবিন্যস্ত, সুস্পষ্ট, সারগর্ভ ও ঐশ্বর্যময়। আর এ সমস্ত কারণে আরবী ভাষা أم الألسنة (তথা ভাষাজননী) ও مَلِكَةُ اللغات (ভাষার রাণী বা সর্বোত্তম ভাষা) হওয়ার দাবি রাখে।

২. অর্থাৎ আপনি কারো অস্বীকৃতি ও অসন্তুষ্টির বিন্দুমাত্র পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাআলা যে মহাজ্ঞান আপনাকে দান করেছেন, তারই অনুসরণ করতে থাকুন। ধরে নেওয়া যাক, আপনি যদি ওদের কামনা-বাসনা বা ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঝুঁকে গেলেন, তবে তাঁর কবল থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে?

এ সম্বোধন মূলত প্রত্যেক সত্যান্বেষীর প্রতি। আর যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তবে তাঁকে সামনে রেখে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য, যেমন পূর্বেও অনেক স্থানে এর উদাহরণ গত হয়েছে।

৩. আরবের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নতুন কিতাব ও নতুন আহকাম দিয়ে পাঠানো কি কোন অদ্ভুত ব্যাপার যে, এত তর্ক-বিতর্ক করা হচ্ছে? তাঁর পূর্বেও আমি যেসব পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা আকাশের ফেরেশতা ছিলেন না, এই দুনিয়ারই অধিবাসী

৩৯. আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করেন এবং (যা ইচ্ছা) বহাল রাখেন। আর তাঁরই নিকট রয়েছে মূল কিতাব (তথা লওহে মাহফূজ)[১]।

يَمۡحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُ ۚۖ وَعِنۡدَهٗۤ اُمُّ الۡكِتٰبِ ﴿۳۹﴾

ছিলেন। তাঁরা পানাহার করতেন, নিজেদের কাজকাম নিজ হাতেই সম্পাদন করতেন এবং পুত্র-পরিজন রাখতেন। তাঁদের মধ্যে কারো এই ক্ষমতা ছিল না যে, লোকেরা যে নিদর্শনই চাইবে তাই দেখিয়ে দেবেন। বরং বর্তমান পয়গম্বরের ন্যায় তাঁরা প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতেন। তাঁরা সেই নিদর্শনই দেখাতেন এবং সেই বিধানই শোনাতেন, যার অনুমতি আল্লাহর নিকট থেকে হত। (لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ)- আর আল্লাহর অনুমতির অবস্থা এই যে, তাঁর নিকট প্রত্যেক কাল ও প্রত্যেক যুগের উপযোগী পৃথক বিধান লিখিত রয়েছে, এবং একটি ওয়াদা সাব্যস্ত করা আছে, যা কোন নবীও পরিবর্তন করতে পারেন না, কোন ফেরেশতাও না।

তো, প্রত্যেক নবী যখন আপন যুগের উপযুক্ত আহকাম নিয়ে আগমন করেছেন এবং নিজ সত্যতার নিদর্শন দেখানোর ক্ষেত্রে জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেননি এবং নিজেকে মানবীয় প্রয়োজন ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে পবিত্র ও তার উর্ধ্বে বলে প্রকাশ করেননি, তখন এসব বিষয় মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যাওয়ার কারণে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হবে কেন?

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত অনুযায়ী যে হুকুম ইচ্ছা মনসূখ (বা রহিত) করেন, যে হুকুম ইচ্ছা বলবৎ রাখেন। যে জাতিকে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করেন, যাকে ইচ্ছা তার স্থলাভিষিক্ত করেন। আসবাব-উপকরণের মধ্যে যার কার্যকারিতা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন, আবার যার কার্যকারিতা ইচ্ছা অপরিবর্তিত রাখেন। শর্তাবলি পাওয়া গেলে যে ওয়াদার ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তা পূরণ করেন, আর শর্তাবলি না পাওয়া গেলে সে ওয়াদা মওকূফ করে দেন। মোটকথা, সব রকমের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা, বিলোপ ও বহাল রাখা সবই তাঁর হাতে। কাযা ও কদর-ভাগ্যলিপির সকল ফাইল তাঁরই মুঠিতে।

আর সব বিবরণ ও ফাইলের মূল তথা 'উম্মুল কিতাব' তাঁরই নিকট রয়েছে।

আর তিনিই সেই 'সর্বব্যাপী অনাদি ইলম'-এর আধার, যা সব রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ও পবিত্র এবং যা লওহে মাহফূজের উৎস।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিস 'আসবাব' তথা উপায়-উপকরণনির্ভর। কতক 'আসবাব' প্রকাশ্য, আর কতক অপ্রকাশ্য। 'আসবাবে'র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা প্রাকৃতিক পরিমাণ আছে- যখন আল্লাহর ইচ্ছা, এই ক্রিয়াকে পরিমাণ থেকে কম বা বেশি করে দেন, যখন ইচ্ছা তা অপরিবর্তিত রাখেন। মানুষ কখনো একটি কঙ্করের আঘাতে মারা যায়, আবার কখনো গুলিতেও মরে না, বেঁচে যায়। আর প্রত্যেক জিনিসেরই আরেকটি পরিমাণ আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে, যা কখনো পরিবর্তন হয় না। পরিমাণ বা মাত্রাকে 'তাকদীর' বলা হয়। এ হল দুটি তাকদীর- একটিতে পরিবর্তন হয়, আর একটিতে হয় না।

৪০. আমি ওদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছি, তার কিছু আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা (এর পূর্বেই) আপনার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই- (সর্বাবস্থায়) আপনার দায়িত্ব তো কেবল পৌছিয়ে দেওয়া, আর হিসাব নেওয়া আমারই দায়িত্ব[১]।

وَاِنۡ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِىۡ نَعِدُهُمۡ اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ وَعَلَيۡنَا الۡحِسَابُ۝

৪১. ওরা কি দেখে না, আমি যমীনকে তার সকল দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি[২]? আর আল্লাহ হুকুম করেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে

اَوَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا نَاۡتِى الۡاَرۡضَ نَـنۡقُصُهَا مِنۡ اَطۡرَافِهَا‌ ؕ وَاللّٰهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ

যে তাকদীরে পরিবর্তন হয়, তাকে معلق (পরিবর্তনযোগ্য) তাকদীর বলে এবং যাতে পরিবর্তন হয় না, তাকে مبرم (অখণ্ডনীয়) তকদীর বলে।

যেসব হাদীস থেকে কোন কোন বিজ্ঞজনের এই সন্দেহ হয়েছে যে, مبرم (অখণ্ডনীয় তাকদীরও) পরিবর্তিত হয়, তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে বৃহৎ তাফসীরে তা লেখা হবে।

(কিন্তু সেই তাফসীর লেখার সুযোগ মুফাসসিরের আর হয়নি। এ শুভ নিয়তের ফযীলত আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করুন। আমীন- মুতারজিম।)

১. অর্থাৎ (আযাব ইত্যাদির) যে সব ওয়াদা ওদের সাথে করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে কতক আপনার সামনে পূর্ণ করার অথবা আপনার ওয়াফাতের পর প্রকাশ করার এখতিয়ার-ক্ষমতা -উভয় আমার আছে। সুতরাং সেগুলি প্রকাশ করা হয় কি না-এই চিন্তা-ভাবনায় আপনার পড়া উচিত নয় এবং বিলম্ব ও অবকাশ দেখে ওদেরও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর জ্ঞানে প্রত্যেক জিনিসের একটি উপযুক্ত সময় আছে। সেই সময় এলে তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে। আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, অবিশ্বাসীদের হিসাব আমি নিজে অবশ্যই নিব।

২. অর্থাৎ ইসলামের কর্মপরিধি মক্কার আশেপাশে প্রসারিত হচ্ছে এবং কুফরের প্রভাব সংকুচিত হচ্ছে। বড় বড় সম্প্রদায় ও ব্যক্তির অন্তরে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে- আওস ও খাযরাজ গোত্র দুটির অন্তরের দ্বার সত্য ও সততার সামনে খুলে যাচ্ছে। এভাবে আমি ক্রমান্বয়ে কুফরের রাজত্ব সংকুচিত করে ফেলছি। -এ সকল জ্বলন্ত নিদর্শন থেকে ওদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা কী, তা ওরা বুঝতে পারছে না? একজন বুদ্ধিমান বিলক্ষণ বুঝতে পারে যে, ইসলাম বর্তমানে যে গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা কোন শক্তির সামনে প্রতিহত হওয়ার নয়। অতএব যা আসার তা এসে গেছে মনে করাটাই পরিনামদর্শিতার লক্ষণ।

لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

নিক্ষেপকারী কেউ নেই[১] এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[২]।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

৪২. নিশ্চয় ওদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহরই কব্জায়[৩]। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে তা তিনি জানেন[৪] এবং কাফেররা শীঘ্রই জানতে পারবে, আখেরাতের* (শুভ) পরিণাম কাদের জন্য[৫]।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

৪৩. আর কাফেররা বলে, 'তুমি প্রেরিত (তথা রাসূল) নও।' আপনি বলে দিন, 'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে

---

১. অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগত হুকুম ও ফয়সালা অটল– সময় এসে গেলে কার এই ক্ষমতা আছে যে, এক মুহূর্তের জন্য তা পিছিয়ে দেবে?

২. অর্থাৎ হিসাব-কিতাবের সময় এসে গেলে আর দেরি হবে না। অথবা যা অবশ্যই ঘটবে তাকে দ্রুতই মনে করা উচিত।

৩. 'আল্লাহর কব্জায় সকল চক্রান্ত' অর্থাৎ আল্লাহ না চাইলে এবং চলতে না দিলে সকল চক্রান্ত অচল ও অকার্যকর হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, আল্লাহ ওদের চক্রান্ত নস্যাত করে দেন।

আসলে مكر গোপন তদবীর ও কৌশলকে বলা হয়। যদি তা কুট-কৌশলকে নস্যাৎ করার জন্য হয়, তবে ভাল (অতএব সকল مكر মন্দ নয়)। আয়াতের মর্ম এই যে, ওরা গোপনে গোপনে নাপাক তদবীর করেছে, কিন্তু আল্লাহর তদবীর ও কৌশল সবার উপর প্রবল ও বিজয়ী হয়েছে। তিনি ওদের তদবীর ওদেরই দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন- وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ (আর কূট-ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই উলটে পড়বে। -ফাতের, আয়াত ৪৩)

৪. অর্থাৎ যার থেকে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং গোপন-প্রকাশ্য কোন কাজই গুপ্ত নয়, তাঁর সামনে কারো চক্রান্ত কী করে চলতে পারে? তিনি শীঘ্রই এই চক্রান্তকারীদের আযাবের মজা আস্বাদন করাবেন।

* **দ্বিতীয় তরজমা– 'দুনিয়ার...'। অথবা : 'দুনিয়া-আখেরাতের'।**

৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তীরা যেমন নিজেদের চক্রান্তের পরিণাম দেখে নিয়েছে, বর্তমান কাফেরদেরও নিজেদের পরিণাম ভোগ করতে হবে।

وَمَنۡ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

আল্লাহই যথেষ্ট[১] এবং সেই ব্যক্তি, যাঁর নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে[২]।"

---

১. অর্থাৎ তোমরা অস্বীকার করায় কিছু আসে যায় না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা আমার সত্যতার বড় সাক্ষী এবং তিনি এর বড় বড় নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তাঁর কালাম কুরআন শরীফ একদিকে নিজের ঐশ্বরিক কালাম হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে, অপরদিকে তা আমার নবুওয়াতেরও সাক্ষী। তাছাড়া চোখ মেলে দেখলে বুঝতে পারবে যে, দারুণ প্রতিকূল অবস্থায় সত্যের অনবরত বিস্তার লাভ করা এবং শত্রুদের অন্তরে পর্যন্ত স্থান করে নেওয়া, পক্ষান্তরে মিথ্যার পরাভূত ও ধিকৃত হয়ে সংকুচিত হতে থাকা– এ সবও আল্লাহর তরফ থেকে আমার সত্যতার জ্বলন্ত সাক্ষী।

২. অর্থাৎ যারা কুরআনের ইলম রাখে এবং তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত, তারাও অন্তর থেকে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি কোন মিথ্যা রচনা করিনি (বরং আল্লাহর কালাম নিয়ে আমি আগমন করেছি)। তদ্রূপ যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ এবং সেগুলোর ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কে অবহিত, তাদের অন্তরও সাক্ষ্য দেয় যে, শত শত বছর পূর্বে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ. প্রমুখ নবীগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সে মোতাবেকই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন।

আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন– যে বিষয়ের সাক্ষ্য আপনার কিতাবধারীগণ ও আপনি দিয়েছেন, আমি নরাধম গোনাহগারও খাঁটি দিলে তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (ইয়া আল্লাহ! আমি নরাধম অনুবাদকও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।)

সূরা ইবরাহীম

سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১৪ । ৫২ আয়াত । ৭ রুকূ । মক্কী

آياتها ۵۲، ركوعاتها ۷

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ লা-ম রা। (এ) এমন এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন– (অর্থাৎ) সেই সত্তার পথে, যিনি পরাক্রান্ত, সকল প্রশংসার উপযুক্ত[১]–

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۱﴾

২. আল্লাহর (পথে), যাঁর মালিকানাধীন আকাশ-মণ্ডলীতে যা কিছু আছে তা এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও[২]। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির দুর্ভোগ[৩]–

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ﴿۲﴾

---

১. অর্থাৎ এ কিতাবের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকে আন্দাজ করা উচিত যে, আমি (আল্লাহ) এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং আপনার ন্যায় উচ্চমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব এর বাহক। আর এর উদ্দেশ্যও এত মহান যে, এর চেয়ে মহান কোন উদ্দেশ্য হতেই পারে না। তা এই যে, আল্লাহর হুকুম ও তাওফীকে এর দ্বারা আপনি আরব-অনারব, কালো-সাদা, মালিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষকে মূর্খতা ও সন্দেহের ঘন অন্ধকার থেকে বের করে আনবেন এবং আল্লাহর মা'রেফত, ঈমান ও বিশ্বাসের আলোতে এনে দাঁড় করাবেন।

২. অর্থাৎ মানুষ যেন সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সেই পথে এসে যায়, যা মহাশক্তিশালী, একচ্ছত্র সম্রাট ও সমগ্র বিশ্বের মালিক আল্লাহ তাআলার পথ এবং যা তাঁর সন্তুষ্টির স্থল (বেহেশত) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৩. অর্থাৎ যারা এরূপ কিতাবের অবতরণের পরও কুফর, শিরক, মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের হল না, ওরা কঠিন আযাব ও ধ্বংসকর বিপদের সম্মুখীন হবে– আখেরাতে বা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে।

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأٓخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ۝

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয় ও তাতে বক্রতা খোঁজে। এমন লোকেরাই চরম গোমরাহীতে লিপ্ত[১]।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন[২]।

---

১. এস্থলে কাফেরদের অবস্থা বলা হয়েছে যে, দুনিয়াই ওদের লক্ষ্যবস্তু। পরকালের মোকাবেলায় একেই ওরা পছন্দ করে ও অগ্রাধিকার দেয়। দিনরাত এরই মহব্বতে নিমজ্জিত থাকে এবং অন্যদেরও দুনিয়ার মহব্বতে ফাঁসিয়ে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে চায়। এ জন্যই ওরা আল্লাহর দীনের মধ্যে ত্রুটি বের করার এবং সরল পথকে বক্র প্রমাণ করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই লোকগুলো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বহু দূরে সরে পড়েছে, যেখান থেকে ওদের প্রত্যাবর্তনের আশা নেই। আল্লাহর কঠোর আযাব আসার পরই ওদের চোখ খুলবে।

২. অর্থাৎ আপনাকে আমি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য এ মহান কিতাব দান করেছি। পূর্বেও আমি প্রত্যেক যুগে হেদায়াতের উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করেছি। যে জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব, যেহেতু স্বাভাবিক ক্রমানুযায়ী সেই জাতিই তাঁর প্রথম শ্রোতা হয়, তাই নবীর জাতীর ভাষায় ওহী পাঠানো হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে বোঝা ও বোঝানো সহজ হয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও সমগ্র মানব ও জিন জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু যে জাতির মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন, তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। আর স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম অনুযায়ী তাঁর আনীত হেদায়াতের প্রচার-প্রসারের এ পদ্ধতি সাব্যস্তকৃত ছিল যে, তাঁর প্রথম শ্রোতাবৃন্দ ও অগ্রবর্তী সংস্রবপ্রাপ্তগণ সর্বপ্রথম কুরআনের শিক্ষা ও তাতে বর্ণিত বিষয়াবলি বুঝবে ও সংরক্ষণ করবে। অতঃপর তাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার জাতিসমূহ এবং পরবর্তী বংশধররা ধাপে ধাপে কুরআনের রঙে রঙিন হতে থাকবে।

বস্তুত তা-ই হয়েছিল। আরবগণ আপন নবীর সুহবতে থেকে নিজেদের অতি প্রিয় ভাষায় কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য দক্ষতা লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে ছড়িয়ে পড়েন এবং রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। সে সময় অনারবদের মধ্যে আল্লাহর কুদরতে আল্লাহর কালামের জ্ঞান এবং আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করার এমনই আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হল যে, স্বল্পকালের মধ্যেই কুরআনী

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৫. নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদিসহ এ বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আস এবং তাদের স্মরণ করাও আল্লাহর দিনসমূহের কথা। নিশ্চয় তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[২]।

জ্ঞানমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁরা নিজেদের সমসাময়িক আরবদেরও ছাড়িয়ে গেলেন বরং সার্বিকভাবে দীনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও আরবী সাহিত্যে চরম উৎকর্ষতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন। এভাবে আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁর প্রমাণ পূর্ণ হতে থাকে এবং যুগে যুগে কুরআনী হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা হতে থাকে। فالحمد لله على ذلك

যা হোক, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরব জাতির মধ্যে আবির্ভূত করার যদি কারণ থেকে থাকে, আর অবশ্যই তা আছে, তবে সেসব কারণের মাধ্যমেই এ প্রশ্নেরও উত্তর এসে যায় যে– 'কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ আরবদের রেয়াত করলেন কেন?'

১. অর্থাৎ বাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পথপ্রদর্শনের উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণ করে দেওয়ার পর যে ব্যক্তি তা দ্বারা উপকৃত হতে চেয়েছে, তাকে আল্লাহ তাআলা সত্যের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাকে গোমরাহীর মধ্যে ফেলে রেখেছেন। তিনি শক্তিধর ও পরাক্রমশালী। ইচ্ছা করলে সকলকে জোরপূর্বক সৎপথের অনুসারী করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর হেকমতের দাবি হল– মানুষকে একটা সীমা পর্যন্ত ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা, আর এভাবে দুনিয়ায় আল্লাহর রহমত ও গযব (অর্থাৎ দয়া ও ক্রোধ) উভয়ের প্রকাশস্থলকে অবশিষ্ট রাখা।

২. 'নিদর্শনাদিসহ' – অর্থাৎ মু'জেযাসমূহ প্রদান করে, যেগুলি آيات تسعة "নয় নিদর্শন" নামে খ্যাত। অথবা بِاٰيٰتِنَا দ্বারা তাওরাতের আয়াতসমূহ উদ্দেশ্য। আর 'আল্লাহর দিনগুলি তাদের স্মরণ করান'– অর্থাৎ সেই দিনগুলির ঘটনা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তা থেকে তাদের মুক্তি দিলেন এবং নিজ মেহেরবানী দান করলেন।

এই স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, উভয় রকমের অবস্থার কথা শুনলে ধৈর্যধারী ও শোকরকারী বান্দারা এই শিক্ষা লাভ করে যে, মুসিবতের সময় ঘাবড়ানো এবং সুখের সময় অহংকার করা উচিত নয়। যারা পূর্বে সফল হয়েছে, তারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর নে'য়ামতের উপর শোকর করেই সফল হয়েছে–

৬. (স্মরণ কর), যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি ফেরাওনের লোকদের থেকে তোমাদের মুক্ত করলেন– ওরা তোমাদের নিকৃষ্ট আযাব দিত[১], তোমাদের পুত্রদের যবেহ করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর তাতে বিরাট সাহায্য ছিল* তোমাদের রবের পক্ষ থেকে[২]।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

[রুকূ - ২]

৭. 'আরো (স্মরণ কর), যখন তোমাদের রব জানিয়ে দিলেন, 'যদি তোমরা শোকর কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরো বেশি

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ

(এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে আপনার রবের শুভ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল, তাদের ধৈর্যধারণের ফলে। আর ফেরাওন ও তার সম্প্রদায় যা কিছু নির্মাণ করেছিল এবং যে সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করেছিল, আমি তা সব ধ্বংস করে দিলাম। –আ'রাফ, আয়াত ১৩৭)

১. যেমন: তোমাদের গোলাম বানিয়ে রাখত এবং বিনা পারিশ্রমিকে কঠোর পরিশ্রম করাত।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর তাতে (অর্থাৎ ওদের জুলুম-নির্যাতনে) বিরাট পরীক্ষা ছিল ....

২. কেননা, তোমাদের তিনি গোলামীর অপমান থেকে নিষ্কৃতি দিলেন এবং স্বাধীনতার সৌভাগ্য দান করলেন।

بلاء এর আসল অর্থ পরীক্ষা : সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায় বান্দার ধৈর্য ও শোকরের পরীক্ষা হয়। وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (আর আমি ভাল ও মন্দ অবস্থা দ্বারা তোমাদের যাচাই ও পরীক্ষা করি। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৫)। আরো ইরশাদ হয়েছে– وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ (আর আমি ওদের পরীক্ষা করলাম ভাল ও মন্দ অবস্থার মাধ্যমে। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৬৮)। –যেহেতু ফেরাওনের লোকদের হাত থেকে মুক্তিদান বিরাট নে'য়ামত ছিল, সেহেতু এস্থলে নে'য়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা পরীক্ষা হয়েছিল। একেই বিজ্ঞ মুতারজিম (র) সারার্থ হিসাবে مدد (সাহায্য) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

এ রকম আয়াত সূরা বাকারা (আয়াত ৪৯) ও আরাফে (আয়াত ১৪১) গত হয়েছে। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

দেব[১]; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি কঠোর[২]।'

وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

৮. এবং মূসা বললেন, 'যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই কুফর কর, তবে আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার উপযুক্ত[৩]।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

৯. 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের– (অর্থাৎ) নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের সংবাদ পৌঁছেনি? এবং (সংবাদ পৌঁছেনি) ওদের পরবর্তীদের?

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ

---

১. এটি মূসা (আ)-এর উক্তি। অর্থাৎ সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছিলেন– যদি মুখে ও অন্তরে আমার নে'য়ামতরাশির কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে অধিকতর নে'য়ামত পাবে– দৈহিক, আত্মিক, পার্থিব, পারলৌকিক, ইত্যাদি সব রকমের।

২. অর্থাৎ বর্তমান নে'য়ামতসমূহ কেড়ে নেওয়া হবে, আর না-শোকরির কারণে ভিন্ন শাস্তি তো আছেই। হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ভিক্ষুক এলে তিনি তাকে একটি খেজুর দান করলেন। সে তা নিল না, বা ফেলে দিল। অতঃপর আর একজন ভিক্ষুক এল। তাকেও তিনি একটি খেজুর দিলেন। সে বলল, سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ রাসুলুল্লাহর তাবাররুক! তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাসীকে হুকুম দিলেন, উম্মে সালামার নিকট যে চল্লিশটি দেরহাম রেখেছি, সেগুলি এনে এ ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২৫৭৪)

৩. অর্থাৎ নে'য়ামতের না-শোকরির ক্ষতি তোমাদেরই হবে, আল্লাহর কিছু আসে যায় না। তোমাদের কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন আল্লাহর মোটেই নেই। কেউ তাঁর শোকর করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় তাঁর প্রশংসিত হওয়ার মধ্যে কোন কমতি হয় না। মুসলিম শরীফের একটা হাদীসে কুদসীতে (২৫৭৭) আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্বাপর মানব-জিন সকলেই যদি সর্বোচ্চ স্তরের একজন মুত্তাকী পরহেজগারের মত হয়ে যায় (অর্থাৎ সবাই সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকী হয়ে যায়), তাতে আমার রাজত্বে কিছু বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, পূর্বাপর সকল জিন ও মানুষ যদি (অসম্ভব হলেও ধরা যাক) একজন চরম পাপাচারী মানুষের মত হয়ে যায় (আল্লাহর পানাহ!), তবে তাতে আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয় না।'

ওদের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না[১]। ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলি নিয়ে আগমন করেছিলেন। তখন ওরা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রাখল[২] এবং	لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ

১. এটাও মূসা আলাইহিস সালামের বক্তব্যের অংশ। অথবা পূর্ব আয়াতে তার বক্তব্য শেষ হয়েছে, আর বর্তমান আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সম্বোধন করেছেন।

এতে বলা হয়েছে যে, পূর্বে যে অসংখ্য জাতি গত হয়েছে, তাদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। অবশ্য আরবদের নিকট অধিক পরিচিত, এমন কতক কওমের নাম উল্লেখ করে এবং অবশিষ্টদের وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ (ওদের পরবর্তীদের) এর অধীনে রেখে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব কওমের যে পরিণতি হয়েছে তা কি তোমাদের জানা নেই? আশ্চর্যের বিষয়, এতসব জাতি পূর্বে ধ্বংস হয়েছে, অথচ ওদের অবস্থা থেকে এখনো তোমাদের শিক্ষা লাভ হল না!!

বি. দ্র. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ আয়াতাংশটি পড়ে বলে উঠলেন- كذب النسابون অর্থাৎ যারা সকল মানুষের পূর্ণ বংশ-ধারা জানার দাবি করে, তারা মিথ্যুক। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (র) বলেন, আমরা এমন কাউকে পাইনি, যে মা'দ ইবনে আদনানের উপরস্থ বংশধারার অবস্থা সঠিকভাবে বলতে পারে। والله أعلم

২. **فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ—এর অর্থ-মর্ম এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য :**

অর্থাৎ কাফেররা আক্রোশের আতিশয্যে নিজেদের হাত কামড়াতে আরম্ভ করল, যেমন: অন্যত্র রয়েছে- عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৯)। অথবা ওরা নবীদের কথা শুনে অতিশয় বিস্মিত হয়ে হাত মুখের উপর রাখল। অথবা হাত মুখের দিকে নিয়ে নবীদের চুপ থাকতে ইশারা করল; অথবা এই ইঙ্গিত করল যে, আমাদের এ মুখ থেকে সম্মুখস্থ উত্তর (إِنَّا كَفَرْنَا...) ছাড়া আর কিছু আশা করো না। অথবা পয়গম্বরদের কথা শুনে ওরা হাসত এবং কখনো হাসি দাবিয়ে রাখার জন্য মুখের উপর হাত রাখত।

আর এমনো হতে পারে যে, أيديهم এর ضمير (সর্বনাম) দ্বারা কাফেররা এবং أفواههم এর সর্বনাম দ্বারা রাসূলগণ উদ্দেশ্য। অর্থ এই যে, অভিশপ্তরা নিজেদের হাত পয়গম্বরদের মুখের উপর চাপা দিল, যাতে তাঁরা কোন কথাই বলতে না পারেন। অথবা উভয় সর্বনাম দ্বারা রাসূলদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাতে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চরম বেয়াদবী করে নবীদের হাত ধরে তাঁদেরই মুখে ঠেলে দিল।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে أيدي দ্বারা নে'য়ামতসমূহ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নবীগণ (আ) আল্লাহর যেসব মহান নে'য়ামত লোকসমক্ষে পেশ করেছিলেন, যেমন আল্লাহর শরীয়ত ও বিধি-বিধান প্রভৃতি, ওরা সেসবের অমর্যাদা করে তা তাঁদেরই ফিরিয়ে দিল, নিজেরা কিছুই গ্রহণ করল না। যেমন: আমাদের ভাষায়ও বলা হয়ে থাকে, আমি অমুকের জিনিসটা তারই মুখের উপর ছুড়ে মারলাম।

وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ۝

বলল, 'তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা মানি না। এবং তোমরা যার দিকে আমাদের আহবান করছ, তার ব্যাপারে আমরা এমন সন্দেহে আছি যা (আমাদের) দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

১০. ওদের রাসূলগণ বললেন, 'কী! আল্লাহ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা[১]? তিনি তোমাদের ডাকছেন, যাতে তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করেন[২] এবং

মোটকথা, যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন, সবগুলির উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ ওরা আল্লাহর নে'য়ামতের অমর্যাদা করল এবং নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করল না। তাঁদের সঙ্গে খুবই অভদ্র বরং ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করল।

১. অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব তো এমন ব্যাপার নয়, যার মধ্যে দ্বিধা ও সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ থাকতে পারে। মানব স্বভাবই আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। ঊর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের বিরল বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা এ সাক্ষ্য বহন করে যে, এই বিরাট মেশিনের পার্টসগুলিকে যিনি অস্তিত্ব দান করেছেন ও পরস্পর সংযুক্ত করেছেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল নিয়মের ভিতর দিয়ে তা পরিচালনা করছেন– নিশ্চয় তিনি মহাশক্তির অধিকারী। আর এই সর্বশক্তিমান সত্তাই পরিপূর্ণ হেকমত ও শক্তির সাথে বিশ্বব্যবস্থার মেশিন নিজের পূর্ণ আয়ত্তে রেখেছেন। এ জন্যই কট্টর থেকে কট্টরতর মুশরিককেও কোন না কোনভাবে এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে –আকাশ, পৃথিবী, ইত্যাদি প্লানেট সৃষ্টিকারী তিনিই হতে পারেন, যিনি ছোট ছোট সকল দেবতা থেকে ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

নবীদের শিক্ষা এই যে, মানব-প্রকৃতি যখন একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাশক্তিশালী ও সকল গুণের উৎস আল্লাহর সন্ধান লাভ করতে পেরেছে, তখন আর দ্বিধা-সন্দেহ ও ধারণা-কল্পনার ফাঁদে পড়ে এই সরল ও স্বাভাবিক বিশ্বাসকে হেঁয়ালিতে পরিণত করার প্রয়োজন কী? মানবীয় উপলব্ধি সাক্ষ্য দেয় যে, এক সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর বর্তমানে কোন পাথর বা বৃক্ষ, মূর্তি বা নক্ষত্র, কিংবা অন্য কোন মাখলুককে প্রভুত্বের অংশীদার বানানো সুস্থ স্বভাবের আহ্বানকে স্তব্ধ করা বা বিকৃত করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলার সত্তা বা গুণাবলির মধ্যে কি (নাউযুবিল্লাহ) কোনো অভাব অনুভূত হল, যেজন্য দেব-দেবী দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করতে চাওয়া হচ্ছে?

২. অর্থাৎ আমরা ডাকি না, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের (নবীদের) মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে তাঁর দিকে ডাকছেন, যেন তাওহীদ ও ঈমানের পথে চলে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পার। যদি তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে ঈমান ও ইয়াকীনের পথ অবলম্বন করে

وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

তোমাদের এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন[১]।' ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। তোমরা আমাদের সেসব (উপাস্য) থেকে বিরত রাখতে চাও, যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপদাদারা। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আন[২]।'

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ

১১. ওদের রাসূলগণ ওদের বললেন, 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা বিশেষ অনুগ্রহ করেন[৩]। আর আমাদের জন্য এ

নাও, তবে পূর্বের সমস্ত গোনাহ (দেনা-পাওনা ইত্যাদি ছাড়া) তিনি মাফ করে দেবেন। আর ঈমান আনার পর যেরূপ আমল করবে, সে অনুযায়ী তোমাদের সাথে ব্যবহার করা হবে।

১. অর্থাৎ কুফরী ও দুষ্কৃতির পথে চলতে থাকলে শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু ঈমান আনলে তা থেকে রক্ষা পাবে এবং যতদিন দুনিয়ায় থাকবে শান্তির জীবন কাটাবে। যেমন: অন্যত্র (হূদ : ৩) বলা হয়েছে- يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا (তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তমরূপে জীবন উপভোগ করতে দিবেন।) আরো (নাহল : ৯৭) ইরশাদ হয়েছে- فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (আমি অবশ্যই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করব)।

২. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে নিজেদের সম্পর্কে বলুন দেখি, আপনারা কি আসমানের ফেরেশতা, না মানব জাতির উর্ধ্বে অন্য কোন জীব? যখন তা নন, বরং আমাদেরই মত মানুষ, তখন কী করে আপনাদের কথায় বিশ্বাস করি? আসলে আপনাদের অভিলাষ হচ্ছে, কোন রকমে আমাদেরকে পুরনো ধর্ম থেকে হটিয়ে নিজেদের অনুগত বানিয়ে নেওয়া। তাহলে নিশ্চিত থাকুন, এ কখনই হবে না। যদি আপনারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কামিয়াব হতে চান, তবে এমন কোনো স্পষ্ট নিদর্শন বা আল্লাহপ্রদত্ত সনদ দেখান, যার সামনে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকলের মাথা নত হয়ে যাবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মুজেযা দেখাবেন।

৩. অর্থাৎ তোমাদের এ কথা তো সত্য যে, আমরা ফেরেশতাও নই এবং অন্য কোন স্বতন্ত্র জীবও নই, বরং তোমাদের মতই মানুষ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন স্তরের দিক থেকে মানুষে মানুষে আসমান-যমীন পার্থক্য হয়। তোমরাও তো এ সত্য লক্ষ করে থাকবে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও আর্থিক অবস্থাদির দিক থেকে একের উপর অন্যকে কীরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এখন যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশিষ্ট কিছু বান্দাকে তাদের স্বভাবগত যোগ্যতা ও সর্বোচ্চ গুণাবলির কারণে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও

مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট কোন (ফরমায়েশী) প্রমাণ নিয়ে আসি। আর ঈমানদারদের আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত[১]।

وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ⑫

১২. 'আর আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন[২]? এবং তোমরা যে আমাদের কষ্ট দাও, আমরা অবশ্যই তাতে ধৈর্যধারণ করব। আর ভরসাকারীদের আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত[৩]।'

বাতেনী নৈকট্যের সেই উচ্চস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, যাকে 'নবুওয়াতের মাকাম' বা 'রেসালাতের মর্যাদা' বলা হয়– তবে এতে সন্দেহ বা আশ্চর্যের কী আছে?

যা হোক, নবুওয়াতের দাবির কারণে আমরা নিজেদেরকে মনুষ্য জাতি থেকে ভিন্ন কোন জাতির বলে দাবি করছি, এমন মোটেই নয়। তবে এর দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে কারো কারো প্রতি এমন বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন, যা অন্যদের প্রতি করা হয় না।

১. অর্থাৎ, এখন রইল সনদ ও নিদর্শন আনার ব্যাপার, এর উত্তর এই যে, আল্লাহর হুকুমে আমরা পূর্বেই নিজেদের নবুওয়াতের সনদ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করেছি। যেমনঃ ইরশাদ হয়েছে : جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ –অতএব যার মানার সদিচ্ছা আছে, তার প্রশান্তির জন্য তা-ই যথেষ্ট, বরং যথেষ্ট হওয়ার চেয়েও বেশি। আর তোমাদের ফরমায়েশী নিদর্শনের দাবি পূর্ণ করার বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ আমাদের হাতে নয়। আর জ্ঞানগত দিক থেকে আমাদের সত্যতার প্রমাণও এর উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত অনুযায়ী যে সনদ ও নিদর্শন চাইবেন, তা তোমাদের দেখাবেন।

বস্তুত ফরমায়েশী নিদর্শন দেখে ঈমান আসে না, বরং ঈমান আসে আল্লাহর দানে। সুতরাং একজন ঈমানদারের পক্ষে তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত। যদি তোমরা না মান, আর আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর ও কষ্ট দিতে চাও, তবে আল্লাহরই মেহেরবানী ও সাহায্যের উপর আমাদের ভরসা থাকবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই আমাদের তাওহীদ ও মারেফতের শরাব পান করিয়ে প্রকৃত কামিয়াবীর পথ দেখিয়েছেন। এর পরও কী করে সম্ভব যে, আমরা তাঁর উপর ভরসা না করি?

৩. অর্থাৎ তোমরা যতই কষ্ট-যাতনা দাও না কেন, আল্লাহর ফযলে আমাদের তাওয়াক্কুল (বা আল্লাহ-নির্ভরতার) মধ্যে কোন পার্থক্য আসতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট দেখে আল্লাহ-নির্ভরতা ও অবিচলতার পথ পরিহার করা তায়াক্কুলকারীদের কাজ নয়।

[রুকূ' - ৩]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. কাফেররা আপন রাসূলদের বলল, 'আমরা আমাদের দেশ থেকে তোমাদের অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমাদের আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে[১]।' তখন তাঁদের রব তাঁদের প্রতি ওহী পাঠালেন- 'আমি অবশ্যই (এই) জালেমদের ধ্বংস করে দেব।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾

১৪. 'এবং ওদের পর (এ) ভূখণ্ডে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করব[২]। এ (পুরস্কার) তার জন্য, যে আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং আমার ধমকিকে ভয় করে[৩]।'

وَاسْتَفْتَحُوْا

১৫. আর তারা চূড়ান্ত ফয়সালা প্রার্থনা করল[৪]; এবং

---

১. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের তায়াক্কুল ইত্যাদির কথা ছাড়, বেশি বুযুর্গী দেখাবে না। এখন দুই বিষয়ের একটি হতেই হবে- হয় তোমরা (পূর্বের মত) চুপচাপ আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকবে এবং যাদের তোমরা বিভ্রান্ত করেছ তারা সকলে আমাদের পুরনো ধর্মে ফিরে আসবে, নতুবা তোমাদের সকলকে নির্বাসিত ও দেশান্তরিত করা হবে।

২. অর্থাৎ এরা তোমাদের বের করবে কী, আমিই এ জালেমদের উৎখাত করত চিরতরে এখান থেকে বের করে দেব, যেন আর কখনো প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। আর এদের স্থলে তোমাদের এবং তোমাদের খাঁটি অনুসারীদের দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করব।

লক্ষণীয় বিষয়, মক্কার কাফেররা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সর্বকালের জন্য মক্কা থেকে বের করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই বহিষ্কারই শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য এবং কাফেরদের নিশানা অবশিষ্ট না থাকার কারণ হয়ে গেল।

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত সফলতা ও পুরস্কার তাদের জন্য, যারা এ কথা ভেবে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যে, তিনি সর্বদা আমাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং হিসাব দেওয়ার জন্য একদিন তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে, যেখানে তাঁর নিদারুণ শাস্তি থেকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না।

৪. অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং চূড়ান্ত মীমাংসা কামনা করলেন। যেমন: নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন- فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي الخ (অতএব আমার ও ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে দিন ...।) লূৎ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ⑮

প্রত্যেক অহংকারী, হটকারী অকৃতকার্য হল[1]।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ⑯

১৬. ওর পিছনে রয়েছে জাহান্নাম, আর ওকে পান করানো হবে পুঁজের (মত) পানি[2]–

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ

১৭. সে তা অতি কষ্টে ঢোক ঢোক করে পান করবে এবং সহজে গলা দিয়ে নামাতে পারবে না[3]। আর সবদিক থেকে ওর কাছে উপস্থিত

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করুন ওদের কার্যকলাপ থেকে।) শুআইব আলাইহিস সালাম আরয করেছিলেন- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ (হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দিন।) মূসা আলাইহিস সালাম দো'য়া করেছিলেন- رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ الخ (হে আমাদের রব! আপনি ফেরাওন ও ওর প্রধানদের পার্থিব জীবনে শোভা ও ধনসম্পদ দিয়েছেন ...।)

অন্যদিকে কাফেররাও যখন দেখল যে, এত দীর্ঘকাল থেকে আযাবের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না, তখন ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে লাগল- رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (হে আমাদের রব! আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাবের দিনের পূর্বে এখনই দিয়ে দিন। –সূরা সাদ, রুকূ ২) এবং اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (আয় আল্লাহ! যদি এ ধর্মই তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর অন্য কোন যাতনাদায়ক শাস্তি আপতিত কর। –সূরা আনফাল, রুকূ ৪)। এসব তো হল মক্কার কুরায়শদের কথা। নূহ (আ)-এর কওম বলেছিল- فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا এবং শুআয়ব (আ)-এর জাতি বলেছিল- فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, উভয় দিক থেকে আশু ফয়সালার তাগিদ হতে লাগল।

১. অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহকে ডাকামাত্র সাহায্য এল এবং প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারী ব্যর্থ হয়ে গেল। ওরা যা কিছু ধারণা-কল্পনা এঁটে রেখেছিল, এক পাকড়াতেই সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ওরাও রইল না, ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও রইল না– এক মুহূর্তে সবার সমাপ্তি ঘটে গেল।

২. অর্থাৎ এ তো ছিল দুনিয়ার আযাব। এর পর রয়েছে দোযখের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যেখানে অতিশয় পিপাসার সময় ওদের পূঁজ বা পূঁজের ন্যায় পানি পান করানো হবে। أعاذنا الله منها وسائر المؤمنين

৩. অর্থাৎ তা কি আর আনন্দচিত্তে পান করতে পারে? হাদীস শরীফে (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২৮৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫৮৩) আছে, ফেরেশতাগণ মাথায় লোহার মুগুর মেরে জবরদস্তিমূলক তা মুখে ঢেলে দেবেন। যখন মুখের নিকটবর্তী করবেন, তখন তাপের

وَمِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ﴿۱۷﴾

হবে মৃত্যু, কিন্তু সে মরবে না। এবং ওর পিছনে রয়েছে কঠোর আযাব[১]।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اِۨشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ﴿۱۸﴾

১৮. যারা নিজেদের রবকে অস্বীকার করেছে, ওদের উদাহরণ এই যে, ওদের আমলগুলো সেই ভস্ম সদৃশ, যার উপর দিয়ে ঝরের দিনে প্রবল বেগে বয়ে গেছে বাতাস। ওরা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই ওরা হস্তগত করতে পারবে না। এ-ই তো ঘোরতর বিভ্রান্তি[২]।

প্রচণ্ডতায় মাথার চামড়া খসে নীচে ঝুলে পড়বে। মুখে ঢালার পর সেই পানি গলায় আটকে যাবে, দারুণ মুসিবত ও কষ্টের সাথে এক এক ঢোক করে গলার নীচে নামাবে। পেটে পৌঁছামাত্র নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে বাইরে এসে যাবে- وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (এবং তাদের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, ফলে তা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। –সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৫) এবং وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ (আর যদি ওরা পানির জন্য ফরিয়াদ করে, তবে ওদের পূজের ন্যায় পানি দেওয়া হবে, যা ওদের চেহারা পুড়ে ফেলবে। –সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯)

১. অর্থাৎ এ তো আর পান করা নয়, যেন চারদিক থেকে উপস্থিত মৃত্যু! মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা চেপে বসবে, সর্বদিক থেকে ধ্বংসকর আযাব ঘিরে ধরবে। ফলে এহেন জিন্দেগীর চেয়ে মৃত্যুকে সে ভাল মনে করবে। কিন্তু মৃত্যুও আসবে না, যা সমস্ত কষ্টের পরিসমাপ্তি করে দিতে পারত। বরং এক আযাবের পিছনে পিছনে দ্বিতীয় আযাব আসতে থাকবে– كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (যখনই ওদের চামড়া পুড়ে যাবে, এর বদলে ওদের অন্য চামড়া দেব, যাতে ওরা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে। –সূরা নিসা, আয়াত ৫৬) এবং ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। –সূরা আ'লা, আয়াত ১৩)

কবি সত্যই বলেছেন-

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ÷ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے.

(এখন তো ঘাবড়ে গিয়ে বলছে, 'মরে যাব'। মরেও যখন শান্তি মিলবে না, তখন কোথায় যাবে?)

২. কোন কোন কাফেরের মনে এরূপ ধারণা এসে থাকতে পারে যে, আর যাই হোক দুনিয়ায় আমরাও তো অনেক সৎকাজ করেছি, যেমন দান-খয়রাত করেছি, মানব সমাজে আমাদের সদ্ব্যবহার ও উদারতার প্রসিদ্ধি হয়েছে, অনেক মানুষ বিপদাপদে আমাদের দ্বারা উপকৃত

১৯. তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারণ করে দিবেন এবং কোন নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন;

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ﴿۱۹﴾

২০. আর এ আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়[১]।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾

হয়েছে। আর কোন না কোনরূপে আমরা আল্লাহর ইবাদতও করেছি। এসব কাজ ও দান সে সময় কি (আখেরাতে) উপকারে আসবে না?

এরই জওয়াব একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করে নাই, নিছক মনগড়া ও কাল্পনিক পদ্ধতিতে আল্লাহর পূজা করেছে, সেসব কাফেরের সমস্ত আমল নিতান্তই প্রাণহীন, অসার। হাশরের মাঠে এই আমলাদি সেইরূপ উড়ে যাবে, যেরূপ ঝড়ের সময় প্রচণ্ড বাতাসে ছাইয়ের কণাগুলো উড়ে যায়। সে সময় কাফেররা নেক আমল থেকে একেবারে শূন্যহাত হয়ে পড়বে। অথচ তখন নেক আমলের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। হায়! তা কত আফসোসের মুহূর্ত হবে! কেননা যে সমস্ত আমলকে নৈকট্য ও মুক্তির কারণ মনে করে রেখেছিল, তা ঠিক প্রয়োজনের সময় ভস্মস্তূপের ন্যায় অসার প্রমাণিত হবে, অথচ তখন অন্য মানুষেরা নিজেদের সৎকর্মের প্রতিদান লাভে ধন্য হতে থাকবে। কবির ভাষায়-

که بازار چنداں که آگنده تر ÷ تہی دست را دل پراگنده تر

অর্থ : 'বাজারে পণ্যের যত সমারোহ, রিক্তহস্ত মানুষের মনে ততই অশান্তি ।'

১. সম্ভবত কাফেরদের এ ধারণা হয়ে থাকবে যে, মাটিতে মিশে যখন ওরা মাটি হয়ে গেল তখন পুনরায় জীবিত হবে কী করে! কিয়ামত, আযাব, ছওয়াব ইত্যাদি সবই গল্প-কাহিনী।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ পরিপূর্ণ কুদরত ও হেকমতের দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা অথবা তোমাদের স্থলে অন্য কোন সৃষ্টি আনয়ন করা কঠিন হবে কেন? আকাশ ও পৃথিবীর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা লক্ষ করে দেখ– নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবে যে, এর সৃষ্টি ও স্থিতির পিছনে নিশ্চয়ই একজন প্রজ্ঞাময় কারিগর রয়েছেন, بالحق শব্দটি দ্বারা এ ঘোষণাই করা হচ্ছে। সুতরাং এ কী করে বলা সম্ভব যে, তিনি আশরাফুল মাখলূকাত (সৃষ্টির সেরা) মানুষকে বৃথাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টি ও অস্তিত্বের পিছনে কোন বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত নেই? নিশ্চয়ই এমন নয়, বরং এ জীবনের পর আর একটি জীবন থাকা জরুরী, যেখানে মানবসৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য চরম ও পরমরূপে প্রকাশ পাবে।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

২১. ওরা সকলে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে[১]। অতঃপর দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, সুতরাং তোমরা কি আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের কিছুটা রক্ষা করবে*[২]?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করলে আমরা অবশ্যই তোমাদের হেদায়েত করতাম। (এখন) আমরা হা-হুতাশ করি বা ধৈর্যধারণ করি- উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই[৩]।'

---

১. অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আদালতে হাযির হবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা কি আমাদের থেকে আল্লাহর আযাব কিছুটা প্রতিহত করবে?'

২. অনুসারীরা নেতাদের এ কথা বলবে। অর্থাৎ 'দুনিয়ায় তোমরা মাতব্বর হয়ে বসেছিলে এবং আমরা তোমাদের অনেক তাবেদারী করেছিলাম। আজ এই সংকট-মুহূর্তে কিছুটা উপকার কর। এমন হতে পারে কি যে, আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ আমাদের থেকে একটু হালকা করে দেবে?' –এ কথা হয় দোযখে যাওয়ার পর বলবে, অথবা হাশরের ময়দানে। ইবনে কাছীর (র) সামনের আয়াত ও অপরাপর আয়াত দৃষ্টে প্রথমোক্ত সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (যখন ওরা আগুনের ভিতর পরস্পর বিতর্ক করবে, তো দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি আমাদের পক্ষ থেকে আগুনের কিছু অংশ নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে?' –মুমিন, আয়াত ৪৮)। এছাড়া আরো আয়াতে এমনই রয়েছে। والله أعلم

৩. অর্থাৎ আল্লাহ যদি দুনিয়াতে আমাদের হেদায়াতের তাওফীক দিতেন, তাহলে তোমাদেরও আমরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে সরল পথে চলতাম। কিন্তু আমরা হোচট খেয়েছি, ফলে তোমাদেরও নিয়ে ডুবেছি।

অথবা অর্থ এই যে, এই সময় যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের আযাব থেকে বের হওয়ার কোনো পথ বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরও সে পথ বলে দিতাম। এখন তো তোমাদের মত আমরাও মুসিবতে আছি। আর মুসিবতও এরূপ যে, এ থেকে নিষ্কৃতির কোনই উপায় নেই– সবর করে চুপ থাকলেও কোন লাভ নেই, ঘাবড়ে গিয়ে চিল্লাচিল্লি করলেও ফায়দা নেই।

[রুকূ - ৪]

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

২২. আর যখন সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন, আর আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তোমাদের সাথে ওয়াদার খেলাফ করেছি। আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না– তবে এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহবান করেছিলাম, আর তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। আমিও তোমাদের সাহায্য করতে পারব না, তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে শরীক বানিয়েছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম, তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব[১]।'

---

১. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর যখন বেহেশতীদের বেহেশতে ও দোযখীদের দোযখে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন কাফেররা দোযখে গিয়ে বা যাওয়ার পূর্বে অভিশপ্ত ইবলীসকে দোষারোপ করে বলবে, মালাউন! তুই-ই দুনিয়াতে আমাদের সর্বনাশ করলি এবং এই মুসিবতে ফেললি। এখন সুপারিশ ইত্যাদি কোন তদবীর কর, যাতে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

তখন ইবলীস ওদের সামনে দীর্ঘ লেক্‌চার দেবে, যার সারার্থ এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী পয়গম্বরদের মাধ্যমে ছওয়াব ও শাস্তি, বেহেশত ও দোযখ সম্বন্ধে সত্য ওয়াদা করেছিলেন, যেসবের সত্যতা দুনিয়াতে দলীল-প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আজ চাক্ষুসভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম এবং মিথ্যা ওয়াদা করেছিলাম, যার মিথ্যা হওয়া সেখানেও সামান্য চিন্তা-বিবেচনায় সুস্পষ্ট হতে পারত, আর এখানে তো চোখেই দেখা যাচ্ছে।

আমার নিকট দলীল-প্রমাণের শক্তিও ছিল না, কিংবা এমন ক্ষমতাও ছিল না যার দ্বারা জোরপূর্বক তোমাদেরকে কোন মিথ্যা বিষয় মানাতে বাধ্য করতে পারতাম। আমি তো দুষ্কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম-মাত্র এবং আমার মিশনের প্রতি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম। আর তোমরা স্বেচ্ছায় দ্রুতগতিতে সাড়া দিয়েছিলে এবং আমি যেদিকে যাওয়ার জন্য ফুসলিয়েছি তোমরা আনন্দচিত্তে তারই পথ ধরেছিলে। যদি বা আমি বিভ্রান্ত করেছিলাম, কিন্তু তোমরা

২৩. আর যারা ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতরাজিতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত (এবং) যাতে তারা তাদের রবের হুকুমে অনন্তকাল থাকবে[১]।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

এমন অন্ধ কেন হলে যে, আমার দাবির স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ না শুনে এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই চোখ বন্ধ করে আমার অনুসরণ করলে? এখন আমার চেয়ে বেশি তোমাদের নিজেদেরকেই তিরস্কার করা উচিত। বিভ্রান্ত করার অপরাধ আমার আছে বটে, কিন্তু আমার প্রতি দোষারোপ করেই তোমরা নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে যাবে? আজ তোমাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, উলটা তোমাদের থেকে সাহায্য নেওয়াও সম্ভব নয়। তোমরা ও আমরা উভয়েই স্ব স্ব অপরাধ অনুযায়ী শাস্তিতে ধৃত হয়েছি, এখন কেউ অন্যের ফরিয়াদ শুনতে পারব না।

(إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا...) তোমরা নিজেদের বোকামিতে দুনিয়াতে আমাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে। (অর্থাৎ কেউ কেউ তো সরাসরি শয়তানের ইবাদত করেছে। আর অনেকে তার কথা এবং তার হুকুমের সামনে এমনভাবে মাথা নত করেছে, যেমনটি আল্লাহর আহকামের সামনে করা উচিত ছিল)। যা হোক, তোমরা নিজেদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে যে শিরক করেছিল, এখন আমি তা অস্বীকার করছি ও তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

অথবা بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ এর با কে سببية তথা কারণনির্দেশক ধরলে অর্থ হয়, তোমরা আমাকে আল্লাহর মর্যাদা দেওয়ার কারণে আমিও কাফের হয়েছিলাম। আমার কথা যদি কেউ না শুনত, তবে আমি কুফর ও অবাধ্যতার এ পর্যায়ে কী করে পৌছতাম? এখন প্রত্যেক জালেম ও মুশরিককে নিজ কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করা উচিত, হট্টগোল করলে এবং দোষারোপ করলে কোন লাভ হবে না।

পূর্বা-পর সম্পর্ক ও আয়াতের উদ্দেশ্য

পূর্বের আয়াতে কাফেরদের দু'দল–দুর্বল ও প্রধানদের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে দোযখীদের মহানেতা (অভিশপ্ত ইবলীস) এর বক্তৃতা উল্লেখ করা হল। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ কাফেরদের অভিযোগ ও দাবি একই ছিল, সম্ভবত সেজন্যই শয়তানের কথা আলোচনার সময় এর উল্লেখ জরুরী মনে করা হয়নি। والله أعلم

এসব কথোপকথন উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এসব ধ্বংসকর অবস্থার কথা চিন্তা করে জিন ও মানব উভয় শ্রেণীর শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত থাকে।

১. কাফেরদের শাস্তির আলোচনার পর তার বিপরীতে মুমিনদের শুভ পরিণামের বর্ণনা দেওয়া হল।

تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾

সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'[১]।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি কি লক্ষ করেননি, আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন[২] 'পবিত্র বাক্যের'[৩]? (তার দৃষ্টান্ত এমন) : যেমন উৎকৃষ্ট বৃক্ষ[৪], যার শিকড় (যমীনে) প্রোথিত, আর তার শাখাগুলি আসমানে (বিস্তৃত)[৫]।

تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. সে নিজ রবের হুকুমে সর্বদা ফল দান করে[৬]। আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে*।

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দুনিয়ায় 'সালাম' হচ্ছে নিরাপত্তা প্রার্থনার একটি দো'য়া, আর পরকালে 'সালাম' হচ্ছে নিরাপত্তা লাভ হওয়ায় মুবারকবাদ জানানোর শব্দ।

২. অর্থাৎ লক্ষ করুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন, কেমন স্থানোপযোগী ও অর্থবহ দৃষ্টান্ত! বুদ্ধিমান লোকেরা এতে যত বেশি চিন্তা করবে, ততই হাজারো সূক্ষ্ম তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

৩. كلمة طيبة (পবিত্র বাক্য) এর মধ্যে কলেমা তাওহীদ, আল্লাহর মারেফতের কথা-বার্তা, ঈমান ও ঈমানসম্পর্কিত আলোচনা, কুরআন, আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন, তাসবীহ ও তাহলীল, সত্য কথা– সবই দাখিল।

৪. অধিকাংশ বর্ণনা মতে এখানে 'উৎকৃষ্ট বৃক্ষ' বলতে খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য, যদিও অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৃক্ষও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৫. অর্থাৎ তার শিকড়গুলি মাটির গভীরে ছড়িয়ে থাকায় প্রবল বাতাস বা ঝড়ও তাকে গোড়া থেকে উপড়াতে পারে না। আর তার চূড়া আকাশচুম্বী অর্থাৎ শাখাগুলি খুব উঁচু, মাটির মলিনতা থেকে দূরবর্তী।

৬. অর্থাৎ কোন ঋতুই ফলশূন্য থাকে না। অথবা ধরে নিন, বার মাসই সকাল বিকালে তাতে তাজা ফল ধরে থাকে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'উপদেশ গ্রহণ করে'।

২৬. আর 'অপবিত্র বাক্যের'[১] দৃষ্টান্ত হল : যেমন মন্দ বৃক্ষ[২], যাকে মাটির উপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই[৩]।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৭. আল্লাহ ঈমানদারদের মজবুত বাক্য দ্বারা দৃঢ় করেন- দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে[৪] এবং

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

---

১. কুফরের কলেমা, মিথ্যা কথা এবং আল্লাহ তাআলার মর্যির খেলাফ উক্তি- كلمة خبيثة (অপবিত্র বাক্য) এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ দ্বারা 'হানজাল' গাছ (যার ফল দেখায় সুন্দর, কিন্তু স্বাদে অত্যন্ত তিক্ত) বোঝানো হয়েছে, যদিও সকল মন্দ বৃক্ষই 'শাজারায়ে খবীছা'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. অর্থাৎ শিকড় বলতে কিছু না থাকায় সামান্য নাড়াতেই উপড়ে যায়। এ দ্বারা ভঙ্গুরতা ও অস্থায়িত্ব প্রকাশ করা হচ্ছে।

দৃষ্টান্তদ্বয়ের ব্যাখ্যা

উভয় দৃষ্টান্তের সারকথা এই যে, মুসলমানদের তাওহীদ ও ঈমানের কালিমা দৃঢ় ও সত্য কালিমা, যার দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট, সঠিক ও পরিপক্ক। মানবস্বভাবের অনুকূল হওয়ার কারণে তার শিকড়গুলি অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে। আর সৎকর্মের শাখা-প্রশাখা কবুলিয়তের আকাশ স্পর্শ করে। إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (তাঁরই দিকে আরোহন করে পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম একে আরো উন্নীত করে। -সূরা ফাতের, আয়াত ১০)। তার সুস্বাদু ও মিঠা ফলমূল দ্বারা তাওহীদবাদীদের দেহ-মন পরিতৃপ্ত হয়। মোটকথা, সত্য ও সততা এবং তাওহীদ ও ঈমানের সবুজ বৃক্ষ অনবরত ফলে-ফুলে উন্নত এবং দৃঢ়তার সাথে সুউচ্চ হতে থাকে।

পক্ষান্তরে, মিথ্যা কথা, শিরক ও কুফরের বাতিল কালিমার কোন ভিত্তি ও শিকড় হয় না- একটু বাতাসেই উপড়ে যায়। বাতিল বিষয় প্রমাণ করার জন্য যতই শক্তি ব্যায় করা হোক না কেন, তা মানবস্বভাবের বিরোধী হওয়ার কারণে তার শিকড় অন্তরের গভীরে পৌঁছে না। একটু তলিয়ে দেখলেই ভ্রান্ত বা অসার মনে হতে শুরু করে। তাই প্রবাদ রয়েছে- মিথ্যার হাত-পা নেই। অর্থাৎ সত্যের মত তার পা চলে না। তা দিয়ে অন্তরেও নূর পয়দা হয় না।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) সুফীদের ধারায় উক্ত দৃষ্টান্তসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এস্থলে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

৪. পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে তাওহীদ ও ঈমানের কলেমার পরিপক্কতা ও স্থায়িত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা সেই পরিপক্ক ও স্থায়ী কলেমাগুলির দ্বারা মুমিনদের

আল্লাহ অপরাধীদের বিচ্যুত করেন[১] আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন[২]।

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ۫ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۟

[রুকূ - ৫]

২৮. আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বিনিময়ে কুফর অবলম্বন করেছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে ধ্বংস-নিবাসে[৩]?

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۟

২৯. (অর্থাৎ) জাহান্নামে, যাতে ওরা প্রবেশ করবে; আর (তা) অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۟

দুনিয়া ও আখেরাতে অবিচল ও দৃঢ়পদ রাখেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে 'বরযখ' নামে কবরের যে মনযিল আছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাত যে কোন দিকের সাথে গণ্য করা যায়– পূর্ববর্তী মনীষীদের থেকে উভয় ধরণের বক্তব্য রয়েছে।

মোটকথা, মুমিনগণ দুনিয়ার জীবন থেকে শুরু করে হাশরের মাঠ পর্যন্ত এই কালিমা তায়্যিবার বদৌলতে দৃঢ় ও অবিচল থাকবেন। দুনিয়াতে যতই বিপদ ও দুর্ঘটনা আসুক না কেন, যত বড় অগ্নি পরীক্ষাই হোক না কেন, তদ্রূপ কবরে মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সওয়াল-জওয়াব হোক, আর হাশরের মাঠের ভয়াবহ দৃশ্যই হোক, সর্বত্র এই কালিমায়ে তাওহীদই তাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার কারণ হবে।

১. অপরাধীদের দ্বারা এখানে কাফের-মুশরিক উদ্দেশ্য। ওরা দুনিয়াতেও বিচ্যুত হল, পদস্খলিত হল এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্যুত হতেই থাকবে। কখনো প্রকৃত কামিয়াবীর রাস্তা তাদের হস্তগত হবে না।

২. অর্থাৎ নিজ হেকমত অনুযায়ী যার সাথে যেরূপ আচরণ সংগত, তিনি তাই করে থাকেন।

৩. এতে কাফের ও মুশরিক-প্রধানদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, বিশেষত কুরায়শ-প্রধানদের, যাদের হাতে তখন আরবদের নেতৃত্ব ছিল। আল্লাহ তাআলা ওদের প্রতি কতই না অনুগ্রহ করেছিলেন : ওদের হেদায়াতের জন্য পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে পাঠালেন, কুরআন অবতীর্ণ করলেন, নিজ গৃহ ও হরম শরীফের খাদেম বানালেন, আরবের নেতৃত্ব দান করলেন। এ সমস্ত নে'য়ামত ও অনুগ্রহের বদলা (প্রতিদান) ওরা এই দিল যে, আল্লাহর না-শোকরী করতে উঠে পড়ে লাগল– তাঁর বাণীকে মিথ্যা বলল, পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং অবশেষে স্বজাতিকে নিয়ে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হল।

৩০. আর ওরা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, যাতে (লোকদের) তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে[১]। আপনি বলুন, 'মজা ভোগ করে নাও, অবশেষে তোমাদের ফিরে যেতে হবে আগুনের দিকে[২]।'

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝

৩১. আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দিন, 'তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে[৩]– সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন না কোন বেচা-কেনা থাকবে, আর না বন্ধুত্ব[৪]।'

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ পেয়ে যেখানে অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করার প্রয়োজন ছিল, তা না করে উলটা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিল। আল্লাহর মোকাবেলায় অন্যান্য দেবদেবীদের দাঁড় করাল, তাদেরকে প্রভুত্বের অংশ দিল এবং যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর হক ছিল, তা বিভিন্নরূপে ওদের (দেবদেবীদের) জন্য বরাদ্দ করল। এতটুকুতেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজেদের সাথে অন্যদেরও সর্বনাশ করল। তাদের বিভ্রান্ত করে নিজেদের আনুগত্যের জালে ফাঁসিয়ে রাখল।

২. অর্থাৎ বেশ ভাল, তোমাদের জালে নির্বোধদের ফাঁসিয়ে কয়েক দিনের জন্য আত্মপ্রসাদ ও দুনিয়ার মজা উপভোগ করে নাও। কিন্তু তা কত দিন? শেষ পর্যন্ত দোযখের আগুনে চিরদিন থাকতে হবে। উক্ত মজাভোগের পরিণতি এটাই।

(تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ ...) এই উক্তিটির উদাহরণ এরূপ– যেমন একজন চিকিৎসক কোন অসংযমী রোগীকে রাগত স্বরে বলেন- كل ما تريد فإن مصيرك إلى الموت (তোমার যা ইচ্ছা খেতে থাক, এরপর মৃত্যুর দিকে তোমার প্রত্যাবর্তন।)

৩. কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করার পর এখন খাঁটি মুমিনদের এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপে সচেতন থাকে– ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে যেন কোনো ত্রুটি না করে, মনেপ্রাণে যেন স্রষ্টার ইবাদত করে এবং মানুষের খেদমত করে। কারণ, এও উত্তম ইবাদত। নামাযগুলি যেন যথাসময়ে সঠিকভাবে খুশূ-খুযূর সাথে আদায় করতে থাকে, আর আল্লাহ তাআলা যা কিছু দিয়েছেন তার একাংশ যেন গোপনে বা প্রকাশ্যে অভাবীদের দান করে।

মোটকথা, কাফেররা যেরূপ শিরক ও অকৃতজ্ঞতায় ডুবে আছে, তার বিপরীতে মুমিনদের জন্য উচিত– জান-প্রাণ ও ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও শোকর-গোযারীতে সচেষ্ট থাকা।

৪. অর্থাৎ সেদিন নামায পড়া ও আল্লাহর রাস্তায় দান করা ইত্যাদি নেক কাজই উপকারে আসবে, বেচাকেনা বা শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক দ্বারা কিছু হবে না। অর্থাৎ সেদিন কোন নেক

৩২. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি[১], অতঃপর তা দিয়ে ফলমূল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের জীবিকাস্বরূপ[২] এবং নৌযানকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করেছেন, যাতে তা তাঁর হুকুমে

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی

আমল কোথাও থেকে কিনে আনা যাবে না। আর এমন কোন বন্ধুও পাওয়া যাবে না, যে ঈমান ও নেক আমল ছাড়া শুধু বন্ধুত্বের কারণে মুক্তির দায়িত্ব নিতে পারে।

পূর্বা-পর সামঞ্জস্য

প্রথমে কাফেরদের অকৃতজ্ঞতার আলোচনা ছিল, অতঃপর মুমিনদের ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার নির্দেশ দান করত কৃতজ্ঞতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সামনে আল্লাহ তাআলার কয়েকটি বিরাট নে'য়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলি মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করছে, যাতে সেসবের কথা শুনে মুমিন আল্লাহর শোকর-গোযারীর প্রতি অধিকতর উৎসাহী হয় এবং কাফেররাও চিন্তা-ভাবনা করে ও মনে মনে লজ্জিত হয় যে, ওরা কীরূপ মহানুভব দাতা ও অনুগ্রহকারী প্রভুর বিদ্রোহ করছে। প্রসঙ্গত আল্লাহ তাআলার একত্ব ও প্রভুত্বের দলীল-প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে। আশা করা যায়, এগুলি শুনে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিজেদের শিরেকী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসবে, অথবা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার নিদর্শনাদিতে গভীর চিন্তার ফলে তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ে ভীত হবে।

১. অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। অথবা (আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করার) অর্থ এই যে, বৃষ্টির অবতরণে (সমুদ্র বা জলাশয় থেকে উত্থিত) বাষ্প ইত্যাদি বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ছাড়াও অদৃশ্য আসমানী আসবাব-উপকরণের ভূমিকা রয়েছে। লক্ষনীয় যে, সূর্যের কিরণমালা আর সব বস্তুর মত কাচের উপরও পতিত হয়। কিন্তু কাচ নিজের বিশিষ্ট গঠন-প্রকৃতি ও যোগ্যতা বলে উক্ত কিরণ থেকেই অদৃশ্যভাবে এমন পর্যায়ের তাপ গ্রহণ করে, যা অপরাপর বস্তু পেরে ওঠে না। চন্দ্র এত দূরে থাকা সত্ত্বেও তার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানিতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়ে যায়। অনুরূপ, মেঘমালাও যদি কোন আসমানী ভাণ্ডার থেকে অদৃশ্যভাবে উপকৃত হয় (এবং বৃষ্টি বর্ষণে তার প্রভাব থেকে থাকে), তবে তা অস্বীকার করার কী আছে? (যা হোক, বৃষ্টি আকাশের দিক থেকে পড়ে এবং তাতে কোন আসমানী উপায়-উপকরণের প্রভাব থেকে থাকতে পারে– তাই বলা হয়েছে : 'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন')।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম কুদরত ও প্রজ্ঞা বলে পানির মধ্যে এমন একটি শক্তি রেখেছেন, যা বৃক্ষ-লতা ও শস্যক্ষেত্রের সুফলা ও সবুজ-শ্যামল হওয়ার কারণ হয়। এভাবেই আমরা খাদ্য হিসাবে ফলমূল ও শস্যাদি পেয়ে থাকি।

الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝

সমুদ্রে চলাচল করে[১] এবং তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন নদ-নদীকে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৩. আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকেও তোমাদের কাজে এভাবে লাগিয়ে রেখেছেন যে, উভয়ে অনবরত পরিভ্রমণ করে যাচ্ছে এবং রাত ও দিনকেও তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন[২]।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ

৩৪. এবং তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেক এমন বস্তু থেকে দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ[৩]। আর যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গণনা করে পূর্ণ করতে পারবে না[৪]। নিশ্চয়

---

১. অর্থাৎ সমুদ্রের ভয়াবহ তরঙ্গমালার মধ্যে ছোট্ট একখানি নৌকায় আরোহণ করে তোমরা কোথা থেকে কোথায় চলে যাও এবং কী পরিমাণ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য দ্রব্য-সমাগ্রী পারাপার করে থাক। এ খোদারই কুদরত ও হুকুমের লীলাখেলা যে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে আমরা ছোটখাট নৌকা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারি।

২. অর্থাৎ নদ-নদীতে পানির প্রবাহ এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানির পৌঁছে যাওয়া যদিও জলযানের মত তোমাদের আয়ত্তাধীন নয়, তবু নদ-নদী তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

অনুরূপ, যে চন্দ্র-সূর্য এক নির্ধারিত নিয়মাধীনে অবিরত চলছে, কখনো ক্লান্ত হয় না কিংবা তার গতিধারায় কোন পার্থক্যও হয় না, অথবা রাত ও দিন যে ধরা-বাঁধা নিয়মে সর্বদা একে অপরের পিছনে চলে আসছে– এসব যদিও এ অর্থে তোমাদের হাতে নয় যে, তোমরা যখন ও যেদিকে ইচ্ছা তাদের প্রাকৃতিক গতিধারা ও ক্রিয়াকে পরিবর্তন করতে পারবে, তবু তোমরা অনেক রকম কলা-কৌশল ও বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে অফুরন্ত উপকার লাভ করে থাক। আর মানব কলা-কৌশল ও বুদ্ধিশুদ্ধির কথা বাদ দিলেও তারা নিজেরা কুদরতীভাবে সর্বদা তোমাদের কোন না কোন সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তোমরা ঘুমাচ্ছ, কিন্তু তারা তোমাদের উপকার করে যাচ্ছে। তোমরা আরামে বসে আছ, কিন্তু তারা তোমাদের খেদমতে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে।

৩. অর্থাৎ তোমরা মুখের ভাষায় বা হাল-চালের ভাষায় যেসব জিনিস চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে যতখানি হেকমতপূর্ণ ও মঙ্গলকর ছিল, তা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর নেʼয়ামত এত অসংখ্য ও অনন্ত যে, তোমরা যদি সকলে মিলে সামগ্রিকভাবে গণনা শুরু কর, তবে ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে বসে পড়বে।

إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

মানুষ বড় বে-ইনসাফ, খুবই অকৃতজ্ঞ[১]।

[রুকূ' - ৬]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৩৫. (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম বললেন[২], 'হে আমার রব! এই শহরকে করুন নিরাপদ এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমার পূজা থেকে দূরে রাখুন[৩]।

আল্লাহ তাআলার নে'য়ামত যে কত অসংখ্য ও অসীম, তা মুফাসসির ইমাম রাযী (র) ও আল্লামা আবুস সউদ (র) কিছুটা বিশদভাবে বয়ান করেছেন এবং তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'র লেখক তাঁদের বয়ানের সাথে আরো সংযোজন করেছেন। এখানে সেই দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই।

১. অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে এমন অনেক বে-ইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ রয়েছে, যারা এত অনুগ্রহ দেখেও প্রকৃত অনুগ্রহকারীর হক কী– তা জানে না, বোঝে না।

২. যেসব কুরায়শ-প্রধানের অকৃতজ্ঞতা এবং শিরক ও কুফরের কথা পূর্বে (আয়াত ২৮) বর্ণিত হয়েছিল, ওদের ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা যার বংশধর হওয়ার ফলে বাইতুল্লাহ ও হরম শরীফের সেবায়েত ও প্রতিবেশী হয়েছ, তিনি এ কাবাগৃহের ভিত্তি খাঁটি তাওহীদের উপর স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই দো'য়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা এ মক্কা নগরীকে আবাদ করেছেন, কঙ্করময় মরুভূমিতে জাহেরী ও বাতেনী নে'য়ামতরাশির সমাহার ঘটিয়েছেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায়কালে দো'য়া ও ওসিয়ত করে গিয়েছেন যে, তাঁর বংশধররা যেন শিরকের পথ অবলম্বন না করে।

তাঁর সে ওসিয়তসমূহের কতটুকু মর্যাদা তোমরা রক্ষা করেছ অথবা তাঁর দো'য়া থেকে কতখানি উপকৃত হয়েছ এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের শোকর কতদূর আদায় করতে পেরেছ, এসব ভেবে এখন তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

৩. অর্থাৎ মক্কাকে 'হরম বা নিরাপদ স্থান' বানিয়ে দাও (আল্লাহ তাআলা তেমনই বানিয়ে দিলেন)। অধিকন্তু আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিকে সর্বদা মূর্তিপূর্জা থেকে দূরে রাখ। এস্থলে 'সন্তানসন্ততি' বলতে খুব সম্ভব তাঁর ঔরসজাত সন্তানাদিই উদ্দেশ্য। আর তাঁর ঔরসজাত সন্তানাদি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হননি। আর যদি সন্তানসন্ততি বলতে ব্যাপকভাবে সকল বংশধর উদ্দেশ্য হয়, তবে বলতে হবে যে, তাদের কতকের বেলায় এ দো'য়া কবুল হয়নি।

হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিজের জন্য উক্ত দোয়া করার তাৎপর্য

যদিও হযরত ইবরাহীম (আ) মা'সূম পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু অন্যদের পূর্বে নিজের জন্য দো'য়া করাই দো'য়ার আদব। নবীদের থেকে বর্ণিত এ ধরণের দো'য়ার মধ্যে এ ইঙ্গিতই থাকে যে, পয়গম্বরদের ইসমত বা নিষ্পাপতা তাঁদের স্বকীয় নয়, বরং আল্লাহ তাআলার দান এবং তিনিই এর হেফাজত ও সংরক্ষণকারী। এজন্য তাঁরা সর্বদা তাঁরই হুযূরে বিনীত প্রার্থনারত থাকেন।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضۡلَلۡنَ كَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنۡ تَبِعَنِیۡ فَاِنَّهٗ مِنِّیۡ وَمَنۡ عَصَانِیۡ فَاِنَّكَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۳۶﴾

৩৬. 'হে আমার রব! ওরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে[১]। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করল, সে আমার দলভুক্ত। আর কেউ আমার কথা অমান্য করলে, আপনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

رَبَّنَاۤ اِنِّیۡۤ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡىِٕدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ وَارۡزُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ یَشۡكُرُوۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. 'হে আমাদের রব! আমি আমার এক সন্তানকে* আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক শস্যহীন প্রান্তরে (এনে) আবাদ করেছি। আমাদের রব! যাতে তারা (অর্থাৎ সে ও তার বংশধর) নামায কায়েম করে। অতএব আপনি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদের ফলমূল থেকে রিযিক দান করুন, সম্ভবত তারা শোকর করবে[৩]।

বি. দ্র. মুফাসসির হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র)-এর মতে কাবাগৃহ নির্মাণ ও মক্কা আবাদের বহুকাল পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বৃদ্ধাবস্থায় এসব দো'য়া করেছিলেন। আর সূরা বাকারার প্রথম পারার শেষের দিকে (আয়াত ১২৬-১২৯) যে দো'য়ার উল্লেখ রয়েছে, তা তিনি কাবা নির্মাণের সময় স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)সহ করেছিলেন।

১. অর্থাৎ পাথরের এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষের গোমরাহীর কারণ হয়েছে।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাঁটি তাওহীদের পথ অবলম্বন করেছে এবং আমার কথা মেনেছে, সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কথা মানেনি এবং আমাদের পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, ওকে আপনি নিজ ক্ষমা ও দয়াগুণে তওবার তাওফীক দিতে পারেন। আপনার মেহেরবানী হলে সে ঈমান গ্রহণ করে নিজেকে বিশেষ রহমত ও চিরকালীন মুক্তির উপযুক্ত বানাতে পারে। অথবা অর্থ এই যে, তাকেও বর্তমান অবস্থায় ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আছে, যদিও আপনার হেকমত মোতাবেক এমন হওয়ার নয়।

বি. দ্র. সূরা মায়েদার শেষের দিকে (১১৮নং আয়াত : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -এর ব্যাখ্যায়) আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই উক্তি এবং হযরত ঈসা (আ) এর বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছি, তা দ্রষ্টব্য।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'বংশধরের কতককে ...'

৩. এক সন্তান বলতে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। কারণ, অন্যান্য সন্তান : হযরত ইসহাক প্রমুখ তখন শামদেশে ছিলেন।

৩৮. 'হে আমাদের রব! আপনি জানেন– যা কিছু আমরা গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আর আল্লাহর নিকট কোন জিনিস গোপন থাকে না– না যমীনে, না আসমানে[১]।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

মক্কা নগরী গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ও ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বরকত

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলার হুকুমে দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল ও তাঁর মাতা বিবি হাজেরাকে এখানে মরুপ্রান্তরে রেখে চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর জুরহাম গোত্রের কিছু লোক সেখানে পৌঁছে। কেননা, হযরত ইসমাঈলের পিপাসা এবং মা হাজেরার অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে সেখানে যমযম কূপ উৎসারিত করে দিলেন। জুরহাম গোত্রের যাযাবর লোকেরা (মরুর বুকে ঝরনাধারা) দেখে অবতরণ করে এবং বিবি হাজেরার অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বড় হয়ে সেই গোত্রেই বিবাহ করেন। এভাবে বর্তমান মক্কা নগরী যেখানে, সেখানে একটি লোকালয় গড়ে ওঠে।

হযরত ইবরাহীম (আ) শামদেশ থেকে সময় সময় এখানে তশরীফ আনতেন এবং এই নগরী ও নগরীর বাসিন্দাদের জন্য এই দো'য়া করতেন, প্রভু হে! আমি নিজের এক সন্তানকে এই জনশূন্য তরু-লতাবিহীন প্রান্তরে তোমার হুকুমে তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট এনে আবাদ করেছি, যেন সে এবং তার বংশধর তোমার ও তোমার ঘরের হক আদায় করে। তুমি নিজ দয়াগুণে কিছু লোকের অন্তরকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও, যাতে তারা এখানে আসে এবং তোমার ইবাদত হয় এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু তাদের জীবিকা ও প্রশান্তির জন্য গায়ব থেকে এমন উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দাও যে, (জীবন ধারণের জরুরী দ্রব্য-সামগ্রী : খাদ্যশস্য ও পানি ছাড়াও) উত্তম ফলমূলের প্রচুর আমদানী হয়, যাতে এই মানুষগুলি শান্ত মনে তোমার ইবাদত ও কৃতজ্ঞতায় মশগুল থাকে। আল্লাহ তাআলা এসব দো'য়া কবুল করলেন।

এরই ফলে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক এখানে এসে সমবেত হয় এবং এখানে উত্তম ধরনের এমন ফলমূলের প্রাচুর্য ও সমাহার হয় যা দুনিয়ার অন্যত্র সম্ভবত হয় না। অথচ স্বয়ং মক্কায় সম্ভবত একটি ফলবৃক্ষেরও কোন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দো'য়ার মধ্যে أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ (কিছু সংখ্যক মানুষের অন্তর) বলেছিলেন, তা না হলে সমস্ত মানুষ এসে জড় হত।

১. অর্থাৎ পৃথিবী ও আসমানের কোন বস্তুই আপনার নিকট থেকে গুপ্ত নয়। এ অবস্থায় আমাদের ভিতর ও বাইর কী করে গোপন থাকতে পারে?

৩৯. 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'য়া শোনেন[১]।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَی الْكِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَآءِ ۝

৪০. 'হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার সন্তানসন্ততির মধ্য থেকেও (এক দলকে)[২]। হে আমাদের রব! আর আমার দো'য়া কবুল করুন[৩]।

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

৪১. 'আমাদের রব! আমাকে, আমার মাতাপিতা ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব সংঘটিত হবে[৪]।'

رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

(হযরত ইবরাহীম) যে বললেন, 'যা আমরা করি গোপনে এবং যা করি প্রকাশ্যে'— এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে- এমন ব্যাপক অর্থের শব্দাবলি থাকতে বিশেষ অর্থ গ্রহণের কোন কারণ নেই।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'ইবরাহীম (আ) বাহ্যত সকল সন্তানের জন্য দো'য়া করেছেন। কিন্তু অন্তরে ছিল শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা।'

১. অর্থাৎ আমার বৃদ্ধাবস্থায় আশাতীতভাবে 'সারা'-এর গর্ভে ইসহাক (আ) ও হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ)-কে দান করেছেন। সন্তানসন্ততি সম্বন্ধে আপনি আমার দো'য়া رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ যেরূপ কবুল করেছেন, সেরূপ উল্লিখিত দো'য়াও কবুল করুন।

২. অর্থাৎ আমার বংশধরদের মধ্যে এমন লোক পয়দা হতে থাকুক, যারা সঠিকভাবে নামায কায়েম করতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ আমার সব দো'য়া কবুল করুন।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ) এই দো'য়া খুব সম্ভব তাঁর পিতার কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণের সংবাদ শোনার পূর্বে করেছিলেন। যদি এমনই হয় তবে দো'য়ার উদ্দেশ্য এই যে, তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করত কিয়ামতের দিন ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য করে দাও। আর যদি পিতার মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর এই দো'য়া করে থাকেন, তবে কাফেরের যে মাগফেরাত হবে না- এ বিষয় আল্লাহ তাআলা সম্ভবত তখন পর্যন্ত তাঁকে জানাননি।

উল্লেখ্য, কাফেরের মাগফেরাত অসম্ভব, এ কথা জানা আল্লাহপ্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভরশীল, মানববুদ্ধির উপর নয়। সুতরাং এমন সংবাদ না শোনা পর্যন্ত স্বীয় বিবেচনায় কাফেরের মাগফেরাত সম্ভব মনে করার অবকাশ থাকে।

[রুকূ - ৭]

৪২. তুমি কিছুতেই আল্লাহকে জালেমরা যা কিছু করে তা থেকে বেখবর মনে করো না[১]। তিনি তো ওদের সেদিনের জন্য ঢিল দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে[২]–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝٤٢

৪৩. ওরা নিজেদের মাথা ঊর্ধ্বে তুলে দৌড়াতে থাকবে, ওদের দৃষ্টি ওদের দিকে ফিরে আসবে না এবং ওদের অন্তর হবে শূন্য[৩]।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝٤٣

শিয়াদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছে, কুরআন করীমে যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতাকে কাফের বলা হয়েছে, সে তাঁর প্রকৃত পিতা নয়, বরং তাঁর চাচা বা বংশীয় কোন মুরব্বী ছিল। والله أعلم

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

এক রুকূ পূর্বে বহু বড় বড় নে'য়ামতের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ (মানুষ বড়ই জালেম ও অকৃতজ্ঞ)। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী শুনিয়ে মক্কাবাসী কাফেরদের কিছু বিশেষ নে'য়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে এবং ওদের জুলুম ও শিরকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমান রুকূতে বলা হচ্ছে যে, জালেমদের শাস্তি হতে দেরি দেখে মনে করো না যে, আল্লাহ ওদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেখবর। স্মরণ রেখো, ওদের ছোটবড় কোন কাজই আল্লাহর নিকট গোপন নয়। অবশ্য অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করত ধ্বংস করে দেওয়া তাঁর নীতি নয়। তিনি অতি বড় জালেমকেও সুযোগ দিয়ে থাকেন, যাতে সে নিজের পাপাচার থেকে ফিরে আসে, অথবা দুষ্কর্মসমূহের মধ্যে এতদূর পৌঁছে যায় যে, আইনগত দিক থেকে ওর শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকে।

বি. দ্র. لَا تَحْسَبَنَّ এর সম্বোধন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার মনে উপরোক্ত ধারণার উদয় হতে পারে। আর যদি এ সম্বোধন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হয়ে থাকে, তবে তাঁর মাধ্যমে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য যে, তাঁর মনের ধারেকাছেও উক্ত ধারণা না আসা সত্ত্বেও যখন তাঁর প্রতি এ নির্দেশ, তখন অন্যদের জন্য উক্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকা কতটা জরুরী!

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে চোখগুলি বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

৩. অর্থাৎ হাশরের মাঠে কঠিন পেরেশানী এবং ভয় ও বিস্ময়ে উপরের দিকে মাথা তুলে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। যেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, সেদিক থেকে আর দৃষ্টি ফিরবে না, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকবে, চোখের পলকমাত্র ফেলবে না। দিলের অবস্থা এই হবে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও মঙ্গল-চিন্তা থেকে একেবারে শূন্য হবে এবং ভয়-বিহ্বলতার আতিশয্যে প্রাণ-পাখী যেন উড়ে যাবে।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

৪৪. আপনি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন ওদের উপর আযাব আসবে[১]। তখন জালেমরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিন, তা হলে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব[২]।' (ওদের বলা হবে), তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই[৩]?

মোটকথা, জালেমদের জন্য তা সাংঘাতিক বেদনাদায়ক সময় হবে। অবশ্য আল্লাবহ মুমিনদের কথা ভিন্ন, তাঁদের সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ (মহাভীতি তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৩)

১. يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ (যেদিন আযাব আসবে) –'দিন' দ্বারা কিয়ামত দিবস আর 'আযাব' দ্বারা পরকালীন আযাব উদ্দেশ্য। অথবা (দিন দ্বারা) মৃত্যুর সময় এবং (আযাব দ্বারা) মৃত্যু-যন্ত্রণা ও প্রাণ-সংহারের কষ্ট উদ্দেশ্য। আর এমনও হতে পারে যে, পার্থিব আযাব ও তাতে ধ্বংস হওয়ার দিন উদ্দেশ্য।

২. যদি দুনিয়ার শাস্তি বা মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে এই উক্তি করা হয়, তবে তো অর্থ খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ এখন আমাদের আর কিছু দিনের অবকাশ দিন, আমরা ওয়াদা করছি যে, ভবিষ্যতে নিজেদের চাল-চলন দুরুস্ত করে নেব, সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করত নবীদের আনুগত্য করব। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন- حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا (অবশেষে যখন ওদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, হয়ত আমি কিছু সৎকর্ম করতে পারব। –সূরা মুমিনূন, আয়াত ৯৯-১০০)

আর যদি উপরোক্ত কথা কিয়ামতের দিনে হয়, তবে অবকাশ চাওয়ার অর্থ এই হবে যে, আমাদের দ্বিতীয়বার কিছুকালের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করুন এবং তারপর দেখুন, আমরা কী রকম প্রভুভক্তি ও বাধ্যতা প্রদর্শন করি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا (যদি আপনি দেখেন, যখন অপরাধীরা ওদের রবের সামনে নতশীর হয়ে থাকবে (এবং বলবে,) 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আমাদের পুনরায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমরা সৎকাজ করতে পারি। –সূরা সেজদা, আয়াত ১২)

৩. অর্থাৎ তোমরা তো তারাই, যাদের মধ্যে কতক অহংকারী লোক মুখের ভাষায়, আর অধিকাংশই আচরণের ভাষায় শপথ করে বলত যে, আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ

৪৫. আর তোমরা সেই লোকদের বাসভূমিতে বসবাস করেছিলে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছিল যে, ওদের সাথে আমি কিরূপ আচরণ করেছিলাম। আর আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করেছিলাম বিবিধ দৃষ্টান্ত[১]।

وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ۝

৪৬. ওরা সব রকমের ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, আর আল্লাহর ইলমে রয়েছে ওদের (সব) ষড়যন্ত্র[২]। কিন্তু ওদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল না যে, তার দ্বারা পাহাড়-পর্বত টলে যাবে★[৩]।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ۝

কখনো শেষ হবে না, মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে যেতে হবে না। –ওদের এই উক্তির জওয়াবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথা বলা হবে।

১. অর্থাৎ পরবর্তীরা সেসব লোকালয়ে বা সেগুলোর আশেপাশে বসবাস করেছে, যেখানে পূর্ববর্তী জালেমদের বাস ছিল এবং ওরা এদেরই আচার-আচরণ অবলম্বন করল। অথচ ঐতিহাসিক ঘটনাদি ও ধারাবাহিক সংবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ওদের জানা ছিল যে, আমি পূর্ববর্তী জালেমদের কী রকম শাস্তিই না দিয়েছিলাম। অধিকন্তু আমি পূর্ববর্তী উম্মতদের এসব কাহিনী আসমানী কিতাবে উল্লেখ করে নবীদের মাধ্যমে তা পরবর্তীদের জানিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও ওদের শিক্ষালাভ হয়নি। বরং ওরা পূর্বের মতই অবাধ্যতা, শত্রুতা ও সত্যদ্রোহিতাতেই লিপ্ত থাকল। حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (আল-কামার, রুকূ ১)

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জালেমই নিজ নিজ ষড়যন্ত্র করেছে, নবীদের মোকাবেলায় সত্যকে প্রতিহত ও নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে কৌশল ও ষড়যন্ত্র করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেনি। কিন্তু ওদের সকল কৌশল ও ষড়যন্ত্র এক এক করে আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, তিনিই এসবের প্রতিফল দেবেন।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের ষড়যন্ত্র তো এমন (শক্তিশালী) ছিল যে, তাতে পাহাড়-পর্বতও টলে যায়।

৩. অর্থাৎ ওরা সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র করে দেখেছে, কিন্তু (নবীদের সম্পর্কে) আল্লাহর হেফাজতের সামনে কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এ তো সম্ভব ছিল না যে, ওদের কৌশল ও চক্রান্ত পাহাড়-পর্বতকে আপন স্থান থেকে টলিয়ে দেয়। অর্থাৎ নবীগণ ও সত্য শরী'য়ত তো পাহাড় থেকেও বেশি দৃঢ় ও মজবূত। তা কি ওদের ষড়যন্ত্রে টলতে পারে? কখনই না।

আয়াতের এ তাফসীর অনুযায়ী وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ الخ আয়াতের إن অব্যয়টি নাকচ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ অর্থে আয়াতটির বিষয়বস্তু সূরা বনী ইসরাঈলের ৪র্থ রুকূর নিম্নোক্ত

৪৭. অতএব তুমি কিছুতেই মনে করো না যে, আল্লাহ আপন রাসূলদের সঙ্গে নিজ ওয়াদার খেলাফ করবেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী[২]।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. (স্মরণ কর সেদিনকে), যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও। আর সকল মানুষ দণ্ডায়মান হবে একক, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে[৩]।

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾

৪৯. এবং সেদিন তুমি পাপীদের পরস্পর শিকলে বাধা অবস্থায় দেখবে[৪]।

وَتَرَی الْمُجْرِمِیْنَ یَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ ﴿ۚ۴۹﴾

আয়াতের (৩৭) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ : وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (এবং যমীনের বুকে দম্ভভরে চলো না। তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উঁচু হয়ে পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।)

অবশ্য কোন কোন মুফাসসির إن কে (شرطية) শর্তবোধক এবং واو কে وصليه ধরে আয়াতের এ অর্থ করেছেন যে, ওদের বিরাট বিরাট ষড়যন্ত্র পাহাড়কে টলিয়ে দেওয়ার মত শক্তিশালী ছিল বটে, কিন্তু আল্লাহর হেফাজতের সামনে তা অসার প্রমাণিত হয়েছে।

১. এখানে সেই ওয়াদা উদ্দেশ্য, যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা: وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا (আমি অবশ্যই আমার রাসূলদের ও ঈমানদারদের সাহায্য করব। –সূরা গাফির, আয়াত ৫১)। অন্যত্র আছে– كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, 'আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হব।' –মুজাদালাহ, আয়াত ২১)

২. অতএব, আল্লাহর হাত থেকে কোন অপরাধী পালাতেও পারবে না এবং তিনি নিজে এহেন অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেনও না।

৩. কিয়ামতের দিন এ পৃথিবী ও আকাশগুলি বর্তমান আকার বা অবস্থায় থাকবে না। হয় আমূল পরিবর্তন ঘটবে, নতুবা গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায়, কয়েক দফা এ পরিবর্তন ঘটবে। (তাফসীরে তবারী ১৩/৭৩৫-৭৩৬) والله أعلم

আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الخ –এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ এক এক জাতের অপরাধীদের কয়েকজনকে একত্রে শিকলে বাঁধা হবে– যেমন: আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন- احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ {(ফেরেশতাদের বলা হবে) একত্র কর পাপীদের ও ওদের সহচরদের'। –সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ২২}। এবং وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (আর যখন একই প্রকৃতির লোকদের পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হবে। –সূরা তাকবীর, আয়াত ৭)

سَرَابِيۡلُهُمۡ مِّنۡ قَطِرَانٍ وَّتَغۡشٰى وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ ۙ﴿۵۰﴾

৫০. ওদের জামা হবে গন্ধকের[*][১] এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে ওদের চেহারাকে[২]।

لِيَجۡزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۵۱﴾

৫১. (আল্লাহর সামনে এজন্য দণ্ডায়মান হবে), যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। নিশ্চয় আল্লাহ শীঘ্র হিসাব গ্রহণকারী[৩]।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنۡذَرُوۡا بِهٖ وَلِيَعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۵۲﴾

৫২. এ (কুরআন) মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে, (যাতে তারা অবহিত হয়) এবং যাতে এর দ্বারা তাদের সতর্ক করা হয় আর তারা জেনে নেয় যে, তিনিই একমাত্র মা'বুদ এবং যাতে বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে[৪]।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের পোশাক হবে 'কাতিরান্' ('আব্হাল' প্রভৃতি গাছ থেকে আহরিত এক প্রকার অতি দাহ্য তরল পদার্থ)-এর'।

১. গন্ধকের মধ্যে আগুন তাড়াতাড়ি ও তীব্রতার সাথে জ্বলে ওঠে এবং বিকট দুর্গন্ধ হয়। তদুপরি জাহান্নামের আগুন যেমন, সেখানকার গন্ধকের অবস্থাও তেমন।

২. ইন্দ্রিয়সমূহের কেন্দ্রস্থল এবং মানবদেহের সর্বোত্তম অঙ্গ হিসাবে এখানে চেহারার উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে, যেরূপ অন্যত্র (হুমাযাহ্ : ৭) تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ আয়াতাংশে কল্‌ব বা দিলের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের সময় অতি সন্নিকটে। কারণ, যে বিষয়ের সংঘটন সুনিশ্চিত, তাকে দূরে মনে করা যায় না। যেমন: আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَ هُمۡ فِىۡ غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُوۡنَ (মানুষের নিকটবর্তী হয়ে গেছে তাদের হিসাব-নিকাশের সময়, অথচ তারা উদাসীনতায় লিপ্ত...। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১)

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, অর্থাৎ যখন হিসাব হবে তখন কোন দেরি হবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং জিন ও মানুষ সকলেরই আমলের খুঁটিনাটি হিসাব অতি সত্বর হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহর নিকট যেমন কোন বস্তুই গুপ্ত নয়, তেমনি এক কাজ তাঁকে অন্য কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না- مَا خَلۡقُكُمۡ وَ لَا بَعۡثُكُمۡ اِلَّا كَنَفۡسٍ وَّاحِدَةٍ (তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও মৃত্যুর পর জীবিত করা একটি প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনর্জীবিত করার) মতই। –সূরা লুকমান, আয়াত ২৮)

৪. অর্থাৎ যাতে উদাসীনতার ঘুম থেকে সজাগ হয়ে যায় এবং আল্লাহকে ভয় করত তাঁর আয়াতগুলিতে গভীরভাবে চিন্তা করে, যার ফলে তাঁর একত্ববাদের বিশ্বাস হাসিল হয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে উপদেশ পালনে যত্নবান হয়।

সূরা হিজ্‌র

সূরা ১৫ । ৯৯ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٩٩ ، ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলি কিতাবের[১] ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত[২]।

পারা-১৪

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢

২. কোন সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! ওরা যদি মুসলমান হত[৩]।

---

১. অর্থাৎ এগুলি সেই পূর্ণাঙ্গ ও মহামর্যাদাশালী কিতাবের আয়াত, যার তুলনায় অন্য কোন কিতাব 'কিতাব' বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

২. এবং এগুলি সেই কুরআনের আয়াত, যার মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যার প্রমাণাদি সমুজ্জ্বল, যার বিধি-বিধান যুক্তিসংগত, যার অলৌকিকতার প্রমাণাদি সুস্পষ্ট এবং যার বর্ণনাদি স্বচ্ছ ও সাবলীল। অতএব সামনে যা কিছু বর্ণিত হচ্ছে, তা অতি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত।

৩. অর্থাৎ আজ কাফেররা কুরআন ও ইসলামের মত মহা মূল্যবান নে'য়ামতের কদর করল না। কিন্তু এমন দিন আসবে, যখন ওরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য মাতম (বিলাপ) করবে এবং আক্ষেপে হাত কচলাবে আর বলবে, 'হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম!'

সে সময়টি কখন আসবে? এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। আমরা ইবনুল আনবারীর উক্তি অনুযায়ী একে ব্যাপক অর্থে রেখে বলব, দুনিয়া ও আখেরাতে কাফেরদের ব্যর্থতা ও মুসলমানদের সফলতার যেসব ক্ষেত্র আসতে থাকবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাফেররা বার বার নিজেরা মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে এবং ইসলামের নে'য়ামত থেকে মাহরূম থাকার কারণে আক্ষেপ করবে।

বদরযুদ্ধ ছিল এর প্রথম ক্ষেত্র। সে যুদ্ধে কাফেররা মুসলমানদের প্রতি সুস্পষ্ট বিজয় ও গায়বী সাহায্য হতে দেখল। তখন ওরা নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছিল, যে ইসলাম মক্কার গরীব মুহাজির এবং মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের চাষীদেরকে দাম্ভিক কুরায়শদের উপর বিজয়ী করল, আফসোস! আমরা সেই দৌলত থেকে বঞ্চিত রইলাম। অনুরূপ, ইসলামের বিজয় অভিযান ও অগ্রগতির প্রত্যেক ধাপেই কাফেররা নিজেদের দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার জন্য

৩. আপনি ওদের (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দিন– ওরা খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং (অলীক) আশা ওদের উদাসীন করে রাখুক। অচিরেই ওরা জানতে পারবে[১]।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۝

৪. আমি যে জনপদই ধ্বংস করেছি, তার জন্য ছিল একটি লিখিত, নির্দিষ্ট সময়[২]।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ۝

আক্ষেপ ও অনুতাপের অশ্রুজল বহাতে থাকে। –জান কবজের জন্য ফেরেশতার উপস্থিতি এবং চোখের সামনে অদৃশ্য জগতের সত্যগুলি ভেসে ওঠার মুহূর্তটিই হবে ওদের জন্য চরম অনুতাপ ও আক্ষেপের ক্ষেত্র। তখন মনস্তাপে আঙ্গুল কামড়াবে ও খেদোক্তি করবে– 'হায়, আমরা যদি ইসলাম কবূল করতাম, তবে আজ মৃত্যু-পরবর্তী শাস্তি থেকে রক্ষা পেতাম!'

এ থেকেও অধিক নৈরাশ্যজনক দৃশ্যের বর্ণনা 'তবরানী'র হাদীসে (মুজামে আওসাত, তবরানী, হাদীস ৫১৪২) আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের বহু লোক নিজেদের পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে এবং আল্লাহ যতদিন চাইবেন তারা সেখানে থাকবে। অতঃপর মুশরিকরা তাদের ভর্ৎসনা করে বলবে, তোমদের ঈমান ও একত্ববাদের দ্বারা তোমাদের কী উপকার হল? আমাদের মতই তোমরাও আজ পর্যন্ত দোযখে রইলে? এজন্য আল্লাহ তাআলা কোন একত্ববাদীকে জাহান্নামে রাখবেন না।' এ কথা বলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান আয়াত পড়লেন- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ — এটাই সর্বশেষ ক্ষেত্র হবে, যখন কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, 'আমরা যদি মুসলমান হতাম।'

১. অর্থাৎ যখন কোন উপদেশই ফলপ্রসু হচ্ছে না, তখন আপনি ওদের চিন্তায় পড়বেন না, বরং কয়েক দিনের জন্য ওদের চতুষ্পদ জন্তুর মত পানাহার করতে দিন– মন যেমন চায় ওরা দুনিয়ার মজা উপভোগ করে নিক এবং ভবিষ্যতের সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নজাল তৈরি করতে থাকুক। শীঘ্রই সময় আসবে যখন ওদের সামনে বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠবে এবং পূর্বাপর যা কিছু করেছে তার পরিণাম প্রকাশ পাবে।

সে মত এই বাস্তবতার কিছুটা তো দুনিয়াতেই মুজাহিদদের হাতে উন্মোচিত হয়েছে। আর অবশিষ্টটা পরকালে প্রকাশ পাবে।

২. অর্থাৎ যেসব জাতি ও বসতি ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে, আল্লাহর জ্ঞানে ওদের প্রত্যেকের ধ্বংসপ্রাপ্তির একটি নির্ধারিত সময় ছিল, যার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি বা শিথিলতা হতে পারত না এবং আল্লাহর ওয়াদাও টলতে পারত না। যখনি কোন জাতির মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে এবং শাস্তিদানের সময় এসেছে, তখনি অবিলম্বে তাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান কাফেররাও অবকাশ পেয়ে এবং শাস্তিদানে বিলম্ব দেখে যেন উদ্ধত না হয়। যখন ওদের সময় আসবে, তখন আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

৫. কোন সম্প্রদায় তার নির্ধারিত সময় থেকে আগে বাড়তে পারে না এবং (তা থেকে) পেছাতেও পারে না[১]।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝
৬. আর ওরা বলে, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি 'যিক্‌র' (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে! তুমি নিশ্চয় উন্মাদ[২]।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝
৭. 'তুমি আমাদের নিকট ফেরেশতাদের নিয়ে আস না কেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও[৩]?'	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
৮. আমি যথার্থ কারণ ছাড়া ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করি না, আর তখন ওদের অবকাশ দেওয়া হবে না[৪]।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝

শাস্তিদানে বিলম্ব করার মধ্যে আল্লাহর বহু হেকমত নিহিত আছে। একটি এই যে, ওদের মধ্যে কারো কারো নিজের বা সন্তানসন্ততির ভাগ্যে ঈমান লেখা রয়েছে। তাৎক্ষণিক আযাব দেওয়া হলে এর কোনই সুযোগ থাকে না।

১. অর্থাৎ শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ কেন? বরং প্রত্যেক জাতিরই উত্থান ও পতন বা জন্ম ও মৃত্যুর মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে, তা থেকে সে জাতি এক মুহূর্তও এদিক-সেদিক হতে পারে না।

২. মক্কার মুশরিকরা এ শব্দগুলো অবজ্ঞা ও ঠাট্টাস্বরূপ বলত। অর্থাৎ, আপনি আগে বেড়ে আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন নিয়ে আসলেন, অন্য সবাইকে নির্বোধ ও মূর্খ বলতে লাগলেন, বরং সারা দুনিয়ার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। তার উপর এ দাবি যে, পরিশেষে আমিই বিজয়ী হব এবং এমন এক সময় আসবে যখন অস্বীকারকারীরা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম! –এসব কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধির কথা? বরং সুস্পষ্ট পাগলামি। আর আপনি যা পড়ে শোনাচ্ছেন, তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ, যদি আল্লাহর দরবারে আপনার এমনি মর্যাদা থেকে থাকে এবং সমগ্র জাতির মধ্যে নবুওয়াতের জন্য তিনি আপনাকেই মনোনীত করে থাকেন, তবে তাঁর বাহিনী ফেরেশতারা আপনার সঙ্গে কেন আসলেন না, যারা প্রকাশ্যভাবে আপনার সমর্থন করতেন এবং আপনার কথা মানতে আমাদের বাধ্য করতেন, না মানলে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতেন?

৪. অর্থাৎ মানার মনোভাব যাদের আছে, তাদের জন্য এখনো প্রয়োজনের বেশি নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। আর যাদের মানার ইচ্ছাই নেই, তারা ফেরেশতা আসলেও মানবে না। সুতরাং

৯. নিশ্চয় আমিই অবতীর্ণ করেছি যিক্‌র (কুরআন) এবং আমিই এর হেফাজতকারী[১]।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝

ফেরেশতা অবতীর্ণ করায় লাভ কী? আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিজ হেকমত অনুযায়ী বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়ে থাকেন, উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু তামাশা দেখানোর জন্য পাঠান না।

(وَمَا كَانُوْا...) আর সাধারণত আল্লাহর নিয়ম এই যে, যখন কোন জাতির অবাধ্যতা চরমে পৌছে এবং উপদেশ ও হেদায়েত দানের সকল পর্যায় শেষ হয়ে যায়, তখন ওদের ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠানো হয়, অতঃপর ওদের আর অবকাশ দেওয়া হয় না। অতএব, যদি তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হয়, তবে তোমাদের অবিলম্বে ধ্বংস করে দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে। অথচ বর্তমানে এটা আল্লাহর হেকমতের অনুকূল নয়। কেননা, এখনো এর সময় আসেনি। এ তো সর্বশেষ উপায়, যা অন্য সব পথ ও স্তর শেষ হয়ে যাওয়ার পরই অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

১. অর্থাৎ তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, একগুঁয়েমি এবং কুরআন-বাহকের প্রতি উন্মাদ হওয়ার অপবাদ আরোপে কুরআন ও কুরআন-বাহকের কিছুই আসে যায় না। স্মরণ রেখো! এই কুরআনের অবতারণকারী আমি (আল্লাহ তাআলা) এবং আমিই এর সব রকমের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি। যে অবস্থায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, একটি বিন্দু বা যের-যবরের পরিবর্তন ছাড়াই তা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সব রকমের শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি থেকে তার হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হবে। কালের যতই পরিবর্তন হোক না কেন, কুরআনের নীতিমালা ও বিধি-বিধানের পরিবর্তন কখনো হবে না। ভাষাশৈলী, সাহিত্যকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন, কুরআনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অলৌকিকতার মধ্যে মোটেই দুর্বলতা অনুভূত হবে না। বিভিন্ন জাতি ও রাজশক্তি কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ বা ম্লান করে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হবে, কিন্তু তার একটি নুক্‌তারও হেরফের করতে পারবে না।

এই প্রতিশ্রুতি সর্বযুগে পূর্ণ হয়েছে বিস্ময়করভাবে!

কুরআনের হেফাজত সম্পর্কে এই বিরাট খোদায়ী প্রতিশ্রুতি সর্বদা এতই স্পষ্টতার সাথে ও বিস্ময়কররূপে পূর্ণ হয়ে এসেছে যে, তা লক্ষ্য করে বড় বড় কট্টর ও উদ্ধত বিরুদ্ধাচারীরও মাথা হেট হয়ে যায়। অমুসলিম ঐতিহাসিক মূর বলেন, "আমাদের জানা মতে সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি গ্রন্থও নেই, যা কুরআনের ন্যায় বার শতাব্দী যাবৎ সব রকমের বিকৃতি থেকে অক্ষত রয়েছে।" ইউরোপীয় আর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি লেখেন, 'আমরা ঠিক সেই প্রত্যয়ের সাথেই কুরআনকে হুবহু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত শব্দাবলিরূপে বিশ্বাস করি, যে প্রত্যয়ের সাথে মুসলমানরা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে জ্ঞান করে।'

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, প্রত্যেক যুগে অসংখ্য আলেমের বিরাট একটি দল এমন থেকেছেন, যাঁরা কুরআনের উলূম, অর্থ ও অফুরন্ত বিস্ময় সংরক্ষণ করেছেন। লিপিকারগণ তার

১০. আমি তো আপনার আগেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে (রাসূলদের) পাঠিয়েছি।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ۝
১১. আর ওদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেননি, যার সঙ্গে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি[১]।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۝

লিখন-পদ্ধতি, কারীগণ তার পঠন-পদ্ধতি এবং হাফেজগণ তার শব্দাবলি ও ভাষার এমনি হেফাজত করেছেন, যার ফলে অবতরণকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি যের বা যবরেরও পরিবর্তন হতে পারেনি। কেউ বা কুরআনের রুকূসমূহ গণনা করেছেন, কেউ বা আয়াতগুলি শুমার করেছেন, কেউ বা হরফগুলির সংখ্যা নির্ণয় করেছেন– এমনকি, কেউ কেউ এক একটি হরকত (যের, যবর ও পেশ) এবং এক একটি নুকতা শুমার করে ফেলেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুহূর্ত এরূপ অতিক্রান্ত হয়েছে বলা যায় না, যখন হাজারো লাখের সংখ্যায় কুরআনের হাফেজ বর্তমান ছিলেন না।

লক্ষ করার বিষয়, এ উপমহাদেশের আট দশ বছর বয়সী একটি শিশু, যাকে নিজ মাতৃভাষার দু তিন ফর্মার একটি পুস্তিকা মুখস্ত করানোও দুষ্কর, সে একটি বিদেশী ভাষার এমন একটি বিরাট গ্রন্থ ফরফর করে শুনিয়ে দেয়, যা পরস্পর সদৃশ বাক্যাবলিতে ভরপুর। তাছাড়া কোন মজলিসে যদি একজন বড় আলেম ও হাফেজ ভুলবশত কোন হরফ বাদ দিয়ে বসেন কিংবা একটি হরকতের স্থলে অন্যটি পড়ে ফেলেন, তবে একজন শিশু হাফেজ পর্যন্ত তা ধরে বসে। বরং চারদিক থেকে সংশোধনকারীরা উচ্চরবে চিৎকার দিয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তেলাওয়াতকারীর পক্ষে ভুল পড়ে যাওয়ার সাধ্য নেই।

যা হোক, কুরআনের সংরক্ষণের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেই এমন মনোযোগ ও গুরুত্বারোপ সকলে লক্ষ করত। وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ দ্বারা এ সত্যের দিকেই তদানীন্তন কাফেরদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে।

১. এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকদের অস্বীকৃতি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে দুঃখিত হবেন না। এ কোন নতুন বিষয় নয়। সর্বদাই কাফেরদের এ অভ্যাস থেকেছে যে, যখনি কোন পয়গম্বর আগমন করেছেন ওরা তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে। কখনো বা পাগল বলেছে, কখনো শুধু বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অবান্তর ফরমায়েশ করেছে। মূসা আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে ফেরাওন বলেছিল- اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (তোমাদের বার্তাবাহক, যাকে তোমাদের দিকে প্রেরণ করা হয়েছে, অবশ্যই উন্মাদ। –সূরা শু'আরা, আয়াত ২৭)। এবং আপনার নিকট কুরায়শদের দাবির মত সেও ফেরেশতা বাহিনী নিয়ে আসার ফরমায়েশ করেছিল- فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (তাকে কেন স্বর্ণের বালা দেওয়া হল না, অথবা তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেধে কেন আগমন করলেন না? –সূরা যুখরুফ, আয়াত ৫৩)

১২. এভাবেই আমি তা (ঠাট্টা-বিদ্রূপ) অপরাধীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দেই[১]।	كَذٰلِكَ نَسۡلُكُهٗ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۲﴾
১৩. ওরা তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর পূর্ববর্তীদের এ রীতিই চলে এসেছে[২]।	لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ وَقَدۡ خَلَتۡ سُنَّةُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۳﴾
১৪. আর যদি আমি ওদের জন্য আসমানের কোন দুয়ার খুলে দেই এবং ওরা দিনভর তাতে আরোহণ করতে থাকে–	وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوۡا فِیۡهِ یَعۡرُجُوۡنَ ﴿۱۴﴾
১৫. তবুও ওরা এ কথাই বলবে যে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে*, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়[৩]।'	لَقَالُوۡۤا اِنَّمَا سُکِّرَتۡ اَبۡصَارُنَا بَلۡ نَحۡنُ قَوۡمٌ مَّسۡحُوۡرُوۡنَ ﴿۱۵﴾

[রুকূ - ২]

১৬. নিশ্চয় আমি আসমানে বুরূজসমূহ সৃষ্টি করেছি[৪] এবং আসমানকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করেছি[৫]।	وَلَقَدۡ جَعَلۡنَا فِی السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّزَیَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِیۡنَ ﴿۱۶﴾

১. অর্থাৎ যারা অপরাধ করা থেকে বিরত হয় না, আমি ওদের অন্তরে এভাবেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অস্বীকারের অভ্যাস ঢুকিয়ে দিই– যখনি ওদের কানের ছিদ্র দিয়ে আল্লাহর ওহী প্রবেশ করে, সাথে সাথে অস্বীকার করার প্রবণতাও ঢুকে পড়ে।

২. অর্থাৎ ওরা সর্বদা এভাবেই অবিশ্বাস ও হাসি-ঠাট্টা করে এসেছে। আর আল্লাহর নীতিও এই যে, অবাধ্যদের ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করা হয় এবং পরিশেষে সত্যের বাণীই সর্ব উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'আমাদের চোখকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। বাঃ চোখে ধাঁধা লাগানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা তেমন আশ্চর্যের কী– আমি যদি আকাশের দ্বার খুলে স্বয়ং ওদের উর্ধ্বলোকে আরোহণ করাই এবং ওরা দিনভর তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও এই হঠকারী ও অবাধ্য লোকগুলো সত্যকে স্বীকার করার নয়। তখন ওরা বলে উঠবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহন করা হয়েছে, বরং আমাদের কোন বড় যাদু করা হয়েছে।—সম্ভবত ওরা প্রথমে সম্মোহন করা হয়েছে বলে ধারণা করবে। কিন্তু পরিশেষে বড় যাদু সাব্যস্ত করবে।

৪. 'বুরূজ' দ্বারা এখানে বড় বড় নক্ষত্র বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ বলেছেন। আর কেউ বলেন যে, এর দ্বারা সেসব আসমানী দূর্গ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে ফেরেশতা বাহিনী পাহারারত রয়েছেন।

৫. অর্থাৎ আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। রাতের বেলায় যখন আকাশ মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ থাকে, তখন অসংখ্য নক্ষত্রের গোলাকৃতিবিশিষ্ট বাতিগুলি আকাশকে কতই

১৭. এবং তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি ।	وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝
১৮. কিন্তু যে চুরি করে শোনার চেষ্টা করে, তাকে ধাওয়া করে উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা[১]।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝

না সুন্দর ও জমকালো করে তোলে। চিন্তাশীলগণ তাতে আল্লাহ তাআলার পরম শিল্পনৈপুন্য, মহাপ্রজ্ঞা এবং তাঁর নিরঙ্কুশ একত্বের কতই না নিদর্শন দেখতে পায়।

মোদ্দাকথা, আকাশ থেকে ফেরেশতাগণকে অবতীর্ণ করার বা মানুষদেরকে আকাশে আরোহণ করানোর প্রয়োজন নেই। মানতে চাইলে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর কুদরতের বিস্তর নিদর্শন রয়েছে, যেগুলি দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা অতি সহজে একত্ববাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু (মক্কার) এই কাফেররা এসব নিদর্শন থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করেছে? কিছুই না। অতএব ভবিষ্যতে এরা নির্দশন দেখে তা মেনে নেবে– এমন আশা করা যায় না।

১. অর্থাৎ আসমানসমূহের উপর শয়তানদের কোন অধিকার বা প্রভাব চলে না, বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময় থেকে তো সেখানে ওদের যাতায়াতও অসম্ভব হয়ে গেছে। এখন আপ্রাণ চেষ্টা হয়ে থাকে শয়তানদের একটি সিলসিলা (বা সিঁড়ি) স্থাপন করে আসমানের নিকট পৌছার এবং ফেরেশতা জগতের নিকটবর্তী হয়ে কিছু গায়বী খবর সংগ্রহ করার। কিন্তু ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন শয়তানরা এরূপ চেষ্টা করতে গেলে উর্ধ্বদেশ থেকে উল্কাপাত করা হয়।

আয়াতটির অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, সৃষ্টিগত বিষয় সম্বন্ধে যখন আকাশে কোন ফয়সালা ঘোষিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত তা ফেরেশতাদের অবহিত করেন, তখন সে ঘোষনাটি এক বিশেষ অবস্থায় ক্রমান্বয়ে উপর থেকে নীচে পৌছে। অবশেষে দুনিয়ার নিকটতম আকাশে, আর বোখারী শরীফের এক হাদীস (৪৭০১) অনুযায়ী 'আনান' (মেঘমালা)-এর মধ্যে ফেরেশতাগণ তার আলোচনা করে থাকেন। এ অবস্থায় শয়তানরা উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে গায়বী খবর হাসিল করার চেষ্টা করে, ঠিক যেভাবে বর্তমানকালে ওয়ারলেস বা টেলিফোনযোগে প্রেরিত কোন কোন সংবাদ পথিমধ্যে কেউ গোপন কৌশলে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে থাকে। তখন অকস্মাৎ উপর থেকে (شهاب ثاقب) আগ্নেয় গোলা নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে গায়বী-সংবাদের চোরেরা আহত বা নিহত হয়। এই ধরপাকড় ও গোলযোগের মধ্যে এক-আধটি কথা যা শয়তানরা জেনে ফেলে, তা তারা ধ্বংস হওয়ার আগেভাগে ক্ষিপ্রগতিতে অপরাপর শয়তানের নিকট এবং সেই শয়তানরা নিজেদের বন্ধু মানুষের নিকট পৌছানোর চেষ্টা করে।

জ্যোতিষীরা এই অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই নিজেদের পক্ষ থেকে হাজারো মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে সাধারণ লোকদের গায়বী খবরাদি বলে। যখন সেই আসমানী এক-আধটি কথা সত্যে পরিণত হয়, তখন ওদের ভক্তরা সেই কথাকে ওদের সত্যতার প্রমাণে পেশ করে এবং অবশিষ্ট মনগড়া সংবাদগুলো যে মিথ্যা প্রমাণিত হল, তা উপেক্ষা করা হয়ে থাকে।

১৯. আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি পরিমিতভাবে।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ⑲

২০. এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও, যাদের তোমরা রিযিক দাও না[১]।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ⑳

আয়াতের শিক্ষা

পবিত্র কুরআন ও হাদীস এসব ঘটনা বর্ণনা করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, যতই মামুলি ও ক্ষুদ্র হোক, সব সত্যের উৎস ঊর্ধ্বজগতই। আর মানব ও জিনরূপী শয়তানদের ভাণ্ডারে মিথ্যা ও মনগড়া কথা ছাড়া কোন কিছুই নেই। তদ্রূপ এ সত্যও প্রকাশ পেল যে, আসমানী ব্যবস্থাদি এতই পূর্ণাঙ্গ যে, সেখানে পা রাখতে পারে অথবা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানকার ব্যবস্থা ও ফয়সালাসমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয়ত্ত করে নিতে পারে, এমন সাধ্য কোনও শয়তানের নেই।

তবে ফেরেশতাদের থেকে এক-আধটি বাক্য শুনে শয়তান যে পলায়ন করে, এ সম্ভাবনাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা স্বয়ং আল্লাহই করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে এ থেকেও ওদের নিবারণ করতে পারতেন, কিন্তু তা তাঁর হেকমতের অনুকূল ছিল না। তিনি তো জানেন, জিন ও মানবরূপী শয়তানরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থেকে কখনো বিরত হবে না। তা সত্ত্বেও তিনি ওদেরকে দীর্ঘ অবকাশ এবং বিভ্রান্ত করার উপায়-উপকরণ দিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো হেকমত রয়েছে বলে সকলকে স্বীকার করতে হবে। তদ্রূপ বোঝা উচিত, এক্ষেত্রেও (অর্থাৎ শয়তানদের এক-আধ কথা শুনে ফেলার সুযোগ দানের মধ্যেও) কোন না কোন হেকমত নিহিত রয়েছে।

বি. দ্র. শয়তানরা সর্বদা 'শিহাব' অর্থাৎ আগ্নেয় গোলার আঘাতে মরছে, কিন্তু দমছে না। এর উদাহরণ এরূপ– যেমনঃ দক্ষিণ মেরু ও হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের অনুসন্ধানী (অনেক) ব্যক্তিরা প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু অন্যরা এ পরিণতি দেখেও উক্ত পথ পরিহার করছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শুধু শয়তানদের মারার জন্যই 'শিহাব'সমূহের সৃষ্টি—কুরআন ও হাদীসে এ কথা বলা হয়নি। বরং এদের সৃষ্টির সাথে সম্ভবত আরো অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে এবং প্রয়োজন মাফিক সেসব কাজও নেওয়া হয়ে থাকে। والله أعلم

১. এ দ্বারা চাকর-বাকর, জীব-জন্তু প্রভৃতি উদ্দেশ্য, যাদের দ্বারা আমরা নানাবিধ কার্যসাধন ও খেদমত গ্রহণ করে থাকি, অথচ তাদের রুজি আল্লাহর দায়িত্বে।

২১. আমার নিকট রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার-সমূহ, আর আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণেই অবতীর্ণ করি[১]।

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢١

২২. আর আমি পানি-ভর্তি বায়ুমণ্ডলী প্রবাহিত করি* অতঃপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি, তারপর তা তোমাদের পান করাই[২]। আর তোমরা তা সংরক্ষণ করে রাখতে সক্ষম নও[৩]।

وَاَرْسَلْنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَیْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِیْنَ ۝٢٢

২৩. এবং আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই (সব কিছুর) ওয়ারিস[৪]।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْیٖ وَنُمِیْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝٢٣

---

১. অর্থাৎ তিনি যে বস্তু যে পরিমাণ ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এতে তাঁর কোন পরিশ্রমও নেই, ক্লান্তিও নেই। এদিকে তিনি ইচ্ছা করলেন, ওদিকে সেই বস্তু সৃষ্টি হয়ে গেল। মোটকথা, তাঁর অসীম কুদরতই সমস্ত জিনিসের উৎস। সেই কুদরতের দ্বারা প্রত্যেত বস্তু হেকমত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীনে কিছুমাত্র কমবেশি হওয়া ছাড়া নির্ধারিত পরিমানে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– '... বায়ু প্রবাহিত করি, যা (মেঘমালাকে) করে পানিপূর্ণ'।

২. অর্থাৎ বর্ষাকালীন বায়ুমালা পানিভর্তি ঘন মেঘপুঞ্জ নিয়ে আসে। তা থেকে পানি বর্ষিত হয়, যা নদনদী, খালবিল ও কুয়াসমূহে জমা থেকে তোমাদের কাজে আসে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই পানি পানের যোগ্য থাকত না, কিন্তু তিনি নিজ মেহেরবানীতে কতই না সুস্বাদু ও স্বচ্ছ পানি বছরব্যাপী তোমাদের পান করার জন্য ভূগর্ভে জমা করে রেখেছেন।

৩. অর্থাৎ উর্ধ্বদেশে বৃষ্টিভাণ্ডারের উপরও তোমাদের কোন হাত নেই, নিম্নদেশে নদ-নদী ও কুয়াসমূহও তোমাদের আয়ত্তে নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন বৃষ্টি বর্ষন করেন– তা তোমরা ঠেকাতেও পার না এবং নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আনতেও পার না। আর যদি কুয়া ও নদীর পানি শুকিয়ে দেন অথবা তোমাদের নাগালের বাইরে নীচে নামিয়ে দেন, তবে কিভাবে তোমরা তা আয়ত্তে রাখবে?

৪. অর্থাৎ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা নিজ মহিমা ও গুণাবলিসহ অবশিষ্ট থাকবেন।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেকেই মরে যায় এবং তার কামাই আল্লাহর হাতে থেকে যায়।'

২৪. তোমাদের মধ্যে যারা অগ্রগামী, আমি নিশ্চয় তাদের জানি এবং যারা পশ্চাতে রয়ে যায় তাদেরও জানি[১]।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আর আপনার রব– তিনিই তাদের একত্র করবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ[২]।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

[রুকূ'- ৩]

২৬. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা দুর্গন্ধময় কাদা থেকে সৃষ্ট শুকনা ঠনঠনে মাটি দিয়ে[৩]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

১. অর্থাৎ আগে-পরের যে কোন ব্যক্তি বা তার আমলাদি আমার জ্ঞানসীমার বাইরে নয়। প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান আদি-অনাদি কাল থেকে আল্লাহর রয়েছে। সে মতই দুনিয়াতে সবকিছু প্রকাশ পায় এবং সে অনুযায়ীই পরকালে সমগ্র সৃষ্টির সুবিচার করা হবে।

বি. দ্র. অগ্রগামিতা ও পশ্চাৎবর্তিতার অর্থ এখানে ব্যাপক। তা জন্ম বা মৃত্যুর দিক থেকে হোক, ইসলাম (গ্রহণ) বা সৎকর্মের বিবেচনায় হোক। এমনকি, নামাযের কাতারে আগে-পিছনে থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থাৎ এক এক অণু-পরমাণু তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। যখন তাঁর হেকমতের দাবি এই হবে যে, সুবিচারের জন্য সকলকে একই সময়ে একত্র করা হোক, তখন এতে কোনই অসুবিধা হবে না। কবরের মাটি, জীবজন্তুর পেট, সমুদ্রের তল, বায়ুমণ্ডল– যেখানেই যে কোনো বস্তুর কোনো অংশ থাকবে, তাকে তিনি নিজের সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে যথাস্থানে একত্র করে দেবেন।

৩. সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে থাকা খোদায়ী নিদর্শনাদি বর্ণনার পর এখন মানব সত্তায় বিদ্যমান নিদর্শনাদি উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে সম্ভবত এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য যে, সকল গুণের উৎস যে মহান সত্তা তোমাদের এরূপ অভিনব উপায়ে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার পয়দা করে একই ময়দানে সমবেত করে দেওয়া কোনই কঠিন বিষয় নয়।

مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এখানে দুটি শব্দ صلصال ও حمأ مسنون ব্যবহার করেছেন। মাটি যখন আগুনে পুড়ে এমন হয়ে যায় যে, (আঘাত লাগলে) ঠনঠন করে বাজে, তখন তাকে صلصال বলে, কুরআনের অন্যত্র اَلْفَخَّار বলা হয়েছে। আর দুর্গন্ধময় পচা কাদাকে حمأ مسنون বলা হয়েছে। মনে হয়, প্রথমে পচা কাদা দিয়ে আদমের দেহ-

২৭. এবং এর পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি লু'র আগুন দিয়ে[১]।	وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝

কাঠামো তৈরি করা হয়। অতঃপর যখন শুকিয়ে ও পুড়ে ঠনঠন করে বাজতে লাগল, তখন তা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর এমন স্তরে পৌছল যে, তাতে মানব-প্রাণ ফুঁকে দেওয়া যায়। তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে কোন কোন আলেমের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার শব্দাবলি নিম্নরূপ–

كأنه سبحانه أفرغ الحمأ فصوّر من ذلك تمثال إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صوت ثم غيره طورا بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين

('আল্লাহ পাক যেন ছাঁচের ভিতরে কাদা ঢেলে ফাঁপা (শূন্যগর্ভ) মানব-কাঠামো তৈরি করলেন। তারপর তা শুকিয়ে এমন হল যে, টোকা দিলে ঠনঠন করে বাজে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তার মধ্যেও পরিবর্তন করে করে অবশেষে তিনি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন। অতএব কত বরকতময় আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।')

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, মাটি পানিতে ভিজানো হল এবং শুকানো হল, তখন তা ঠনঠন করে বাজতে লাগল। তা-ই হল মানুষের দেহ। উক্ত ঠনঠনে মাটির বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কাঠিন্য ও ভার মানবদেহে রয়ে গেল। অনুরূপ, জিনের সৃষ্টির মধ্যে উষ্ণ বায়ুর বৈশিষ্ট্য, তীব্রতা ও লঘুত্ব থেকে গেল।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) দীর্ঘ আলোচনা করত বলেন যে, طِيْنٌ لَازِبٌ এবং حَمَأٌ مَسْنُوْنٌ ইত্যাদি শব্দ থেকে বোঝা যায়, মাটি ও পানি মিলিয়ে (কাদা বানিয়ে) বাতাসে তা শুকানো হয়। আর فخار শব্দটি প্রমান করে, এক পর্যায়ে তা আগুনে পোড়ানো হয়। এই আগ্নেয় অংশটাই মানুষের মধ্যে দুষ্ট স্বভাবের উৎস। এ হিসাবেই অন্যত্র (সূরা রহমানে) বলা হয়েছে- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (১৪) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় ঠনঠনে মাটি থেকে। আর জিন সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে।)

রাগেব (র)-এর এ আলোচনাটি খুবই দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ, কিন্তু তার সারসংক্ষেপও এখানে লেখার অবকাশ না থাকায় আফসোস রয়ে গেল।

১. অর্থাৎ বায়ুমিশ্রিত সূক্ষ্ম আগুন দিয়ে। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ। অথবা বলা যায় যে, জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের ন্যায় দহনকারী তীব্র বায়ু থেকে, যে বায়ুকে আমাদের এখানে লূ বলা হয়।

যা হোক, মানব জাতির আদি পিতাকে এমন উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে মাটির ভাগ প্রবল ছিল। আর জিন জাতির পিতা এমন উপাদান দিয়ে সৃষ্ট, যার মধ্যে আগুনের ভাগ বেশি ছিল। ইবলীসও জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

২৮. (স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পচা দুর্গন্ধময় কাদা থেকে সৃষ্ট শুকনা ঠনঠনে মাটি দিয়ে একজন মানুষ সৃষ্টি করব;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

২৯. 'অতঃপর যখন তার অবয়ব পরিপূর্ণ করব এবং তাতে ফুঁকে দেব আমার (পক্ষ থেকে) রূহ, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ো[১]।'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব সকল ফেরেশতা সেজদা করল–

فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

---

১. অর্থাৎ আদমের দেহ ঠিক করে তাতে মানবাত্মা ফুঁকে দেওয়ার মত যোগ্য করব। এরপর তাতে প্রাণ সঞ্চার করব, ফলে একটি জড়বস্তু জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত হবে। তোমাদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে, তখন সকলে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।

مِن رُّوحِى -এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা এই যে 'রূহ' (বা আত্মা)-কে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন, এর দ্বারা নিতান্তই মানবাত্মার মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তা এমন বিশিষ্ট আত্মা, যার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি (জ্ঞান-বুদ্ধি, সুব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)-এর নমুনা রয়েছে এবং যার স্বভাবগত প্রকৃতি হল আল্লাহকে স্মরণ করা। আর বিশেষ সূক্ষ্মতার কারণে আল্লাহর সঙ্গে রয়েছে তার অপেক্ষাকৃত বেশি নৈকট্যের সম্পর্ক।

ইমাম গাজ্জালী (র) উক্ত সম্পর্কের বিষয়টিকে অন্যভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, সূর্য যদি বাকশক্তি লাভ করে এবং বলে যে, আমি পৃথিবীকে আমার আলো দান করেছি, তবে তার এ বলাটা কি অশুদ্ধ হবে? না। তো, যখন এরূপ বলাটা সঠিক– অথচ সূর্য পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে তার সাথে একীভূতও হয় না এবং সূর্যের আলো সূর্য থেকে বিচ্ছিন্নও হয় না, বরং পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও আলোর অধিকার তারই হাতে থাকে, পৃথিবী শুধু নিজ যোগ্যতা অনুসারে উপকৃত হতে পারে, সূর্যের আলোর উপর তার কোন কর্তৃত্বই চলে না– তখন সকল উর্ধ্বেরও উর্ধ্বের আল্লাহ তাআলা যদি এ কথা বলেন যে, তিনি নিজ আত্মা আদমের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন, তবে তাতে মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রবিষ্ট হওয়া অথবা মানুষের সঙ্গে আল্লাহর একীভূত হওয়ার কথা কিরূপে প্রমাণিত হতে পারে?

রূহ' (আত্মা) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৫) আয়াতের অধীনে করা হবে।

إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ٣١	৩১. ইবলীস ছাড়া, সে সেজদাকরীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।
قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ٣٢	৩২. আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস! তোর কী হল যে, তুই সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না?'
قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَٰلٍ مِّنۡ حَمَإٍ مَّسۡنُونٍ ٣٣	৩৩. সে বলল, 'আমি সেই মানুষকে সেজদা করার নই, যাকে আপনি পচা দুর্গন্ধময় কাদা থেকে সৃষ্ট শুকনা ঠনঠনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।'
قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٤	৩৪. তিনি বললেন, 'তবে তুই তা থেকে বের হ[১], কেননা তুই বিতাড়িত[২]।
وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٣٥	৩৫. 'আর তোর উপর লা'নত বিচার-দিবস পর্যন্ত[৩]।'

১. অর্থাৎ বেহেশত থেকে বা আসমান থেকে, বা এ উচ্চ মর্যাদা থেকে বের হয়ে যা, যেখানে তুই এখন পর্যন্ত ছিলি।

২. (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) অর্থাৎ তুই বিতাড়িত ও ধিকৃত। অথবা رجيم এর মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা পূর্বে বলা হয়েছে যে, শয়তানদের شِهَابٌ ثَاقِبٌ তথা অগ্নি-গোলা মেরে মেরে বিতাড়িত করা হয়।

বস্তুত فإنك رجيم বাক্যে শয়তানের দাবির খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেজদা করতে তোর অস্বীকৃতির কারণ উপাদানগত মর্যাদা নয়, যেমনটি তুই দাবি করছিস! এর আসল কারণ তোর সেই দুর্ভাগ্য, যা তোরই অযোগ্যতা-দোষে তোর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। তুই তো আদি থেকেই বিতাড়িত!

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহর অভিসম্পাত ও বান্দাদের পক্ষ থেকে লানত হতে থাকবে। এভাবে সে দিন দিন কল্যাণ থেকে দূর হতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্তও যখন কল্যাণের তাওফীক হবে না, তখন এর পরে তো আর কোন সুযোগই হবে না। কেননা, আখেরাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তেমন ফলই লাভ করবে যেমন কর্ম সে দুনিয়াতে করেছিল। অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত লানত হতে থাকবে। অতঃপর যে অসংখ্য রকমের আযাব হবে, তা তো লানতের চেয়েও অনেক বেশি। অথবা إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ দ্বারা চিরকালীন শাস্তির প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে।

৩৬. সে বলল, 'হে আমার রব! তবে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন মানুষদের পুনর্জীবিত করা হবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۞

৩৭. তিনি বললেন, 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল–

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞

৩৮. 'নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত[১]।'

إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۞

৩৯. সে বলল, 'হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সুতরাং আমি অবশ্যই তাদের জন্য দুনিয়ার ভিতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব–

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞

৪০. 'তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাদের ছাড়া[২]।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

৪১. তিনি বললেন, 'এ-ই আমার পর্যন্ত (পৌঁছার) সরল পথ[৩]।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۞

---

১. অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেওয়া হল। তুই প্রাণ খুলে সখ মিটিয়ে নে।

এই ঘটনার বিশদ আলোচনা সূরা 'বাকারা' ও 'আরাফ'-এ হয়েছে। আমরা সূরা আরাফের দ্বিতীয় রুকূতে (আয়াত ১৩-১৫) এর বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করেছি, তা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়ে তাদেরকে নফসের কামনা-বাসনার জালে ফাঁসিয়ে দেব এবং আপনার বিশিষ্ট ও নির্বাচিত খাঁটি বান্দাদের ছাড়া অন্য সকলকে সৎপথ থেকে হটিয়ে ছাড়ব।

অভিশপ্ত শয়তান এ কথা হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় বলেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এই কথা বলা যে, আপনার তো কিছুই ক্ষতি করতে পারব না, তবে যার কারণে আমি বিতাড়িত হলাম, আমার সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী তার বংশধরদের থেকে প্রজন্মপরম্পরায় এর প্রতিশোধ নিতে থাকব। —সূরা আরাফে এ বিষয়ে আমরা যা কিছু লিখেছি তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বন্দেগী ও এখলাসের পথ সোজা আমার পর্যন্ত পৌঁছে। আর এটাই আমার স্বচ্ছ ও সরল পথ, যার মধ্যে কোন হেরফের নেই। যে বান্দারা আমার দাসত্ব ও এখলাসের পথ অবলম্বন করবে, তারাই অভিশপ্ত শয়তানের খপ্পর থেকে নিরাপদ থাকবে। পক্ষান্তরে যারা তার আনুগত্য করবে, তারা তার সাথে দোযখে যাবে।

৪২. 'আমার বান্দাদের উপর তোর কোন আধিপত্য নেই: কিন্তু যারা তোর অনুসরণ করবে অর্থাৎ বিপথগামীরা-(তাদের কথা ভিন্ন)[১]।	اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیْنَ۝
৪৩. 'নিশ্চয় জাহান্নামই ওদের সকলের নির্ধারিত স্থান[২],	وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِیْنَ۝
৪৪. 'তার সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য রয়েছে ওদের মধ্য থেকে এক একটা বণ্টিত দল[৩]।'	لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ۝

কোন কোন মুফাসসির هٰذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیْمٌ আয়াতটিকে হুমকির অর্থে গ্রহণ করেছেন- অর্থাৎ ওরে অভিশপ্ত! মানুষকে সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে তুই কোথায় পালাবি? কোন্ সে পথ? যা আমার দিকে যায় না? অতএব তুই আমার শাস্তি থেকে পালিয়ে কোথায় যেতে পারবি? –এ ব্যাখ্যানুযায়ী আল্লাহর এই কথাটি এমন, যেমন বলা হয়- اِفْعَلْ مَا شِئْتَ، فطريقك عَلَیَّ (তোর যা ইচ্ছা কর, তোর গন্তব্যপথ তো আমারই দিকে)। আর কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (নিশ্চয় আপনার রব ওঁত পেতে রয়েছেন। –ফাজ্র, আয়াত ১৪) والله أعلم

১. অর্থাৎ আমার মনোনীত ও খাঁটি বান্দাদের উপর তোর কোনই প্রভাব চলবে না। অথবা অর্থ এই যে, কোনো বান্দার উপরই তোর জবরদস্তি চলতে পারে না। হাঁ, যে নিজেই নিজের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তোর অনুসরণ করবে, সে নিজ ইচ্ছায়ই ধ্বংস ও বরবাদ হবে। যেমন: পূর্বে শয়তানেরই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, وَمَا كَانَ لِیَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِیْ (আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না– তবে এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে! –সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২২)

২. অর্থাৎ তোর ও তোর সঙ্গী-সাথীদের জন্য দোযখের জেলখানা তৈরি রয়েছে, তোদের সকলকে সেখানেই পৌছানো হবে।

৩. সালাফের কেউ কেউ سبعة أبواب দ্বারা দোযখের উপর-নীচ সাতটি স্তর উদ্দেশ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। সে মত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সাতটি স্তরের নাম এরূপ বলেছেন– 'জাহান্নাম', 'সা'ঈর', 'লাযা', 'হুতামা', 'সাকার', 'জা'হীম' ও 'হাবিয়া'। উল্লেখ্য, 'জাহান্নাম' শব্দটি দোযখের বিশেষ একটি স্তর এবং সাত স্তরের সমষ্টি– উভয়ের উপরই প্রযোজ্য হয়। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সাতটি দরজাই উদ্দেশ্য– যেগুলো দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দোযখীরা প্রবেশ করবে। والله أعلم

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বিভিন্ন শ্রেণীর নেককারদের প্রবেশের জন্য যেমন বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে, তেমনি নানা শ্রেণীর দোযখীর জন্য দোযখের

[রুকূ - ৪]

৪৫. নিশ্চয় পরহেযগাররা থাকবে উদ্যানরাজি ও ঝরনাসমূহে[১]।	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ
৪৬. (তাদের বলা হবে,) 'তোমরা এগুলিতে প্রবেশ কর নিরাপত্তার সাথে, নির্ভয় হয়ে[২]।'	اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ
৪৭. আর তাদের অন্তরে (পরস্পরের প্রতি) যে বিদ্বেষ ছিল আমি তা বের করে দেব– তারা হয়ে যাবে ভাই ভাই[৩], যারা সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর মুখোমুখি হয়ে সমাসীন হবে[৪]।	وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ
৪৮. সেখানে তাদের স্পর্শ করবে না কষ্ট- ক্লান্তি এবং সেখান থেকে তাদের বের করা হবে না[৫]।	لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

সাতটি দরজা রয়েছে। বেহেশতের একটি দরজা বেশি থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, কতক তাওহীদবাদী একমাত্র আল্লাহর দয়াগুণে বিনা আমলেই বেহেশতে যাবে। একে বাদ দিলে, আমলের দিক থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের দরজা সমান।

১. পরহেযগারগণ অর্থাৎ যারা কুফর, শিরক, নাফরমানী ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে, তারা নিজ নিজ মর্যাদানুযায়ী বেহেশতের বিভিন্ন বাগানে বাস করবে, যেথায় অত্যন্ত নিপুনভাবে নদনদী ও ঝরনামালা প্রবাহিত হতে থাকবে। –শয়তানের অনুসারীদের আলোচনার পর এ আয়াতে মুখলেস বান্দাদের পরিণামের কথা বলা হল।

২. অর্থাৎ এখন সব রকমের বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। এবং ভবিষ্যতে অনন্তকালের জন্য সব রকমের দুশ্চিন্তা, অশান্তি, পেরেশানী ও ভয়-ভীতি থেকে নিশ্চিন্ত থাকবে।

৩. অর্থাৎ বেহেশতে পৌঁছার পর বেহেশতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে পূর্বের কোন মনোমালিন্য অবশিষ্ট থাকবে না। তাঁদের অন্তর সম্পূর্ণ পাক-সাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সেখানে একের প্রতি অন্যের ঈর্ষাও হবে না, বরং ভাই ভাইরূপে পরম ভালবাসা ও মহব্বতের সাথে থাকবে– প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে দেখে খুশী ও আনন্দিত হবে।

সূরা আ'রাফে (আয়াত ৪৩) এর কিছু বিবরণ গত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ মর্যাদা ও সম্মানের আসনসমূহে মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলবে। দেখা-সাক্ষাতের সময় এমনভাবে বসবে না যে, কেউ সামনে আর কেউ পিছনে।

৫. হাদীসে আছে, বেহেশতবাসীদের বলা হবে, 'হে বেহেশতবাসীগণ! এখন তোমাদের এই পুরস্কার দেওয়া হল যে, চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থতার কষ্টে পতিত হবে না,

৪৯. আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমিই প্রকৃত ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান-

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۟

৫০. এবং এও (শুনিয়ে দিন) যে, আমার শাস্তিই যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

৫১. এবং তাদের শোনান ইবরাহীমের মেহমান-দের ঘটনাও[২]।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝

৫২. যখন তারা তাঁর নিকট প্রবেশ করল এবং বলল, 'সালাম'। তিনি বললেন, 'আমরা তোমাদের ভয় পাচ্ছি[৩]।'

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝

চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু আসবে না। চিরকাল আরামের সাথে অবস্থান করবে, কখনো সফরের কষ্ট পোহাবে না। (সহহি মুসলিম, হাদীস : ২৮৩৭)

১. পাপী ও মুত্তাকীদের পৃথক পৃথক পরিণাম বর্ণনার পর এখানে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার কোন না কোন গুণ ও শানের প্রকাশ রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তাআলা মূলত নিজের সকল সৃষ্টির প্রতি ক্ষমা ও দয়া করতে চান এবং বাস্তবে প্রকৃত দয়া তাঁরই। সকল জীব-জন্তুর মধ্যকার দয়া-মায়া তাঁরই দয়ার ছায়া মাত্র। তবে যে ব্যক্তি নিজেই দুষ্কৃতি ও পাপাচার করে নিজের প্রতি দয়ার দ্বার বন্ধ করে দেয়, তখন তাঁর শাস্তিও এমন কঠোর যে, তা প্রতিহত করার মত কোন শক্তি নেই। শেখ সাদী (র) সত্যই বলেছেন-

به تهدید گر برکشد تیغ حکم ÷ بمانند کر بیاں صم وبکم
وگر دردہد یک صلائے کرم ÷ عزازیل گوید نصیبے کرم

(অর্থ- ধমকের সাথে যদি আদেশের তলোয়ার হাঁকেন, তবে নিকটতম ফেরেশতারাও বোবা ও বধির হয়ে যান। আর যদি পুরস্কারের ঘোষণা দেন, তবে আযাযীল ফেরেশতাও বলে ওঠেন, আমিও একটি অংশ পাব।)

সামনে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যার মধ্যে ফেরেশতাদের অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। এ ফেরেশতারাই কোন স্থানে সুসংবাদ শোনান, আবার অন্যত্র পাথর নিক্ষেপ করেন, যাতে এ সত্য জানা হয়ে যায় যে, আল্লাহর উভয় গুণই (রহমত ও গযব) পরিপূর্ণ। অতএব বান্দাদের কর্তব্য– তারা নির্ভয়ও হবে না, নিরাশও হবে না।

২. 'মেহমান' বলার কারণ এই যে, তিনি প্রথমে তাঁদের মেহমানই মনে করেছিলেন। পরে জানা গেল যে, তাঁরা ফেরেশতা।

৩. কুরআনের অন্যত্র আছে- فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً (হূদ, ৭০) অর্থাৎ তিনি ভয়কে অন্তরে গোপন করলেন। সুতরাং বলা হবে যে, প্রথমে গোপন করার চেষ্টা করেন, শেষ পর্যন্ত দমন করতে

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা বরং আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি[১]।	قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝٥٣
৫৪. তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে এমন সময় (তার) সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গিয়েছি? এখন কীসের সুসংবাদ দিচ্ছ[২]?'	قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝٥٤

না পেরে মুখে প্রকাশ করে দেন। অথবা এই আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন করা সত্ত্বেও ভয়ের চিহ্ন চোখ-মুখে এমনি ফুটে ওঠে, যেন তিনি মুখে বলছিলেন, আপনাদের দেখে আমাদের ভয় লাগছে।

কীসের ভয় ছিল? সূরা হূদে (আয়াত ৭০) এর বিশদ ব্যাখ্যা গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য। তদুপরি, এ ঘটনার অপরাপর অংশের উপরও সেখানে যে আলোকপাত করা হয়েছে, তাও একবার দেখে নেওয়া উচিত।

১. অর্থাৎ ভয়ের কারণ নেই, বরং খুশী হওয়ার বিষয় যে, আমরা আপনাকে এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়ার সুসংবাদ শোনাচ্ছি। সন্তানও কেমন? অত্যন্ত বুদ্ধিমান পুত্রসন্তান, বড় আলেম, যাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা দিয়ে নবুওয়াতের মহামর্যাদায় সমাসীন করা হবে- وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি হবেন নবী, পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। –সূরা সাফফাত, আয়াত ১১২)

২. যেহেতু আশাতীত ও অস্বাভাবিক সুসংবাদ শুনলেন, তাই নিজ বৃদ্ধাবস্থা লক্ষ করত কিছুটা বিস্মিত হলেন। মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যখন আশার বাইরে কোন আনন্দকর সংবাদ অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে হঠাৎ করে শোনে, তখন বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও তা সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করে এবং বিস্ময়ের ভাব অবলম্বন করে, যাতে সংবাদদাতা পূর্ণ নিশ্চয়তা ও স্পষ্টতার সাথে সুসংবাদটির পুনরাবৃত্তি করে। ফলে কোন রকমের ভুল-বোঝাবুঝিরও সম্ভাবনা থাকে না এবং কোন জটিলতা ও অস্পষ্টতার অবকাশও থাকে না। মোটকথা, বিস্ময়ভাবের প্রকাশ দ্বারা সুসংবাদটিকে স্পষ্ট ও পরিপক্ক করানো এবং বারবার শ্রবণের দ্বারা নতুন স্বাদ হাসিল করা উদ্দেশ্য হয়। এ বিষয়ে ইবনে কাছীর বলেন–

قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة

(' তিনি উক্ত কথা বলেছিলেন তাঁর ও স্ত্রীর বার্ধক্যহেতু আশ্চর্য হয়ে, আর ওয়াদা জোরদার করানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর ফেরেশতারাও তাঁকে প্রথমে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তার সত্যতা জোরদার করণার্থে সুসংবাদের পর সুসংবাদ শোনালেন।')

৫৫. তাঁরা বলল, 'আমরা আপনাকে যথার্থই সুসংবাদ দিয়েছি, সুতরাং আপনি নিরাশ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তিনি বললেন, 'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিজ রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়[১]?'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তিনি বললেন, 'অতঃপর তোমাদের বিশেষ কাজ কী হে প্রেরিত (ফেরেশতা)-গণ[২]!'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তাঁরা বলল, 'আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি-

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. 'তবে লূতের পরিবার-পরিজন ছাড়া। আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব-

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ) এর কথা দ্বারা নৈরাশ্যের সন্দেহ হতে পারত, যা বড়দের বিশেষত বিশিষ্ট পয়গম্বরদের শানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সেজন্য ফেরেশতাগণ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ বলে সতর্ক করলেন। হযরহ শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ দ্বারা বোঝা গেল, কামেল বান্দারাও (কোন পর্যায়ে) বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করে থাকেন।'

১. অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে সাধারণ মুসলমানরাই তো নিরাশ হতে পারে না, নবীদের পক্ষে এ সম্ভাবনা মোটেই নেই। শুধু স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ ও আমার বর্তমান অবস্থার বিবেচনায় একটি বিষয় অত্যাশ্চর্য মনে হওয়ায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করেছি যে, আল্লাহর কী কুদরত, এখন এ বৃদ্ধ বয়সে আমার সন্তান লাভ হবে!

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হওয়া- উভয়ই কুফর। অর্থাৎ ভবিষ্যতের খবর আল্লাহই জানেন। অতএব নিশ্চিতরূপে দাবি করা যে, এরূপ হতেই পারে না, এটা কুফর। অবশ্য শুধু অন্তরের ধারণা ও কল্পনার কারণে পাকড়াও হয় না। যখন মুখে উচ্চারণ করে, তখন গোনাহ হয়।'

২. অর্থাৎ শুধু কি এ সুসংবাদ শোনানোর জন্যই আপনারা প্রেরিত হয়েছেন, না আরো কোনো উদ্দেশ্য আছে, যা করার জন্য আপনারা এসেছেন? -খুব সম্ভব লক্ষণাদি দ্বারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের আগমনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁদের দেখে যে ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল, সম্ভবত তা থেকেই ধারণা হয়েছে যে, নিছক সুসংবাদ বহনকারীদের দেখে ভয় লাগবে কেন? নিশ্চয় তাঁদের সঙ্গে একটা ভয়ের বিষয়ও জড়িত আছে। والله أعلم

৬০. 'তাঁর স্ত্রী ছাড়া। আমরা স্থির করেছি, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত[১]।	إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

[রুকূ - ৫]

৬১. অতঃপর প্রেরিত (ফেরেশতা)-গণ যখন লূতের পরিবার-পরিজনের কাছে আসল,	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾
৬২. তিনি বললেন, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক[২]।'	قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. তারা বলল, 'না, বরং আমরা তো আপনার নিকট সেই জিনিস নিয়ে এসেছি, যাতে ওরা সন্দেহ পোষণ করত[৩]।	قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

---

১. অর্থাৎ সে পশ্চাতে রয়ে যাওয়া কাফেরদের সাথে আযাবে পতিত হবে।

বি. দ্র. বাহ্যত মনে হয়, قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِيْنَ উক্তিটি ফেরেশতাদের, যাঁরা আযাব নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু তাঁরা তখন আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনার্থে এবং তকদীরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে এসেছিলেন, সেজন্য তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে تقدير ('তাকদীর')-এর বিষয়কে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন– قدرنا (আমরা স্থির করেছি)। আর যদি এটা আল্লাহ তাআলার উক্তি হয়, তা হলে তো কোন সমস্যাই নেই।

২. এর অর্থ হয় এই যে, তোমরা আমার নিকট অস্বাভাবিক ধরনের মানুষ মনে হচ্ছ, যাদের দেখেই মনে শঙ্কা ও খটকা পয়দা হয়। এটা সম্ভবত সেই ধরণের খটকা ছিল, যা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দিলে পয়দা হয়েছিল।

অথবা (আয়াতের) অর্থ এই যে, তোমরা এ শহরে অপরিচিত। ফলে এখানকার লোকদের অসৎ চরিত্রের কথা তোমাদের জানা নেই। দেখা যাক ওরা তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করে।

অথবা এ কথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা ফেরেশতাদের সুদর্শন ছেলে মনে করে লূত (আ.)-এর বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল। আর লূৎ আলাইহিস সালাম তাঁদের মেহমান মনে করে সাধ্যমত রক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত তিনি আক্ষেপের সাথে বলে উঠলেন- لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (হায়, যদি আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম! –হূদ, আয়াত ৮০)। সে সময় তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে ও ঘাবড়ে গিয়ে মেহমানদের বলতে লাগলেন– (إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ) তোমরা দেখি আজীব ধরনের মানুষ। আমি তোমাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য রক্ত পানি করে দিচ্ছি, আর তোমরা আমার সাহায্যার্থে কিছুই করছ না।

৩. অর্থাৎ আপনি ঘাবড়াবেন না– আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। আমরা আকাশ থেকে সেই বস্তু নিয়ে আগমন করেছি, যার ব্যাপারে এরা আপনার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। অর্থাৎ

৬৪. 'এবং আমরা আপনার নিকট অকাট্য বিষয় নিয়ে এসেছি আর আমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী[১]।

وَاٰتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

৬৫. 'অতএব আপনি রাতের শেষভাগে আপন পরিবার-পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনি ওদের পিছনে পিছনে চলবেন। আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না দেখে[২] এবং আপনারা সেখানে চলে যাবেন যেখানে (যেতে) আপনাদের আদেশ করা হয়েছে[৩]।'

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝

৬৬. আর আমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে তাঁকে এ বিষয় জানিয়ে দিলাম যে, প্রভাতে উপনীত হওয়া-মাত্রই ওদের নির্মূল করে দেওয়া হবে[৪]।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝

ধ্বংসের আযাব নিয়ে এসেছি, যার সম্পর্কে আপনি এদের হুঁশিয়ার করতেন আর এরা তা অস্বীকার করত।

১. অর্থাৎ আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। (ওদের উপর যে আযাব আসবে) এটা সম্পূর্ণ পাকাপোক্ত ও অটল বিষয়, যাতে মিথ্যার কোন সম্ভাবনা নেই।

২. অর্থাৎ অল্প রাত বাকি থাকতে আপনি নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে লোকালয় থেকে বের হয়ে যাবেন এবং আপনি সকলের পিছনে থাকবেন, যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, কেউ থেকে যায়নি অথবা রাস্তা থেকে ফিরে যায়নি। এতে আপনার অন্তর প্রশান্ত থাকবে এবং আপনি অবিচলিতভাবে আল্লাহর যিকির ও শোকরে মশগুল থেকে সঙ্গীসাথীদের দেখাশোনা করতে পারবেন। অন্যদিকে, আপনি পিছনে থাকার কারণে সকলের অন্তরে আপনার প্রভাব-মিশ্রিত ভয় থাকবে এবং তারা পিছনে ফিরে দেখার সাহস পাবে না। ফলে وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أحد -এ নিষেধাজ্ঞার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এবং তারা বিপদ থেকে রক্ষা পাবে আর আপানাকে নিজেদের অভিভাবক মনে করবে।

৩. অর্থাৎ শামদেশে, অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে, যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে লূৎ আলাইহিস সালামকে আমার অকাট্য সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলাম যে, আযাব মোটেই দূরে নয়। এই তো ভোর হওয়ামাত্রই এ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য এই যে, ভোর হওয়ামাত্রই আযাব শুরু হয়ে যাবে এবং এশরাকের সময় পর্যন্ত সব ব্যাপার সম্পূর্ণ করে দেওয়া হবে। কেননা, অন্য আয়াতে (৭৩নং) مُصْبِحِيْنَ এর স্থলে مُشْرِقِيْنَ শব্দ এসেছে, (যার অর্থ : যখন ওরা এশরাকের সময়ে উপনীত হবে)।

৬৭. আর শহরের লোকেরা উল্লসিত হয়ে আসল[১]। وَجَآءَ اَهۡلُ الۡمَدِيۡنَةِ يَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৮. লূত বললেন, 'এরা তো আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো না[২]। قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ ضَيۡفِىۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِ ﴿۶۸﴾

৬৯. 'এবং আল্লাহকে ভয় কর, আর আমাকে অপদস্থ করো না[৩]।' وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ ﴿۶۹﴾

৭০. ওরা বলল, 'আমরা কি আপনাকে দুনিয়া-শুদ্ধ মানুষকে (আশ্রয় দিতে) নিষেধ করিনি[৪]?' قَالُوۡۤا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۷۰﴾

৭১. তিনি বললেন, তোমরা যদি (আমার কথা-নুযায়ী) কাজ কর, তবে এই যে আমার কন্যারা আছে[৫]।' قَالَ هٰۤؤُلَآءِ بَنٰتِىۡۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَ ﴿۷۱﴾

---

১. অর্থাৎ ওরা যখন শুনল, লূত (আ) এর ওখানে খুব সুন্দর ও সুদর্শন ছেলেরা মেহমান হয়েছে, তখন নিজেদের বদ অভ্যাসহেতু খুব খুশী হল এবং দৌড়ে তাঁর বাড়ি এল এবং দাবি জানাল যে, এদেরকে আমাদের হাওলা কর!

বি. দ্র. وَجَاء أهل المدينة আয়াতের শুরুতে واو অব্যয়টি কেবলই সংযোজন (مطلق جمع) এর জন্য আনা হয়েছে, ঘটনার ধারাবাহিকতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে নয়। সূরা হূদ (আয়াত ৭৮) ও আরাফে (আয়াত ৮৩) এ ঘটনা গত হয়েছে, সেখানে এর ব্যাখ্যা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ, মেহমানের অপমান বস্তুত মেযবানেরই অপমান।

৩. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে এই নির্লজ্জতার কাজ বর্জন কর এবং বিদেশী মেহমানদের কষ্ট দিয়ো না। আখের আমি তো তোমাদেরই মধ্যে থাকি, আমার মান-মর্যাদার প্রতি তোমাদের কিছুটা লক্ষ করা উচিত। মেহমানরা যখন বুঝবে, এ লোকালয়ে একজন মানুষও আমার ইজ্জত করে না এবং আমার কথাও মানে না, তখন আমি তাদের নজরে কতটা হেয় হব?

৪. অর্থাৎ আমরা অপমানিত করি না, আপনি নিজেই অপমানিত হচ্ছেন। আমরা আপনাকে কোন বিদেশী বা অপরিচিত লোককে আশ্রয় দিতে এবং মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে মানা করেছি। এর পরও আপনার কী ঠেকা পড়ল, অযথা এই কিশোরদের নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে নিজে অপমানিত হওয়ার?

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ওরা সর্বদা বিদেশী মুসাফিরদের নিজেদের পাশবিকতার শিকার বানাত এবং হযরত লূৎ আলাইহিস সালাম নিজ সাধ্যানুযায়ী গরীব মুসাফিরদের সহায়তা করতেন আর ঐ দুরাচারদের ঘৃণ্য ক্রিয়াকাণ্ড থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন।

৫. অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই আমাকে অপরিচিত লোকদের সহায়তা করতে বারণ করেছ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের এই বারণ করার উদ্দেশ্য কী? এর কারণ কি শুধু এই নয়

৭২. আপনার প্রাণের কসম, ওরা নিজেদের নেশায় মত্ত, উদভ্রান্ত[১]।

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

৭৩. অতঃপর (একদিন) সূর্যোদয় হওয়ামাত্র ওদের পাকড়াও করল বিকট চিৎকার[২]।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ۝

৭৪. তার পর আমি সেই জনপদকে উলট-পালট করে দিলাম এবং ওদের উপর বর্ষণ করলাম শক্ত মাটির পাথর[৩]।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ۝

যে, আমি তোমাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথে প্রতিবন্ধক? তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ তো, রিপুর চাহিদা পূরণ করার কি বৈধ সুযোগ-সুবিধা নেই যে, এহেন পাশবিক ও নোংড়া পথ অবলম্বন করছ? এই যে তোমাদের স্ত্রীরা (যারা আমার কন্যাতুল্য) তোমাদের ঘরবাড়ীতে রয়েছে। যদি তোমরা আমার কথানুযায়ী আমল কর এবং রিপু চরিতার্থ করার বৈধ ও যুক্তিসংগত পন্থানুযায়ী চল, তবে চাহিদা পূরণ করার জন্য তারাই যথেষ্ট। এটা কেমন সাংঘাতিক কথা যে, হালাল ও নিষ্কলুষ পথ ছেড়ে হারামের কলুষতায় লিপ্ত হচ্ছ!

১. বাহ্যত এমনই মনে হয় যে, لعمرك এ সম্বোধন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অর্থাৎ আপনার প্রাণের শপথ, লূতের কওম গাফলত ও নেশায় মাতাল হয়ে একেবারে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওরা একেবারে নির্ভয়ে হযরত লূতের নসীহত বরং অনুনয়-বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করছিল। ওদের ক্ষমতার বাহাদুরি ছিল, আর প্রবৃত্তির পূজা ওদের মন-মস্তিষ্ককে বিকৃত করে ফেলেছিল। ফলে ওরা বড়ই নিশ্চিন্ততার সাথে আল্লাহর নবীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। ওরা জানত না যে, ভোর পর্যন্ত ওদের কী দশা হবে। বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুহূর্ত মাথার উপর দাঁড়িয়ে! ওরা তো হযরত লূতের সঙ্গে বিদ্রূপ করছিল আর মৃত্যু ওদের দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছিল।

বি. দ্র. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণের চেয়ে বেশি সম্মানিত ও অভিজাত প্রাণ আর সৃষ্টি করেননি। এবং আমি আল্লাহ তাআলাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণের কসম খেতে দেখেনি।

পবিত্র কুরআনে যেসব কসমের উল্লেখ রয়েছে, তা সম্বন্ধে অন্যত্র কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

২. (مُشْرِقِيْنَ)– এ বিষয়ে আমরা একটু পূর্বেই دَابِرَ هٰؤُلَاۤءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করেছি। –ইবনে জুরায়জ (র) বলেন, যেই আযাব দ্বারা কোন কওমকে ধ্বংস করা হয়, তাকে صَيْحَةٌ ও صَاعِقَةٌ বলা হয়।

৩. এর বিশদ আলোচনা সূরা হূদ (আয়াত ৮২-৮৩) ইত্যাদিতে হয়েছে।

৭৫. নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল-দের জন্য[১]। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝

৭৬. আর সেই জনপদটি এমন পথের উপর অবস্থিত, যা (আজও) বিদ্যমান[২]। وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝

৭৭. অবশ্যই এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে[৩]। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

৭৮. নিশ্চয় বনের বাসিন্দারা ছিল অপরাধী[৪]। وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝

---

১. مُتَوَسِّمْ আসলে সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি বাহ্যিক লক্ষনাদি ও আলামত দেখেই স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কোন গোপন বিষয়ের সন্ধান লাভ করতে পারেন। হাদীসে আছে- اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ('মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহ্‌প্রদত্ত আলো দিয়ে দেখে।') কোন কোন রেওয়ায়াতে بنور الله এর সঙ্গে وبتوفيق الله এরও উল্লেখ আছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩১২৬; তাফসীরে তবারী ১৪/৯৬) অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌প্রদত্ত তাওফীকের আলোকে দেখে থাকে। আমীর আবদুর রহমান খান মরহুমের মতে 'কাশফ' ও 'ফেরাসাত'-এর মধ্যে ততটুকু পার্থক্যই থেকে থাকবে, যতটুকু টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মধ্যে রয়েছে।

যা হোক, আয়াতের অর্থ এই যে, গভীর পর্যবেক্ষনকারী ও চিন্তাশীলদের জন্য লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনীর মধ্যে শিক্ষার বহু উপাদান রয়েছে। এর দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতার পরিণাম কীরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহর অপার কুদরতের সামনে মানুষের শক্তি-ক্ষমতা কিছুই নয়। তাঁর 'লাঠি'তে আওয়াজ নেই। সুতরাং তাঁর দেওয়া অবকাশ পেয়ে মানুষের গর্বিত হওয়া উচিত নয়, এবং নবীদের সঙ্গে হঠকারিতা ও শত্রুতা করা সমীচীন নয়। নতুবা পরিণাম এমনই হবে।

২. মক্কা থেকে শামদেশে যাওয়ার পথে উক্ত উলটিয়ে দেওয়া বসতির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে।

৩. অর্থাৎ এসব ধ্বংসাবশেষ দেখে বিশেষ করে মুমিনদের শিক্ষা লাভ হয়। কারণ, তারাই বুঝতে পারে যে, উক্ত কওমের অসৎকর্ম ও অবাধ্যতারই শাস্তিরূপে ওদের বসতিগুলো উলটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুমিনদের ছাড়া অন্য লোকেরা তো এসব (ধ্বংসাবশেষ)-কে শুধু দুর্ঘটনা ও ঘটনাচক্র অথবা স্বাভাবিক কার্যকারণের ফলাফল গণ্য করবে।

৪. বনের বাসিন্দারা বলে শুআয়ব (আ)-এর জাতি উদ্দেশ্য। তারা 'মাদয়ান' শহরে বাস করত। আর মাদ্‌য়ানের নিকট গাছ-বৃক্ষের বন ছিল। সেখানেও কিছু লোক বাস করত। কেউ কেউ বলেন, أصحاب أيكة এবং أصحاب مدين দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়। হযরত শুআ'য়ব (আ) উভয় কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এরা শিরক, মূর্তিপূজা, ডাকাতি ও মাপে-ওজনে প্রতারণাসহ নানা পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ইতিপূর্বে সূরা হূদ ও আরাফে এদের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে- তা দ্রষ্টব্য।

৭৯. সুতরাং আমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর উক্ত উভয় জনপদ উন্মুক্ত পথের উপরে অবস্থিত[১]।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۹﴾

[রুকূ - ৬]

৮০. নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারাও রাসূলদের অস্বীকার করেছিল[২]।	وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۰﴾
৮১. আর আমি ওদের আপন নিদর্শনাদি দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল[৩]।	وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۸۱﴾
৮২. ওরা নির্ভয়ে পাহাড় কেটে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করত[৪]।	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿۸۲﴾
৮৩. অতঃপর প্রভাতকালে ওদের পাকড়াও করল বিকট শব্দ।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿۸۳﴾
৮৪. তখন, ওরা যা কিছু কামাই করেছিল তা ওদের কোন উপকারে আসল না[৫]।	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۴﴾

১. অর্থাৎ হিজায থেকে শামে যাওয়ার যে পথের উপর লূত (আ) এর সম্প্রদায়ের বসতি ছিল, তারই কিছু নিম্নভাগে ছিল শুআয়ব-সম্প্রদায়ের বাসস্থান। এই উভয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পথচারীদের দৃষ্টিগোচর হয়।

২. 'হিজরের বাসিন্দা' বলে 'ছামূদ' জাতিকে বোঝানো হয়েছে। এদের দেশের নাম ছিল 'হিজর'। এদের প্রতি হযরত সালেহ (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। আর এক নবীকে অবিশ্বাস করা বস্তুত সকল নবীকেই অবিশ্বাস করার নামান্তর। এজন্যই বলা হয়েছে– ওরা রাসূলদের অস্বীকার করেছিল।

৩. অর্থাৎ এমন এক উটনী দান করেছিলাম, যাকে পাথর থেকে বের করা হয়েছিল। এবং এ ছাড়া অপরাপর অলৌকিক বিষয়ও দান করা হয়েছিল।

৪. অর্থাৎ পার্থিব জীবনের ধোঁকায় পড়ে শক্তিমত্তা ও অহংকারের প্রদর্শনীরূপে পাহাড়-পর্বত কেটে বিরাট বিরাট বাসস্থান বানাত। তাতে মনে হত, যেন এখান থেকে আর যেতে হবে না। তারা হয়ত এমনও ভাবত যে, এরূপ মজবুত ও পরিপক্ক এমারতসমূহে কী করে বিপদাপদ আসতে পারে?

৫. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সুদৃঢ় এমারত, শারীরিক শক্তি এবং অপরাপর উপায়-উপকরণ– কোন কিছুই আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করতে পারেনি।

৮৫. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তা যথাযথ কারণেই সৃষ্টি করেছি। আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে। সুতরাং আপনি (ওদের) এড়িয়ে যান উত্তমরূপে[১]।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

৮৬. নিশ্চয় আপনার রব– তিনিই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ[২]।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

এদের কাহিনীও পূর্বে গত হয়েছে। হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের জেহাদে 'হিজর উপত্যকা' দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মাথা ঢেকে নিলেন, বাহনের গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির বস্তিসমূহের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাক। (কান্না না এলে কাঁদার ভাব ধর।) আল্লাহ না করুন, ওদের উপর যা পতিত হয়েছিল, না জানি তোমাদের উপর তা পতিত হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৯৮০)

এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদব শিক্ষা দিলেন যে, এ ধরনের স্থানে যাওয়া হলে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত, একে নিছক আনন্দ-বিহার বানাবে না।

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনা শুনিয়ে এখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, এ বিশ্ব এমনিই উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে নেই। এর পিছনে একজন নিয়ন্তা রয়েছেন, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের ব্যবস্থাপন করে থাকেন। সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ ব্যবস্থাপনের নামই কিয়ামত।'

আর আয়াতে কাফেরদেরকে এড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাবলীগের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছেন, এরপরও কাফেররা আপন বিরোধিতায় অটল আছে। তাই বলা হচ্ছে, বেশি বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এখন আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকুন। এবং ওদের দেওয়া দুঃখ-কষ্টের জন্য সবর করুন, যতক্ষণ না আল্লাহর মীমাংসা এসে পৌঁছে।

২. অর্থাৎ আপনাকে ওদের কষ্টপ্রদান ও আপনার ধৈর্যধারণ সম্বন্ধে যিনি সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দান করবেন।

এই আয়াতে ইশারা-ইঙ্গিতে পুনরুত্থানের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যিনি একবার পয়দা করেছেন, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। আর যার শরীরের বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রত্যেক অংশেরই খবর তিনি রাখেন– যেখানেই থাকুক তিনি যথাসময়ে সবগুলিকে একত্র করে দেবেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿۸۷﴾

৮৭. আমি তো আপনাকে এমন সাতটি আয়াত দান করেছি, যা বারবার পড়া হয় এবং (দান করেছি) মহামর্যাদাশালী কুরআন[১]।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮. আপনি মোটেই সেসব জিনিসের প্রতি নিজের চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না, যা আমি কাফেরদের বিভিন্ন দলকে ভোগ করতে

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

(যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই! তিনিই তো প্রকৃত স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তার রীতি এই যে, তিনি তাকে বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায় –সূরা ইয়াসীন, ৮১)

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ আপনাকে যে কতবড় নে'য়ামত দান করা হয়েছে তা লক্ষ করুন, কাফেরদের হঠকারিতার জন্য রাগ হবেন না।'

বি. দ্র. سبع مثاني বলতে কী বোঝানো হয়েছে তাতে মতভেদ আছে। সহীহ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কথা এই যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতেহার সাতটি আয়াত, যেগুলি প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাকাতে পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে এবং যেগুলি ওযীফারূপে বারবার পড়া হয়। হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা তাওরাত, ইনজীল, যাবুর, কুরআন– কোন কিতাবেই এর কোন সদৃশ নাযিল করেননি। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০৯২) তাছাড়া সহীহ হাদীসসমূহে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা সম্বন্ধে বলেছেন, এটাই سبع مثاني এবং قرآن عظيم , যা আমাকে দান করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৪৭৪)

এই ছোট সূরাটিকে قرآن عظيم (মহান কুরআন) বলা হয়েছে মর্যাদার দিক থেকে। আর একে ام القرآن বলারও কারণ এই যে, এ যেন একটি সারসংক্ষেপ ও মূলপাঠ; এবং সমগ্র কুরআন এর ব্যাখ্যা ও তাফসীর। কুরআনের জ্ঞানরাশি ও তার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত নকশা এই এক সূরার মধ্যেই বর্তমান।

অবশ্য مثاني শব্দটি কোন কোন দিক থেকে সমগ্র কুরআনের উপরও প্রযোজ্য হয়েছে- اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী, অর্থাৎ এই কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, যার বিভিন্ন বিষয় পুনরাবৃত্ত, তা শ্রবণ করে যারা তাদের রবকে ভয় করে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় –সূরা যুমার, আয়াত ২৩)। আর বিভিন্ন কারণে অন্য সূরাগুলিকেও مثاني বলার অবকাশ আছে। কিন্তু এস্থলে سبع مثاني এবং قرآن عظيم বলে সূরা ফাতেহাই উদ্দেশ্য।

দিয়েছি[১] এবং ওদের জন্য দুঃখ করবেন না। আর স্বীয় ডানা অবনত করুন ঈমানদারদের জন্য[২]। وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

৮৯. আর বলে দিন, 'আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী[৩]।' وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝٨٩

৯০. (আপনার প্রতি কুরআনের অবতারণ এমন), যেমন আমি (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি বিভক্তকারীদের প্রতি– كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝٩٠

৯১. যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে[৪]। الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝٩١

---

১. অর্থাৎ মুশরিক, ইহুদী ও খ্রিস্টান এবং আল্লাহ ও রাসূলের অপরাপর দুশমনকে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের যেসব উপকরণ তিনি দিয়েছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং ভাববেন না যে, এ অভিশপ্তদের এহেন উপকরণ কেন দেওয়া হল, যার ফলে এদের দুষ্কর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে? অথচ এ সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসে গেলে সৎপথে ব্যয়িত হত। –এমন চিন্তা না করে এদের বরং স্বল্প সময়ের জন্য আনন্দ ভোগ করে নিতে দিন। আপনাকে আল্লাহ তাআলা সেই কুরআনের দৌলত দান করেছেন, যার সামনে সমস্ত দৌলতই তুচ্ছ। হাদীসে আছে, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন দান করেছেন, এ সত্ত্বেও সে যদি কারো কোনো নে'য়ামত দেখে তা কামনা করে, তবে বুঝতে হবে যে, সে কুরআনের মূল্যায়ন করতে পারেনি। (তারীখে কাবীর, বুখারী, হাদীস : ৩৯২৩—এর সনদ দুর্বল)

২. আপনি এ কথা ভেবে দুঃখিত হবেন না যে, কাফেররা মুসলমান হয় না কেন? আপনি তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করতে থাকুন, অবাধ্যদের নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। মুসলমানরাই আপনার স্নেহ-মহব্বত ও সমবেদনার অধিকারী– তাদের সঙ্গে নম্রতা, ভদ্রতা, স্নেহ ও বিনয়ের ব্যবহার করুন।

৩. অর্থাৎ কেউ মানুক বা না মানুক, আমি আল্লাহর বিধান সুস্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দিচ্ছি এবং অবিশ্বাস ও পাপাচারের পরিণাম সম্বন্ধে খুব ভালভাবে জানিয়ে দিচ্ছি। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মন ঘুরিয়ে দেওয়া আপনার কাজ নয়– এ একমাত্র আল্লাহর দ্বারা হতে পারে। কেউ ঈমান না আনলে আপনি দুঃখিত হবেন না।'

৪. এই আয়াতের অর্থ কয়েকভাবে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, مُقْتَسِمِيْنَ (বিভক্তকারীদের) বলতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদী ও নাসারারা উদ্দেশ্য, যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রেখেছিল। অর্থাৎ কুরআনের যে বিষয় ওদের বিশ্বাস অথবা ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনার অনুকূল হত, তা মেনে নিত; আর যা এমন হত না তা মানত না। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আপনাকে سبع مثاني ও قرآن عظيم

৯২. অতএব আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই ওদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব–	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. ওরা যা কিছু করত সে সম্বন্ধে[১]।	عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

দিয়ে পাঠিয়েছি, যেরূপ ওদের প্রতিও ইতিপূর্বে কিতাব নাযিল করেছিলাম। সুতরাং আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা অথবা ওহী পাঠানো কোন অভিনব বিষয় নয় যে, তা অস্বীকার করতে হবে।

কোন কোন মুফাসসির مُقْتَسِمِيْنَ দ্বারা তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরই উদ্দেশ্য করেছেন, তবে তাদের মতে 'কুরআন' শব্দ দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ওরা নিজেদের কিতাব বিকৃত করে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে।

কেউ কেউ বলেন, مُقْتَسِمِيْنَ দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য, যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত কুরআনের ভাগ-বণ্টন করত। যেমন, যখন সূরাসমূহের নাম শুনত, তখন উপহাস করে পরস্পরে বলাবলি করত, 'বাকারা' বা 'মায়েদা' আমি নেব, আর 'আনকাবূত' তোমাকে দেব। তাছাড়া ওরা কুরআন সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ধারণাগত বিভক্তিতেও লিপ্ত হয়েছিল। কেউ কুরআনকে কাব্য বলত, কেউ ভাগ্য গণনার বিষয় বলত, কেউ যাদু বলত, কেউ বলত পাগলের প্রলাপ, কেউ বা পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলত। এই মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে– আমি (অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবাইকে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেমন আযাব এই বিদ্রূপকারী মুশরিকদের উপর অবশ্যই অবতীর্ণ হবে।

উল্লেখ্য, (এ ক্ষেত্রে أنزلنا এর مفعول হচ্ছে 'আযাব')। এটা যেহেতু অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন ছিল, তাই একে 'অতীতের' বিষয় ধরে নিয়ে 'অতীত'বাচক ক্রিয়া أنزلنا ব্যবহার করা হয়েছে। (যা হোক, এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে– যেমন আমি অবশ্যই আযাব নাযিল করব বিভক্তকারীদের উপর...)।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর (র) مقتسمين শব্দের অর্থ করেছেন 'শপথকারীগণ', অর্থাৎ পূর্ববর্তী সেইসব জাতি, যারা নবীদের অস্বীকার ও তাদের বিরুদ্ধাচরণের অঙ্গীকার করেছিল, যারা মিথ্যা বিষয়াদিতে শপথ করত এবং আসমানী কিতাবসমূহ টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। বলা হচ্ছে যে, এদের উপর আমি (আল্লাহ) যেরূপ আযাব অবতীর্ণ করেছিলাম, সেরূপ আযাব সম্বন্ধেই এই 'সুস্পষ্ট সতর্ককারী' তোমাদের সতর্ক করছেন।

مقتسمين এর এ অর্থের সমর্থনে ইবনে কাছীর (র) নিম্ন আয়াতগুলি পেশ করেছেন- تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَأَهْلَهٗ (–সূরা নামল, আয়াত ৪৯) وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ (–সূরা নাহল, আয়াত ৩৮) أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (–সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪৪) أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ (–সূরা আ'রাফ, আয়াত ৪৯)

১. অর্থাৎ (জিজ্ঞাসা করব যে,) তোমরা কার ইবাদত করেছিলে? নবীদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলে? لا إله إلا الله কলেমা মাননি কেন? এ কলেমার হক কেন আদায় করনি? এসব এবং এই ধরনের না জানি আরো কত প্রশ্ন করা হবে।

৯৪. অতএব আপনাকে যে আদেশ করা হয়, আপনি তা প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন এবং মুশরিকদের অগ্রাহ্য করুন[১]।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾
৯৫. আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট বিদ্রূপ-কারীদের বিরুদ্ধে[২]–	اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾
৯৬. যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য মা'বূদ স্থির করে। সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে[৩]।	الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. নিশ্চয় আমি জানি যে, ওদের কথাবার্তায় আপনার অন্তর সংকুচিত হয়।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. অতএব আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজদাকারী-দের অন্তর্ভুক্ত হোন[৪]।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾

১. অর্থাৎ বাতলানোর মধ্যে ত্রুটি করবেন না, সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিন। এ মুশরিকরা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমি সকল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীর সাথে বোঝাপড়া করে নেব। আপনি নির্ভয় ও নিশ্চিন্তে তাবলীগ করতে থাকুন– আপনার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

৩. অর্থাৎ রাসূলের সঙ্গে উপহাস করা ও আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা– এ উভয় কাজের পরিণাম এরা দেখে নেবে।

৪. অর্থাৎ ওদের বিরোধিতা ও হটকারিতার কারণে আপনার মন যদি ভারাক্রান্ত হয়, তবে ওদের থেকে দৃষ্টি হটিয়ে মনেপ্রাণে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদে (অর্থাৎ পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনায়) মশগুল থাকুন। আল্লাহর যিকির, নামায, সেজদা, তাঁর ইবাদত– এমন জিনিস, যার তাছীরে (প্রভাবে) অন্তর প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত থাকে এবং চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– যখনই কোন গুরুতর দুর্ভাবনার বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তিনি নামাযের প্রতি ধাবিত হতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৩১৩)

৯৯. আর স্বীয় রবের ইবাদত করতে থাকুন- আপনার নিকট নিশ্চিত বিষয় আসা পর্যন্ত[১]।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝

১. নিশ্চিত বিষয় দ্বারা এস্থলে মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। يقين শব্দটি কুরআনের অন্যত্র এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যথা- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ (আমরা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করতাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছল অকাট্য বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু)। –সূরা মুদ্দাচ্ছের, আয়াত : ৪৭)।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক মৃতের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجوله الخير ('তার কাছে তো নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ মৃত্যু এসে গেছে। আর আমি তার জন্য অবশ্যই মঙ্গলের আশা করি।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৪৩)

অধিকাংশ সালাফই এই আয়াতের মধ্যে يقين শব্দটি মৃত্যুর অর্থেই নিয়েছেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাক। কবির ভাষায়-

اندریں رہ می تراش ومی خراش ÷ تادم آخر دمے فارغ مباش

(আল্লাহর পথে নিজের নফসের ঘষা-মাঝা (অর্থাৎ এসলাহ) করতে থাক। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হয়ো না।')

কতক আরেফগণ যে এস্থলে يقين কে অন্তরের অবস্থাবিশেষের অর্থে নিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা বিখ্যাত তাফসীর روح المعاني গ্রন্থে রয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

সূরা নাহ্‌ল

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১৬ । ১২৮ আয়াত । ১৬ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ١٢٨، رُكُوْعَاتُهَا ١٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

১. আল্লাহর আদেশ এসে গেছে, সুতরাং তোমরা তার জন্য তাড়াহুড়া করো না[১]। ওরা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে[২]।

---

১. অর্থাৎ পয়গম্বর আলাইহিস সালামের জামাত যে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং সত্যের বিরোধীরা পরাজিত ও অপমানিত হবে– আল্লাহর এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের সময় হয়ে গেছে। কাফেররা দুনিয়ায় মুসলমান মুজাহিদদের হাতে এবং আখেরাতে সরাসরি আহকামুল হাকেমীনের দরবারে শিরক ও কুফরের শাস্তি ভোগ করবে। আর কিয়ামত-মুহূর্তও দূরে নয়। যে বিষয়ের আগমন নিশ্চিত, তা এসে গেছে বলে মনে করা উচিত। সুতরাং তাড়াহুড়া করার কী প্রয়োজন?

কাফেররা অস্বীকার ও উপহাস করে বলত, যে আযাব বা কিয়ামতের আগমনের ওয়াদা আপনি করছেন, তা শীঘ্র কেন আসে না? উত্তরে ওদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, তোমাদের এরূপ বলার কারণে তা টলে যাওয়ার নয়, বরং তা শীঘ্র আসবেই আসবে। আসতে যতটুকু দেরি হচ্ছে, তা তোমাদের জন্য এক হিসাবে কল্যাণকর– হয়ত ইত্যবসরে অনেকের তওবা ও সংশোধনের তাওফীক হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গেই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ (ওরা আপনার নিকট আযাব তাড়াতাড়ি চায়। যদি এক নির্ধারিত সময় না থাকত, তবে অবশ্যই ওদের উপর আযাব এসে যেত। –সূরা আনকাবূত, আয়াত ৫৩)। আরো ইরশাদ হয়েছে : يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ (কিয়ামতের ব্যাপারে তারাই তাড়াহুড়া করে, যারা তাতে ঈমান রাখে না, আর যারা তাতে ঈমান রাখে তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে যে, তা সত্য। –সূরা শূরা, আয়াত ১৮)

২. অর্থাৎ সত্যের বিজয়ী হওয়া এবং কুফর ও শিরকের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া যেহেতু সুনিশ্চিত, সুতরাং তোমরা তাওহীদের পথ অবলম্বন কর এবং শিরেকী রীতি-নীতি ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। মনে রেখো, তোমরা যাদের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ তাদের কেউই আল্লাহর হুকুম টলাতে পারবে না এবং তাঁর আযাবকে প্রতিহতও করতে পারবে না।

২. তিনি স্বীয় হুকুমে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা[১] 'রূহ' (অর্থাৎ ওহী) সহ[২] ফেরেশতাদের[৩] অবতীর্ণ করেন– এই মর্মে যে, তোমরা (হে রাসূলগণ!) সতর্ক করে দাও– আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব আমাকে ভয় কর[৪]।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ⓶

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে* সৃষ্টি করেছেন। ওরা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে[৫]।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⓷

---

১. সে সকল বান্দা হচ্ছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, যাঁদের আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত অনুযায়ী সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে বেছে নেন। যেমন, বলা হয়েছে- اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (আল্লাহই সেই স্থান ভাল জানেন, যেখানে তিনি নিজ পয়গাম পাঠাবেন। –সূরা আন'আম, আয়াত ১২৪)। এবং – اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। –সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৫)

২. এখানে روح দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর ওহী, যা আল্লাহর তরফ থেকে পয়গম্বরদের নিকট অদৃশ্যভাবে আসে। অন্যত্র বলা হয়েছে- يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে 'রূহ' (ওহী) অবতীর্ণ করেন। –সূরা মুমিন, আয়াত ১৫) আরেক স্থানে কুরআন সম্বন্ধে বলা হয়েছে- وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا (আর এভাবেই আমি আমার নির্দেশে আপনার প্রতি রূহ (তথা কুরআন) পাঠিয়েছি। –সূরা শূরা, আয়াত ৫২)

কুরআন বা খোদায়ী ওহীকে روح শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, জড় দেহে যেমন রূহের আগমনে বাহ্যিক জীবন সঞ্চার হয়, তদ্রূপ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার রোগে মৃত আত্মারা আল্লাহর ওহীর রূহ লাভ করে জীবিত হয়ে ওঠে।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতা জাতির মধ্য থেকে কাউ কাউকে– যেমন: হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে; বা ওহী-সংরক্ষক ফেরেশতাদেরকে, যাদের দিকে এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে- فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (–সূরা জিন, আয়াত ২৭)

৪. অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা, শিরকের খণ্ডন এবং তাক্ওয়ার প্রতি আহ্বান– এগুলি আদিকাল থেকেই সমগ্র নবীকুলের সর্ববাদী ও সর্বসম্মত মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এ তো হল তাওহীদের সমর্থনে বর্ণনাগত (نقلي) দলীল (বা ধর্মীয় প্রমাণ)। সামনে যুক্তিগত দলিলাদি বর্ণিত হচ্ছে।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'যথার্থ উদ্দেশ্যে'।

৫. অর্থাৎ যমীন ও আসমানের ব্যবস্থাপনা এমন সুষ্ঠু ও পরিপক্ক করেছেন, যা দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে হয় যে, নিখিল বিশ্বের কর্তৃত্ব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একক মহাশক্তিধরের

৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু শুক্র থেকে। আর অমনি সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হয়ে গেছে[১]!

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ④

হাতে রয়েছে। যদি এর নিয়ন্ত্রণ স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী একাধিক স্রষ্টার হাতে থাকত, তবে এ সুদৃঢ় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা এতকাল ধরে কিছুতেই কায়েম থাকত না, অবশ্যই তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেত, বরং একাধিক স্বাধীন স্রষ্টার পরস্পর টানাটানির ফলে উক্ত ব্যবস্থাপনা আদৌ অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আরো মাবূদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২২)। এবং – إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (এমন হলে প্রত্যেক কর্তৃত্বধারী ইলাহ তার সৃষ্টি নিয়ে (পৃথক হয়ে) যেত এবং একে অন্যের উপর আক্রমণ করত। –সূরা মুমিন, আয়াত ৯১)

১. অর্থাৎ ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমরা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর কারিগরি ও শক্তিমত্তার পরিচয় লাভ করতে পারবে।

তোমাদের মূল কী ছিল? একটি নিষ্প্রাণ ফোঁটামাত্র– যার মধ্যে না ছিল অনুভূতি ও স্পন্দন, না ছিল ইচ্ছা ও বোধশক্তি। তার বাকশক্তিও ছিল না এবং কোন বিষয়ে বিতর্ক করে নিজ দাবি প্রতিষ্ঠা করার বা অন্যদের উপর বিজয়ী হওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। এখন দেখ, আল্লাহ তাআলা এ তুচ্ছ ফোঁটাটিকে কী থেকে কী করে দিলেন– কী সুন্দর আকৃতি দান করলেন এবং কত কী উচ্চমানের শক্তি-সামর্থ্য ও উৎকৃষ্ট গুণাবলির দ্বারা তাকে ধন্য করলেন। যে একটি শব্দও বলতে পারত না, সে এখন কী রূপ বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। যার মধ্যে সামান্য অনুভূতি ও চলনশক্তি ছিল না, এখন কথায় কথায় কী রূপ ঝগড়া ও বিতর্ক করা শুরু করেছে। এমনকি, মানুষ কখনো কখনো সৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে স্বয়ং স্রষ্টার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। এও ভুলে যায় যে, আমার মূল কী ছিল এবং কী করে আমার শক্তি সামর্থ্য হাসিল হল। সূরা ইয়াসীনে (আয়াত ৭৭-৭৯) ইরশাদ হয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

(মানুষ কি লক্ষ করে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অমনি সে হয়ে উঠল প্রকাশ্য বাকবিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্পর্কে এক উপমা তৈরি করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে,'কে হাড়গুলিতে জীবন দান করবে, সেগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও? আপনি বলুন, সেগুলিতে তিনি জীবন দান করবেন, যিনি তাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সব রকম সৃষ্টি করতে জানেন।)

৫. এবং তিনি গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য আছে শীতবস্ত্রের (উপাদান) ও আরো বহু উপকার। আর কতক পশু তোমরা আহার কর[*১]।

وَالۡاَنۡعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمۡ فِيۡهَا دِفۡءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۵﴾

৬. এবং তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য– যখন তোমরা সন্ধ্যায় (তাদের) চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং যখন সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও[২]।

وَلَكُمۡ فِيۡهَا جَمَالٌ حِيۡنَ تُرِيۡحُوۡنَ وَحِيۡنَ تَسۡرَحُوۡنَ ﴿۶﴾

৭. আর তারা তোমাদের বোঝা এমন শহরে বয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব অতি দয়ালু, পরম করুণাময়[৩]।

وَتَحۡمِلُ اَثۡقَالَكُمۡ اِلٰى بَلَدٍ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا بٰلِغِيۡهِ اِلَّا بِشِقِّ الۡاَنۡفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۷﴾

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তা থেকে তোমরা আহার কর'।

১. অর্থাৎ তোমাদের জন্য তিনি উট, গরু, ভেড়া, ছাগল সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কোন কোনটার লোম, পশম ইত্যাদি দ্বারা কম্বল, পশমী বস্ত্র, ডেরা, তাঁবু ও শীত নিবারণের বিভিন্ন রকম পোশাক তৈরি করা হয়। তা ছাড়া কোনটার দুধ পান করা হয়, কোনটার দ্বারা হাল চালানো হয়। তদুপরি এসব জন্তুর বদৌলতেই ঘি, মাখন, ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এদের চামড়া দ্বারা কত রকম উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। যেসব জন্তুর গোশত খাওয়ায় কোনো রকম দৈহিক বা চারিত্রিক ক্ষতি নেই, তাদের গোশত খাওয়া হয়। তা দ্বারা কত গরীব লোকদের পেটপূর্তি হয়ে থাকে। এছাড়া আরো বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যা আমরা খেয়ে থাকি, সেসবের তৈরিতেও এসব জন্তুর অনেক ভূমিকা রয়েছে।

২. গৃহপালিত জন্তুগুলি যখন গোয়াল ঘরে বাঁধা অবস্থায় বা ঝোপ-জঙ্গলে দৃষ্টির বাইরে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলার নে'য়ামতরাশির তেমন প্রকাশ ঘটে না। তবে যখন চরার জন্য ওরা ঘর থেকে বের হয় অথবা সন্ধ্যা বেলায় পেট ভরে মাঠ-জঙ্গল থেকে ঘরবাড়ীর দিকে ফিরে আসে, তখন এক আজীব সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। তা দেখে মালিক নিজেও আনন্দিত হয় এবং অন্য লোকেরাও বলতে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা অমুককে কত ধন-সম্পদ দান করেছেন!

৩. অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে মালপত্র ছাড়াই যেখানে যাওয়া দুষ্কর ছিল, এই জন্তুগুলি তোমাদের ও তোমাদের ভারী আসবাবপত্র সেখানে বয়ে নিয়ে যায়। এ আল্লাহর কত বড় দয়া ও মায়া যে, তিনি এসব জন্তুকে তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং এদের দ্বারা কাজ নেওয়ার অনুমতি দান করেছেন। অতি কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ এ জন্তুগুলির দ্বারা আসান করে দিয়েছেন-

৮. এবং (সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যাতে তোমরা তাতে আরোহণ কর এবং সৌন্দর্যের জন্য[১]। আর তিনি (আরো) এমনসব জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না[২]।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৯. আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে সরল পথ*, আর কিছু পথ বাঁকাও আছে[৩]। আর তিনি যদি ইচ্ছা

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

(ওরা কি দেখে না যে, আমি আমার হাতের সৃষ্ট বস্তুরাজির মধ্যে তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই সেগুলির মালিক? এবং আমি সেগুলিকে বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে সেগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। আর তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আছে (আরো) বহু উপকারিতা ও পান করার ঘাট (ওলান)। তবুও কেন তারা শোকর করে না। –সূরা য়া-সীন, আয়াত ৭১-৭৩)

১. অর্থাৎ তাতে তোমরা আরোহণ কর এবং তাতে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

বি. দ্র. আরবদেশে গাধার উপর আরোহণকে দূষণীয় মনে করা হয় না। সেখানকার গাধা খুব দামী, সুন্দর ও দ্রুতগামী হয়ে থাকে। কোন কোন গাধার সামনে ঘোড়াও হার মানে। একজন হিন্দীভাষী রসিক সাহিত্যিক খুব সুন্দর বলেছেন, আরবে 'গাধা' নয় বরং 'হেমার' পাওয়া যায়।

(অর্থাৎ আরবী ভাষায় 'গাধা' নামের কোনো পশুর অস্তিত্ব নেই, আছে 'হেমার' নামের পশু। তাই এই হিন্দীভাষী সাহিত্যিকের রসিকতা চমৎকার হয়েছে যে, আরবে 'গাধা' পাওয়া যায় না, বরং 'হেমার' পাওয়া যায়। –অনুবাদক)

২. অর্থাৎ উল্লিখিত জীবজন্তু ছাড়াও তোমাদের উপকারের জন্য আল্লাহ তাআলা এমনসব জিনিস সৃষ্টি করতে থাকেন ও করতে থাকবেন, বর্তমানে যেসবের ধারণাও তোমরা করতে পার না। এর মধ্যে সেসব যানবাহনও শামিল রয়েছে, যেগুলি কিয়ামতকাল পর্যন্ত উদ্ভাবিত হতে থাকবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আল্লাহরই কাজ সরল পথ বাতলানো'।

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

প্রথমে বলা হয়েছে যে, তোমরা জীবজন্তুর উপর আরোহণ করে থাক এবং তারা তোমাদেরকে ও তোমাদের মালামাল ও আসবাবপত্র দূরদূরান্তের কঠিন পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এ ছিল দৈহিক ও পার্থিব সফরের অবস্থা। প্রসঙ্গত এখন রূহানী ও আধ্যাত্মিক সফর ও ভ্রমণের আলোচনা করা হচ্ছে।

وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

করেন, তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করতে পারেন[১]।

[রুকূ - ২]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ۝

১০. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন। তা থেকে তোমরা পান কর এবং তার দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চরাও[২]।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۝

১১. তিনি তার দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সব ধরনের ফল। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে[৩]।

আয়াতের মর্ম

অর্থাৎ তোমরা যেমন পার্থিব পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে থাক, ঠিক তেমনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সোজা পথও উন্মুক্ত রয়েছে। যার সমঝ্-বুঝ সঠিক হবে, সে উল্লিখিত দলীল-প্রমান ও নিদর্শনাবলিতে গভীরভাবে চিন্তা করে আল্লাহ তাআলার কুদরত, মহিমা ও পরাক্রমের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাওহীদ ও তাক্ওয়ার সরল পথে চলে নির্বিঘ্নে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু যার বুঝ-বুদ্ধি সরল-সঠিক নয়, তার পক্ষে সরল পথে চলার তাওফীক কী করে হবে? সে তো স্বীয় কামনা-বাসনা ও ধ্যান-ধারণার চক্করে পড়ে সর্বদা দিশাহারা থাকবে- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (এ আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, তা হলে সেগুলি তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। –সূরা আন'আম, আয়াত ১৫৩)

১. অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াবাসীকে একই পথে পরিচালিত করতে আল্লাহ তাআলা মোটেই অক্ষম নন। কিন্তু সকলকে একই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর হেকমতের পরিপন্থী। ইতিপূর্বে বহু স্থানে আমরা এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

২. অর্থাৎ পানিকে পান করার যোগ্য বানিয়েছেন এবং পানির দ্বারা গাছপালা, তৃণলতা ইত্যাদি উদ্ভিদ উদ্গাত করেন, যার মধ্যে তোমাদের জীবজন্তু চরানো হয়।

৩. অর্থাৎ একই পানি দ্বারা বিভিন্ন রকম ফসল ও ফলমূল উৎপন্ন করতে থাকেন, যেগুলির আকার-আকৃতি, রং, গন্ধ, স্বাদ ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। যারা গভীরভাবে চিন্তা-

১২. আর তিনি তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। আর তারকারাজিও তাঁর হুকুমে (তোমাদের কাজে) নিয়োজিত আছে[১]। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩. এবং (তোমাদের কাজে নিয়োজিত) সেই সব রঙ-বেরঙ জিনিসও, যা তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন[২]। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি দরিয়াকে (তোমাদের) কাজে নিয়োজিত করেছেন,

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا

ভাবনা করে, তাদের জন্য এতে আল্লাহর মহাশক্তি ও বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের বিরাট নিদর্শন রয়েছে। কেননা, একই মাটি, একই বায়ু, একই সূর্যতাপ ও একই পানি থেকে কত রং-বেরং ফুলফল পয়দা করে থাকেন।

১. দিন ও রাত অবিরাম একটি অপরটির পিছনে পিছনে চলে আসে, যাতে দুনিয়ার ক্রিয়াকর্ম চলতে থাকে এবং মানুষ আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপ, চন্দ্র ও সূর্য একটি নির্ধারিত ব্যবস্থাপনার অধীনে উদয় হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে।

রাতদিনের গমনাগমন ও চন্দ্রসূর্যের উদয়-অস্তের সাথে মানুষের অফুরন্ত উপকারিতা জড়িত রয়েছে। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, এসব ছাড়া মানুষের জীবনই অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা নিজের সীমাহীন কর্তৃত্ববলে চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত তারকা-নক্ষত্রকে মমুলি চাকর-বাকরের ন্যায় আমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।

উল্লেখ্য যে, দিনরাত ও চাঁদসুরুজের সাথে আমাদের স্বার্থ-উপকারিতার সম্পর্ক যেরূপ সুস্পষ্ট, তারকারাজির সাথে সে রকম স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এ কারণেই তারকা-নক্ষত্রের কথা পৃথকভাবে, ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ যে মহান সত্তা আসমানী বস্তুরাজিকে তোমাদের কাজকামে নিয়োজিত করেছেন, তিনিই তোমাদের উপকারের জন্য যমীনের বুকে বিভিন্ন রকমের বস্তু পয়দা করেছেন, যেগুলি প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, রং, গন্ধ, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যে একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা বাহুল্য, এতে সকল জীব, উদ্ভিদ, জড়বস্তু এবং মিশ্র ও অবিমিশ্র পদার্থ সবই শামিল হয়ে গেল। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ১২২৫৩; জামে তিরমিযী, বর্ণনা ৩৩৬৯)

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾	যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত খেতে পার এবং তা থেকে আহরণ করতে পার অলঙ্কার, যা তোমরা পর। আর তুমি নৌযানগুলিকে দেখ, দরিয়ায় পানি চিরে চিরে চলাচল করছে[১], (যাতে তোমাদের উপকার হয়) এবং যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শোকর কর[২]।
وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ	১৫. আর তিনি পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে[৩]। এবং সৃষ্টি করেছেন

১. অর্থাৎ এমন উত্তাল তরঙ্গময় ও ভয়ঙ্কর সমুদ্রকেও তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, যার সামনে দুর্বল মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। তোমরা তা থেকে অনায়াসে মাছ শিকার করে অত্যন্ত সুস্বাদু ও তাজা গোশত খেয়ে থাক এবং সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চল থেকে তোমরা মণি-মুক্তা আহরণ কর, যার দ্বারা মূল্যবান অলঙ্কার তৈরি করা হয়। সমুদ্রের সুবিশাল তরঙ্গমালার প্রতি লক্ষ কর, ওদের সামনে যেখানে বড় বড় জাহাজও খড়কুটা সমতুল্যও না, সেখানে ছোট ছোট নৌকা পর্যন্ত ওই ঢেউয়ের বুক চিরে-ফেড়ে চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই নিদর্শন যে, তিনি মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং এমন এমন জিনিস তৈরি করার কৌশল শিখিয়েছেন, যার দ্বারা সমুদ্রের নাড়ী-নক্ষত্র বের করে আনা যায়।

২. অর্থাৎ তোমরা যেন জাহাজ ও নৌকাসমূহে বাণিজ্যিক মালপত্র ভরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে নিয়ে যাও এবং আল্লাহর ফযলে প্রচুর পরিমাণে জীবিকা অর্জন কর। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করত তাঁর নে'য়ামতসমূহের জন্য শোকর কর।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীপৃষ্ঠে ভারী পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী নিজের কম্পমান অবস্থার কারণে তোমাদের নিয়ে ধসে না যায়। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবী হেলত ও কাঁপত। আল্লাহ তাআলা তার উপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করলেন, ফলে তার কম্পন থেমে গেল। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ১২২৫৩; জামে তিরমিযী, বর্ণনা ৩৩৬৯।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে যে, পাহাড়-পর্বতের অস্তিত্ব অনেকাংশে ভূমিকম্পের আধিক্য থেকে বাধার কারণ। যা হোক, পৃথিবী কি ঘোরে না তা স্থির– এ বিষয়ে যে মতভেদ ছিল তার সাথে বর্তমান আয়াতের ইতি বা নেতিবাচক কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, পাহাড়-পর্বতের দ্বারা যে কম্পনকে বন্ধ করা হয়েছে, তা সেই অবিরাম ঘূর্ণনের কম্পন নয়, যে সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে।

بِكُمْ وَأَنْهٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮

নদ-নদী[১] ও পথ-ঘাট, যাতে তোমরা (আপন গন্তব্যে) পৌঁছতে পার[২]।

وَعَلٰمٰتٍ ۖ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ⑯

১৬. এবং (সৃষ্টি করেছেন) বহু নিদর্শন[৩]। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও লোকেরা পথ পেয়ে থাকে[৪]।

أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ⑰

১৭. আচ্ছা, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার সমান, যে সৃষ্টি করে না? তোমরা কি চিন্তা কর না[৫]?

---

১. নদ-নদী ও ঝরনাসমূহের উৎস কোথাও বা পাহাড়-পর্বতে হয়, কিন্তু তা পর্বতসমূহের মাঝখান দিয়ে শতশত বা হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে আল্লাহর হুকুমে সেই সব লোকালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার জীবিকার সম্পর্ক উক্ত নদীনালার পানির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ যাতে (এক শহর থেকে অন্য শহরে,) এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পার।

৩. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, নদনদী, ঝরনাধারা, গাছ-গাছালি, বালুর টিলা প্রভৃতি নিদর্শন স্থাপন করেছেন, যাতে পথিকদল নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সঠিক পথ-নির্দেশনা পেয়ে যায়। আমি নিজে (অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (র)) কোন কোন আরব বেদুইনকে দেখেছি, মাটি শুঁকে তারা পথ চিনে নেয়।

৪. অর্থাৎ রাতের বেলায় জলের ও স্থলভাগের সফরে কোন কোন তারার মাধ্যমে পথ-নির্দেশ লাভ করে থাকে। দিকদর্শন যন্ত্র দ্বারা যে পথ-নির্দেশনা লাভ হয়, তাও সরাসরি নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৫. অর্থাৎ চিন্তা করা উচিত, যেসব জিনিস মাছির একটি ডানা ও মশার একটি ঠ্যাং, বরং গমের একটি দানা বা বালুর কণাও সৃষ্টি করতে পারে না, তাদেরকে উপাস্য ও সাহায্যস্থল স্থির করে সেই আল্লাহ পাকের সমান মনে করা কত বড় বোকামী, যিনি উল্লিখিত বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহের স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের মজবুত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রনকারী। একদিকে এহেন ধৃষ্টতার কথা চিন্তা কর, অন্যদিকে আল্লাহর নে'য়ামতরাশির প্রতি লক্ষ কর। বস্তুত মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

১৮. তোমরা যদি আল্লাহর নে'য়ামতসমূহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না[১]। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯. আল্লাহ জানেন, তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর[৩]।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

২০. আর ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট[৪]।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ যেসব নে'য়ামতের কথা উপরে বর্ণিত হল, তা তো সামান্য নমুনাস্বরূপ। আল্লাহর নে'য়ামতরাজির বিশালতা এমন যে, তা তোমরা কোনভাবেই গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ এ অসংখ্য নে'য়ামতের যথাযথ শুকরিয়া কারো দ্বারা আদায় হওয়া সম্ভব না। সুতরাং শুকরিয়া আদায়ে এই যে ত্রুটি থেকে যায়, তা আল্লাহ মাফ করে দেন এবং স্বল্প পরিমাণ শুকরিয়ার বিপুল পরিমাণ ছওয়াব দান করে থাকেন।

অথবা অর্থ এই যে, নে'য়ামতের না-শুকরী করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে কৃতজ্ঞ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার পিছনের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে তার উপর রহমতের বারি বর্ষণ করেন। বরং অকৃতজ্ঞতার অবস্থায়ও তাকে নিজের অপার রহমত থেকে একেবারে বঞ্চিত করেন না– দুনিয়াতে তিনি হাজারো রকমের নে'য়ামত দান করে থাকেন।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহেরী ও বাতেনী সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি উত্তমরূপে জানেন, কোন্ ব্যক্তি অন্তরের দ্বারা কী পরিমান আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা কী পরিমাণ তাঁর নে'য়ামতরাশির শোকর করে থাকে। আর কোন ব্যক্তি এমন যে, তার বাইর ও ভিতর নে'য়ামতের হক আদায় করা থেকে শূন্য। অথবা আল্লাহ জানেন যে, উল্লিখিত প্রমাণাদি ও নে'য়ামতরাশির কথা শুনে কে খাঁটিমনে তাঁর প্রতি ঈমান আনে, আর কে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ্যে লা-জওয়াব হয়েও সত্য গ্রহণ করে না। আল্লাহর ইলমে যার যে অবস্থা হবে, তার সাথে তিনি সে অনুযায়ীই আচরণ করবেন।

৪. আল্লাহ তো তিনি, যাঁর মহৎ ও অনন্ত নে'য়ামতরাশির কথা উপরে বর্ণিত হল। এখন মুশরিকদের বোকামীর অবস্থাটা লক্ষনীয় যে, এমন সর্বজ্ঞ ও সর্বস্রষ্টা আল্লাহর অংশীদার ওরা এমন সব জিনিসকে স্থির করল, যারা একটি ঘাসের পাতাও সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরা আল্লাহর সৃষ্টি।

২১. (তারা) মৃত, নির্জীব[১]। এবং তারা জানে না, কবে তারা পুনরুত্থিত হবে[২]।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

[রুকূ - ৩]

২২. তোমাদের মা'বূদ এক মা'বূদ; আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, ওদের অন্তর অস্বীকার করে এবং ওরা অহংকারী[৩]।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. এ সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ জানেন– যা ওরা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না[৪]।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

---

১. অর্থাৎ ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করে, তারা সকলেই মৃত (নিষ্প্রান)– চাই সর্বদার মৃত হোক, যথা মূর্তি; অথবা বর্তমানে মৃত, যেমন সেই বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ, যারা মরে গেছেন কিন্তু তাঁদের পূজা করা হয়ে থাকে। অথবা শেষ পরিণতির দিক থেকে মৃত, যেমন হযরত মাসীহ, রূহুল কুদ্‌স ও আল্লাহর ফেরেশতাগণ (যাঁদের পূজা করে কতিপয় ফের্কা)। বরং জিন ও শয়তান পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত (যাদের পূজা করে কতিপয় বিকৃত স্বভাবধারীরা)। উল্লিখিত সকলের উপরই এক সময় মৃত্যু আসবে।

অতএব যার অস্তিত্ব পর্যন্ত অন্যের দান এবং আল্লাহর যখন ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিতে পারেন– তাকে কী করে উপাস্য বলা যেতে পারে? আর কেমন করেই বা সে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে?

২. অর্থাৎ এরা সত্যিই আশ্চর্যজনক উপাস্য, যারা এতটুকুই জানে না যে, কিয়ামত কবে আসবে এবং তারা নিজেরা বা তাদের পূজাকারীরা হিসাব-নিকাশের নিমিত্ত কবে উত্থিত হবে। এরূপ নিষ্প্রাণ ও বেখবরদের উপাস্য বলা নিতান্তই বোকামী ও নিরেট মূর্খতা।

৩. অর্থাৎ উপরে বর্ণিত প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ এতই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, সেগুলি নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই মানুষ একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা তো সেই ব্যক্তি করবে, যার নিজ পরিণামের ফিকির আছে এবং প্রতিফল সম্পর্কে ভয় আছে। পুনরুত্থানের বিশ্বাসই যাদের নেই, পরিণামের প্রতি ধেয়ানই যাদের নেই, ওরা কী করে দলীল-প্রমাণের দিকে কান দেবে এবং ঈমানের শুফল ও কুফরের মন্দফলের প্রতি মনোযোগী হবে? আর কবেই বা তাদের অন্তরে তাওহীদের অনুভূতি ও নবীদের সামনে বিনয়ের সাথে আত্মনিবেদনের মনোভাব জাগ্রত হবে?

৪. অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝে নাও, দম্ভ ও অহংকার কোন ভাল বিষয় নয়। বরং এর কুফল ভোগ করতে হবে। তাওহীদের প্রতি অস্বীকৃতির যে মনোভাব তোমরা অন্তরে পোষণ কর এবং

২৪. যখন ওদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমাদের রব কী অবতীর্ণ করেছেন?' তখন ওরা বলে, 'পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী'[১]–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. ফলে ওরা কিয়ামতের দিন নিজেদের বোঝা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদের বোঝারও একটা অংশ, যাদের ওরা কোন জ্ঞান ছাড়া বিভ্রান্ত করত। শুনে রাখ, যে বোঝা ওরা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট[২]!

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿۲۵﴾

[রুকূ - ৪]

২৬. নিশ্চয় এদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। অতঃপর ওদের ইমারতের উপর আল্লাহর

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ

তোমাদের চাল-চলন ও ব্যবহার-আচরণে যে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে, তা সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। তিনি প্রত্যেকটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপরাধের শাস্তি যথাসময়ে তোমাদের দেবেন।

১. অর্থাৎ যারা জানে না, তারা জানার জন্য অথবা যারা জানে, তারা পরীক্ষাস্বরূপ যখন উক্ত অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা করে; অথবা অবিশ্বাসীরা নিজেরাই ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'বল তো দেখি, তোমাদের প্রভু কী অবতীর্ণ করেছেন'? উদ্দেশ্য এই যে, যে কুরআনকে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম আল্লাহর নাযিলকৃত বলে থাকেন, তার সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কী এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দাবির মধ্যে কতখানি সত্য? –তো, উক্ত প্রশ্ন করা হলে ওরা বলে, 'কুরআনের মধ্যে পূর্ববর্তী কিতাবাদি ও উম্মতদের কিছু সনদহীন কথাবার্তা (অর্থাৎ তাওহীদ, নবুওয়াত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি) এবং কিছু কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া আছেই বা কী?

২. অর্থাৎ উল্লিখিত কথা দ্বারা ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মহান কুরআনকে হেয় সাব্যস্ত করে নিজেদের সাথে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করা এবং এভাবে নিজ কুফর ও পথভ্রষ্টতার পূর্ণ বোঝার সাথে সেই লোকদেরও পাপের বোঝা কিছুটা মাথায় নেওয়া, যাদেরকে তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে পথভ্রষ্ট করেছে। লক্ষ্য করা দরকার যে, কীরূপ পাপের বোঝা ওরা মাথায় নিচ্ছে। হাদীসে আছে- ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ('কোন ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান করলে যারা ওর অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ গোনাহ ওরও হবে– আর এতে তদের গোনাহ একটু কমবে না।') (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৪) –আর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (অবশ্যই ওরা বহন করবে নিজেদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝা –আনকাবূত, আয়াত ১৩)

بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(হুকুম) এসে পৌঁছল ভিত্তিমূলের দিক থেকে। ফলে উপর থেকে ওদের উপর ছাদ ধসে পড়ল এবং ওদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব এল যার ধারণাও ওরা করেনি[১]।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৭. অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ ওদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার শরীকেরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব লড়াই করতে[২]?' যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয় আজ লাঞ্ছনা ও দুর্দশা কাফেরদের জন্য–[৩]'

---

১. অর্থাৎ লোকদের পথভ্রষ্ট করার এবং সত্যের পয়গাম অবনমিত করার যেসব চেষ্টা-তদবীর বর্তমানে করা হচ্ছে, পূর্বে অন্যান্য জাতিও নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) মোকাবেলায় এরূপ চেষ্টা-তদবীর করেছিল। ওরা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের বড় বড় সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করেছিল। কিন্তু তারপর যখন আল্লাহর হুকুম আসল, তা সেসবের ভিত্তিমূল হেলিয়ে দিল। অবশেষে খোদায়ী গজবের একটি মাত্র ঝাঁকুনিতে ওদের নির্মিত প্রাসাদগুলো ওদেরই উপর ধসে পড়ল। ফলে ওরা সকলে ছাদের নীচে পিষ্ট হয়ে মরল।

মোট কথা, ওদের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদসমূহ ওদেরই উপর উলটিয়ে দেওয়া হল এবং প্রাধান্য বিস্তার ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ অবলম্বন করেছিল, তা সবই ওদের ধ্বংসের কারণ হল। বরং কোন কোন জাতির ঘরবাড়ী বাহ্যিকভাবেও উলট-পালট করে দেওয়া হয়েছিল।

২. অর্থাৎ যেসব অংশীদারের জন্য তোমরা আমার পয়গম্বরদের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে, আজ তারা কোথায়, তারা তোমাদের সাহায্যে কেন আসছে না? هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ (ওরা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে অথবা প্রতিশোধ নিতে পারবে? –সূরা শু'আরা, আয়াত ৯৩)— فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ (সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং হবে না কোন সাহায্যকারী। –সূরা তারেক, আয়াত ১০)

এরূপ বলাটাই ওদের লাঞ্ছিত করা। অথবা লাঞ্ছনার অর্থ এই যে, ওদের দোযখে দাখিল করা হবে এবং ওদের সকল ষড়যন্ত্রের গোমর ফাঁস করে দেওয়া হবে– اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ (যাকে আপনি জাহান্নামে ফেললেন, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করলেন। –সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯২)।

৩. অর্থাৎ ওরা আর কী উত্তর দিবে? অবশ্য নবীগণ ও অন্যান্য ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরা সে সময় এ দাগাবাজদের শুনিয়ে বলবেন, আমরা যা বলতাম তা আজ তোমরা দেখে নিলে। আজকার দিনের সমস্ত খারাবী ও অপমান একমাত্র সত্যের অস্বীকারকারীদের জন্যই।

২৮. যাদের প্রাণ ফেরেশতারা এ অবস্থায় বের করে যে, ওরা নিজেদের উপর জুলুম করছিল[১]। আর তখন ওরা আনুগত্য প্রকাশ করে (বলে), 'আমরা তো কোন মন্দকর্ম করতাম না।'[২] (ওদের বলা হয়,) 'অবশ্যই। তোমরা যা করতে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত[৩]।'

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. অতএব তোমরা দোযখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, যার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। নিশ্চয় অহংকারীদের বাসস্থান অতি নিকৃষ্ট!

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾

৩০. আর পরহেযগারদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাদের রব কী অবতীর্ণ করেছেন?' তারা বলল, 'উত্তম বিষয়।' যারা এ দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ[৪]। আর

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ

---

১. অর্থাৎ ওরা শিরক ও কুফর অবলম্বন করে নিজেদেরই ক্ষতি করতে থেকেছে। পরিশেষে এ অবস্থায়ই মৃত্যুর ফেরেশতাগণ ওদের জান কবজ করার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। মোদ্দা কথা, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকাবস্থায়ই মৃত্যু হল।

২. অর্থাৎ তখন সমস্ত লক্ষ-ঝক্ষ বিদায় নেবে। দুনিয়াতে ওরা যেসব দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতা করত, তা সব অস্বীকার করে আনুগত্য প্রকাশ করবে ও বলবে, আমরা কখনো কোন অসৎকাজ করিনি, সর্বদাই সৎকাজ করেছি ও ভাল মানুষ থেকেছি-

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

(যেদিন আল্লাহ ওদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন ওরা তাঁর সামনে কসম খাবে, যেমন তোমাদের সামনে কসম খায়। আর ওরা মনে করে যে, ওরা কিছুটা ভাল পথেই আছে। শুনে রাখ, ওরাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী।–মুজাদালাহ : ১৮)

৩. অর্থাৎ মিথ্যা বলে কি তোমরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাও, যাঁর জ্ঞানে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড রয়েছে? আজ তোমাদের কোন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করার সময় এসে গেছে।

৪. উল্লিখিত অহংকারীদের বিপরীতে এস্থলে মুত্তাকী (পরহেজগার)-দের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে– যখন তাদের কুরআন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'তোমাদের রব কী বিষয় অবতীর্ণ করেছেন?' তখন তারা অত্যন্ত ভক্তি ও আদবের সাথে বলেন, 'এমন পুণ্য বিষয় (নাযিল করেছেন), যার আগাগোড়া মঙ্গল ও বরকতে পরিপূর্ণ।' –এরূপ লোকদের জানা উচিত যে,

আখেরাতের ঘরই উত্তম এবং কত উৎকৃষ্ট পরহেযগারদের নিবাস![1]–

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৩১. (অর্থাৎ) অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানরাজি, যাতে তারা প্রবেশ করবে। তার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তাদের জন্য তারা যা চাবে তা-ই রয়েছে[২]। আল্লাহ এমনি প্রতিদান দেবেন পরহেযগারদের[৩]–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۗ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৩২. যাদের প্রাণ ফেরেশতাগণ এ অবস্থায় বের করে যে, তারা পাক-পবিত্র[৪]। ফেরেশতা-গণ বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর[৫] যেসব আমল করতে তার বদৌলতে[৬]।'

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করল, সে সৎকর্মের সুফল অবশ্যই লাভ করবে। আল্লাহর দরবারে কারো মেহনত ও সামান্য নেকীও বিনষ্ট হয় না।

১. অর্থাৎ আখেরাতের কল্যাণ, সুখ-সম্পদ ও নে'য়ামতরাজির অবস্থা বর্ণনার অতীত! সেখানকার ছোট ছোট বিষয়ের সামনে দুনিয়া ও দুনিয়ার সমগ্র নে'য়ামত কিছুই নয়।

২. অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা যা কিছু দৈহিক আরাম ও আত্মিক আনন্দ চাইবে, তা-ই সেখানে পাবে- وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (আর সেখানে রয়েছে যা অন্তর চায় এবং যাতে চক্ষু জুড়ায়। আর সেখানে তোমরা অনন্তকাল থাকবে। –সূরা যুখরুফ, আয়াত ৭১)

৩. অর্থাৎ যারা কুফর-শিরক ও ফাসেকী-নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তারা এরূপ প্রতিদানই লাভ করবে।

৪. তাদের দেহ-প্রাণ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা এবং পাপাচারের পঙ্কিলতা থেকে পাকসাফ থেকেছে এবং আল্লাহ তাআলার সহীহ মারেফত ও মহব্বতের কারণে তারা অত্যন্ত খুশী মনে ও প্রশস্ত হৃদয়ে বরং পরম আগ্রহের সাথে নিজেদের জান স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করেছে।

৫. এক হিসাবে তো মানুষ মৃত্যুর পরপরই আত্মিকভাবে বেহেশত বা দোযখে দাখিল হয়ে যায়। অবশ্য শারীরিকভাবে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হবে হাশরের পরে। اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ –হতে পারে, এ সুসংবাদের মধ্যে উভয় প্রকার প্রবেশের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

৬. অর্থাৎ তোমাদের নেক আমল বেহেশতে প্রবেশের স্বাভাবিক কারণ, যদিও আল্লাহর রহমতই তার মূল কারণ। যেমনঃ হাদীসে এসেছে- إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ (এর

৩৩. কাফেররা কি কেবল এই প্রতীক্ষায় আছে যে, ওদের কাছে ফেরেশতারা আগমন করবে অথবা আপনার রবের আদেশ পৌছবে[১]? এমনই করেছিল ওদের পূর্ববর্তীরা। আর আল্লাহ ওদের প্রতি অবিচার করেননি। কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছিল।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৩৪. অবশেষে ওদের উপর আপতিত হল ওদের মন্দ কর্ম-কাণ্ডের (কুফল) এবং ওদের ঐ জিনিস বেষ্টন করে ফেলল, যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত[২]।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

সারাসার এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিও আল্লাহ তা'আলার রহমতেই জান্নাতে দাখিল হব)। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮৩১, সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮১৬)

১. বেহেশতের সৌন্দর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর এখন সেই গাফেলদের সতর্ক করা হচ্ছে, যারা নিছক পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মেতে আখেরাতকে ভুলে রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরানোর কোন ফিকিরই করে না। –অর্থাৎ, ওরা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, যখন ফেরেশতাগণ জান কবজ করতে এসে পড়বেন, অথবা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, অথবা পাপীদের শাস্তিদানের নির্দেশ পৌঁছে যাবে এবং মাথায় জুতা পড়তে শুরু করবে— তখন ঈমান এনে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করবে? অথচ তখনকার ঈমান বা তওবা ও প্রত্যাবর্তন কোনই উপকারে আসবে না। সুতরাং যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং আযাব আসার আগেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবাধ্যরাও ধোঁকা ও গাফলতের নেশায় নিমজ্জিত ছিল, দীর্ঘকাল বাতিলের পূজায় লিপ্ত ছিল, তওবার সময় তওবা করেনি। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নবীদের প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতায় মেতে থাকে এবং তাঁদের কথা ও পয়গাম নিয়ে হাসি-তামাশা করতে থাকে। পরিশেষে ওদের কার্যকলাপের পরিণাম সামনে উপস্থিত হল এবং যে খোদায়ী আযাবের সংবাদকে উপহাস করত তা স্বচক্ষে দেখে নিল। আর পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে, এমন কোন পথই রইল না। নিজেদের অপকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হল। অথচ ওদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন দুশমনি ছিল না এবং তাঁর আদালতে জুলুম ও অত্যাচারের কোন সম্ভাবনা নেই। আসলে ওরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছে। তাতে কার কী হয়েছে? নিজেদেরই ক্ষতি হয়েছে।

[রুকূ - ৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۞

৩৫. মুশরিকরা বলে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তিনি ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত আমরাও করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, এবং আমরা তাঁর (নির্দেশ) ছাড়া কোন কিছু হারামও সাব্যস্ত করতাম না[১]।' এমনই করেছিল ওদের পূর্ববর্তীরা। বস্তুত, রাসূলদের দায়িত্ব হল কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া[২]।

---

১. মুশরিকরা নিজেদের শিরক ও শিরেকী কার্যকলাপকে বৈধ বলে প্রমাণিত করার জন্য যেসব বাতিল ও অসার প্রমাণাদি পেশ করত, এখানে তা খণ্ডন করা হচ্ছে।

ওদের কথার সারসংক্ষেপ এই যে, গাইরুল্লাহর উপাসনা করা অথবা কোন জন্তুকে (যথা: বাহীরা, সায়িবা প্রভৃতিকে) হারাম সাব্যস্ত করা যদি মন্দ কাজ হত এবং আল্লাহ তা অপছন্দ করতেন, তবে তিনি তা আমাদের কেন করতে দেন? আমরা তাঁর মর্যির খেলাফ করলে তিনি অবশ্যই আমাদের বাধা দিতে পারতেন। বাধা না মানলে তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতেন। যখন এরূপ হয়নি, তখন প্রমাণিত হল যে, এসব কাজ আল্লাহর অপছন্দ নয়।

অষ্টম পারায় সূরা আনআমের ১৪৮ নং আয়াতে سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ أَشْرَكْنَا –এর তাফসীর ও ব্যাখ্যায় মুশরিকদের এ প্রশ্ন ও এর বিস্তারিত উত্তর আলোচিত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ মুশরিকদের এ কথাই ভুল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়নি। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত (যুগে যুগে) প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে এসেছেন। তাঁদের কাজই ছিল লোকদের শিরক ও শিরেকী কাজকাম থেকে বিরত রাখা এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দেওয়া যে, আল্লাহ কী কী কাজ পছন্দ করেন ও কী কী অপছন্দ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে কোনটির পরিণাম কী?

তবে লোকেরা যাতে অসৎ পথ অবলম্বনই না করতে পারে, সৃষ্টিগতভাবে এমন ব্যবস্থা কেন করা হল না? উত্তর এই যে, (মানুষকে এভাবে বাধ্য করা এবং তার ইচ্ছাশক্তিকে একদম বিলুপ্ত করে দেওয়া)– এ আল্লাহর হেকমতের পরিপন্থী, যেমন: ইতিপূর্বে আমরা কয়েক স্থানে লিখেছি।

এখন রইল এই প্রশ্ন যে, যারা নবীদের কথা অমান্য করল, সঙ্গে সঙ্গে ওদের শাস্তি দেওয়া হল না কেন? উত্তর এই যে, বহু জাতিকে দুনিয়াতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যেমন: পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। তবে যুক্তি-প্রমাণের আলোকে এ জরুরী নয় যে, অপরাধ করামাত্রই শাস্তি দেওয়া লাগবে, অপরাধীকে এক মিনিটের অবকাশও দেওয়া হবে না এবং তাকে তওবা ও সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হবে না।

৩৬. নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি[১] এ বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক[২]। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন এবং কতক এমন, যাদের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। অতএব তোমরা যমীনের বুকে সফর কর, তার পর দেখ, কেমন হয়েছে অস্বীকারকারীদের পরিণাম।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۶﴾

৩৭. আপনি ওদের সুপথে আনতে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে তিনি হেদায়েত দান করেন না। এবং ওদের কোনই সাহায্যকারী নেই[৩]।

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এটা নিতান্তই অজ্ঞদের কথা যে, আল্লাহর নিকট এ কাজ অপছন্দ হলে তিনি তা করতে দেন কেন? উত্তর এই যে, প্রত্যেক দলের কাছেই তো কতক কাজ অপছন্দ। তা সত্ত্বেও তিনি তা কেন হতে দেন?' (আল্লাহ তাআলা কি তাতে বাধাদান করতে অক্ষম ছিলেন?) যা হোক, এখানে সংক্ষেপে আসল কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলগণ সর্বদা তা নিষেধ করে এসেছেন। যার ভাগ্যে হেদায়েত ছিল, সে পেয়েছে। যে খারাপ হওয়ার ছিল, খারাপ হয়েছে। আল্লাহর মর্যি এ-ই ছিল (যে, মানুষকে মোটামুটিভাবে কর্ম ও ইচ্ছাশক্তি প্রদান করে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে, ইট পাথরের ন্যায় অক্ষম অথবা জীবজন্তুর ন্যায় তার কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করা হবে না বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার ও উন্নতি করার সুযোগ দেওয়া হবে।)

১. অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ সময়ে। সর্বশেষে আখেরী নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব ও জিন উভয় জাতির রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

বি. দ্র. এই আয়াতের অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে ও সকল লোকালয়ে সরাসরি রাসূল প্রেরিত হওয়া জরুরী। বরং এমনও হতে পারে যে, কোন জাতির প্রতি একজন নবী প্রেরিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য জাতির প্রতি তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছে– যাদের 'হাদী' ও 'নাজীর' বলা যেতে পারে। এরূপ প্রতিনিধি পাঠানো পরোক্ষভাবে সেই নবীকেই পাঠানো।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন- طاغوت বলা হয়, যে অন্যায়ভাবে বিনা দলীলে সরদারীর দাবি করে। প্রতিমা, শয়তান ও শক্তিশালী জালেম– সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. অর্থাৎ যাকে তারই অযোগ্যতা ও ক্ষমতার অসদ্ব্যবহারের কারণে আল্লাহ তাআলা গোমরাহ করেন, তাকে কেউ হেদায়েতও করতে পরে না এবং তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ

৩৮. ওরা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, 'যে মরে যায়, আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না[১]।' অবশ্যই (করবেন), এর দৃঢ় ওয়াদা রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[২]।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ۚ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

৩৯. (পুনর্জীবিত এজন্য করবেন,) যাতে তিনি ওরা যে বিষয়ে মতভেদ করত, তা ওদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেন এবং যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, ওরা ছিল মিথ্যাবাদী[৩]।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ۞

রক্ষাও করতে পারে না। তাদের হেদায়াতের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষাও কোন উপকারে আসতে পারে না। সুতরাং তাদের চিন্তায় আপনি নিজেকে এত ভারাক্রান্ত করছেন কেন?

১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর জীবনই নেই, সুতরাং আযাবের ভয় কী করে–? এ সবই প্রবঞ্চনামাত্র।

২. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকার করাতে এবং অনুমানপ্রসূত কসম খাওয়াতে আল্লাহর পরিপক্ক ওয়াদা টলতে পারে না, তা বাস্তবায়িত হবেই হবে। অবশ্য তোমরা এমন প্রামান্য সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের মূর্খতার প্রমাণ দিচ্ছ। যে ব্যক্তি আল্লাহর সর্বব্যাপী ইলম, তাঁর কুদরত ও হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্য, উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত আছে, সে কখনো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে পারে না। কবি সত্যই বলেছেন- الناس أعداء ما جهلوا (মানুষ যা জানে না, তারা তার শত্রু)।

৩. অর্থাৎ হেকমত ও যুক্তিরই দাবি হচ্ছে– কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সংঘটিত হওয়া। কেননা, মৃত্যুর পর যদি পুনর্জীবনের ব্যবস্থা না হয়, তবে দুনিয়ার মধ্যে যে বিভিন্ন আমল ও অবস্থা পাওয়া যায়, সেসবের পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ ফলাফল কী করে প্রকাশ পাবে? এখানকার কলহ-বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা তো সেখানেই হবে এবং সে সময় অবিশ্বাসীরা জেনে নেবে যে, কসম খেয়ে তারা যেসব বিষয় অস্বীকার করত সেগুলি সত্য ছিল এবং কসমকারীরা ছিল মিথ্যাবাদী।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ জগতে অনেক বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কেউ আল্লাহকে স্বীকার করেছে, কেউ অস্বীকার করেছে। অতএব পরজগত হওয়া জরুরী, যাতে বিতর্কিত বিষয়াদির তাহকীক ও মীমাংসা হয়, সত্য ও মিথ্যা পৃথক হয় এবং অনুগত ও অবিশ্বাসীরা নিজেদের কৃতকর্মের ফল পায়।'

৪০. আমি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করি, তখন তার প্রতি আমার কথা কেবল এতটুকু হয় যে, আমি তাকে বলি, 'হও' আর তা হয়ে যায়[১]।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

[রুকূ - ৬]

৪১. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করেছে, নিশ্চয় আমি দুনিয়াতেই তাদের উত্তম নিবাস দান করব। আর আখেরাতের প্রতিদান তো অনেক বড়, যদি তারা জানত[২]।

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

---

১. অতএব মৃতদের পুনর্বার জীবিত করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়।

বি. দ্র. كن فيكون এর ব্যাখ্যা সূরা বাকারার আয়াত (১১৩)- এ দ্রষ্টব্য। এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হওয়ামাত্র কাম্য বস্তুটি হয়ে যায়, তা হতে এক সেকেণ্ডেরও দেরি হয় না। ইচ্ছা করামাত্র কাম্য বস্তুটি যে আসানী ও দ্রুততার সাথে হয়ে যায় এবং কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না– এ-ই এ বাক্যের মর্মকথা।

২. অর্থাৎ ভাল-মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করার জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান জরুরী। আল্লাহর বহু অনুগত বান্দা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভুগে ভুগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। তাদের ত্যাগ ও কুরবানী কি বৃথা যাবে? নিশ্চয় না।

যারা সত্যের সাহায্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে জালেমদের অত্যাচার সহ্য করেছে এবং বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এমনকি বাধ্য হয়ে ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্মান ও আরাম-আয়েশ সব কিছু আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়েছে, তাদের মেহনত ও আনুগত্যের সুফল অবশ্যই লাভ হবে। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দুনিয়াতেই নিজেদের কুরবানীর কিছুটা ফল ভোগ করবে। অর্থাৎ হিজরতকারীদের উত্তম নিবাস দেওয়া হবে– নিজেদের ঘরবাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়িঘর এবং স্বদেশী ভাইদের চেয়ে উত্তম ও দরদী ভাই-বন্ধু, পূর্বের জীবিকা থেকে উত্তম জীবিকা ও পূর্বের সম্মান থেকে উত্তম সম্মান তারা লাভ করবে। বরং যারা বাড়িঘর থেকে বের করেছে, ওদের উপর তারা বিজয়ী হবে এবং দুনিয়ার শাসক ও পরহেজগারদের নেতা হবে। আর পরিশেষে এত সব কিছুর পর পরকালে যেসব উচ্চস্থান ও বড় বড় মর্তবা লাভ করবে, সেসবের কল্পনাও করা যায় না। পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেলে যারা এখনো হিজরতের সৌভাগ্য থেকে মাহরূম রয়েছে, তারাও আপন বাড়িঘর ছেড়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে যাবে।

৪২. (তারাই) এমন লোক, যারা অবিচল থেকেছে; আর তারা স্বীয় রবেরই উপর ভরসা করে[১]।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. আমি আপনার পূর্বে মানুষদেরই পাঠিয়েছি (ফেরেশতাদের নয়), যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম। সুতরাং যারা স্মরণ রাখে, তোমরা তাদের জিজ্ঞাসা কর* যদি তোমাদের জানা না থাকে[২]–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের শব্দাবলির ব্যাপকতা দৃষ্টে আমরা উপরোক্ত তাফসীর করেছি, (যা রূহুল মা'আনীতে কতক মুফাস্‌সির থেকে উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াত সেই আশিজন সাহাবী (رضي الله عنهم) সম্পর্কে নাযিল হয়, যাঁরা মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে হাবশায় হিজরত করে গিয়েছিলেন। কেননা, অধিকাংশের মতে আয়াতখানি মদীনায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। উক্ত হিজরতকারীদের শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মদীনায় উত্তম নিবাস দান করেন- (رضي الله عنهم ورضوا عنه)

১. অর্থাৎ তাঁরা জুলুম-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে ঘাবড়ে যাননি, প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজন বিসর্জনের মোটেই পরোয়া করেননি, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা এক আল্লাহর প্রতি নিবেদিত থেকেছেন এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য ও অটল ওয়াদাসমূহের উপর ভরসা করেছেন। অবশেষে তাঁরা দেখে নিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত থাকে, আল্লাহ তাঁদের কতটা আপন হয়ে যান।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা জ্ঞানী, তাদের জিজ্ঞাসা কর'।

২. অর্থাৎ পয়গম্বরের নির্যাতিত সঙ্গী-সাথীরা যখন সবর ও তাওয়াক্কুলের পথে দৃঢ়পদ হন, তখন ইহ ও পরকালে তাঁদের বিজয়ী ও সাহায্য করা আমার কোনো নতুন নীতি নয়। পূর্বেও আমি মানবজাতির মধ্য থেকে রাসূলদের প্রেরণ করেছি, যাঁদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর আহকাম এবং নেকী ও বদীর পরিণাম সম্বন্ধে মানবজাতিকে অবহিত করা। এ বিষয় যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের ও তাদের পয়গম্বরদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জ্ঞান যারা রাখে সেই জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও যে, সত্যিই পূর্বে কিছু সংখ্যক মানুষকে মুজেযা ও কিতাবসহ নবুওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা এবং তাঁদের অনুগত ও অবাধ্যদের কী পরিণতি হয়েছিল? আরো জেনে নাও, সত্যের অনুসারীগণ ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর উপর নির্ভর করার বদৌলতে কিরূপে বিজয়ী ও কামিয়াব হয়েছেন এবং জালেম ও অবাধ্যরা হুজ্জত (আল্লাহর দলীল-প্রমাণ) পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কীরূপ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে?

44. (তাদের পাঠিয়েছি) নিদর্শনাদি ও গ্রন্থসমূহ দিয়ে[১]। এবং আপনার প্রতি এই স্মারক (তথা কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে তা স্পষ্ট করে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে[২],	بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

(এবং আপনার রবের শুভ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে, তাদের ধৈর্যধারণের ফলে। আর ফেরাওন ও ওর সম্প্রদায় যা কিছু তৈরি করেছিল এবং যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল আমি তাদের ধ্বংস করে দিলাম। -সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৩৭)

أَهْلَ الذِّكْرِ–এর ব্যাখ্যা

উল্লেখ্য, আমরা أهل الذكر দ্বারা শুধু আহলে-কিতাব উদ্দেশ্য করিনি, বরং শব্দের ব্যাপকতা বিবেচনায় রেখেছি, যার মধ্যে অন্য জ্ঞানীরা ছাড়া আহলে কিতাবও শামিল রয়েছে। তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে আছে-

قال الرماني والزجاج والأزهري : المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالفة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ

('আর রুম্মানী, আযযাজ্জাজ ও আল আযহারী বলেন, أهل الذكر-এর দ্বারা অতীতের উম্মতসমূহের ইতিহাস সম্পর্কে জানে- এমন আলেমগণ উদ্দেশ্য, তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক। অতএব এস্থলে الذكر শব্দটি الحفظ (স্মরণ রাখা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।')

আর বিজ্ঞ মুতারজিম (র) أهل الذكر এর তরজমা 'যারা স্মরণ রাখে' করে সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

যা হোক, বর্তমান আয়াত থেকে এ মাসলা জানা যায় যে, যারা জানে না, তারা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে আমল করবে। তাই অনেক আলেম এই আয়াতকে ইমামদের তাকলীদের প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকেন। والله أعلم

১. অর্থাৎ মুজিযাসমূহ এবং বহু ইলমসম্বলিত কিতাবাদিসহ পাঠিয়েছি।

২. 'স্মারক' দ্বারা এখানে কুরআন কারীম উদ্দেশ্য, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের জরুরী হাল-অবস্থা ও তাদের শরী'য়তসমূহের সংরক্ষক, পূর্ববর্তী নবীদের উলূমের ধারক, সর্বযুগে আল্লাহর আহকাম ও ইহ-পরকালের কল্যাণ-পথের স্মারক এবং উদাসীনতা থেকে জাগ্রতকারী। অতএব আয়াতের অর্থ দাঁড়াল, পূর্বে যেভাবে মুজেযাসহ রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন,

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

এবং যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে[১]।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

৪৫. তবে কি যারা নানা চক্রান্ত করে ওরা এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ ওদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতে পারেন অথবা ওদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসতে পারে যার ধারণাও ওরা করে না[২]?

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۝

৪৬. অথবা তিনি ওদের পাকড়াও করতে পারেন চলাফেরা করা অবস্থায়? ওরা তো (তাঁকে) ব্যর্থ করতে পারবে না[৩]।

কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তদ্রূপ আজ আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছি, যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সারাসার এবং অতীত নবীদের উলূমের পরিপূর্ণ স্মারক। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু উত্তমরূপে সুস্পষ্টভাবে বয়ান করা এবং এর কঠিন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করে দেওয়া।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াতসমূহের সেই অর্থ-মর্মই গ্রহণযোগ্য, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ হচ্ছে কুরআনের বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে বয়ান করা, আর মানুষের কর্তব্য তাতে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের ও তাঁদের জাতির অবস্থা শোনা এবং পবিত্র কুরআনের মত পরিপূর্ণ স্মারক গ্রন্থ পৌঁছে যাওয়ার পরও মক্কার কাফেররা কি সত্যের মোকাবেলায় নিজেদের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হবে না? এ আশঙ্কা কি নেই যে, আল্লাহ ওদের কারূনের ন্যায় মাটিতে ধসিয়ে দেবেন, অথবা এমন দিক থেকে কোন আপদ পাঠিয়ে দেবেন যেদিকের ধারণা-কল্পনাও ওদের নেই? অবশ্যই আছে। উদাহরণস্বরূপ: বদরের ময়দানে মুসলমান গাজীদের হাতে কাফেরদের এমনি শাস্তি দেওয়া হল, যা নিজেদের শক্তিমত্তা ও বিরাট জনবল এবং মুসলমানদের দুর্বলতা ও স্বল্পতা দৃষ্টে ওদের কল্পনাতেও আসেনি।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার অথবা দলে দলে সৈন্য পাঠনোরও কোন প্রয়োজন নেই। বরং তোমরা যখন চলাফেরা করছ, কাজকাম করছ বা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছ– এমন অবস্থায়ও পাকড়াও করে ফেলতে অথবা সম্পূর্ণ অসহায় করে দিতে আল্লাহ সক্ষম রয়েছেন। তাঁর সব ক্ষমতাই আছে; তিনি তোমাদের অক্ষম করে দিতে পারেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পার না।

৪৭. অথবা ওদের পাকড়াও করতে পারেন সতর্ক করার পর[১]? নিশ্চয় তোমাদের রব অতি দয়ালু, পরম করুণাময়[২]।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٤٧

৪৮. তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি করা সেসব বস্তু দেখেনি, যাদের ছায়া ডান দিক থেকে (বামে) ও বাম দিক থেকে (ডানে) ঢলে পড়ে– আল্লাহর জন্য সেজদাবনত হয়ে, আর সেগুলি থাকে বিনয়াবনত[৩]?

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝٤٨

---

১. অর্থাৎ সহসা পাকড়াও না করে অবহিত করা ও আযাবের পূর্বলক্ষণ পাঠানোর পর এমন অবস্থায় পাকড়াও করে ফেলতে পারেন, যখন লোকেরা আযাবের লক্ষণ দেখে স্বভাবতই ভয় পেতে থাকে অথবা পার্শ্ববর্তী লোকদের আসমানী বিপদাপদে পতিত দেখে ভয় করতে থাকে। কিন্তু উক্ত ভয় নিতান্তই স্বভাবগত; অনুশোচনা ও তওবার সাথে নয় যে, আযাবকে সরিয়ে দিতে পারে।

কেউ কেউ تخوف শব্দটিকে تنقص অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ এ সম্ভাবনাও আছে যে, হঠাৎ করে ধ্বংস না করে ক্রমান্বয়ে তোমাদের হ্রাস করতে ও দুর্বল করতে থাকবেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ উপরোক্ত সবকিছু করতে পারেন। তাহলে করেন না কেন? আসলে, তাঁর নম্রতা ও দয়ার্দ্রতাই অপরাধীদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব নাযিল করতে বাধাদান করে। তাঁর মহানুভবতা ও রহমতের দাবি এই যে, পাপীদের অবকাশ ও আত্মসংশোধনের সুযোগ দান করা হোক।

অথবা এই– فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيْمٌ বাক্যটি শুধু يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تخوف -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর تخوف এর অর্থ تنقص। অর্থ এই যে, অকস্মাৎ ধ্বংস না করে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার কারণ হচ্ছে তাঁর রহমত ও মমতা– নতুবা এক মুহূর্তে তিনি ধ্বংস ও নিপাত করে দিতেন।

৩. অর্থাৎ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর সামনে অক্ষম, অনুগত ও বিনীত– এমন কি ছায়াবিশিষ্ট বস্তুসমূহের ছায়াও তাঁরই হুকুম ও কুদরতের নিয়ম অনুসারে বাড়ে ও কমে এবং এদিকে বা সেদিকে ঢলে পড়ে, অতএব এরূপ শক্তিমান আল্লাহকে আযাব পাঠানো থেকে কোনো শক্তি কি বাধা দিতে পারে? কক্ষনো না। তাই মানুষের উচিত, স্বেচ্ছায় তাঁর শরী'য়তের সামনে মাথা নুইয়ে দেওয়া।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেক বস্তু ঠিক দুপুরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ছায়াও দাঁড়িয়ে। যখন দুপুর গড়াল, ছায়াও ঝুঁকল। এরপর ঝুঁকতে ঝুঁকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পতিত হল। যেমন: নামাযে দাঁড়ানো থেকে রুকূ, রুকূ থেকে সেজদা। অনুরূপ

৪৯. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবাই আল্লাহকে সেজদা করে এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহংকার করে না[১]।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٤٩

৫০. তারা আপন রবকে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে। এবং তারা তাদের যে আদেশ করা হয় তা পালন করে[২]।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٥٠

[রুকূ - ৭]

৫১. আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই মা'বূদ গ্রহণ করো না, তিনি তো একক মা'বূদ। অতএব আমাকেই ভয় কর[৩]।'

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٥١

প্রত্যেক বস্তু নিজে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজ ছায়া দ্বারা নামায পড়ে। কোনো দেশে কোনো মৌসূমে ডান দিকে ঝোঁকে, কোথাও বাঁ দিকে ঝোঁকে।

১. প্রথমে ছায়াবিশিষ্ট বস্তুনিচয়ের সেজদার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন সমস্ত প্রাণীর, বিশেষ করে ফেরেশতাদের সেজদার কথা বর্ণনা করত সতর্ক করা হচ্ছে যে, এরূপ নৈকট্যধারী ও মর্যাদাশালী সত্তাগণও তাঁর সামনে সেজদাবনত। তাঁদের মধ্যে কোনো গর্ব বা অহংকার নেই, যাতে তাঁরা আপন প্রভুর সামনে মাথা নত করতে বাধাপ্রাপ্ত হন।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অহংকারী লোকদের পক্ষে মাটিতে মাথা রাখা মুশকিল হয়। তারা জানে না যে, এতেই বান্দার গৌরব- مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله ('যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচু করেন।')

২. অর্থাৎ এরূপ নৈকট্য ও মর্যাদা সত্ত্বেও ফেরেশতাগণ নিজেদের রবের পরাক্রমশালিতাকে ভয় করে চলেন এবং যে হুকুমই পান, তৎক্ষণাৎ তা তামীল করে থাকেন।

'মুযেহুল কুরআন'-এ আছে, "প্রত্যেক বান্দার দিলে এ কথা আছে যে, আমার উপর আল্লাহ আছেন এবং নিজেকে সে নীচে মনে করে থাকে। এই অনুভূতি– যাকে এক ধরণের সেজদা বলা যেতে পারে– ফেরেশতাদেরও আছে, অন্যদেরও আছে।"

৩. অর্থাৎ যেহেতু আসমান-যমীনের সৃষ্টিকুল এক আল্লাহর সামনে অক্ষম ও সেজদাবনত এবং বিনীতি ও বাধ্যগত, তখন ইবাদতের মধ্যে অন্য অংশীদার কোথা থেকে আসল? যিনি সারা বিশ্বের মালিক ও মা'বূদ, একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করা উচিত এবং তাঁকেই ভয় করা উচিত।

৫২. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই মালিকানাধীন এবং ইবাদত সর্বদা তাঁরই জন্য[১]। অতএব তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় কর?

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۭ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝

৫৩. এবং তোমাদের কাছে যা-কিছু নে'য়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। তদুপরি যখন তোমাদের দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন চিৎকার করে তাঁকেই ডাক[২]।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔــرُوْنَ ۝

৫৪. তারপর যখন তিনি তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করে দেন, অমনি তোমাদের একদল স্বীয় রবের সঙ্গে শিরক করা শুরু করে দেয়–

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৫. যাতে আমি ওদের যা দান করেছি তা অস্বীকার করে। অতএব তোমরা (মজা) ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে[৩]।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

---

১. (وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا) –অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক বস্তু একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করতে বাধ্য। أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (তবে কি ওরা আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে? অথচ যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে, তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আয়ত্তাধীন রয়েছে এবং তাঁরই দিকে সকলে ফিরে যাবে। –সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৩)

অথবা অর্থ এই যে, সর্বদা তাঁরই ইবাদত করা জরুরী। أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ (শুনে রাখ! নির্ভেজাল ইবাদত আল্লাহরই জন্য। –সূরা যুমার, আয়াত ৩)

আর কেউ কেউ دين শব্দটিকে جزاء বা প্রতিফল অর্থে ধরেছেন– অর্থাৎ, সৎকর্ম ও অসৎকর্মের প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই পাওয়া যাবে। والله أعلم

২. অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণ ও নে'য়ামত যেমন তাঁরই পক্ষ থেকে, তেমনি সকল অমঙ্গল ও বিপদ দূর করার ক্ষমতাও তাঁরই হাতে। সেজন্যই তো কোন কঠিন মুসিবত এসে যখন মানুষকে স্পর্শ করে, তখন কট্টর মুশরিকও সব ভরসা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। এতে বোঝা যায়, মানুষের স্বভাব এ সাক্ষ্যই বহন করে যে, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাজ নয়।

সুতরাং যে আল্লাহর হাতে প্রত্যেকটি নে'য়ামত ও শান্তি এবং হরেক রকম লাভ ও ক্ষতি রয়েছে, তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে উপাস্য হওয়ার মধ্যে তাঁর অংশীদার হতে পারে, অথবা যাকে মানুষ ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসার স্থল মনে করতে পারে?

৩. অর্থাৎ যেইমাত্র বিপদ কেটে গেল, অমনি প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ভুলে গেল এবং অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে আল্লাহর সঙ্গে শিরক শুরু করল। এ কথা চিন্তা করে একটু লজ্জা পেল না

৫৬. আর আমি ওদের যে রিযিক দিয়েছি, ওরা তার এক অংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করে যাদের ওরা জানে না* (অর্থাৎ যাদের শরীক হওয়ার কোন প্রমাণ ওদের কাছে নেই)[১]। আল্লাহর কসম! তোমরা যে মিথ্যা রচনা করতে, সে সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে[২]।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝

৫৭. এবং ওরা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান স্থির করে– তিনি এ থেকে পবিত্র[৩]– আর

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ

যে, একটু আগেই অসহায় হয়ে কীভাবে তাঁকে ডেকেছিল? প্রকৃত অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহও স্বীকার করল না, অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ ধৃত হওয়ার অথবা নে'য়ামতের না-শুকরীর কারণে তা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করল না। বলতে গেলে, একক ও লা-শরীক আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা অস্বীকার করল।

আচ্ছা, ঠিক আছে– এখন কিছু দিনের অবকাশ ওদের দেওয়া যাচ্ছে, পার্থিব জীবনের মজা খুব করে উপভোগ করে নিক। পরিশেষে বুঝতে পারবে, নে'য়ামতের এই মুশরিকসুলভ অকৃতজ্ঞতার কেমন শাস্তি কপালে জোটে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** '... তাদের জন্য নির্ধারণ করে, যারা (কিছুই) জানে না'।

১. এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের খেত-খামারে, গৃহপালিত জীবজন্তুতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে অংশ নির্ধারণ করত এবং তা তার নামে উৎসর্গ করে দিত ("মূযেহুল কুরআন")। আরবের মুশরিকদের এহেন রীতি ছিল, যার আলোচনা সূরা আ'রাফের আয়াত নং ১৩৬-১৩৯ তে রয়েছে।

مَا لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা সেসব মূর্তি প্রভৃতি উদ্দেশ্য, মুশরিকরা মূর্খতা ও অজ্ঞতাহেতু যাদের উপাস্য বা লাভ-লোকসানের মালিক মনে করত, অথচ এর কোন দলীল বা সনদ ওদের নিকট ছিল না। আর শরীকও নির্বাচন করা হয়েছিল পাথরের মূর্তিকে, যা সব রকমের অনুভূতিহীন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপলব্ধিহীন : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (এ তো এক আশ্চর্য কথা!)

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এসব মিথ্যা অপবাদ সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদের মধ্যে অন্যদের শরীক বানানোর কী অধিকার তোমাদের ছিল?

তবে কাউকে ছওয়াব পৌছানোর বিষয়টি ভিন্ন, তা এ আয়াতের আওতাভুক্ত নয়।

৩. অর্থাৎ তাঁর জন্য সন্তানসন্ততি সাব্যস্ত করা হবে, বিশেষত কন্যাসন্তান– এ থেকে তিনি পবিত্র। আশ্চর্য, এ লোকগুলো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এহেন ধৃষ্টতা কেমনে করে?! "খুযাআ" গোত্রের লোকেরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলত (আল্লাহর পানাহ!)। আয়াতে ওদের এ উক্তির খণ্ডন হয়ে গেল।

وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

নিজেদের জন্য স্থির করে আপন কাম্যবস্তু (অর্থাৎ পুত্রসন্তান)[১]।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ۝

৫৮. যখন ওদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন ওর চেহারা কালো হয়ে যায়, আর ও অন্তর্জ্বালায় হতে থাকে পিষ্ট[২]।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۚ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৫৯. ওকে যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে খারাপ মনে করে সে লোকদের থেকে লুকিয়ে থাকে[৩]। (আর মনে মনে ভাবে), অপমান সয়ে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে[৪]? শুনে রাখ, ওরা যে ফয়সালা করে তা খুবই নিকৃষ্ট[৫]।

---

১. অর্থাৎ ওদের নিজেদের ভাগ্যে কন্যা হোক, এতে ওরা সন্তুষ্ট নয়। যখন সন্তান চায়, পুত্রসন্তান চায়।

২. অর্থাৎ ওদের কাউকে যদি সংবাদ দেওয়া হয় যে, তোমার ঘরে কন্যা জন্মেছে, তাহলে সে ঘৃণা ও দুঃখে ভ্রূকুঞ্চন করে এবং দিনভর অসন্তুষ্টির কারণে চেহারা মলিন ও অন্তর সংকুচিত হতে থাকে– এ কথা ভেবে যে, এহেন অবাঞ্ছিত মুসিবত মাথার উপর কোথা থেকে এল?!

৩. অর্থাৎ মেয়ে জীবিত থাকলে কাউকে জামাই বানাতে হবে– এই লজ্জায় সে মানুষকে মুখ দেখাতে চায় না, এদিকে সেদিকে আত্মগোপন করে বেড়ায়। উল্লেখ্য, জাহেলী সমাজে উক্ত বিষয়কে লজ্জাকর ভাবা হত!

৪. অর্থাৎ রাত-দিন এই চিন্তায় থাকে এবং কল্পনা-জল্পনা করতে থাকে যে, লজ্জার মাথা খেয়ে কন্যাকে জীবিত থাকতে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে অর্থাৎ মেরে ফেলবে। জাহেলী যুগে বহু পাষানহৃদয় মানুষ কন্যাদের মেরে ফেলত, অথবা মাটির নীচে জীবিত প্রোথিত করত। ইসলাম এই ঘৃণ্য প্রথার উচ্ছেদ করে এবং এমনি নির্মুল করে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর সারা দেশে এহেন নিষ্ঠুরতার একটি উদাহরণও পেশ করা যায় না।

কেউ কেউ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ এর অর্থ করেছেন– "কন্যাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় রেখে দেবে", অর্থাৎ জীবিত রাখলেও (ওর সাথে) এরূপ অপমানকর আচরণ করবে, যেন সে তার সন্তানই নয়, বরং মানুষই নয়।

৫. কন্যাদের সম্বন্ধে যে অন্যায় ফয়সালা ওদের ছিল, তার চেয়েও নিকৃষ্ট ফয়সালা হচ্ছে আল্লাহর জন্য সন্তানসন্ততি সাব্যস্ত করা– তাও আবার কন্যাসন্তান, যে কন্যাসন্তানকে নিজেরা এতটা অপছন্দ করে। মোটকথা, ভাল জিনিস নিজেদের জন্য, আর মন্দ জিনিস আল্লাহর জন্য (নাউযুবিল্লাহ)!

৬০. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, ওদেরই উদাহরণ (বা অবস্থা) নিকৃষ্ট, আর আল্লাহর উদাহরণ (বা শান) সমুন্নত[১]। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

[রুকূ - ৮]

৬১. যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদের অবকাশ দেন এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। অতঃপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত পেছাতেও পারবে না এবং এগোতেও পারবে না[৩]।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ যে মুশরিকরা নিজেদের জুলুম-অত্যাচার, পাপাচার ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তার পরিণাম ও শাস্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখে না, নিকৃষ্ট উদাহরণ বা মন্দ অবস্থা ওদেরই। ওরাই সন্তানসন্ততির মুখাপেক্ষী। কারণ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও বার্ধক্য-দুর্বলতায় সহযোগিতার জন্য ওদের পুত্রের প্রয়োজন। আর লজ্জা বা দারিদ্র প্রভৃতির ভয়ে কন্যাসন্তানদের হত্যা করা ওদেরই কাজ। পরিশেষে জুলুম, শিরক ইত্যাদি পাপাচারের যে চরম পরিণাম হওয়ার, তা থেকে ওদের বাঁচার উপায় নেই।

মোটকথা, সকল দিক দিয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ এবং দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক ওদেরই সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তাআলার প্রতি এমন বিষয়াদি আরোপ করা, যা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করা এবং হীন ও নিকৃষ্ট উদাহরণ প্রয়োগ করা– তাঁর মহামর্যাদা ও উচ্চশানের পরিপন্থী। আল্লাহর জন্য তো সেইসব দৃষ্টান্ত ও গুণাবলিই সাব্যস্ত করা সমীচীন, যেগুলি উচ্চ থেকে উচ্চতর এবং প্রত্যেক মহৎ জিনিস থেকে মহত্তর।

২. অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিশালী যে, তোমাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তার জন্য তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এভাবে শাস্তি দেওয়া তাঁর হেকমত মাফিক নয়। সুতরাং অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে সময় থাকতে ভুল পথ থেকে প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজেদের হাল-অবস্থার সংশোধন করে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের ধৃষ্টতা ও জুলুম-অত্যাচারের কারণে দুনিয়াতে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতে শুরু করলে পৃথিবীর এ আবাদি কয়েক ঘণ্টাও স্থায়ী থাকবে না। কেননা, দুনিয়ায় অধিকাংশ লোকই জালেম ও পাপী, আর ছোটখাট গোনাহ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত তো কেউ না। তাছাড়া যদি পাপী ও অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাহলে তো নিষ্পাপ

৬২. আর ওরা আল্লাহর জন্য তা স্থির করে যাকে স্বয়ং ওরা অপছন্দ করে[১] এবং ওদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, ওদের জন্য রয়েছে কল্যাণ[২]। এ সুনিশ্চিত যে, ওদের জন্য রয়েছে আগুন এবং ওদের দ্রুতগতিতে (সেদিকেই) নিয়ে যাওয়া হচ্ছে*[৩]।

وَيَجۡعَلُوۡنَ لِلّٰهِ مَا يَكۡرَهُوۡنَ وَتَصِفُ اَلۡسِنَتُهُمُ الۡكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الۡحُسۡنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمۡ مُّفۡرَطُوۡنَ ۝

পয়গম্বরদের পৃথিবীতে পাঠানোরও প্রয়োজন থাকে না, বরং তাঁদের জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতাদের সঙ্গেই থাকা অধিক সমীচীন। আর যখন নেক ও বদ উভয় প্রকার মানুষই দুনিয়াতে না থাকবে, তখন অপরাপর প্রাণীদের রাখাও নিরর্থক হবে। কারণ, ওদের তো মানব জাতির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তদুপরি ধরুন, যদি আল্লাহ তাআলা মানুষের জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, তবে মানুষের সঙ্গে কি জীবজন্তু মরবে না?

যা হোক, আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়াতে কথায় কথায় পাকড়াও করেন এবং তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন, তবে এ দুনিয়ার সবকিছু কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি নিজের সহনশীলতা ও হেকমতের কারণে এমন করেন না, বরং অপরাধীদের তওবা ও সংশোধনের সুযোগ দেন এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ওদের ঢিল দিয়ে রাখেন। সময় এসে গেলে আর এক সেকেণ্ডও এদিক সেদিক হতে পারবে না।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির مَا تَرَكَ عَلَيۡهَا مِنۡ دَآبَّةٍ দ্বারা শুধু 'জালেম বিচরণকারী' উদ্দেশ্য করেছেন। এটা সঠিক হলে অর্থ সুস্পষ্ট, কোন প্রশ্নই থাকে না। والله أعلم

১. অর্থাৎ যেসব জিনিস ওরা নিজেদের জন্য পছন্দ করত না, যথা: কন্যাসন্তান, নিজেদের ধন-সম্পদে অন্য কারো অংশীদারিত্ব কিংবা নিজেদের প্রতি নিন্দা ও হাসি-ঠাট্টার ব্যবহার– এসব আল্লাহ পাকের জন্য সাব্যস্ত করে।

২. অর্থাৎ, এহেন ধৃষ্টতা সত্ত্বেও মুখে এ মিথ্যা দাবি করে যে, আমরা তো দুনিয়ার জীবনেও উত্তম বস্তুর অধিকারী এবং পরকালের কাহিনী যদি সত্য হয় তবে সেখানেও আমরা আরাম-আয়েশের জীবন উপভোগ করব : وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى (আমি যদি তাকে আমার কোন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর, তবে সে বলতে শুরু করে, 'এ হচ্ছে আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইও, তবে নিশ্চয়ই আমার জন্য তাঁর নিকট কল্যাণই রয়েছে।' –হা-মীম সেজদা, আয়াত ৫০)

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সম্পূর্ণ বিস্মৃত করে তাতেই ফেলে রাখা হবে'।

৩. অর্থাৎ এ সমস্ত ধৃষ্টতা সত্ত্বেও এহেন অসার আশা-আকাঙ্ক্ষা করাই এর প্রমাণ যে, ওদের জন্য কোন কল্যাণ তো দূরের কথা, বরং ওদের জন্য দোযখ প্রস্তুত রয়েছে, যেদিকে ওদের

৬৩. আল্লাহর কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান ওদের দৃষ্টিতে ওদের কাজকর্ম শোভন করে তুলেছে। সুতরাং আজ সে-ই ওদের বন্ধু। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۳﴾

৬৪. আমি আপনার প্রতি কিতাব এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি ওদের সামনে সেই বিষয় সুস্পষ্ট করে দেন যাতে ওরা মতভেদ করছে[২]। এবং (তা অবতীর্ণ করেছি)

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ

দ্রুতগতিতে নেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে পৌছার পর ওদের সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত করা হবে, অর্থাৎ ওদের প্রতি কখনো কৃপাদৃষ্টি হবে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ কথা তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, যারা নিকৃষ্ট জিনিস আল্লাহর জন্য স্থির করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, ওরা বেহেশত লাভ করবে, অথচ ওরা ক্রমশ দোযখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।'

১. মক্কার কাফেরদের ধৃষ্টতা এবং অসার দাবি-দাওয়া উল্লেখ করার পর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, আপনি ওদের দুর্ব্যবহারে দুঃখ করবেন না। আমি আপনার পূর্বেও বিভিন্ন উম্মতের প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু সর্বদা এটাই হয়েছে যে, অভিশপ্ত শয়তান অবিশ্বাসীদের নিকট ওদের আমলাদি সুশোভিত করে উপস্থাপন করেছে। ফলে ওরা সর্বদা দুষ্কর্মে উন্নতি করেছে। আজ ওরা সকলে খোদায়ী আযাবের তলে রয়েছে এবং শয়তান ওদের কোন কাজে আসছে না। ঠিক এমন পরিণাম আপনার অস্বীকারকারীদেরও হবে।

কোন কোন মুফাসসির فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ এর অর্থ করেছেন, যে শয়তান পূর্ববর্তীদের বিভ্রান্ত করেছিল, সে-ই আজ এদের (মক্কার কাফেরদের) বন্ধু সেজেছে। সুতরাং যে পরিণতি ওদের হয়েছে, এদেরও তা-ই হবে।

২. অর্থাৎ কুরআন শুধু এজন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে লোকেরা যেসব মৌলিক বিষয়ে মতভেদ করছে (যথা: তাওহীদ, পুনরুত্থান, হালাল, হারাম প্রভৃতি আহকাম), আপনি সে সবের স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেন, যেন তাতে কোন সন্দেহ ও অস্পষ্টতা না থাকে। অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের মাধ্যমে সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করেন এবং বান্দাদের জন্য আল্লাহর হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) পূর্ণ করে দেন। তারপর মানা না মানা শ্রোতাদের কাজ– যার তাওফীক হবে, সে গ্রহণ করবে। আপনার পেরেশান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

ঈমানদারদের পথপ্রদর্শন করা ও তাদের প্রতি দয়া করার জন্য[১]।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

৬৫. আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এর দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন[২]। নিশ্চয় এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা শোনে[৩]।

[রুকূ - ৯]

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝

৬৬. আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও রয়েছে চিন্তা-ভাবনার উপকরণ। আমি তোমাদের পান করাই– তার উদরস্থ বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে, গোবর ও রক্তের মাঝখান হতে খাঁটি দুধ[৪], যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু[৫]।

---

১. অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ফয়সালা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো সবার জন্যই, কিন্তু কুরআনী হেদায়েত দ্বারা উপকৃত তারাই হতে পারে, যারা তা খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস করে এবং তার প্রতি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈমান আনয়ন করে।

২. অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক মাটিকে সতেজ ও উর্বর করে দিলেন। বলতে গেলে, শুষ্ক হওয়াটা মাটির মৃত্যু এবং সতেজ হওয়াই তার জীবন।

৩. অর্থাৎ, তদ্রূপ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জাহেলদেরকে আলেম এবং মৃত অন্তরগুলিকে জীবিত করে তুলবেন। তবে শর্ত এই যে, মনোযোগ ও ইনসাফের সাথে তা শুনতে হবে।

৪. অর্থাৎ জীবজন্তু যে ঘাস ও তরুলতা খায়, তা পেটে গিয়ে তিনটি বস্তুতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার কুদরতে উট, গরু, মহিষ, প্রভৃতি পশুর দেহের অভ্যন্তরে এমন যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা খাদ্যবস্তুর কিছু অংশকে পৃথক করত বিষ্ঠা বা গোবরের আকারে বাইরে নিক্ষেপ করে। এবং কিছু অংশকে রক্ত বানিয়ে শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দেয়, যা ওদের জীবন ও স্থায়িত্বের কারণ হয়ে থাকে। আর এই খাদ্যবস্তু থেকেই রক্ত ও গোবরের মত পূতিগন্ধময় দু'টি বস্তুর মাঝখানে তৃতীয় একটি দ্রব্য তিনি তৈরি করেন, অর্থাৎ দুধ– যা অত্যন্ত পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু।

৫. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা কিতাব এবং প্রসঙ্গত পানি অবতরণের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান আয়াতগুলিতে পানির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের আলোচনা রয়েছে, যথা– দুধ,

৬৭. এবং খেজুর ও আঙ্গুরের ফল থেকে তোমরা তৈরি কর নেশাকর পানীয় ও উৎকৃষ্ট রিযিক[১]। নিশ্চয় এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা বোঝে[২]।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾

শরবত, নাবিয (খেজুর ভেজানো পানি) ও মধু। পবিত্র কুরআনের অন্য এক স্থানে যেখানে বেহেশতের ঝরনাসমূহের উল্লেখ রয়েছে, এ চার শ্রেণীর পানীয়ের কথাই বর্ণিত হয়েছে-

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

(জান্নাত, যার ওয়াদা আল্লাহভীরুদের সাথে করা হয়েছে– তার অবস্থা (এই): তাতে আছে এমন পানির নহর, যা দুর্গন্ধযুক্ত নয়; এমন দুধের নহর, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি; এমন শরাবের নহর, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু; এমন মধুর নহর, যা পরিশোধিত। –সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৫)

আয়াতের শিক্ষা

এস্থলে এসব জিনিসের আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য এদিকে ইশারা করা যে, মানুষের দৃষ্টিতে যেসব নে'য়ামত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ, তা সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। অতএব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ কী করে প্রকৃত অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে অন্যদের দাস হয়ে যায়? এতে যেন শিরকের খণ্ডন করা হল। এবং সেই সাথে এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের দৈহিক জীবনের জন্য আল্লাহ তাআলা যেমন নানা ব্যবস্থা ও মুনাসিব উপায়-উপকরণ তৈরি করেছেন, তদ্রূপ তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও আত্মিক উন্নতির জন্যও উপায়-উপকরণের যথেষ্ট ব্যবস্থা তিনি করে থাকবেন।

১. অর্থাৎ উক্ত ফলমূল থেকে তোমরা নেশাকর পানীয় তৈরি করে থাক এবং পানাহারের জন্য অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য, যথা শরবত, তাজা ফলের রস, সিরকা, খোরমা, কিসমিস ইত্যাদি হাসিল করে থাক।

বি. দ্র. এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কী জীবনে মদ হারাম হয়নি। ফলে পানকারীরা অবাধে মদ পান করত। মদীনায় হিজরতের পর মদ হারাম হয়। এর পর কোন সাহাবী তা আর স্পর্শ করেননি।

মক্কী জীবনে মদ হারাম না হলেও মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতটিতে سَكَرًا এর পর رِزْقًا حَسَنًا বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যে দ্রব্যটি হারাম হবে, তার উপর "উৎকৃষ্ট রিয্‌ক" শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নয়।

২. يَعْقِلُوْنَ শব্দটি عقل থেকে উৎপন্ন। سَكَرًا এর আলোচনার সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু নেশার কারণে আকল লোপ পেয়ে যায়, সুতরাং يَعْقِلُوْنَ-এর দ্বারা এ সত্যের প্রতিই

وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. আর আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ করেছেন যে, 'তুমি ঘর তৈরি কর– পাহাড়-পর্বতে, গাছে এবং মানুষ যে মাচা তৈরি করে তাতে[১]।

ثُمَّ كُلِیْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِیْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ یَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ

৬৯. 'অতঃপর সব রকমের ফল থেকে খাও[২], তারপর চল আপন রবের উন্মুক্ত-বাধাহীন পথসমূহে[৩]।' তার পেট থেকে নির্গত হয়

ইঙ্গিত করা হল যে, কুরআনের আয়াতসমূহ বুঝতে পারা আকলধারী (বুদ্ধিমান) লোকদের কাজ, নেশাখোরদের কাজ নয়।

১. (وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ)-অর্থাৎ আঙ্গুর-লতিকার জন্য যেসব মাচা তৈরি করা হয়, অথবা লোকেরা যে ঘরবাড়ী তৈরি করে (সেগুলিতেও মৌচাক তৈরি কর)।

মৌমাছিকে নির্দেশ দানের অর্থ এই যে, তাকে এরূপ স্বভাববিশিষ্ট বানানো হয়েছে যে, মামুলী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও সে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিগরি ও শিল্পনিপুণতার সাথে নিজ ঘর (বা মৌচাক) তৈরি করে। সকল মৌমাছি একটি বড় মৌমাছির অধীনে থেকে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কাজ করে। তাদের প্রধানকে রানীমৌমাছি বলা হয়। এরই সাথে আর সব মৌমাছি দলবদ্ধভাবে চলে।

মৌচাকের প্রত্যেকটি ঘর ছয়কোণ্ বিশিষ্ট এবং কোণ্গুলির মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হয়ে থাকে। রেখা টানার রুলার ও দিকদর্শন যন্ত্র ইত্যাদি ছাড়াই এরূপ নিপুণভাবে ঠিক একই আকৃতির তৈরি ঘরগুলির গঠনপ্রকৃতি মানুষকে সত্যিই বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। বৈজ্ঞানিকদের অভিমত এই যে, ঘরগুলো ছয়কোণ্ বিশিষ্ট না হয়ে অন্য যে কোনো আকৃতির হলে তাতে অবশ্যই কিছু স্থান অযথা পড়ে থাকত। আল্লাহ তাকে এমন আকৃতির পথনির্দেশ করেছেন, যাতে মৌচাকের সামান্য ফাঁকও অযথা পড়ে না থাকে।

২. فَاسْلُكِیْ ও كُلِیْ সবই আল্লাহর প্রাকৃতিক নির্দেশ, অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে তাকে পথনির্দেশ করা হয়েছে, যেন নিজ চাহিদা ও স্বভাব অনুসারে হরেক রকম ফলমূল থেকে খাদ্য আহরণ করে। সে মত মৌমাছি মৌচাক থেকে বের হয়ে নানা রকম ফুলফল চুষে থাকে এবং সেসব থেকে মধু, মোম প্রভৃতি তৈরি হয়।

৩. অর্থাৎ খাদ্য হাসিল করার পর মৌচাকের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন করার জন্য উন্মুক্ত পথ পড়ে রয়েছে– কোন বাধা বিপত্তি নেই। বস্তুত দেখা গেছে যে, মৌমাছিরা খাদ্যের অন্বেষণে কোন কোন সময় বহু দূরে চলে যায়, অতঃপর স্বচ্ছন্দে নিজেদের মৌচাকে ফিরে আসে, একটুও পথ ভুলে না।

কেউ কেউ فَاسْلُكِیْ سُبُلَ رَبِّكِ আয়াতাংশের এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার কাজকর্মের যে স্বভাবগত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তুমি তারই অনুসরণ করে চল– অর্থাৎ, ফুলফল চুষে আপন শক্তি, যোগ্যতা ও কৌশল দ্বারা মধু ইত্যাদি তৈরি কর।

مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۶۹﴾

নানা রঙের পানীয়[১], যাতে আছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি[২]। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে[৩]।

---

১. অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের মধু বের হয়, যথা– সাদা, লাল, হলুদ। কথিত আছে, রঙের বিভিন্নতা মৌসুম, খাদ্য ও মৌমাছির বয়স ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে। والله أعلم

২. অর্থাৎ নানা রোগে শুধু খাঁটি মধু অথবা অন্য ঔষধে মধু মিশিয়ে সেবন করলে আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সহীহ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তির দাস্ত হচ্ছিল। তার ভাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অবস্থা জানালে তাকে মধু পান করানোর নির্দেশ দিলেন। মধু পান করার পর দাস্ত বেড়ে গেল। তিনি পুনরায় খেদমতে গিয়ে আরয করলেন, হযরত! দাস্ত এখন বেশি হচ্ছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- صدق الله وكذب بطن أخيك (আল্লাহ সত্য, তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা)। আবার পান করাও। দ্বিতীয়বার পান করালেও আগের অবস্থাই হল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও তাই বললেন। অবশেষে তৃতীয়বার পান করালে দাস্ত বন্ধ হল এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠল। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২০২৮)

চিকিৎসকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে বলেছেন, কোন কোন সময় পেট খারাপ হয়ে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে খাদ্য বা ওষুধ যা কিছু পেটে পড়ুক, পেট তা ধারণ করতে পারে না। সুতরাং দাস্ত হতে শুরু করলেই কোন জোলাপ খাওয়াতে হয়, যাতে পেটের বদহজমী দূর হয়ে যায়। মুসহেল বা জোলাপ হিসাবে মধু যে একটি উপাদেয় বস্তু– এতে কারো দ্বিমত নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ এই নীতি অনুসারেই ছিল।

মামুন রশীদের শাসনামলে ছুমামা আব্‌সী এ ধরনের অসুখে পতিত হলে তখনকার রাজচিকিৎসক ইয়াযিদ ইবনে ইউহান্না জোলাপের দ্বারা তার চিকিৎসা করলেন এবং উক্ত যুক্তিই পেশ করলেন। বর্তমান কালের চিকিৎসকগণও পেটের অসুখের চিকিৎসায় মধুর ব্যবহারকে অত্যন্ত উপকারী বলে থাকেন।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মন্দ থেকে ভাল বের হয়ে আসার তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন– জন্তুর পেটের ভিতরে গোবর ও রক্তের উপাদান থেকে দুধ, নেশার মূল উপাদান (আঙ্গুর, খেজুর ইত্যাদি) থেকে পবিত্র খাদ্য এবং মৌমাছির পেট থেকে মধু। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনের বদৌলতে জাহেলদের সন্তানসন্ততির মধ্যে আলেম পয়দা করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে দেখা গেছে, কাফেরদের সন্তানসন্ততি কামেল আরেফ হয়েছে।'

৭০. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যাকে উপনীত করা হয় নিকৃষ্টতম বয়সে (অতি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য বয়সে), যাতে সে বোঝার পর (এখন) কিছু না বোঝে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পূর্ণ সক্ষম[১]।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۷۰﴾

[রুকূ - ১০]

৭১. আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রিযিকের ক্ষেত্রে। তো, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের রিযিক নিজেদের মালিকানাধীন দাস-দাসীকে এভাবে দিয়ে দেয় না যে, তারা সবাই তাতে সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর নে'য়ামতকে অস্বীকার করে[২]?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّیْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۷۱﴾

---

১. আল্লাহ তাআলার কুদরতের বহু বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করার পর এখন মানুষকে তার নিজের আভ্যন্তরীন অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সে কিছুই ছিল না, আল্লাহ তাআলা তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তারপর মৃত্যু পাঠিয়ে পূর্বের দেওয়া জীবন ফেরত নিয়ে নেন। সে কিছুই করতে পারে না। আর কতক মানুষকে মৃত্যুর পূর্বেই বৃদ্ধ বয়সের এমন স্তরে পৌঁছিয়ে দেন যে, তার শোধ-বোধ ঠিক থাকে না। হাত-পায়েও শক্তি থাকে না, একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যায়। কিছু বোঝেও না, আর বুঝলেও তা স্মরণ রাখতে পারে না।

এতে প্রমাণিত হল যে, জ্ঞান ও শক্তি একমাত্র সেই সত্তার ভাণ্ডারে রয়েছে, যিনি সকলের খালিক ও মালিক। তিনি যখন যতটুকু ইচ্ছা দান করেন, যখন ইচ্ছা ফেরত নিয়ে নেন।

হযরত শাহ সাহেবের মতে আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে কামেল মানুষ পয়দা হওয়ার পর আবার অপূর্ণ মানুষের সৃষ্টি হতে থাকবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. অর্থাৎ সকলকে সমপরিমাণ রিযিক দেওয়া হয়নি। যোগ্যতা ও অবস্থার পার্থক্যের আলোকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় হেকমত অনুযায়ী কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কাউকে তিনি ধনী ও কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়েছেন, যার অধীনে অনেক দাস-দাসী ও চাকর-বাকর থাকে, যারা তারই মাধ্যমে রুযী পায়। আর কতককে বানিয়েছেন দাস ও ভৃত্য, যারা নিজেরা এক পয়সা বা সামান্য ক্ষমতারও মালিক নয়, বরং সর্বদা মনিবের আদেশ-ইশারার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা তার মতই মানুষ।

৭২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের দিয়েছেন পুত্র ও পৌত্র[২]। এবং তোমাদের দিয়েছেন পরিচ্ছন্ন বস্তুরাজি[৩]। তবুও কি ওরা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে[৪]?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۟

এখন দুনিয়াতে কোন প্রভু কি এটা সহ্য করবে যে, তারা তার ধন-সম্পদে, মান-মর্যাদায় ও স্ত্রী প্রভৃতিতে সমান অংশীদার হয়ে যাবে? গোলামের ব্যাপারে শরী'য়তের বিধান তো এই যে, গোলামীতে থাকা অবস্থায় তাকে কোন কিছুর মালিক বানালেও মালিক হয় না, বরং মনিবই মালিক থাকে। আর যদি বা প্রভু তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিজ সম্পদ প্রভৃতিতে সমান অংশীদার বানিয়ে নেয়, তবে তারা উভয়ে পরস্পর সমান হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তখন গোলাম আর গোলাম রইল না। যা হোক, গোলামী ও সমান অংশীদারিত্ব একত্র হতে পারে না।

যখন একই জাতের ও সমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মালিক ও মালিকানাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমতা সম্ভব নয়, তখন খালেক ও মাখলূককে (অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে) উপাস্য ইত্যাদি হওয়ার ক্ষেত্রে সমান মনে করা হয় কী করে? এবং যেসব বস্তুকে স্বয়ং মুশরিকরা পর্যন্ত আল্লাহর মালিকানাধীন বলে স্বীকার করত, তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা কতই না সাংঘাতিক অপরাধ। যে বিষয় কবুল করতে নিজেরা অপ্রস্তুত, তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা খুবই নিমকহারামী!

(اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ...) –অর্থাৎ রুযী-রোযগার, ধন-সম্পদ প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহ তাআলা যেমন একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সকলকে একই স্তরে রাখেননি, তদ্রূপ ইলম ও মারেফত এবং নবুওয়াতের গুণাবলির মধ্যে কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকলে তা তো আল্লাহ তাআলারই দান, তাঁরই নেয়ামত। তাঁর এ নে'য়ামতকে অস্বীকার করার কারণ হঠকারিতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

১. অর্থাৎ মানব শ্রেণী থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে ভালবাসা ও হৃদ্যতা বজায় থাকে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় – وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে আরেকটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। –সূরা রূম, আয়াত ২১)

২. যারা তোমাদের বংশ রক্ষার মাধ্যম।

৩. যা তোমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব (বা জীবনধারণের) অবলম্বন।

৪. অর্থাৎ দেব-দেবীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে যে, তারা রোগমুক্ত করেছে, পুত্রসন্তান দিয়েছে বা রিযিক দান করেছে। এ সবই মিথ্যা। আর যিনি প্রকৃত দাতা, সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে না। (মুজেহুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

৭৩. আর ওরা আল্লাহ ছাড়া এমনসব বস্তুর উপাসনা করে, যারা ওদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে সামান্য কিছুও দেওয়ার মালিক নয়[১] এবং তারা (এর) ক্ষমতাও রাখে না[২]।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য নানা দৃষ্টান্ত স্থির করো না[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না[৪]।	فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

আর আয়াতে সম্ভবত এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ওরা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্থিতির উপায়-উপকরণকে তো স্বীকার করে এবং সেসবকে খুব গুরুত্ব দেয়। কিন্তু আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নে'য়ামত তথা নবীজীর হেদায়েতকে অস্বীকার করে, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী জীবনের একমাত্র উপায়। কবি বলেন– ألا كل شيء ما خلا الله باطل (খবরদার! আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল)।

১. অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণেরও ক্ষমতা রাখে না, মাটি থেকে শস্য উৎপনাদনও করতে পারে না। এ সত্ত্বেও কী করে ওরা সর্বশক্তির অধিকারী আল্লাহর শরীক হয়ে গেল?

২. অর্থাৎ বর্তমানেও উক্ত ক্ষমতা রাখে না, ভবিষ্যতেও হাসিল করতে পারবে না।

৩. মুশরিকরা বলত, মালিক তো আল্লাহই, এরা (দেবদেবীরা) তাঁর সরকারের অংশ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আমাদের কাজকাম এদেরই সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ, শাহানশাহর দরবার পর্যন্ত আমাদের পৌছা সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য, এই উদাহরণ ভ্রান্ত, এ কথা একক আল্লাহর বেলায় প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজ নিজে করেন– কোন মাধ্যমে হোক বা সরাসরি। তিনি কোন কাজই কারো কাছে এমনভাবে সোপর্দ করে রাখেন না, যেরূপ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা নিজেদের অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে কাজকামের ক্ষমতা অর্পন করে রাখে। অর্থাৎ অর্পন তো করে নিজ ইচ্ছা ও এখতিয়ারে, কিন্তু অর্পন করার পর সেসব ক্ষমতার ব্যবহারে অধীনস্থরা স্বাধীন। কোন ম্যাজিস্ট্রেট যখন বিচারিক রায় প্রদান করে, তখন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট সে বিচার বা ঘটনার আদৌ খবর রাখে না, এবং এই রায় দানে বাদশাহর ইচ্ছা ও মনোভাবের মোটেই প্রভাব থাকে না। এ অবস্থা কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে নেই, বরং ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাজ এবং মামুলি থেকে মামুলি বিষয়, চাই আসবাবের মাধ্যমে হোক বা মাধ্যম ছাড়া– তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই মানুষের উচিত, খুঁটিনাটি প্রত্যেক কাজের কর্তা বিশ্বাস করে তাঁকেই মা'বূদ ও সাহায্যস্থল মনে করা।

বি. দ্র. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীদের মতে فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ এর অর্থ এই যে, আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না।

৪. অর্থাৎ তোমরা জান না যে, আল্লাহর জন্য কিরূপ উপমা পেশ করা উচিত! তাঁর ক্ষেত্রে উপমা এমন হওয়া চাই, যা প্রকৃত সত্য ও সঠিক মর্ম প্রকাশে সহায়ক হয় এবং যা তাঁর মর্যাদা ও মহিমার খেলাফ নয়। যদি এমন সঠিক দৃষ্টান্ত পেতে চাও, তবে সামনে দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হচ্ছে। তা মনোযোগের সাথে শোন এবং তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা কর।

৭৫. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, (কারো) মালিকানাধীন একটি দাস, যে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না; আরেক ব্যক্তি আছে, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম জীবিকা দান করেছি, অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তারা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوۡكًا لَّا یَقۡدِرُ عَلٰی شَیۡءٍ وَّمَنۡ رَّزَقۡنٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنۡفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَّجَهۡرًا ؕ هَلۡ یَسۡتَوٗنَ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

৭৬. আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন ব্যক্তি– তাদের একজন বোবা[২], সে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না[৩] এবং সে

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَیۡنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبۡكَمُ لَا یَقۡدِرُ عَلٰی شَیۡءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰی

১. এক ব্যক্তি এমন, যে স্বাধীন নয়, অন্যের অধীন গোলাম। তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই। প্রত্যেক কাজে সে মুনিবের অনুমতির মুখাপেক্ষী। অনুমতি ছাড়া তার সকল কাজ মূল্যহীন। আর এক ব্যক্তি এমন, যে স্বাধীন ও ক্ষমতাধারী। তাকে আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে অনেক সামর্থ্য ও সম্পদ দান করেছেন। তা থেকে সে সর্বদা গোপনে ও প্রকাশ্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করে থাকে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?

ঠিক এরূপ বোঝা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের মালিক। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ তাঁর ভাণ্ডারে রয়েছে– যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে থাকেন, বাধাদানকারী কেউ নেই। খুঁটিনাটি সকল কিছুর উপর তাঁর সার্বিক ক্ষমতা ও একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। –এ অবস্থায় পাথরের একটি মূর্তিকে, যা কোন কিছুর মালিক নয় বরং যা স্বয়ং অন্যের মালিকানাধীন, তাকে আল্লাহর সমতুল্য করে দেওয়া কতই না অযৌক্তিক ও অন্যায় কথা! যদি পার্থিব জগতের মালিক ও দাস সমান না হতে পারে, তবে অন্যের মালিকানাধীন কোন কিছু প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলার সমান ও তাঁর শরীক হয় কী করে?

এ থেকে আরো বোঝা উচিত যে, এক আল্লাহর সেই ইবাদতকারী, যাকে তিনি ইলম ও ঈমানের মহাসম্পদ দান করেছেন এবং যাকে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে দিনরাত রূহানী নে'য়ামত বিতরণের তাওফীক দিয়েছেন– এমন তাওহীদবাদী মুমিনের সমান কি সেই অপবিত্র মুশরিক হতে পারে, যে কিনা পাথর-প্রতিমার ভক্ত-অনুরক্ত, কামনা-বাসনা ও ধারণা-কল্পনার সেবাদাস এবং নেক আমলাদি থেকে একেবারে রিক্তহস্ত? কিছুতেই নয়, আল্লাহর কসম।

২. যখন বোবা, অতএব সে বধিরও বটে। তাই সে নিজের কথা যেমন বলতে পারে না, অন্যের কথাও শুনতে পারে না।

৩. কেননা, তার শোধ-বোধও নেই, জ্ঞান-বুদ্ধিও নেই। তদুপরি সে পঙ্গু, চলতে ফিরতেও পারে না।

مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

নিজের মালিকের উপর বোঝা, মালিক তাকে যে দিকেই পাঠায় সে ভাল কিছু আনতে পারে না[১]। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সে আছে সরল পথের উপর[২]?

[রুকূ - ১১]

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়াদি(-র জ্ঞান) আল্লাহরই কাছে আছে[৩], আর কিয়ামতের বিষয়টি তো চোখের পলকতুল্য বা এর চেয়েও নিকটবর্তী[৪]।

---

১. অর্থাৎ মালিকের জন্য সে কোনো কাজের নয়, যেদিকেই তাকে পাঠানো হোক তার দ্বারা কোনই মঙ্গল হয় না।

২. অর্থাৎ নিজে সরল পথে কায়েম থেকে অন্যদেরও ন্যায় ও ইনসাফের পথে নিয়ে যায়। যখন এরা দুজন সমান হতে পারে না, তখন তোমাদের নিজ হাতে গড়া একটা পাথরমূর্তিকে কী করে আল্লাহর মর্যাদা দিতে পার?

অথবা মর্ম এই যে, একজন অন্ধ, বধির, মুশরিক, যে আল্লাহর সৃষ্ট রিযিক খেয়ে থাকে এবং যার দ্বারা এক কানাকড়ির উপকারও হয় না, সে ওই অনুগত মুমিনের সমকক্ষ কীভাবে হতে পারে, যে নিজেও সরল পথের উপর রয়েছে এবং অন্যদেরও পথে নিয়ে যাচ্ছে?

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) বলেন, 'অর্থাৎ আল্লাহর দুই মাখলুক– এক, পাথর-মূর্তি, একেবারে অথর্ব, নড়াচড়া বা চলাফেরাও করতে পারে না– যেমনঃ বোবা দাস। আর একজন রাসূল, যিনি হাজারো মানুষকে আল্লাহর পথ বলে দেন এবং নিজেও ইবাদত-বন্দেগীতে অবিচল রয়েছেন। এ দুয়ের মধ্যে কার আনুগত্য করা উচিত? পাথর-মূর্তির, না রাসূলের?"

৩. অর্থাৎ সকল সৃষ্টি এক রকম নয়। এক মানুষের অবস্থাই অন্যজন থেকে অনেক ভিন্ন। সব কিছুকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়নি। এর রহস্য এবং প্রত্যেকের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও গুপ্ত অবস্থার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সাথে পৃথক আচরণ করবেন এবং বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফল দান করবেন।

৪. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমনকে অসম্ভব মনে করো না, আল্লাহর নিকট কোন বিষয়ই কঠিন নয়। যখন সকল মানুষকে তিনি পুনরায় জীবিত করতে চাইবেন, তখন পলক ফেলার সময়ও লাগবে না। তাঁর ইচ্ছা হওয়ামাত্রই চোখের পলকে সমগ্র দুনিয়া পুনর্বার অস্তিত্ব লাভ করে ফেলবে।

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٧٧

আর আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[১]।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨

৭৮. আল্লাহ তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে তোমাদের এ অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছু জানতে না এবং তিনি তোমাদের দান করেছেন কান, চোখ ও অন্তর, যাতে তোমরা শোকর কর[২]।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ۭ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۭ

৭৯. ওরা কি পাখিদের দেখেনি, যারা আকাশের শূন্যলোকে (আল্লাহর হুকুমের) বশীভূত? তাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ধরে রাখে না[৩]।

বি. দ্র. كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ –সাধারণ মানুষের জ্ঞান বা উপলব্ধি অনুযায়ী সময়ের দ্রুততা প্রকাশার্থে চোখের পলকের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এর চেয়েও কম সময়ে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা, لَمْحِ الْبَصَرِ বা চোখের পলকও তো সময়গত ব্যাপার। পক্ষান্তরে, খোদায়ী ইচ্ছার বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ বিষয় নয়।

১. অর্থাৎ যাঁর সর্বব্যাপী ইলমের অবস্থা এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত রহস্য তাঁর সামনে উপস্থিত এবং যাঁর মহাশক্তি সৃষ্টিরাজ্যের অণুপরমাণুকে ঘিরে রয়েছে– তাঁর মত শক্তিমান আর কে হতে পারে এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত ও সমকক্ষ কোথা থেকে আনা যাবে?

২. অর্থাৎ জন্মের সময় তোমরা কিছুই জানতে না ও বুঝতে না। আল্লাহ তাআলাই জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ ও অনুভূতির আধার অন্তর তোমাদের দান করেছেন। এগুলি একদিকে যেমন অতি বড় বড় স্বতন্ত্র নে'য়ামত, অন্যদিকে লাখো নে'য়ামত উপভোগ করার মাধ্যম। চোখ, কান, আকল-বুদ্ধি ইত্যাদি না হলে সব উন্নতির দ্বারই বন্ধ হয়ে যাবে। মানব-সন্তানের বয়োবৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার জ্ঞান ও কর্মের শক্তিসমূহ ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে।

এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মানুষের উচিত ছিল, উক্ত শক্তিগুলি মাওলার আনুগত্যে ব্যয় করা এবং বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্য উপলব্ধি করা। তা না করে উলটা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোমর বেঁধে লাগা এবং প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ছেড়ে ইট-পাথরের পূজা করা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা-বিরুদ্ধ কাজ।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যেমন তার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন, পাখিকেও তদ্রূপ তার অবস্থার অনুকূল শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। প্রত্যেক পাখির উড্ডয়ন প্রক্রিয়া কুদরতী নিয়মের অধীন এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত বিধানের অনুগত। তাকে কোনো শিক্ষাঙ্গনে ওড়া শেখানোর প্রয়োজন হয়নি। আল্লাহ তাআলা তার পাখা, ডানা, লেজ ইত্যাদির ধরন-ধারণ এমন তৈরি করেছেন যে, অতি সহজে সে আকাশের বুকে উড়তে

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে[১]।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

৮০. আল্লাহ তোমাদের ঘর-বাড়ীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান বানিয়েছেন[২] এবং তিনি গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য এমন ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, যা তোমাদের নিকট হালকা মনে হয়– তোমাদের সফরের দিনে ও তোমাদের অবস্থানের দিনে[৩]। এবং ভেড়ার পশম, উটের পশম[৪] ও ছাগলের কেশ দ্বারা (তৈরি করেছেন) গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার্য বস্তু, (যা ব্যবহৃত হয়) একটা সময় পর্যন্ত[৫]।

থাকে। তার ভারি দেহ ইচ্ছার বাইরে নীচে পড়ে যায় না, অথবা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি ওর উড্ডয়নকে প্রতিহত করে ওকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো শক্তি আছে কি, যা আকাশের বুকে পাখিদের এভাবে ধরে রাখছে?

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জীবিকার চিন্তায় কিছু লোক ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে। তাই বলা হচ্ছে যে, মায়ের পেট থেকে তো কেউ কিছু নিয়ে আসে না, বরং জীবিকার্জনের প্রকৃত উপকরণ যথা চোখ, কান, অন্তর প্রভৃতি আল্লাহই দিয়ে থাকেন। আর আকাশের বুকে বিচরণকারী পাখিগুলি খাদ্যের অন্বেষণে শেষ পর্যন্ত তাঁর উপরই ভরসা করে।

২. অর্থাৎ তোমাদের ইট, পাথর, কাঠ প্রভৃতির ঘর দিয়েছেন (যার মধ্যে তোমরা বসবাস কর)।

৩. অর্থাৎ ইট-পাথরের বাসস্থান স্থানান্তরিত করা যায় না বলে তিনি চামড়া, লোম ইত্যাদির দ্বারা ডেরা ও তাঁবু তৈরি করতে শিখিয়েছেন, যেগুলি সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। ঘরে ও বাইরে যেখানে ইচ্ছা তা স্থাপন করতে পার, যখন ইচ্ছা গুটিয়ে রাখতে পার।

কোন কোন মুফাসসির تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ –এর এই অর্থ করেছেন যে, চলার সময় সহজে বহন করা যায় এবং কোথাও অবতরণ করে সহজে স্থাপনও করা যায়।

৪. أوبارها –অর্থাৎ উটের পশমের দ্বারা।

৫. অর্থাৎ এসব পশম ও কেশ দ্বারা বসবাস ও আরামের কত আসবাবপত্র তৈরি করা যায়, যা একটি নির্ধারিত সময় বা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাজ দেয়। যদি আল্লাহ তাআলা চোখ, কান এবং উন্নতি সাধনকারী মন-মস্তিষ্ক দান না করতেন, তবে এ সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা কীভাবে হত?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮১. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর সৃষ্ট বস্তুরাজি থেকে ছায়া তৈরি করেছেন[১] এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন[২] আর তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন পোশাক, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে[৩] এবং এমন পোশাক, যা তোমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরস্পরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে[৪]। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আজ্ঞাবহ হও[৫]।

---

১. উদাহরণস্বরূপ, মেঘমালা, গাছপালা, ঘর-বাড়ী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির ছায়া, যা কুদরতী নিয়ম অনুযায়ী মাটির উপর পড়ে। তাতে সৃষ্টিকুল আরাম পায়।

২. যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টি, রোদ বা শত্রু প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যেসব জামা তাপ থেকে আত্মরক্ষার উপায়, তা শীত থেকেও বাঁচার উপায়। তবে আরবে উষ্ণতার আধিক্য বলে বিশেষভাবে তাপ থেকে রক্ষা করার কথা উল্লেখ হয়েছে।

৪. অর্থাৎ যুদ্ধপোশাক, যা যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৫. অর্থাৎ লক্ষ কর, কীভাবে তিনি স্বীয় রহমতে সব রকমের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন এবং মানুষকে কীরূপ জ্ঞানশক্তি ও কর্মকৌশল দান করেছেন, যা কাজে লাগিয়ে মানুষ দুর্লভ ও বিস্ময়কর বস্তুরাজি আবিষ্কার করে চলেছে।

অতএব এ কি সম্ভব যে, যিনি দৈহিক ও বৈষয়িক জগতে এত সব অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষা ও পূর্ণতার ব্যাপারে মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন না? নিশ্চয় তিনি তাও পূর্ণ করেছেন- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করলাম। –সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

এজন্য সকল মানুষের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে, তাঁর অনুগ্রহের সামনে মাথা নত করে দেওয়া এবং প্রকৃত ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত, ভক্ত-অনুরক্ত ও আত্মসমর্পিত হয়ে থাকা।

৮২. এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া[১]।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

৮৩. ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ চেনে। অতঃপর তা অস্বীকার করে, আর ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ[২]।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ۝

[রুকূ - ১২]

৮৪. (সেদিনকে স্মরণ কর), যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা দাঁড় করাব, অতঃপর কাফেরদের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং ওদের তওবা করতেও বলা হবে না[৩]।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ এত অনুগ্রহের কথা শুনেও যদি ওরা আল্লাহর সামনে মাথা নত না করে, তবে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ করবেন না। আপনি নিজের কর্তব্য আদায় করেছেন। সকল জরুরী কথা পরিষ্কারভাবে শোনানো হয়েছে। এখন ওদের ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন।

২. অর্থাৎ কিছু বান্দা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞও বটে- وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ তবে অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই যে, ওরা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত দেখে ও তাঁর অনুগ্রহ বোঝে, কিন্তু যখন কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করার সময় আসে তখন সবই ভুলে যায়। বলতে গেলে, অন্তরে বিশ্বাস করে কিন্তু আমল দ্বারা অস্বীকার করে।

৩. এখান থেকে কুফরী ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, সেই দিন অবশ্যই আসবে, যেদিন পূর্বাপর সকল উম্মতই আহকামুল হাকেমীনের (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের) সর্বশেষ আদালতে দণ্ডায়মান হবে এবং প্রত্যেক উম্মতের নবীকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো হবে, যাতে তিনি নিজ উম্মতের নেককার ও বদকার (অর্থাৎ অনুগত ও অবাধ্যদের) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন যে, সত্যের বাণী ও বাণীবাহকের সঙ্গে কে কীরূপ আচরণ করেছে।

তখন অস্বীকারকারীদের মুখ খোলারও অনুমতি দেওয়া হবে না, আর না ওরা এই অসময়ে তওবা করে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। আর তখন মুখ খুলবেই বা কী করে; তখন তো, ওরা যে অপরাধী এবং কোন রকম ওজরই যে চলতে পারে না- এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন ওরা এও বুঝতে পারবে যে, এ হচ্ছে কর্মফলের স্থান, কর্মক্ষেত্র নয় যে, তওবা করে গোনাহ-খাতা মাফ করিয়ে নেবে।

৮৫. যখন জালেমরা আযাব দেখবে, তখন আর ওদের আযাব লঘু করা হবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না[১]।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর যখন মুশরিকরা নিজেদের শরীকদের দেখবে, তখন বলবে, 'হে আমাদের রব! এরা আমাদের শরীক, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম[২]'। তখন শরীকরা ওদের প্রতি এ কথা ছুড়ে মারবে যে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী'[৩]।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾

---

১. অর্থাৎ আযাবের কঠোরতা হ্রাসও পাবে না এবং তাতে বিরতিও হবে না, ফলে কিছু সময়ের জন্যও তা থেকে নিস্তার পাবে না।

وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ এর অর্থ কেউ কেউ এভাবে করেছেন যে, জাহান্নাম পাপীদের এমনভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, যেভাবে পাখী মুখে দানা তোলা মাত্র গিলে ফেলে। অর্থাৎ এ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতি দ্রুততার সাথে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২. অর্থাৎ আমরা তো এদের কারণেই ধ্বংস হলাম। সম্ভবত উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে, আমরা নিজেরা নির্দোষ। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এদের ডবল সাজা দিন।

৩. অর্থাৎ তোমরা মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার অনুসারী, এজন্যই আমাদের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে, নচেৎ আমরা কবে বলেছিলাম যে, আমাদের ইবাদত কর? আসলে তোমরা নিতান্তই নিজেদের আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করতে, যার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র ছিল না। আর না হয় তোমরা জিন ও শয়তানদের পূজা করতে। কিন্তু তখন শয়তানও এই বলে পৃথক হয়ে যাবে যে- وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ (আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না- তবে এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। -সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২২)

মোটকথা, মুশরিকরা যাদের উপাস্য বানিয়েছিল, তারা সবাই ওদের প্রতি নিজেদের অসন্তুষ্টি ও নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করবে- কেউ সত্যভাবে, কেউ মিথ্যা বলে। পাথর-মূর্তিদের তো কোন অনুভূতিই ছিল না। আর ফেরেশতা এবং যেসব নবী ও নেকলোকদের শরীক করা হত, তাঁরা সর্বদাই শিরকের প্রতি দারুণ ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের খাঁটি বান্দা হিসাবে পেশ করতেন। অবশ্য শয়তানদের পক্ষে শিরকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ব্যাপারটি নিতান্তই প্রতারণামূলক হবে। এসব দেখে মুশরিকরা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়বে এবং বুঝে ফেলবে যে, যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, আজ কোন উপকারেই আসবে না।

৮৭. আর ওরা সেদিন আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পন করবে এবং ওরা যে মিথ্যা রচনা করত তা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে[১]।

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَىِٕذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۝

৮৮. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, আমি ওদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করে চলব, কেননা ওরা দুষ্কর্ম করত[২]।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ۝

৮৯. (সেদিনকে স্মরণ কর), যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে একজন সাক্ষ্যদাতা দাঁড় করাব, এবং আপনাকে উপস্থিত করব এদের বিষয়ে সাক্ষীরূপে[৩]। আর আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি- যা প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাকারী[৪] এবং

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

---

১. অর্থাৎ তখন সমস্ত লক্ষ-ঝক্ষ ও মিথ্যাচার গায়েব হয়ে যাবে, আর সকলে অক্ষম হয়ে ও ধাতানি খেয়ে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে।

২. অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করার কারণে এক আযাব আর অন্যদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেওয়ার কারণে দ্বিতীয় আযাব দেওয়া হবে। অথবা অপরাধের সূচনা করার জন্য এক শাস্তি আর অপরাধে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় শাস্তি হবে।

যা হোক, আয়াত থেকে জানা গেল, বেহেশতে যেমন বেহেশতীদের বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা হবে, তদ্রূপ দোযখীদের আযাবের ধরন-ধারণ, রকম-সকম ও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

৩. অর্থাৎ সেই ভয়াবহ দিনটি স্মরণ রাখার যোগ্য, যেদিন প্রত্যেক পয়গম্বর স্বীয় উম্মতের আমলাদি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারে সাক্ষ্য দান করবেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করবেন। বরং কোন কোন মুফাসসিরের মতে, তিনি ঐ সাক্ষ্যদাতাদের পক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য দান করবেন যে, নিশ্চয় তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

হাদীসে এসেছে, প্রতিদিন উম্মতের আমল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হয়ে থাকে- ভাল আমল দেখে তিনি আল্লাহর শুকর আদায় করেন, আর বদ আমল সম্বন্ধে অবগত হয়ে হতভাগাদের জন্য এসতেগফার করেন। (মুসনাদে বায্‌যার, হাদীস : ১৯২৫; ফাযলুস সালাত আলান নাবী, হাদীস : ২৫)

৪. অর্থাৎ কুরআন করীমের মধ্যে হেদায়াতের যাবতীয় জ্ঞান, দীনের মৌলিক নীতিমালা ও উভয় জাহানের সফলতা সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলির পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামতের

وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝٨٩

হেদায়েত ও রহমত, আর আদেশ মান্যকারীদের জন্য সুসংবাদদাতা[১]।

[রুকূ - ১৩]

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, কল্যাণসাধন, ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করেন[২]

উপরোক্ত ঘটনাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে নবীর প্রতি এমন পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব-কর্তব্যও অনেক বড় হবে। অর্থাৎ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ এর পর وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ইরশাদ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদা এবং সে অনুযায়ী তাঁর গুরু দায়িত্বের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে- فَلَنَسْاَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْاَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ (অতএব আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করব, যাদের প্রতি (রাসূল) পাঠানো হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রাসূলদের। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর (র) বিষয়টির কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. অর্থাৎ এ কিতাব সমগ্র বিশ্বের জন্য আদ্যোপান্ত হেদায়েত ও জীবন্ত রহমত। আর এটি অনুগত বান্দাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ শোনায়।

২. কুরআনকে যে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে, এ আয়াতটি তার অন্যতম নমুনা। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা সকল ভাল ও মন্দের বর্ণনাকে বর্তমান আয়াতে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন, অর্থাৎ –ভাল বা মন্দ– এমন কোনো আকীদা, আচার-ব্যবহার, নিয়ত, আমল, লেনদেন নেই, যা আয়াতটির অধীনে না এসেছে। এসবের মধ্যে যা ভাল, আয়াতে তার আদেশ করা হয়েছে, আর যা মন্দ তা নিষেধ করা হয়েছে (আল আদাবুল মুফরাদ, বর্ণনা ৪৮৯)। কোন কোন আলেম লিখেছেন, কুরআনে আর কোন আয়াত না থাকলেও এই একটি আয়াতই تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সম্ভবত এ জন্যই খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) জুমার খুতবার শেষাংশে আয়াতটিকে সংযোজন করে দিয়ে উম্মতের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা কায়েম করে গেছেন।

আয়াতটির কিঞ্চিত ব্যাখ্যা

এ আয়াতখানি কতটা ব্যাপক-বিস্তৃত অর্থ-মর্মপূর্ণ, তা বোঝানোর জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন। তবে কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য এতটুকু বলা যায় যে, আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে– (১) عدل (২) إحسان (৩) إيتاء ذي القربى

عدل এর অর্থ এই যে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, স্বভাব-চরিত্র, লেনদেন, আবেগ-অনুভূতি সবই ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ডে নির্ণিত হতে হবে, বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না। কঠিন থেকে কঠিনতর শত্রুর সাথে আচার-ব্যবহারের

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘন[১]। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন,

---

ক্ষেত্রেও ন্যায়ের পাল্লা হাতছাড়া করা যাবে না। ভিতর-বাইর একই রকম হতে হবে। যা নিজের জন্য পছন্দ করবে না, তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা চলবে না।

احسان! এর অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে নেকী ও কল্যাণের প্রতীকে পরিণত করবে এবং অন্যদের মঙ্গল কামনা করবে। ন্যায় ও ইনসাফের স্তর থেকে উর্ধ্বে উঠে দয়া ও ক্ষমা এবং সহানুভূতি ও সমবেদনার অভ্যাস অবলম্বন করবে। ফরয আদায় করার পর নফলের প্রতিও অগ্রসর হবে, ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সৌজন্য-ভদ্রতার সমাবেশ ঘটাবে। এবং বিশ্বাস রাখবে যে, যা কিছু নেকী সে করছে আল্লাহ তা দেখছেন। তাঁর পক্ষ থেকে কল্যানের প্রতিদান কল্যাণের আকারেই দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীতে (হাদীস : ৫০) আছে : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه: فإنه يراك — সূরা রহমানে (আয়াত : ৬০) আছে : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

(ايتاء ذي القربى)- উক্ত দুটি অভ্যাস (অর্থাৎ عدل ও إحسان -অন্য কথায় ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতা) নিজের সঙ্গে এবং আত্মীয়-অনাত্মীয় ও শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক অনাত্মীয়দের চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়া উচিত। আত্মীয়তার সম্পর্ক, যা আল্লাহ তাআলা পরস্পরের মধ্যে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, কিছুতেই উপেক্ষা-অবহেলা করা যায় না, বরং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সঙ্গে ভদ্রতা ও এহসান অনাত্মীয়দের তুলনায় একটু বেশি হওয়া উচিত। আত্মীয়দের প্রতি সদাচারণ করা একটি স্বতন্ত্র নেকী, যা আত্মীয়স্বজনের স্তরভেদ অনুযায়ী আঞ্জাম দেওয়া উচিত।

ফলকথা, إحسان এর পর বিশেষভাবে ايتاء ذي القربى এর উল্লেখ দ্বারা এ-ই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আদল ও ইনসাফ তো সকলের জন্যই এক রকম, কিন্তু ইহসান ও মহানুভবতার বেলায় কোন কোন ক্ষেত্র ও পাত্র অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বের অধিকারী। এই স্তরভেদ বা পার্থক্যকে ভুলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিয়ম-নীতি ভুলে যাওয়া।

উক্ত শব্দ তিনটির এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ করে বুদ্ধিমান মাত্রই বিলক্ষণ বুঝতে পারেন যে, দুনিয়াতে মানব-স্বভাবের এমন কোনো সৌন্দর্য, কল্যাণ ও পুণ্য নেই, যা উল্লিখিত শব্দ তিনটির মর্মের অধীন নয়। فلله الحمد والمنة

১. নিষেধও তিনটি জিনিস থেকে করা হয়েছে- ১. فحشاء ২. منكر ৩. بغي

বস্তুত, মানুষের মধ্যে এমন তিনটি শক্তি রয়েছে, যার অপব্যবহারেই সকল খারাবী ও অনর্থ সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে- পশুসুলভ কামশক্তি, শয়তানী কল্পনাপ্রসূত শক্তি ও হিংস্র ক্রোধশক্তি। فحشاء-দ্বারা সেসব নির্লজ্জতার কাজ উদ্দেশ্য, যার উৎস বা মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি ও পাশবিকতার বাড়াবাড়ি। منكر হচ্ছে মা'রূফের বিপরীত- অর্থাৎ সেসব অসমীচীন কাজ, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও সঠিক জ্ঞান যার অনুমতি দেয় না। বলতে গেলে, যখন শয়তানী কল্পনাপ্রসূত শক্তির প্রভাবে ফেরেশতাসুলভ জ্ঞান-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন 'মুনকার' সংঘটিত হয়ে থাকে।

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝٩٠

যাতে তোমরা স্মরণ রাখ[১]।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۝٩١

৯১. আর তোমরা আল্লাহর (নামে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং শপথ পরিপক্ক করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে নিজেদের জামিন বানিয়েছ। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ জানেন[২]।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে بغي অর্থাৎ সীমা অতিক্রম করা, জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হওয়া, হিংস্র জন্তুর মত আচরণ করা এবং অন্যের ধন, প্রাণ, সম্মান ইত্যাদি হনন করার জন্য অন্যায়ভাবে হস্ত সম্প্রসারণ করা। এ ধরনের সকল আচরণ হিংস্র ক্রোধ-শক্তির অপব্যবহার দ্বারা পয়দা হয়ে থাকে।

মোটকথা, আয়াতে সতর্ক করা হচ্ছে যে, মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত উক্ত তিনটা শক্তিকে বশে না রাখবে এবং ফেরেশতাসুলভ জ্ঞান-শক্তিকে এসবের শাসক (حاكم) না বানাবে, ততক্ষন পর্যন্ত সে সভ্য ও পবিত্র হতে পারে না।

১. আকছাম ইবনে সয়ফী রা এ আয়াত শুনে তাঁর সম্প্রদায়কে গিয়ে বলেছিলেন, আমি দেখছি, এ পয়গম্বর সকল উত্তম চরিত্র ও মহৎ আচরণের হুকুম করেন এবং হীন আচরণ ও নীচ কাজকাম করতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা অবিলম্বে তাঁর অনুসারী হয়ে যাও- فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولاتكونوا فيه اذنابا (তোমরা এ বিষয়ে মাথা হও, লেজ হয়ো না অর্থাৎ অগ্রগামী হও, পিছনে থেকো না)। [আলইস্‌তীআব ১/১৪৬)

হযরত উছমান ইবনে মাযউন (রা) বলেন, এ আয়াতখানি শোনার পরই আমার অন্তরে ঈমান পরিপক্ক হয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বসে যায়। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ২৯১৯)

২. উপরের আয়াতে যেসব কাজ করার বা ছাড়ার নির্দেশ ছিল, এখানে সেসব থেকে কয়েকটি বিশেষভাবে বর্ণিত হচ্ছে– অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ না করা। কেননা, এসব বিষয় এমনিতেও অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তখনকার শ্রোতাদের অবস্থার সঙ্গে ছিল খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এবং মুসলিম জাতির উন্নতি ও ভবিষ্যত সফলতার উপর এর অসামান্য প্রভাব পড়ার ছিল। এ জন্যই হুকুম হয়েছে যে, যখন আল্লাহর নাম নিয়ে এবং কসম খেয়ে অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহর পবিত্র নামের মর্যাদা রক্ষা কর। কোন জাতি বা ব্যক্তির সঙ্গে যখন এমন অঙ্গীকার কর যা শরী'য়তবিরুদ্ধ নয়, তখন শত অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হলেও তা পূর্ণ করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বলা হয়- قول مرداں جان دارد (পুরুষদের কথার প্রাণ আছে)!

বোঝা উচিত যে, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করা মানে আল্লাহকে উক্ত ব্যাপারে সাক্ষী বা জামিন বানানো। যখন তোমরা তাঁকে সাক্ষী বানাও, তিনি তা জানেন। আর এ সাক্ষীর

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ

৯২. আর যে নারী মজবুত করে সুতা পাকানোর পর তার পাক খুলে সুতাগুলি আলাদা আলাদা করে ফেলে, তোমরা তার মত হয়ো না[১] যে, তোমরা নিজেদের কসমকে পরস্পরের মাঝে প্রতারণার মাধ্যম বানাবে, যাতে (তোমাদের) এক দল অন্য দলের চেয়ে (মর্যাদা, শক্তি ইত্যাদিতে) সমৃদ্ধ হয়ে যায়[২]। আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন[৩]। এবং তিনি

মর্যাদা কতটুকু রক্ষা কর, তাও তিনি জানেন। যদি তোমরা খিয়ানত বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর, তবে তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী এর শাস্তি দেবেন। কেননা, তোমাদের কোন প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দাগাবাজিই তাঁর থেকে গোপন থাকতে পারে না।

১. অর্থাৎ অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা এমনি বোকামী, যেমন কোন মহিলা দিনভর সূতা পাকানোর পর সন্ধ্যায় তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে। মক্কার এক পাগলি মেয়ে এরূপই করত। অর্থাৎ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য সুতার ন্যায় মনে করা– যখন ইচ্ছা পাকালাম, যখন ইচ্ছা আঙ্গুলের সামান্য টানে ছিঁড়ে ফেললাম– এটা নিতান্তই অদূরদর্শিতা ও পাগলামির পরিচায়ক। অঙ্গীকার ও কথার মূল্য না থাকলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

কিন্তু যেসব জাতি ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ বর্জন করে শুধু স্বার্থ ও কামনা-বাসনার পূজা করতে শুরু করে, তাদের কাছে অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য থাকে না। তারা যেন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করারই জন্য। তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ অপর পক্ষকে নিজেদের তুলনায় দুর্বল দেখলেই সকল প্রতিশ্রুতি পশ্চাতে নিক্ষেপ করে।

২. অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ও শপথকে ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও হিলা-বাহানার অস্ত্র বানিয়ো না– যেরূপ জাহেলিয়াতের যুগে মানুষের অভ্যাস ছিল যে, কোন সম্প্রদায়কে নিজেদের অপেক্ষা সবল দেখে তাদের সাথে অঙ্গীকার করল। পরে যখন তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা ও শক্তিশালী দলের সম্মুখীন হল, তখন প্রথমোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নতুন দলের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার করে ফেলল। আবার কিছুদিন পর যখন এই চুক্তিবদ্ধ লোকদের দুর্বল বানানোর এবং নিজেদের সবল বানানোর সুযোগ পেল, অমনি সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলল। ঠিক যেরূপ চরিত্র বর্তমান কালের ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়।

৩. অর্থাৎ শক্তি ও দুর্বলতার বিবেচনায় জাতিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য, তা তোমাদের পরীক্ষার জন্যই রাখা হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি রক্ষার নির্দেশ দানের মধ্যেও তোমাদের জন্য পরীক্ষা রয়েছে। তা এই যে, তিনি দেখবেন– কে প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের অঙ্গীকার পালনে দৃঢ় থাকে; আর কে এমন নয়। বাকি উত্থান-পতন আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নয়। পতনের স্থলে উত্থান এবং দুর্বলতার স্থলে শক্তি-সামর্থ্য দেওয়া আল্লাহরই মুঠিতে। তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইচ্ছা এ কথার আলামত যে, পতন ও ধ্বংস সমাগত।

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য সেই বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট করে দেবেন, যাতে তোমরা মতভেদ করতে[১]।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন[২], কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছু কর, সে সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে[৩]।

وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. তোমরা তোমাদের কসমকে পরস্পরের মধ্যে প্রতারণার মাধ্যম বানিয়ো না। তা হলে পা স্থির হওয়ার পর বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং তোমরা শাস্তি আস্বাদন করবে, কেননা (এরূপ করে) তোমরা আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছ। আর তোমাদের জন্য থাকবে কঠোর শাস্তি[৪]।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ

৯৫. এবং আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না।

---

১. অর্থাৎ দুনিয়া পরীক্ষার স্থল। আর পরীক্ষার ফলাফল কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে, যেদিন দুর্বল ও শক্তিমানের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে কোনো মতভেদ থাকত না। কিন্তু এমনটি করা হেকমত-বিরুদ্ধ ছিল। ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ থেকে বোঝা গেল, কাফেরদের সাথেও প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়। এর দ্বারা কুফর মিটে না, উল্টো নিজের উপর বিপদ আসে।'

৪. অর্থাৎ অঙ্গীকার ও শপথ ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার পথ তৈরি করো না এবং মুসলমান জাতির দুর্নাম করো না। কেননা, তোমাদের মন্দ কর্মপন্থা দেখে যারা ঈমান আনার তারা সন্দেহে পতিত হবে এবং অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহ ইসলামের ছায়াতলে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে, ফলে আল্লাহর পথে বাধা প্রদানের পাপে তোমরা পাপী হবে, যার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।

إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আল্লাহর নিকট যা আছে নিশ্চয় তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, যদি তোমরা জান[১]।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা কখনো শেষ হবে না[২]। আর আমি ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের প্রতিদান অবশ্যই দিব তারা যেসব উত্তম আমল করত তার বিনিময়ে[৩]।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৭. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আর সে হবে ঈমানদার- আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই এমন লোকদেরকে তাদের প্রতিদান দান করব[৪]- তারা যেসব উত্তম আমল করত তার বিনিময়ে।

---

১. এতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নিজেদের মধ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা হয়েছে। এখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, ধন-সম্পদের লোভে শরী'য়ত-বিরুদ্ধ কাজ করো না। কারণ, পরিণামে তা বিপদ ডেকে আনবে। (إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ...) অর্থাৎ শরী'য়তসম্মতরূপে যা হস্তগত হয়, তাই তোমাদের জন্য উত্তম। অথবা অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুতি পালনের যে প্রতিদান আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে, তা এই তুচ্ছ মূল্য থেকে বহু গুণে শ্রেয়।

ثَمَنًا قَلِيْلًا -'সামান্য মূল্য' বলার কারণ এই যে, সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ লাভ হলেও তা আখেরাতের মোকাবেলায় অতি তুচ্ছ ও নগন্য।

২. অতএব অক্ষয় ও চিরস্থায়ী সম্পদ ছেড়ে ভঙ্গুর ও অস্থায়ী সম্পদ গ্রহণ করা মোটেই বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় থাকবে এবং ধৈর্যের সাথে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে, তাদের প্রতিদান বিনষ্ট হওয়ার নয়- এরূপ উত্তম আমলের প্রতিদান তারা আল্লাহর নিকট অবশ্যই পাবে।

৪. উপরের আয়াতে ধৈর্যধারণকারী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীদের প্রতিদানের উল্লেখ ছিল। এ আয়াতে সকল সৎকর্ম সম্বন্ধে সাধারণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। যার সারকথা এই যে, যে কোন পুরুষ বা নারী নেক কাজকর্মে অভ্যস্ত হবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই পাক-পবিত্র ও

৯৮. আপনি যখন কুরআন পড়েন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন[১]।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝٩٨

আনন্দময় জীবন দান করবেন। তবে শর্ত এই যে, সেই কর্ম শুধু বাহ্যত নয় বরং প্রকৃতই সৎ হতে হবে, অর্থাৎ তাতে ঈমান ও সহীহ মারেফতের রূহ থাকতে হবে। তাহলে আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও শান্তি-সুখের জীবন দান করব। সে দুনিয়াতে হালাল জীবিকা, অল্পে সন্তুষ্টি, অন্তরের ঐশ্বর্য, শান্তি ও নিশ্চিন্ততা, যিকরুল্লাহর স্বাদ, আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ, আবদিয়তের দায়িত্ব পালনের আনন্দ, সফল ভবিষ্যতের আশা, আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের স্বাদ– লাভ করবে। এ স্বাদের মাধুর্য উপভোগ করে এক আরেফ বলেছিলেন-

چوں چتر سنجری رُخ بختم سیاہ باد ÷ در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم
زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب ÷ من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم

(আমার চেহারা ছাতার মত কালো 'সানজারী' হয়ে যাক, যদি আমার অন্তরে 'সানজার' দেশের রাজ ক্ষমতার একটু অভিলাষ থেকে থাকে। যেদিন থেকে 'অর্ধ রজনীর' রাজত্বের সংবাদ পেয়েছি, আমি যবের একটি দানার বিনিময়েও 'অর্ধ দিবসের রাজত্ব' ক্রয় করব না)।

বাস্তব সত্য এই যে- أهل اليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهم (রাত-জাগরণকারীদের কাছে রাত-জাগরণ ক্রীয়ামোদীদের কাছে ক্রীয়ার যে আনন্দ তার চেয়ে বেশি মজাদার)।

এ জন্যই এক বুযুর্গ বলেছেন, রাজা-বাদশাহরা যদি জানতে পারে যে, রাতজাগরণে কী আনন্দ ও স্বাদ, তবে তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সৈন্য নিয়ে অভিযান চালাবে, যেমন রাজত্ব দখলের জন্য করে থাকে।

যা হোক, ফরমাবরদার মুমিনের পবিত্র ও আনন্দময় জীবন দুনিয়া থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। কবরে পৌছার পর এর ঔজ্জ্বল্য আরো গাঢ় হয় এবং পরিশেষে ফুলেফলে সজ্জিত হয়ে তা সেই "হায়াতে তায়্যেবা"র রূপ ধারণ করে, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে- (মৃত্যুহীন জীবন, দারিদ্র্যহীন ধনাঢ্যতা, রোগবিহীন সুস্বাস্থ্য, পতনহীন সাম্রাজ্য ও দুর্ভাগ্যহীন সৌভাগ্য)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার দয়া ও মেহেরবানীতে আমাদেরও তা দান করুন।

বি. দ্র. : আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা গেল, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে নেকি ও সফলতার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর একই নীতি– অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী সৎকর্ম করে উল্লিখিত পবিত্র জীবন হাসিল করতে পারে।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

হাদীসে আছে- خيركم من تعلم القرآن وعلمه (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫০২৭)। বোঝা গেল, মুমিনের জন্য কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে সর্বোত্তম কাজ। আর পূর্ববর্তী

৯৯. নিশ্চয় তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আপন রবেরই উপর ভরসা করে[১]।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর, যারা ওকে বন্ধু বানায় এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে[২]।

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

আয়াতগুলিতে দু'বার উত্তম কাজকর্মের প্রতিদান লাভের কথা বলা হয়েছে। এজন্য এখানে কুরআন পাঠের কতিপয় আদব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে মানুষ অসতর্কতার কারণে এই উত্তম কাজের বিনিময় বিনষ্ট করে না বসে।

কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে اعوذ بالله পড়ার গুরুত্ব

শয়তান লোকদের নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে, বিশেষত সমস্ত নেক কাজের উৎস এই কুরআন পাঠকে সে কখনই সহ্য করতে পারে না– বরং সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, যেন মুমিনকে এ থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে। আর এতে কৃতকার্য না হলে বিভিন্ন ভ্রান্তিতে (রিয়া, তিলাওয়াতের আদব রক্ষা না করা ইত্যাদি– অনুবাদক) ফেলার চেষ্টা করে, যাতে সে কুরআন পাঠের উপকারিতা হাসিল করতে না পারে। শয়তানের এসব বিভ্রান্তিকর কলা-কৌশল ও অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ এই যে, যখন মুমিন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে খাঁটি দিলে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করবে এবং অভিশপ্ত শয়তানের ফাঁদ থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে এসে পড়বে। এই আশ্রয়গ্রহণ অন্তরের দ্বারাও করবে, আর মুখ ও অন্তরকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে মুখের দ্বারাও; অর্থাৎ পাঠের শুরুতে পড়বে– أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করল এবং তাঁরই আশ্রয় নিল, তার উপর শয়তান শক্তিশালী আক্রমণ করতে পারে না। এমন ব্যক্তি যদিও বা কোন সময় স্বল্প সময়ের জন্য মানবিক দুর্বলতার কারণে শয়তানের প্ররোচনায় এসে যায়, তবু শয়তান তার উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। শীঘ্রই তার চোখ খুলে যায় এবং গাফলতের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় না। ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ- وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (যাদের অন্তরে ভয় রয়েছে, তাদের যখনই শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের চোখ খুলে যায়। আর যারা শয়তানদের ভাই, ওদেরকে শয়তানরা গোমরাহীর মধ্যে টেনে নিতে থাকে, আর এরা এ বিষয়ে কোন ত্রুটি করে না। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ২০১-২০২)

২. অর্থাৎ যারা নিজেরাই শয়তানকে আপন বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং এক আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের উপর ভরসা রাখে, অর্থাৎ ওকে খোদায়ী শক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করে, অথবা ওর প্ররোচনায় অন্য কিছুকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে– ওদের উপরই শয়তানের পূর্ণ আধিপত্য চলে, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত ওদেরকে আঙ্গুলের উপর নাচায়।

[রুকূ - ১৪]

وَاِذَا بَدَّلۡنَاۤ اٰیَۃً مَّکَانَ اٰیَۃٍ ۙ وَّاللّٰہُ اَعۡلَمُ بِمَا یُنَزِّلُ قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُفۡتَرٍ ؕ بَلۡ اَکۡثَرُہُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۞

১০১. আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত অবতীর্ণ করি- আর আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি কী অবতীর্ণ করেন- তখন ওরা বলে, 'তুমি তো (নিজের পক্ষ থেকে) রচনা কর'। বরং ওদের অধিকাংশই জানে না[১]।

---

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বে আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন পাঠের সময় অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, যাতে সে এ উত্তম কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। এখন কিছু সংশয় উল্লেখ করা হচ্ছে, যা শয়তান পবিত্র কুরআন সম্পর্কে পয়দা করে থাকে।

'নাস্‌খ' (হুকুম রহিতকরণ) সম্পর্কে সংশয়ের উত্তর

সমগ্র কুরআন একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হত। কখনো কখনো কিছু সাময়িক বিধানও আসত, পরে আবার অবস্থার পরিবর্তনে অন্য নির্দেশ আসত। যেমন প্রথমদিকে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা এবং হাত সংযত রাখার নির্দেশ ছিল, কিছুদিন পর জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। (তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে) প্রথমদিকে এই হুকুম ছিল- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ الخ (রাতে নামাযে দণ্ডায়মান থাকুন, কিছু অংশ ছাড়া, অর্থাৎ দণ্ডায়মান থাকুন- আধা রাত, ...)। কিছুদিন পর মক্কী জীবনেই নিম্ন আয়াত নাযিল হয়-عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (তিনি জানেন যে, তোমরা তার সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। এখন কুরআন থেকে পড়- যতটুকু সহজ হয় -মুয্‌যাম্মিল, আয়াত : ২-৩ ও ২০)

কাফেররা এসব শুনে প্রশ্ন করত, এ আল্লাহর কালাম কী করে হতে পারে? আল্লাহ তাআলা কি প্রথমে অজ্ঞাতভাবে একরকম নির্দেশ দিয়ে দিলেন, পরে জ্ঞাত হয়ে অন্য নির্দেশ অবতরণ করলেন? মনে হয়, এই কালাম আপনি নিজে তৈরি করেন। নতুবা আল্লাহর নির্দেশাবলি এ রকম হতে পারে না যে, একদিন একটা আবার অন্যদিন আর একটা। শয়তানের পক্ষে এ ধরনের নানা ওয়াসওয়াসা কোন কোন মুসলমানের অন্তরেও ঢেলে দেওয়ার আশঙ্কা ছিল।

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তোমাদের এ প্রশ্ন নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। তোমরা যদি 'নাসখের' তাৎপর্য্য বুঝতে, তবে কষ্মিনকালেও এমন কথা বলতে না। এইটুকু বুঝে নাও যে, একটি সাময়িক হুকুমের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে দ্বিতীয় হুকুম পাঠানো হয়। কোন চিকিৎসকের হাতে সময়ের ব্যবধানে রোগীর ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের যে পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাকে কি চিকিৎসকের অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার কারণ বলা হয়ে থাকে? কখনই না। বরং যে

১০২. আপনি বলুন, 'এটি 'রূহুল কুদুস' (তথা জিবরাঈল আ.) আপনার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছেন[১]– ঈমানদারদের মজবুত করার জন্য এবং মুসলমানদের হেদায়েত দান ও সুসংবাদ দেওয়ার জন্য[২]।'

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۝

১০৩. আমি ভাল করেই জানি যে, ওরা বলে, 'তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়[৩]।' (অথচ) যার প্রতি ওরা ইঙ্গিত করে

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ

ব্যক্তি এমন উক্তি করবে, তাকেই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ বলা হবে। তদ্রূপ, যখন যে নির্দেশ অবতীর্ণ করা হয় অর্থাৎ যে রূহানী খাদ্য বা ওষুধ নিরূপন করা হয়– তা রোগীদের মেয়াদ ও অবস্থাদির জন্য কতটুকু উপযোগী, তা আল্লাহই ভাল জানেন এবং সে অনুসারেই আয়াত ও বিধান অবতীর্ণ করেন।

১. অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আমার বা কোন মানুষের তৈরি করা কালাম নয়। এ তো সেই কালাম, যা নিঃসন্দেহে আমার প্রভু রূহুল কুদুস (অর্থাৎ পবিত্র ফেরেশতা জিবরাঈল আমীন) মারফত হেকমত ও কল্যাণ অনুযায়ী নাযিল করেছেন। مِنْ رَّبِّكَ (তোমার পালন-কর্তার পক্ষ থেকে) বলে যেন ইঙ্গিত করলেন যে, এর অবতারণকারী হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিস্ময়কররূপে এমন সর্বোত্তম চরিত্রে গড়ে তুলেছেন, যা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত। আর رُوْحُ الْقُدُسِ– এর মাধ্যমের কথা উল্লেখ করে এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, যে কালামের বাহক روح القدس কে বানানো হয়েছে, তাকে রূহানিয়ত, পবিত্রতা ও ফেরেশতার গুণাবলির প্রতিচ্ছবি হতে হবে। অতএব দেখে নাও– এসব গুণাবলিতে পরিপূর্ণ এবং এমন মর্যাদার আর কোন কালাম আকাশের নীচে দৃষ্টিগোচর হয় কি না।

২. অর্থাৎ সময়ে সময়ে ও ক্রমান্বয়ে হুকুম-আহকাম ও আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হচ্ছে– এটা দেখে ঈমানদারদের অন্তর সবল ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তারা ভাবে যে, আমাদের রব সকল অবস্থা এবং জীবনের প্রত্যেক আবর্তন সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত আছেন এবং পরম হেকমতের সঙ্গে আমাদের তরবিয়ত করছেন ও অবস্থা অনুযায়ী পথনির্দেশ করছেন এবং প্রত্যেক নেক কর্মের জন্য উপযোগী সুসংবাদ শোনাচ্ছেন।

৩. অর্থাৎ (তারা বলে,) কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম নয়, আল্লাহর হলে তাতে 'নাসখ' হত না। আর এ আপনারও কালাম নয়– কারণ, আপনি যে নিরক্ষর তা সকলের জানা।

যে নিরক্ষর মানুষটি জীবনে কখনো কোনো কিতাব স্পর্শ করেননি, কলমও হাতে নেননি, বরং কুরায়শ বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি কবিতাও মুখে উচ্চারণ

لِسَانُ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ

তার ভাষা আরবী নয়, আর এ (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) পরিষ্কার আরবী ভাষা[১]।

করেননি— তাঁর পক্ষে কী করে চিন্তা করা যায় যে, তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া হঠাৎ করে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে এনেছেন, যা এরূপ বিস্ময়কর ও দুর্লভ জ্ঞান-গরিমা, হৃদয়স্পর্শী হেদায়েত এবং বৈপ্লবিক আইন-কানুন ও হুকুম- আহকাম সম্বলিত? স্বভাবতই বলতে হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁকে এসব কথা শিক্ষা দেয় এবং তার সাহায্যে তিনি এরূপ কালাম রচনা করে পরিবেশন করেন।

তাদের কথিত সেই ব্যক্তিটি কে, যার অসামান্য যোগ্যতার বলে কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচিত হল? (অর্থাৎ তাদের মিথ্যা, হাস্যকর দাবি অনুযায়ী) তার নামের ব্যাপারে মতভেদ ছিল। জাবার, ইয়াসার, আইশ (عائش) ও লাইশ (لعيش) – এই কয়েকজন অনারব গোলামের নাম কথিত আছে। এদের মধ্যে কেউ ইহুদী ছিল, কেউ নাসরানী, বরং কতকের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা খ্রিস্টবাদ ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

কথিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো (তাদের নিকট) আসা যাওয়া করতেন। এবং তাদের কারো কারো নিকট বসতেন, অথবা সে হুযূরের খেদমতে কখনো উপস্থিত হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষদের নামও পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে ইতিহাস স্মরণ রাখেনি! অথচ যিনি তাদের নিকট থেকে শুধু নকল করলেন, দুনিয়া তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল! এমন কি যারা তাঁকে নবী মানেনি তারা পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, পরিপূর্ণ মানব হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে!

যা হোক, মুশরিকদের উক্ত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দাবির মাধ্যমে এই সত্যটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নবুওয়াতের দাবির পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিরক্ষর ছিলেন তা তাদের নিকট এতই স্বীকৃত ছিল যে, কুরআনী উলূম ও মাআরেফকে (জ্ঞানরাজিকে) ওরা এই নিরক্ষরতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। এজন্যই ওদের বলতে হল যে, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাঁকে এ সকল বাণী শিক্ষা দিয়ে যায়। –আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁকে শেখানো হয়, তবে শিক্ষাদাতা কোন মানুষ না, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান প্রভু– اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

১. অর্থাৎ তোমরা যদি কুরআনের অনন্যসাধারণ জ্ঞানমালা ও তার অলৌকিকতার অন্যান্য দিকগুলিকে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে বুঝতে নাও পার, তবে কুরআনের ভাষা-সাহিত্যের অলৌকিক লালিত্য-মাধুর্য ও তার অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি তো উপলব্ধি করতে পার– যার সম্বন্ধে বারবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, সমগ্র মানব ও জিন মিলেও এই কালামের উদাহরণ পেশ করতে পারবে না। এখন যার তুলনা পেশ করতে আরবের সকল ভাষাবিদ ও সাহিত্যবিশারদ অক্ষম ও অপারগ, কোন অজ্ঞাত-অখ্যাত ক্রীতদাস কী করে এরূপ অলৌকিক কালাম রচনা করবে?

সমগ্র আরবের কোন ব্যক্তিত্ব যদি আদৌ এমন কালাম রচনা করতে পারত, তবে তিনি স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেন। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত

১০৪. যারা আল্লাহর আয়াতগুলির প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শন করেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব[১]।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٠٤

১০৫. মিথ্যা তো তারা রচনা করে যারা আল্লাহর আয়াতগুলির প্রতি ঈমান আনে না। এবং ওরাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী[২]।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝١٠٥

১০৬. যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর পুনরায় তাঁকে অস্বীকার করবে (তার উপর আল্লাহর গজব)– তবে তার ব্যাপার ভিন্ন, যাকে (কুফরীতে) বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল। কিন্তু যারা হৃদয় খুলে কুফরী করবে, ওদের উপর আল্লাহর গজব এবং ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি[৩]।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠٦

বিষয়াবলি সম্বন্ধে তাঁর বাণীর বিশাল ভাণ্ডার (হাদীস) বিদ্যমান। তবে সেগুলি ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের সংক্ষিপ্ত একটি সূরারও সমকক্ষতা দাবি করে না।

১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্তরে সাব্যস্ত করে নেয় যে, বিশ্বাস করব না– আল্লাহ তাআলাও ওকে সরল পথ দেখান না। ফলে তাকে যতই বোঝানো হোক, সে বুঝবে না। এমন বদ আকীদার লোকেরা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থেকে পরিণামে কঠোর শাস্তির যোগ্য হয়।

২. অর্থাৎ ওরা আপনাকে বলে- إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ {তুমি তো নিজের পক্ষ থেকে রচনা কর}, অথচ আপনার আমানতদারী ও সত্যবাদিতা পূর্ব থেকে সর্বজনস্বীকৃত এবং আপনার প্রতিটি আচার-আচরণ দ্বারা তা সুস্পষ্ট ছিল। মিথ্যা রচনাকারীদের চেহারা এবং চাল-চলন কি এরূপ হয়ে থাকে? মিথ্যা রচনা তো সেই হতভাগাদের অভ্যাস, যারা আল্লাহর বাণী শুনে ও তাঁর নিদর্শনাদি দেখেও বিশ্বাস করে না। তো আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বলার চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে?

৩. এক তো হল সেই পাপীরা, যারা শত শত আয়াত ও কুরআনি দলিল-প্রমাণ শুনেও ঈমান আনে না। কিন্তু এদের চেয়ে বেশি পাপী ওরা, যারা ঈমান আনা ও মানার পর শয়তানী সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার শিকার হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে বসে। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ করেছিল। সে ঈমান আনার পর মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল (আল্লাহর পানাহ!)। এরূপ লোকদের শাস্তির কথা আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

১০৭. এটা এজন্য যে, ওরা পরকালের চেয়ে পার্থিব জীবনকে বেশি ভালবেসেছে। আর আল্লাহ কাফের লোকদের পথপ্রদর্শন করেন না[১]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. ওরাই তারা, যাদের অন্তর, কান ও চোখ আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরাই গাফেল[২]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

মাঝখানে إلا من أكره الخ, দ্বারা একটি ব্যতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। তা এই যে, যদি কোন মুসলমান খাঁটি অন্তরে ঈমানের উপর কায়েম থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও ঈমানী আলো ও আন্তরিক বিশ্বাস তার অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, শুধুমাত্র কোন বিশেষ অবস্থায় খুবই কঠিন চাপ ও নিপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে প্রাণরক্ষার খাতিরে কেবল মুখে কুফুরী কথা বলে অর্থাৎ কোন কথা ইসলামের বিপক্ষে বলে ফেলে, কিন্তু তখনো অন্তরে পূর্ণ ঈমান থাকে এবং মৌখিক শব্দটির প্রতিও অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তি বোধ করে– এমন ব্যক্তি মুর্তাদ নয়। বরং তাকে মুসলমানই ধরা হবে। তবে এর চেয়ে উচ্চস্তর এই যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তখনো মুখ থেকে এমন শব্দ বের করবে না। যেমন: হযরত বিলাল, হযরত ইয়াসির, হযরত সুমাইয়া, হযরত খুবায়ব ইবনে যায়েদ আনসারী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীর ঘটনা ইতিহাসে বর্তমান রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা তার বিবরণ দিতে পারছি না। 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এ দেখে নিতে পারেন।

১. অর্থাৎ যেই কাফেররা দুনিয়ার জীবনকেই লক্ষবস্তু বানিয়ে নেয়, ওদের ভাগ্যে সফলতা কী করে জুটবে? হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে কেউ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ঈমান থেকে ফিরে গেছে, প্রাণের ভয়ে বা আত্মীয়তার খাতিরে অথবা ধনের লোভে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার জন্য আখেরাত কোথায়? তবে যদি প্রাণের ভয়ে শুধু মুখে কিছু বলে থাকে, তাহলে ভয়ের অবস্থা চলে যাওয়ার পর তওবা ও এসতেগফার করত দৃঢ় হয়ে যাওয়া উচিত।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও আত্মপূজায় ওরা এমনি মাতোয়ারা যে, হুঁশে আসার কোন আশা নেই। আল্লাহপ্রদত্ত সকল শক্তি ওরা নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। ফলে কানে সত্যের আওয়াজ শোনা, চোখে সত্যের নিদর্শন দেখা, অন্তরে কথা বোঝা ও চিন্তা করার তাওফীক রহিত হয়ে গেছে। মোহর করে দেওয়ার বিস্তারিত অর্থ পূর্বে বাকারা প্রভৃতি সূরায় গত হয়েছে।

১০৯. এ সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১১০. অতঃপর (উল্লেখ্য যে), যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর জেহাদ করেছে ও অবিচল রয়েছে- নিশ্চয় এসব বিষয়ের পর আপনার রব (তাদের প্রতি) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

[রুকূ - ১৫]

১১১. (সেই দিনটি স্মরণ কর), যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক করতে করতে[৩] এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল পুরাপুরি দেওয়া হবে, আর তাদের উপরে জুলুম করা হবে না[৪]।

يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ যারা নিজেদের অপকর্মের দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিসমূহ নষ্ট করে দিল এবং দুনিয়াকেই আপন লক্ষ্য বানিয়ে নিল, ওদের চেয়ে অধিক মন্দ পরিণতি আর কার হতে পারে?

২. **শানে নুযূল-**
মক্কায় কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে কতক মুসলমানের পদস্খলণ ঘটেছিল, অথবা শুধু মুখে কুফর-বাক্য উচ্চারণ করে ফেলেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁরা হিজরত করলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বাহাদুরির সাথে ইসলামের উপর কায়েম থাকেন- তখন তাঁদের পূর্ব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী বর্ষিত হয়। বুযুর্গ সাহাবী হযরত আম্মার রা-এর পিতামাতা 'ইয়াসির' ও 'সুমাইয়া' কাফেরদের অমানুষিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু কুফর-বাক্য উচ্চারণ করেননি। পুত্র (আম্মার) প্রাণের ভয়ে কুফর বাক্য বলে বসেন, কিন্তু পরে কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। তখন এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। (আসবাবুল ওয়াহিদী, পৃ ৪৬৬; তাফসীরে বাগাবী ৩/৮৬)

৩. অর্থাৎ একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন কথা বলতে পারবে না- মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউই উপকারে আসবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে- কী করে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি হাসিল করবে। মুক্তির জন্য নানা রকম সত্যমিথ্যা ওজর-আপত্তি বানাতে থাকবে এবং এভাবে মুক্তি লাভ করতে চাবে।

৪. অর্থাৎ সৎকর্মের ছওয়াব কম দেওয়া হবে না এবং অসৎকর্মের শাস্তি অতিরিক্ত দেওয়া হবে না।

১১২. আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত[১]। সেথায় সকল জায়গা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে চলে আসত তার রিযিক[২]। অতঃপর তা(-র অধিবাসীরা) আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করল, ফলে আল্লাহ তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিধান করালেন– তাদের কার্যকলাপের কারণে[৩]।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আর ওদের নিকট ওদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এলেন। কিন্তু ওরা তাঁকে অস্বীকার করল। ফলে ওদের পাকড়াও করল আযাব, আর ওরা ছিল পাপী[৪]।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

---

১. অর্থাৎ বাইর থেকেও শত্রুর আশঙ্কা ছিল না এবং ভিতর থেকেও কোন প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী ছিল না– খুবই শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন কাটছিল।

২. অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য হিসাবে শস্যদানা, ফলমূল প্রভৃতি চলে আসত। প্রত্যেক জিনিসেরই প্রাচুর্য ছিল, ঘরে বসেই দুনিয়ার নে'য়ামতসমূহ লাভ হত।

৩. উক্ত জনপদের বাসিন্দারা আল্লাহর নে'য়ামতসমূহের মূল্যায়ন করল না। দুনিয়ার ভোগবিলাসে পড়ে এমনি উদাসীন ও গাফেল হল যে, প্রকৃত দাতার খেয়ালও হল না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে ওরা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা ওদেরকে নাশোকরী ও নিমকহারামীর স্বাদ আস্বাদন করালেন– অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার স্থলে ভয়-ভীতি আর অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের স্থানে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ ওদের এমনভাবে ঘিরে ধরল, যেমন পরিধেয় বস্ত্র পরিধানকারীর শরীরকে ঘিরে নেয়। মোটকথা, ক্ষুধা ও ভীতি এক মুহূর্তের জন্যও ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হত না।

৪. উল্লিখিত বাহ্যিক নে'য়ামতরাশি ছাড়াও ওদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, যাঁর অনুসরণ করে ওরা আল্লাহর সন্তুষ্টির বড় বড় মাকাম হাসিল করতে পারত। কিন্তু তাঁর অনুসরণ ও সমর্থনের পরিবর্তে ওরা অবিশ্বাস ও বিরোধিতায় লেগে গেল এবং ক্রমান্বয়ে রসাতলে চলে গেল। অবশেষে আল্লাহ তাআলার সনাতন নীতি অনুযায়ী আযাব এসে ওদের পাকড়াও করল। তখন কোন তদবীর কাজে এল না।

এখানে কোন্ জনপদ উদ্দেশ্য?

কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতটিতে কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ের কথা বলা হয়নি, বরং উদাহরণস্বরূপ অনির্ধারিতরূপে যে কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এরূপ একটি জনপদের কথা ধরে নিয়ে মক্কার কাফেরদের বলা হয়েছে যে, তোমরা এ রকম করলে তোমাদের সাথেও তদ্রূপ আচরণ করা হতে পারে। নে'য়ামতের

১১৪. অতএব আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দান করেছেন তা খাও এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক (তাঁরই বান্দা হয়ে থাক)[১]।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

নাশোকরী, রাসূলকে অস্বীকার ও তাঁর সঙ্গে শত্রুতার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে– এমন মনে করো না।

তবে কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে قَرْيَة (জনপদ) দ্বারা উদ্দেশ্য পবিত্র মক্কা, যেখানে সর্বপ্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল এবং অনুর্বর, তৃণলতাহীন উপত্যকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বিভিন্ন রকম ফল আমদানী হত। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (আমি কি ওদের এমন নিরাপদ ও সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী করা হয়? –সূরা কাসাস, আয়াত ৫৭)

মক্কাবাসীরা এ নে'য়ামতরাশির কোনই কদর করেনি। ওরা শিরক, নাফরমানী, নির্লজ্জতা ও মনগড়া বিষয়ে লিপ্ত ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'য়ামতরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওরা তাঁকে অস্বীকার করতে কোন ত্রুটি করেনি- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (আপনি কি ওদের দেখেননি, যারা অকৃতজ্ঞতাকে আল্লাহর অনুগ্রহের বিনিময় বানিয়েছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে ধ্বংস-নিবাসে? –সূরা ইবরাহীম, আয়াত ২৮)

অবশেষে আল্লাহ তাআলা ওদের উপর শান্তি ও নিরাপত্তার স্থলে মুসলমান মুজাহিদদের ভয়-ভীতি এবং অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের স্থলে সাত বছরের দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিলেন। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার তাড়নায় ওরা কুকুর ও মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর বদর যুদ্ধের সময় ইসলামী মুজাহিদদের হাত দিয়ে ওদের উপর আল্লাহর চূড়ান্ত আযাব নেমে এল।

একদিকে তো এই হল, অন্যদিকে যারা জালেমদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পলায়ন করেছিল, আল্লাহ তাদের উত্তম নিবাস দিলেন, দুশমনদের ভয় থেকে নিরাপদ করলেন, জীবিকার দ্বারগুলি খুলে দিলেন এবং শক্তিশালী দুশমনদের উপর বিজয় দান করলেন। বরং রাজত্বসমূহের মালিক এবং মুত্তাকী-পরহেজগারদের ইমাম বানিয়ে দিলেন। সম্ভবত এ জন্যই বর্তমান আয়াতগুলিতে মক্কাবাসীদের অবস্থা শুনিয়ে সামনের আয়াত فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ -এ মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা সেসব কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থেকো, যেগুলির কারণে মক্কাবাসীরা মুসিবতে পড়েছিল।

১. অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবি যে করে, তার উচিত আল্লাহপ্রদত্ত হালাল ও পবিত্র রুযী উপভোগ করা এবং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করত কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া, হালালকে হারাম মনে না করা এবং নে'য়ামতসমূহ উপভোগ করার সময় প্রকৃত দাতাকে না ভোলা। তদুপরি

১১৫. আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই প্রাণী, (যবেহ করার সময়) যার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে, আর সে অন্যায়কারী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়– তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ الۡمَيۡتَةَ وَالدَّمَ وَلَحۡمَ الۡخِنۡزِيۡرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيۡرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৬. আর তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা রচনার ভিত্তিতে তোমরা বলে দিয়ো না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম– যাতে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করতে পার[২]। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, নিশ্চয় ওরা সফলকাম হয় না।

وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُكُمُ الۡكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُوۡا عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁরই বিধিবিধান ও হেদায়েতসমূহ মেনে চলা।

১. এ আয়াতের তাফসীর সূরা 'বাকারা' (আয়াত ১৭৩), মায়েদা (আয়াত ৩), 'আনআম' (আয়াত ১২১,১৩৬–১৪৩) প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়েছে– তা দ্রষ্টব্য। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হালাল বস্তুসমূহকে নিজের উপর হারাম যেমন করা যাবে না, তদ্রূপ হারাম বস্তুসমূহকে হালাল সাব্যস্ত করা যাবে না। মোটকথা, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা তাঁরই অধিকার, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। সামনের আয়াতগুলিতে এ বিষয় আরো স্পষ্টতার সাথে আলোচিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ শরী'য়তসম্মত কোনো প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তু সম্বন্ধে বলে দেওয়া যে, এ হালাল বা হারাম– সাংঘাতিক ধৃষ্টতা এবং মিথ্যা ও অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। হালাল বা হারাম একমাত্র সে বস্তুই হতে পারে, যাকে আল্লাহ তাআলা হালাল বা হারাম বলেছেন। সূরা 'আনআমে' বর্ণিত মক্কার মুশরিকদের ন্যায় কোন ব্যক্তি যদি শুধু নিজ রায় অনুযায়ী কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে এবং তা আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে, তবে প্রকৃতপ্রস্তাবে সে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে।

আয়াতে মুসলমানদের নসীহত করা হয়েছে, তারা যেন কখনো এরূপ না করে, বরং যে বস্তু আল্লাহ হালাল করেছেন তাকে যেন হালাল এবং যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে, আর শরী'য়তের দলীল ছাড়া বৈধতা ও অবৈধতার হুকুম না দেয়।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. (ওদের জন্য আছে) সামান্য ভোগ এবং ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব[১]।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর ইহুদীদের জন্য আমি তা হারাম করেছিলাম, যা পূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। আর আমি ওদের উপর জুলুম করিনি, বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত[২]।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. তবে, যারা নির্বুদ্ধিতাবশত মন্দকাজ করে ফেলে[৩], তারপর তওবা করে এবং (স্বীয় আমল) সংশোধন করে- নিশ্চয় আপনার রব এসব বিষয়ের পর (তাদের জন্য) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৪]।

---

১. অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যারচনাকারী বলে, কিন্তু ওদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ওরা নিজেরাই মিথ্যারচনাকারী। কারণ, ওরা মিথ্যা ও অপবাদস্বরূপ যে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলে তা আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়। তো শীঘ্র ওরা জানতে পারবে, এহেন রীতি-নীতি অবলম্বন করে কোন কল্যাণই হাসিল করা যায় না। আর ওরা কয়েক দিন দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করে নিক- তারপর চিরস্থায়ী জেলখানা প্রস্তুত রয়েছে।

২. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা 'আন'আম' এর আয়াত (১৪৬) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا الخ -এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

এস্থলে উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল বস্তু আল্লাহ তাআলা সকলের জন্য বা কোন বিশেষ জাতির জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত হারাম করেছেন, আল্লাহর এই হুকুম অবশ্যই হেকমতপূর্ণ। কিন্তু কোন ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, সে তাতে হস্তক্ষেপ করত হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম সাব্যস্ত করবে।

৩. যেমন: হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করল। আর 'নির্বুদ্ধিতাবশত' এ জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষ যে আল্লাহর নাফরমানী ও গোনাহ করে- চাই জেনেই করুক, প্রকৃতপ্রস্তাবে অজ্ঞ ও নির্বোধ হয়েই করে। যদি সে একটু আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে এবং গোনাহর কুফলের কথা চিন্তা করে, তবে কিছুতেই পাপে লিপ্ত হতে পারে না। সূরা 'নিসা'র আয়াত (১৭) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ الخ -এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ কুফরী কাজকর্ম থেকে তওবা করত মুসলমান হয়ে গেলে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজ অবস্থার সংশোধন করে নিলে আল্লাহ তাআলা বিগত সব গোনাহ মাফ করে দেন- চাই যত কঠিন গোনাহই হোক। কবি বলেন-

[রুকূ' - ১৬]

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন কল্যাণের পথপ্রদর্শক*, আল্লাহর আজ্ঞাবহ, একনিষ্ঠ এবং তিনি ছিলেন না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত[১]—

باز آ باز آ ہر آنچہ کردی باز آ ÷ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں درگہ مادرگہ نومیدی نیست ÷ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

('ফিরে আস, ফিরে আস, তুমি যা-ই করে থাক না কেন, ফিরে আস। তুমি যদি কাফের, অগ্নিপূজক বা পৌত্তলিক হয়ে থাক, তবু ফিরে আস। আমার এ দরবার নিরাশ হওয়ার দরবার নয়। যদি শতবার তওবা ভেঙে থাক, তবু ফিরে আস।')

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'হেদায়েতের ইমাম।' **অথবা :** 'মানুষের জন্য অনুসরণীয় ইমাম'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

আরবের মুশরিকদের শিরেকী আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করার পর বর্তমান আয়াতে তাওহীদবাদীদের ইমাম ও নবীদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ স্মরণ করানো হচ্ছে। কারণ, আরবের লোকেরা তাঁর বংশধর ছিল এবং নিজেদেরকে তাঁরই আদর্শের অনুসারী বলে দাবি করত। অথচ ইবরাহীম (আ)-এর দীনের সঙ্গে ওদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না।

আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাওহীদবাদীদের ইমাম, পুণ্যের শিক্ষাদাতা, সারা দুনিয়ার মুশরিকদের মোকাবেলায় একাই এক বিরাট উম্মতের সমতুল্য ছিলেন। তাঁর একক সত্তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমনসব সৌন্দর্য ও গুণাবলি একত্র করেছিলেন, যেগুলি কোন বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। لَيْسَ على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد (আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয়- সমস্ত জগতকে এক ব্যক্তির মধ্যে একীভূত করে দেওয়া)। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলার সম্পূর্ণ অনুগত ও আজ্ঞাবহ বান্দা ছিলেন, এবং তিনি সকল দিক থেকে নির্লিপ্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ও একনিষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বস্তুকে নিজের পক্ষ থেকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। শিরক করা তো দূরের কথা, মুশরিকদের দলে এবং ওদের লোকালয়ে বসবাস করাও তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়।

অতএব যারা নিজেদের 'হানীফ' বা একনিষ্ঠ বলে এবং ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করে, ওদের নিজেদের কার্যকলাপের কারণে লজ্জিত হওয়া উচিত! আল্লাহর নামে মিথ্যার বেশাতি করে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে দেওয়া এবং শিরকের সমর্থনে নবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কি একজন 'হানীফ ও ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারীর পক্ষে সম্ভব হতে পারে?

১২১. (এবং ছিলেন) আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী[১]। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে[২]।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝١٢١

১২২. আর আমি তাঁকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করেছিলাম[৩] এবং তিনি আখেরাতেও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত[৪]।

وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٢٢

১২৩. অতঃপর আমি আপনার প্রতি এ নির্দেশ পাঠিয়েছি যে, ইবরাহীমের দীনের অনুসরণ করুন, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি ছিলেন না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত[৫]।

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٢٣

মনে রেখো, কোন্‌টি হালাল আর কোন্‌টি হারাম- এ বিষয়ে এবং দীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদিতেও মূল ভিত্তি হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মিল্লাত বা আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন। সুতরাং যদি বাস্তবিকই ইবরাহীম (আ) এর মিল্লাতের অনুসারী হতে চাও, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তকে আঁকড়ে ধর।

১. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) আল্লাহর শোকরগোযার বান্দা ছিলেন। অথচ তোমরা চরম অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর নে'য়ামতের নাশোকরী করে থাক, যেমন পূর্বে ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمنة আয়াতের (১১২) ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা কী করে ইবরাহীম (আ.)-এর পথের অনুসারী হলে?

২. অর্থাৎ পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং আত্মসমর্পন ও সন্তুষ্টির সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে নবুওয়াত, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তানসন্ততি, মান-মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। ফলে সকল ধর্মের লোকেরা তাঁকে ভক্তি করে এবং প্রত্যেক দলই নিজেদেরকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চায়।

৪. অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য যে দো'য়া করেছিলেন-وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ, তা কবুল হয়। তিনি নিশ্চয় আখেরাতে صالحين বা পুণ্যাত্মাদের সর্বোচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ নবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৫. সূরা 'আনআম'-এর (১৬১নং) আয়াত دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - এর ব্যাখ্যায় বর্তমান আয়াতের বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হালাল ও হারাম এবং দীনের অন্যান্য ব্যাপারে মূলভিত্তি হচ্ছে ইবরাহীমের মিল্লাত। তবে মাঝখানে ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তাদের হাল-অবস্থা অনুযায়ী কতিপয় বিশেষ হুকুম দেওয়া হয়েছিল। পরিশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. শনিবারের বিধান তো কেবল তাদের উপরে আরোপ করা হয়েছিল, যারা তাতে মতভেদ করেছিল। আর আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যাতে তারা মতভেদ করত[১]।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

১২৫. আপনি (মানুষকে) স্বীয় রবের পথের দিকে ডাকুন– হেকমতপূর্ণ কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে; এবং যে পন্থা সর্বোত্তম, সেই পন্থায় তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করুন[২]।

ওয়াসাল্লামকে خاتم الأنبياء (সর্বশেষ নবী) বানিয়ে পাঠানো হয়। ইবরাহীম (আ)-এর আসল মিল্লাত, যা গাফলতি, বিকৃতি ও অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল– তাকে নতুনভাবে জীবন দান করা এবং শিরকের সকল শাখা-প্রশাখা নির্মূল করাই হচ্ছে হুযূর সা. এর পবিত্র দায়িত্ব। হাদীসে (মুসনাদে আহমদ, ২২২৯১) আছে- بعثت بالسمحة الحنيفية البيضاء ('আমি প্রেরিত হয়েছি সমুজ্জ্বল 'মিল্লাতে হানীফ' নিয়ে।') হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর অমরগ্রন্থ حجّة الله البالغة-তে এর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা পড়ে দেখার মত।

১. অর্থাৎ আসল মিল্লাতে ইবরাহীমে শনিবারের বিধান ছিল না। এই উম্মতের জন্যও তা প্রযোজ্য নয়। অবশ্য ইহুদীরা যখন তাদের পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে মতভেদ করে নিজেদের জন্য এই দিনটি নির্বাচন করে, তখন আদেশ হল– আচ্ছা, এর সম্মান কর এবং এই দিনে মাছ শিকার করো না। এই নির্দেশ কেউ মানল, কেউ মানল না। যারা অমান্য করল, ওরা দুনিয়াতে বানর ও শূকরে পরিণত হল। আর আখেরাতে যে বিচার হবে তা তো বাকি আছেই।

হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে কেউ বলত, তিনি 'ইহুদী', কেউ বলত, তিনি 'নাসরানী'। আল্লাহ তাআলা এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। যা হোক, আখেরাতে সকল মতভেদের মীমাংসা করা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখে নেবে– কে ভ্রান্তিতে ছিল এবং কে সঠিক পথে ছিল।

২. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

উপরের আয়াতগুলিতে মানুষকে জানানো হয়েছে যে, এই পয়গম্বর আসল মিল্লাতে ইবরাহীম নিয়ে এসেছেন। সুতরাং যদি সফলতা চাও এবং 'হানীফ' হওয়ার দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে তাঁর পথের অনুসরণ কর। এখন বর্তমান আয়াতে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষকে কীভাবে পথে আনতে হবে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

নিশ্চয় আপনার রবই বেশী জানেন যে, কারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তিনিই বেশী জানেন যে, কারা পথপ্রাপ্ত[১]।

আল্লাহর পথে আহ্বানের ৩ পন্থা

এর ৩টি পন্থা রয়েছে– হেকমত, সৎ-উপদেশ ও উৎকৃষ্ট পন্থায় যুক্তিতর্ক। 'হেকমত' বলতে বোঝায়– দীনের পরিপক্ক ও অটল বিষয়াবলিকে মজবুত দলীল-প্রমাণাদির আলোকে জ্ঞানগর্ভ উপায়ে পেশ করা, যা শুনে আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানী-গুণী লোকেরা মাথা অবনত করে দিবে, যার সামনে পার্থিব কাল্পনিক দর্শন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন উন্নতিই ওহীবর্ণিত সত্যসমূহের সামান্য পরিবর্তন করবে না।

(الموعظة الحسنة) মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী উপদেশ বলতে সেই সব নসীহতকে বোঝায়, যার মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা, হৃদয়গ্রাহীতা ও সহানুভূতিশীলতার প্রাণ থাকে। আন্তরিকতা, সহানুভূতি, স্নেহ-মমতার সাথে এবং প্রাঞ্জল ও শান্ত ভাষায় যে নসীহত করা হয়, তাতে অনেক সময় পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়, মৃতদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগ্রত হয়, একটি নিরাশ ও নির্জীব জাতি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়, লোকেরা আকর্ষনীয় ও সতর্ককারী বিষয়াদি শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটতে শুরু করে। বিশেষত যারা উচ্চ মেধাবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তবে তারা সত্য সন্ধানের প্রেরণা বুকে ধারণ করে, তাদের মধ্যে হৃদয়গ্রাহী ওয়াজ-নসীহতের দ্বারা আমলের এমনি স্পিরিট ভরে দেওয়া যায়, যা উঁচু পর্যায়ের জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে সম্ভব হয় না।

(مجادلة بالتي هي احسن) দুনিয়াতে সর্বদাই এমন এক দলও থাকে, যাদের কাজ সব কিছুতে জটিলতা সৃষ্টি করা, সত্যের পথে বাধা প্রদান করা এবং অযৌক্তিক তর্কবিতর্ক করা। এ সকল লোক হেকমতের কথাবার্তাও গ্রহণ করে না, ওয়াজ-নসীহতও শোনে না, বরং তারা প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ে তর্কবিতর্কের বাজার গরম হোক এটাই চায়। কোন কোন সময় বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সত্যসন্ধানীদেরও সন্দেহ-সংশয় ঘিরে নেয় এবং যুক্তিতর্ক ছাড়া সান্ত্বনা লাভ হয় না। এ জন্যই وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ বলা হয়েছে, অর্থাৎ যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে উত্তম পন্থায় এবং ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বাহাছ করুন। যদি প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করতে হয়, তবে সর্বোত্তম উপায়ে করুন– অযথা মনে আঘাত দিয়ে ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে লাভ নেই, তাতে বরং বিবাদ বৃদ্ধি পায় এবং সমাধানে পৌঁছতে দেরি হয়। বস্তুত বোঝানো ও সত্য-প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রূঢ়তা, বাকবিতণ্ডা ও হঠকারিতায় কোন সুফল নেই।

১. অর্থাৎ দাওয়াত ও তবলীগের ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। কে মানল, কে মানল না– আপনার এই চিন্তায় পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলাফল

১২৬. যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে সেই পরিমাণ প্রতিশোধই গ্রহণ কর যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আর যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম[১]।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝١٢٦

১২৭. আর আপনি ধৈর্য ধরুন– আপনার ধৈর্য ধারণ আল্লাহর সাহায্যেই হতে পারে– আর ওদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং ওরা যে চক্রান্ত করে তার কারণে কুণ্ঠিত হবেন না[২]।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝١٢٧

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্মশীল[৩]।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝١٢٨

আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিন। যারা পথে আসল, যারা আসল না, তাদের সবার অবস্থা তিনিই উত্তমরূপে জানেন। তিনি তাদের সঙ্গে সে মতই আচরণ করবেন।

১. অর্থাৎ দাওয়াত ও তবলীগের পথে যদি তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়, নির্যাতন করা হয়– তবে শক্তি হাসিল হওয়ার পর (উৎপীড়নের) সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি আছে। কিন্তু ধৈর্যধারণের মর্যাদা এরও উর্ধ্বে। তোমরা ধৈর্য ধরলে এর ফলাফল তোমাদের পক্ষে, এমন কি সীমালঙ্ঘনকারীদের পক্ষেও উত্তম হবে।

২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-অত্যাচারে ধৈর্য ধরা সহজ কাজ নয়। একমাত্র আল্লাহ সাহায্য করলেই এমন সম্ভব হয় যে, মানুষ নির্যাতন সইতে থাকে অথচ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে না।

৩. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহকে ভয় করে যে পরিমাণ তাকওয়া ও নেকী অবলম্বন করবে, সেই পরিমাণই আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা সে লাভ করবে। সুতরাং এমন পরহেযগার-নেককার লোকদের পক্ষে কাফেরদের প্রতারণায় সংকুচিত ও ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনই কারণ নেই।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীতে হাশরের মাঠে এই অক্ষম ও দুর্বলকে মুত্তাকী-পরহেজগার ও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে সমবেত করুন। (অধম অনুবাদকেরও তাঁর হুযূরে একই দো'য়া।)

সূরা বনী ইসরাঈল

سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১৭ । ১১১ আয়াত । ১২ রুকূ । মক্কী

آیاتها ۱۱۱، رکوعاتها ۱۲

পারা - ১৫

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. পবিত্র সেই সত্তা[১], যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত[২], যার

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

---

১. অর্থাৎ তাঁর সত্তা দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা ও সব রকমের দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র। যে বিষয় আমাদের ধারণায় খুবই বিস্ময়কর এবং আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি যাকে একেবারে অসম্ভব মনে করে, খোদার কুদরত ও ইচ্ছার সামনে তা মোটেই কঠিন নয়।

২. অর্থাৎ মাত্র এক রাতের সীমিত অংশে তিনি তাঁর বিশিষ্ট ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মক্কার হরম শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমন করালেন।

এ সফরের উদ্দেশ্য কী ছিল? لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا আয়াতাংশে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সারকথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরে অথবা বাইতুল মুকাদ্দাসের পরে আরও সফর করিয়ে আল্লাহর মহা কুদরতের নিদর্শন এবং হেকমতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিস্ময়কর নমুনা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। সূরা নাজমের শুরুতে এসব নিদর্শনের কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায়, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত তশরীফ নিয়ে যান এবং অতীব বিস্ময়কর নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করেন। এরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ،لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.

(রাসূল তাঁকে আরো একবার দেখেছেন 'সিদরাতুল মুনতাহা'-এর নিকট। এর নিকট রয়েছে (আরামে) থাকার স্থান জান্নাত। যখন সেই বরই বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যা কিছু আচ্ছাদিত করে রেখেছিল! (তাঁর) দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি এবং লক্ষচ্যুতও হয়নি। নিশ্চয় তিনি স্বীয় রবের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছেন। –সূরা নাজ্‌ম, আয়াত ১৩-১৮)

ইস্‌রা ও মি'রাজ

বিজ্ঞ আলিমগণের পরিভাষায় মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পরিভ্রমণকে 'মে'রাজ' বলা হয়। আবার অনেক সময় এই পুরো সফরকে একত্রে একই শব্দ 'ইসরা' বা 'মে'রাজ' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

মি'রাজসংক্রান্ত হাদীসসমূহ প্রায় ত্রিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে এবং সেসব হাদীসে মে'রাজ ও ইসরার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মে'রাজ হয়েছে জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল আলিমের আকীদা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছে। কেবল দুই তিন জন সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ইস্‌রা ও মে'রাজের ঘটনাকে নিদ্রাবস্থায় এক দুর্লভ স্বপ্নস্বরূপ মনে করতেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা এ সূরারই ৬০ নং আয়াতের শব্দাবলি– وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْٓ أَرَيْنٰكَ الخ পেশ করে থাকেন। তবে পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউই এ কথা বলেন না যে, মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় শুধু রূহানীভাবে (আধ্যাত্মিকরূপে) সংঘটিত হয়েছিল, যেমনটি কোন কোন দার্শনিক ও সুফী-সাধকের অভিরুচি মনে হয়। রূহুল মাআনীতে রয়েছে-

وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقا للعادة ومحلا للتعجب أيضا إلا أنه أمر لاتعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من السلف اه

('ইসরা'-র অর্থ জাগ্রত অবস্থায় রূহানীভাবে গমন নয়, যেমন কতক তাসাওফপন্থী ও দার্শনিকগণ 'এনসেলাখ' (আত্মার দেহপরিবর্তন) দ্বারা সংঘটিত হয় বলে মনে করেন। কেননা, যদিও এটি অস্বাভাবিক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে, কিন্তু এর সঙ্গে আরবগণ পরিচিত ছিল না এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউই এ মত গ্রহণ করেননি।)

অবশ্য ইবনুল কাইয়্যিম 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত মুআবিয়া, ও হাসান বসরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের অভিমতের এরূপ ব্যাখ্যা দান করেছেন। কিন্তু এর পক্ষে কোন দলীল পেশ করেননি, শুধু আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করেছেন। ইবনে ইসহাক প্রমুখ উক্ত মনীষীদের যে শব্দাবলি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কোথাও জাগ্রত অবস্থার উল্লেখ নেই।

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ

কিন্তু যে যাই বলুন না কেন, পবিত্র কুরআন যে অসাধারণ গুরুত্ব ও শানদার ভূমিকাসহ 'ইসরা'র ঘটনা উল্লেখ করেছে এবং বিরোধীরা এর খণ্ডন ও অস্বীকারে যে রকম তোড়জোড় করে ময়দানে নেমেছিল– এমন কি, কোন কোন অনুগত ব্যক্তিও যেরূপ পদস্খলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মিরাজের ঘটনা কেবল একটি বিরল ও বিস্ময়কর স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক সফর ছিল না। যদি তাই হত, তবে ইসলামের প্রাথমিককাল থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো যেসব আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ ও ওহী-কাশ্‌ফ ইত্যাদির দাবি করে এসেছেন, সেসবের চেয়ে মেরাজের দাবিটি কাফেরদের নিকট বেশি বিস্ময়কর মনে হত না এবং ওরা সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মেরাজের ঘটনাকে মিথ্যা বলার প্রয়াস পেত না এবং হাসি-ঠাট্টা করত লোকদের ডেকে বলত না যে– আস, আজ নবুওয়াতের দাবিদারের মুখে এক অভিনব কথা শুনে যাও। তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামও এ ঘটনা প্রকাশের পর অত চিন্তিত হতেন না, যা কয়েকটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে (মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৩৪৮৪) পরিষ্কারভাবে রয়েছে- ثم أصبحت بمكة أو ثم أتيت مكة (অতঃপর ভোর বেলায় আমি মক্কায় পৌছলাম)। মে'রাজ যদি নিতান্তই কোন আধ্যাত্মিক সফর হবে, তবে মক্কা থেকে তাঁর অনুপস্থিত হওয়ার কথা বলা হল কেন? এবং শাদ্দাদ ইবনে আউস প্রমুখের রেওয়ায়াত মত কয়েকজন সাহাবী এ কথাই বা জিজ্ঞেস করলেন কেন যে, 'রাতে শয্যাস্থলে তালাশ করলাম, হুযূর কোথায় গিয়েছিলেন?' (মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭১৪২)

আমাদের মতে, أسرى بعبده এর অর্থ যদি এই করা হয় যে, 'আল্লাহ আপন বান্দাকে স্বপ্নে বা নিতান্ত আধ্যাত্মিকরূপে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন'- তবে কুরআনেরই আয়াত فأسر بعبادي এর অর্থ করতে হবে যে- 'হে মূসা! আমার বান্দাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) স্বপ্নে বা নিতান্ত রূহানীভাবে সঙ্গে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যাও'! অথবা সূরা কাহাফে যে হযরত মূসা (আ.)-এর হযরত খিযিরের সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং তাঁর সাথে সফর করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এর জন্য فانطلقا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- এখানে বলতে হবে যে, এ সমস্ত কিছু নিতান্ত স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। (অথচ এই দুটি আয়াতের এ অর্থ কেউ-ই গ্রহণ করেন না।)

সংশয় নিরসন

আর কুরআনে (এ সূরার ৬০ নং আয়াতে) যে رؤيا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তো এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা) বলেই দিয়েছেন- رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم (এ ছিল চোখের দেখা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছিল)। رؤيا, শব্দটি সাধারণ দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, মুফাসসিরগণ এর সমর্থনে আরবী ভাষাভাষীদের ব্যবহার থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং এ দ্বারা যদি মেরাজের ঘটনাই উদ্দেশ্য হয়, তবে এখানেও চর্মচোখে দেখার অর্থই করতে হবে, যাতে কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার বক্তব্য এবং উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের আকীদার সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়।

হাঁ, একজন রাবী শারীকের রেওয়ায়াতে কিছু শব্দ এমন রয়েছে, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'ইসরা' ঘুমন্ত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মুহাদ্দেছীনের সর্বসম্মত রায় এই যে, শারীকের স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল, তাই বড় বড় হাফেজে-হাদীসের মোকাবেলায় তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হাফেজ ইবনে হাজার 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের শেষাংশে শারীকের বর্ণনার ভুল-ভ্রান্তি উল্লেখ করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তাঁর বর্ণনার এরূপ অর্থ করা যেতে পারে, যা অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী না হয়।

বস্তুত এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই- মুসলিম শরীফের শরাহে এসবের বিশদ ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত এ-ই যে, মেরাজ ও ইসরার ঘটনা জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য এর পূর্বে বা পরে স্বপ্নের মধ্যেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে তা অস্বীকার করার দরকার নেই।

আরো প্রশ্ন ও তার উত্তর

মে'রাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী এত দীর্ঘ দূরত্ব এক রাতে কী করে অতিক্রম করলেন? অথবা মধ্যস্থলের অগ্নিমণ্ডল ও শীতমণ্ডলের ভিতর দিয়ে কেমন করে গেলেন? কিংবা পাশ্চাত্যের ধারণা মতে যেহেতু আকাশের অস্তিত্বই নেই, তাই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এক আকাশ থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় আকাশে কী করে আরোহণ করতে পারেন? –বস্তুত, আকাশ কোন অস্তিত্বশীল বস্তুই নয়– এর পক্ষে আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। তাদের এ দাবি যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, উপরে পরিদৃষ্ট নীলাভ বস্তুটি আসলে আকাশই নয়, তবুও এই নীল রঙের উপর আকাশের অস্তিত্ব হতে পারে না– এর কী প্রমাণ?

আর রইল, এক রাতে এত দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার প্রশ্ন? তো সকল বিজ্ঞানীই তো স্বীকার করেন যে, গতির দ্রুততার কোন সীমা নেই। এখন থেকে একশ' বছর পূর্বে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না যে, ঘণ্টায় তিন শত মাইল বেগে অতিক্রমকারী মোটরযান তৈরি হবে, অথবা দশ হাজার ফুট উর্ধ্বে আমরা উড়োজাহাজে উড়তে পারব। বাষ্প ও বিদ্যুত শক্তির এই লীলাখেলা মানুষ তখন কল্পনাও করতে পারেনি। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই অগ্নিমণ্ডলের ব্যাপারটি কোন বিষয়ই নয়, বরং উর্ধ্ব আকাশে যে প্রচণ্ড হিমমণ্ডল রয়েছে, তার মোকাবলোয় আরোহীদের তীব্র শীতলতা থেকে রক্ষার জন্য উড়োজাহাজে বিভিন্ন যন্ত্র সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

এসব তো হচ্ছে দুর্বল মানুষের হাতে তৈরি মেশিনারির অবস্থা। আর স্রষ্টার হাতে সরাসরি তৈরি মেশিনগুলোর কথা চিন্তা করলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। পৃথিবী বা সূর্য চব্বিশ ঘণ্টায় কত দূরত্ব অতিক্রম করে অথবা আলোকরশ্মির গতি প্রতি মিনিটে কত? মেঘ-বিদ্যুত দিগন্তে চমকে ওঠে ও পশ্চিমাকাশে পতিত হয়– গতির এ দ্রুততাকে পর্বতও রুখতে পারে না। যে আল্লাহ এসব কিছু সৃষ্টি করলেন, সেই মহাশক্তিশালী স্রষ্টা কি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন বুরাকের মধ্যে এমন বিদ্যুতগতি এবং হেফাজত ও আরাম-আয়েশের এমন ব্যবস্থা করতে পারেন না, যার ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি আরাম ও মর্যাদার সাথে চোখের পলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে সক্ষম হয়েছেন? সম্ভবত এ জন্যই মে'রাজের ঘটনার বিবরণ سُبْحَانَ الَّذِيْٓ শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে, যাতে যে সকল লোকেরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তিকে তাদের চিন্তা ও কল্পনার চার দেয়ালের মধ্যে সীমিত করতে চায়, তারা নিজেদের হীনতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির দীনতা সম্পর্কে সতর্ক হয়!

কবি বলেন :

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن ÷ کہ جاہا سپر باید انداختن

(প্রত্যেক ক্ষেত্রে কল্পনার ঘোড়া চালানো যায় না, এমনো স্থান আছে যেখানে আত্মসমর্পণ করাই সংগত।')

الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

আশ-পাশকে আমি বরকতময় করেছি- যাতে তাঁকে আমার (কুদরতের) কিছু নিদর্শন দেখাই[১]। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২]।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا

২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং একে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়েছিলাম,[৩] (এতে এ নির্দেশ ছিল) যে,

---

১. অর্থাৎ যে এলাকায় মসজিদে আক্‌সা অবস্থিত, সেখানে আল্লাহ তাআলা বহু জাহেরী ও বাতেনী বরকত রেখেছেন। বস্তুগত দিক থেকে দেখলে সেখানে নদ-নদী, ঝরনামালা, শস্য-ফসল ও ফলমূলের প্রাচুর্য রয়েছে। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে লক্ষ করলে, কত নবী-রাসূলের বাসস্থান ও সমাধিস্থল এবং তাঁদের ফয়েয, বরকত ও নূরের ঝরনাধারা সেখানে প্রবাহিত রয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে সম্ভবত এ ইঙ্গিতও আছে যে, বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য জাতির নবীদের যেসব গুণ দেওয়া হয়েছিল, তা সবই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এবং বনী ইসরাঈলকে যেসব নে'য়ামত দেওয়া হয়েছিল তা সবই এখন বনী ইসমাঈল লাভ করবে– একই উম্মত এখন 'কাবা' ও 'বাইতুল মুকাদ্দাস' উভয়েরই নূর ও বারাকাতের ধারক-বাহক হবে। মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়েছেন। এভাবে, নবীগণের সরদার ও (রুহানী) ইমাম হওয়ার যে মর্যাদা হুযূর (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল, তার বাহ্যিক নমুনাও তাঁকে ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের দেখানো হল।

২. অর্থাৎ আল্লাহই প্রকৃত শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজ কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া-প্রার্থনা শুনেছেন এবং তাঁর উচ্চ অবস্থাদি লক্ষ্য করেছেন। পরিশেষে মে'রাজ শরীফে তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণধর চোখ দ্বারা সেসব মহানিদর্শন দেখালেন, যেগুলি তাঁর মহা যোগ্যতা ও উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল।

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। যেহেতু মেরাজ প্রসঙ্গে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত গমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু মসজিদে আক্‌সা ও তার পুরাতন মুতাওয়াল্লী অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের উপর যেসব দুর্যোগ এসেছিল– মুসলানদের শিক্ষা এবং স্বয়ং বনী ইসরাঈলের নসীহতের জন্য সামনে তা বর্ণিত হবে। আলোচ্য আয়াতখানি তারই ভূমিকাস্বরূপ।

تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে কার্যনির্বাহক স্থির করো না[১]।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

৩. হে তাদের সন্তান-সন্ততি, যাদের আমি নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম! নিশ্চয় তিনি ছিলেন একজন অতি কৃতজ্ঞ বান্দা[২]।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা অবশ্যই যমীনে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং চরম ঔদ্ধত্য দেখাবে'[৩]।

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا

৫. অতঃপর যখন দুই বিপর্যয়ের প্রথমটির প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বান্দাদের পাঠালাম[৪], যারা ছিল প্রচন্ড লড়াকু। তারা

মে'রাজের ঘটনায় ইঙ্গিত ছিল যে, শাম দেশের বরকতময় ভূমিতে আল্লাহ তাআলার যে পবিত্র আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, ভবিষ্যতে শেষ নবীর উম্মতই তার অধিকারী হবে। বর্তমান আয়াতগুলিতে বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, মঙ্গল চাইলে এখন আরবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর, তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। নতুবা পূর্বের মত পুনরায় শাস্তি পাবে।

১. অর্থাৎ তাওরাতে আদেশ করা হয়েছিল, তারা যেন খাঁটি তাওহীদের উপর থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেই কার্যনির্বাহক জ্ঞান না করে– সর্বদা তাঁরই উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করে।

২. তোমরা হচ্ছ তাদের বংশধর, যারা নূহ (আ)-এর সঙ্গে কিশতিতে আরোহন করে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তোমাদের পূর্বপুরুষের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল, তোমরা তা ভুলে যেয়ো না। (انه كان عبدا..) চিন্তা করে দেখ, তোমরা যেই নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানসন্ততির অন্তর্ভুক্ত, তিনি কী রকম কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। তোমাদেরও তাঁর পথ অনুসরণ করা উচিত।

৩. তাওরাতে বা অন্য কোন আসমানী কিতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, এই জাতি (বনী ইসরাঈল) দুবার পৃথিবীতে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং জুলুম ও অহংকারের পথ অবলম্বন করত চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। –অতঃপর এমনই হল। আর প্রতিবারই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ ভোগ করানো হল, যেমন সামনে আসছে।

৪. অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের উপর তাদের চড়াও করে দিয়েছিলাম।

خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝

(লুটতরাজ করার জন্য) শহরগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আর তা ছিল এমন প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হতই[১]।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝

৬. অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে আবার তোমাদের আধিপত্য দান করলাম[২] এবং তোমাদের সাহায্য করলাম ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তানাদি দিয়ে এবং তোমাদের সৈন্যসংখ্যা (তাদের চেয়ে) বৃদ্ধি করে দিলাম।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝

৭. যদি তোমরা ভাল কর তবে নিজেদেরই জন্য ভাল করবে, আর যদি মন্দ কর নিজেদেরই জন্য (করবে)[৩]। অতঃপর যখন দ্বিতীয়টির প্রতিশ্রুত সময় এল (তখন আমি অন্য লোকদের পাঠালাম), যাতে তারা তোমাদের মুখ মলিন করে দেয় এবং মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন ঢুকেছিল প্রথমবার এবং যাতে যা-কিছুর উপর তাদের আধিপত্য কায়েম হয় সব পুরাপুরি ধ্বংস করে দেয়[৪]।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

৮. সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আর যদি তোমরা পুনরায় (তা-ই) কর, তবে আমিও আবার (তা-ই) করব। আর আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য

---

১. অর্থাৎ তারা লোকালয়ের ঘরে ঘরে ঢুকে মারপিট, লুটপাট ও খুনখারাবী করল। এভাবে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দানের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হল।

২. অর্থাৎ তোমরা যখন আমার অভিমুখী হলে এবং তওবা ও বিনয়ের পথ অবলম্বন করলে, তখন আমি তোমাদের আবারো শত্রুদের উপর বিজয় দান করলাম।

৩. অর্থাৎ ভাল-মন্দের যা কিছু লাভ-ক্ষতি ছিল তা তোমাদেরই জন্য ছিল এবং বস্তুত তা-ই হল।

৪. অর্থাৎ মেরে মেরে তারা তোমাদের চেহারা মলিন করে ফেলল এবং মসজিদে আক্সাতে ঢুকে প্রথমবারের ন্যায় তার ধ্বংস সাধন করল এবং তার নকশা ও সৌন্দর্য বিনষ্ট করে দিল। এভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তি চিরতরে খতম হয়ে গেল।

لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا۝

কারাগার বানিয়েছি[১]।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا۝

৯. নিশ্চয় এ কুরআন সেই পথ বাতলে দেয়, যা সবচেয়ে সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান[২]–

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

১০. এবং এ (সংবাদও দেয়) যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না ওদের জন্য

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'তাওরাতের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, বনী ইসরাঈল দুবার দুষ্কৃতি করবে, তার ফলে শত্রুরা তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। তাই হল। একবার জালূত জয়ী হল। তারপর আল্লাহ তাআলা ওকে হযরত দাউদ (আ) এর হাতে ধ্বংস করেন এবং বনী ইসরাঈলের শক্তি আরো বৃদ্ধি করেন। দ্বিতীয়বার পারস্যবাসী বুখ্‌তে নাস্‌সার (তাদের উপর) জয় লাভ করে, তখন থেকে তাদের (বনী ইসরাঈলের) রাজত্ব মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

এখন বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর সদয় হয়েছেন– যদি তোমরা বর্তমান নবীর অনুগত হও, তবে তিনি সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য ফিরিয়ে দেবেন। আর যদি দুষ্কৃতিই কর, তবে তিনিও চরম শাস্তি দিবেন। সে মত মুসলমানদের তিনি তাদের উপর বিজয়ী করলেন এবং আখেরাতে তাদের জন্য দোযখ প্রস্তুত রাখলেন।'

কোন কোন আলেম মাসীহ (আ)-এর জন্মের ৫৮৭ বছর পূর্বে বুখ্‌তে নাস্‌সারের আক্রমণকে প্রথম ওয়াদা এবং মাসীহ (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ৭০ বছর পর 'তয়তূস রূমী'-এর আক্রমণকে দ্বিতীয় ওয়াদা বলে গণ্য করেছেন। কেননা, এ উভয় আক্রমণে ইহুদীদের উপর চরম বিপর্যয় নেমে আসে এবং (ওদের) 'পবিত্র হায়কাল'কে বরবাদ করে দেওয়া হয়। والله أعلم

২. অর্থাৎ এমনিতে তো 'তাওরাত'ও বনী ইসরাঈলকে পথ দেখাত, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে- هُدًى لِّبَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ কিন্তু এ কুরআন সমগ্র দুনিয়াকে সবচেয়ে ভাল, সরল ও দৃঢ় পথ দেখায়। এই أقوم (বা সব চেয়ে সরল) পথের মধ্যে সমস্ত قويم 'সরল পথ' (পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ) একীভূত হয়ে গেছে। অতএব যদি মুক্তি ও সফলতা চাও, তবে সর্বশেষ নবীর অনুসরণ কর এবং এই সরল মহাসড়কের উপর দিয়েই চল। যারা ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের মাধ্যমে এই সরল ও প্রশস্ত পথে চলবে, কুরআন তাদেরকে দুনিয়ায় হায়াতে তায়্যিবার (পবিত্র জীবনের) এবং পরকালে জান্নাতের মহাসুসংবাদ শোনায়।

পক্ষান্তরে, যাদের পরিণাম সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই, যারা অন্ধ হয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনায় মেতে আছে, ওদের পরিণতি সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি প্রস্তুত করেছি যাতনাদায়ক আযাব। | اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑩

[রুকূ - ২]

১১. মানুষ অকল্যাণ প্রার্থনা করে, যেমন সে প্রার্থনা করে কল্যাণ; আর মানুষ হচ্ছে অতি ত্বরাপ্রবণ[১]। | وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ⑪

১২. আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি[২]। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে | وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ

---

১. অর্থাৎ কুরআন তো মানুষকে সর্বোত্তম কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ শোনায় এবং মন্দের ধ্বংসাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করে। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, সে সবকিছু শোনার পরও নিজের জন্য তেমনি আগ্রহের সাথে অকল্যাণ কামনা করে, যেরূপ আগ্রহে কেউ কল্যাণ কামনা করে অথবা যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। সে পরিণামের দিক থেকে চক্ষু বন্ধ করে অতি দ্রুতবেগে পাপাচার ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়। বরং কোন কোন হতভাগা তো স্পষ্ট ভাষায় বলেই বসে- اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (আয় আল্লাহ! যদি পয়গম্বর নিজ দাবিতে সত্য হয়ে থাকেন, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন কঠোর আযাব নাযিল করুন–আনফাল : ৩২) কোন কোন নির্বোধ লোক রাগে উত্তেজিত হয়ে নিজের জন্য বা নিজ সন্তানসন্ততির জন্য না বুঝে বদ দো'য়া করে বসে। কেউ কেউ দুনিয়ার নগদ ভোগ-বিলাসকে লক্ষ্য বানিয়ে নেয় এবং হালাল-হারামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যে কোন উপায়ে তা অর্জন করার পিছনে লেগে যায়। এ চিন্তা করে না যে, এই গোলাপ গাছের নীচে তো বিষধর সাপ-বিচ্ছু লুকিয়ে আছে, যার দংশনে নিশ্চিত ধ্বংসের কবলে পতিত হতে হবে।

সত্যিই মানুষ নিজ স্বভাবজাত তাড়াহুড়ার কারণে বস্তুর বাহ্যিক টিপটপই দেখে, তার দূরবর্তী ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা করার মত ধৈর্য তার হয় না। ব্যস একটা বিষয় মনে জাগল, অমনি তা বলে বা করে ফেলল। যে দিকে একবার পা বাড়ল, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সে দিকেই চলতে থাকল। যদি তাড়াহুড়া ছেড়ে ধীর-স্থিরভাবে এবং দূরদর্শিতার সাথে সে কাজ করত, তবে এমন সব ভুল করত না।

২. রাতের অন্ধকার, দিনের আলো, উভয়ের পালাক্রমে ছোট বড় হওয়া; আবার রাতে চাঁদের ক্রম হ্রাস ও বর্ধন, তার স্নিগ্ধ ও মৃদু আলো; দিনের বেলায় সমুজ্জ্বল সূর্যের প্রখর ও উত্তপ্ত আলো– এ সবই আল্লাহ তাআলার মহা কুদরতের নিদর্শন। এদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনাও রয়েছে– যার সাথে অশেষ উপকার ও কল্যাণ জড়িত। আবার সবার জন্য যৌথ সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে– যা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত অত্যন্ত পরিপক্ব ও দৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসছে।

آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ⑫

দীপ্তিহীন করেছি[১] আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকিত, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার[২] এবং জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব[৩]। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি[৪]।

---

১. অর্থাৎ রাতের নিদর্শন অন্ধকার ও দীপ্তিহীনতা। সূর্যের তুলনায় চাঁদের আলো নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট হয়, বরং স্বয়ং চাঁদই দর্শকের নিকট কলঙ্কযুক্ত প্রতিভাত হয়।

২. অর্থাৎ দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার দেখায়, মানুষ জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মোটকথা, রাতে যেসব বস্তু অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল, সূর্যের আলোতে তা সবই উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর যারা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল, তারা চোখ খুলে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা শুরু করে দেয়।

৩. অর্থাৎ রাত ও দিনের গমনাগমনে এবং চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের সাথে মাস ও বছরের গণনা এবং অনেক ধরণের ছোট-বড় হিসাব জড়িত রয়েছে।

৪. মনে রেখো, তাড়াহুড়া করে কোন লাভ নেই। খোদার নিকট ভাল-মন্দ প্রত্যেক জিনিসের একটা সময় ও পরিমাপ নির্ধারিত আছে, যাতে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। যেমন: রাত ও দিন– কারো তাড়াহুড়ার কারণে রাত ছোট হয়ে যায় না বা দিন বড় হয়ে যায় না। বরং যথাসময়ে যথানিয়মে সকাল ও সন্ধ্যা হয়ে থাকে। –রাতের পিছনে যেমন দিন এবং দিনের পিছনে রাতের আগমন অবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে, মন্দের পিছনে ভাল এবং ভালর পিছনে মন্দের আগমনকেও তেমনি মনে করা উচিত। দুনিয়ার সমস্ত ভাল-মন্দের গতিধারা একটি নির্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থার অধীন, যা ভেঙে ফেলার ক্ষমতা কারো নেই।

দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের দৃষ্টান্ত

দুনিয়ার এই ঘোলাটে জীবনকেও অন্ধকার রাতের সদৃশ মনে করতে হবে, যার অন্ধকারে ভাল ও মন্দের ফলাফল সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। তবে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যাতে এই অন্ধকারে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদের সামনে তা পরিপূর্ণ স্পষ্ট করে দেন, যাতে তাদের নিকট ভালমন্দের তাৎপর্য ও পরিণাম উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এমন অকাট্যভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া যে, কোন একজন মানুষের পক্ষেও সন্দেহ বা অস্বীকৃতির সুযোগ না থাকে— এটা তখনি হবে, যখন আমাদের পার্থিব জীবনের রাতের অবসান হয়ে কিয়ামত দিবস উপস্থিত হবে। মানুষের যেসব আমল দুনিয়ার জীবনে সর্বক্ষণ তার সঙ্গেই ছিল, তবে গাফলত ও মূর্খতার কারণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, কিয়ামতের আগমন হওয়ামাত্র তাই এক সুস্পষ্ট কিতাবের আকৃতিতে সম্মুখে উপস্থিত হবে, যা প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে পড়তে পারবে। فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (এখন তোমার

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য* তার গলায় সেঁটে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন তার সম্মুখে এমন এক কিতাব উপস্থিত করব, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে[১]।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ۝١٣

১৪. (তাকে বলা হবে), 'তুমি নিজের কিতাবটি পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব-গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট'[২]।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝١٤

১৫. যে সৎপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই মঙ্গলের জন্য অবলম্বন করবে এবং যে বিচ্যুত হবে, সে নিজেরই অমঙ্গলের জন্য বিচ্যুত হবে। আর কোন ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করবে না[৩]।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ

সামনে থেকে তোমার পর্দা অপসারিত করে দিলাম, ফলে তোমার দৃষ্টি আজ প্রখর। –সূরা কাফ, আয়াত ২২)। তখন নিজের সমস্ত ছোট-বড় আমলের আসলরূপ দেখতে পেয়ে বলে উঠবে- مَالِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (এ কেমন কিতাব যে, ছোট বড় কোন বিষয়ই বাদ দেয়নি, বরং সব কিছু হিসাব করে রেখেছে। –সূরা কাহাফ, আয়াত ৪৯)

★ **দ্বিতীয় তরজমা– 'আমল'।**

১. অর্থাৎ দুর্ভাগ্য ও অসৎকর্ম যেন ওর গলার হার। দুর্ভাগ্যের সাথে অসৎকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাই দৃষ্টিগোচর হবে। (আয়াতটির আরো ব্যাখ্যার জন্য পূর্ববর্তী টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য– অনুবাদক)

২. অর্থাৎ আমলনামা তার হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজেই পড়ে দেখে নিতে পারে যে, যেসব কর্ম জীবনভর করেছিল তার কোনটা বাদ পড়েনি, আবার অতিরিক্ত কিছুও লেখা হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, সমস্ত আমল হুবহু তাতে বিদ্যমান আছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বে, দুনিয়াতে আল্লাহ-প্রেরিত 'কিতাব' অর্থাৎ কুরআনের এবং চাঁদ-সূর্যসম্পর্কিত হিসাবের আলোচনা হয়েছে। আর বর্তমান আয়াতে কিয়ামতের হিসাব-কিতাবের আলোচনা করা হল। কারণ, এই 'কিতাব' (তথা আমলনামা) সেই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-এর পরিণতিস্বরূপ (অর্থাৎ আমলনামা তেমনি হবে, যেমন কুরআনের সাথে আচরণ করা হবে –অনুবাদক)।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সরল পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন– এখন এর উপর চলবে কি চলবে না, প্রত্যেকে নিজের ভাল-মন্দ চিন্তা করে তা বুঝে নিক। কারণ, নিজের কার্যকলাপের লাভ বা ক্ষতি নিজেরই হবে। একের পাপের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না।

حَتّٰى نَبۡعَثَ رَسُوۡلًا ۝

এবং আমি শাস্তি প্রদান করি না যতক্ষণ না কোন রাসূল পাঠাই[১]।

১৬. وَاِذَاۤ اَرَدۡنَاۤ اَنۡ نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً اَمَرۡنَا مُتۡرَفِيۡهَا فَفَسَقُوۡا فِيۡهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا الۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنٰهَا تَدۡمِيۡرًا ۝

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার ঐশ্বর্যশালী লোকদের (ঈমান ও সৎকর্মের) আদেশ করি। কিন্তু ওরা সেখানে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, ফলে সেই জনপদের ব্যাপারে (শাস্তির) কথা অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই[২]।

---

১. অর্থাৎ নিঃসন্দেহে অসৎকর্ম বিপদ টেনে আনে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কর্মের পরিণতি স্পষ্ট করার পূর্বে পাকড়াও করেন না। এ জন্যই তিনি রাসূল প্রেরণ করেন, যাতে লোকেরা বে-খবর ও উদাসীন না থাকে এবং ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে পারে।

যেসব বিষয় মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা অনুধাবন করতে পারে (যথা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব বা একত্ববাদ), সেসবের অধিকতর ব্যাখ্যা নবীদের জবানীতে করে দেওয়া হয়। আর যেসব বিষয়ের উপলব্ধি শুধু জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব না, তা ওহীর মাধ্যমে অবগত করা হয়। এ জন্যই মানবসৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ তাআলা ওহী ও রেসালাতের ধারা জারী রেখেছেন, যাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে দুনিয়াতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে, কোন শাস্তিপ্রাপ্ত জাতি দুনিয়া বা আখেরাতে মূর্খতা ও বেখবরীকে ওযর বানাতে না পারে।

বি. দ্র. এস্থলে মুফাসসিরগণ 'আসহাবে ফাত্‌রাত' (তথা দুই নবীর মধ্যবর্তী নবীহীন সময়ের মানুষ এবং 'আতফালে সিগার' (বা নাবালেগ শিশুরা) ঈমান না আনার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে কি না– এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। আমরা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

২. অর্থাৎ অসৎকর্মের কারণে যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়, তখন একদম হঠাৎ পাকড়াও করে তাদের হালাক করে দেওয়া হয় না, বরং হুজ্জত পূর্ণ করার পর (অর্থাৎ অভিযোগের পথ বন্ধ করে) শাস্তি প্রদান করা হয়। প্রথমে নবী বা তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আল্লাহর আহকাম পৌঁছানো হয়, বিশেষত সেখানকার প্রধান ও প্রভাবশালী লোকদের নিকট, যাদের মানা না মানার প্রভাব সাধারণ লোকদের উপর পড়ে। যখন এ জাতীয় লোকেরা জেনেশুনে আল্লাহর বিধান অমান্য করে এবং প্রকাশ্যে অবাধ্যতা করত সমস্ত লোকালয়ের পরিবেশ বিষাক্ত ও দূষিত করে তোলে, তখন সেই জনপদ প্রকাশ্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

বি. দ্র.

وقال بعض السلف ان الأمر في قوله تعالى: أمرنا مترفيها، أمر تكويني قدري بالفسق وقوله تعالى، إن الله لا يأمر بالفحشاء، معناه نفي الأمر التشريعي فلامنافاة ، فافهم.

১৭. আমি নূহের পর কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি[১]! আর স্বীয় বান্দাদের পাপাচার সম্বন্ধে আপনার রবই যথেষ্ট অবগত এবং (তার) পরিপূর্ণ দ্রষ্টা[২]।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ⑰

১৮. যারা দুনিয়া কামনা করে, আমি (তাদের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, দুনিয়াতেই দিয়ে দেই। তারপর– তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম, যাতে সে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে[৩]।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ⑱

১৯. আর যারা আখেরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করে, আর তারা ঈমানদারও বটে– তো এমন লোকদেরই

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

('পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর বাণী أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا-এর মধ্যে أمر দ্বারা أمر تكويني বা সৃষ্টিগত নির্দেশ উদ্দেশ্য– অর্থাৎ তাদের তাকদীরে এ কথা সুনির্ধারিত যে, তারা পাপাচারে লিপ্ত হবে। অতএব, এর ব্যত্যয় ঘটবে না। আর إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ –এখানে أمر হচ্ছে تشريعي বা বিধানগত– অর্থাৎ শরঈভাবে আল্লাহ তাআলা অশ্লীলকাজের আদেশ করেন না। অতএব উভয় أمر এর অর্থে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।')

১. আদম (আ) ও নূহ (আ) এর মধ্যবর্তী সময়ে সকল মানুষ ইসলামের উপর ছিল। অতঃপর শিরক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়। নূহ আলাইহিস সালামকে ওদের হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়। কয়েক শত বছর ধরে তিনি ওদের বোঝান, কিন্তু ওরা মানেনি। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধ্বংস করা হয়। তার পর আরো বহু জাতি (যথা আদ, ছামূদ প্রভৃতি) ধ্বংস হয়। মোদ্দাকথা, নূহ (আ)-এর আগমনের পর থেকে বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করার ধারা শুরু হয়।

২. অর্থাৎ তিনি কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন না, কাউকে অসংগত শাস্তিও প্রদান করেন না, বরং প্রত্যেকের গোনাহ দেখে এবং তার চালচলন ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে জেনে তার সাথে সংগত আচরণ অবলম্বন করে থাকেন।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত সকল ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দেয়া তাঁর নীতি নয়। যারা শুধু দুনিয়ার সুখ-ভোগের জন্য সচেষ্ট, আমি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা, নিজ হেকমত ও বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী পার্থিব উপায়-উপকরণ দিয়ে দিই, যাতে তারা স্বীয় চেষ্টা-সাধনা ও নশ্বর সৎকর্মের নশ্বর ফল পেয়ে যায় এবং যাতে— যাদের কপালে আখেরাতের সৌভাগ্য নেই, তাদের দুর্ভাগ্য পূর্ণতায় পৌঁছে যায় এবং তারা চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে দোযখের চিরস্থায়ী জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হয়।

سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ⑲

চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়[১]।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَهٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ⑳

২০. আমি আপনার রবের দান থেকে সকলকে দিয়ে থাকি– এদেরকেও, ওদেরকেও। আর আপনার রবের দান রোধ করা যায় না[২]।

اُنْظُرْ كَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِیْلًا ㉑

২১. দেখ, আমি কীভাবে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিঃসন্দেহে আখেরাত মর্যাদাসমূহে অনেক বড় এবং অনেক বড় শ্রেষ্ঠত্বেও[৩]।

---

১. অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস আছে এবং সে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন ছওয়াবের আশায় নবীপ্রদর্শিত পথে চলার পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করে, তার চেষ্টা কিছুতেই বিনষ্ট হবে না, বরং তা আল্লাহর দরবারে অবশ্যই গৃহীত হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমত ও বিবেচনা অনুযায়ী কতক দুনিয়া-অন্বেষণকারীকে দুনিয়া দিয়ে দেন আর আখেরাতকামীদের সকলকে আখেরাত দান করেন। তাঁর দানে কেউ বাধা দিতে পারে না।

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, দুনিয়া অন্বেষণকারী হোক কিংবা আখেরাতকামী – উভয়কে বিবেচনা অনুযায়ী পার্থিব নেয়ামতের অংশ দেওয়া হয়। শুধু কুফর ও অবাধ্যতার কারণে পার্থিব উপকরণ ও নেয়ামত থেকে কাউকে সম্পূর্ণ মাহরুম করা হয় না।

৩. অর্থাৎ পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তানসন্ততি প্রভৃতির দিক দিয়ে একের উপর অন্যের কমবেশি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এ থেকেই বোঝা উচিত যে, পরকালে মানুষের অবস্থা ও আমলের বিবেচনায় মর্যাদা ও স্তরের কী পরিমাণ পার্থক্য হবে। কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতের শ্রেণীগুলির মাঝে এবং জাহান্নামের স্তরগুলোর মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য বিদ্যমান। হাদীসে আছে, জান্নাতের দুটি স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য হবে– (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৮৮৪) নিম্নস্তরের বেহেশতীরা উর্ধ্বস্তরের বেহেশতীদের সেভাবে দেখবে, যেভাবে আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্ব দিগন্তে কোন তারকা দেখে থাকি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৩১)

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বে বলা হয়েছে, জান্নাতের উক্ত স্তরগুলি তারাই লাভ করতে পারবে, যারা পরকালের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা-সাধনা করবে। এখন সামনের আয়াতগুলিতে পরকালের জন্য চেষ্টা-সাধনার পথ বাতানো হচ্ছে, যার অনুসরণ করলে মানুষের পক্ষে জান্নাত অর্জন করা সম্ভব হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা তাওরাতের সকল নৈতিক শিক্ষা সূরা বনী ইসরাঈলের পনেরটি আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এই পনেরটি আয়াত সামনের রুকূ থেকে আরম্ভ হচ্ছে।

لَا تَجۡعَلۡ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُوۡمًا مَّخۡذُوۡلًا ﴿۲۲﴾

২২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করো না, তা হলে তুমি নিন্দিত, অসহায় হয়ে পড়বে[১]।

[রুকূ - ৩]

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا

২৩. তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে[২]। যদি তোমার বর্তমানে তাদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে পৌছে যায়, তবে তাদের

---

১. অর্থাৎ শিরক এমন একটি সুস্পষ্ট অবৈধ বিষয়, যা অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, বরং দুনিয়ার সকল বুদ্ধিমান লোকের নিকট তোমরা নিন্দিত ও দোষী সাব্যস্ত হবে। তাই তো, আজ আমরা নিজ চোখে দেখছি, যেসব ধর্মে পরিষ্কার শিরকের তালীম ছিল, তারাও বুদ্ধিমান সমাজে স্থান পাওয়ার জন্য নিজেদের সংস্কার ও সংশোধন করে ক্রমান্বয়ে একত্ববাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের পক্ষে নিজের চেয়ে হীন বা কোন অক্ষম সৃষ্টির সামনে সেজদাবনত হওয়া চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের বিষয়, বিশেষ করে সেসবের সামনে ভিক্ষার হাত সম্প্রসারণ করা, যারা মানুষেরই হাতে গড়া। যে মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে মাথা নত করে, বেনিয়ায আল্লাহ তার জন্য প্রকৃত সাহায্য ও বরকতের দ্বার বন্ধ করে দেন এবং তাকে অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন। সুতরাং কঠিন সময়ে যখন তাঁর সাহায্য-সহায়তার দারুণ প্রয়োজন হবে, তখন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না- ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ (কতই না দুর্বল অন্বেষক ও অন্বেষিত!)

২. শিশুকে অস্তিত্ব আল্লাহ তাআলাই দান করেন, আর পিতামাতা তার অস্তিত্ব লাভের বাহ্যিক মাধ্যম। এ জন্য কতিপয় আয়াতে আল্লাহর হকের সাথে পিতামাতার হক উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে আছে, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে পিতামাতাকে পেয়েও তাদের খেদমত করে বেহেশত লাভ করতে পারল না (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৮৫৭)। আরেক হাদীসে আছে, বেহেশত মায়ের পদতলে। (মূল শব্দ মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৫৫৩৮-এ দ্রষ্টব্য)

পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার অর্থ– তাদের জীবদ্দশায় জানমালের দ্বারা তাদের সেবাযত্ন এবং অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা ও মহব্বত করা। আর মৃত্যুর পর তাদের জানাযা পড়া, তাদের জন্য দো'য়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা, তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার যথাসাধ্য পূর্ণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভক্তি ও সদ্ব্যবহার এবং তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'উফ' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদের ধমক দেবে না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে[১]।

تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝

২৪. আর করুণাভরে তাদের সামনে বিনয়ের ডানা ঝুঁকিয়ে দাও এবং বল, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন[২]।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

২৫. তোমাদের রব উত্তমরূপে জানেন, তোমাদের অন্তরে কী আছে। তোমরা যদি নেককার হও, তবে তিনি তো (আল্লাহ)-অভিমুখীদের জন্য অতি ক্ষমাশীল[৩]।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

---

১. বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা সেবাযত্নের বেশি মুখাপেক্ষী হয়। এতে কোন কোন সময় পরিবার-পরিজনও বিরক্ত হতে শুরু করে। অধিকতর বার্ধক্যে তাঁদের বুদ্ধিশুদ্ধিও ঠিক থাকে না। এমতাবস্থায় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাযত্নে অতিষ্ঠ না হওয়া অত্যন্ত ভাগ্যবান সন্তান-সন্ততিরই কাজ। পবিত্র কুরআন সতর্ক করে দিয়েছে যে, ধমক দেওয়া ও তিরস্কার করা তো দূরের কথা, তাঁদের সামনে বিরক্ত মুখে "আহা" শব্দটাও উচ্চারণ করো না, বরং কথা বলার সময় পূর্ণ আদব ও ভক্তি রক্ষা কর। ইবনে মুসায়্যিব (র) বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে এভাবে কথা বল, যেভাবে একজন অপরাধী গোলাম তার কঠোর স্বভাবের মনিবের সঙ্গে কথা বলে থাকে।

২. অর্থাৎ আমি যখন একেবারে দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম, তখন তাঁরা আমার প্রতিপালনে অনেক কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন, নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আমার জন্য সব রকমের সুখ-সুবিধার চিন্তা করেছেন। হাজারো বিপদাপদ থেকে রক্ষা করায় সচেষ্ট রয়েছেন, কতবার নিজ প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন। আজ তাঁদের দুর্বলতার সময় এসেছে, ফলে আমার সাধ্য মত তাঁদের খেদমত ও তাজীম করছি। কিন্তু এতেও তাঁদের পূর্ণ হক আদায় করতে পারছি না। এ জন্য আপনার নিকট (হে আল্লাহ) দরখাস্ত করছি, এই বৃদ্ধ বয়সে ও মৃত্যুর পরে তাঁদের প্রতি রহমতের বিশেষ দৃষ্টি দান করবেন।

৩. অর্থাৎ পিতামাতার ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তাঁদের সামনে বিনয় ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে হতে হবে। আল্লাহ তাআলা জানেন, কে কীরূপ অন্তরে মাতাপিতার খেদমত করে। যদি সত্যিই তোমরা অন্তর থেকে নেক হও এবং এখলাস ও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের খেদমত কর, তবে তিনি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। আর যদি কোন সময় কোন কারণে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, অতঃপর তওবা ও রুজু করে ফেল, তবে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপরায়ণ। তিনি ক্ষমা করে দেন।

২৬. আর আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং অভাবী ও মুসাফিরকেও। আর অপব্যয় করো না[১]।	وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝
২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান স্বীয় রবের চরম অকৃতজ্ঞ[২]।	اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝
২৮. আর যদি তুমি তাদের (অর্থাৎ আত্মীয়, অভাবী ও মুসাফিরদের) এ কারণে এড়িয়ে যেতে চাও যে, তুমি স্বীয় রবের ওই রহমতের প্রতীক্ষায় আছ যা লাভ হওয়ার আশা তুমি কর, তবে তাদের সাথে নম্র কথা বল[৩]।	وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝

বি. দ্র. কোন্ কোন্ বিষয়ে পিতামাতার কথা মানা জরুরী, কোন্ কোন্ বিষয়ে নয়– তার বিশদ বিবরণ ফিক্হের কিতাবাদিতে দেখা উচিত। তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'-তেও দীর্ঘ ও উপকারী আলোচনা রয়েছে।

১. অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক ও নৈতিক– সব রকমের হক আদায় কর, গরীব-দুঃখী ও অসহায় পথিকের খোঁজ-খবর নাও। আর আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অযথা–অন্যায়ভাবে নষ্ট করো না। অপব্যয় এর অর্থ হচ্ছে– গোনাহর ও অনর্থক কাজকামে ব্যয় করা, অথবা মুবাহ বিষয়াদিতেই চিন্তা-ভাবনা না করে এত পরিমাণ ব্যয় করা, যার ফলে ভবিষ্যতে হকদারের হক আদায় করতে না পারার এবং হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

২. অর্থাৎ ধনসম্পদ আল্লাহর একটি বড় নে'য়ামত, এর ফলে ইবাদত-বন্দেগীতে মন বসে, বহু ইসলামী খেদমত ও অনেক নেকী করার সুযোগ হয়। অপব্যয় হচ্ছে এক ধরণের অকৃতজ্ঞতা, যা শয়তানের উৎসাহ ও প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। তাছাড়া, এর দ্বারা মানুষ শয়তানের মত হয়ে যায়– কারণ, শয়তান যেমন খোদাপ্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যকে পাপাচার ও পথভ্রষ্টতায় ব্যয় করেছে, তদ্রূপ অপব্যয়কারী আল্লাহ তাআলার দেওয়া নে'য়ামত না-ফরমানীতে উড়িয়ে দিচ্ছে।

৩. অর্থাৎ যে মানুষ সর্বদা দান-খয়রাত করে থাকে, কোন সময় তার হাতও শূন্য হতে পারে। এ জন্য যদি কিছু দিতে না পারে, তবে নরম ও মিঠা ভাষায় ওজর করবে। যেমন বলবে, যখন আল্লাহ আমাদের দেবেন, তখন ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের খেদমত করব। কঠোরতা ও রূঢ় ব্যবহার করবে না। অন্যথায় পূর্ববর্তী দান-খয়রাতের ছওয়াবও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُوۡلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ الۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُوۡمًا مَّحۡسُوۡرًا۝

২৯. আর তুমি তোমার হাত নিজ ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্তও করে দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে পড়বে[১]।

اِنَّ رَبَّكَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيۡرًۢا بَصِيۡرًا۝

৩০. তোমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করেন[২]। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত, তাদের সম্যক দ্রষ্টা[৩]।

---

১. অর্থাৎ (প্রথম ক্ষেত্রে) সকলে অভিযোগ করবে যে, লোকটা কৃপণ, দারুণ বখীল। (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) তাকে অভিযুক্ত করে বলবে যে, সব উজাড় করে দিয়ে এখন নিজেই অভাবী হয়ে পড়েছে। মোদ্দাকথা, প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত– হাতকে সম্পূর্ণ সংকুচিত করতে নেই, আবার সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করতে গিয়ে তা এত সম্প্রসারিত করো না যে, পরে আবার ভিক্ষা চাইতে হয়। ইবনে কাছীর (র) লেখেন, সামর্থ্যের বাইরে বা আয়ের অধিক ব্যয় করাও وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ الۡبَسۡطِ-এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে– ما عال من اقتصد (যে ব্যক্তি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে, সে অভাবী হয় না)। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৪২৬৯; মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস : ১২৬৫৬)

২. অর্থাৎ হাত গুটিয়ে রাখলেই তোমরা ধনী ও অন্যরা ফকীর হয়ে যায় না, আর তোমাদের বদান্যতা দ্বারাও অন্যরা ধনী ও তোমরা ফকীর হয়ে যাও না। দরিদ্র ও ধনী বানানো এবং জীবিকা বাড়ানো ও কমানো একমাত্র আল্লাহর হাতে।

আর এ কথা ভেবে পেরেশান হওয়ারও প্রয়োজন নেই যে, হায়! আজ আমার হাত শূন্য। এই অভাবী ব্যক্তি তো আশা নিয়ে এসেছিল, এখন সে কী বলবে! দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা একমাত্র আল্লাহর কব্জাতেই রয়েছে। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে মধ্যম পন্থায় আদেশ পালন করা।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অভাবীকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ো না, তার প্রয়োজন মেটানো তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর দায়িত্ব। আর এ কথাগুলি নবী আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে, যিনি অপরিসীম দানশীল ছিলেন। অবশ্য যে খুশীচিত্তে সম্পদ ব্যায় করতে পারে না, তাকে দান-খয়রাত করতে জোর তাকিদ করা হয়েছে। কারণ, যেমন রোগ তেমন ওষুধ! রোগীকে গরম ওষুধ দিয়ে থাকেন।'

৩. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক বান্দার জাহেরী ও বাতেনী হাল-অবস্থা ও মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত– সে মতই তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার কিছু বান্দা এমন আছে যে, দারিদ্রের মধ্যেই তাদের কল্যাণ। আমি তাদের ধনী বানালে তাদের দীন-ধর্ম নষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে কিছু বান্দা এমন আছে, যাদের আমি ধনী বানিয়েছি– ফকীর বানানো হলে তারা দীনের উপর কায়েম থাকতে পারত না। এ ছাড়া কিছু

[রুকূ - ৪]

৩১. তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে আপন সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের ও তোমাদের রিযিক দান করি[১]। তাদের হত্যা করা নিশ্চয় মহা পাপ[২]।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝۳۱

৩২. এবং ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না[৩]। কারণ, তা তো অশ্লীলতা ও জঘন্য পথ[৪]।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝۳۲

হতভাগা এমনও আছে, যাদের ধন-সম্পদ দেওয়া হয় কেবল অবকাশ ও (পাপাচারে) সুযোগ প্রদানস্বরূপ, অথবা অভাব-অনটন প্রদান করা হয় শুধু শাস্তি ও পীড়ন হিসাবে। (আল্লাহ তাআলা আমাদের এ উভয় অবস্থা থেকে রক্ষা করুন।) [হিলয়াতুল আউলিয়া, বর্ণনা ১২৪৮৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৪১]

১. কোন কোন কাফের সন্তানদের এই ভয়ে হত্যা করে ফেলত যে, তাদের ব্যয়ভার কী করে বহন করবে। সূরা আনআমে এ বিষয়ক আয়াত (১৫১) রয়েছে, তার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২. কোননা, এ নির্দয় আচরণ মানববংশ নির্মূল করার কারণ এবং এতে প্রকাশ পায় যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রিযিকদানে বিশ্বাস রাখে না।

৩. অর্থাৎ যিনা (ব্যভিচার) করা তো গুরুতর বিষয়, তার কাছেও যেয়ো না। কেমন যেন, لَا تَقْرَبُوْا বলে যিনার ভূমিকা থেকেও বাঁচার আদেশ করা হয়েছে– যেমন শরী'য়তসম্মত ওজর ছাড়া পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া, তাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি।

৪. কারণ, ব্যভিচারের দ্বারা মানব বংশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অনেক ধরনের দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হয় এবং সকলের জন্য মন্দের দ্বার উন্মুক্ত হয়। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ এ পথ উন্মুক্ত হলে এক ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, আর অপরজন তার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেবে।'

'মুসনাদে আহমাদ'এ (হাদীস : ২২২১) আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল, আমাকে যিনার অনুমতি দিন। এতে উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে তিরস্কার করত বললেন, (আল্লাহন নবীর সম্মুখে এ ধৃষ্টতা?) সাবধান! চুপ থাক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমার কাছে আস। সে কাছে এলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, তোমার মা, মেয়ে, বোন, ফুফু ও খালার সাথে এরূপ করা হোক? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গিত করুন, কখনও না। তিনি বললেন, অন্যরাও নিজেদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু ও খালার জন্য এ আচরণ পছন্দ করে না। তারপর তিনি

৩৩. এবং সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যার হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে যথাযথ কারণে হলে (ভিন্ন বিষয়)[১]। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে (কেসাসের) ক্ষমতা দিয়েছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে[২], সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে[৩]।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ إِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

৩৪. এবং এতীমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে কেবল এমন পন্থায় যা উত্তম- যে পর্যন্ত না সে যৌবনে উপনীত হয়[৪]। আর অঙ্গীকার

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهٗ ۖ وَأَوْفُوْا

দো'য়া করলেন, আয় আল্লাহ! এর গোনাহ মাফ করুন এবং এর অন্তরকে পবিত্র ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।

হযরত আবু উমামা বলেন, এ দো'য়ার পর সে ব্যক্তির অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, সে কোন মহিলার প্রতি চোখ উঠিয়েও দেখত না। اللّٰهُمَّ صل على سيدنا محمد وبارك وسلم

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়– এক, সে কাউকে হত্যা করলে; দুই, বিবাহিত হয়ে যিনা করলে; তিন, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭৬)

২. অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য সরকারকে বলে (ও আদালতে যেয়ে) কেসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ করার অধিকার আছে। কিন্তু কেসাস গ্রহণ করার সময় সীমা অতিক্রম করবে না। যেমনঃ হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্যকে শাস্তি দেওয়া, অথবা হত্যাকারীর সাথে নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা অথবা হত্যাকারীর নাক, কান ইত্যাদি কেটে তার দেহ বিকৃত করা।

৩. আল্লাহ তাআলা তাকে এভাবে সাহায্য করেছেন যে, তাকে কেসাস নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন এবং শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তার অধিকার আদায় করে দিতে তারা যেন ত্রুটি না করে। বরং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, কেসাস গ্রহণে সহযোগিতা করা, হত্যাকারীর সহায়তা না করা। আর উত্তরাধিকারীর কর্তব্য হচ্ছে– একের স্থানে দুজনকে কতল না করা, অথবা হত্যাকারী ধরা না পড়লে তার পুত্র বা ভাইকে হত্যা না করা– যেমনঃ মূর্খতার যুগে প্রচলিত ছিল।

৪. অর্থাৎ এতীমের ধন-সম্পদ স্পর্শ করো না। তবে তার হেফাজত, দেখাশোনা ও হিতাকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য হলে তাতে ক্ষতি নেই। অতঃপর যখন সে সাবালক হয় এবং নিজের লাভ-ক্ষতি বুঝতে পারে, তখন তার ধনসম্পত্তি তার দায়িত্বে দিয়ে দাও।

بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾	পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে[১]।
وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾	৩৫. এবং মাপ পূর্ণ করে দাও যখন মাপ এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন কর[২]। এ-ই উত্তম এবং এরই পরিণাম উৎকৃষ্ট[৩]।
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾	৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর- এসবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে[৪]।

১. সব ধরণের অঙ্গীকার এর অন্তর্ভুক্ত, তা আল্লাহর সঙ্গে করা হোক বা বান্দাদের সঙ্গে। তবে শর্ত এই যে, তা শরী'য়তবিরুদ্ধ না হতে হবে। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কারও সাথে সন্ধি স্থাপন করে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করলে এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হয়।

২. অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা একদিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ো না, তা সোজা রাখ। মাপ ও ওজনে কম দিলে কায়-কারবারের ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। শুআ'য়ব (আ)-এর জাতির ধ্বংসের কাহিনী ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে- তাদের বড় অপরাধই ছিল মাপ-ওযনে ঠক্ দেওয়া। কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি কোন হারাম কাজের (যেমন মাপে কম দেওয়ার) শক্তি-সুযোগ পেয়েও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা পরকালের পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে শুভ বিনিময় দান করেন। (তাফসীরে তবারী : ১৪/৫৯৩)

৩. কেননা প্রতারণা কিছুদিন চলে, পরে লোকেরা অবগত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে কারবার ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে, সততা রক্ষাকারী সকলের নিকট প্রিয় হয় এবং আল্লাহ তার ব্যবসা খুব প্রসার করে দেন।

৪. অর্থাৎ তাহকীক ছাড়া এবং সঠিকভাবে না জেনে কোনো কথা মুখ থেকে বের করো না এবং অন্ধভাবে তার অনুসরণ করো না। মানুষের উচিত- যে কোনও ঘটনায় কান, চোখ, মন ও মস্তিষ্ক ব্যবহার করা এবং খোঁজ-খবর নিয়ে সে সম্পর্কে কোন কথা বলা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শোনা কথার ব্যাপারে না বুঝে, চিন্তা-ভাবনা না করে, শুধু আন্দাজ-অনুমানে কোন সিদ্ধান্ত দিতে নেই বা কার্যক্রম শুরু করতে নেই।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, প্রমাণহীন বিষয়াদি শুনে কাউকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করা অথবা হিংসা ও শত্রুতার মনোভাব গ্রহণ করা, বাপ-দাদার অনুকরণে বা রসম-রেওয়াজের অনুসরণে শরী'য়ত-বিরুদ্ধ বিষয়ে সহায়তা করা, না দেখা বা না শোনা

৩৭. এবং যমীনের বুকে দম্ভভরে চলো না। তুমি কখনো যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উঁচু হয়ে পর্বতমালা পর্যন্ত পৌছতেও পারবে না[১]।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

৩৮. এ সকল বিষয়ের মধ্যে যেগুলি মন্দ, তা তোমার রবের নিকট অপছন্দ[২]।

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

৩৯. এগুলি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়, যা আপনার রব আপনার নিকট ওহী মারফত পাঠিয়েছেন[৩]। আর তুমি (হে শ্রোতা)! আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত, বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে[৪]।

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝

বিষয়কে দেখা বা শোনা বিষয় বলে প্রকাশ করা, অজানা বিষয় সম্পর্কে নিজের জানা আছে বলে দাবি করা– এ সব কিছু আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ রাখা উচিত যে, কিয়ামতের দিন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে : এসব কোথায় কোথায় ব্যবহার করেছিলে? অপাত্রে বা অবৈধ স্থানে ব্যবহার করনি তো?

১. অর্থাৎ অহংকার করা মানুষের জন্য সমীচীন নয়– জোরে জোরে পা ফেলেও সে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, গলা বাড়িয়ে ও বুক ফুলিয়ে পর্বতসম হতে পারবে না। সুতরাং এহেন দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও এ ধরনের আস্ফালন করে কী লাভ?

২. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে তা করা এবং যেসবের আদেশ দেওয়া হয়েছে তা না করা রবের অসন্তুষ্টির কারণ।

৩. অর্থাৎ উপরে যেসব অমূল্য নসীহত করা হয়েছে, তা এমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ও চরিত্র গঠনমূলক বিষয়, যা সুস্থ বিবেক মাত্রই গ্রহণ করে নেয় এবং যা সরাসরি ওহীর মাধ্যমে উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর মাধ্যমে উম্মী উম্মতের প্রতি পাঠানো হয়েছে।

৪. উল্লিখিত নসীহতগুলির আলোচনা তাওহীদের এ শিক্ষা দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ; আর পরিসমাপ্তিতেও তাওহীদের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে কুরআনের পাঠক উপলব্ধি করতে পারে যে, সমস্ত নেককর্মের সূচনা ও সমাপ্তি খাঁটি তাওহীদের উপর হওয়া উচিত।

৪০. তবে কি তোমাদের রব তোমাদেরকে পুত্রসন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন, আর (নিজের জন্য) ফেরেশতাদের কন্যা সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথা বল![1]

أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنَٰثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝٤٠

[রুকূ - ৫]

৪১. আমি এ কুরআনে বিভিন্নভাবে নসীহত করেছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তা ওদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করে চলেছে[2]।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا۟ ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤١

৪২. আপনি বলুন, 'যদি তাঁর সঙ্গে আরো মা'বূদ[3] থাকত– যেমন ওরা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার কোনো পথ খুঁজে বের করত[4]।'

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۝٤٢

---

১. অর্থাৎ একে তো আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, তাও আবার কন্যাসন্তান– যাদের তোমরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে থাক, এ চরম ধৃষ্টতা।

২. অর্থাৎ কুরআন কারীম বিভিন্ন পন্থায় এবং নানা ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে এই মুশরিকদের নসীহত করে, কিন্তু নসীহত গ্রহণ করার পরিবর্তে এ হতভাগারা আরো বেশি বিমুখ হয় এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পলায়ন করে।

৩. অর্থাৎ মূর্তি প্রভৃতি, যাদেরকে আল্লাহর শরীক ও প্রভুত্বের অংশীদার বলা হয়ে থাকে।

৪. অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তারা পরাধীন থাকা পছন্দ করত না। বরং সকলে মিলে আল্লাহ তাআলার সিংহাসন উলটিয়ে দিত।

যদি বলা হয়, আরশের অধিপতির মোকাবেলায় তাদের কিছু করা সম্ভব নয়, তবে এরূপ অক্ষম সৃষ্টির উপাসনা করাই চরম বোকামী। আর যদি এই উপাস্যরা আরশের অধিপতিকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাঁর নৈকট্য হাসিল করা নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে, তবে এদের উপাসনাকারীদের জন্য বেশী জরুরী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতিকে সন্তুষ্ট রাখার ফিকির করা।

আসল কথা হচ্ছে, মহামহিম আল্লাহ সর্বপ্রকার অংশীদার থেকে পবিত্র। তিনি তো সকল নবী-রাসূলের যবানীতে এবং মানব-স্বভাবের মাধ্যমে শিরকের প্রতি তাঁর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ সত্ত্বেও নির্বোধেরা অন্ধের মত শিরকের পথেই চলছে।

৪৩. ওরা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪৪. সাত আসমান, যমীন এবং এদের মধ্যে যারা আছে তারা সকলে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহপাঠ অনুধাবন কর না[১]। নিশ্চয় তিনি ধৈর্যশীল, অতি ক্ষমাশীল[২]।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪৫. আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই[৩]।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

৪৬. এবং ওদের অন্তরের উপর রেখে দেই এক আচ্ছাদন, যাতে ওরা কুরআন না বোঝে[৪]

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেক মাখলুক নিজ যবান বা অবস্থার দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও গুণাবলি বর্ণনা করে, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না– চাই চিন্তা-ভাবনা না করার কারণেই হোক, অথবা সেই শক্তি না থাকার কারণে, যার দ্বারা কোন কোন সৃষ্টির যবানী তাসবীহ শোনা ও বোঝা যেতে পারে। আর যদি কোনো ব্যক্তি বুঝেও স্বীকার না করে অথবা তদনুসারে আমল না করে, তবে এই বোঝা না বোঝারই সমতুল্য।

২. অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যস্ত, তোমরা তাঁর জন্য অংশীদার, সন্তান ও কন্যা সাব্যস্ত করছ। নিশ্চয় এ এমন ধৃষ্টতা, যদ্দরুণ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দেওয়ার কথা, কিন্তু তিনি নিজ সহনশীলতার গুণে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না, আর তওবা করে নিলে ক্ষমা করে দেন।

৩. যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং নিজের পরিণামের কোনই চিন্তা করে না, সে নসীহতের প্রতি মনোনিবেশ করবে কেন? নিজ মুক্তির চিন্তাই যখন নেই, তখন মুক্তিদাতা পয়গম্বরের বাণীসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌছার প্রয়োজন বোধ করবে কেন? অতএব আখেরাতে অবিশ্বাস এবং পরিণামের প্রতি উদাসীনতাই সেই প্রচ্ছন্ন পর্দা, যা এই ব্যক্তি ও নবীর মাঝখানে টানিয়ে দেওয়া হয়।

৪. ইতিপূর্বে মুশরিক্‌দের পয়গম্বরের সততা অনুধাবন করতে না পারার উল্লেখ ছিল। এখানে কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করতে না পারার বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআনের অতি

يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

এবং ওদের কানে সৃষ্টি করে দেই বধিরতা[১]। আর আপনি যখন কুরআনের মধ্যে এককভাবে আপনার রবের উল্লেখ করেন, তখন ওরা ঘৃণাভরে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়[২]।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى

৪৭. ওরা যখন কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখ· যে উদ্দেশ্যে শোনে তা আমি উত্তমরূপে জানি[৩] এবং ওরা যখন গোপন পরামর্শ করে,

---

শক্তিশালী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর তার প্রভাব না পড়ার কারণ এই যে, ওরা পর্দার আড়ালে রয়েছে। সূর্যালোকে সমগ্র জগত আলোকিত হয়। কিন্তু কেউ যদি ভূগর্ভস্থ ঘরে সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে, এমন কি চোখও বন্ধ করে বসে থাকে, তবে সূর্যের আলো দেখবে কীভাবে? তার হিসাবে তো কোথাও কোন আলো নেই!

১. অর্থাৎ তারা যেহেতু উপকার হাসিলের নিয়তে শুনে না, অতএব যেন কিছুই শুনে না।

বি. দ্র. এস্থলে যেসব পর্দা ও আচ্ছাদনের কথা বলা হয়েছে, তা তারা আনন্দ ও গৌরবের সাথে নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করত। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে-

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

(আর ওরা বলে, 'আমাদের অন্তর সেই বিষয় থেকে গিলাফে আবৃত, যার দিকে তুমি আমাদের আহ্বান কর, আর আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা। অতএব তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।' –সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত ৫)

পরকালে বিশ্বাস না রাখা, পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন থাকা, এক আল্লাহর আলোচনায় ক্রোধান্বিত হওয়া, নবীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা– এগুলোই হচ্ছে এমন মন্দ বিষয়, যা পর্দা, 'আবরণ' ও 'ছিপি'-র রূপ ধারণ করে। তবে যেহেতু সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, তাই এসবের সৃষ্টিকেও তাঁরই সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ এক আল্লাহর আলোচনা করা হলে ওরা উত্তেজিত হয়, বিরক্ত হয় এবং পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। হাঁ, ওদের উপাস্যদের আলোচনা হলে খুব খুশী হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

(যখন এক আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নাম নেওয়া হয়, তখন তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকে। –সূরা যুমার, আয়াত ৪৫)

৩. অর্থাৎ আমি জানি যে, উপকৃত হওয়া ওদের উদ্দেশ্য হয় না, শুধু ঘৃণা ও ঠাট্টা করা উদ্দেশ্য হয়। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

إِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

যখন জালেমরা বলে, 'তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ (তখন সে কথাও আমি ভাল করে জানি)[১]।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا

৪৮. লক্ষ করুন, ওরা আপনার ব্যাপারে কেমন সব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করছে। এভাবে ওরা বিভ্রান্ত হচ্ছে, সুতরাং ওরা পথ পাবে না[২]।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا

৪৯. আর ওরা বলে, 'আমরা যখন হাড়-গোড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনো কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব[৩]?'

---

১. অর্থাৎ মুশরিকরা কুরআন ও নবী (সা.)-এর বক্তব্য শুনল। অতঃপর পরস্পর পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এখন কী বলা যেতে পারে? পরিশেষে ওরা বলল, এই লোকটা যাদুগ্রস্ত বলে মনে হয়। অর্থাৎ যাদুর প্রভাবে পাগল হয়ে গেছে, তাঁর মাথা ঠিক নেই (আল্লাহর পানাহ!)। –কোন কোন মুফাসসির আয়াতের مسحور শব্দটিকে ساحر অর্থে নিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর কথাবার্তায় যাদুর আছর আছে।

বি. দ্র. مسحور শব্দটি দ্বারা ওরা যা উদ্দেশ্য করত তা খণ্ডনের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নবীর উপর সাময়িকভাবেও কোন প্রকার যাদুর আছর হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর (মদীনায় হিজরত করার পর) হুযূরের উপর ইহুদীদের যাদু করার কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। হুযূরের উপর কয়েক দিন পর্যন্ত এর এতটুকু প্রতিক্রিয়া ছিল যে, কোন কোন পার্থিব কাজ তিনি কখনো বিস্মৃত হয়ে যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৮৯)

২. অর্থাৎ কখনো কবি, কখনো যাদুকর, কখনো গণক, কখনো যাদুগ্রস্ত বা পাগল বলত। মোটকথা, বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলতে থাকত– কোন একটি কথার উপরও স্থির থাকত না, যখন যা মুখে আসত তা-ই বলে দিত। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, শত চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও তারা নবীজীকে দোষারোপের এমন কোন উপায় পেত না, যা দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে কামিয়াব হতে পারে।

৩. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাদুগ্রস্ত বা পাগল কিংবা কবি বা গণক প্রভৃতি নাম প্রয়োগ করা তো আশ্চর্যের বিষয় ছিলই, কিন্তু এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক হচ্ছে সেই দলীল যা ওরা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ও পাগল প্রমাণিত করার জন্য পেশ করত। তার সারকথা এই যে, মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষের শরীর পচে-গলে শুধু হাড়গুলো থেকে যায়। কিছু দিন পর তাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যায়। অতএব, কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ কি এ কথা বলতে পারে যে, এ হাড়গুলোর চূর্ণ ও মাটির অণুগুলো পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে? এবং এই বিক্ষিপ্ত অণুগুলোর মধ্যে মানুষের জীবন প্রত্যাবর্তন করবে? যে

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾

৫০. আপনি বলুন, 'তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও–

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾

৫১. অথবা এমন কোন সৃষ্টি, যা (-র মধ্যে প্রাণ সঞ্চার) তোমাদের নিকট অধিক কঠিন– (সর্বাবস্থায় তোমরা পুনরুত্থিত হবে)[১]। অতঃপর শীঘ্রই ওরা বলবে, 'কে আমাদের আবার সৃষ্টি করবে?' আপনি বলুন, 'যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[২]।' তখন ওরা আপনার উদ্দেশ্যে নিজেদের মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলবে, 'তা কবে ঘটবে[৩]?' আপনি বলুন, 'সম্ভবত সত্বরই ঘটবে[৪]—

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ

৫২. যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন। আর তখনই তোমরা এই ডাকে সাড়া দেবে তাঁর

পয়গম্বর এরূপ অসম্ভব কথার সংবাদ দেন, তিনি মানসিকভাবে সুস্থ হতে পারেন না! (এই আসার দলীলের উত্তর সামন আসছে)।

১. অর্থাৎ এই অণু ও চূর্ণগুলো তো তবু মানুষের শরীরের, যার মধ্যে ইতিপূর্বে জীবন বিদ্যমান ছিল। আর মাটির কনিকাসমূহেও জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হওয়া তেমন কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমি আরো অগ্রসর হয়ে তোমাদের বলব যে, হাড়ের চূর্ণ নয়– সম্ভব হলে পাথর বা লোহাতে পরিণত হও, যার মধ্যে জীবনের কোন আলামত পরিলক্ষিত হয় না। বরং এমন কঠিন পদার্থে পরিণত হয়ে দেখ, যাতে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া লোহা ও পাথর থেকেও বেশি মুশকিল। বরং সম্ভব হলে মূর্তিমান মৃত্যুতে পরিণত হয়ে যাও। এরপরও দেখবে যে, একচ্ছত্র শক্তির মালিক আল্লাহর জন্য তোমাদের জীবিত করে দেওয়া কত সহজ।

২. যিনি প্রথমবার তোমাদের মাটি বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্জীব জড়পদার্থের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, এখন কি তাঁর মধ্যে এ শক্তি নেই যে, তিনি মাটির অণু-কণা ও মৃত লাশের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্র করত দ্বিতীয়বার তাতে জীবন সঞ্চার করে দেন?

৩. অর্থাৎ ঠাট্টা ও বিদ্রূপস্বরূপ মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বলবে– হ্যাঁ, মিয়া সাহেব! গলিত হাড়গুলোর অণু-কণাতে প্রাণসঞ্চার কখন হবে এবং হিসাবের জন্য মৃতদের কবর থেকে কখন ওঠানো হবে?

৪. অর্থাৎ কিয়ামতের সঠিক সময় আল্লাহ তাআলা কাউকে জানাননি, তবে তা সত্বরই ঘটবে বলে আপনি সম্ভাবনা প্রকাশ করতে পারেন। কারণ, অতীত বয়সের তুলনায় দুনিয়ার বাকি বয়স অল্পই।

وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

প্রশংসা করতে করতে[১] এবং তোমাদের মনে হবে যে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছ[২]।'

[রুকূ - ৬]

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

৫৩. আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন সেই কথাই বলে, যা উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু[৩]।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্বন্ধে বেশি জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, আর ইচ্ছা করলে তোমাদের আযাব দেবেন[৪]। আর আমি আপনাকে ওদের

---

১. অর্থাৎ যখন আল্লাহর তরফ থেকে ডাক দেওয়া হবে, তখন একটি মাত্র ডাকে সকল লাশ মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হয়ে যাবে। কারো অবাধ্যতা করার শক্তি হবে না। প্রত্যেক মানুষ তখন বাধ্য ও অনুগত হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে করতে হাযির হবে। অবশ্য তখনকার বাধ্যগত গুণকীর্তন ও প্রশংসায় কাফেরদের কোন লাভ হবে না। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, মুমিনদের মুখে তখন এ শব্দগুলি উচ্চারিত হবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

২. অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য এখন তোমরা তাড়াহুড়া করছ, আসার পর বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে বেশি একটা সময় থাকনি। হাজার হাজার বছরের তুলনায় পঞ্চাশ বা শত বছর কী আর মনে হবে? (موضح القرآن)

কেউ কেউ বলেছেন, ভয়-ভীতির আতিশয্যে দুনিয়ার জীবন স্বল্পকালীন বলে মনে হবে, অথবা শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে যেহেতু আযাব মুলতবী থাকবে, তাই এই মধ্যবর্তী সময়কে স্বল্প ধারণা করত ওরা বলবে- مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا (কে আমাদের উঠিয়ে দিল আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে?)

৩. মুশরিকদের মূর্খতা ও বিদ্রূপ-জনিত কথাবার্তা শুনে কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে উপদেশ দানের সময় সংকীর্ণতা ও কঠোরতা প্রদর্শনের সম্ভাবনা ছিল। তাই মুসলমানদের নসীহত করা হচ্ছে যে, দীনী আলোচনার সময় যেন কষ্টদায়ক কথা ও উত্তেজনাকর কোন পথ অবলম্বন না করা হয়। কেননা, এতে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে থাকে– শয়তান বিপক্ষকে উস্কানি দিয়ে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়। অতঃপর শ্রোতার অন্তরে এমনি জিদ ও শত্রুতা দানা বেঁধে ওঠে যে, সে বুঝেও বোঝে না।

৪. তিনি দয়া করবেন ঈমানের তাওফীক দিয়ে, অথবা আযাব দেবেন কুফরের হালতে মৃত্যু ঘটিয়ে।

عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

যিম্মাদার বানিয়ে পাঠাইনি[১]।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

৫৫. আপনার রব আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তাদের ভালভাবে জানেন। আর আমি নবীদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবূর[২]।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

৫৬. আপনি বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর তাদের ডাক, তাহলে (দেখবে)– তারা তোমাদের থেকে কষ্ট দূর করার বা তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না[৩]।'

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, পরস্পর আলোচনার সময় হকপন্থী এ কারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে, প্রতিপক্ষ স্পষ্ট সত্যকে মানছে না কেন? —এজন্য বলা হচ্ছে যে, তোমরা ওদের হেদায়াতের যিম্মাদার নও। আল্লাহই উত্তমরূপে জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখাবেন।

২. অর্থাৎ আমি নিজের সর্বব্যাপী ইলম অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গে যথা আচরণ করে থাকি। মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যাকে ভাল মনে করেছি, নবী বানিয়েছি। অতঃপর যে নবীকে ইচ্ছা অন্য নবীদের উপর সামগ্রিক বা আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, ' কোন কোন নবী এমনো ছিলেন যে, (উম্মতের সীমাতিরিক্ত অপকর্মের ফলে শেষ পর্যন্ত) অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বড় মন-মানসিকতার অধিকারী বানিয়েছেন এবং সকলের উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং তাঁর আচার-ব্যবহার স্বীয় উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। আর এস্থলে বিশেষভাবে দাউদ আলাইহিস সালামের উল্লেখের কারণ এই যে, উম্মতকে বোঝানোর জন্য তাঁর কাছে দুই জিনিস ছিল– জেহাদ ও যাবূর। (হাদীসে আছে- كان لايفر إذا لاقى) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯৭৭; মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস : ৭৮৬৪)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটও এ উভয় বিষয় বিদ্যমান– কুরআন ও জেহাদ।

কেউ কেউ বলেছেন, এস্থলে যাবূরের কথা উল্লেখ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর উম্মতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, তিনি যে 'খাতামুল আম্বিয়া' এবং তাঁর উম্মত যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাবূরে এর উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ (আমি যাবূরে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, শেষ পর্যন্ত আমার নেক বান্দারা যমীনের অধিকারী হবে। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৫)

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তো হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন, যার প্রতি ইচ্ছা মেহেরবানী করেন, যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। মোটকথা,

৫৭. এরা যাদের ডাকে, স্বয়ং তারাই আপন রব পর্যন্ত পৌঁছার ওসীলা অন্বেষণ করে (এবং চিন্তা করে) যে, তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) সবচেয়ে নিকটবর্তী[১] এবং তারা তাঁর মেহেরবানীর আশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার রবের আযাব ভয় করারই জিনিস[২]।

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ۝٥٧

তাঁর রয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও সর্বব্যাপী ইলম । এখন মুশরিকরা সেই সত্তাগুলোকে ডাকুক, যাদের ওরা খোদা বানিয়ে রেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ কি এমন ক্ষমতা রাখে যে, সামান্য দুঃখ-কষ্টও তোমাদের থেকে দূর করতে বা হ্রাস করে দিতে পারে, কিংবা তোমাদের থেকে সরিয়ে অন্য কারো উপর নিক্ষেপ করতে পারে? নিশ্চয় না। তাহলে এরূপ দুর্বল ও অক্ষম সৃষ্টিকে মা'বূদ সাব্যস্ত করা যায় কীভাবে?

১. বুখারী শরীফের হাদীস (৪৭১৪) আছে, কিছু লোক মূর্খতার যুগে জিনদের উপাসনা করত। সেই জিনেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এই উপাসনাকারীরা নিজেদের মূর্খতার উপর কায়েম থাকে। এদেরই ব্যাপারে বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কেউ কেউ বলেন, জিন, ফেরেশতা, মাসীহ প্রমুখের উপাসনাকারীরা সকলেই এই আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যেসব সত্তাকে তোমরা উপাস্য ও সাহায্যকারী মনে কর, তারা নিজেরা বরং মহাপ্রভু আল্লাহর পরম নৈকট্য সন্ধান করে থাকেন। তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে কে কত সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে যারা অধিক নিকটবর্তী, তাঁদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের আরো বেশী পিপাসা থাকে। তাঁরা চিন্তায় থাকেন, কী করে সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন বান্দার দো'য়া প্রভৃতিকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের ওসীলা বানানো যায়।

সুতরাং আল্লাহর সামনে এসব মা'বূদের যখন এ অবস্থা, তখন নিজেরাই ফয়সালা করে নাও যে, আল্লাহ তাআলাকে খুশী রাখা কত জরুরী। বস্তুত গাইরুল্লাহর ইবাদত দ্বারা আল্লাহও সন্তুষ্ট হন না এবং তারাও না, যাদের তোমরা সন্তুষ্ট রাখতে চাও।

বি. দ্র. توسل (অর্থাৎ ওসীলা ধরা) ও تعبد (বন্দেগী করা) এর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তদুপরি ওসীলা ধরাও ততটুকুই জায়েয, যতটুকু শরী'য়ত অনুমতি দিয়েছে।

২. অর্থাৎ অতীব নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীকে কেন্দ্র করেই এবং তারা তাঁর আযাবের ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁরা জানেন যে, সর্বপ্রকার উপকার সাধন বা বিপদাপদ দূর করা একমাত্র আল্লাহর হাতে।

৫৮. এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করে ফেলব না অথবা তাকে কঠোর শাস্তি দেব না[১]। এ কথা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২]।

وَاِنۡ مِّنۡ قَرۡیَۃٍ اِلَّا نَحۡنُ مُہۡلِکُوۡہَا قَبۡلَ یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ اَوۡ مُعَذِّبُوۡہَا عَذَابًا شَدِیۡدًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا ﴿۵۸﴾

৫৯. আর নিদর্শনাবলি প্রেরণ করা থেকে আমাকে এ বিষয়ই বিরত করেছে যে, পূর্ববর্তীরা তা অস্বীকার করেছে[৩]। এবং আমি ছামূদ

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنۡ نُّرۡسِلَ بِالۡاٰیٰتِ اِلَّاۤ اَنۡ کَذَّبَ بِہَا الۡاَوَّلُوۡنَ ؕ وَاٰتَیۡنَا ثَمُوۡدَ

---

১. এই আয়াতের অর্থ কয়েকভাবে করা যায় :

(ক) দুনিয়ার সকল জনপদকে বড় বড় পাপের কারণে কিয়ামতের পূর্বেই ব্যাপক আযাব পাঠিয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হবে। আর অপরাধ চরম পর্যায়ের না হলে, লঘু পাপাচারের শাস্তিরূপে সর্বগ্রাসী আযাব অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন কঠিন আযাব সেই জনপদের উপর পতিত করা হবে। বলা বাহুল্য, এমন জনপদ কোন্‌টি, যেখানে কোন অপরাধই হয় না এবং যার বাসিন্দারা কোন আপদে পতিত হয় না?

(খ) কিয়ামতের পূর্বে স্বাভাবিক মৃত্যু প্রেরণ করত প্রত্যেক জনপদকে জনশূন্য করে দেওয়া হবে, অথবা কোন কঠিন বিপদে পতিত করা হবে। শাস্তিস্বরূপ না হলেও স্বাভাবিক মৃত্যুকেও কুরআন-হাদীসে هلاك (ধ্বংস) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা : حَتّٰۤی اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا (অবশেষে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর পরে আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না।' –সূরা মুমিন, আয়াত ৩৪)। হাদীসে রয়েছে- كلما هلك نبي جاء نبي آخر (যখনই এক নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন অপর নবী আগমন করেছেন।) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৪৫৫)

(গ) কাফেরদের সকল লোকালয় হয় কিয়ামতের পূর্বে স্বীয় মারাত্মক অপরাধের পরিণামে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে, না হয় তারা কোন না কোন সময় (কিয়ামতের আগে বা পরে) কঠোর আযাবের স্বাদ ভোগ করবে।

যা হোক, যে অর্থই নেওয়া হোক– আয়াতের উদ্দেশ্য সতর্ক করা। পূর্বে যে বলা হয়েছে– اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا, বর্তমান আয়াতে তারই সংঘটনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত একেবারে চূড়ান্ত ও অটল। আল্লাহর ইলমে এটা সাব্যস্ত এবং লওহে মাহফূজে লিখিত আছে। কোন শক্তিই এটি রোধ করতে পারবে না। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেক জনপদের লোকেরা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে এ কথা ভেবে মান্য করে যে, আমরা তার ভক্তবৃন্দ এবং তার আশ্রয়ে আছি। কিন্তু যখন সময় আসবে, কেউই আশ্রয় দিতে পারবে না- لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ

৩. **শানে নুযূল**

হাদীসে আছে, একদা মক্কার কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কয়েকটি নিদর্শন দেখাতে বলল– যথা: সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দিন, অথবা

النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝

জাতিকে অন্তর্চক্ষু খুলে দেয় এমন উটনী দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তার প্রতি জুলুম করল[১]। আর আমি নিদর্শনাবলি প্রেরণ করি শুধু ভীতি প্রদর্শনের জন্য[২]।

আমাদের আশপাশ থেকে পাহাড়-পর্বতকে হটিয়ে কৃষির উপযোগী সমতল ভূমি বানিয়ে দিন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনটি করতে পারলে আমরা আপনাকে মেনে নেব। এরই উত্তরে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩৩)

আয়াতের অর্থ হল– এরূপ ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো আল্লাহ তাআলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফরমায়েশ অনুযায়ী পূর্ববর্তী লোকদের নিদর্শন দেখানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তারা মানেনি, বরং অধিকতর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহর নীতি অনুযায়ী ওদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এখন যদি তোমাদের সকল ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় এবং তা সত্ত্বেও তোমরা না মান– যেমনটি আল্লাহর ইলমে আছে এবং তোমাদের অবস্থা থেকেও তা সুস্পষ্ট, তবে আল্লাহর নীতি অনুযায়ী এর ফলাফলও পূর্বের ন্যায় সার্বিক ধ্বংস সাধনই হবে। অথচ এটি এ উম্মতের ব্যাপারে হেকমত ও কল্যাণপরিপন্থী। আখেরী উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এমন নয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় ধ্বংসাত্মক আযাব পাঠিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন।

পূর্ববর্তীদের এমন নিদর্শন দেখানো হতো কেন?

পূর্ববর্তী উম্মতদের ফরমায়েশী নিদর্শন এজন্য দেখানো হত যে, একে তো ওদের সমূলে ধ্বংস করা খোদার নিকট অনভিপ্রেত ছিল না। দ্বিতীয়ত, ফরমায়েশী নিদর্শন যারা চায় তাদের পরিণতি কীরূপ হয়, তার কিছুটা নমুনা সর্বশেষ আগমনকারী উম্মতকে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্যই বর্তমান আয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতগুলিকে প্রদত্ত নিদর্শনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যদি ফরমায়েশী নিদর্শন দেখার পরও অস্বীকার কর (এবং অবশ্যই করবে), তবে যে পরিণাম পূর্ববর্তীদের হয়েছিল তোমাদেরও তাই হবে। কিন্তু তোমাদের এভাবে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। অতএব ফরমায়েশী নিদর্শনাদি প্রেরণ করা মুলতবী রাখা হয়েছে।

১. "ছামূদ জাতি" হযরত সালেহ (আ)-এর নিকট এই আবদার করেছিল যে, পাহাড়ের অমুক পাথর থেকে একটি উটনী বের করে দিন। আল্লাহ তাআলা বের করে দিলেন। কিন্তু তারা অন্তর্চক্ষু খোলার পরিবর্তে জুলুম ও শত্রুতা করতে উঠে পড়ে লাগল। ওরা উটনীকে মেরে ফেলল এবং হযরত সালেহ (আ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। অবশেষে ওদের যে পরিণাম হল তা সকলের জানা আছে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য, كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ –এর নমুনাস্বরূপই এ ঘটনা উল্লেখ করা হল।

২. অর্থাৎ হেদায়েত নিদর্শনাদি দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। অস্বাভাবিক নিদর্শনাদি পাঠানোর উদ্দেশ্য কেবল এই যে, আল্লাহর বজ্রকঠোর শক্তিমত্তা দেখে মানুষ যেন তাঁকে ভয় করে এবং

৬০. (স্মরণ করুন), যখন আমি আপনাকে বলে দিলাম, 'আপনার রব (তাঁর ইলম ও কুদরতের দ্বারা) সকল মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[১]।' আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা লোকদের জন্য কেবল পরীক্ষার বস্তুই বানিয়েছি[২], এবং কুরআনে অভিশপ্ত বৃক্ষটিকেও (পরীক্ষার বস্তু বানিয়েছি)[৩]। আর

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ

তাঁর প্রতি অনুগত হয়। এ উদ্দেশ্যই যদি হাসিল না হল, অপরদিকে এ উম্মতকে ধ্বংস করাও সংগত নয়, তবে নিদর্শনাদি পাঠিয়ে কী লাভ? অবশ্য সাধারণ ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের জন্য যেসব মু'জেযা ও নিদর্শন প্রেরণ করা কল্যাণকর, তা সর্বদা পাঠানো হয়।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ধারণা হয়ে থাকবে যে, ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর কারণে কাফেরদের পক্ষে হাসি-ঠাট্টা করার সুযোগ হবে এবং তারা অভিযোগ করবে যে, যদি তিনি সত্য নবী হতেন তবে আমাদের দাবি অনুযায়ী নিদর্শন দেখাতেন।

এ জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার প্রভুর জ্ঞান ও শক্তি সকল মানুষকে ঘিরে রয়েছে– কেউ তাঁর জ্ঞানবহির্ভূত নয়, কেউ তাঁর শক্তির অধীনতা থেকেও বের হয়ে যেতে পারে না, বরং সকলেই তাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আপনি ওদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবেন না, ওরা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আপনি আপনার কাজ করে যান এবং ওদের সব ফয়সালা সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি জানি যে, ফরমায়েশী নিদর্শন দেখেও ওরা আপনার কথা মানত না এবং এর ফলে আমার শাস্তি থেকে পলায়ন করাও ওদের পক্ষে সম্ভব হত না। আর আমি এও জানি যে, ওদের মধ্যে কাদেরকে এখনই ধ্বংস করে দেওয়া দরকার এবং কাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিৎ। সুতরাং আপনি এসব চিন্তা-ফিকিরে পড়বেন না– এরা সবাই আমার বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যাবে।

২. "দৃশ্য" বলতে শবে মেরাজের দৃশ্য উদ্দেশ্য, যার আলোচনা দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। যারা পাক্কা মু'মিন, তারা ঘটনা শুনে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু যারা সন্দেহবাদী, তারা অবিশ্বাস করেছে।

৩. অর্থাৎ কুরআনে দোযখবাসীদের খাদ্য হিসাবে বর্ণিত "যাক্কুম" গাছের প্রতি ঈমানদাররা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর কাফেররা বলেছে, দোযখের আগুনে সবুজ বৃক্ষ কী করে জন্মাবে?

আসলে এর দ্বারাও পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। আর এ দুটি উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়, অলৌকিক বিষয়াদি মানার ব্যাপারে ওদের স্বভাব-প্রকৃতি কী? (সুতরাং ওদের ফরমায়েশী নিদর্শনাবলি দেখিয়ে কী লাভ?)

وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

আমি ওদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা ওদের ঘোর অবাধ্যতাকেই বৃদ্ধি করে[১]।

[রুকূ - ৭]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۙ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝

৬১. (স্মরণ করুন), যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর'। তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সেজদায় পড়ে গেল। সে বলল, 'আমি কি তাকে সেজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন[২]?

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬২. সে (আরো) বলল, 'দেখুন– এই ব্যক্তি যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন– তবে আমি অবশ্যই অল্পসংখ্যক ছাড়া এর সকল সন্তান-সন্ততিকে আমার বশীভূত করে ফেলব[৩]।

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۝

৬৩. আল্লাহ বললেন, 'যা তুই! তাদের মধ্যে যারা তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তোদের সবার শাস্তি– পরিপূর্ণ শাস্তি[৪]।

---

১. অর্থাৎ যাদের অন্তরে খোদার ভয় নেই, ভয়প্রদর্শনেও যারা ভীত হয় না, বরং দুষ্কর্ম বাড়িয়ে দেয়– তাদের ব্যাপারে এ আশা অনর্থক যে, তারা ফরমায়েশী নিদর্শন দেখে সত্যকে মেনে নেবে।

২. এই কাহিনী কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলার হুকুম বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া ফেরেশতাদের কাজ, আর তাতে আপত্তি করা শয়তানের কাজ। উল্লিখিত (মক্কার) কাফেররাও শয়তানেরই আচরণ করছে এবং কথায় কথায় অহেতুক বাদানুবাদ করছে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এদের পরিণামও স্বীয় নেতা অভিশপ্ত ইবলীসের মতই হবে।

৩. অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত আর সকলকে আমার অনুগত করে ফেলব, যেমন ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে কাবু করে ফেলা হয়। সুতরাং যে আমার সম্মুখে এতই দুর্বল, তাকে আমার উপর মর্যাদা দেওয়ার মানে কী?

৪. অর্থাৎ তুই যা! তুই যত শক্তি খাটাতে পারিস, খাটিয়ে নে। আমিও তোর ও তোর সঙ্গীদের জন্য জেলখানা প্রস্তুত করে রাখলাম।

৬৪. 'আর তুই তাদের মধ্যে যাকে পারিস তোর ডাকের দ্বারা বিভ্রান্ত কর[১], ওদের উপর তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও কর[২], ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ওদের শরীক হয়ে যা[৩] এবং ওদের প্রতিশ্রুতি দে।' শয়তান তো ওদের প্রতারণা ছাড়া আর কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না[৪]।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৫. 'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোর কোন আধিপত্য নেই। আর কর্মবিধায়ক হিসাবে তোর রবই যথেষ্ট[৫]।'

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৬. তোমাদের রব তো সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য দরিয়ায় নৌযান চালান[৬],

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي

---

১. অর্থাৎ সেই ডাক, যা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য– অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেওয়া। আর গান-বাজনাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২. অর্থাৎ সকল সামর্থ্য ব্যয় করে ফেল এবং সমগ্র শক্তিসহ অভিযানে নেমে পড়!

আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সকলেই শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, জিন হোক বা মানুষ হোক।

৩. অর্থাৎ ওদের সব রকমে প্ররোচিত কর, যাতে ওরা ধনসম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে তোকে অংশীদার বানায়, অর্থাৎ এসব কিছু অবৈধ উপায়ে হাসিল করে এবং অবৈধ কাজকর্মে ব্যবহার করে।

৪. অর্থাৎ শয়তান যে সোনালী স্বপ্ন দেখায়, তাতে প্রতারিত হওয়া আহমকের কাজ। শয়তানের সকল অঙ্গীকার ছল-চাতুরী ও প্রতারণাপূর্ণ। সে নিজেই (একদিন) স্বীকার করবে: وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ (ইবরাহীম, আয়াত ২২)

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রাখে, তিনি তাদের কার্যসিদ্ধি করেন এবং শয়তানের ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন।

৬. এস্থলে আল্লাহর কার্যসম্পাদনের একটি নমুনা পেশ করা হয়েছে। একজন মুশরিকও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আল্লাহ ছাড়া কোনই কার্যসম্পাদক নেই। কবি বলেন-

کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے

(সাময়িক শক্তিসমূহ সবই দুর্বল)।

যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর[১]। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান।

الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

৬৭. দরিয়ায় যখন তোমাদের বিপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা যাদের ডাক তারা (তোমাদের মন থেকে) উধাও হয়ে যায়– কেবল আল্লাহ ছাড়া। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা (তাঁকে) এড়িয়ে যাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ[২]।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

৬৮. তবে কি তোমরা এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের ধসিয়ে দিতে পারেন স্থলের (কোন) প্রান্তে[৩] অথবা তোমাদের উপর প্রেরণ করতে পারেন শিলাবর্ষণকারী ঘুর্ণিঝড়। অতঃপর তোমরা নিজেদের জন্য পাবে না কোন রক্ষাকর্তা?

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾

৬৯. অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের পুনরায় দরিয়ায় নিয়ে যেতে পারেন[৪], তারপর তোমাদের উপর প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করবেন এবং তোমাদেরকে

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا

---

১. অর্থাৎ জীবিকা। জীবিকাকে কুরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে فضل বলা হয়েছে। এর আসল অর্থ বাড়তি। মুসলমানদের বন্দেগী তো পরকালের জন্য, আর দুনিয়ায় যা লাভ হয় তা বাড়তি বৈকি। (অর্থাৎ ইবাদতের পূর্ণ ফলাফল তো পরকালে প্রকাশ পাবে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা দিচ্ছেন তা বাড়তি। –অনুবাদক)

২. فضله অর্থাৎ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েই প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ভুলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে আল্লাহকে ডাকছিল, তীরে পা রাখামাত্রই সব কিছু ভুলে গেল। এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

৩. অর্থাৎ সমুদ্রের পাড়ে স্থলে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন– যেমন ভূমিকম্প হবে এবং মাটি বিদীর্ণ হয়ে কারূনের ন্যায় তোমরা তাতে ধ্বসে যাবে। মোটকথা, ধ্বংস করা সমুদ্রের ঢেউ এর উপর নির্ভরশীল নয় (তিনি স্থলভাগেও ধ্বসিয়ে দিতে পারেন)।

৪. অর্থাৎ এমন কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিলেন, যার কারণে বাধ্য হয়ে সামুদ্রিক সফর করতে হল।

مِّنَ الرِّيۡحِ فَيُغۡرِقَكُمۡ بِمَا كَفَرۡتُمۡ ثُمَّ لَا تَجِدُوۡا لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهٖ تَبِيۡعًا ۝

তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে ডুবিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের জন্য এমন কাউকে পাবে না, যে এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে[১]?

৭০. وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيۡۤ اٰدَمَ وَحَمَلۡنٰهُمۡ فِي الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنٰهُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلۡنٰهُمۡ عَلٰى كَثِيۡرٍ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيۡلًا ۝

আমি আদম-সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে বাহন দিয়েছি স্থলে ও জলে, তাদেরকে রিযিকস্বরূপ পরিচ্ছন্ন দ্রব্যাদি দান করেছি এবং আমার অনেক মাখলুকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি[২]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহকে কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে? অথবা কার এত সাহস আছে যে, তাঁর নিকট থেকে অপরাধীদের রক্তপণ আদায় করতে পারে?

২. অর্থাৎ মানুষকে তিনি সুন্দর আকৃতি, বাকশক্তি, শক্তি-সামর্থ্য, আকল-বুদ্ধি ও অনুভূতিশক্তি দান করেছেন, যা দিয়ে সে পার্থিব ও পরকালীন লাভ-লোকসান বুঝতে এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে পারে। তিনি তার উন্নতির জন্য সকল পথ উন্মুক্ত করেছেন। সে অন্যান্য সৃষ্টজীবকে বশে এনে নিজের কাজে লাগায়। স্থলভাগে জীবজন্তুর পিঠে চড়ে বা অন্য কোন গাড়ীতে চড়ে সফর করে এবং নৌকা ও জাহাজে আরোহণ করত নদী ও সমুদ্র পথে অনায়াসে ভ্রমণ করে। তাকে আল্লাহ আরো দান করেছেন বিভিন্ন রকমের উন্নত-পরিচ্ছন্ন খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ও পার্থিব আরাম-আয়েশের উপকরণ। এ আদম-সন্তানদেরই আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকুলের দ্বারা সেজদা করিয়েছেন এবং সর্বশেষ পয়গম্বর হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন।

মোটকথা, মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা অনেক দিক থেকে মর্যাদা ও গৌরব দান করেছেন এবং নিজের অনেক বড় বড় মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

ইতিপূর্বে আদম (আ) সম্বন্ধে শয়তানের হিংসাত্মক উক্তি- هذا الذي كرمت علي এবং ফেরেশতাদের আদম (আ)-কে সেজদা করা, নৌযানের দ্বারা আদম-সন্তানদেরকে সামুদ্রিক সফর করানো ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। এই বিষয়গুলির সাথে আলোচ্য আয়াতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বি. দ্র. বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ এ বিতর্কের অবতারণা করেছেন যে, ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তবে সত্য কথা এই যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই বিষয়ের ফয়সালা হয় না। হানাফী আলিমগণের অভিমত এই যে, "মানব-রাসূল" "ফেরেশতা-রাসূল" থেকে শ্রেয় এবং ফেরেশতা-রাসূল (মানব-রাসূল ছাড়া) অবশিষ্ট ফেরেশতাকুল ও মানবগোষ্ঠী থেকে শ্রেয়, আর সাধারণ মানুষ থেকে সাধারণ ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। والله أعلم

[রুকূ - ৮]

৭১. (স্মরণ কর), যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ* ডাকব। অতঃপর যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পড়বে[১] এবং তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না[২]।

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমলনামাসহ'।

১. এখানে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, দুনিয়াতে সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, তা সে কতখানি অক্ষুন্ন রেখেছে এবং কারা কারা মানবীয় মর্যাদা ও আভিজাত্যকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

আয়াতের সারাসার এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক সম্প্রদায় তার সাথে উপস্থিত হবে; যার অনুসরণ-অনুকরণ তারা করত। যেমন মুমিনদের ক্ষেত্রে নবী, কিতাব, দীনী নেতা। আর কাফেরদের ক্ষেত্রে ধর্মগুরু, বড় শয়তান ও মিথ্যা উপাস্য, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে- وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ (আমি ওদের এমন নেতা বানিয়েছিলাম, যারা দোযখের দিকে আহ্বান করত। –সূরা কাসাস, আয়াত ৪১) আর হাদীসে আছে- لتتبع كل أمة ما كانت تعبد الخ (প্রত্যেক উম্মত তার অনুগামী হবে, যার উপাসনা তারা করত।) (মুসনাদে হুমাইদী, হাদীস : ১২১২; সহিহ বুখারী, হাদীস : ৪৫৮১)

তখন সকল মানুষের নিকট আমলনামা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে– কারো আমলনামা সম্মুখ থেকে ডান হাতে, আর কারোটা পিছন থেকে বাঁ হাতে। এটা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার একটি বাহ্যিক নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হবে। দুনিয়াতে যারা সত্যকে গ্রহণ করে নিজেদের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে, তারাই "আসহাবে ইয়ামীন" (ডান হাতে আমলনামাধারী) হবে। দুনিয়াতে তারা দেখে-শুনে ও ভেবে-চিন্তে কাজ করেছিল বলে পরকালে তারা এর সুফল পাবে। সেদিন তারা খুশীতে আটখানা হয়ে যাবে। পরম আনন্দ-আহলাদে স্বীয় আমলনামা পড়বে এবং অন্যদেরও বলবে- هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهْ (হাক্কাহ, আয়াত ১৯) "আস, আমার কিতাব পড়ে দেখ।" পক্ষান্তরে যারা "আসহাবে শিমাল" (বাঁ হাতে আমলনামাধারী) হবে, তাদের কিছু অবস্থা সামনের আয়াতে বর্ণিত হবে।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে আয়াতে إمام শব্দ দ্বারা আমলনামা উদ্দেশ্য। কারণ, পরকালে মানুষ তার অনুগামী হবে।

২. (فتيلًا) অর্থাৎ খেজুরদানার মধ্যভাগে একটি সরু সূতার মত যে থাকে, এই পরিমাণ অবিচারও সেদিন হবে না। প্রত্যেকে নিজ প্রচেষ্টার পূর্ণ বরং তারও বেশি প্রতিদান লাভ করবে।

৭২. আর যে কেউ ইহজগতে অন্ধ রইল, সে পরজগতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথহারা থাকবে[১]।

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৭৩. ওরা তো আপনাকে তা থেকে বিচ্যুত করে ফেলতে চেয়েছিল, যা ওহী মারফত আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি, যাতে আপনি তার পরিবর্তে অন্য কিছু বানিয়ে আমার প্রতি আরোপ করেন। আর তখন ওরা আপনাকে নিশ্চয় বন্ধু বানিয়ে নিত[২]।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন হেদায়াতের পথ থেকে অন্ধ থেকেছে, তেমনি আখেরাতে বেহেশতের পথ থেকে অন্ধ এবং বহু দূরে পড়ে থাকবে। —এখানে "আসহাবে ইয়ামীন" এর বিপরীতে "আসহাবে শিমাল" এর অবস্থা উল্লেখ করা হল।

কেউ কেউ أضل سبيلا এর এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, দুনিয়াতে যা হারিয়েছিল তার তো প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আখেরাতে এমন সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থাকবে। কারণ, সেখানে ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

২. অর্থাৎ কতক অন্ধ এমনই দুরাচারী যে, নিজেরা পথে আসা তো দূরের কথা– বড় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও বিচ্যুত করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, মক্কার কাফেরদের এই ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা লক্ষণীয় যে, ওরা স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্ররোচিত করছে, যাতে তিনি খোদাপ্রদত্ত আহকাম ও তাঁর ওহীর কিছু অংশ ওদের খাতিরে বর্জন করেন বা পরিবর্তন করে ফেলেন। এই অপচেষ্টায় কখনো রাজত্ব, ধন-দৌলত ও সুন্দরী নারীদের লোভ দেখাচ্ছে। আর কখনো বলছে, কুরআনে শিরক ও মূর্তিপূজার খণ্ডনে যে আয়াতগুলি আছে, শুধু তা বাদ দিলেই আমরা আপনার অনুসারী হয়ে যাব।

ধরে নেওয়া যাক– আপনি যদি এমনটি করতেন, তবে অবশ্যই ওরা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নিত। কিন্তু (দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে) হুযূর (সা.)-এর উত্তর এ-ই ছিল যে– 'আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আমার এক হাতে চাঁদ ও অন্য হাতে সূর্যও এনে দাও, তবুও মুহাম্মদ তা বর্জন করবে না, যা দিয়ে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন। হয় সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করবে, নতুবা এ পথে এমনকি প্রাণ বিসর্জন দেবে,

কবির ভাষায়-

دست از طلب ندارم تا کام من برآید ÷ یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

(আমার লক্ষ্যমূলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না– হয় দেহ প্রাণপ্রিয়ের কাছে পৌঁছে যাবে, না হয় প্রাণ দেহ ত্যাগ করে যাবে)।

৭৪. আর যদি না আমি আপনাকে অবিচলিত রাখতাম, তবে আপনি ওদের প্রতি সামান্য কিছুটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতেন[১]।

وَلَوْ لَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۞

৭৫. সেক্ষেত্রে, আমি আপনাকে অবশ্যই দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম– এই জীবনেও এবং মরণের পরেও। অতঃপর আপনি নিজের জন্য আমার বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী পেতেন না[২]।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۞

---

১. تركن ক্রিয়াটি ركون থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ– মনের সামান্য ঝোঁক ও ঈষৎ আকর্ষণ। এর সাথে شَيْئًا قَلِيْلًا জুড়ে দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, স্বল্প থেকে স্বল্পতম ঝোঁকই উদ্দেশ্য। তদুপরি لَقَدْ كِدْتَ যোগ করে এর সম্ভাব্যতাকে অধিকতর লঘু করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যদি নিষ্পাপ পয়গম্বর না হতেন– যার নিষ্পাপতা আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে রক্ষা করে থাকেন– তবে এই ধূর্ত দুরাচারীদের ছল-চাতুরীর কারণে আপনার অতি সামান্য মাত্রায় সেদিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পয়গম্বরদের নিষ্পাপতা রক্ষা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন বলে এ সামান্য ঝোঁকপ্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়নি।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তাক্ওয়া-পরহেজগারীর স্বভাবজাত শক্তি কী পরিমাণ মজবুত, দৃঢ় ও অনমনীয় ছিল!

২. এখানেও অতি সূক্ষ্ম উপায়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। নৈকট্যধারীদের পুরস্কারও যেমন অতি বড়, তাঁদের ছোট থেকে ছোটতর ভুল বা ত্রুটির জন্য ভর্ৎসনাও হয়ে থাকে বেশী। উদাহরণস্বরূপ, নবীজীর পবিত্র স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। – সূরা আহযাব, আয়াত ৩০)

তো, এখানে বলা হচ্ছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা অনন্যসাধারণ। তাই অসম্ভব হলেও ধরা যাক– যদি তাঁর দ্বারা অতি সামান্য ভুলত্রুটি হয়, তবে তাঁকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখেরাতে দ্বিগুণ স্বাদ (আযাবের) আস্বাদন করতে হবে। (এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মর্যাদা অনন্য সাধারণ, নতুবা ভুল-ত্রুটির শাস্তি দ্বিগুণ হত না)।

এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করার সময় মুমিনের কর্তব্য, নতজানু হয়ে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত চিত্তে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও পরাক্রম স্মরণ করত সেই দো'য়াটি করা, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ لَاتَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ (আয় খোদা! এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নফসের নিকট সোপর্দ করো না!) অর্থাৎ সর্বদা তোমারই হেফাজত ও দায়িত্বে রাখ। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৯৭০; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ১০৩৩০)

৭৬. আর ওরা তো আপনাকে আতঙ্কিত করে তুলতে চেয়েছিল, যাতে আপনাকে এই ভূমি থেকে বহিষ্কার করতে পারে। অথচ সেক্ষেত্রে ওরাও আপনার পরে স্বল্পকালই থাকতে পারবে[১]।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾

৭৭. আমি আপনার পূর্বে আমার যে রাসূলদের পাঠিয়েছি, তাদের ক্ষেত্রেও এ নিয়মই (চলে এসেছে); আর আপনি আমার নিয়মের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম পাবেন না[২]।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

[রুকূ - ৯]

৭৮. আপনি নামায কায়েম করুন[৩]– সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[৪]

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى

---

১. অর্থাৎ ওরা আপনাকে বিব্রত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু ওদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এমনটি করলে ওরা নিজেরাও এখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। কার্যত এমনই হয়েছিল। ওদের জুলুম ও নির্যাতনের কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, কিন্তু এর দেড় বছর পরই মক্কার বড় বড় সর্দার ঘরবাড়ি ছেড়ে বদরের প্রান্তরে হাযির হয় এবং চরম লাঞ্ছনায় মৃত্যুবরণ করে। এর পাঁচ-ছয় বছর পর মক্কার উপর ইসলামের বিজয় লাভ হয়। ফলে কাফেরদের রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে স্বল্পকাল পরেই মক্কানগরী, এমন কি সারা আরব ভূখণ্ডে পয়গম্বর আলাইহিস সালামের বিরোধিতা করার মত একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকেনি।

২. অর্থাৎ আমার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, যখনি কোনো লোকালয়ে আল্লাহর পয়গম্বরকে থাকতে দেওয়া হয়নি, তখন এলাকাবাসী নিজেরাও সেখানে টিকতে পারেনি।

৩. অর্থাৎ ওই দূরভিসন্ধিকারীদের কারণে কোন চিন্তা করবেন না। আপনি নিজ প্রতিপালকের অভিমুখী থাকুন এবং নামাযসমূহ সঠিকভাবে কায়েম করুন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে 'তাআল্লুক' বা গভীর সম্পর্ক এমন বস্তু, যা মানুষকে সকল সমস্যা, মুশকিল ও বিপদাপদের ঘাটি পার করিয়ে দেয়। وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য গ্রহণ কর। – সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫)

৪. এর মধ্যে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা– এই চার ওয়াক্ত নামায এসে গেল।

উল্লেখ্য, جمع بين الصلوتين বা দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার যে মাসলা, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। নিতান্তই যদি বর্তমান আয়াত থেকে এ-জাতীয় মাসআলা বের করতে হয়, তবে দুই নয় বরং চার নামায একত্রে পড়ার বিধান এখান থেকে বের হবে। হাঁ, সুস্থ

غَسَقِ الَّيۡلِ وَقُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ کَانَ مَشۡهُوۡدًا ﴿۷۸﴾

এবং ফজরের নামাযে কুরআন (তেলাওয়াত করুন)[১]। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠে* (ফেরেশতাদের) সমাবেশ ঘটে[২]।

وَمِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ٭ۖ عَسٰۤی اَنۡ یَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে কুরআন সাথে নিয়ে জাগ্রত থাকুন-** তা আপনার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত[৩]। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে 'মাকামে মাহমূদে' অধিষ্ঠিত করবেন[৪]।

রুচিবোধ থাকলে আয়াত থেকে এ কথা বের করা যেতে পারে যে, ওযর না থাকলে জোহরের নামায তাড়াতাড়ি ও এশার নামায দেরীতে পড়া মুস্তাহাব হওয়া উচিৎ।

১. অর্থাৎ ফজরের নামাযে কুরআন পড়। ফজরের নামাযকে قرآن الفجر, শব্দে প্রকাশ করে সম্ভবত ফজরের নামাযে কেরাত লম্বা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যত্নবান হোন ফজরের নামাযেও। নিশ্চয় ফজরের নামাযের সময়ে (ফেরেশতাদের) সমাবেশ ঘটে।'

২. হাদীসে আছে, ফজর ও আসরের ওয়াক্তে দিন ও রাতের ফেরেশতাদের পালা বদল হয় (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৫৫)। সুতরাং এ দু'সময়ে রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ একত্র হন। ফলে, আমাদের কেরাত ও নামায তাঁদের উপস্থিতিতে হয়, যা অনেক বেশি বরকত ও স্বস্তির কারণ। আর তখন উর্ধ্বগামী ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেন যে, যখন গেলাম তখনো আপনার বান্দাদের নামায পড়তে দেখেছি এবং যখন আসলাম তখনো তাই করতে দেখেছি। –তাছাড়া ভোরবেলায় এমনিতেও মানব-মন স্থির ও একাগ্র থাকে।

✯✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** '...তাহাজ্জুদ পড়ুন'।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদে কুরআন পড়ুন। আপনার প্রতি সবচেয়ে জোরালোভাবে এ আদেশ করা হয়েছে। কারণ, আপনার মর্যাদাও (সবচেয়ে) বেশি।"

৪. 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে শাফাআতের সবচেয়ে বড় স্থান। কিয়ামতের দিন যখন কোন পয়গম্বরই কথা বলার হিম্মত করবেন না, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করে মানুষকে কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করাবেন। সে সময় প্রত্যেকের মুখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা হতে থাকবে– এমন কি, আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রশংসা করবেন। অর্থাৎ, সেই সময় মুহাম্মদী মর্যাদার পূর্ণতম বিকাশ ঘটবে।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

৮০. আর আপনি বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বেরও করুন কল্যাণের সাথে[১]। আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন[২]।'

বি. দ্র. "মাকামে মাহমূদ" এর এ তাফসীর সহীহ হাদীসসমূহে রয়েছে। এবং বুখারী (৪৪৭৬) ও মুসলিম শরীফে (১৯৩) এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবে (যেমন : মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২১৫৩) "শাফাআতে কুবরা"এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দশ প্রকার শাফাআতের কথা প্রমাণ করেছেন। "ফাতহুল বারী" দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ আমাকে যেখানেই প্রবেশ করান (যেমন মদীনা), অত্যন্ত মান-ইজ্জত সহকারে প্রবেশ করান, যেন সত্যের আওয়াজ বুলন্দ থাকে। এবং যেখান থেকে বের করবেন (যেমন মক্কা থেকে), মান-মর্যাদা ও উত্তম পন্থায় বের করবেন, যাতে দুশমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং আপনজন খুশী ও আনন্দিত হয়, আর সর্বাবস্থায় সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয় হয়।

২. অর্থাৎ এমন বিজয় ও আধিপত্য দান করুন, যার সাথে থাকবে আপনার সাহায্য ও সহায়তা, যাতে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ থাকে এবং দীনবিরোধীরা পরাজিত ও অপমানিত হয়।

শক্তি কামনা করার তাৎপর্য

দুনিয়াতে যে কোন আইন প্রবর্তন করতে –তা মানব রচিত হোক বা ঐশী– এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাদি দেখা ও শোনা এবং সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা জিদ ও শঠতার উপর কায়েম থাকে, তাদের ফেতনা-ফাসাদ ও অপতৎপরতা একমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। এ জন্যই সূরা হাদীদে বলা হয়েছে-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(আমি আমার রাসূলদের নিদর্শনাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়-নীতির উপর কায়েম থাকে। এবং নাযিল করেছি লৌহ, তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি ও মানুষের বহুবিদ উপকার। (তা এজন্য নাযিল করেছেন), যাতে আল্লাহ জেনে নেন, কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে তাঁকে না দেখেও। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। –সূরা হাদীদ, আয়াত ২৫)

৮১. এবং বলুন, 'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই[১]।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

৮২. আমি এমন কুরআন অবতীর্ণ করছি, যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত, আর তা অপরাধীদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে[২]।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

---

১. মক্কায় যখন বাহ্যত সত্যের বিজয়ের কোনই উপায়-উপকরণ ছিল না, তখন এ মহা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। অর্থাৎ বলে দিন– কুরআন কারীম মুমিনদের শুভ সংবাদ দিতে ও বাতিলকে নির্মূল করতে এসে গেছে। ভালভাবে বুঝে নাও, এখন সত্য ধর্ম বিজয় লাভ করেছে এবং কুফর পলায়ন করেছে– শুধু মক্কা থেকেই নয়, বরং সমগ্র আরবভূমি থেকে।

হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কাবার আশপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল। তিনি একটি লাঠি দ্বারা সেগুলোকে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

আঘাত খেয়ে প্রত্যেকটা মূর্তি উপুর হয়ে পড়ে যেত। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭২০) এভাবে কুরআনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল। আর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী এই ঘোষণা করা হল যে, কাবা থেকে পলায়নকারী কুফর ভবিষ্যতে আর কখনো ফিরে আসবে না।

২. অর্থাৎ সত্যের আগমনে যেমন মিথ্যা পলায়ন করে, তদ্রূপ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের অবতরণে আত্মিক রোগসমূহের উপশম হয়। অন্তর থেকে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ও দ্বিধা-সন্দেহের ব্যাধি দূর হয়ে আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও শুদ্ধি লাভ হয়। বরং অনেক সময় তার বরকতময় প্রভাবে দৈহিক স্বাস্থ্যও হাসিল হয়। "রূহুল মাআনী", "যাদুল মাআদ" প্রভৃতি গ্রন্থে এর দর্শন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে।

যা হোক, যারা ঈমান আনবে তথা আরোগ্যের এ ব্যবস্থাপত্র (কুরআন কারীম) ব্যবহার করবে, তারা সমস্ত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগসমূহ থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত এবং জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামতসমূহ লাভে ধন্য হবে। (এজন্যই বলা হয়েছে- شفاء ورحمة)

(ولا يزيد الظالمين) তবে যে রোগী নিজেই নিজের শত্রু এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে– বলা বাহুল্য, এমন রোগী চিকিৎসা ও ওষুধকে ঘৃণা করে যে পরিমান দূরে পালাবে, ততটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা না করার কারণে রোগ মারাত্মক হতে থাকবে– পরিণামে রোগীর প্রাণ কেড়ে নেবে। বলা বাহুল্য, তার এ বিপদের জন্য কুরআন দায়ী নয়, বরং সে নিজেই দায়ী। এজন্যই আল্লাহ তাআলা অন্যত্র

৮৩. আমি যখন মানুষকে নে'য়ামত দান করি তখন সে উপেক্ষা করে ও পাশ কাটিয়ে চলে যায়, আর যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে[১]।

وَاِذَآ اَنۡعَمۡنَا عَلَى الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـــُٔوۡسًا ۝

৮৪. আপনি বলুন, 'প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে। আর আপনার রবই ভাল জানেন, কে বেশি সঠিক পথের উপর আছে[২]।'

قُلۡ كُلٌّ يَّعۡمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖؕ فَرَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ اَهۡدٰى سَبِيۡلًا ۝

[রুকূ - ১০]

৮৫. ওরা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে[৩]। বলে দিন, 'রূহ আমার রবের 'আদেশ' থেকে

وَيَسۡـــَٔلُوۡنَكَ عَنِ الرُّوۡحِ ؕ قُلِ الرُّوۡحُ مِنۡ اَمۡرِ

বলেছেন- وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, ওদের জন্য তা বৃদ্ধি করে দিয়েছে কলুষের উপর কলুষ এবং ওরা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকেছে। –সূরা তওবা, আয়াত ১২৫)

১. অর্থাৎ মানুষের বড় অদ্ভুত অবস্থা! আল্লাহ তাআলা যখন নিজ কৃপায় তাকে নে'য়ামত দান করেন, তখন সে শোকর করে না। যতই আরাম-আয়েশ পায়, ততই প্রকৃত অনুগ্রহকারী (আল্লাহর) প্রতি তার উদাসীনতা ও বিমুখতা বেড়ে যায় এবং দাসত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। অতঃপর যখন কঠিন ও দুঃসময় আসে, তখন একেবারে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। মোটকথা, উভয় অবস্থাতেই সে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন– কখনো উদাসীনতার কারণে, কখনো হতাশার কারণে। (এ উভয় অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাদের পানাহ দিন।)

এস্থলে বিষয়টি আলোচনার কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন যে সবচেয়ে বড় নে'য়ামত, অনেক মানুষ তা বোঝে না। বরং এটা মানতেই চায় না, পাশ কাটিয়ে থাকে। তারপর যখন অকৃতজ্ঞতা, বিমুখতা ও অস্বীকৃতির কুফল সামনে আসে, তখন নিরাশায় একদম ভেঙ্গে পড়ে– কোন দিকেই আশার আলো দেখতে পায় না।

২. অর্থাৎ সকল কাফের ও মুমিন, অমান্যকারী ও ফরমাবরদার– প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ, নিয়ত, স্বভাব ও মানসিকতা অনুসারে চলে এবং তাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, কারো কোনো আমল আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। তিনি প্রত্যেকের কর্মপদ্ধতি, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সরাসরি দেখছেন এবং উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, কে কতটুকু সঠিক পথে চলছে এবং কার মধ্যে কী পরিমাণ বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা রয়েছে। প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি সে অনুযায়ীই আচরণ করবেন।

৩. অর্থাৎ মানুষের রূহ বা মানবাত্মা কী জিনিস? তার স্বরূপ ও তাৎপর্য কী?

رَبِّيْ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۝

উৎসারিত। আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে[১]।'

অবতরণের প্রেক্ষাপট

বুখারী (৪৭২১) ও মুসলিম শরীফের (২৭৯৪) বর্ণনা অনুযায়ী মদীনার ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন করেছিল। আর সীরাতের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের পরামর্শে মক্কার কুরায়শরা এ প্রশ্ন করেছিল। (দালাইলুন্ নবুওয়াহ ২/২৬৯) এ জন্যই আয়াতখানি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে আয়াত একটি হলেও তা উভয় স্থানে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। والله أعلم

এখানে এই প্রশ্ন উল্লেখ করে খুব সম্ভব এদিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, যেসব বিষয় ওদের বোঝার প্রয়োজন সেসব বিষয় তো এড়িয়ে যাচ্ছে, আর অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও শত্রুতামূলক বিতর্ক করছে। প্রয়োজন তো ছিল, কুরআনী ওহীর রূহ (জীবনীশক্তি) দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভে ধন্য হওয়া এবং আত্মিক সুস্থতা লাভের এ ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উপকৃত হওয়া। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا (আর এভাবেই আমি আমার নির্দেশে আপনার প্রতি এক 'রূহ' তথা কুরআন পাঠিয়েছি। –সূরা শুরা, আয়াত ৫২)। আরো এরশাদ হয়েছে : يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (তিনি স্বীয় হুকুমে 'রূহ' (অর্থাৎ ওহী) দিয়ে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করেন– তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা। –সূরা নাহ্ল, আয়াত ২)— কিন্তু যারা অপ্রয়োজনীয় ও বিদ্বেষপূর্ণ তর্কবিতর্কেই লিপ্ত, তাদের কুরআনী ওহী দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ কোথায়?

'রূহ'-এর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য মুশরিক-ইহুদীরা কী বুঝবে?

"রূহ" কী? তা কি স্বনির্ভর বস্তু (جوهر), না পরনির্ভর গুণ (عرض)? শরীরী (مادي), না অশরীরী (مجرد)? অমিশ্র, অযৌগিক (مفرد), না মিশ্র, যৌগিক (مركب)? পরকালীন নাজাত এ ধরনের দুর্বোধ্য ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বোঝার উপর নির্ভর করে না, এমন কি নবীদের দীনী দায়িত্ব-কর্তব্যের সঙ্গেও এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা আজ পর্যন্ত খোদ مادہ তথা পদার্থের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেনি। এ অবস্থায় পদার্থ থেকেও সূক্ষ্মতর ও প্রচ্ছন্নতর যে "রূহ", তার প্রকৃত রহস্য ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করার আশা কীভাবে করা যায়? মক্কার মুশরিকদের নানাবিধ মূর্খতা ও মদীনার ইহুদীদের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ সম্পর্কে যারা অবগত, তারা বুঝতে পারবেন যে, যেসব লোক স্থূল কথা এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট সত্য ও বাস্তবতা বুঝতে পারে না, তারা আবার "রূহ" এর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কীভাবে উপলব্ধি করবে? কবির ভাষায়-

تو کار زمیں را نکو ساختی ÷ کہ با آسماں نیز پرداختی

(তুমি যমীনের কাজ তো সঠিকভাবে করতে পেরেছ, কিন্তু আসমানের কাজে তোমার কোনো পারঙ্গমতা দেখাতে পারবে?)

১. "মুযেহুল কুরআনে" আছে, "হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। আল্লাহ এর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেননি। কারণ, ওদের মধ্যে

বোঝার শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না। আর পয়গম্বরগণও এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করেননি। 'রূহ' প্রসঙ্গে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহর হুকুমে একটি জিনিস শরীরে এসে ঢুকল, ফলে তা জীবিত হয়ে উঠল। অতঃপর যখন তা বের হয়ে গেল, মরে গেল।"

'রূহ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা

আল্লাহ তাআলার কালামের মধ্যে থাকে বিস্ময়কর অলৌকিকতা। রূহ সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সাধারণ মর্মটুকু সাধারণ মানুষ কিংবা বক্র স্বভাবের হঠকারীদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই সাদামাটা বক্তব্যের অন্তরালে এবং সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির গভীরে রূহ সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যা বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তি, তত্ত্বানুসন্ধানী দার্শনিক এবং একজন কামেল আরেফের গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে।

রূহ সম্বন্ধে প্রাচীন কাল থেকে গবেষণার যে ধারা জারী রয়েছে, তার সমাপ্তি আজো হয়নি, সম্ভবত হবেও না। রূহ ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার দাবি তো কঠিন ব্যাপার। কারণ, মানুষ এখনো অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরই প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি, আর রূহ এর বিষয় তো অনেক বেশি জটিল। তবুও পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের আলোকে রূহ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়—

(ক) মানুষের মধ্যে এ জড় দেহ ছাড়াও আরেকটি জিনিস আছে, যাকে 'রূহ' বলা হয়। তা (عالم امر) "আলম-ই- আমর" (বা আদেশ জগত)-এর বিষয় এবং আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছায় তা উৎপত্তি লাভ করে। ইরশাদ হচ্ছে– قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (আপনি বলে দিন, 'রূহ হচ্ছে আমার রবের আদেশঘটিত।'– خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে তিনি হয়ে গেলেন। –সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৫৯)– ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (তারপর আমি তাকে ভিন্ন এক আকৃতিতে গড়ে তুলি। –সূরা মুমিন, আয়াত ১৪)– إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (আমি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পর্কে আমার কথা কেবল এই যে, আমি তাকে বলি, 'হও', আর তা হয়ে যায়। –সূরা নাহ্ল, আয়াত ৪০)

(খ) রূহের গুণাবলি যথা জ্ঞান, চেতনা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। আর এই পূর্ণতা লাভের দিক দিয়ে রূহসমূহের মধ্যে অশেষ স্তরভেদ রয়েছে। এমনকি, আল্লাহ তাআলার প্রতিপালনে (ও তাঁর তাওফীকে) কোন কোন রূহ উন্নতির এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে পৌঁছা অন্যান্য রূহের পক্ষে সম্ভব হয় না, যেমন: "রূহে মুহাম্মদী" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলোচ্য আয়াতে رب-এর সাথে امر-এর সম্বন্ধ এবং (ياء المتكلم) তথা উত্তম পুরুষ সর্বনাম ي-এর সাথে— যা দ্বারা এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য– رب এর সম্বন্ধ করায় উক্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া সম্মুখে এরশাদ হয়েছে : قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

(গ) কিন্তু রূহ-এর এসব গুণ স্বকীয় নয়, বরং প্রকৃত দাতা (অর্থাৎ আল্লাহর) দান এবং তা সসীম। আল্লাহ তাআলার বাণী- وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا এ সত্যের প্রমাণ বহন করছে। কেননা, মানুষের জ্ঞান অন্য উৎসস্থল থেকে উৎসারিত এবং তা আল্লাহর জ্ঞানের সামনে অতি স্বল্প। যেমন: আল্লাহ পাক বলেন : قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي الخ (সূরা কাহাফ, রুকূ ১২)– আরো এরশাদ হয়েছে : وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ الخ (সূরা লুকমান, আয়াত ২৭)

মানুষের শক্তি যে সীমিত, তা সামনের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। কাফেররা বলেছিল : وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا الخ। ওদের কথার খণ্ডনে এরশাদ হয় : قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি গুণে মানুষের রূহ যতই উন্নতি করুক, এমন কি সকল রূহকে ছাড়িয়েও যদি যায়, তবুও রূহের গুণাবলি সীমিতই থাকে; আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ন্যায় অসীম হতে পারে না। আর এটাই এ কথার বড় প্রমাণ যে, আল্লাহ থেকে পৃথক কোন রূহ অনাদি (قديم) ও অসৃষ্ট (غير مخلوق) সত্তা নয়। তাই যদি হত, তবে রূহের গুণাবলি সসীম হত না।

(ঘ) রূহ যতই কামেল ও পূর্ণাঙ্গ হোক, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তার গুণাবলি কেড়ে নিতে পারেন, যদিও তাঁর দয়া ও রহমতহেতু এমনটি হয় না। এর প্রমাণ নিম্ন আয়াতখানি- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও সেগুলির বিন্যাস নিয়ে কিছুটা চিন্তাভাবনা করলেই সমঝদার ব্যক্তিগণ আমার বর্ণিত উক্ত মৌলিক বিষয়গুলির যথার্থতা বুঝতে সক্ষম হবেন।

عالم امر এর ব্যাখ্যা

তবে عالم امر 'আলম-ই-আম্‌র' এই শব্দটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জরুরী। আর তা বুঝতে পারলে আশা করা যায় যে, 'রূহ'-এর পরিচয় লাভ করা সহজ হবে। امر (আম্‌র) শব্দটি পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ নির্ণয়ে মুফাসসিরগণ যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তবে এস্থলে আমি সূরা আরাফের আয়াত (৫৪)- الا له الخلق والامر এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এতে امر কে خلق এর সমান্তরালে রাখা হয়েছে। ফলে, আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয় রয়েছে– একটি خلق আর অপরটি امر, এ উভয়ের মধ্যে কী পার্থক্য, তা আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলির বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারি–

প্রথমে বলা হয়েছে- إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৪)। এ তো হল خلق –তারপর إستواء على العرش এর উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে- يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ (তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছন্ন করেন– রাত দ্রুতগতিতে দিনের পশ্চাদ্ধাবন করে চলে আসে। এবং সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি, এগুলি তার হুকুমের অনুগত। –সূরা আ'রাফ, আয়াত

৫৪)- অর্থাৎ সৃষ্টিগুলিকে এক নির্ধারিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত করেন, যাকে تدبير (নিয়ন্ত্রণ) ও تصريف (পরিচালনা) বলা যায়, আর এ-ই হল امر। সূরা তালাকের দ্বিতীয় রুকূতে (আয়াত ১২) বলা হয়েছে-

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

বিষয়টির আরেকটু ব্যাখ্যা করি- মনে করুন, দুনিয়া একটি বিশাল কারখানা সদৃশ, যার মধ্যে বিভিন্ন মেশিন রয়েছে। কোন মেশিন কাপড় বুনছে, কোনটি আটা পিষছে, কোনটি ছাপার কাজ করছে, কোনটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক মেশিনে বহু পার্টস রয়েছে, যেগুলি যথানিয়মে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর যখন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন লাইনের মাধ্যমে প্রত্যেক মেশিনে কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়া হয়, তখন মুহূর্তে নিশ্চল মেশিনগুলি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ঘুরতে ও কাজ করতে শুরু করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রত্যেক মেশিন এবং তার প্রত্যেক অংশকে স্বীয় প্রকৃতি ও লক্ষ্য অনুসারে পরিচালিত করে।

এ উদাহরণ থেকে বোঝা গেল যে, মেশিনের কাঠামো তৈরি করা, তার পার্টসগুলি সঠিকভাবে নিরূপণ করা, তারপর ফিট করা- এসব একটি সুবিন্যস্ত কার্যধারা। এ সবের পর মেশিনটি চালু করার জন্য অন্য একটি বস্তু (বিদ্যুৎ) তার কেন্দ্র থেকে আনতে হয়।

এর আলোকে এখন বুঝুন যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে আকাশ ও পৃথিবীর সকল মেশিন তৈরি করলেন- যাকে خلق বলা হয়। প্রত্যেক ছোট-বড় যন্ত্রাংশ সঠিক পরিমাপে তৈরী করেছেন, যাকে "তাকদীর" বলা হয়েছে- قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, সকল যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করে পূর্ণ মেশিনের রূপ দিয়েছেন, যাকে تصوير বলা হয়- خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ (আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি বানিয়েছি। -সূরা আ'রাফ, আয়াত ১১)। এই কাজগুলি خلق এর আওতাভুক্ত।— এখন প্রয়োজন, যে মেশিনকে যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাকে তাতে লাগিয়ে দেওয়া। তাই মেশিনটি চালু করা এবং আপন কাজে লাগানোর জন্য أمر إلهي (আল্লাহর আদেশ)-এর বিদ্যুৎ সংযোগ করা হল। সম্ভবত এর সম্পর্ক আল্লাহর গুণবাচক নাম البارئ- এর সঙ্গে। কুরআনে আছে- اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (সূরা হাশর, আয়াত ২৪) হাদীসে আছে- فلق الحبة وبرأ النسمة (বুখারী, হাদীস : ৩০৪৭) -সূরা হাদীদে (আয়াত ২২) আছে- من قبل ان نبرأها, ها অব্যয় দ্বারা نفوس (প্রাণীজগত) উদ্দেশ্য। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে এমনই বর্ণিত আছে।

মোটকথা, আল্লাহর দিক থেকে (كُنْ বলে) নির্দেশ দেওয়া হল- "চল", আর অমনি তা চলতে লাগল। এই أمر إلهي সম্বন্ধেই বলা হয়েছে- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (তাঁর ব্যাপার এই যে, তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করলে তাকে শুধু বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়। -সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৮২)। অন্যত্র স্পষ্টতার সাথে প্রথমে শরীর সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর كن (হও) এর কথা বলা হয়েছে- خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাকে বললেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।

৮৬. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আপনার কাছে যা-কিছু ওহী পাঠিয়েছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করে নিতে পারি। অতঃপর আপনি নিজের জন্য এমন কাউকে পাবেন না, যে আমার মোকাবেলায় তা (এনে দেওয়ার) যিম্মাদার হবে–

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًاۙ

–সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৫৯)। বরং গভীর অনুসন্ধান চালালে প্রকাশ পায় যে, পবিত্র কুরআনে كُنْ فَيَكُوْنُ এর কথা যত স্থানে এসেছে, সাধারণত সৃষ্টি করার কথা উল্লেখের পরই এসেছে। এতে ধারণা জন্মে যে, كن শব্দটির সম্বোধন হয়ে থাকে خلق (সৃষ্টি)-এর পর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন (تدبير وتصريف) এর জন্য।

যা হোক, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– اَلرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ – এখানে امر এর অর্থ আদেশ, আর এটা সেই আদেশ, যা كن শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আর كن আল্লাহর একটি অনাদি গুণ অর্থাৎ 'কালাম' এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর সকল গুণ যথা: হায়াত, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতিকে আমরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন গুন স্বীকার করি, 'কালাম' গুণের ক্ষেত্রে একই কথা।

যা হোক, কুরআনের অধিকাংশ স্থানে "রূহ" এর সাথে امر (আম্র) শব্দের ব্যবহার হয়েছে, যেমন-

(১) قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي -

(২) وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا - (الشورى : ٤٠)

(৩) يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - (المؤمن : ١٠)

(৪) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - (اللنحل : ٢)

আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, امر হচ্ছে সেই আদেশ, যে আদেশ করা হয় كن দ্বারা। আর এটা আল্লাহর كلام إنشائي (আদেশসূচক কালাম), যার দ্বারা সৃষ্টিনিচয়কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা হয়, যাতে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। অতএব প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তাআলার 'কালাম' গুণটিই হচ্ছে "রূহ" এর উৎস।

(মূল উর্দু তাফসীরে অতঃপর 'রূহ' সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা মূলত ফিলোসফিনির্ভর এবং সাধারণ পাঠকের অনুপযোগী। তাছাড়া বক্ষ্যমান আয়াতের মূল অর্থ-মর্ম বোঝা তার উপর নির্ভরশীল নয়। টীকার শুরুতে 'মুযেহুল কুরআনে'র বক্তব্য দ্রষ্টব্য। তাই আমরা এ অংশের অনুবাদ এড়িয়ে গেলাম। উলামা-তালাবাগণ মূল উর্দু তাফসীর দেখে নিতে পারেন –অধম অনুবাদক غفر الله له)।

৮৭. তবে আপনার রবের মেহেরবানীতে (তা প্রত্যাহার করা হয় না)। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর দয়া বড় বেশি[১]।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

৮৮. বলুন, 'এই কুরআনের সদৃশ তৈরি করে আনার উদ্দেশ্যে যদি সকল মানুষ ও জিন সমবেত হয়, তবুও তারা কখনই এরূপ কুরআন আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়[২]।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৯. আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে নানাভাবে প্রতিটি উদাহরণ বর্ণনা করেছি*। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট নয়[৩]।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

৯০. আর ওরা বলে, 'আমরা আপনার কথায় ঈমান আনব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝরনা উৎসারিত করে দেবেন[৪],

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾

---

১. অর্থাৎ যে কুরআন আপনাকে দান করা হয়েছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে তা কেড়ে নিতে পারেন। তারপর কেউ তা ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে না। কিন্তু আপনার প্রতি তাঁর অপরিসীম মেহেরবানী থাকার কারণেই তিনি এই মহা নে'য়ামত আপনাকে দান করেছেন এবং তা ছিনিয়ে নেওয়ার কোন কারণ নেই। এস্থলে তো শুধু তাঁর মহা কুদরতের প্রকাশ উদ্দেশ্য এবং এ সত্যেরও প্রকাশ উদ্দেশ্য যে, যতই কামেল রূহ হোক না কেন, সমস্ত গুণ আল্লাহপ্রদত্ত, তাঁর নিজস্ব নয়।

২. কুরআনের অলৌকিকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু এ বিষয়ে إعجاز القرآن ("কুরআনের অলৌকিকতা") নামে আমাদের একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য। (আমরা তা অনুবাদ করেছি আলহামদুলিল্লাহ! তিনি কবুল করুন –অনুবাদক)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'সর্বপ্রকার উপকারী বিষয়' বর্ণনা করেছি।

৩. অর্থাৎ মানুষের উপকারার্থে বিস্ময়কর বহু বিষয় বারবার বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধের কাছে এর মূল্যায়ন নেই– তারা শুকরিয়া আদায় না করে বরং অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামীতে মেতে থাকে।

৪. অর্থাৎ মক্কার ভূমি থেকে ঝরনাধারা প্রবাহিত করবেন।

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

৯১. 'অথবা আপনার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়ে যাবে, অতঃপর আপনি তার ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করবেন অজস্র নহর,

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

৯২. 'অথবা আমাদের উপর আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পতিত করে দেবেন যেমন আপনি বলে থাকেন[১], অথবা (আমাদের) সামনে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিয়ে আসবেন[২],

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

৯৩. 'অথবা আপনার জন্য হবে একটি সোনার ঘর[৩], অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন; আর আপনার আরোহণকেও আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমরা পাঠ করতে পারি– এমন একখানা কিতাব আমাদের উপর অবতীর্ণ করবেন[৪]।' আপনি বলুন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ বৈ আর কিছু নই, যাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরণ করা হয়েছে[৫]?'

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতার প্রভাবে পরাজিত হয়ে ওরা অমূলক ফরমায়েশ (আবদার) করতে লাগল। বস্তুত, ফায়দা হাসিল করা বা উপকৃত হওয়া ওদের উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু শত্রুতা ও দোষান্বেষণ করাই ছিল আসল কাজ।

১. পবিত্র কুরআনের অন্যত্র যে বলা হয়েছে– إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ (আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেব অথবা ওদের উপর আকাশের টুকরা পতিত করব। –সাবা, আয়াত ৯), এদিকেই ওরা ইঙ্গিত করেছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সামনে এসে বলুন এবং ফেরেশতাগণ প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য দিন যে, আপনি সত্য।

৩. (من زخرف) অর্থাৎ সোনার না হোক, অন্তত সোনার গিলটি করাই হোক।

(শাইখুল হিন্দ (র.) এর তরজমা : ایک گھر سنہرا -এর ব্যাখ্যায় আল্লামা উসমানী (র.) এ কথা লিখেছেন। কিন্তু মুফাসসিরগণ বলেন যে, এখানে زخرف দ্বারা সোনাই উদ্দেশ্য। দেখুন– তবারী, বাগাভী, ইবনে কাসীর, জালালাইন প্রভৃতি –অনুবাদক)।

৪. অর্থাৎ আপনি তো মে'রাজের কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাদের সামনে আকাশে আরোহণ করুন দেখি। এবং সেখান থেকে একটি লিখিত কিতাব নিয়ে আসুন, যা আমরা নিজেরা পড়তে ও বুঝতে পারি।

৫. অর্থাৎ পূর্বেও নবীগণ আগমন করেছেন এবং তাঁরা মানুষ ছিলেন, (আমিও তাঁদেরই মত একজন প্রেরিত মানুষ বৈ কিছু নই)। আর আল্লাহর শক্তি ও এখতিয়ার কোন পয়গম্বরেরই

[রুকূ - ১১]

৯৪. যখন লোকদের নিকট হেদায়েত পৌঁছল, তখন ঈমান আনা থেকে তাদেরকে তাদের এ কথাই বাধা দিয়েছে যে, 'আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন'?[১]

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৫. বলুন, 'পৃথিবীতে যদি ফেরেশতাগণ নিশ্চিন্ত হয়ে চলাফেরা করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকেই রাসূল বানিয়ে অবতীর্ণ করতাম'[২]।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

৯৬. আরো বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ

নেই, তাঁর পক্ষে শোভনও নয় যে, তিনি এরূপ অযথা ফরমায়েশ তাঁর রবের নিকট পেশ করেন। তাঁদের দায়িত্ব শুধু এই যে, যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে, তা তাঁরা পৌঁছে দেবেন এবং নিজেদের প্রত্যেকটি বিষয় এক আল্লাহর সোপর্দ করবেন। তো, আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি- এসব ফরমায়েশী নিদর্শন দেখানো- না দেখানো আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

ইতিপূর্বে এ সূরাতেই (আয়াত ৫৯-৬০) ফরমায়েশী নিদর্শন না দেখানোর কিছু হেকমত উল্লেখ করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ হেদায়াতের আলো পৌঁছার পরও ওদের চোখ খোলেনি বরং এ কথাই বলতে থাকল যে, মানুষ আবার রাসূল হয় কী করে? আল্লাহ যদি পয়গম্বর পাঠাতেই চাইতেন, তবে আসমান থেকে কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন।

২. অর্থাৎ এ পৃথিবী যদি মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতাদের বাসস্থান হত, তবে আমি ফেরেশতাকেই পয়গম্বর বানিয়ে পাঠাতাম এবং নিঃসন্দেহে এটাই সংগত হত। কিন্তু পৃথিবী তো মানুষের বাসস্থান। এখন মানুষের প্রতি ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে পাঠালে তাঁর দ্বারা মানুষের উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, তার চোখ ও অন্তর ফেরেশতা-দর্শন সইতেই পারত না। আর ফেরেশতা মানবাকৃতিতে আগমন করলে মানুষ সেই পূর্বের সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকবে এবং বলতে থাকবে, মানুষ আবার রাসূল হয় কীভাবে? এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআমের (আয়াত নং ৮) ব্যাখ্যায় দেখুন।

اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ۝

স্বীয় বান্দাদের সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত, (সবকিছুর) দ্রষ্টা[১]।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝

৯৭. আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই হয় পথপ্রাপ্ত। আর যাদের পথভ্রষ্ট করেন, তুমি ওদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু পাবে না[২] এবং কিয়ামতের দিন আমি ওদেরকে মুখে ভর দেওয়া অবস্থায় সমবেত করব– অন্ধ, বোবা ও বধির বানিয়ে[৩]। ওদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই আগুন নিবতে শুরু করবে, আমি ওদের উপর অগ্নিশিখা আরো বাড়িয়ে দেব[৪]।

---

১. কাফেররা যে বলত, أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহ নিজে আমাদের সামনে এসে আপনাকে সমর্থন করলে আমরা মানব, এরই উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ স্বীয় কার্যের দ্বারা আমার সমর্থন করছেন। কারণ, তিনি আমাকে দেখছেন যে, আমি নবুওয়াতের দাবি করছি। তদুপরি, তিনি আমার হাতে ও যবানে অনবরত এমনসব নিদর্শনের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, যা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। আর তিনি আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ক্রমান্বয়ে সফল করছেন ও চারদিকে এর প্রভাব প্রসারিত করছেন এবং আমার অস্বীকারকারীদের পদে পদে বিফল-ব্যর্থ করছেন– এসব কি খোদার পক্ষ থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, আমি আমার দাবিতে সত্য? কারণ, একজন মিথ্যাচারীর সাথে আল্লাহর আচরণ কক্ষনো এমন হতে পারে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যেই মানুষ সত্যের পথে চলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ যাকে তারই দুর্ভাগ্য ও হঠকারিতার কারণে সহায়তা না করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারে এমন কে আছে?

৩. এমনটি কিয়ামতের কিছু কিছু স্থানে হবে। হাদীসে আছে, সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপুড় হয়ে কী করে চলবে? তিনি বললেন, যিনি মানুষকে পায়ের উপর চালাচ্ছেন, তিনি মাথার উপরও চালাতে পারেন (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৫২৩)। আর ফেরেশতাগণ যে জাহান্নামীদের উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবেন, তা দোযখে প্রবেশের পর সংঘটিত হবে- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ (যেদিন ওদেরকে দোযখে উপুড় করে হেঁচড়ানো হবে। –সূরা কামার, আয়াত ৪৮)

৪. অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে শাস্তি কম হতে দেওয়া হবে না। (এ জন্যই আগুন কমা শুরু করলে তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তদ্রূপ), শরীর জ্বলে গিয়ে কষ্ট কম হতে শুরু করলে পুনরায় নতুন চামড়া লাগিয়ে দেওয়া হবে- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا (যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, আমি তার বদলে তাদের অন্য চামড়া দেব। –সূরা নিসা, আয়াত ৫৬)

৯৮. এ-ই ওদের শাস্তি, কারণ ওরা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, 'আমরা যখন অস্থি ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আবার নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব'[১]?

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৯. ওরা কি (ভেবে) দেখেনি যে, আল্লাহ- যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম[২]? আর তিনি তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত করেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই[৩]। কিন্তু জালেমরা অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট নয়[৪]।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০. আপনি বলুন, 'তোমরা যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতে, তবে নিশ্চয় তা বন্ধ করে রাখতে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আর মানুষ হচ্ছে অতি সংকীর্ণমনা[৫]।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

---

১. দুনিয়ায় দলীল-প্রমাণ পেয়েও তো স্বীকার করনি। এখন নিজ চোখে বারবার দেখে নাও যে, কীভাবে পুড়ে পুড়ে নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছ।

২. অর্থাৎ যিনি এত বড় বড় মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তাঁর পক্ষে তোমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন নয়- لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (মুমিন, আয়াত ৫৭) নিশ্চয় তিনি তোমাদের ও তোমাদের মত সকল মানুষকেই অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন।

৩. ওরা এ কথা বলতে পারত যে, আজ পর্যন্ত কত মানুষ মরেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তো তারা পুনর্জীবিত হল না। তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, সকলের জন্য কবর থেকে ওঠার এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, তা আসবেই আসবে। বিলম্ব দেখে অস্বীকার করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়- وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (আর আমি তা বিলম্বিত করছি কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। -সূরা হূদ, আয়াত ১০৪)

৪. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও দলীল-প্রমাণ শোনার পরও জালেমদের কুফর, গোমরাহী ও অকৃতজ্ঞতাই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে- ওরা কিছুমাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে না।

৫. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্বের রুকূতে বলা হয়েছিল- إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে আপনার উপর অনেক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনের মত বেনজীর

১০১. আমি তো মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম যখন তিনি ওদের নিকট আসলেন। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন[১]। তখন ফেরাওন

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ

দৌলত আপনাকে দান করেছেন।) মাঝখানে বিরুদ্ধবাদীদের জিদ, হঠকারিতা, অহেতুক ফরমায়েশ, অবিশ্বাস এবং এসবের পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন পুনরায় আগের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন–

একজন বান্দাকে কুরআনের মত মহামর্যাদাশালী, নজীরবিহীন দৌলত সেই প্রকৃত দাতাই দান করতে পারেন, যাঁর নিকট রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং অধিক থেকে অধিকতর দান করলেও যার রিক্তহস্ত হয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই এবং তাঁর এ আশঙ্কাও নেই যে, অন্য কেউ তাঁর থেকে নিয়ে তাঁর সমকক্ষ হয়ে যাবে অথবা ভবিষ্যতে তাঁকে পরাভূত করে ফেলবে। আল্লাহ পাক তো দুর্বল মানুষের মত সংকীর্ণমনা নন, যার অবস্থা হল, তাকে যদি রহমতের ভাণ্ডারসমূহের একচ্ছত্র মালিকও বানিয়ে দেওয়া হয়, তবু সে নিজ স্বভাবকে কৃপণতা ও সংকীর্ণতামুক্ত করতে পারবে না। কোন অভাবীকে দান করতে এ কথা ভেবে ভয় করবে যে, সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়ে যায় কি না, অথবা আজ যার জন্য ব্যয় করছি পরবর্তীতে সে সমকক্ষ হয়ে যায় কি না।

যা হোক, খোদায়ী রহমতের ভাণ্ডারগুলি তোমাদের দখলে থাকলে তোমরা কাউকেই কিছু দিতে না। আর তোমরা এটাও বরদাশত করতে না যে, মক্কা ও তায়েফের বড় বড় ধনী ও অহংকারীদের স্থলে বনী হাশিমের এক এতীম ওহী ও নবুওয়াতের এ মহামর্যাদাশালী দৌলত লাভ করুক। কিন্তু এ আল্লাহ তাআলার দয়া যে, তিনি যার মধ্যে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা দেখেছেন, তাকে মহান গুণাবলি ও নে'য়ামতের অফুরন্ত ভাণ্ডার দান করেছেন। তোমাদের হঠকারিতা ও শত্রুতার কারণে খোদার দয়ার এ ভাণ্ডার বন্ধ হওয়ার নয়।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নন, তাঁর ওসীলায় তাঁর অনুসারীদের ভাগ্যেও যেসব সম্পদ-ভাণ্ডার হাসিল হওয়ার, তা হাসিল হবেই এবং পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীরা উদার হৃদয়ে সে দৌলত (তথা দীন ও কুরআন) মানব জাতির জন্য ব্যয় করবেন, তোমাদের ন্যায় সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় তাঁরা দেবেন না।

১. অর্থাৎ আমি যেমন আপনাকে স্বীয় রহমত গুণে মহান কুরআন দান করেছি এবং আরো অনেক অনুগ্রহ আপনার প্রতি করেছি, তেমনি ইতিপূর্বে মূসা আলাইহিস সালামকে সত্যতার নয়টি নিদর্শন (معجزات) দান করেছিলাম, যখন তিনি ফেরাওনের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য বনী ইসরাঈলের নিকট তশরীফ এনেছিলেন। যদি চাও তবে তোমরা বনী ইসরাঈলের নিরপেক্ষ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ যে, এ কথা কতদূর সত্য।

تسع آيات -এর ব্যাখ্যা

এই নয়টি অলৌকিক বিষয় হল- শুভ্র হাত, লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফল-ফসলের ক্ষতি, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন-আঁটুলি, ব্যাঙ ও রক্ত।

সূরা আরাফের ১৩৩নং আয়াত فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ الخ এর অধীনে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

একটি হাদীস ও কিছু কথা

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ প্রভৃতি কিতাবের এক হাদীসে আছে, ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নয়টি নিদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে এ বিধানসমূহ- শিরক করো না, চুরি করো না, যিনা করো না, অন্যায় কতল করো না, যাদু করো না, সূদ খেয়ো না, নিরপরাধকে শাসকের হাতে হত্যা করিয়ো না, সতী মেয়েদের প্রতি অপবাদ দিয়ো না, জেহাদ থেকে পলায়ন করো না। এ তো হল নয়টি আদেশ, যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আর (হে ইহুদীরা!) দশম আদেশটি শুধু তোমাদের জন্য ছিল- তা এই যে, শনিবার দিন তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। ইহুদীরা এসব শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা স্বীকার করল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৮০৯২; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪১১)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর লেখেন, রেওয়ায়াতটি আপত্তিকর, সম্ভবত এর বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা থেকে কোন ত্রুটি হয়েছে। (নতুবা) বক্ষ্যমান আয়াতসমূহের বিন্যাস ও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এ কথা কিছুতেই সমর্থন করে না যে, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ -এ تسع آيات দ্বারা উল্লিখিত নয়টি আদেশ উদ্দেশ্য। সামনে فقال له থেকে ফেরাওন ও মূসার যে সংলাপ আসছে, তারও দাবি এই যে, এখানে آيات দ্বারা সে নিদর্শনগুলিই উদ্দেশ্য, যেগুলি মূসার (নবুওয়াতের) দলীল-প্রমাণ হিসাবে ফেরাওন-গোষ্ঠীকে দেখানো হয়েছিল। এবং بصائر শব্দটিও এই নিদর্শনসমূহের জন্যই বেশি খাপ খায়। তাছাড়া, ইতিপূর্বে মক্কাবাসীদের হঠকারিতা ও ফরমায়েশি নিদর্শন দাবি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরও দাবি এই যে, এস্থলে অলৌকিক নিদর্শনাদির সাথে ফেরাওনের লোকদের হঠকারী আচরণের চিত্র তুলে ধরা হবে।

যা হোক, ইবনে কাছীরের অভিমত এই যে, ইহুদীরা সম্ভবত নয়টি নিদর্শন (تسع آيات) সম্বন্ধে নয়, বরং সেই দশটি হুকুম সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করেছিল, যেগুলি ওসিয়তরূপে তাওরাতের শুরুতে লেখা হত। ফলে হাদীসে উক্ত দশটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাকারী ভুলক্রমে كلمات عشر এর স্থলে تسع آيات উল্লেখ করেছেন।

আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, প্রশ্ন করা হয়েছিল تسع آيات সম্পর্কেই, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর ছিল বিজ্ঞজনোচিত। যেন সতর্ক করলেন যে, নয়টি মুজেযা (বা অলৌকিক নিদর্শন) জেনে তোমাদের কী লাভ, বরং এ দশটি হুকুম স্মরণ রাখাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। والله أعلم

তাঁকে বলল, 'হে মূসা! আমি তো তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি[১]।'	اِنِّیۡ لَاَظُنُّکَ یٰمُوۡسٰی مَسۡحُوۡرًا ﴿۱۰۱﴾
১০২. তিনি বললেন, 'তুমি তো জান, এই নিদর্শনগুলি আর কেউ নয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভুই উপলব্ধি সৃষ্টিকারীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফেরাওন! আমি তো মনে করি, তুমি ধ্বংস হতে যাচ্ছ[২]।'	قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَاۤ اَنۡزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّیۡ لَاَظُنُّکَ یٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُوۡرًا ﴿۱۰۲﴾
১০৩. অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে আতঙ্কিত করে সে ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাইল, কিন্তু আমি ওকে ও ওর সঙ্গীদের–সকলকে ডুবিয়ে দিলাম[৩]।	فَاَرَادَ اَنۡ یَّسۡتَفِزَّهُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ فَاَغۡرَقۡنٰهُ وَ مَنۡ مَّعَهٗ جَمِیۡعًا ﴿۱۰۳﴾
১০৪. এবং তার পরে বনী ইসরাঈলকে বললাম, 'তোমরা এই ভূখণ্ডে বসবাস করতে থাক। অতঃপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুত সময় আসবে, আমি তোমাদের (সকলকে) একত্র করে নিয়ে আসব[৪]।'	وَّ قُلۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ لِبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اسۡکُنُوا الۡاَرۡضَ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ الۡاٰخِرَۃِ جِئۡنَا بِکُمۡ لَفِیۡفًا ﴿۱۰۴﴾

১. অর্থাৎ কেউ তোমাকে যাদু করেছে, যার ফলে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই এরূপ বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলছ। কুরআনের অন্যত্র আছে : اِنَّ رَسُوۡلَکُمُ الَّذِیۡۤ اُرۡسِلَ اِلَیۡکُمۡ لَمَجۡنُوۡنٌ (তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, অবশ্যই উন্মাদ। –সূরা শু'আরা, আয়াত ২৭) সম্ভবত, এস্থলে مسحور এর অর্থ مجنون (পাগল)। তবে কেউ কেউ مسحور কে ساحر (যাদুকর) অর্থে ধরেছেন।

২. অর্থাৎ যদিও মুখে অস্বীকার করছ, কিন্তু তোমার অন্তর উত্তমরূপেই জানে যে, এই মহান নিদর্শনগুলি তোমার চোখ খোলার জন্যই সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত মালিক। এখন যে ব্যক্তি জেনেশুনে শুধু অহংকারবশে সত্যকে অস্বীকার করবে, তার সম্পর্কে এ কথাই বলতে হয় যে, তার ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, "ঈমান" শুধু জানার নাম নয়, বরং মানার নাম।

৩. মূসা (আ) এর প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে দেখে ফেরাওনের আশঙ্কা হল, বনী ইসরাঈল শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে সে তাদের আরো বেশি নির্যাতন করতে লাগল, যাতে তারা মিসরে নিরাপদে ও শান্তিতে না থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাকেই সাথী-সঙ্গীসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিলেন।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ জালেমদের সমূলে ধ্বংস করলেন এবং ওদের গোলামী থেকে তোমাদের নাজাত দিলেন। এখন তোমরা মিসর ও শামের যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে থাক। যখন কিয়ামত আসবে তখন পুনরায় তোমাদের সকলকে ও তোমাদের শত্রুদের একত্র করা হবে

১০৫. আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই তা অবতীর্ণ হয়েছে[১]; আর আমি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি[২]।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

১০৬. আমি কুরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে তা পাঠ করেন থেমে থেমে এবং তা অবতীর্ণ করেছি ক্রমে-ক্রমে[৩]।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝

এবং কে হতভাগা, কে ভাগ্যবান এবং কে ধ্বংসপ্রাপ্ত, কে নাজাতপ্রাপ্ত –এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেওয়া হবে।

১. মূসা আলাইহিস সালামের মু'জেযা ইত্যাদির বর্ণনার পর আলোচনার মোড় পুনরায় কুরআন করীমের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে– মূসা (আ)-এর মু'জেযাসমূহ তো আপন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত সুস্পষ্ট মু'জেযাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ইলমী মু'জেযা হচ্ছে এই কুরআন কারীম, যা আমি আমার হেকমত অনুসারে অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি এবং অবিকল সেই সত্যসহই তা তাঁর নিকট পৌঁছে গেছে। মাঝপথে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনও ঘটেনি- فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (জেনে রাখ, কুরআন তো অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের সাথে এবং এও জেনে রাখ যে, তিনি ছাড়া কোনই মাবূদ নেই। –সূরা হূদ, আয়াত ১৪)

২. অর্থাৎ আপনি মান্যকারীদের সুসংবাদ দেন, আর অমান্যকারীদের আল্লাহর শাস্তির ধমক শোনান।

৩. পবিত্র কুরআন নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ-মর্ম বুঝে কুরআন অনুসারে আমল করা। একেই কুরআনের ভাষায় تدبر وتذكر বলা হয়, অর্থাৎ গভীর চিন্তা-ভাবনা করা ও উপদেশ গ্রহণ করা। তবে কুরআনের নিছক শব্দাবলি ও হরফগুলিও নূর ও বরকত থেকে শূন্য নয়। ইরশাদ হয়েছে– كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (সূরা সাদ, আয়াত ২৯)।

এ জন্যই সূরা ও আয়াতসমূহ পৃথক পৃথক রাখা হয়েছে, যাতে ওজীফারূপে (অর্থাৎ প্রতিদিনের আমলরূপে) তেলাওয়াত করা সহজ হয় এবং শ্রোতাদের জন্য তা হেফজ করতে ও বুঝতেও আসান হয়। আর ধীরে ধীরে এজন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী তা থেকে মুনাসিব হেদায়েত হাসিল করার সুযোগ হয়। এবং যারা পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক হবেন, তারা প্রত্যেক আয়াত ও হুকুমের ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে স্মরণ রাখতে পারেন এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কোন আয়াতকেই অযথা স্থানে ব্যবহার করার অবকাশ না রাখেন।

১০৭. আপনি বলুন, 'তোমরা এর প্রতি ঈমান আন বা না আন, যারা এর পূর্বে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে– তাদের নিকট এ কুরআন তেলাওয়াত করামাত্রই তারা চিবুকের উপর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে,

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۰۷﴾

১০৮. এবং বলতে থাকে, 'আমাদের রব পাক-পবিত্র, নিশ্চয় আমাদের রবের ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল[১]।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰۸﴾

১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে চিবুকের উপর লুটিয়ে পড়ে এবং কুরআন তাদের বিনয়কে আরো বাড়িয়ে দেয়[২]।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿۱۰۹﴾

১১০. বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাক বা 'রহমান' বলে ডাক, (তাঁকে) যে নামেই ডাকবে– সুন্দর নামসমূহ তো তাঁরই[৩]।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

---

১. অর্থাৎ তোমরা মান বা না মান, কুরআনের এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি সেই ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানবান লোকেরা দিচ্ছে, যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সুসংবাদ সম্বন্ধে অবহিত। তারা এই কালাম শ্রবণ করতেই সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে, সুবহানাল্লাহ! কী বিরল ও বিস্ময়কর বাণী! নিশ্চয় আল্লাহর সেই ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার ছিল, যা মূসা আলাইহিস সালামের মুখে তাওরাতের 'দ্বিতীয় বিবরণ' অধ্যায়ে করা হয়েছিল– "(হে বনী ইসরাঈল!) আমি তোমাদের ভাইদের (অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের) মধ্য থেকে এক নবী পাঠাব, যাঁর মুখে আমার বাণী ঢেলে দেব।" নিঃসন্দেহে তা এই কালামই, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় মুখে দেওয়া হয়েছে।

আর ইলমধারী ব্যক্তিগণ যখন কুরআনের সত্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল, তখন অস্বীকার করা একমাত্র জাহেলদেরই কাজ।

২. অর্থাৎ কুরআন শুনে তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় এবং বিনয় বাড়তে থাকে।

أذقان (চিবুক) শব্দটির মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা সেজদায় অত্যন্ত বেশি নত হয়, চিবুকগুলিও মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, এখানে সেজদা করাই উদ্দেশ্য। والله أعلم

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

সেজদা, খুশু-খুযু ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে দু'আ অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকার আলোচনা করা হচ্ছে। আর দু'আর সাথে সামঞ্জস্য আছে বলে পরের আয়াতে নামাজের আলোচনা করা হয়েছে।

আর তুমি স্বীয় নামায উচু স্বরেও পড়বে না এবং নিচু স্বরেও না;* বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করবে[১]।	وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۞

অবতরণের প্রেক্ষাপট

ঘটনা এই যে, আল্লাহ তাআলার নামগুলির মধ্যে আরবের মুশরিকরা "আল্লাহ" নামটি বেশি ব্যবহার করত, "রহমান" নামের সাথে ওদের পরিচয় ছিল কম। অবশ্য ইহুদীরা এই "রহমান" নামের ব্যবহার বেশি করত। "ইবরানী" ভাষায় এ নামের উচ্চারণ আরবীর মতই ছিল। অপর দিকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা নিজ উপাধি "রহমানুল ইয়ামামা" ধারণ করেছিল। যাহোক, মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার জন্য "রহমান" নাম ব্যবহারে বিব্রত বোধ করত। যখনই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে "রহমান" শুনত, তখন বলত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তো দুই খোদাকে ডাকতে নিষেধ করেন, কিন্তু নিজে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় খোদা (রহমান)-কে ডাকেন। আর ইহুদীদের অভিযোগ ছিল, আমাদের ন্যায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মে "রহমান" নামটির অধিক চর্চা হয় না কেন?

উভয় দলের উত্তরে আয়াতে বলা হচ্ছে যে, "আল্লাহ" ও "রহমান" সর্বগুণের আধার এক সত্তারই দুই নাম- গুণ বা নামের বহুত্বে গুণী বা ব্যক্তির বহুত্ব প্রমাণিত হয় না, অতএব তা তাওহীদের পরিপন্থী নয়। (তাফসীরে তবারী ১৫/১২৩-১২৪)

আর যদি বলা হয়, কোন একটি নাম অধিক ব্যবহৃত হয় না কেন? এর উত্তর এই যে, আল্লাহর যতগুলি নাম (أسماء الحسنى) আছে, তন্মধ্য থেকে যে নামেই তাঁকে ডাকবে উদ্দেশ্য একই। শিরোনাম ও প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতায় আসল বিষয় বিভিন্ন হয় না। হাঁ, এ কথা ঠিক যে, প্রত্যেক কথার একটি সময় আর প্রত্যেক বিষয়ের একটি স্থান রয়েছে। কবির ভাষায় :

عبارتنا شتى وحسنك واحد ÷ وكل إلى ذاك الجمال يشير

(আমাদের প্রকাশভঙ্গি বিচিত্র হলেও তোমার সৌন্দর্য একই। আর সবাই (আপন ভাষায়) সেই সৌন্দর্যের দিকেই ইঙ্গিত করছে।)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**- 'স্বীয় তেলাওয়াত (বেশি) উঁচু স্বরেও করবে না এবং (খুব) নিচু স্বরেও করবে না'।

১. অর্থাৎ জাহ্‌রী নামাযে (তদ্রূপ দো'য়া প্রভৃতিতে) বেশি জোরে পড়ো না এবং একেবারে অস্পষ্ট আওয়াজেও না, বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা পছন্দনীয় (موضح القرآن)।

বিভিন্ন হাদীসে আছে, মক্কা শরীফে যখন সজোরে কেরাত পড়া হত, তখন মুশরিকরা তা শুনে কুরআন ও আল্লাহ-রাসূলের প্রতি অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করত। সেজন্য নবীজী খুব আস্তে পড়তে শুরু করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হল (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৪৬) অর্থাৎ এত উচ্চ স্বরে পড়বেন না, যাতে মুশরিকরা ওদের সভা থেকে শুনতে পায়। (অবশ্য তবলীগের সময় ভিন্ন বিধান, সেখানে তো শোনানোই

১১১. আর বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, আর সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং লাঞ্ছনা থেকে (রক্ষাকারী) তাঁর কোন সাহায্যকারীও নেই। আর খুব করে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন[১]।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

উদ্দেশ্য)। আর এতটা আস্তেও পড়বেন না যে, আপনার সঙ্গী-সাথীও শুনতে না পারে। বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করুন, যাতে অন্তর বিগলিত হয় এবং পেরেশানীও না আসে।

১. নামাযের আলোচনার পর নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি গুণে ও মহিমায় অদ্বিতীয় এবং সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও খুঁত-কলঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সত্তায় কোন রকমের দুর্বলতা নেই, যার ক্ষতিপূরণের জন্য অন্যের প্রয়োজন হবে।

অন্যদের সবরকম সহায়তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী

অন্যের সাহায্য নেওয়ার তিনটি অবস্থা হতে পারে। ছোটর সাহায্য নেওয়া, যেমন পিতা সন্তানের সাহায্য নিয়ে থাকে। অথবা সমকক্ষের সাহায্য, যেমন এক শরীক অন্য শরীক থেকে নেয়। অথবা বড় থেকে, যেমন দুর্বল ব্যক্তি বিপদাপদে প্রভাবশালীদের সাহায্য নিয়ে থাকে। এ আয়াতে এই তিনটি অবস্থারই খণ্ডন করা হয়েছে– অর্থাৎ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এর মধ্যে প্রথম অবস্থার, لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ এর মধ্যে দ্বিতীয়টির এবং لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ এর মধ্যে তৃতীয়টির খণ্ডন করা হয়েছে। তারপর كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا এর দ্বারা তাঁর আজমত ও বড়ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ –মানুষের উচিত আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব মুখে ও অন্তরে স্বীকার করে নেওয়া এবং তাঁকে সব রকমের দুর্বলতার উর্ধ্বে জ্ঞান করা।

অধিকন্তু মজার বিষয় এই যে, لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এর দ্বারা খ্রিস্টানদের, لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ এর দ্বারা মুশরিকদের এবং لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ এর দ্বারা সেসব ইহুদীদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা ইয়াকূব (আ) এর সঙ্গে কুস্তিতে পেরে উঠতে পারেননি। نعوذ بالله

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'লাঞ্ছনার সময় তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ তাঁর জন্য কখনো লাঞ্ছনাকর অবস্থাই সৃষ্টি হতে পারে না, যে জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। রাজা-বাদশাহদের দরবারে শক্তিশালী আমীরদের একটা দল থাকে, বিপদের সময় যারা কাজে আসে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এহেন বিষয়ের কল্পনাও করা যায় না।

সূরা কাহাফ

سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১৮ । ১১০ আয়াত । ১২ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ١١٠، رُكُوعَاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۟

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন বক্রতা রাখেননি[১]—

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

২. সরল-সঠিক কিতাব। (এজন্য অবতীর্ণ করেছেন), যাতে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে[২] এবং

১. অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চ প্রশংসা ও শোকরের উপযুক্ত সেই এক আল্লাহ তাআলাই হতে পারেন, যিনি নিজের বিশিষ্ট ও সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণতম কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এভাবে বিশ্ববাসীকে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'য়ামত দ্বারা সৌভাগ্যশালী করেছেন।

নিশ্চয় এই কিতাবের মধ্যে কোনই বক্র ও কুটিল কথা নেই। এর ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল, বর্ণনাভঙ্গি খুবই স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী– সরল, স্বচ্ছন্দ ও আবেদনপূর্ণ। তার শিক্ষা অতি উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং তা সর্বযুগের সকল মানুষের নিকট গ্রহণীয় ও সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে সম্পূর্ণ বরণীয়। তাতে ইফরাত ও তাফরীতের (অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার) লেশমাত্র নেই।

২. অর্থাৎ পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের উপর দুনিয়া বা আখেরাতে যে কঠিন আযাব আসবে, সে সম্পর্কে এ কিতাব সতর্ক করে।

বি. দ্র. قيما শব্দটিকে কেউ কেউ مستقيم (সরল) অর্থে ধরেছেন এবং একে وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا এর তাকীদ সাব্যস্ত করেছেন– অর্থাৎ যতই চিন্তা-গবেষণা কর না কেন, এ কিতাবের মধ্যে তিল পরিমাণ বক্রতাও পাবে না।

কিন্তু ইমাম ফাররা (র) এর অর্থ করেছেন- قيما على سائر الكتب السماوية অর্থাৎ সকল আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী ও তার সমর্থনকারী এবং দুনিয়ায় সেগুলোর মৌলিক শিক্ষার ধারক-বাহক। আবু মুসলিম বলেছেন- قيما بمصالح العباد অর্থাৎ মানুষের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সফলতার ধারক এবং তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনের সংস্কারক।

যা হোক, যে অর্থই নেওয়া হোক, তার সত্যতায় কোনো সন্দেহ নেই।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝

সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের এ সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান–

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝

৩. যার মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে[১]।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

৪. এবং যাতে তাদের সতর্ক করে যারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন[২]।'

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

৫. এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই এবং ওদের বাপ-দাদাদেরও না। কী জঘন্য কথা, যা ওদের মুখ থেকে বের হয়! ওরা আর কিছু নয়, কেবল মিথ্যাই বলছে[৩]।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

৬. মনে হয় যেন আপনি ওদের পিছনে পরিতাপ করতে করতে স্বীয় প্রাণ নাশ করে ফেলবেন যদি ওরা এই বাণীর প্রতি ঈমান না আনে[৪]।

---

১. বাহ্যত এর দ্বারা আখেরাতের প্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত উদ্দেশ্য, যেখানে অনুগত মুমিনরা চিরস্থায়ী আনন্দ ও শান্তি লাভ করবে।

২. খোদার সন্তান আছে বলে যাদের বিশ্বাস, তাদের মধ্যে খ্রিস্টানরাই সর্বাধিক খ্যাত এবং হাদীছের ইঙ্গিত অনুযায়ী তাদেরই সাথে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের ধারক ও বাহকদের মোকাবিলা হতে থাকবে। তবে এই আয়াতের শব্দাবলির ব্যাপকতা কতক ইহুদী ও মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করে, যারা যথাক্রমে উযায়র আলাইহিস সালামকে খোদার পুত্র এবং ফেরেশতাদের খোদার কন্যা বলে।

মোটকথা, খোদার সন্তানসন্ততি আছে বলে যাদের বিশ্বাস, তাদেরকে এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে খ্রিস্টানদের এস্থলে সতর্ক করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ ওদের হাতে কোনই জ্ঞান ও ইলমী মূলনীতি নেই, আর না ওদের পূর্বপুরুষদের ছিল, যাদের অন্ধ অনুকরণে ওরা এরূপ জঘন্য কথা মুখ থেকে বের করছে। আসলে আল্লাহ তাআলার পবিত্র শান ও মর্যাদা সম্বন্ধে ওদের কোনো ধারণাই নেই, যে কারণে তাঁর ব্যাপারে এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করতে কিছুমাত্র লজ্জা করছে না। দলীল-প্রমাণের স্থলে ওদের ভাগাড়ে কেবল এটাই আছে যে, মুখ দিয়ে একটা মিথ্যা ও উদ্ভট কথা বলে যাবে এবং প্রমাণ চাইলে বলে দেবে, এটা ধর্মের এমন এক রহস্য, যার উপলব্ধি মানব-বুদ্ধির নাগালের বাইরে।

৪. অর্থাৎ এই কাফেররা যদি কুরআনের কথাগুলি না মানে, তবে আপনি ওদের চিন্তায় নিজেকে পেরেশান করবেন না। আপনি তাবলীগ ও দাওয়াতের কর্তব্য পালন করেছেন ও করছেন।

৭. পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে আমি তাকে করেছি পৃথিবীর শোভা, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি— তাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম[১]?	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝
৮. এবং তার উপর যা কিছু আছে, আমি অবশ্যই তাকে পরিণত করব বৃক্ষ-লতাহীন এক ময়দানে[২]।	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

কেউ না মানলে আপনার ভারাক্রান্ত ও চিন্তান্বিত হওয়ার দরকার নেই। চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি বলে তা কেন করলাম– এ কথা ভেবে আফসোস করাও সংগত নয়। আপনি তো সর্বাবস্থায় সফল। দীনের প্রচার ও প্রসারে এবং মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির দাবীতে যেসব কাজ আপনি করছেন, তা আপনার মর্তবা বৃদ্ধি করে চলেছে। হতভাগারা যদি গ্রহণ না করে, তবে তাদেরই ক্ষতি।

১. পরীক্ষা এই যে, তারা কি এর শোভার পেছনে দৌড়ায়, না কি তা বাদ দিয়ে আখেরাতের চিন্তা করে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! أحسن عملا কারা? উত্তরে বললেন, যাদের সমঝ-বুঝ ভাল, যারা হারামকে সর্বাধিক পরিহার করে এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে বেশি ধাবিত হয়। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, রেওয়ায়েত : ১০৭০৫- এর সনদ খুবই দুর্বল)

২. অর্থাৎ একদিন এসব গাছপালা, তৃণলতা প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীপৃষ্ঠকে পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করা হবে। অতএব যারা এর শোভা-সৌন্দর্যে বিমোহিত হচ্ছে, তাদের বোঝা উচিত যে, এই শোভা-সৌন্দর্য চিরন্তন নয়। তোমরা পার্থিব উপায়-উপকরণ যতই সঞ্চয় কর না কেন এবং বস্তুগত উন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীকে যতই মনোহর ও সুশোভিত কর না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আসমানী হেদায়েত ও রূহানী দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকবে, প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি এবং শাশ্বত মুক্তি ও সফলতা লাভ করতে পারবে না। প্রকৃত সফলতা একমাত্র তাদেরই জন্য, যারা প্রকৃত মাওলার সন্তুষ্টির খাতিরে দুনিয়ার সকল নশ্বর আনন্দ জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং সত্যের পথে কোন প্রতিবন্ধকতায় যারা ঘাবড়ায় না এবং দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জালেমদের ভীতি প্রদর্শনে বিচলিত হয় না।

এ প্রসঙ্গেই সম্মুখে 'আসহাবে কাহাফ'-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এ দুর্ভাগাদের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হবেন না। ওরা যে দুনিয়ার জীবন ও আরাম-আয়েশের কারণে সত্যকে উপেক্ষা করছে, তা সবই কেটে-ছেঁটে সমান করে দেওয়া হবে এবং পরিশেষে সকলকে আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে– তখন সব বিবাদের মীমাংসা করে দেওয়া হবে।

৯. তুমি কি মনে করেছ যে, 'গুহা' ও 'গহ্বর'ওয়ালারা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে (বড়) বিস্ময়কর ছিল[১]?

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহা কুদরতের তুলনায় 'আসহাবে কাহ্ফের' কাহিনী খুব অদ্ভুত কিছু নয়, যাকে সীমাতিরিক্ত বিস্ময়কর মনে করা হবে। পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করা, এদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা করা, দুর্বল মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীদের প্রেরণ করা, তাঁদের মুষ্টিমেয় আসবাব-উপকরণহীন জামাতকে বড় বড় অহংকারী ও প্রতাপশালী লোকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করা, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর গুহা-বন্ধু হযরত আবু বকর (রা)-কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে ছাওর গুহায় তিন দিন অবস্থান করানো, গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পরও তাঁদের শত্রুদের বিফল মনোরথ করে ফিরিয়ে দেওয়া, পরিশেষে মুষ্টিমেয় সম্বলহীন মুসলমানদের সমগ্র আরবভূমি বরং প্রাচ্য-প্রতীচ্যে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে বিজয় দান করা— ইত্যাদি ঘটনাবলি এবং এ রকমের আরো অসংখ্য বিষয় কি আসহাবে কাহফের কাহিনীর চেয়ে কম বিস্ময়কর?

ইহুদীরা কুরায়শদের বলেছিল, পরীক্ষাস্বরূপ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন কর– (১) রূহ কী? (২) আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা কী ছিল? (৩) যুলকারনাইনের ইতিবৃত্ত কী? (তাফসীরে তবারী ১৫/১৪৩-১৪৪) বিস্ময়কর হিসাবে ওরা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, সেটা তত বিস্ময়কর নয় যতটা তোমরা মনে করছ। এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি বর্তমান রয়েছে। সামনে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

আসহাবে কাহ্ফের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

কথিত আছে, গুহাবাসী এই যুবকরা ছিল এক জালেম ও প্রতাপশালী রোমান সম্রাটের আমলে, যার নাম কারো কারো মতে 'দাকিয়ানুস' ছিল। সম্রাট ঘোর মূর্তিপূজক ছিল এবং জবরদস্তিমূলক মূর্তিপূজা প্রসারের চেষ্টা করত। সাধারণ লোকেরা নির্যাতনের ভয়ে এবং দুনিয়ার লোভে নিজেদের দীন-ধর্ম ছেড়ে মূর্তিপূজা অবলম্বন করতে থাকে। সে সময় রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় যুবকের অন্তরে খেয়াল এল– একজন মানুষের খাতিরে স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, তাঁদের অন্তর আল্লাহর ভয় ও তাক্ওয়ার আলোতে পূর্ণ ছিল এবং সবর ও স্থিরতা, তাওয়াক্কুল ও যুহ্দের দৌলত লাভ করেছিল।

তারা সম্রাটের সম্মুখে গিয়ে ঘোষণা দিল- لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهٖ إِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই মাবূদরূপে ডাকব না, এমন করলে আমরা তো অতিশয় ভ্রান্ত কথা বললাম)। তারা ঈমানের পরিচায়ক দৃঢ়তা ও সৎসাহস প্রকাশ করে উপস্থিত দর্শকদের অভিভূত করে ফেলল। একে তো তারা তরুণ-যুবক এ কথা ভেবে এবং অপরাপর ব্যস্ততা ও বিচার-বিবেচনাবশত সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করল না, কয়েক দিনের অবকাশ দিল,

যেন নিজেদের বিষয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা ও পুনর্বিবেচনা করে। তখন তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, যেহেতু সম্রাটের কঠোরতা ও বলপ্রয়োগের সম্মুখে অক্ষম হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই আপাততঃ শহরের নিকটবর্তী কোন পর্বতগুহায় আত্মগোপন করাই সমীচীন। তারা দো'য়া করল- প্রভু হে! তুমি তোমার বিশেষ রহমতে আমাদের কার্য সমাধা করে দাও এবং রুশ্‌দ ও হেদায়াতের যাত্রাপথে আমাদের সকল প্রয়োজন সুচারুরূপে পূরণ করে দাও।

অতঃপর তারা লোকালয় ছেড়ে নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং নিজেদের একজনকে দায়িত্ব দিল, যেন প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী ক্রয় করতে এবং সংশ্লিষ্ট খবরাখবর জানতে বিশেষ সময়ে ছদ্মবেশে শহরে যাতায়াত করে। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি একদিন ফিরে এসে জানাল, আজ সরকারীভাবে শহরে আমাদের অনুসন্ধান চলছে এবং আমাদের খোঁজ দেওয়ার জন্য আমাদের আত্মীয়স্বজনদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। তারা এ আলোচনা করছিল, এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের উপর হঠাৎ করে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সরকারী লোকেরা তাদের অনেক অনুসন্ধান করেও ব্যর্থ ও নিরাশ হল। শেষে সম্রাটের পরামর্শে একটি সীসার ফলকে উক্ত যুবকদের নাম-ঠিকানা লিখে রাজকোষে রেখে দেওয়া হয়, যাতে ভবিষ্যত বংশধররা জানতে পারে যে, একটি দল বিস্ময়করভাবে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছে। হতে পারে, পরবর্তী কালে এর কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে এবং এই বিস্ময়কর ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। (তাফসীরে তবারী ১৫/১৬৫-১৭২)

এই যুবকরা কোন ধর্মের ছিল? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তারা খ্রিস্টান- অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর আসল-অবিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিল। কিন্তু ইবনে কাছীর (র) বিবিধ আলামত ও প্রমাণের আলোকে এ মতকে অগ্রগণ্য বলেছেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা ঈসা (আ.)-এর যুগের পূর্বের ছিল।

বি. দ্র. رقيم বলে গিরিগুহাকে। আর শব্দটি مرقوم ("লিখিত বস্তু") অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মুসনাদে আব্‌দ ইবনে হুমায়দ-এর একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইবনে আব্বাস (রা) الرقيم এর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। রেওয়ায়াতটিকে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর শর্ত অনুসারে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫৯) অতএব "আসহাবে কাহ্‌ফ" ও "আসহাবে রাকীম" একই দলের দুটি উপাধি। গিরিগুহায় থাকার কারণে তাদের "আসহাবে কাহ্‌ফ" এবং একটি ফলকে তাদের নাম-ধাম লিখিত থাকায় "আসহাবে রাকীম" বলা হয়েছে। কিন্তু মুতারজিম (র) প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং رقيم এর যে অর্থই নেওয়া হোক "আসহাবে কাহফ" ও "আসহাবে রাকীম"-কে একই দল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে, "আসহাবে রাকীম" ভিন্ন একটি দল এবং তদের বিস্তারিত কাহিনী কুরআনে বর্ণিত হয়নি, তবে বিস্ময়কর বলে "আসহাবে কাহফ"-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাদেরও উল্লেখ হয়েছে। "আসহাবে রাকীম" (গর্তবাসী) হচ্ছে সেই তিন লোক, যারা বৃষ্টিবাদল থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। উপর থেকে

১০. (স্মরণ কর), যখন সেই যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল এবং বলল, 'হে আমাদের রব! আপনার নিকট থেকে আমাদের রহমত দান করুন এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা করুন।'

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

১১. অতঃপর আমি তাদের কানে চাপড় দিয়ে সেই গুহায় কয়েক বছর পর্যন্ত (ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম)[১]।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

১২. অতঃপর আমি তাদের জাগ্রত করে দিলাম, যাতে জানতে পারি যে, দুই দলের কোন দল অধিক সঠিকরূপে তাদের ঘুমে থাকার মেয়াদ নির্ণয় করে[২]।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

একটি বিরাট পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাদের প্রত্যেকে নিজ জীবনের সব চেয়ে মকবূল আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলে ধীরে ধীরে গিরিদ্বার খুলে যায়।

ইমাম বুখারী (র) "আসহাবে কাহফ" অধ্যায়ে حديث الغار নামে স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করে উক্ত তিন ব্যক্তির ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪৬৫) তিনি সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, "আসহাবে রাকীম" হচ্ছে এই তিন ব্যক্তি। তাবারানী ও বাযযার (র.) 'হাসান' সনদে নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে একটি মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার "রাকীম" এর উল্লেখ করত এ তিন ব্যক্তির ঘটনা আলোচনা করেছেন। (মুজামে আওসাত, তবরানী, হাদীস ২৩২৮; কাশফুল আসতার, হাদীস ৩১৭৮) والله أعلم

১. অর্থাৎ এমন চাপড় দিলেন যে, যুগ যুগ ধরে তারা গিরিগুহায় ঘুমিয়ে থাকে, এদিক-ওদিকের কোন খবরই তাদের কানে ঢোকেনি।

২. বহু বছর পর আল্লাহ তাআলা তাদের জাগ্রত করলেন, যাতে নিদ্রার মেয়াদ বিষয়ে মতভেদকারীদের মধ্যে কারা তাদের নিদ্রা-কাল বেশি সঠিকরূপে নির্ণয় করতে পারে– তা প্রকাশ পায়।

বলা বাহুল্য, এরূপ দীর্ঘ নিদ্রার পর যখন তারা জাগ্রত হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং তাদের মধ্যে ও অন্যান্য দর্শকদের মধ্যেও মতভেদ হয়ে থাকবে। কেউ সময় কম বলবে, কেউ দীর্ঘ। কেউ বা এ ঘটনা স্বীকার করবে, কেউ অসম্ভব মনে করবে। সুতরাং তাদের জাগ্রত করে এটা দেখার ছিল যে, কোন্ দল সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে এবং এর মাধ্যমে

[রুকূ - ২]

نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَاَهُمۡ بِالۡحَقِّ ؕ اِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ اٰمَنُوۡا بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنٰهُمۡ هُدًى ﴿۱۳﴾

১৩. আমি আপনার নিকট তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা আপন রবের প্রতি ঈমান এনেছিল, আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সমঝ-বুঝ[১]।

وَّرَبَطۡنَا عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ اِذۡ قَامُوۡا فَقَالُوۡا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ لَنۡ نَّدۡعُوَا۠ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدۡ قُلۡنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমাদের রব তো তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব[২]। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মা'বূদরূপে ডাকব না, এমন করলে আমরা তো অতিশয় ভ্রান্ত কথা বললাম[৩]।

هٰۤؤُلَآءِ قَوۡمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوۡ لَا يَاۡتُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ بِسُلۡطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾

১৫. 'এই আমাদের সম্প্রদায়, এরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বূদ স্থির করেছে। এরা তাদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনে না কেন? অতএব ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে[৪]?

"মৃত্যুর পর পুনরুত্থান" সম্পর্কে সব সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারে। এই পুনরুত্থান সম্পর্কেই তখনকার লোকেরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিল।

১. অর্থাৎ সাধারণ মু'মিনগণ থেকে উচ্চ মর্তবা তথা আউলিয়ার মর্যাদা তাদের দান করলাম।

২. অর্থাৎ তাদের দৃঢ় ও অবিচল রাখলাম, ফলে তারা নিজেদের ঈমানের কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিল।

৩. অর্থাৎ "রব" যখন তিনিই, তখন অন্য কাউকে মাবূদ সাব্যস্ত করা চরম বোকামী। রুবুবিয়্যত ও উলুহিয়্যত উভয়ই তাঁর জন্যই নির্ধারিত।

৪. তাওহীদবাদীরা যেমন তাওহীদের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে, মুশরিকরা নিজেদের দাবিতে সত্য হলে তারা কোনো স্পষ্ট দলীল পেশ করে না কেন? পেশ করবেই বা কোথা থেকে? মিথ্যার তো ভিত্তি থাকে না। আর আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করার চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে?

১৬. 'তোমরা যখন ওদের থেকে এবং ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছ, অতএব এখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের বিষয়ে তোমাদের জন্য আসানীর ব্যবস্থা করে দেবেন[১]।'

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا۝

১৭. তুমি দেখতে— যখন সূর্য উদিত হয়, তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে সরে যায়। আর যখন অস্ত যায়, তখন তাদের পাশ কাটিয়ে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থানরত। এ আল্লাহর এক নিদর্শন[২]। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই হয় পথপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তুমি তার জন্য সুপথে আনয়নকারী কোন বন্ধু পাবে না[৩]।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۝

---

১. অর্থাৎ তারা পরস্পর শলা-পরামর্শ করল যে, আমরা যখন মুশরিকদের ধর্ম থেকে পৃথক, তখন বাহ্যিকভাবেও তাদের থেকে আমাদের পৃথক থাকা উচিত। এবং ওদের বাতিল মা'বূদদের থেকে আমরা যখন সরে গিয়েছি, তখন সকল কিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে একমাত্র আমাদের রবের প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত এবং তাঁরই নিকট থেকে রহমত ও অনুগ্রহের আশা করা উচিত। এই পরামর্শ করে তারা পর্বত-গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার কুদরতে তাদের এমন স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। সেথায় না ছিল জায়গার সংকীর্ণতা আর না রোদের কষ্ট। পর্বত-গুহাটি ভিতরে প্রশস্ত ও বাতাসপূর্ণ ছিল এবং যেমনটি ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, উত্তরমুখী হওয়ার কারণে তার অবস্থান এমন ছিল যে, ভেতরে প্রয়োজন মাফিক রোদ ঢুকত, তবে তাদের কষ্ট না দিয়ে বের হয়ে যেত।

৩. অর্থাৎ বাহ্যিক পথপ্রদর্শন ও রুহানী পথপ্রদর্শন সবই তাঁর মুঠিতে। লক্ষ্য করে দেখ, যখন সারা দুনিয়া বিপথগামী হচ্ছিল তখন কিভাবে তিনি আসহাবে কাহফকে হেদায়াতের পথে দৃঢ় রাখলেন এবং জাহেরীভাবেও কীরূপ বিস্ময়কর গুহার পথ দেখালেন।

[রুকূ - ৩]

১৮. তুমি তাদের জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা নিদ্রিত। এবং আমি তাদেরকে ডানে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম। আর তাদের কুকুর গুহামুখে তার বাহু দু'টি (অর্থাৎ সামনের দু'পা) বিস্তার করে বসে ছিল। তুমি যদি উঁকি দিয়ে তাদের দেখতে, তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে পালাতে এবং তোমাকে পুরোপুরি ছেয়ে ফেলত তাদের ভয়[১]।

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨

১৯. এভাবেই আমি তাদের জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল– 'তোমরা কতকাল (ঘুমে) থেকেছ?' তাদের কতক বলল, 'আমরা একদিন বা একদিনের চেয়ে কম সময় ঘুমে থেকেছি।' অন্যরা বলল, 'তোমরা কতকাল ঘুমে থেকেছ তা তোমাদের রবই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে নিজেদের এই মুদ্রাটি দিয়ে শহরে

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۭ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۭ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۭ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى

১. কথিত আছে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তাদের চোখ খোলা ছিল এবং এত দীর্ঘ নিদ্রার কোন প্রভাব তাদের শরীরে পড়েনি। ফলে, কেউ তাদের দেখলে মনে করত, তারা জাগ্রত আছে। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বড় ভীতিপ্রদ এবং সেখানে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, যেন লোকেরা তাদের আরামের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে। তাদের সঙ্গে একটি কুকুরও ছিল। এর উপরও তাদের সোহবতের প্রভাব পড়ে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী সেও জীবিত থাকে। কুকুর রাখা ভাল নয়, তবে লাখো মন্দের মধ্যে একটি ভালও হয়। শেখ সাদী কত সুন্দরই না বলেছেন–

پسر نوح بابداں بنشست - خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند - پئے نیکاں گرفت مردم شد

(নূহ (আ)-এর পুত্র অসৎ সঙ্গ গ্রহণ করায় তার নবীবংশের পরিচয় বিলুপ্ত হল। আর 'আসহাবে কাহফ'-এর কুকুরটি কিছু দিন সাধুসঙ্গে থেকে মানুষের মর্যাদা পেয়ে গেল)।

الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا۝

পাঠাও। সে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুক, কোন্ শহরের খাদ্য বেশি পবিত্র এবং তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসুক। আর সে যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের সম্পর্কে কাউকে জানতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا۝

২০. 'ওরা যদি তোমাদের সম্বন্ধে জেনে ফেলে, তবে তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদের ফিরিয়ে নেবে ওদের ধর্মে। এবং তখন তোমরা কিছুতেই সফল হবে না[১]।'

---

১. আল্লাহ তাআলা যেমন নিজ কুদরতে তাদের দীর্ঘকাল ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন, তদ্রূপ তাদের যথাসময়ে জাগিয়ে দিলেন। জেগেই তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল যে, আমরা কতকাল ঘুমিয়েছি? কেউ কেউ বলল, "এক-আধ দিন"। অর্থাৎ খুবই অল্প সময়। অন্যরা বলল– একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, আমরা কতকাল ঘুমিয়েছি।

এখন তোমরা নিজেদের কাজ কর, একজনকে এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠাও। সে কোন দোকান থেকে হালাল ও পরিচ্ছন্ন খাদ্য কিনে আনুক। তবে তাকে খুবই সতর্কতার সাথে যাতায়াত করতে হবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে, যেন শহরবাসী আমাদের খোঁজ না পায়, নতুবা ভয়াবহ অবস্থা হবে। জালেম বাদশাহ জানতে পারলে আমাদের হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় জোরজবরদস্তি করে সত্যধর্ম থেকে আমাদের বিচ্যুত করবে। আল্লাহর পানাহ! এমনটি হলে আমরা যে কল্যাণ ও সফলতা চাচ্ছি, তা কখনো হাসিল হবে না। কেননা, সত্য ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া, চাই তা জোরপূর্বক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোক, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুমিনদের কাজ হতে পারে না।

বি. দ্র. আমার মতে, يوما أو بعض يوم বলে এখানে স্বল্প সময় উদ্দেশ্য। যদিও তারা দীর্ঘকাল ঘুমে ছিল, কিন্তু ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এত দীর্ঘ সময়ও তাদের নিকট স্বল্প মনে হয়েছে।

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ বলে সময়ের স্বল্পতা বোঝানোর একটি উদাহরণ হচ্ছে সামনের আয়াতটি, যাতে দুনিয়ার জীবনের স্বল্পতা বোঝানোর জন্য এ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা মুমিনূন (রুকূ ৬)-এর মধ্যে রয়েছে- كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّيْنَ (তোমরা পৃথিবীতে বছরের গণনায় কতকাল থেকেছ? ওরা বলবে, 'আমরা একদিন বা একদিনেরও কম সময় থেকেছি', আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। –সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১১২-১১৩)

وَكَذٰلِكَ اَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيۡبَ فِيۡهَا ۚۤ اِذۡ يَتَنَازَعُوۡنَ بَيۡنَهُمۡ اَمۡرَهُمۡ

২১. আর এভাবেই আমি (লোকজনকে) তাদের সম্বন্ধে অবহিত করে দিলাম, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই– যখন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে নিজেদের বিষয়ে (অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে) বিতর্ক করছিল*[১]।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– "আসহাবে কাহফ' সম্পর্কে বিতর্ক করছিল (যে, তারা কোথায় গেল? এখন তাদের অবস্থা কী? ইত্যাদি)'।

১. ঘটনা এই যে, তাদের একজন একটি মুদ্রা নিয়ে শহরে গেল। তার কাছে সেখানকার সকল জিনিস অভিনব মনে হল। আসলে, ইতিমধ্যে কয়েক শতাব্দি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। শহরের লোকেরা সেই মুদ্রাটি দেখে অবাক হল এবং ভাবতে লাগল, এ কোন্ রাজার নাম এবং এ কোন্ যুগের মুদ্রা? লোকেরা মনে করল যে, এই ব্যক্তি মাটির ভেতর কোন গুপ্ত ধন পেয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি রাজার কানে পৌছল। তিনি সেই পুরাতন ফলকটি তলব করলেন, যার উপর কয়েক ব্যক্তির নাম লেখা ছিল, যারা অকস্মাৎ অজানা উপায়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হল যে, এরাই সেই হারিয়ে যাওয়া দল।

সে সময় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (بعث بعد الموت) সম্বন্ধে শহরের লোকদের মাঝে বাদানুবাদ চলছিল। কেউ বলত, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন নেই। কেউ বলত, শুধু আত্মিক জীবন লাভ হবে, শারীরিক নয়। কেউ পরকালে আত্মিক ও শারীরিক উভয় জীবনের কথা বলত। তৎকালীন রাজা সত্যের অনুসারী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, সত্যের পক্ষে এমন উদাহরণ প্রকাশিত হোক, যার দ্বারা বিষয়টি বুঝানো সহজ হয় এবং পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার প্রবণতা কমে আসে।

আল্লাহ তাআলা তাকে এই উদাহরণ দান করলেন। শেষ পর্যন্ত পরকালের অস্বীকারকারীরাও 'আস্হাবে কাহফে'র বিস্ময়কর ঘটনা দেখা ও শোনার পর পরকালে বিশ্বাস করল। এই ঘটনা বিশেষভাবে তাদের মন-মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলল এবং তারা বুঝল, আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তাদেরই সতর্ক করেছেন, এ ঘটনাও পুনরুত্থানের চেয়ে কম নয়।

বি. দ্র. কেউ কেউ إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرهم এর তফসীরে বলেছেন, এই বিতর্ক পরকালের পুনরুত্থান সম্পর্কে নয়, বরং স্বয়ং অসহাবে কাহফ সম্পর্কে ছিল। অর্থাৎ দলটি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল যে, সেই যুবকগুলি, যারা একই সঙ্গে গায়েব হয়ে গিয়েছিল বলে দীর্ঘকাল যাবৎ শোনা যাচ্ছে– তারা কোথায় চলে গেল? কোথায় তাদের বংশ বিস্তার লাভ করেছে? তারা কি আদৌ বেঁচে আছে, না সকলে মরে মাটিতে মিশে গেছে? এসব বিষয়ে নানা জনে নানা উক্তি করছিল, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করছিল। এমন সময় আল্লাহ তাআলা সহসা প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করে দিলেন এবং সমস্ত মতভেদের অবসান ঘটালেন।

فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

অতঃপর এক দল বলল, 'তাদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ কর।' (আল্লাহ বলেন-) তাদের রবই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। যারা নিজেদের কর্তব্যবিষয়ে প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো তাদের (গুহার) নিকট একটি মসজিদ নির্মাণ করব[১]।'

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ

২২. কিছু লোক বলবে, 'তারা তিনজন, চতুর্থ তাদের কুকুর।' আর কিছু লোক বলবে, 'তারা পাঁচজন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর- (লক্ষ্যস্থল) না দেখে ঢিল ছোঁড়ার মত আর কি[২]! এবং কিছু লোক বলবে, 'তারা

---

১. দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর আসহাবে কাহ্ফ জীবিত থেকেছে, না পরক্ষণেই মরে গেছে, মরে গিয়ে থাকলে কখন মরল; জীবিত থাকলে কতকাল জীবিত থেকেছে বা কতকাল জীবিত থাকবে- এসব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

যা হোক, শহরবাসীরা তাদের আশ্চর্য ঘটনাদি জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বিগলিত হয়ে গেল এবং সেই গুহার নিকটে স্মৃতিস্বরূপ কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে চাইল, যাতে পরবর্তী দর্শকদের জন্য সুবিধা হয়। অবশ্য কী ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা হবে, তা নিয়ে সম্ভবত তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। এ মতভেদের বিস্তারিত বিবরণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং এটাও তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না যে, স্থাপনা নির্মাণের সিদ্ধান্ত তাদের মৃত্যুর পর নেওয়া হয়েছিল, না মৃত্যুর আগে তখন, যখন তারা দ্বিতীয়বার নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। তদ্রূপ, লোকেরা গুহা পর্যন্ত পৌঁছে তাদের সাক্ষাৎ লাভ করতে পেরেছিল কি না- তাও আল্লাহই জানেন। যা হোক, যারা ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ছিল, তাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, গুহার নিকটে সৌধ নয়, ইবাদতখানা নির্মিত হোক।

আসহাবে কাহফ খাঁটি তাওহীদবাদী ও মুত্তাকী-পরহেজগার ছিল- এটা তো বলাই বাহুল্য, তবে তারা ঠিক কোন্ নবীর শরী'য়তের অনুসারী ছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না। তবে যারা তাদের ভক্তিতে সেখানে ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিল, তারা ছিল খ্রিস্টান।

আবু হায়্যান (রা.) তাঁর রচিত "বাহরে মুহীত" তফ্সীরে আসহাবে কাহফের অবস্থান কোথায় ছিল তা নির্ণয়ে বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আগ্রহী পাঠক তা দেখতে পারেন।

২. অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী শুনে শ্রোতারা স্বাভাবিকভাবেই নানা কল্পনা করবে। কেউ বলবে, তারা ছিল তিনজন, কুকুরটি ছিল চতুর্থ। কেউ তাদের সংখ্যা পাঁচ বলে কুকুরকে ষষ্ঠ গণনা করবে। কিন্তু এসব উক্তি হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতই।

وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

সাতজন, অষ্টম তাদের কুকুর।' আপনি বলুন, 'তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার রবই বেশি জানেন। অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না।' অতএব আপনি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না, তবে ভাসা-ভাসাভাবে এবং তাদের বিষয়ে এদের কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন না[১]।

[রুকূ - ৪]

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝

২৩. আপনি কোন কাজ সম্পর্কে কিছুতেই বলবেন না যে, 'আমি আগামীকাল তা করব—'

এই বিভিন্ন উক্তির কারণ অজ্ঞতা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করাও হতে পারে যে, দেখি- তিনি এ বিষয়ে কী বলেন? কেননা, ইহুদীরা সম্ভবত তাদের সঠিক সংখ্যা সাত জানিয়ে দিয়েছিল। সম্মুখে এ সংখ্যারই সঠিখ হওয়ার প্রতি কুরআন ইঙ্গিত করেছে।

১. অর্থাৎ এ ধরণের গুরুত্বহীন বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক করায় কোন লাভ নেই। সংখ্যা জানার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই। যতটুকু কথা আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি জানার পিছনে পড়া অথবা তিনি যতটুকু খণ্ডন করেছেন তার অতিরিক্ত খণ্ডন করা অহেতুক।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "আমিও সেই অল্পসংখ্যক লোকদের একজন, যারা (কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকে) বুঝতে পেরেছে যে, আসহাবে কাহফ সাতজনই ছিল।" (তাফসীরে তবারী ১৫/২১৯-২২০) কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রথম দুই উক্তিকে رَجْمًا بِالْغَيْبِ বলেছেন, তৃতীয় উক্তির ক্ষেত্রে তা বলেননি। তা ছাড়া বাক্যের ধরনেও পার্থক্য রয়েছে– প্রথমোক্ত দুই বাক্যের মধ্যে واو (সংযোজক অব্যয়) নেই– ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ... –কিন্তু তৃতীয় বাক্য– وثامنهم কে واو সহ বলার দ্বারা যেন এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে যে, এই উক্তির বক্তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আস্থার সাথে ঘটনার বিস্তারিত সম্বন্ধে অবহিত।

এর সমর্থনে কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, নিদ্রা-ভঙ্গের পর আসহাবে কাহফের মধ্যে যে সংলাপ হয়, তার প্রথম বাক্য– قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ এর দ্বারা এক বক্তার, দ্বিতীয় বাক্য قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا الخ এর দ্বারা সে ছাড়া কমপক্ষে আরো তিন বক্তার এবং পরবর্তী বাক্য قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ الخ এর দ্বারা কমপক্ষে আরো তিনজন বক্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে কমপক্ষে সাত ব্যক্তি হয়, কুকুর তাদের অতিরিক্ত।

إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. তবে (তা বলুন) আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর আপন রবকে স্মরণ করুন যদি ভুলে যান এবং বলুন, 'আশা করি, আমার রব আমাকে এমন কিছু বাতলিয়ে দিবেন, যা কল্যাণের দিক থেকে এর চেয়ে নিকটতম*[১]।'

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারা নিজেদের গুহায় তিনশ বছর এবং অতিরিক্ত আরো নয় বছর (ঘুমে) থেকেছে[২]।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এমন কিছু দান করবেন, যা এর চেয়ে অধিক কল্যাণকর।

১. **শানে নুযূল**

আসহাবে কাহফের ঘটনা ইতিহাসের কিতাবাদিতে বিরল ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তা কী করে সকলের জানা থাকবে? ইহুদীদের প্ররোচনায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মুশরিকরা তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করে বললেন, "আগামীকাল বলব।" এটা এই ভরসায় বলেছিলেন যে, জিবরাঈল আগমন করলে জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু জিবরাঈল (আ) পনের দিন পর্যন্ত আসলেন না। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিব্রত হলেন। মুশরিকরা হাসি-ঠাট্টা শুরু করল। (দালাইলুন্ নবুওয়াহ, বাইহাকী ২/২৬৯; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৭৬)

অবশেষে ফেরেশতা উক্ত ঘটনাসম্বলিত আয়াতসমূহ নিয়ে আগমন করেন। তার শেষে নসীহত করা হয় যে, ভবিষ্যত বিষয় সম্পর্কে "ইনশাআল্লাহ" বলা ছাড়া ওয়াদা করা উচিত নয়। আর কখনো ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা বলে নেবেন। আরো বলা হয় যে, (قل عسى أن ...الخ) আশা রাখুন– আল্লাহ আপনার মর্যাদা আরো বাড়াবেন, অর্থাৎ আপনি কখনো ভুলবেন না (موضح القرآن)।

অথবা ... عَسَىٰٓ أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ এর উদ্দেশ্যে এই যে, আসহাবে কাহফের চেয়ে বেশি বিস্ময়কর উপায়ে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন ও সফলতা দান করবেন, যেমন "ছাওর" গুহার ঘটনায় হয়েছিল। অথবা আসহাবে কাহফের ঘটনা থেকে বেশি বিস্ময়কর ঘটনা ও নিদর্শন আপনার মুখ দিয়ে বর্ণনা করাবেন।

২. অর্থাৎ সৌর বছরের হিসাবে তারা তিনশ' বছর গুহায় নিদ্রিত থাকে, আর চান্দ্রবছরে নয় বছর বেশি হয় (ভাঙ্গা মাস ও দিনগুলির হিসাব ধরা হয়নি)। অথবা এ অর্থ হতে পারে যে, তিনশ বছর পর ঘুম কিছুটা ভেঙ্গেছিল, অতঃপর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে এবং আরো নয় বছর ঘুমিয়ে থাকে।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৬. আপনি বলুন, 'তারা কতকাল (ঘুমে) থেকেছে– তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়াদি (-র জ্ঞান) তাঁরই রয়েছে। তিনি কতই না দেখেন ও শোনেন[১]। তিনি ছাড়া বান্দাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না[২]।

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. আপনার প্রতি আপনার রবের যে কিতাব পাঠানো হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাণীগুলি পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং আপনি তাঁকে ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না[৩]।

কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে, (এখানে উদ্দেশ্য এই যে), জাগ্রত হওয়ার পর থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে তিন শত নয় বছর। অর্থাৎ লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে, যার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা পর্যন্ত ৩০৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। والله أعلم

একটি মজার ঘটনা : আমাদের কালে যীশোয়ান প্রদেশের এক ব্যক্তির বর্তমান বয়স ২৫২ বছর। হালে সে চব্বিশতম বিয়ে করেছে।

১. অর্থাৎ তারা ঘুম থেকে কতকাল পর জেগেছিল- এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করে। সঠিক কথা তাই, যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আসমান ও যমীনের সকল গোপন বিষয় তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে, কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়।

২. অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান যেমন সর্বব্যাপী, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতাও সকলকে বেষ্টন করে আছে। এবং যমীন ও আসমানের সকল গুপ্ত বিষয় জানার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর কোন অংশীদার নেই, তেমনি মহাশক্তি ও অধিপত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই।

৩. ইতিপূর্বে আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল– فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا –(আর এখন বলা হচ্ছে– ...وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ)। সারমর্ম এই যে, নিরর্থক বিষয়ে অধিক তর্কবিতর্ক ও চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে আপনি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকুন, অর্থাৎ –যে জ্ঞানগর্ভ ও পরিপূর্ণ কিতাব আপনার প্রভু দান করেছেন, তা পড়ে শোনাতে থাকুন। আল্লাহ তাআলা তাতে যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব ওয়াদা করেছেন, তা পরিবর্তন বা মুলতবী করতে পারে কিংবা ভুল প্রমাণিত করতে পারে– এমন কোন শক্তি নেই।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৮. আর আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে জুড়ে রাখুন, যারা নিজেদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে[১] এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে নেবেন না[২]। আর এমন কারো আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে; আর তার কাজই হচ্ছে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া[৩]।

যে উক্ত বিষয়গুলি পরিবর্তন করতে চায় অথবা এ কিতাবের হক আদায়ে ত্রুটি করে, তার জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর অবাধ্যতাকারীর কোথাও আশ্রয় নেই। হাঁ, আল্লাহর আজ্ঞাবহ বান্দাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর রহমত অসীম-অনন্ত। দেখে নাও, "আসহাবে কাহফ" যারা আল্লাহর হুকুম মান্য করেছিল, তাদের তিনি নিজ রহমতে কীরূপ উত্তম আশ্রয় দান করেছিলেন।

১. অর্থাৎ তারা আল্লাহর দীদার ও সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরম এখলাসের সাথে সর্বদা ইবাদতে রত থাকে। যেমন: যিক্র করে, কুরআন পড়ে, সর্বদা নামায পড়ে, হালাল ও হারামের পার্থক্য করে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের হক আদায় করে, যদিও পার্থিব দিক থেকে তারা ধনী ও সম্মানিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবীদের মধ্যে তখন আম্মার, সুহাইব, বিলাল, ইবনে মাসউদ প্রমুখ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এসব গুণাবলিতে ধন্য ছিলেন। সুতরাং হে নবী! এমন খাঁটি মুমিনদের নিজ সুহবত ও বৈঠকে বসতে দিয়ে উপকৃত করতে থাকুন এবং কারো অনুরোধে আপনার মজলিস থেকে তাদের দূর করবেন না।

২. অর্থাৎ এই গরীব-অসহায় কিন্তু খাঁটি মুসলমানদের পরিত্যাগ করে বড় বড় অহংকারী দুনিয়াদারদের দিকে এই উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দান করবেন না যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলাম ধর্মের বিরাট জাঁকজমক হবে। ইসলামের প্রকৃত মর্যাদা ও সৌন্দর্য পার্থিব বা বস্তুগত ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে না, বরং পরিপক্ক ঈমান ও তাক্ওয়া এবং উন্নত চরিত্র ও মধুর ব্যবহার দ্বারা তা লাভ হয়। দুনিয়ার শান-শওকত নিতান্তই ভঙ্গুর ও ছায়ার ন্যায় ক্ষনস্থায়ী। প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে তাক্ওয়া ও 'তাআল্লুক মাআল্লাহ' (বা আল্লাহর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক)। এর ভাঙ্গনও নেই, পতন বা হ্রাসও নেই। আসহাবে কাহফের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণকারী ও দুনিয়াকামী– উভয় শ্রেণীর পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ যাদের অন্তর দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল এবং সর্বদা প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত, আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থাকা ও রিপুপূজায় অগ্রসর থাকাই যাদের স্বভাব, এমন গাফেলদের কথা আপনি কানে নেবেন না– বাহ্যত ওরা যতই সম্পদশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হোক না কেন।

২৯. আর বলুন, 'সত্য তো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।[১] আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের ঘিরে রাখবে[২]। আর যদি ওরা (পানির জন্য) ফরিয়াদ করে, তবে ওদের পুঁজের ন্যায় পানি দেওয়া হবে, যা (ওদের) চেহারা পুড়ে ফেলবে[৩]। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

শানে নুযূল

হাদীছে আছে, কতিপয় কুরায়শ সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, এ হীন প্রকৃতির লোকগুলিকে (অর্থাৎ গরীব মুসলমানদের) আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিন, যাতে মর্যাদাশালীরা (অর্থাৎ সম্পদশালী কাফেররা) আপনার নিকট বসতে পারে। সম্ভবত হুযূরের অন্তর মুবারকে এ খেয়াল এসেছিল যে, এ গরীবদের স্বল্প সময়ের জন্য মজলিস থেকে আলাদা করে দিলে কী ক্ষতি? তারা তো পরিপক্ক মুসলমান, উপস্থিত কল্যাণ চিন্তা করে তারা এতে দুঃখ পাবে না। পক্ষান্তরে এই সম্পদশালীরা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।

তখন বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১২৭; তাফসীরে তবারী ৯/২৫৯-২৬০) যাতে বলা হচ্ছে যে, আপনি কিছুতেই এই অহংকারীদের কথা মানবেন না। কেননা, এ ফরমায়েশই এ কথা প্রকাশ করছে যে, প্রকৃত ঈমান আনার যোগ্যতা ওদের নেই। সুতরাং কাল্পনিক উপকারের খাতিরে মুখলিসদের উপেক্ষা করার প্রয়োজন কী? তদুপরি ধনী ও গরীবদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহারে সাধারণ লোকদের অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে, আর কয়েক জন অহংকারীর ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতির চেয়ে এই ক্ষতি অনেক বেশি।

১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন কারো মানা না মানায় কিছু আসে যায় না। লাভ বা ক্ষতি যা হবে, তোমাদেরই হবে। সুতরাং মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয় শ্রেণীই নিজ নিজ পরিণাম চিন্তা করে নিক, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

দুনিয়ার সুখ-সম্পদ নিতান্তই ক্ষনস্থায়ী। এর সার্থকতা কেবল তখনই, যখন এটা আখেরাতের সফলতা লাভের মাধ্যম হয়। পার্থিব ধন-সম্পদ সেখানে কোন কাজ দেবে না, বরং এখানে যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের অনেকে সেখানে আরাম-আয়েশে থাকবে।

২. এই বেষ্টনী আগুনেরই হবে।

৩. অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমের কারণে পিপাসা লাগলে ওরা 'পিপাসা', 'পিপাসা' বলে চিৎকার করবে। তখন গাদ কিংবা পুঁজের ন্যায় পানি ওদের দেওয়া হবে, যার প্রচণ্ড উত্তাপে ওদের চেহারা জলে-পুড়ে যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তো যে সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই আমি তার প্রতিদান বিনষ্ট করি না[১]।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩১. এমন লোকদের জন্য রয়েছে বসবাসের উদ্যানসমূহ, তাদের তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরমালা। সেখানে তাদের সোনার বালা পরানো হবে[২] এবং তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমের সবুজ কাপড়[৩]– (আর) সেখানে সুসজ্জিত পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসে থাকবে[৪]। কতই না উত্তম প্রতিদান এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল!

[রুকূ - ৫]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا

৩২. আপনি তাদের নিকট বর্ণনা করুন দু'ব্যক্তির উদাহরণ[৫]: যাদের একজনকে আমি দু'টি

---

১. অর্থাৎ সামান্য থেকে সামান্য সৎকর্মও বিনষ্ট করা হবে না, পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

২. যাতে স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃত ও স্থায়ী সম্পদশালী কারা।

বেহেশতের বালা বা রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, তদ্রূপ বেহেশতের অপরাপর নে'য়ামতের স্বরূপ কী? দুনিয়াতে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। কেননা, আমাদের সম্মুখের জগতে সেসবের কোন পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত বর্তমান নেই।

৩. সম্ভবত তাদের কাপড়ের উপরিভাগ মিহি রেশমের আর নীচের ভাগ মোটা রেশমের হবে। যেমন: সূরা রহমানের আয়াত– بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ থেকে বোঝা যায়। অথবা মিহি ও পুরু উভয় প্রকারের রেশমের কাপড় তারা ব্যবহার করবে।

"মূযিহুল কুরআনে" আছে, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনা ও রেশমী কাপড় পুরুষেরা বেহেশতে লাভ করবে। যারা দুনিয়ায় এ দুই বস্তু ব্যবহার করবে, তারা সেখানে তা পরতে পারবে না।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৩২)

৪. অর্থাৎ খাট-পালঙ্কের উপর বালিশে হেলান দিয়ে অত্যন্ত মর্যাদা ও আরামের সাথে বসে থাকবে।

৫. এটা ধনী কাফের ও গরীব মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার দ্বারা দুনিয়ার ক্ষনস্থায়িত্ব, কুফর ও অহংকারের শোচনীয় পরিণতি এবং ঈমান ও তাক্ওয়ার শুভ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং সে দু'টিকে খেজুর গাছের দ্বারা বেষ্টিত করেছিলাম, আর উভয়ের মাঝে রেখেছিলাম শস্যক্ষেত্র[১]।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগান নিজ নিজ ফল উৎপন্ন করত এবং কোনটি তাতে কিছুই হ্রাস করত না[২]। আর আমি সে দু'টির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছিলাম একটি নহর[৩]।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. সে ফল-ফলাদি লাভ করল[৪]। আর তখন নিজের সঙ্গীকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'আমার ধন-সম্পদও তোমার চেয়ে বেশি এবং দলবলের দিক থেকেও আমি অধিক শক্তিশালী[৫]।

যে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, তারা কি সত্যিই ছিল? না শুধু বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত কল্পনা করা হয়েছে? এ বিষয়ে মুফাসসিরদের উভয় মতই রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক, উদাহরণের উদ্দেশ্য উভয় অবস্থায় পূরণ হয়।

১. অর্থাৎ বাগান দুটির চারপাশে খেজুর গাছের সারি ছিল এবং উভয় বাগানের মধ্যভাগে চাষাবাদের জমি রাখা হয়েছিল, যেন শস্য ও ফল সব কিছুর ব্যবস্থা হয়।

২. অর্থাৎ এমন নয় যে, এক বাগানে ফল এল, দ্বিতীয়টি ফলল না। অথবা কোন গাছে বেশি ফল হল, অন্য গাছে কম।

৩. অর্থাৎ বাগানগুলির মধ্য দিয়ে নহরের পানি সঠিক পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছিল, যাতে মনোরম দৃশ্যের অবতারণা হয় এবং বৃষ্টি না হলেও বাগান ও ক্ষেত শুষ্কতায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৪. অর্থাৎ সে যা ব্যয় করল, তা খুবই লাভজনক হল এবং আরাম-আয়েশের সব রকম উপায়-উপকরণ তার কাছে জমা হল। বিয়ে করলে এর ফলও ভাল হল এবং অনেক সন্তান সে লাভ করল।

৫. অর্থাৎ আমার ধন-সম্পদ ও জনবল উভয়ই অনেক বেশি। শিরকী কাজ-কর্ম করায় আমি যদি বাতিলপন্থী গণ্য হতাম, তবে এত সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতাম না!

সে যে মুশরিক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে তার ক্ষেদোক্তি দ্বারা- يَالَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْ أَحَدًا। তার গরীব সঙ্গীটি পাক্কা তাওহীদবাদী হওয়ায় সম্ভবত শিরকের বাতিল হওয়ার কথা বলেছিল এবং তাকে শিরক থেকে তওবা করতে নসীহত করেছিল। এর

৩৫. আর সে নিজ বাগানে এ অবস্থায় প্রবেশ করল যে, সে নিজের প্রতি অবিচার করছিল[১]। সে বলল, 'আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনো ধ্বংস হবে,

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۟

৩৬. 'এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে বলে আমি মনে করি না। আর যদি আমি (কখনো) স্বীয় রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও, তবে আমি অবশ্যই (সেখানে) এর চেয়ে উত্তম স্থান পাব[২]।'

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۟

৩৭. তাকে তার সঙ্গী উত্তর প্রদান করত বলল, 'তুমি কি সেই সত্তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে; তার পর তোমাকে পরিণত করেছেন পূর্ণাঙ্গ মানবে?

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۟

৩৮. 'কিন্তু (আমি তো বলি,) 'সেই আল্লাহই আমার রব এবং আমি নিজ রবের সাথে কাউকে শরীক করি না[৩]।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۟

উত্তরে সে বলেছিল, 'আমি তোমার চেয়ে ধনে, জনে, সকল বিষয়ে অনেক অগ্রবর্তী। সুতরাং কী করে বিশ্বাস করি যে, আমি বাতিলপন্থী আর তোমার মত গরীব কাঙ্গাল সত্যপন্থী?

১. অর্থাৎ সে শিরকে লিপ্ত ছিল। গর্ব ও অহংকারের নেশায় অন্যদের হেয় জ্ঞান করত, খোদার কুদরত ও পরাক্রমের প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সে এও বুঝত না যে, ভবিষ্যতে কী পরিণাম হবে। হাঁ, এই বাগানই তার জান্নাত ছিল, যাকে সে চিরস্থায়ী মনে করত।

২. অর্থাৎ বর্তমানে আমি আরামে আছি এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা এমন পরিপূর্ণরূপে করে রেখেছি যে, আমার জীবনে এ বাগানগুলি ধ্বংস হওয়ার বাহ্যত কোন আশঙ্কা নেই। রইল মৃত্যুর পরবর্তী ব্যাপার– তো প্রথমতঃ মৃত্যুর পর চূর্ণবিচূর্ণ হাড়গুলো পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর সামনে আমাদের উপস্থিত করা হবে –এসব আমি বিশ্বাসই করি না। আর যদি এমনটা হলই, তবে এখানকার চেয়ে উত্তম সুখ-সম্পদ সেখানে আমার পাওয়া উচিত। আমাদের কার্যকলাপ আল্লাহর নিকট পছন্দ না হলে দুনিয়াতে আমাদের এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কেন দিলেন? অতএব, এখানকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রমাণ করে যে, সেখানেও আমরা আরাম-আয়েশে থাকব।

৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমার উৎস আদম আলাইহিস সালামকে নিষ্প্রাণ মাটি থেকে, তারপর তোমাকে মাটিতে উৎপন্ন বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের নির্যাস ও এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করত জীবন দান করেছেন এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তি-সামর্থ্য দান করে মোটাতাজা পুরুষ

৩৯. 'আর তুমি যখন নিজ বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ যা চান (তাই হয়), আল্লাহর (মদদ) ছাড়া (কারো) কোন শক্তি নেই'[১]? যদিও তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার থেকে কম দেখছ-

وَلَوْ لَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿۳۹﴾

৪০. 'তবে আমি আশা করি যে, আমার রব আমাকে তোমার বাগান থেকে উত্তম কিছু দান করবেন[২] এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে কোন আপদ পাঠাবেন, ফলে তা পরিণত হবে উদ্ভিদশূন্য মসৃণ প্রান্তরে-

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾

৪১. 'অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, অতঃপর তুমি আর তা খুঁজে আনতে পারবে না[৩]।'

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾

৪২. অতঃপর ওর (সমস্ত) ফল ঘিরে ফেলা হল, ফলে ঐ বাগানে সে যে অর্থ ব্যয় করেছিল

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ

বানিয়েছেন- তিনি কি তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে পুনর্জীবিত করতে পারবেন না? অথবা তিনি কি তাঁর দেওয়া নে'য়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন না? আমার তো এহেন আকীদা নেই, বরং আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি একাই আমাদের রব- তাঁর কুদরতের মধ্যে কোন অংশীদার নেই। এ অবস্থায় তাঁর হুকুম, এখতিয়ার ও মহাশক্তির সামনে টু শব্দটি করতে পারে- এমন দুঃসাহস কার থাকতে পারে?

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ তো আল্লাহ প্রদত্ত নে'য়ামত। কিন্তু অহংকার ও কুফরী করলে বিপদ আসে। বাগানে প্রবেশ করার সময় তোমার উচিত ছিল- مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هَذِهِ أَبَدًا এর স্থলে مَاشَاءَ اللهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলা- অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা দান করেন, আমাদের মধ্যে যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য আছে তা তাঁরই দান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

হাদীছে আছে, কেউ যখন নিজ ঘরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবে, তখন এই দুআই পড়বে- مَاشَاءَ اللهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (শুআবুল ঈমান, হাদীস ৪৩৬৯)

২. দুনিয়াতে বা আখেরাতে।

৩. অর্থাৎ একটি উষ্ণ ঘূর্ণি বাতাস প্রবাহিত হবে, কিংবা অন্য কোন আসমানী বিপদ নাযিল হবে, যা গর্ব ও শক্তি প্রদর্শনের শাস্তিস্বরূপ বাগানকে তছনছ করে উদ্ভিদশূন্য সমতল ময়দান বানিয়ে দেবে, অথবা নহরের পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর শত চেষ্টায়ও তা প্রবাহিত হবে না।

عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝

তার জন্য হাত কচলাতে লাগল[১]। আর তা নিজ মাচানসমূহের উপর থুবড়ে পড়েছিল[২] এবং সে বলতে লাগল, 'হায়! কতই না ভাল হত যদি আমি নিজ রবের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম[৩]।'

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

৪৩. এবং আল্লাহ ছাড়া ওর এমন কোন দল হল না যারা ওকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষাকারী হতে পারল না[৪]।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪৪. সেখানে সমস্ত এখতিয়ার পরম সত্য আল্লাহরই। তাঁরই পুরস্কার উত্তম এবং তাঁরই প্রতিদান শ্রেষ্ঠ[৫]।

[রুকূ - ৬]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ

৪৫. আপনি তাদের নিকট বর্ণনা করুন পার্থিব জীবনের একটি দৃষ্টান্ত : (তা) পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর তার কারণে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় ভূমিজ উদ্ভিদ*, তারপর তা এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

---

১. অর্থাৎ আক্ষেপে হাত কচলাতে লাগল।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শেষ পর্যন্ত তার বাগানের উপর তাই নাযিল হল, যা সেই নেক ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। রাতের বেলায় আগুনের আকারে আসমানী বিপর্যয় নেমে এল, সব জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ধন ব্যয় করেছিল তা বাড়ানোর জন্য, এখন মূলধনও হারাল।

৩. কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আক্ষেপ করে কী লাভ। আর এ আক্ষেপ ও অনুতাপও আল্লাহর ভয়ে ছিল না, শুধু পার্থিব ক্ষতি হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছিল।

৪. অর্থাৎ দলবলও কাজে এল না, সন্তানসন্ততিও না, আর না সেই মনগড়া উপাস্যরা, আল্লাহর কুদরতের মধ্যে যাদের অংশীদার সাব্যস্ত করে রেখেছিল। আর নিজের এমন ব্যক্তিগত শক্তিও ছিল না যে, খোদার শাস্তি রদ করতে পারে অথবা প্রতিশোধ নিতে পারে।

৫. অর্থাৎ যে আমলের যে প্রতিফল কাউকে প্রদান করেন, তাই সংগত। দুনিয়া-আখেরাতে– সর্বত্র তাঁরই এখতিয়ার চলে। তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে– এমন সাধ্য কারো নেই।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তার সাথে ভূমিজ উদ্ভিদ মিলেমিশে যায় (ও সজীব হয়ে উঠে)।

الرِّيٰحُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়[১]। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[২]।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

৪৬. ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যমাত্র, আর চিরস্থায়ী নেককর্মসমূহই আপনার রবের নিকট প্রতিদানের বিবেচনায় উত্তম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেও উৎকৃষ্ট[৩]।

১. অর্থাৎ দুনিয়ার সাময়িক বসন্ত এবং ক্ষণস্থায়ী শোভা-সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত এরূপ– যেমনঃ শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ মাটিতে বৃষ্টির পানি পড়ল, ফলে তা সহসাই জীবিত হয়ে উঠল। গাছপালা ও বিভিন্ন তরুলতা ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে উৎপন্ন হল। শস্যশ্যামল ফসলাদির মনোরম দৃশ্য দেখে মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই ফসলের ক্ষেত হলুদ হয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল। পরিশেষে সেই সময় এল, যখন তা কেটে-কুটে যমীন সমান করে ফেলা হল। পরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল।

ঠিক একই অবস্থা দুনিয়ার সৌন্দর্য ও প্রবঞ্চনাকর সাজসজ্জার। কিছুদিন খুব সবুজ-শ্যামল মনে হয়। অবশেষে চূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। অতঃপর একদিন এমন আসবে, যখন সব কেটে-কুটে সমতল ময়দান বানিয়ে দেওয়া হবে– যেমন ৪৭নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে– ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة

২. অর্থাৎ যখন ইচ্ছা, ভূমিকে পুনর্জীবিত করে দেবেন। অথবা অর্থ এই যে, ফসলাদি উৎপন্ন করা এবং চূর্ণ করত তা উড়িয়ে দেওয়া– সব তাঁরই ক্ষমতাধীন।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি প্রভৃতি কাজে আসে না। শুধু সেই সব সৎকর্ম কাজে আসে, যার প্রভাব বা প্রতিদান ভবিষ্যতে স্থায়ী হয়। এক হাদীসে سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله –এই কালিমাগুলিকে باقيات صالحات বলা হয়েছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৮৪০; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস ১০৬১৭; আত্তারগীব, ইবনে শাহীন, হাদীস : ৪৭৭)। এটা মূলত উদাহরণস্বরূপ। অন্যথায় সমস্ত সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত।

"মূযেহুল কুরআনে" আছে, "স্থায়ী সৎকর্ম বলতে বোঝায়- এমন ইলম শিক্ষা দেওয়া, যা জারী থাকে। অথবা কোন নেক প্রথা চালু করে যাওয়া, অথবা মসজিদ, কূপ, সরাইখানা, ফলের বাগান, ফসলের ক্ষেত ওয়াক্‌ফ করে যাওয়া, অথবা সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে নেককাররূপে রেখে যাওয়া প্রভৃতি, যেগুলির বিনিময়ে খোদা তাআলার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ হতে পারে এবং যার বিনিময়ে মানুষ উত্তম আশা করতে পারে। দুনিয়ার ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অন্তরে বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

৪৭. (স্মরণ কর), যেদিন আমি পাহাড়-পর্বতকে সঞ্চালিত করব এবং আপনি ভূপৃষ্ঠকে উন্মুক্ত দেখতে পাবেন[১]। আর আমি তাদের (সকলকে) একত্র করব এবং তাদের একজনকেও ছাড়ব না[২]।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৮. আর তাদের আপনার রবের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। '(তিনি বলবেন), তোমরা আমার নিকট এসে পড়েছ যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অথচ তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত করব না[৩]।'

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۫ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৯. এবং 'আমলনামা' সামনে রাখা হবে। তখন আপনি তাতে যা আছে তার কারণে অপরাধীদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন[৪]। আর ওরা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! এ কেমন 'কিতাব' যে, ছোট বড় কোন আমলই সে

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا

---

১. অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে, পর্বতের ন্যায় বিশাল সৃষ্টিও স্বস্থান থেকে সঞ্চালিত হবে, বরং তার বিশাল ভারী পাথর তুলার মত শূন্যে উড়তে থাকবে। মোটকথা, উঁচু সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে ভূপৃষ্ঠকে উন্মুক্ত, সমতল ময়দান বানিয়ে দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর আদালত থেকে কোন ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের বলা হবে, তোমরা তো কিয়ামত ও আখিরাতকে শুধু গাল-গল্প মনে করতে। আজ সকল দলবল ও সাজসরঞ্জাম ছেড়ে জন্মের সময়ের ন্যায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় আমার কাছে এসে পৌছলে। আর "প্রথমবারে যেমন সৃষ্টি করেছিলাম"–এ কথার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত যে, শরীরে কোন দাগ, আঘাত ইত্যাদি থাকবে না।

হাদীছে আছে, হাশরের মাঠে মোট একশ বিশটি সারি হবে– যার মধ্যে আশিটিই হবে উম্মতে মুহাম্মদীর (অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশ)। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৭২২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৪৫৯– হাদীসটির 'মূলপাঠ' হল : اهل الجنة عشرون ومأة صف-অর্থাৎ জান্নাতীদের একশ বিশটি সারি হবে।)

৪. অর্থাৎ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হবে। তাতে নিজের গোনাহর তালিকা পড়ে অপরাধী এই ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে যে, আজ না জানি কী রকম শাস্তি ভাগ্যে জোটে।

كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

হিসাব না করে ছাড়েনি'। এবং ওরা যা কিছু করেছিল তা সামনে উপস্থিত পাবে[১]। আর আপনার রব কারো প্রতি জুলুম করবেন না[২]।

[রুকূ - ৭]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

৫০. (স্মরণ কর), যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর'। তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সেজদায় পড়ে গেল– সে ছিল জিনদের একজন। সে স্বীয় রবের আদেশ অমান্য করল। তোমরা কি আমার পরিবর্তে ওকে ও ওর বংশধরদের বন্ধু স্থির করছ, অথচ ওরা তোমাদের শত্রু? জালেমদের জন্য এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট[৩]!

---

১. অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আমলও চোখের সামনে বিরাজমান থাকবে এবং প্রত্যেক ছোট-বড় বদী বা নেকী আমলনামার মধ্যে লিখিত থাকবে।

২. 'অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা' অর্থে জুলুম আল্লাহ তাআলার দরবারে চিন্তাই করা যায় না। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিই তো তাঁর মালিকানাধীন। তবুও বাহ্যত যা জুলুম এবং অসমীচীন কাজ বলে মনে হয়, তিনি তাও করেন না। কাউকে বিনা দোষে পাকড়াও করেন না, কারো সামান্য নেকীও বিনষ্ট হতে দেন না, বরং নিজ হেকমত অনুযায়ী নেকী ও বদীর প্রত্যেক বৃক্ষে সেই ফলই ফলান, যা তার শ্রেণীগত স্বভাবের দাবি।

گندم از گندم بروید جو ز جو ÷ از مکافات عمل غافل مشو

(গম থেকে গম ও যব থেকে যবই উৎপন্ন হয়। অতএব 'যেমন কর্ম তেমন ফল'– এ নীতি ভুলে যেয়ো না।)

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তিনি কুফর ও ঈমান, আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া রেখে দিয়েছেন, যেমন বিষ ও বিষনাশকের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। বলা বাহুল্য, পরকালে ভাল মন্দের সেসব বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া দিবালোকের মত প্রকাশিত হয়ে যাবে।

৩. নির্ভরযোগ্য অভিমত এই যে, ইবলীস হল জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত। ইবাদত-বন্দেগীতে উন্নতি করতে করতে ফেরেশতাদের দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই ফেরেশতাদের প্রতি সেজদার যে আদেশ হয়েছে, তা ওর প্রতিও প্রযোজ্য ছিল। তখন ওর আসল রূপ প্রকাশ পেল। সে অহংকার করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে অস্বীকার করল। সে আদমের

৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি ওদের হাযির করিনি এবং স্বয়ং ওদের সৃষ্টিকালেও না। আর আমি এমন নই যে, (এই) বিভ্রান্তকারীদের সহযোগী বানাব[১]।

مَآ اَشۡهَدۡتُّهُمۡ خَلۡقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ اَنۡفُسِهِمۡ ۪ وَمَا كُنۡتُ مُتَّخِذَ الۡمُضِلِّيۡنَ عَضُدًا ﴿۵۱﴾

সামনে মাথা নত করাকে অসম্মানজনক মনে করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ আদম-সন্তানরা নিজেদের রবের স্থলে এ চির শত্রুকেই এবং ওর সন্তানসন্ততি ও অনুসারীদের স্বীয় বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী বানাতে চাচ্ছে। এর চেয়ে বড় অন্যায়, জুলুম ও অবিচার আর কী হতে পারে?

পূর্বে একাধিক স্থানে এ কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, অস্থায়ী দুনিয়ার শান-শওকতে গর্বিত হয়ে আখেরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে যাওয়া শয়তানের কারসাজি ও ষড়যন্ত্রেরই ফল। সে চায় যে, আমরা (মানুষরা) যেন নিজেদের প্রকৃত ও পৈতৃক বাড়ি অর্থাৎ বেহেশতে যেতে না পারি। ওর আসল লক্ষ্য হচ্ছে, বন্ধু সেজে আমাদের থেকে পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়া। সুতরাং মানুষের উচিত, এহেন চালাক শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকা। যারা পার্থিব সুখ-সম্পদ পেয়ে গর্বিত হয়ে যায় এবং দুর্বলদের হেয় জ্ঞান করে, তারা মূলত শয়তানের অনুসরণ করে।

ইবলীসের ফেরেশতাদের জাতিভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয়

যেসব রেওয়ায়াতে ইবলীসকে ফেরেশতাদের জাতিভুক্ত বর্ণনা করা হয়েছে, ইবনে কাছীর (র) সেগুলি উল্লেখ করে লিখেছেন, এগুলির অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা। (আর ইসরাঈলী বর্ণনা বাছ-বিচার ছাড়া গ্রহণ করা যায় না)। বরং গভীর চিন্তা-ভাবনার পর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে (গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হলেই) তা গ্রহণ করা উচিত। আর উক্ত বর্ণনাগুলোর কিছু কিছু বিষয় তো নিশ্চিতরূপে মিথ্যা। কেননা, স্বয়ং কুরআন সেসবকে অস্বীকার করে। অতঃপর ইবনে কাছীর (র) অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন, তা সত্যিই দেখা ও স্মরণ রাখার মত। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে তা লেখা গেল না।

১. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করার সময় আমি শয়তানদের ডাকিনি যে, তোমরা একটু এসে দেখে যাও– ঠিক হয়েছে, না কিছু উঁচুনিচু রয়েছে। মোটকথা, জগত সৃষ্টির ব্যাপারে ওদের থেকে কোন পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি, কোন সাহায্যও নেওয়া হয়নি। বরং পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় তো ওদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। স্বয়ং ওদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও ওদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে, তোমাদের কী রকম বানানো উচিত? এবং অন্যদের সৃষ্টি করার সময় ওদের বলা হয়নি যে, তোমরা একটু এসে আমাকে সাহায্য কর। আর ধরে নাও, আল্লাহ যদি সাহায্য নিতেন এবং কাউকে সহযোগী বানাতেন, তবুও কি এই বদবখ্ত হতভাগাদের বানাতেন? যারা মানুষকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে? খোদাই জানেন তা সত্ত্বেও লোকেরা নিজেদের রবকে ছেড়ে ওদের কেন বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাতে শুরু করল- سُبۡحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا۝

৫২. (স্মরণ কর,) যেদিন তিনি বলবেন, 'আমার শরীকদের ডাক[১], যাদের তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে। অতএব ওরা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝে রেখে দেব এক ধ্বংসস্থল[২]।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا۝

৫৩. এবং অপরাধীরা আগুন দেখতে পাবে। তখন বুঝে নেবে যে, ওরা তাতে পতিত হবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না[৩]।

[রুকূ - ৮]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۝

৫৪. নিশ্চয় আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য নানাভাবে বর্ণনা করেছি প্রতিটি উদাহরণ*, কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি কলহপ্রিয়[৪]।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ

৫৫. যখন মানুষের নিকট হেদায়েত এসে গিয়েছে, এরপরও তাদেরকে ঈমান আনা থেকে ও স্বীয়

---

১. অর্থাৎ যাদেরকে আমার অংশীদার মনে করতে তাদের ডাক, যাতে এ বিপদের সময় তোমাদের সাহায্য করে।

২. তখন বন্ধুত্বের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে– একে অন্যের কাছেও যেতে পারবে না। কাজে আসা তো দূরের কথা, উভয়ের মধ্যে বিরাট ও গভীর অগ্নি-খাদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। (আল্লাহ আমাদের পানাহ দিন)।

৩. অর্থাৎ প্রথমে হয়ত ক্ষমার কিছুটা আশা করবে। কিন্তু জাহান্নাম দেখামাত্রই বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, এখন এতে পতিত হতে হবে, পালানোর কোনো পথ নেই।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অতি উপকারী নানা বিষয়'।

৪. অর্থাৎ পবিত্র কুরআন বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে ও নানা রকম দলীল-প্রমাণ ও উপমা-উদাহরণ দ্বারা সত্য বিষয় বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ এমনি ঝগড়াপ্রিয় যে, সুস্পষ্ট ও সরল বিষয়গুলির ব্যাপারেও অযথা তর্কবিতর্ক করতে থাকে। আর যখন যুক্তি-প্রমাণের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অযৌক্তিক ও অহেতুক ফরমায়েশ শুরু করে দেয় যে, অমুক জিনিস দেখাতে পারলে মানব।

جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কেবল এ প্রতীক্ষাই বিরত রেখেছে যে, তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হোক পূর্ববর্তীদের রীতি, অথবা আযাব তাদের সামনাসামনি এসে উপস্থিত হোক[১]।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি রাসূলগণকে কেবল সুসংবাদদানকারী ও ভীতি-প্রদর্শনকারীরূপেই পাঠিয়ে থাকি[২]। আর কাফেররা অন্যায়ভাবে বিতর্ক করে, যাতে তার দ্বারা সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে[৩]। আর ওরা আমার আয়াতগুলিকে এবং ওদেরকে যার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তাকে ঠাট্টার বস্তু বানিয়েছে[৪]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ

৫৭. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা হয়েছে, কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং সে নিজ হাতে যা কিছু অগ্রিম পাঠিয়েছে তা ভুলে গিয়েছে[৫]? বস্তুত আমি

---

১. অর্থাৎ ওদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতা দৃষ্টে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কুরআনের ন্যায় মহান হেদায়েত পৌঁছে যাওয়ার পরও ঈমান না আনার ও তওবা না করার কোন যুক্তিযুক্ত ওজর ওদের নিকট নেই। সত্য গ্রহণ করতে এখন দেরী কেন? তবে কি ওরা এর অপেক্ষায় আছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় আল্লাহ তাআলা ওদের সমূলে ধ্বংস করে দিক? আর ধ্বংস না করলেও কমপক্ষে বিভিন্ন আকারে খোদায়ী আযাব এসে চোখের সামনে উপস্থিত হোক? هكذا يفهم من ابن كثير وغيره (ইবনে কাছীর ও অন্যান্য তাফসীরগ্রন্থ থেকে এ রকমই বোঝা যায়।) হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ওরা এ ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করছে না যে, পূর্ববর্তীদের ন্যায় ধ্বংস হবে অথবা কিয়ামতের আযাব নিজ চোখে দেখবে।'

২. তাঁদের এ ক্ষমতা নেই যে, তোমরা চাইলেই অথবা তাঁরা ইচ্ছা করলেই আযাব উপস্থিত করে দেবেন।

৩. অর্থাৎ মিথ্যা এবং অযথা তর্কবিতর্ক করে ওরা সত্যের আওয়াজকে নিচু এবং মিথ্যার জোরে সত্যকে ব্যাহত করে দিতে চায়। কিন্তু এমনটি কখনো করতে পারবে না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর কালামের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং যে আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়, তা নিয়ে হাসি-তামাসা করে।

৫. অর্থাৎ ভুলেও কখনো এ খেয়াল হয়নি যে, সত্যের প্রত্যাখ্যান, তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি যেসব সঞ্চয় ভবিষ্যতের জন্য পাঠাচ্ছে, তার শাস্তি কী?

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

এমন লোকদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যাতে ওরা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং ওদের কানের মধ্যে রেখে দিয়েছি বধিরতা। আর যদি আপনি ওদের সুপথের দিকে আহবান করেন, তবুও কখনো পথে আসবে না[১]।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আপনার রব বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়। তিনি যদি ওদের কৃতকর্মের কারণে ওদের পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে সত্বর ওদের উপর আযাব আপতিত করতেন[২]। বস্তুত, ওদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে বাঁচার কোন আশ্রয়স্থল ওরা পাবে না[৩]।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. আর সেইসব জনপদ(-বাসীদের) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যখন ওরা জুলুম করেছে। আর আমি ওদের ধ্বংসের জন্য স্থির করেছিলাম একটি নির্ধারিত সময়[৪]।

---

১. অর্থাৎ বাতিলের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক এবং সত্যের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে আমি ওদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি এবং কানের মধ্যে ছিপি ঢুকিয়ে দিয়েছি। অতএব ওরা সত্য শুনতেও পায় না, বুঝতেও পারে না– ফলে সত্যের প্রতি মনোযোগী হবে কী করে এবং পরিণামের চিন্তাই বা করবে কী করে? এহেন হতভাগাদের পক্ষে পথে আসার কোন আশা করা যায় না।

২. অর্থাৎ ওদের কার্যকলাপ তো এমন যে, আযাব আসতে এক মুহূর্ত দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সহনশীলতা ও দয়াদ্রতা তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস সাধনে বাধাস্বরূপ। তিনি তাঁর সাধারণ দয়াগুণে একটি সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করে থাকেন এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অপরাধীকেও সুযোগ দেন, যাতে তওবা করে পিছনের গোনাহ-খাতা মাফ করিয়ে নিতে পারে এবং ঈমান এনে পরম রহমতের অধিকারী হতে পারে।

৩. অর্থাৎ আযাব আসতে এই যে দেরি, তা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। সেই সময়টি আসার পূর্বে কোন অপরাধীর এদিক-সেদিক পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন সময় আসবে, সকলেই বন্দী হয়ে চলে আসবে।

৪. অর্থাৎ আদ ও ছামূদ (প্রমুখ) জাতির বস্তীসমূহ, যাদের ঘটনাবলি প্রসিদ্ধ, দেখে নাও এবং চিন্তা কর যে, জুলুম করার কারণে নির্ধারিত সময়ে কীভাবে ওদের ধ্বংস ও বরবাদ করা হয়েছিল। অনুরূপ, তোমাদেরও ভয় করা উচিত যে, সময় এসে গেলে আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমরাও রক্ষা পাবে না।

[রুকূ - ৯]

৬০. (স্মরণ কর), যখন মূসা নিজের খাদেমকে বললেন, 'আমি চলতে থাকব যতক্ষণ না দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাই, নতুবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব[১]।	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا۝

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বে (আয়াত ২৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকারী কাফেররা দরিদ্র মুসলমানদের হেয় ভাবার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনার নিকটে এদের থাকতে না দিলে আমরা আপনার কাছে আসব। এতে আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তির ঘটনা শোনালেন। তারপর দুনিয়ার উদাহরণ এবং গর্ব ও অহংকারের কারণে ইবলীসের ধ্বংস হওয়ার কথা বয়ান করলেন। এখন মূসা ও খিযিরের কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে, যার শিক্ষা এই যে, আল্লাহওয়ালাগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম হলেও নিজেদের উত্তম বলেন না। আর কদাচিৎ ভুলে বলে ফেললে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁদের সতর্ক-সাবধান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

হাদীছে আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একদা স্বজাতিকে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী ওয়াজ-নসীহত করেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, "হে মূসা! পৃথিবীর বুকে আপনার চেয়ে বড় আলেম কেউ আছে বলে জানেন কি?" তিনি বললেন, "না।"

এই উত্তর আসলে ঠিকই ছিল। কেননা, মূসা (আ) শীর্ষস্থানীয় পয়গম্বরদের অন্যতম বলে তাঁর যুগে শরী'য়তের ইলম তাঁর চেয়ে বেশি কারও থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর উত্তরের ভাষা পছন্দ হয়নি। যদিও অর্থ ঠিকই ছিল, তবুও উত্তরের ভাষার ব্যাপকতা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, পৃথিবীর বুকে তিনি সকল দিক দিয়ে নিজেকে মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করেন। আল্লাহর মর্যি এই ছিল যে, তিনি বিষয়টি আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের হাওয়ালা করে দিয়ে এভাবে বলতেন যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মকবূল অনেক বান্দা রয়েছে, আর সকলের অবস্থা (জ্ঞান ইত্যাদিতে) তিনিই ভাল জানেন।

তখন মূসা (আ)-এর নিকট ওহী আসল যে, যেখানে দুই সাগর মিলিত হয়েছে, সেখানে আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭২৬)

এই দুই সাগর বলতে কোন্ কোন্‌টি উদ্দেশ্য? কেউ কেউ বলেছেন, পারস্য সাগর ও ভূমধ্য সাগর। কিন্তু এ দুটি কোথাও মিলিত হয়নি। তবে হতে পারে, মিলনস্থল বলতে নিকটবর্তিতা উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, আফ্রিকার দুই সাগর উদ্দেশ্য। কোন কোন আলেমের নিকট مجمع البحرين হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে গিয়ে দজলা ও ফুরাত নদী পারস্য উপসাগরে পতিত হয়েছে।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর তাঁরা যখন দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, আর সেটি সাগরে নিজের জন্য সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি করে নিল[১]।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর যখন তাঁরা (সেই স্থান) অতিক্রম করে গেলেন, মূসা নিজ খাদেমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা আন, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি[২]।'

যা হোক, মূসা (আ) সেই জ্ঞানী ব্যক্তির পূর্ণ ঠিকানা জানতে চেয়ে দরখাস্ত করলেন, যাতে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে কিছু ইলমী ফায়দা হাসিল করতে পারেন। তখন হুকুম হল, তাঁর তালাশে বের হলে সঙ্গে একটি ভাজা মাছ নিয়ো। যেখানে পৌঁছে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই সেই বান্দা আছে বলে বুঝবে। এভাবে مجمع البحرين দ্বারা যে বিস্তীর্ণ এলাকা উদ্দেশ্য হতে পারত, তাতে কাঙ্ক্ষিত স্থানটি কোথায়– তা নির্ধারনের জন্যই এই আলামত সাব্যস্ত করে দেওয়া হল।

মূসা (আ) উল্লিখিত হেদায়েত অনুযায়ী তাঁর বিশিষ্ট খাদেম হযরত ইউশাকে সঙ্গে নিয়ে সফর শুরু করলেন এবং ইউশাকে বললেন, মাছটির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। লক্ষস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি অবিরাম চলতেই থাকব। এমনকি, বছর বা যুগ অতিবাহিত হতে থাকলেও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সফর অব্যাহত থাকবে।

বি. দ্র. فتٰه বলতে হযরত ইউশা উদ্দেশ্য, যিনি প্রথমে মূসা (আ)-এর খাদেম ছিলেন। অতঃপর তাঁরই সময়ে পয়গম্বর এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফা হয়েছিলেন।

১. সেখানে একটি বিরাট পাথরের নীচ দিয়ে আবে হায়াতের ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছিল, তারই নিকটে হযরত মূসা (আ) ঘুমাচ্ছিলেন। ইউশা (আ) দেখলেন কী, ভাজা মাছটি আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে গেল এবং ঝুড়ি থেকে বের হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ বানিয়ে চলে গেল। আর পানির মধ্যে আল্লাহর কুদরতে একটা থাক মত রয়ে গেল। এ ঘটনা দেখে ইউশা বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং মূসা (আ) সজাগ হলে তাঁকে বলবেন বলে ভাবলেন। তিনি জাগ্রত হলে উভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন, কিন্তু বিবিধ চিন্তায় পড়ে ইউশা ঘটনাটি বলতে ভুলে গেলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, মূসা আলাইহিস সালাম যখন খাদেমকে মাছটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে বলেছিলেন, তখন তিনি বলে ফেললেন, এ কোন বড় কাজ নয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭২৬) এ জন্যই সতর্ক করা হল যে, ছোট থেকে ছোট কাজেও মানুষকে শুধু নিজের নফসের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।

২. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এতক্ষণ ক্লান্ত হননি। যখন লক্ষ্যস্থল অতিক্রম করে যেতে লাগলেন, তখন পথ চলতে ক্লান্তি বোধ করলেন।

৬৩. সে বলল, 'আপনি কি জানেন, আমরা যখন পাথরটির নিকট বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গেলাম এবং শয়তানই আমাকে তার কথা বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে[১]। আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে নিজের পথ তৈরি করে নিল।'

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ۝

৬৪. মূসা বললেন, 'ঐ স্থানটিই তো আমরা অন্বেষণ করছিলাম।' অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে গেলেন[২]।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

৬৫. এবং (সেখানে) আমার বান্দাদের এক বান্দাকে পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে (বিশেষ) রহমত দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম বিশেষ এক ইলম[৩]।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

---

১. অর্থাৎ আসল কাজের কথা ভুলে যাওয়া এবং যথাস্থানে স্মরণ না হওয়া শয়তানের প্ররোচনারই ফল।

২. সম্ভবত সেখানে তৈরি রাস্তা ছিল না, এ জন্য নিজেদের পদচিহ্ন দেখে দেখে পিছনে ফিরে গেলেন।

৩. সেই বান্দা ছিলেন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম, যাঁকে আল্লাহ তাআলা খাস রহমত দ্বারা ধন্য এবং সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কীয় জ্ঞানের বিশেষ অংশ দান করেছিলেন।

হযরত খিযির কি নবী বা রাসূল ছিলেন?

হযরত খিযিরকে রাসূল বলা হবে, না নবী, নাকি বলা হবে যে, তিনি কেবল একজন ওলী ছিলেন– এ নিয়ে মতভেদ আছে। এ ধরনের জটিল বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা এখানে করা সম্ভব না। তবু অধমের অভিমত এই যে, তাঁকে নবী স্বীকার করা উচিত। আর কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের যেমন ধারণা, যে সকল নবী নতুন শরী'য়ত নিয়ে আসেন না, তাঁদেরকেও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রচলিত শরী'য়তের কোন সাধারণ বিধানকে সীমাবদ্ধ করা বা শর্তহীন বিধানকে শর্তযুক্ত করা বা সাধারণ মূলনীতিভুক্ত শাখা-প্রশাখা থেকে কোন কোন শাখাকে ব্যতিক্রম করার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়। হযরত খিযিরও এ ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।

উভয়ের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

যা হোক, মূসা (আ) খিযিরের সাক্ষাৎ লাভ করলেন এবং সালাম বিনিময়ের পর খিযির (আ) সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। মূসা (আ) আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন। খিযির

৬৬. তাঁকে মূসা বললেন, 'আমি কি এ উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি যে, আপনাকে যে ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আমাকে তা থেকে কিছু কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেবেন[১]?'

قَالَ لَهٗ مُوْسٰی هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤی اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۝۶۶

৬৭. তিনি বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِیَ صَبْرًا۝۶۷

৬৮. 'আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেনই বা কীভাবে, যার সম্বন্ধে আপনি পুরাপুরি অবহিত নন[২]?'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا۝۶۸

৬৯. মূসা বললেন, 'আপনি ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না[৩]।'

قَالَ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِیْ لَكَ اَمْرًا۝۶۹

বললেন, 'হে মূসা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কথা এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন জ্ঞান (সৃষ্টিসম্পর্কিত জ্ঞান) আমাকে দান করা হয়েছে, যা (সেই পরিমাণে) আপনাকে দান করা হয়নি। আর আপনাকে এমন এক ইলম (শরীয়তের ইলম) প্রদান করা হয়েছে, যা (এত বেশি) আমাকে দেওয়া হয়নি। অতঃপর সমুদ্র থেকে পানি পানরত একটি পাখী দেখিয়ে বললেন, আমার ও আপনার বরং সমগ্র সৃষ্টিজীবের সমস্ত জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ততটুকুই, যতটুকু পানিবিন্দু সমুদ্র হতে এই পাখীর মুখে লেগেছে। (এই উদাহরণটিও শুধু বোঝানোর জন্য, নতুবা অসীমের সঙ্গে সসীমের কোন তুলনাই হতে পারে না।) [সহীহ বুখারী, হাদীস ১২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৮০]

১. অর্থাৎ অনুমতি হলে কয়েক দিন আপনার সাথে থাকি এবং আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছে তার কিছু অংশ অর্জন করি।

২. মূসা আলাইহিস সালামের স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবন করে হযরত খিযির বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে মিল হবে না। কেননা, সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান লাভ করে সেই অনুযায়ী আমল করতে খিযির আদিষ্ট ছিলেন, আর মূসা আলাইহিস সালাম যে ইলমের বাহক ছিলেন তার সম্পর্ক ছিল শরী'য়তের বিধি-বিধান ও মূলনীতির সঙ্গে। কাজেই যে সকল ঘটনায় বিশেষ কারণে শরীয়তের সাধারণ নীতিমালা পালিত হবে না, সে সকল ক্ষেত্রে হযরত মূসা নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে খিযিরকে অবশ্যই ধর-পাকড় করবেন এবং চুপ থাকার নীতির উপর বেশি সময় টিকতে পারবেন না। অবশেষে ফল এই দাঁড়াবে যে, তাঁদের পৃথক হতে হবে।

৩. এই ওয়াদা করার সময় খুব সম্ভব মূসা আলাইহিস সালাম কল্পনাও করতে পারেননি যে, খিযিরের ন্যায় নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা দ্বারা এমন কোন আচরণ ঘটবে, যা স্পষ্টত তাঁর শরী'য়ত বরং অন্যান্য সকল শরী'য়ত ও সাধারণ নৈতিকতার খেলাফ। ভাগ্যিস তিনি

৭০. তিনি বললেন, 'আচ্ছা, যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তবে আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে আপনার নিকট তার আলোচনা করি[১]।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعۡتَنِیۡ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِیۡ عَنۡ شَیۡءٍ حَتّٰۤی اُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرًا ﴿۷۰﴾

[রুকূ - ১০]

৭১. অতঃপর তাঁরা চললেন। একসময় যখন তাঁরা একটি নৌকায় আরোহন করলেন, তিনি তা বিদীর্ণ করে দিলেন। মূসা বললেন, 'আপনি কি এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এটা বিদীর্ণ করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি এক গুরুতর কাজ করলেন*[২]।'

فَانۡطَلَقَا حَتّٰۤی اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیۡنَۃِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقۡتَهَا لِتُغۡرِقَ اَهۡلَهَا ۚ لَقَدۡ جِئۡتَ شَیۡـًٔا اِمۡرًا ﴿۷۱﴾

৭২. তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?'

قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ مَعِیَ صَبۡرًا ﴿۷۲﴾

৭৩. মূসা বললেন, 'আমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেল তার কারণে আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার বিষয়ে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না[৩]।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِیۡ بِمَا نَسِیۡتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِیۡ مِنۡ اَمۡرِیۡ عُسۡرًا ﴿۷۳﴾

'ইনশাআল্লাহ' বলেছিলেন, নতুবা একটি অকাট্য ওয়াদা ভঙ্গ করা তাঁর ন্যায় পয়গম্বরের পক্ষে অসমীচীন হত।

১. অর্থাৎ কোন বিষয় বাহ্যত শরীয়তপরিপন্থী মনে হলেও, আমি নিজে আলোচনা না করা পর্যন্ত আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'গর্হিত কাজ করলেন।

২. যখন তাঁরা এ নৌকায় চড়তে গেলেন, মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পেরে তাঁদের বিনা পয়সায় উঠিয়ে নিল। এখন অনুগ্রহের বিনিময়ে এই ক্ষতি করতে দেখে মূসা (আ) খুবই বিস্মিত হলেন। অবশ্য নৌকা তীরের নিকটবর্তী হওয়ার পরই তিনি তা বিদীর্ণ করেছিলেন, ফলে আরোহীরা ডুবে মরা থেকে রক্ষা পায়।

আর 'বিদীর্ণ করা' বলতে, একটি তক্তা খুলে ফেললেন। এভাবে নৌকাটি দোষযুক্ত করে দিলেন।

৩. অর্থাৎ মূসা (আ) বললেন, আমার ভুল-ত্রুটিতে যদি ধর-পাকড় করেন, তবে আপনার সঙ্গে আমার থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে।

৭৪. অতঃপর তাঁরা আবার চললেন। এক সময় যখন তাঁরা একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তিনি তাকে মেরে ফেললেন[১]। মূসা বললেন, 'আপনি কি কোন প্রাণ (হত্যার অপরাধ) ছাড়া একটি নিষ্পাপ প্রাণ[২] হত্যা করে ফেললেন? নিশ্চয়ই আপনি বড় অন্যায় কাজ করলেন[৩]।'

فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

পারা-১৬

৭৫. তিনি বললেন, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না[৪]?'

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৬. মূসা বললেন, 'এর পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আপনি আমার দিক

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ

হযরত মূসা (আ) এর এই প্রথম জিজ্ঞাসাটি ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয়টি ছিল স্বীকারোক্তি হিসাবে এবং তৃতীয়টি ছিল বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

১. এক গ্রামের নিকট কয়েকটি ছেলে খেলছিল। তাদের মধ্যে যে ছিল বেশি সুন্দর ও চালাক-চতুর, তাকে ধরে মেরে ফেললেন এবং পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭২৬)। কোন কোন রেওয়ায়াতে তার নাম 'জয়সূর' উল্লেখ করা হয়েছে।

ছেলে কি বালেগ ছিল, না নাবালেগ? কেউ কেউ বালেগ বলেছেন, আর 'গোলাম' শব্দটি বালেগ নয় বলে প্রমাণ করে না। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সে নাবালেগই ছিল। والله أعلم

২. শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্পাপই থাকে। এ শব্দটি বাহ্যত তার নাবালেগ হওয়াকেই সমর্থন করে, যদিও অন্যদের জন্য (যারা বালেগ বলেছেন) এক্ষেত্রে 'তাবীল' অর্থাৎ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

৩. অর্থাৎ প্রথমত- সে নাবালেগ হওয়ায় কেসাসরূপেও তাকে হত্যা করা যায় না। তদুপরি, এখানে কেসাসের কোন ব্যাপারও ছিল না। অতএব তার প্রাণনাশের চেয়ে গুরুতর অন্যায় ও অযৌক্তিক কাজ আর কী হতে পারে?

৪. কারণ, এমন এমন অবস্থা ও ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে, যেগুলো দেখে আপনি নীরব থাকতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত তা-ই হল।

مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ۝

থেকে ওজরের (শেষ সীমায়) পৌঁছে গেছেন[১]।'

فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ اِۨسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

৭৭. অতঃপর তাঁরা আবার চললেন। এক সময় তাঁরা যখন এক জনপদবাসীদের নিকট পৌঁছলেন, তাঁরা সেই জনপদবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তাঁরা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর পেলেন। তিনি তা সোজা করে দিলেন[২]। মূসা বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য অবশ্যই পারিশ্রমিক নিতে পারতেন[৩]।'

---

১. হযরত মূসা (আ) আন্দাজ করে ফেলেছিলেন যে, খিযিরের বিস্ময়কর অবস্থা ও কর্মকাণ্ড চুপচাপ দেখতে থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এজন্য শেষ কথা বলে দিলেন যে, আবার যদি প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর নিজের সঙ্গে রাখবেন না। এতে আপনার কোন দোষ হবে না এবং আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কোন অভিযোগও উঠবে না। কেননা, তিনবার সুযোগ দিয়ে আপনি আমার অভিযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ এক লোকালয়ে পৌঁছে তার বাসিন্দাদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং চাইলেন যে, তারা যেন মেহমান মনে করে তাঁদের খানা খাওয়ায়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, মূসা ও খিযিরের ন্যায় মকবূল বান্দাদের মেহমানদারী করতে তারা অস্বীকার করল। এহেন আচরণ ছিল তাদের মনের সংকীর্ণতা ও অভদ্রতার বহিঃপ্রকাশ। এজন্য রাগান্বিত হওয়ারই কথা। কিন্তু হযরত খিযির উল্টো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সেই লোকালয়ে একটি বিরাট দেওয়াল ঝুঁকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং লোকেরা তার পাশ দিয়ে চলাচল করতে ভয় করত। হযরত খিযির নিজ হাতে তা সোজা করে দিলেন এবং ভূমিসাৎ হওয়া থেকে তা রক্ষা করলেন।

বি. দ্র. إذا اتيا قرية (তারা যখন এক জনপদে এলেন)– না বলে বলা হয়েছে– أتيا أهل قرية (জনপদবাসীর নিকট এলেন)। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা কেবল সেই জনপদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন অথবা লোকদের থেকে পৃথক কোন সরাইখানায় গিয়ে উঠেছিলেন –এমন নয়। বরং তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে জনপদবাসীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। আর إستطعما أهلها আয়াতাংশে أهل শব্দটির পুণরাবৃত্তি তাদের হীনতা প্রকাশার্থে করা হয়েছে, অর্থাৎ যাদের নিকট মেহমানদারী আশা করা হয়েছিল, তারা সেখানকারইবাসিন্দা ছিল, বহিরাগত ছিল না যে, বলবে– 'আমাদের বাড়ি এখানে নয়, আমরা কী করে মেহমানদারী করব?'

৩. অর্থাৎ জনপদবাসীরা মেহমানদের মর্যাদা রক্ষা করল না। সুতরাং তাদের দেয়াল বিনা পয়সায় মেরামত করে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? কিছু পারিশ্রমিক নিলে আমাদের

৭৮. তিনি বললেন, '(ব্যস্), এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ- (এর সময়)। আমি আপনাকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি- যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, তার তাৎপর্য[১]।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞

৭৯. সেই যে নৌকাটি- তা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, যারা দরিয়ায় কাজ করত[২]। আমি তা ক্রটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে জোর করে প্রত্যেক (ভাল) নৌকা নিয়ে নিত[৩]।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۞

৮০. আর বালকটি- তার মাতা-পিতা ছিল ঈমানদার। আমার আশঙ্কা হল যে, সে তাদের অবাধ্যতা ও কুফরীতে লিপ্ত করে ফেলবে[৪]।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۞

পানাহারের ব্যবস্থা হত এবং এই সংকীর্ণহৃদয় কৃপণদের সতর্ক হওয়ার কিছুটা সুযোগ হত। হয়ত তারা নিজেদের অসদ্ব্যবহার ও অভদ্রতার জন্য লজ্জিত হত।

১. অর্থাৎ ওয়াদা মত এখন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, আমার সঙ্গে আপনার সহাবস্থান হতে পারে না। তবে পৃথক হওয়ার পূর্বে এসব ঘটনার গুপ্ত রহস্য আপনাকে বলে দিতে চাচ্ছি, যেগুলি দেখে আপনি আত্মসংবরণ করতে পারেননি।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এবার মূসা (আ) বিদায় নেওয়ার জন্যই জেনেশুনে প্রশ্ন করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, খিজির এর জ্ঞান আমার ধাতের নয়। হযরত মূসা এমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যার অনুসরণে মানুষের মঙ্গল। পক্ষান্তরে, হযরত খিযিরের জ্ঞানের অনুসরণ অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

২. অর্থাৎ তারা সাগরে কাজ করে আয়-রোজগার করত।

৩. অর্থাৎ যেদিকে নৌকা যাচ্ছিল, সেদিকে এক জালেম রাজা ছিল, যে ভাল নৌকা দেখলেই ছিনিয়ে নিত, অথবা নিজ দখলে নিয়ে তা বেগার খাটাত। তাই আমি তা ক্রটিযুক্ত করে দিলাম, যাতে উক্ত জালেমের হাত থেকে নৌকাটি নিরাপদ থাকে এবং ভাঙ্গা দেখে তা না আটকায়। -কোন কোন বর্ণনায় আছে, বিপদের স্থান অতিক্রম করে যাওয়ার পর হযরত খিযির নিজ হাতে নৌকাটি মেরামত করে দেন। (তাফসীরে তবারী ১৫/৩২৬)

৪. যদিও স্বভাবগতভাবে প্রত্যেক শিশু মুসলমান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশ ও পারিপার্শিকতার মন্দ প্রভাবে বাল্যকালেই কোন কোন শিশুর বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যায়- যার

পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই হয়। তবুও তার কিছু লক্ষণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ দেখতে পান। এ ছেলে সম্বন্ধেও আল্লাহ তাআলা হযরত খিযিরকে জানিয়ে দিলেন যে, ওর ভিত নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং বড় হলে সে দুরাচারী হবে এবং পিতামাতাকেও ডোবাবে– এর মহব্বতে তারা কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং বালকটির মৃত্যু তার পিতামাতার জন্য রহমত ও তাদের ঈমানের হেফাজতের কারণ হবে। আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তার পিতামাতা ঈমানের উপর অবিচল থাকুক এবং তাদের পথ থেকে ভবিষ্যত বাধা দূর হোক। তাই খিযিরকে আদেশ করলেন, বালকটিকে মেরে ফেল। তো তিনি আল্লাহর ওহী পেয়েই তাকে হত্যা করেছেন।

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা বালকটিকে সৃষ্টিই না করতেন? আর সৃষ্টি করলেও এতটা খারাপ না হতে দিতেন? অথবা যেখানে দুনিয়াতে লাখো কাফের বর্তমান, তার পিতামাতাকেও কাফের হতে দিতেন? অথবা যেসব শিশুর ভিত এরূপ মন্দ, পয়গম্বরদের হাতে তাদের সবার লিষ্ট প্রদান করে তাদের কতল করিয়ে দিতেন? আল্লাহ এরূপ করলেন না কেন?

এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২৩)

আর বিস্তারিত উত্তরের জন্য 'ভাল-মন্দের সৃষ্টি' বিষয়ক মাসলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যা এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরে সম্ভব নয়। তবে এতটুকু মনে রাখা দরকার যে, যে বক্তিরই এ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহই 'সব কিছুর খালেক', তিনি 'আলীম' ও 'হাকীম' (সর্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়)– তাকেই সৃষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে এ ধরনের হাজারো প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু কারো নিকট স্বীয় অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ ছাড়া এর আর কোন উত্তর নেই।

আল্লাহর অপার হেকমত মানুষের জ্ঞান-সীমার উর্ধ্বে

আল্লাহ তাআলার অপার হেকমত ও সৃষ্টিসম্পর্কীয় তাৎপর্য যে সবারই নাগালের বাইরে– এস্থলে তারই একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। কখনো কোন ঘটনার বাহ্যরূপ আপাতদৃষ্টিতে মন্দ, দূষণীয় বা অহেতুক বলে মনে হয়, কিন্তু ঘটনার গভীরের জ্ঞান যার রয়েছে, তিনি বুঝতে পারেন যে, এতে অনেক হেকমত নিহিত আছে। খিযির (আ) গরীবদের নৌকার তক্তা ভেঙ্গে ফেললেন, অথচ তারা বিনা পয়সায় তাঁকে নৌকায় তুলে নিয়েছিল। অতঃপর খেলায় রত একটি শিশুকে তিনি মেরে ফেললেন, যা বাহ্যত অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে হচ্ছিল। নিতান্ত অভদ্র ব্যবহারকারী জনপদবাসীদের পতনোম্মুখ দেওয়ালটি সোজা করে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তো, যদি স্বয়ং খিযির আলাইহিস সালাম এই কাজগুলোর রহস্যের ব্যাখ্যা না দিতেন, তবে সকলে আজ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে থাকত অথবা খিযিরকে দোষারোপ করতে থাকত।

এসব উদাহরণ থেকে আল্লাহর কার্যাবলি ও সেগুলোর রহস্য অনুমান করা যেতে পারে।

فَاَرَدْنَاۤ اَنْ یُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا۝٨١

৮১. অতএব আমি চাইলাম যে, তাদের রব তার পরিবর্তে তাদের এমন সন্তান দান করুন, যে হবে পবিত্রতায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং (মা-বাবার প্রতি) ভালবাসায় অগ্রগামী[১]।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ یَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِیْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَیْهِ صَبْرًا۝٨٢

৮২. রইল সেই প্রাচীরটি– তা ছিল সেই শহরের দুই এতীম বালকের, আর তার নীচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিল নেককার। অতএব আপনার রব চাইলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তাদের গুপ্তধন বের করে নিক[২]– আপনার রবের মেহেরবানীতে। আর আমি তা (অর্থাৎ প্রাচীরটি সোজা করে দেওয়া) নিজের মতে করিনি[৩]। আপনি যেসব বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এ হচ্ছে তার তাৎপর্য।

---

১. অর্থাৎ ছেলেটিকে মেরে ফেলার কারণে তার পিতামাতার ঈমান রক্ষা পেল। আর সন্তান হারানোর যে কষ্ট, তার প্রতিকারের জন্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল তাদের এমন সন্তান দান করা, যার চারিত্রিক পবিত্রতা নিহত পুত্রের চেয়ে উন্নত হবে এবং সে পিতামাতার সঙ্গে ভালবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি ও সদ্ব্যবহার করবে।

কথিত আছে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের এক কন্যা দান করেন, যার বিয়ে এক নবীর সঙ্গে হয় এবং তার গর্ভে এক নবীর জন্ম হয়, আর তাঁর মাধ্যমে আবির্ভাব হয় এক নতুন উম্মতের।

২. অর্থাৎ দেয়ালটি পড়ে গেলে এতীমদের যে গুপ্তধন তার নীচে ছিল,তা বের হয়ে পড়ত এবং দুর্বৃত্তরা তা নিয়ে নিত। বালকদের পিতা নেককার ছিলেন। তাঁর পুণ্যের ফলে আল্লাহর ইচ্ছা হল, বালকদের সম্পদের হেফাজত হোক। আমি তাঁরই হুকুমে দেয়ালটি সোজা করে দিলাম, যাতে তারা বড় হয়ে পিতার ভাণ্ডার পেতে পারে।

কথিত আছে, উক্ত ভাণ্ডারে অপরাপর ধন-সম্পদ ছাড়াও একটি স্বর্ণ-ফলক ছিল, যার মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) লেখা ছিল।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে যে কাজ করা জরুরী হল, তার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাজ নয়।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এ ঘটনার শুরুতে হযরত খিযিরের নবুওয়াত ও বেলায়েত সম্বন্ধে আমরা যা কিছু লিখেছি, তা পুনরায় পড়ে নিন। সামনে যুল-কারনাইনের কাহিনী আসছে। এও সেই তিনটি বিষয়ের

[রুকূ - ১১]

৮৩. তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, 'আমি এখনি তোমাদের পড়ে শোনাব তার (কিছু) বৃত্তান্ত।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝

৮৪. আমি তাকে পৃথিবীর বুকে শক্তি-ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ[১]।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝

একটি, যেগুলি সম্পর্কে ইহুদীদের পরামর্শে কুরায়শরা প্রশ্ন করেছিল। 'রূহ' সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর সূরা 'বনী ইসরাঈলে' গত হয়েছে। আসহাবে কাহফের কাহিনী এ সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্মুখে আসছে।

১. এ বাদশাহকে "যুলকারনাইন" (দুই শৃঙ্গ বা প্রান্তধারী) বলার কারণ এই যে, তিনি পৃথিবীর উভয় প্রান্ত (পূর্ব ও পশ্চিম) পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

যুলকারনাইন কে ছিলেন?

কেউ কেউ বলেন, এটা রোম সম্রাট ইসকান্দারের (আলেকজাণ্ডারের) উপাধি ছিল। আর কারো কারো মতে, আরো পূর্বের কোন খোদাভক্ত ও দীনদার বাদশাহর উপাধি। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাঁর "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বিভিন্ন দলীলের আলোকে এই দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভিন্ন বর্ণনা-সমষ্টি দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইন ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সমকালীন এবং ইবরাহীমের দো'য়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বহু অলৌকিক উপায়-উপকরণ দান করেছিলেন, ফলে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সফর ও বিস্ময়কর বিজয় লাভে সমর্থ হন। হযরত খিযির তাঁর ওযীর ছিলেন। সম্ভবত এ জন্যই পবিত্র কুরআনে খিযিরের কাহিনীর পরেই তাঁর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাচীন আরব কবিগণ নিজেদের কাব্যে যুলকারনাইনের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন এবং আরবের হওয়ায় তাঁকে নিয়ে গৌরব করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যুলকারনাইন প্রাগৈতিহাসিক এক মহান আরব বাদশাহ ছিলেন। সম্ভবত তাঁর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বলে অনেকে ইসকান্দারকে (আলেকজাণ্ডার) 'যুলকারনাইন' বলে থাকে।

বর্তমান কালের ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন সেমিটিক আরবদের এমন কিছু মহামর্যাদাশালী সাম্রাজ্যের সন্ধ্যান লাভ করেছে, ইতিহাসের খাতায় যার বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এমনকি কয়েকজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত সম্রাটের নাম পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যেমন: 'হামুরাবী' বাদশাহ, যিনি খুব সম্ভব হযরত ইবরাহীমের সমসাময়িক ছিলেন এবং যিনি দুনিয়ার সর্বপ্রথম আইন প্রণয়নকারী বলে কথিত। তার সংবিধান ব্যবিলনের উঁচু গম্বুজে খোদিত পাওয়া গেছে, যার অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে তার অসাধারণ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয়। –যা হোক, 'যুলকারনাইন' উল্লিখিত বাদশাহদেরই একজন হবেন।

৮৫. তো, সে একটি পথের অনুগামী হল[১]।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۝

৮৬. অবশেষে সে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, সূর্যকে এক কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখল[২] এবং তার নিকট পেল এক সম্প্রদায়। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন! হয় তুমি (তাদের) শাস্তি দেবে, নতুবা তাদের ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে[৩]।'

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَغۡرِبَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِیۡ عَیۡنٍ حَمِئَۃٍ وَّوَجَدَ عِنۡدَهَا قَوۡمًا ؕ۬ قُلۡنَا یٰذَا الۡقَرۡنَیۡنِ اِمَّاۤ اَنۡ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنۡ تَتَّخِذَ فِیۡهِمۡ حُسۡنًا ۝

৮৭. সে বলল, 'যে কেউ অন্যায় করবে, আমরা তাকে শাস্তি দেব। তারপর সে স্বীয় রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

قَالَ اَمَّا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ یُرَدُّ اِلٰی رَبِّهٖ فَیُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّکۡرًا ۝

৮৮. 'আর যে কেউ ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ রয়েছে কল্যাণ। এবং কোন আদেশ দানকালে আমরা তাকে সহজ কথা বলব[৪]।

وَاَمَّا مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالۡحُسۡنٰی ۚ وَسَنَقُوۡلُ لَهٗ مِنۡ اَمۡرِنَا یُسۡرًا ۝

---

১. অর্থাৎ একটি সফর শুরু করলেন।

২. অর্থাৎ সমুদ্র ভ্রমণকারীদের নিকট যেরূপ মনে হয় যে, সূর্য যেন পানি থেকে উদয় হচ্ছে এবং পানির মধ্যেই অস্ত যাচ্ছে– তাঁর নিকটও সেই রকম মনে হল।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যুলকারনাইনের ইচ্ছা হল দুনিয়ার মানব-বসতির শেষ প্রান্ত দেখার। সে মত তিনি পশ্চিমে যেতে যেতে এমন স্থানে পৌঁছলেন, যা ছিল কর্দমাক্ত জলাভূমি– ফলে সেদিকে মানুষ বা নৌকা কোন কিছুর যাতায়াত ছিল না। আল্লাহর রাজ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছতে পারলেন না তিনি।'

৩. রাজা-বাদশাহদের যেমন ভাল-মন্দ উভয়ই করার ক্ষমতা থাকে, তেমনি আমি যুলকারনাইনকে উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করলাম যে, ইচ্ছা করলে সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দিয়ে কুখ্যাত হোক, বা ইচ্ছা করলে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করুক।

অথবা অর্থ এই যে, ওরা কাফের ছিল– আমি যুলকারনাইনকে এ মর্মে ক্ষমতা দিলাম যে, ইচ্ছা করলে ওদের হত্যা করুক, নতুবা প্রথমে ওদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিক। যুলকারনাইন দ্বিতীয়টি অবলম্বন করেন।

৪. অর্থাৎ আখেরাতে সে কল্যাণ লাভ করবে, আর দুনিয়াতে আমি তার সঙ্গে কঠোরতা করব না, বরং তাকে যখন কোন বিষয়ে কোন কথা বলব, তখন নম্রতা ও কোমলতার সাথে কথা বলব। বস্তুত ন্যায়পরায়ন বাদশাহর এ রীতিই থাকে– দুরাচারীদের শাস্তি প্রদান করা, আর ভাল লোকদের সঙ্গে নম্রতা করা। যুলকারনাইন এ রীতিই অবলম্বন করেছিলেন।

৮৯. অতঃপর সে আরেক পথের অনুগামী হল[১]।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৯০. অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল, তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখল, যাদের জন্য আমি তা(-র তাপ) থেকে বাঁচার কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি[২]।

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلٰی قَوۡمٍ لَّمۡ نَجۡعَلۡ لَّهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهَا سِتۡرًا ﴿٩٠﴾

৯১. (যুলকারনাইনের বৃত্তান্ত) এমনই। আর তার কাছে যা কিছু ছিল, সে ব্যাপারে আমি পূর্ণ অবগত[৩]।

كَذٰلِكَ ؕ وَقَدۡ اَحَطۡنَا بِمَا لَدَیۡهِ خُبۡرًا ﴿٩١﴾

৯২. অতঃপর সে (অন্য) এক পথের অনুগামী হল[৪]।

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

---

১. অর্থাৎ পশ্চিমের সফর শেষ করে পূর্ব দিকের সফর শুরু করলেন।

কুরআন-হাদীসে এ কথা সুস্পষ্ট নয় যে, তার এসব সফর দেশ বিজয় ও রাজ্য বিস্তারের জন্য ছিল। বরং হতে পারে যে, নিছক পর্যটনের উদ্দেশ্যেই এসব সফর হয়েছিল এবং ভ্রমণকালে হয়ত তার সাক্ষাত এমন সব সম্প্রদায়ের সাথেও হয়েছিল, যারা তার শাসনাধীন ছিল। কোন কোন সম্প্রদ্রায় তাকে এক শক্তিধর বাদশাহ মনে করে জালেমদের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল। সে মত যুলকারনাইন নিজের অসাধারণ শক্তিবলে জুলুমের দ্বার বন্ধ করে দেন, যেমন সম্মুখে ইয়াজূজ-মাজূজের কাহিনীতে বর্ণিত হবে।

২. অর্থাৎ পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে তিনি এমন এক সম্প্রদায় দেখতে পেলেন, যাদের উপর সূর্যের কিরণ অবাধে পড়ত । তারা সম্ভবত অনগ্রসর বন্যজাতি ছিল। তাদের মধ্যে তখনো ঘরবাড়ি বানানো ও ছাদ নির্মান করার রীতি চালু হয়নি, যেমন বর্তমানেও অনেক যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়।

৩. অর্থাৎ যুলকারনাইনের পূর্ব ও পশ্চিমের অভিযানের অবস্থা তাই ছিল, যা বর্ণনা করা হল। আর তার নিকট যেসব উপায়-উপকরণ ছিল এবং তিনি যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তা সবই আমার সর্বব্যাপী এলেমে রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা সম্ভবত এস্থলে অন্য কিছু বলে থাকবে, কিন্তু প্রকৃত সত্য তাই, যা বলা হল।

কোন কোন মুফাসসির كذلك এর এ অর্থ করেছেন যে, পশ্চিমের জাতিসমূহের সাথে যুলকারনাইন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, পূর্বের জাতিগুলির সঙ্গেও অনুরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। والله أعلم

৪. এই তৃতীয় অভিযানটি পূর্ব ও পশ্চিম ছাড়া অন্য কোন দিকে ছিল। মুফাসসিরগণ সাধারণত একে উত্তর দিকের সফর বলে থাকেন, কিন্তু কুরআন ও হাদীছে এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ بَیۡنَ السَّدَّیۡنِ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا قَوۡمًا ۙ لَّا یَكَادُوۡنَ یَفۡقَهُوۡنَ قَوۡلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. অবশেষে সে যখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌছল, সেগুলির নিকট এমন এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা (তার) কোন কথা বুঝতে পারছিল না[১]।

قَالُوۡا یٰذَا الۡقَرۡنَیۡنِ اِنَّ یَاۡجُوۡجَ وَمَاۡجُوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤی اَنۡ تَجۡعَلَ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿۹۴﴾

৯৪. তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অতএব আমরা আপনাকে কিছু খরচা দেই? যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেন[২]।'

---

১. অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তাঁর সঙ্গীদের ভাষা এরা বুঝত না। আর সম্মুখে তাদের যে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, তা সম্ভবত কোন দোভাষীর মাধ্যমে হয়েছে।

বি. দ্র. এ জাতি ও ইয়াজূজ-মাজূজের মাঝে উক্ত পাহাড় দুটি বাধাস্বরূপ ছিল, যা অতিক্রম করে এদিকে আসা সম্ভব ছিল না। তবে উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি গিরিপথ ছিল। তা দিয়েই ইয়াজূজ-মাজূজরা আসত এবং এই লোকদের উপর লুটপাট করে যেত।

২. যুলকারনাইনের বিপুল সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্য দেখে তাদের মনে হল, তিনি তাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের দ্বার বন্ধ করতে পারবেন। এজন্য তারা বিনয়ের সাথে আরয করল, 'ইয়াজূজ-মাজূজরা' আমারে দেশে অনাচার করে, এখানে এসে ওরা অহরহ খুন-খারাবী ও লুটতরাজ করছে। আপনি দয়া করে আমাদের নিরাপত্তার জন্য ওদের ও আমাদের মাঝখানে কোনো মজবুত অন্তরাল তৈরি করে দিন, এর ব্যয়ভার বহন করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আপনি ইচ্ছা করলে কর বসিয়ে আমাদের থেকে তা আদায় করতে পারেন।

বি. দ্র. ইয়াজূজ-মাজূজ কারা? কোন্ দেশে তাদের বাস? যুলকারনাইনের নির্মিত লৌহ-প্রাচীর কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমার ধারণা এই যে, (আল্লাহই ভাল জানেন) ইয়াজূজ-মাজূজের জাতি মানুষ ও জিন জাতির মাঝামাঝি এক মাখলুকবিশেষ। কা'ব আহবার যেমন বলেছেন এবং ইমাম নববী তাঁর 'ফাতাওয়া-তে জমহুর উলামায়ে কেরাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাদের বংশধারা পিতার দিক থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মায়ের দিক দিয়ে হযরত হাওয়া পর্যন্ত পৌছায় না। সুতরাং তারা শুধু পিতার দিক থেকে সাধারণ মানুষের ভাই। অসম্ভব নয় যে, তামীম দারী (র) যে 'দাজ্জালে আকবর'-কে বন্দী অবস্থায় এক দ্বীপে দেখতে পেয়েছিলেন, সে এ জাতিরই একজন।

আদম বংশীয় একজন মহিলার (মারয়াম সিদ্দীকার) গর্ভে ফেরেশতার ফুঁকের মাধ্যমে যে মাসীহ আলাইহিস সালামের জন্ম, তিনি যখন আকাশ থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন এই ইয়াজূজ-মাজূজ জাতি দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মাসীহর দো'য়ার বরকতে অস্বাভাবিকরূপে মৃত্যুবরণ করবে।

বর্তমানে এ জাতির অবস্থান কোথায় এবং যুলকারনাইনের লৌহ-প্রাচীরই বা কোথায় অবস্থিত? পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহে উক্ত জাতি ও যুলকারনাইনের লৌহ-প্রাচীরের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তা সামনে রেখে যিনি চিন্তা করবেন, তাঁকে বলতেই হবে যে, লোকেরা নিজেদের মতানুযায়ী এক্ষেত্রে যেসব জাতি, দেশ ও প্রাচীরের কথা বলেছে, সেসবের কোন একটির মধ্যেও উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সবগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের মতামতকে সঠিক বলা যায় না। আর সহীহ হাদীসসমূহকে অস্বীকার করা কিংবা কুরআন-হাদীছের দূরবর্তী তাবীল (ব্যাখ্যা) করা দীনপরিপন্থী কাজ।

তবে বিরোধীরা বলতে পারে, 'আমরা সারা পৃথিবী মন্থন করে ফেলেছি, কিন্তু কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায়নি।' আর বিভিন্ন লেখকগণ এ সন্দেহেরই উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উক্ত সন্দেহের সঠিক উত্তর তাই, যা আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র) দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এ প্রাচীরের অবস্থান কোথায়, তা আমাদের জানা নেই। আমাদের ও তার মাঝে বিরাট বিরাট সাগর থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর আমরা সমগ্র স্থল ও জলভাগ মন্থন করে ফেলেছি –এমন দাবি অবশ্য গ্রহণীয় নয়। এখন থেকে কয়েক শ' বছর পূর্বেও যেরূপ আমরা আমেরিকার মত এক মহাদেশের অস্তিত্ব আছে বলে জানতাম না, তদ্রূপ হতে পারে, আরো একটি মহাদেশ বর্তমান আছে, যেখানে আমরা এখনো পৌছতে পারিনি, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেখানে অথবা সেখানকার বাসিন্দারা আমাদের পর্যন্ত পৌছতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব সমুদ্র-তীরে যে মহাপ্রাচীর অবস্থিত, তার ব্যাপারে বর্তমান কালে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ড. সি এম ইয়ং এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা চলছে। এই প্রাচীর হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ এবং কোন কোন স্থানে বার মাইল প্রশস্ত ও হাজার ফুট উঁচু। এর উপর অগণিত সৃষ্টির বসবাস। যে গবেষক দলকে এ কাজে পাঠানো হয়েছিল, তারা তাদের এক বছরের গবেষণা সমাপ্ত করেছে। এতে সমুদ্রের দুর্লভ ও বিস্ময়কর রহস্যাবলি উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে বিস্ময়ের এক নতুন দিগন্ত, যা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এ অবস্থায় কী করে দাবি করা যায় যে, জল ও স্থলভাগের সমস্ত সৃষ্টিজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমরা অর্জন করে ফেলেছি?

যা হোক, যে সত্যবাদী সংবাদদাতার সততা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তিনি যেহেতু উক্ত প্রাচীরের সংবাদ দিয়েছেন, অতএব এর সত্যতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এখন অপেক্ষা শুধু এমন ঘটনাবলির, যা (একদিন না একদিন) সংঘটিত হয়ে সন্দেহবাদী ও অস্বীকারকারীদের মাথা নত করে দেবে। কবির ভাষায়-

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ÷ ويأتيك بالأخبار مَن لـم تزود

(যে সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ ছিলে, শীঘ্রই কালের আবর্তন তা তোমার সামনে তুলে ধরবে। তোমার কাছে এমন বাহক সংবাদ নিয়ে আসবে, যার রাহ-খরচা তুমি জোগাড় করে রাখনি।)

৯৫. সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন তা-ই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব[১]।

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে সে যখন (পাত রেখে রেখে) দুই পাহাড়ের প্রান্ত বরাবর করে দিল, তখন (লোহার পাতগুলিতে আগুন লাগিয়ে) বলল, 'তোমরা ফুঁ দিতে থাক।' অতঃপর সে যখন তাকে (লৌহ প্রাচীরকে) অগ্নিতে পরিণত করল, তখন বলল, 'আমার নিকট গলিত তামা নিয়ে আস, আমি এর উপর তা ঢেলে দেই[২]।'

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৭. অতঃপর তারা (ইয়াজূজ-মাজূজ) তার উপর আরোহণও করতে পারেনি এবং তাতে ছিদ্রও করতে পারেনি[৩]।

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৮. সে বলল, 'এ আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য[৪]।'

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

---

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ আমার নিকট প্রচুর রয়েছে, তবে কায়িক শ্রম দ্বারা তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

২. প্রথমে লোহার বিরাট বিরাট পাত একটির উপর আরেকটি রাখা হল। যখন সেগুলির উচ্চতা উভয় পাহাড়ের চূড়া বরাবার হয়ে গেল, তখন তিনি লোকদের তাতে আগুন লাগিয়ে খুব করে ফুঁকতে নির্দেশ দিলেন। যখন লোহা আগুনের ন্যায় লাল হয়ে গেল, তখন উপর থেকে গলিত তামা ঢেলে দিলেন, যা লোহার পাতের পরতে পরতে ঢুকে জমে গেল এবং লোহা-তামা সব মিলে-মিশে এক বিরাট পর্বততুল্য হয়ে গেল।

তখনকার যুগে এ সকল কাজ বাহ্যত অস্বাভাবিকরূপে সমাধা হয়ে থাকবে, যাকে যুলকারনাইনের কারামত বলা যায়। আবার এমনো হতে পারে যে, সেই যুগে এমন ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যেত, যার আকার-আকৃতি এখন আমাদের জানা নেই।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইয়াজূজ-মাজূজদের এখনো এই শক্তি দেননি যে, তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে বা ভেঙ্গে এদিকে আসবে।

৪. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতে এ প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়াল এবং তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কায়েম থাকবে।

৯৯. আমি সেদিন তাদের এভাবে ছেড়ে দেব যে, তারা তরঙ্গের মত একে অপরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে সমবেত করব।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

১০০. আর সেদিন দোযখকে পেশ করব কাফেরদের সামনে[১]–

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾

১০১. যাদের চোখ আমার স্মরণ থেকে আড়ালে ছিল এবং ওরা শুনতেও পেত না[২]।

اِلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

সহীহ হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজূজ-মাজূজ বের হয়ে আসবে। তখন উক্ত বাধা হটিয়ে দেওয়া হবে। তারা প্রাচীর ভেঙ্গে এত বিপুল সংখ্যায়

বের হয়ে আসবে যে, তাদের হিসাব আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। দুনিয়াবাসী তাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম হবে। হযরত মাসীহর প্রতি নির্দেশ আসবে, আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যেতে। অবশেষে মাসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে দো'য়ার হাত প্রসারিত করবেন। অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজের উপর একটি গায়বী আপদ আপতিত হবে, ফলে সকলে ধ্বংস হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২২৪০)

বিস্তারিত আলোচনা হাদীছের কিতাবসমূহে 'কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়ে দেখা যেতে পারে।

১. অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজ অগণিত সংখ্যায় সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়বে। অথবা অর্থ এই যে, ভয় ও আতঙ্কের কারণে সমগ্র সৃষ্টিকুল একাকার হয়ে যাবে– মানুষ ও জিন জাতি একে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের বিউগল বেজে উঠবে অর্থাৎ শিঙ্গা ফুঁকা হবে। তারপর সকলকে আল্লাহর সামনে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে। আর দোযখ কাফেরদের চোখের সামনে থাকবে।

এখানে কাফেরদের উল্লেখ বিশেষভাবে এজন্য করা হয়েছে যে, দোযখ মূলত ওদেরই জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর দুনিয়ায় ওদের চোখের উপর পর্দা পড়েছিল। এখন সে পর্দা সরে যাবে।

২. অর্থাৎ তাদের জ্ঞানচক্ষুই ঠিক ছিল না যে, কুদরতের নিদর্শন দেখে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর জিদের কারণে তারা কারো কথাও শোনেনি।

[রুকূ - ১২]

১০২. কাফেররা কি মনে করে যে, ওরা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদের সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে[১]? আমি তো কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য দোযখ প্রস্তুত করেছি[২]।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০৩. আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদের তাদের কথা বলব, যারা আমলের দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৪. '(তারা) সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের সাধনা বিনষ্ট হয়েছে, আর তারা মনে করতে থেকেছে যে, তারা খুব ভাল কাজ করছে[৩]।

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৫. 'তারাই এমন লোক, যারা আপন রবের আয়াতগুলি ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

---

১. অর্থাৎ কাফেররা কি মনে করে যে, ওরা আমার বিশেষ বান্দাদের (যথা মাসীহ, উযাইর, জিবরাঈল ও অন্য ফেরেশতাদের) পূজা করে নিজেদের সাহায্য-সহযোগিতার কাজে লাগাতে পারবে? كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (কখনই নয়, বরং স্বয়ং তাঁরা তাদের আচরণের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন এবং বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন– মারয়াম : ৮২)

২. অর্থাৎ উক্ত ধোঁকার শিকার হয়ো না! সেখানে কেউ তোমাদের খোঁজ-খবর নিবে না। হাঁ, আমি তোমাদের মেহমানদারী করব দোযখের আগুন ও রকমারি আযাব দিয়ে। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।)

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তারা হবে, যাদের সব চেষ্টা-সাধনা একমাত্র দুনিয়ার জন্যই ছিল এবং পার্থিব উন্নতি-সফলতাকেই যারা প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করত, আখেরাতের খেয়ালও যাদের হত না। (মুযেহুল কুরআন থেকে এমনি বুঝে আসে)।

অথবা অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে ওরা যেসব কাজ নিজেদের ধারণায় ভাল মনে করে করেছিল, বাস্তবে তা ভাল হোক বা না হোক– সবই কুফরের অভিশাপে আখেরাতে অসার প্রমাণিত হবে এবং সকল সাধনা পণ্ড হবে।

وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا۝

করেছে[১]। ফলে তাদের সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোনো তুলাদণ্ড কায়েম করব না[২]।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا۝

১০৬. 'এ-ই তাদের প্রতিফল অর্থাৎ জাহান্নাম, কারণ তারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদের বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে[৩]।'

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۝

১০৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে শীতল ছায়ার উদ্যানরাজি–

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا۝

১০৮. যাতে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। তারা সেখান থেকে স্থানান্তরিত হতে চাইবে না[৪]।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا۝

১০৯. আপনি বলুন, 'আমার রবের বাক্যাবলি (লেখার) জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবু নিশ্চয়ই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথাসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই, যদিও আমি তার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র নিয়ে আসি[৫]।'

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ মানেনি, তাঁর সামনে কখনো হাযির হতে হবে বলে ধারণাও করেনি।

২. অর্থাৎ কাফেরদের সৎকর্মসমূহ নিষ্প্রাণ– অবিনশ্বর জীবনে তা কোন কাজেই আসবে না। অতএব তখন শুধু কুফর ও অসৎকর্মগুলো অবশিষ্ট থাকবে। এসব তো পাপের পাল্লা ভারী করবে, অথচ পুণ্যের পাল্লা খালি। আর মাপামাপি হয়ে থাকে বিপরীতমুখী জিনিসপত্রের মধ্যে। এস্থলে পাপাচারের বিপরীতে পুণ্যের অস্তিত্বই নেই। অতএব ওজন করার প্রশ্ন নেই।

৩. এখন বিদ্রূপের স্বাদ আস্বাদন কর।

৪. অর্থাৎ অনন্তকাল থেকেও ক্লান্ত হবে না। প্রতি মুহূর্তে নিত্য নতুন নে'য়ামত পেতে থাকবে। কখনো এ আকাঙ্ক্ষা করবে না যে, আমাদের এখান থেকে স্থানান্তরিত করা হোক।

৫. ইহুদীদের ইঙ্গিতে কুরায়শরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহ, আসহাবে কাহফ ও যুল-কারনাইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। সূরার শুরুতে আসহাবে কাহফের এবং শেষে যুল-

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি এ ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং স্বীয় রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে[১]।

কারনাইনের কাহিনী যতটুকু প্রয়োজন বর্ণিত হল। আর রূহ সম্পর্কিত আলোচনায় সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে– وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

এখন সূরার পরিসমাপ্তিতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার ইলম ও হেকমতের কথা অনন্ত-অসীম। যেসব কথা তোমাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে বলা হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকুও নয়, যতটুকু সমুদ্রের তুলনায় একটি ফোঁটা। মনে কর, যদি আল্লাহর ইলম ও হেকমতের কথাসমূহ লেখার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানি কালি হয়ে যায়, অতঃপর অনুরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমুদ্রের পানি তাতে মেশানো হতে থাকে, তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কথাসমূহ লেখা শেষ হবে না।

এ থেকেই বোঝা উচিত যে, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের মাধ্যমে যত জ্ঞানই বিপুল থেকে বিপুল পরিমাণে কাউকে দেওয়া হোক, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তাও অতি সামান্য– যদিও স্বতন্ত্রভাবে তাকে বিস্তর বলা যায়।

১. অর্থাৎ আমি তোমাদের মত মানুষ– আল্লাহ নই যে, আপনা-আপনি স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র জ্ঞানরাশি ও গুণাবলি আমার অর্জিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ তাআলা সত্য ইলম রাশি ও পবিত্র মারেফতরাজি ওহীরূপে আমার প্রতি পাঠান, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাওহীদের ইলম। তারই দিকে আমি সকলকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা যার হয় অথবা তাঁর সম্মুখে হাযির হওয়ার ভয় যার আছে, তার উচিত শরী'য়তসম্মতভাবে ভাল কাজ করে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে কাউকেই কোন পর্যায়েই শরীক না করা। অর্থাৎ শিরকে জলীর (প্রকাশ্য শিরকের) ন্যায় রিয়া প্রভৃতি শিরকে খফী (অর্থাৎ গোপন শিরক) থেকেও আত্মরক্ষা করা। কেননা, যে ইবাদতে গাইরুল্লাহকে শরীক করা হবে, তা ইবাদতকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে। (হে আল্লাহ! আমাদের এ থেকে রক্ষা কর।)

আলোচ্য আয়াতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবীর জ্ঞানও সীমিত ও আল্লাহপ্রদত্ত– আল্লাহর জ্ঞানের মত স্বকীয় ও অসীম নয়।

সূরা মারয়াম

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১৯ । ৯৮ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

آياتها ٩٨ ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

كٓهٰيٰعٓصٓ ۞

১. কা-ফ হা- ইয়া- 'আইন সা-দ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۞

২. (এটি) স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি আপনার রবের রহমতের বিবরণ [১]–

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۞

৩. যখন তিনি স্বীয় রবকে মৃদুস্বরে ডাকলেন[২];

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞

৪. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথায় বার্ধক্যের শুভ্রতা ফুটে উঠেছে[৩]; আর হে রব! আপনার নিকট প্রার্থনা করে আমি কখনো বিফল হইনি[৪]।

---

১. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের অতি মর্যাদাশালী নবীদের একজন। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন এবং নিজ হাতের শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। (হাদীসটি সহীহ বুখারী নয়, সহীহ মুসলিমে আছে। হাদীস নং ২৩৭৯– আলজামউ বাইনাস্ সহীহাইন, হাদীস ২৭১২ দ্রষ্টব্য) তাঁর আলোচনা সূরা আলে-ইমরানে গত হয়েছে (আয়াত ৩৭-৪১), সেখানকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. বর্ণিত আছে, রাতের আঁধারে ও নির্জনে নিম্নস্বরে দো'য়া করলেন, এটাই দো'য়ার আসল নিয়ম। কুরআনে আছে- ادعوا ربكم تضرعا وخفية (তোমরা আপন রবকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও চুপে চুপে। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫)

বলা বাহুল্য, এরূপ দো'য়া রিয়ামুক্ত ও এখলাসে পূর্ণ থাকে। সম্ভবত এ কথাও ভেবেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র চেয়ে না পেলে শ্রোতারা হাঁসবে– তাই মৃদুস্বরে দো'য়া। তাছাড়া বুড়ো বয়সে স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ বাহ্যত মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। মাথার চুলে বার্ধক্যের শুভ্রতা চমকাচ্ছে এবং হাড্ডিগুলি পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আপনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদা আমার দো'য়া কবূল করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ মেহেরবানী দ্বারা আমাকে সদা ধন্য করেছেন। এখন জীবনের এই শেষ সময়ে এবং দুর্বল ও বুড়ো বয়সে কী করে ধারণা করি যে, আমার দো'য়া কবূল করা হবে না।

৫. 'আমি আমার পরে আমার ভাই-বেরাদরের ব্যাপারে ভয় করি[১], আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আমাকে আপনার নিকট থেকে দান করুন একজন কার্যনির্বাহক-

وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ۙ

৬. 'যে (দীনি বিষয়ে) আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততির[২]

یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۗ

কোন কোন মুফাসসির ولم أكن بدعائك رب شقيا এর এই অর্থ করেছেন- হে প্রতিপালক! আপনার ডাকে আমি কখনো হতভাগা প্রমাণিত হইনি, অর্থাৎ আপনি যখনি ডেকেছেন, আমি সর্বদা হুকুম পালন ও ফরমাবরদারীর সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

১. তাঁর ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন অসৎকর্ম ছিল। তাই আশঙ্কা ছিল, তাঁর পরে তারা নিজেদের বদ-আমল ও ভ্রান্তির কারণে সৎপথ নষ্ট করে দিতে পারে এবং যে দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক দৌলত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের বংশধরদের মাধ্যমে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌছেছিল, তা নিজেদের দুষ্কর্ম ও দুরাচার দ্বারা বিনষ্ট করে দিতে পারে।

২. অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, অর্থাৎ সন্তান লাভের বাহ্যিক উপায় নেই। কিন্তু আপনি স্বীয় অসীম কুদরত ও রহমতে আমাকে এমন সন্তান দান করুন, যে দ্বীনের বহুবিধ খিদমত আঞ্জাম দিবে এবং আপনার পবিত্র আমানতের ভার বহন করতে পারবে। আমি দুর্বল ও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেছি, তাই মনে চায়, এমন এক উপযুক্ত পুত্র লাভ করি, যে তার পূর্বপুরুষদের পবিত্র আসনে সমাসীন হবে এবং তাঁদের ইলম ও প্রজ্ঞা-সম্ভারের মালিক আর নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

এখানে সম্পদের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়

সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীদের ধন-সম্পদে মীরাস জারী হয় না, (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৩০) তাঁদের উত্তরাধিকার তো ইলমরূপ সম্পদে জারী হয়। এমনকি, শিয়া সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য কিতাব 'কাফী" থেকেও "রূহুল মাআনী"-গ্রন্থে এ বিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, یَرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوْبَ আয়াতাংশে মাল-সম্পদের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়। আর এর সমর্থন খোদ آل يعقوب শব্দ থেকেও পাওয়া যায়। কারণ, ইয়াকূব (আ)-এর সকল সন্তানের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির একক উত্তরধিকার হযরত যাকারিয়া (আ)-এর পুত্র হতে পারেন না। তাছাড়া দোয়ায় উত্তরাধিকারের উল্লেখই প্রমাণ করে যে, এখানে ধনের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, সবাই জানে ও মানে যে, পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির ওয়ারিছ হয়ে থাকে। দো'য়ার মধ্যে তা উল্লেখ করার কী প্রয়োজন? বোঝা গেল, এস্থলে অন্য কোন বিশেষ উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য।

আর হযরত যাকারিয়ার ব্যাপারে এমন ধারণা করা যে, তাঁর চিন্তা ছিল- সম্পদ আপন পরিবারের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে চলে যায় কি না, এ ধারণা অত্যন্ত

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۝

এবং হে রব! তাকে বানান পছন্দনীয়[১]।'

৭. يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۝

(আল্লাহ বললেন,) 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমি ইতিপূর্বে কাউকে তাঁর সমনামধারী বানাইনি[২]।'

৮. قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۝

তিনি বললেন, 'হে আমার রব! কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমিও পৌঁছে গেছি বার্ধক্যের শেষ সীমায়[৩]?'

৯. قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

আল্লাহ বললেন, 'এমনই (হবে)[৪]।' তোমার রব বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজ, আর

ন্যাক্কারজনক। কেননা এমন বিষয়ে চিন্তিত হওয়া নবীদের শান নয়। অধিকন্তু মজার ব্যাপার এই যে, হযরত যাকারিয়া (আ) ধনীও ছিলেন না, মিস্ত্রীর কাজ করে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আয়-উপার্জন করতেন। তাঁর পক্ষে বুড়ো বয়সে এ চিন্তা করা কি সম্ভব যে, এ সামান্য পয়সা অন্য আত্মীয়স্বজনের হস্তগত হয়ে যায় কিনা? (আল্লাহর পানাহ!)

১. অর্থাৎ এমন পুত্র দান করুন, যে নিজ আমল-আখলাকের কারণে আমার, আপনার ও ভাল লোকদের প্রিয়পাত্র হবে।

২. অর্থাৎ যাকারিয়া (আ)-এর দো'য়া কবূল হল এবং পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হল। জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তার নাম (ইয়াহইয়া) সাব্যস্ত করে দিলেন। নামও এমন অভিনব যে, পূর্বে কারো এ নাম রাখা হয়নি।

পূর্বসুরীদের কেউ কেউ এস্থলে سمي এর অর্থ شبيه (সদৃশ) ধরেছেন- অর্থাৎ এ ধরনের কোন ব্যক্তি তাঁর পূর্বে আর হয়নি। উদ্দেশ্য এই যে, বৃদ্ধ পুরুষ ও বন্ধ্যা স্ত্রীর দ্বারা তখন পর্যন্ত এমন কোন পুত্র জন্ম নেয়নি। অথবা– কতক বিশেষ অবস্থা ও গুণে (যথা: হৃদয়ের নম্রতা ও ক্রন্দনের প্রাবল্য ইত্যাদিতে) ইতিপূর্বে তাঁর সদৃশ কেউ অতিবাহিত হয়নি।

৩. মানুষের স্বভাব এই যে, যখন আশাতীত ও অসাধারণ কোন সুসংবাদ শোনে, তখন আরো বেশি স্বাদ ও প্রশান্তি লাভের জন্য বারবার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা নতুন স্বাদ হাসিল হয় এবং বিষয়টি পরিপক্ক হয়। হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রশ্নের উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অভিনব বস্তু প্রার্থনা করতে ইতস্তত করলেন না, যখন পাবেন বলে শুনলেন তখন বিস্মিত হলেন।'

৪. বিস্ময়ের কোন কারণ নেই– এসব অবস্থাতেই সন্তান লাভ হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩

আমি ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না[১]'।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠

১০. যাকারিয়া (আ) বললেন, 'হে আমার রব! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ্য-সবল হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে তিন রাত পর্যন্ত কথা বলতে পারবে না[২]।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

১১. অতঃপর তিনি (তাঁর) <u>কক্ষ থেকে</u>* আপন সম্প্রদায়ের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং ইঙ্গিতে তাদের বললেন, 'তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পড়তে থাক[৩]।'

---

১. তোমার রব বলেছেন... এটা ফেরেশতার কথা। অর্থাৎ, আপনার নিকট বাহ্যিক উপায়-উপকরণের বিবেচনায় একটি বিষয় কঠিন মনে হলেও তা আল্লাহর কাছে কঠিন নয়– তাঁর মহা কুদরতের সামনে সবই সহজ। মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়েই ভাবুক, এক সময় মানুষ কোন বস্তুই ছিল না, তার নাম-নিশানাও কেউ জানত না। আল্লাহ তাআলা তাকে অনস্তিত্বের জগত থেকে অস্তিত্বে আনলেন। সুতরাং যে মহাশক্তিশালী স্রষ্টা নিছক অ-বস্তুকে বস্তু বানিয়ে দেন, তিনি বৃদ্ধ পুরুষ ও বন্ধ্যা স্ত্রী থেকে সন্তান পয়দা করতে পারবেন না? এটা তো উক্ত বিষয় থেকে সহজ।

২. অর্থাৎ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যখন পূর্ণ তিন দিন ও রাত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, তখন বুঝবে যে, গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। এ সম্বন্ধে সূরা আলে-ইমরানের আয়াত (নং ৩৮-৪১) এর তাফসীরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ইবাদতখানা থেকে।

৩. অর্থাৎ উক্ত সময়টি আসলে যাকারিয়া (আ)-এর যবান বন্ধ হয়ে গেল। তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে লোকদের ইঙ্গিতে বললেন, সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক, নামায-কালাম পড়, আর তাসবীহ-তাহলীলে রত থাক।

এ কথা হয়ত তিনি সাধারণ ওয়াজ-নসীহতস্বরূপ বলেছেন, অথবা আল্লাহর নে'য়ামত লাভের খুশীতে তিনি চাইলেন যে, অন্যরাও তাঁর সঙ্গে যিকর-শোগলে শরীক হোক। সূরা আলে-ইমরানে গিয়েছে যে, যাকারিয়ার প্রতি এই তিনদিন আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ ছিল।

১২. 'হে ইয়াহইয়া! (আল্লাহর) কিতাব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর[১]।' আর আমি তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলাম বিচার-ক্ষমতা*[২];

يٰيَحۡيٰى خُذِ الۡكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحُكۡمَ صَبِيًّا ۙ﴿۱۲﴾

১৩. এবং (দান করেছিলাম) আমার পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা; আর তিনি ছিলেন পরহেযগার[৩]–

وَّحَنَانًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ﴿۱۳﴾

১৪. এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারকারী। আর তিনি ছিলেন না অহংকারী, অবাধ্য[৪]।

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُنۡ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾

اَنْ سبحوا তাসবীহ শব্দটি সম্ভবত এজন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে, কোন বিস্ময়কর ঘটনা দেখে মানুষ সাধারণত 'সুবহানাল্লাহ' বলে থাকে।

১. অর্থাৎ তাওরাত এবং অন্য যেসব আসমানী সহীফা তোমার প্রতি বা অন্য নবীদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। সেগুলির শিক্ষা অনুসারে নিজে আমল কর এবং অন্যদের আমল করাও।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ইয়াহ্ইয়া (আ) লোকদের জোরে-শোরে কিতাবের ইলম শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কারণ, বাপ ছিলেন দুর্বল-বৃদ্ধ আর তিনি ছিলেন যুবক।'

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'জ্ঞান-বুদ্ধি; **অথবা :** প্রজ্ঞা'।

২. অর্থাৎ বাল্যকালেই তাঁকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান-বুদ্ধি, ইলম-হেকমত, সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি, কিতাবের আহকাম ও ইবাদতের রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। একবার ছেলেরা তাঁকে খেলার জন্য ডাকল। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাদের এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।' –অনেক আলেমের মতে, আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়মের বাইরে তাঁকে বাল্যকালেই নবুওয়াতও দান করেছিলেন।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দয়া-মায়া, নম্রতা-দয়াদ্রতা, ভালবাসা ও মহব্বত দান করেছিলেন। এবং তাঁকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও নির্মল চরিত্রবিশিষ্ট, মুত্তাকী-পরহেজগার বানিয়েছিলেন। হাদীসে আছে, ইয়াহইয়া কখনো গোনাহ করেননি, গোনাহর ইচ্ছাও করেননি। আর খোদার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর গালে অশ্রু প্রবাহের দাগ বসে গিয়েছিল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৯৪)

৪. অর্থাৎ অহংকারী, অবাধ্য ও নাফরমান ছিলেন না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া ছেলেরা প্রায়ই এ রকম (অহংকারী-অবাধ্য) হয়ে থাকে। তিনি এর ব্যতিক্রম ছিলেন।'

১৫. তাঁর প্রতি সালাম– যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেছেন, যেদিন তিনি মৃত্যু বরণ করবেন এবং যেদিন তিনি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবেন[১]।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

[রুকূ - ২]

১৬. আপনি (এই) কিতাবে উল্লেখ করুন মারয়ামের (বৃত্তান্ত)– যখন সে নিজ পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে গেল[২];

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৭. অতঃপর সে তাদের সম্মুখে একটি পর্দা টানিয়ে দিল। তখন আমি তাঁর কাছে আমার রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল)-কে পাঠালাম, আর সে পরিপূর্ণ মানবের আকৃতি ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হল[৩]।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৮. মারয়াম বলল 'আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও[৪]।'

قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

---

১. কোন বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার সম্মান-মর্যাদা প্রকাশ করা। আর এটা এ কথাও বোঝায় যে, তিনি সর্বপ্রকার পাকড়াও থেকে মুক্ত। আর এখানে يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا দ্বারা উদ্দেশ্য হল সময় ও অবস্থার ব্যাপকতা বোঝানো, অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কখনো তাঁর চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তিনি সর্বদা নিরাপদ থাকবেন।

২. অর্থাৎ হায়েযের গোসল করার জন্য। এই তাঁর প্রথম হায়েয হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল তের বা পনের বছর। লজ্জায় লোকালয় থেকে পৃথক হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের একটি স্থানে চলে গিয়েছিলেন। এজন্য খ্রিস্টানরা পূর্বদিককে নিজেদের কেবলা বানিয়ে নিল।

৩. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে উপস্থিত হলেন। ফেরেশতা সাধারণত সুদর্শন আকৃতিই ধারণ করে থাকেন। আর এ ক্ষেত্রে সতীত্ব ও পবিত্রতায় হযরত মারয়ামের চূড়ান্ত পরীক্ষাও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে প্রমাণিত হল যে, এরূপ শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় উপায়-উপকরণও তাঁর পবিত্রতা ও তাকওয়ার দূর্গে বিন্দুমাত্র নাড়া দিতে পারেনি।

৪. মারয়াম (আ) প্রথমে ভাবলেন, কোনো মানুষ হবে। নির্জনে হঠাৎ একজন পুরুষ সামনে এসে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এবং সতীত্ব রক্ষার চিন্তা করতে

قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ ٭ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِیًّا ۝

১৯. সে বলল, 'আমি তো তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। (আমাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে), যাতে আমি তোমাকে দান করি এক পবিত্র পুত্র[১]।'

قَالَتۡ اَنّٰی یَكُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّلَمۡ یَمۡسَسۡنِیۡ بَشَرٌ وَّلَمۡ اَكُ بَغِیًّا ۝

২০. মারয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে, অথচ আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না[২]।'

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ ۚ وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِیًّا ۝

২১. সে বলল, 'এমনই (হবে)'। তোমার রব বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজ[৩]। এবং (তা এজন্য করব), যাতে তাকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত বানাই। আর এ তো একটি স্থিরীকৃত বিষয়[৪]।'

শুরু করলেন। কিন্তু মনে হয়, ফেরেশতার চেহারায় তাক্ওয়া ও পবিত্রতার নূর দেখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করলেন যে, 'আমি তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় গ্রহণ করছি।' যদি তোমার অন্তরে সত্যিই আল্লাহর ভয় থাকে (যেমন পবিত্র ও নূরানী চেহারা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল), তবে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও এবং আমার উপর কোনো হস্তক্ষেপ করো না।

১. অর্থাৎ ঘাবড়িয়ো না, আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা হয়ে থাকলে অন্তর থেকে তা দূর করে দাও। আমি মানুষ নই, বরং তুমি যে প্রভুর আশ্রয় নিচ্ছ, আমি তাঁরই প্রেরিত ফেরেশতা। আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাকে এক পূত-পবিত্র, বরকতময় ও সৌভাগ্যবান পুত্র দান করার জন্য এসেছি। غلاما زكيا –এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাত, বংশ ও চরিত্র প্রভৃতির দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হবে।

২. মারয়ামের অন্তরে আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বাস পয়দা করে দিলেন যে, নিশ্চয় ইনি ফেরেশতা। কিন্তু তিনি এ কথা ভেবে বিস্মিত হলেন যে, তাঁর তো স্বামী নেই, যিনি বৈধভাবে তাঁকে স্পর্শ করতে পারেন। আর তিনি ব্যভিচারিণীও নন যে, অবৈধ উপায়ে সন্তান লাভ করবেন। এ অবস্থায় সতী-সাধ্বী ও পুণ্যবতী থাকতে তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? এই একই প্রশ্ন (সন্তান কীভাবে হবে) তুলনামূলক কম আশ্চর্যকর সুসংবাদে হযরত যাকারিয়া (আ)-এরও হয়েছিল।

৩. এই একই উত্তর হযরত যাকারিয়া (আ)-কেও দেওয়া হয়েছিল। ১১নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ এ কাজ অবশ্যই হবে, এটা পূর্ব থেকে নির্ধারিত, এতে অন্যথা হতে পারে না। আমার হেকমতের দাবি এটাই যে, পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই শুধু নারীর অস্তিত্ব থেকে এক শিশুর জন্ম হবে এবং সে প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতাদের জন্য আমার মহা কুদরতের একটি নিদর্শন হবে।

২২. অতঃপর মারয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করল[১]; অনন্তর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল[২]।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩. আর প্রসবব্যথা তাকে এক খেজুর গাছের কাণ্ডের নিকট নিয়ে এল, সে বলল, 'হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত[৩]।'

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

কেননা, সকল মানুষই পুরুষ ও নারীর মিলনে জন্ম লাভ করে। শুধু আদম আলাইহিস সালামের জন্ম হয় নারী-পুরুষ ছাড়াই এবং হওয়া (আ.)-এর জন্ম হয় শুধু পুরুষের অস্তিত্ব থেকে। চতুর্থ উপায় হচ্ছে, পুরুষ ছাড়া শুধু নারীর অস্তিত্ব থেকে মানব শিশুর জন্ম হওয়া। বলা বাহুল্য, হযরত মাসীহ (আ) এই চতুর্থ উপায়েরই ফসল। এভাবে জন্মলাভের চারটি উপায়ই বাস্তবায়িত হল।

অতএব হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়ার জন্য বিরাট রহমতের কারণ।

১. বলা হয়, ফেরেশতার ফুৎকারের ফলে হযরত মারয়াম গর্ভ ধারণ করলেন। 'আল-বাহর' কিতাবে আছে-

وذكروا أن جبرئيل عليه السلام نفخ في جيب درعها أو فيه وفي كمها والظاهر أن المسند إليه النفخ هو الله تعالى لقوله فنفخنا كما قال في آدم : ونفخت فيه من روحي والله أعلم

(আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, জিবরাঈল (আ.) তাঁর জামার বুকে বা বুকে ও আস্তিনে ফুঁ দিলেন। আর এটা পরিষ্কার যে, ফুঁয়ের আসল কর্তা আল্লাহ তাআলা, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فنفخنا অর্থাৎ আমি ফুঁ দিলাম।' আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম।')

২. অর্থাৎ প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে লজ্জায় তিনি লোকালয় থেকে পৃথক হয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। সম্ভবত সেই স্থানটিকেই 'বাতইল লাহ্‌ম' বলা হয়, যা 'বাইতুল মুকাদ্দাস' থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। (ওয়াহাব র. থেকে ইবনে কাছীর র. এমনই উল্লেখ করেছেন।)

৩. অর্থাৎ প্রসব-ব্যাথার কষ্টে তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় উপস্থিত হলেন। তখন ব্যাথার কষ্ট, একাকিত্ব, অসহায়ত্ব, জরুরী উপায়-উপকরণ ও আরামের অভাব, সর্বোপরি একজন পুণ্যবতী সতী-সাধ্বী নারীর ভবিষ্যৎ দুর্নাম ও অপমানের চিন্তা তাঁকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলল। এমন কি, এসব দুশ্চিন্তার আতিশয্যে তিনি বলে উঠলেন– يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا তখন চরম কষ্ট ও অস্থিরতার কারণে ফেরেশতার নিকট থেকে পাওয়া পূর্বের সুসংবাদগুলিও তিনি ভুলে গেলেন।

২৪. তখন (জিবরাইল ফেরেশতা) তাকে তার নিম্নদেশ থেকে ডাক দিয়ে বলল, 'তুমি চিন্তিত হয়ো না, তোমার রব তো তোমার পাদদেশে একটি ঝরনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।	فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا ﴿۲۴﴾
২৫. 'আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছটির কাণ্ড নাড়াও, তা থেকে তোমার উপর ঝরে পড়বে পাকা, তাজা খেজুর[১]।	وَهُزِّیْٓ اِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۵﴾
২৬. 'অতএব তুমি আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর[২]। আর তুমি যদি কোন মানুষ দেখ, তবে বলো, 'আমি দয়াময়ের জন্য রোযার মানত করেছি; সুতরাং আজ কোনো মানুষের সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলব না[৩]।'	فَكُلِیْ وَاشْرَبِیْ وَقَرِّیْ عَیْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِیْٓ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا ﴿۲۶﴾

১. খেজুর গাছের নীচে যে স্থানটিতে হযরত মারয়াম (আ) অবস্থান নিয়েছিলেন, তা কিছুটা উঁচু ভূমি ছিল। তার নীচ থেকে ফেরেশতার আওয়াজ শোনা গেল– চিন্তিত ও অস্থির হয়ো না, আল্লাহর কুদরতে সকল রকম জাহেরী ও বাতেনী স্বস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নীচের দিকে দেখ, আল্লাহ তাআলা কীরূপ ঝরনা বা নদী প্রবাহিত করে দিয়েছেন! এ তো হল পান করার জন্য। খাওয়ার জন্য এই খেজুর গাছেই নাড়া দাও, পাকা ও তাজা খেজুর ঝরে পড়বে।

বি. দ্র. কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী سرِي এর অর্থ 'মহান নেতা' করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার গর্ভ থেকে এক মহান নেতার জন্ম দেবেন। আর سري এর অর্থ ঝরনা বা নহর হলে এটা সুস্পষ্ট যে, এ ঝরনা অলৌকিকরূপে প্রবাহিত হয়েছিল। আর খেজুরও ধরেছিল শুষ্ক বৃক্ষে, বে-মৌসুমে। এসব অলৌকিক ঘটনা মারয়ামের স্বস্তি, শান্তি ও আনন্দের কারণ হয়েছিল। অধিকন্তু সেই অবস্থায় এ জিনিসগুলি মারয়ামের জন্য উপাদেয় এবং আবশ্যকীয়ও ছিল।

২. অর্থাৎ তাজা খেজুর খেয়ে ও ঝরনার পানি পান করে তৃপ্ত হও এবং পবিত্র ছেলেকে দেখে চোখ শীতল কর, আর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করো না, আল্লাহ তাআলা সকল মুশকিল আসান করে দেবেন।

৩. অর্থাৎ কোন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে– আমি রোযা রেখেছি, কথা বলতে পারছি না। তাদের শরী'য়তে কথা না বলার রোজা রাখা দুরুস্ত ছিল– আমাদের শরী'য়তে এটা দুরুস্ত নয়। আর فَقُوْلِیْٓ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا– এর উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বাস্তবিকই রোযার মানত কর এবং মানুষকে এই মানতের কথা জানিয়ে দাও।

আর لَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا –মানুষের শর্ত সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, রোযা রেখে ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল না।

২৭. অতঃপর সে তাকে কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আসল। তারা বলতে লাগল, 'হে মারয়াম! তুমি তো বড় ভয়ানক কাজ করেছ[১]।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝٢٧

২৮. 'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতা ছিলেন না ব্যভিচারিনী[২]।'

يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝٢٨

২৯. তখন সে শিশুটির প্রতি ইঙ্গিত করল[৩]। তারা বলল 'আমরা তার সাথে কীভাবে কথা বলব, যে কোলের শিশুমাত্র[৪]?'

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٩

---

১. অর্থাৎ যখন শিশুকে কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আসলেন, তখন লোকেরা হতভম্ব হয়ে গেল এবং বলতে শুরু করল, মারয়াম! তুমি তো সাংঘাতিক কাজ করে ফেলেছ! এ অবৈধ জিনিস তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে? এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে যে, একটা কুমারী মেয়ে দাবি করে, আমার বৈধ সন্তান জন্মেছে।

২. অর্থাৎ তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা করে বলতে লাগল, 'তোমার পিতামাতা ও বংশীয় লোকেরা সর্বদাই নেক ছিলেন। তোমার মধ্যে এহেন অসচ্চরিত্রতা কী করে এল?' ভাল লোকদের সন্তান খারাপ হওয়াটা আশ্চর্যেরই বিষয়।

বি. দ্র. মারয়ামকে 'হারূনের বোন' বলার কারণ এই যে, তিনি হযরত মূসার ভাই হযরত হারূন আলাইহিস সালামের বংশের ছিলেন। সুতরাং হারূনের বোন বলতে হারূনের বংশীয় বোন উদ্দেশ্য– যেমন وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ এতে হূদ আলাইহিস সালামকে 'আদ' জাতির ভাই বলা হয়েছে, অথচ 'আদ' ছিল তাঁর সম্প্রদায়ের সর্ব উর্ধ্বপুরুষের নাম। আর এমনও হতে পারে যে, اخت هارون দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ, কোন কোন সহীহ হাদীস অনুযায়ী তার এক ভাইয়ের নাম হারূন ছিল (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৩৫)। বর্তমান কালের ন্যায় সেই কালেও নবী বা নেক লোকদের নামে অন্য লোকদেরও নাম রাখা হত। কথিত আছে যে, মারয়ামের সেই ভাই একজন নেক লোক ছিলেন।

সারকথা এই যে, তোমার পিতা ছিলেন পবিত্র, মাতা সতী-সাধ্বী, ভাই এ রকম পুণ্যবান, তোমার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হারূন আলাইহিস সালাম। এর পরও তোমার দ্বারা এহেন কাজ কী করে হল?

৩. অর্থাৎ মারয়াম (আ) শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, একেই জিজ্ঞাসা কর।

৪. অর্থাৎ এমন লজ্জাকর কাজ করে আবার সিনাজুরি করছ এবং শিশুর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বলছ? কোলের শিশুর সাথে আমরা প্রশ্নোত্তর করি কী করে?

৩০. শিশুটি বলল, 'আমি আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন নবী[১]।

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝

৩১. 'আর তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি[২];

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

বি. দ্র. مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا বাক্যাংশে كان শব্দটি এ কথা বোঝায় না যে, এই কথোপকথনের সময় তিনি শিশু ছিলেন না। কুরআনের অনেক স্থানে كان এর ব্যবহার এমন বিষয়ের জন্যও হয়েছে, যার কার্যকারিতা অতীত কাল গত হয়ে যাওয়ার পরও সমাপ্ত হয়নি, যেমন: كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু) – لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً (তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, কেননা তা একটা অশ্লীলতা।) – اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ (নিশ্চয় তাতে তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর।)

আর এখানে كَيْفَ نُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِي (আমরা এই শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব?) না বলে كيف نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ... এভাবে বলার তাৎপর্য এই যে, তারা কথা না বলতে পারার বিষয়টিকে একটি সাধারণ নিয়মের ঢঙে পেশ করেছিল– অর্থাৎ শুধু ঈসার সঙ্গে নয়, বরং কোলের যে কোনো শিশুর সাথেই আলাপ করা অসম্ভব।

১. সম্প্রদায়ের লোকেরা এসব কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় স্বয়ং মাসীহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বাকশক্তি দান করে দিলেন। তিনি তখন এমনসব কথা বললেন, যা দ্বারা সেই সব ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট ধারণার খণ্ডন হয়ে যায়, যা ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে উদ্ভূত হওয়ার ছিল। যেমন: তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা'। অর্থাৎ আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র নই, যেমনটা খ্রিস্টানদের আকীদা। এ আকীদারই খণ্ডনের জন্য এখানে আল্লাহ তাআলা হযরত মাসীহ-এর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি আরো বললেন, 'আর আমাকে আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়েছেন'। অর্থাৎ তিনি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার নন, যেমনটা ইহুদীরা ধারণা করে।

বি. দ্র. কোলের শিশু হয়েও হযরত মাসীহর কথা বলা সম্বন্ধে সূরা 'আলে-ইমরান' ও 'মায়েদা'য় আলোচনা করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য। সহীহ বুখারীর হাদীসে (৩৪৩৬) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোলের যে তিনটি শিশুর কথা বলা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হযরত মাসীহ ইবনে মারয়াম। বর্তমানে যারা কুরআন ও হাদীসের খেলাফ হযরত মাসীহ-এর শিশু থাকাবস্থায় কথা বলার বিষয়টা অস্বীকার করে, তাদের হাতে খ্রিস্টানদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নেই।

২. অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন যখন ও যেখানে যে ধরনের সালাত ও যাকাতের হুকুম দেওয়া হবে, যথাযথভাবে তা আদায় করে যাব।

কুরআনের অন্যত্র মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- الذين هم على صلاتهم دائمون (যারা নিজেদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান। -মাআরিজ, আয়াত ২৩)। এর অর্থ এই নয় যে, তারা সর্বক্ষণ শুধু নামাযই পড়তে থাকে; বরং অর্থ এই যে, যখন যে ধরনের নামায আদায়ের হুকুম রয়েছে, তারা নিয়মিতভাবে সে হুকুম তামীল করে। ফলে নামাযের বরকত ও নূর সর্বদা তাঁদের বেষ্টন করে রাখে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমরা যতদিন জীবিত আছি ততদিন নামায, যাকাত, রোযা, হজ ইত্যাদি আদায়ের নির্দেশ আমাদের প্রতি রয়েছে- তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর জরুরী যে, তাকে সর্বদা নামায পড়তে থাকতে হবে, নেসাবের মালিক হোক বা না হোক যাকাত দিতে থাকতে হবে, সর্বদা তাকে রোযা রাখতে হবে, সর্বদা তাকে হজ করতে থাকতে হবে। তদ্রূপ হযরত মাসীহ (আ)-এর কথা مادمت حيا এর অর্থ এটা নয় যে, আমি সর্বক্ষণ নামায পড়তেই থাকব!

এখানে صلاة ،زكاة -এর অর্থ

এস্থলে মনে রাখতে হবে যে, صلاة শব্দটি কেবল পারিভাষিক নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পবিত্র কুরআন তো ফেরেশতা ও মানব জাতিকে অতিক্রম করে সমগ্র জগতের সাথে সালাতকে সম্পৃক্ত করেছে- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (তুমি কি দেখনি, আসমান ও যমীনে যারাই আছে তারা এবং পাখিসমূহ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই জেনে রেখেছে নিজ নিজ সালাত ও তাসবীহ-এর পদ্ধতি। -সূরা নূর, আয়াত ৪১)। আর এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক জিনিসের তাসবীহ ও সালাতের অবস্থা আল্লাহই জানেন যে, কার সালাত ও তাসবীহ কী ধরনের।

ঠিক অনুরূপ, যাকাতের আসল অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত। এগুলির প্রত্যেক অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন-হাদীসে হয়েছে। এ রুকূর মধ্যেই হযরত মাসীহ সম্পর্কে غُلَامًا زَكِيًّا (এক পবিত্র পুত্র) বলা হয়েছে, আর زكيا শব্দটি زكوة শব্দ থেকে উদ্ভূত। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَوٰةً (এবং [দান করেছিলাম] আমার পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা। -সূরা মারয়াম, আয়াত ১৩) সূরা কাহফে রয়েছে- خَيْرًا مِنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (পবিত্রতায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ভালবাসায় অগ্রগামী। -সূরা কাহ্ফ, আয়াত ৮১)। -এস্থলেও زكوة শব্দটির এরূপ ব্যাপক অর্থ নেওয়া যেতে পারে। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, أَوْصَانِي بِأَنْ آمُرَ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ أوصاني بالصلوة والزكوة দ্বারা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামায ও যাকাতের আদেশ করতে। যেমন: ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ (তিনি পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের আদেশ করতেন। -সূরা মারয়াম, আয়াত ৫৫)

অধিকন্তু أَوصاني শব্দটি আভিধানিক অর্থের দিক থেকে এই দাবি করে না যে, ওসিয়তের সময় থেকেই তার উপর আমল শুরু করতে হবে (সুতরাং হযরত ঈসা (আ:)-এর উপর শৈশবেই সালাত ইত্যাদি ফরজ হয়ে গেছে- এমন বলা যায় না)। অনুরূপ, খুব সম্ভাবনা আছে যে, مَادُمْتُ حَيًّا দ্বারা এই পৃথিবীর জীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (অতএব, আসমানে

৩২. 'এবং (আমাকে বানিয়েছেন) আপন মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী[১] এবং আমাকে বানাননি উদ্ধত, হতভাগা[২]।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢

৩৩. 'আর আমার প্রতি সালাম- যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব[৩]।'

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

থাকাকালিন নামাযের কী হুকুম, এ সম্পর্কে আয়াতে কিছু বলা হয়নি)। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে (৩২৫৬) আছে, জাবের (রা) এর পিতাকে শাহাদাতের পর জীবিত করে আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার নিকট তুমি কিছু চাও। তিনি উত্তরে বললেন, আমাকে আবার জীবিত করে দিন, যাতে দ্বিতীয়বার আপনার পথে শহীদ হতে পারি। এখানে জীবন দ্বারা নিশ্চিতরূপে পার্থিব জীবনই উদ্দেশ্য। কারণ, শাহাদাত লাভের পর শহীদগণ যে (পরকালে) বিশেষ ধরনের জীবনের অধিকারী হন, তা তো বহু প্রমাণে প্রমাণিত, তার জন্য তো আবেদন করারও প্রয়োজন নেই। বোঝা গেল, সেই জীবন উদ্দেশ্য নয়, পার্থিব জীবন উদ্দেশ্য। (তদ্রূপ مادمت حيا-তে হতে পারে যে, শুধু পার্থিব জীবন উদ্দেশ্য)। একটি হাদীস যে আছে– لوكان موسى وعيسى حيين– এতেও ওই জীবনই উদ্দেশ্য। তবে হাদীসের কিতাবসমূহে এর কোন সনদ পাওয়া যায় না। অতএব এর হাদীস হওয়াই প্রমাণিত নয়।

১. যেহেতু তাঁর পিতা ছিল না, তাই শুধু মাতার উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এসব বাক্যে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, যার কারণ এই যে, ভবিষ্যতে যে বিষয়টির সংঘটন সুনিশ্চিত, তাকে অতীতরূপে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন- اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ এর মধ্যে। এভাবে, মাসীহ আলাইহিস সালাম শিশুকালে অতীত কালের শব্দাবলি ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, এসব বিষয় ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়া এমনি অকাট্য ও নিশ্চিত, যেন তা সংঘটিত হয়েই গেছে।

হযরত মাসীহ (আ)-এর এই অলৌকিক কথোপকথন দ্বারা এবং তাঁর বর্ণিত গুণাবলি ও স্বভাব-চরিত্র দ্বারা সেই মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন হয়ে গেল, যা তাঁর সতী-সাধ্বী মায়ের উপর আরোপ করা হত। কারণ, যে সত্তার মধ্যে এমন পবিত্র গুণাবলি ও স্বভাব-চরিত্র বিদ্যমান, তিনি (আল্লাহর পানাহ) ব্যভিচারপ্রসূত হন কী করে? স্বয়ং ওদের স্বীকারোক্তি- مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا থেকে প্রকাশ পায় যে, তারা পরবর্তী সন্তানসন্ততিকে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মতই দেখতে চাচ্ছিল। বস্তুত হযরত ঈসা (আ.) তাদের প্রত্যাশারও উর্ধ্বে ছিলেন।

৩. এই বাক্যটির সমার্থক বাক্য ইতিপূর্বে হযরত ইয়াহয়া (আ)-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালাম ছিল, এখানে আল্লাহ তাআলা মাসীহ (আ)-এর মুখ দিয়ে সেই কথাই বলিয়েছেন। তাছাড়া 'সালাম' ও 'আসসালাম' এর পার্থক্যও লক্ষণীয়।

৩৪. এই হলেন ঈসা ইবনে মারয়াম। (এ-ই) সত্য কথা, যার ব্যাপারে লোকেরা বিতর্ক করছে[১]।

ذٰلِكَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ قَوۡلَ الۡحَقِّ الَّذِىۡ فِيۡهِ يَمۡتَرُوۡنَ ۝٣٤

৩৫. এ আল্লাহর শান হতে পারে না যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি (এ থেকে) পবিত্র। তিনি যখন কোন কিছু (করার ইচ্ছা) করেন, তাকে শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়[২]।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنۡ يَّتَّخِذَ مِنۡ وَّلَدٍ سُبۡحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمۡرًا فَاِنَّمَا يَقُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ ۝٣٥

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর; এ-ই সরল পথ।

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىۡ وَرَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ ۝٣٦

৩৭. অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। অতএব দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য, যখন এক গুরুতর দিবস

فَاخۡتَلَفَ الۡاَحۡزَابُ مِنۡۢ بَيۡنِهِمۡ ۚ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ مَّشۡهَدِ

---

১. অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ)-এর আসল মর্যাদা ও গুণাবলি তা-ই, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একটি সত্য ও স্পষ্ট বিষয়ে লোকেরা অযথা ঝগড়া-ফাসাদ এবং নানা রকম মতভেদ করছে। কেউ তাঁকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, আর কেউ খোদার পুত্র। আবার কেউ বলছে, তিনি মিথ্যাবাদী ও অসত্য নবী। অথচ এ ব্যাপারে সত্য তা-ই, যা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি খোদা নন, (বরং) খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা; মিথ্যাবাদী নবী নন, (বরং) সত্যবাদী পয়গম্বর। তাঁর বংশ-কুল সবই পাক-পবিত্র। আল্লাহ তাঁকে كلمة الله (কালিমাতুল্লাহ) বলেছেন। আর হতে পারে যে, قول الحق -এর অর্থও এখানে 'কালিমাতুল্লাহ'।

২. যাঁর শুধু كن (হয়ে যা) বলার দ্বারা প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে ফেলে, তাঁর পুত্র ও নাতি-নাতনির কী প্রয়োজন? সন্তানসন্ততি কি দুর্বলতার সময়ে তাঁকে আশ্রয় দিবে, অথবা দুর্দিনে সাহায্য করবে, অথবা পরবর্তীকালে তাঁর নাম রক্ষা করবে?

আর যদি এ সন্দেহ হয় যে, সাধারণত মানবশিশু পিতামাতার মাধ্যমে জন্মলাভ করে। হযরত মাসীহর পিতা কে? এর উত্তরও كُنۡ فَيَكُوۡنُ বাক্যের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী সত্তা আল্লাহর পক্ষে পিতাবিহীন এক শিশু সৃষ্টি করে দেওয়া কি অসম্ভব? খ্রিস্টানরা তো খোদাকে পিতা এবং মারয়ামকে মাতা বলে, তবে কি তারা এও বলবে যে, এই উভয়ের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও হয়েছে? যদি না বলে, তাহলে তো খোদাকে পিতা বলা সত্ত্বেও স্বীকার করা হল যে, অন্যান্য শিশু পিতা-মাতা থেকে যেভাবে জন্ম লাভ করে, ঈসা (আ.) সেভাবে সৃষ্টি হননি। অতএব এ কথা মেনে নিতে বাধা কোথায় যে, তিনি পিতা ছাড়া শুধু মাতা থেকে জন্মলাভ করেছেন?

يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۝

উপস্থিত হবে [১]।

اَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَاَبۡصِرۡ يَوۡمَ يَاۡتُوۡنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوۡنَ الۡيَوۡمَ فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۝

৩৮. যেদিন ওরা আমার কাছে আসবে, সেদিন কতই না শুনবে ও দেখবে! কিন্তু জালেমরা আজ স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে[২]।

وَاَنۡذِرۡهُمۡ يَوۡمَ الۡحَسۡرَةِ اِذۡ قُضِىَ الۡاَمۡرُ ۘ وَهُمۡ فِىۡ غَفۡلَةٍ وَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝

৩৯. আপনি ওদের সতর্ক করুন অনুশোচনার দিন সম্বন্ধে, যখন সব কিছুর মীমাংসা করে দেওয়া হবে[৩]; অথচ ওরা গাফলতে পড়ে আছে এবং ওরা ঈমান আনছে না[৪]।

---

১. এটা (আয়াত ৩৬-৩৭) কার কথা? কারো কারো মতে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের উক্তি। قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ الخ থেকে হযরত মাসীহ-এর বক্তব্য শুরু হয়েছিল। এখানে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। মাঝে ذٰلِكَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ থেকে আল্লাহ তাআলার কালাম।

তবে আমার নিকট উত্তম হচ্ছে, একে وَاذۡكُرۡ فِى الۡكِتٰبِ مَرۡيَمَ الخ এর সঙ্গে যুক্ত করা। অর্থাৎ এটাও আল্লাহর কালাম। ইরশাদ হয়েছে– (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কিতাবের মধ্যে মারয়াম ও মাসীহর উল্লিখিত হাল-অবস্থা শুনিয়ে বলে দিন, 'আমার ও তোমাদের সকলেরই প্রভু আল্লাহ। অতএব একমাত্র তাঁরই বন্দেগী কর, তাঁর জন্য সন্তানসন্ততি সাব্যস্ত করো না। এই খাঁটি তাওহীদের পথই হচ্ছে সরল পথ, যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই। সকল পয়গম্বর এরই দিকে আহ্বান করে গেছেন। কিন্তু লোকেরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে এবং তাওহীদ-বিরোধী পৃথক পৃথক পথ বের করেছে। অতএব যারা তাওহীদকে অস্বীকার করছে, তাদের বড়ই ভয়াবহ দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবস সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত, যা আসবেই আসবে।

২. অর্থাৎ আজ দুনিয়াতে যখন শোনা ও দেখা উপকারী, তখন ওরা সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধীর হয়ে আছে। আর কিয়ামতের দিন যখন দেখা ও শোনায় কোন ফায়দা হবে না, তখন চোখ ও কান উত্তমরূপে খুলে যাবে। সেদিন এমন কথা শুনবে যাতে কলিজা ফেটে যাবে এবং এমন দৃশ্য দেখবে যাতে চেহারা কালো হয়ে যাবে। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. কাফেরদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আফসোস ও অনুশোচনা করা লাগবে। সর্বশেষ ক্ষেত্র তা, যখন মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে আনা হবে এবং বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে সকলকে দেখিয়ে তা যবেহ করে ঘোষণা দেওয়া হবে, বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে সর্বদার জন্য থাক। এরপর কারো মৃত্যু আসার নয়। তখন কাফেররা একেবারে নিরাশ হয়ে অনুশোচনায় হাতের আঙ্গুল কামড়াবে। কিন্তু তখন আফসোস করে কী ফায়দা?

৪. অর্থাৎ এখন ওদের বিশ্বাস নেই যে, সত্যিই এমন দিন আসবে। ওরা গাফলতের মধ্যে আছে এবং বড় মারাত্মক ভুলে ডুবে রয়েছে। হায়, এখন যদি ওদের চোখ খুলত এবং নিজ লাভ-লোকসান বুঝত! সেদিন আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়া অন্য কিছু লাভ হবে না।

৪০. নিশ্চয় আমিই পৃথিবীর ও পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের ওয়ারিস (মালিক) হব এবং তারা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।	إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

[রুকূ - ৩]

৪১. আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা আলোচনা করুন[২]। নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি সত্যবাদী, নবী[৩]।	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

১. অর্থাৎ কারো রাজত্ব ও মালিকানা অক্ষত থাকবে না। সব কিছু সরাসরি প্রকৃত মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী হবেন– যে জিনিসে যেভাবে চাইবেন, নিজের হেকমত অনুযায়ী অধিকার খাটাবেন। দুনিয়ার যেসব উপায়-উপকরণ তোমাদেরকে গাফলতে ফেলে রেখেছে, সেসবের একমাত্র ওয়ারিস হয়ে যাবেন। মালিকানা ও রাজত্বের বড় বড় দাবিদারকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

২. পূর্ববর্তী রুকূতে হযরত মাসীহ ও মারয়ামের ঘটনা বর্ণনা করে খ্রিস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছিল, যারা একজন মানুষকে খোদার আসনে বসায়। বর্তমান রুকূতে মক্কার মুশরিকদের লজ্জা দেওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি কেমন করে নিজের পিতাকে পর্যন্ত শিরক ও মূর্তিপূজায় বাধা প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। মক্কার মুশরিকদের দাবি ছিল, তারা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং তাঁর দীন-ধর্মের অনুসারী। তাদের বলা হচ্ছে যে, মূর্তিপূজা সম্পর্কে তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতাদর্শ এই ছিল। যদি বাপদাদার অনুসরণ করতে চাও, তবে এই বাপের অনুসরণ কর এবং মুশরিক বাপদাদা থেকে তেমনি নিঃসম্পর্ক হয়ে যাও, যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হয়েছিলেন।

৩. 'সিদ্দীক' এর অর্থ অতি সত্যবাদী, যিনি নিজ কথাকে বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যে পরিণত করেন। তদ্রূপ 'সিদ্দীক' বলে সেই ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকেও, যার অন্তর সত্যবাদিতা কবুল করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে ও এর পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু আসে, তা তার অন্তরে গেঁথে যায় এবং কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সব অর্থের দিক থেকেই 'সিদ্দীক' ছিলেন। আর যেহেতু সিদ্দীক হলেই নবী হতে হবে– এমন কোন কথা নেই, সে জন্য صديقا এর সঙ্গে نبيا যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, তিনি নবীও ছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনটি মিথ্যাসম্পর্কিত হাদীস এবং نَحْنُ أَحَقُّ بالشك من إبراهيم (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৭২) ইত্যাদি রেওয়ায়েতে كذب وشك এর সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয়, যা বাহ্যত বুঝে আসে।

৪২. (স্মরণ করুন), যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন এমন জিনিসের উপাসনা কর, যা শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না[১]?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ۝

৪৩. 'হে আমার পিতা! আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার নিকট আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখিয়ে দেব[২]।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ۝

৪৪. 'হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না, নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের চরম অবাধ্য[৩]।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۝

৪৫. 'হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের পক্ষ থেকে কোন শাস্তি স্পর্শ করবে। ফলে তুমি শয়তানের সাথী হয়ে যাবে[৪]।'

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ۝

---

১. অর্থাৎ যে জিনিস দেখতে ও শুনতে পারে এবং বিপদাপদে কিছুটা উপকারেও আসে, কিন্তু واجب الوجود (যার সত্তা নিজ অস্তিত্বে কারো মুখাপেক্ষী নয়) না– তার ইবাদত করা যেখানে জায়েয নয়, সেখানে পাথরের একটি প্রাণহীন মূর্তি, যা দেখে না, শোনে না এবং আমাদের কোনো উপকারেও আসে না, এবং যা স্বয়ং আমাদের হাতে তৈরী– তাকে মা'বূদ সাব্যস্ত করা কোনো বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোকের কাজ হতে পারে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদির বিশুদ্ধ ইলম দান করেছেন এবং শরীয়তের গভীর বিষয়াদি সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। সুতরাং তোমরা যদি আমার আনুগত্য কর, তবে আমি তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করব, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এ ছাড়া আর সকল পথ ঋজু ও বাঁকা, যেগুলোর উপর চলে কোনো ব্যক্তি মুক্তি পাবে না।

৩. শয়তানের প্ররোচনায়ই মূর্তিপূজা হয়ে থাকে এবং এ কাজ দেখে শয়তান খুব খুশী হয়।এ হিসাবে মূর্তিপূজা বলতে গেলে শয়তানের পূজা। আর নাফরমান (শয়তান)-এর পূজা করা রহমান-এর চরম নাফরমানী। উল্লেখ্য যে, শয়তানের প্রথম নাফরমানী সর্বপ্রথমতখন প্রকাশ পেয়েছিল, যখন ওকে তোমাদের আদি পিতা আদমের সামনে সেজদাবনত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। অতএব রহমানকে ছেড়ে নিজেদের এই চিরশত্রুকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া আদম সন্তানদের জন্য ডুবে মরার শামিল।

৪. অর্থাৎ দয়াময়ের মহাদয়ার দাবি হচ্ছে, সকল বান্দার উপর দয়া-মায়া ও মেহেরবানী করা। কিন্তু পিতা হে! তোমার বদ আমলের কারণে ভয় হয়, না জানি এমন সহনশীল ও মেহেরবান

৪৬. সে বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব। আর তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও[১]।'

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ۝٤٦

৪৭. ইবরাহীম বললেন, 'তোমার প্রতি সালাম[২], আমি তো তোমার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি পরম দয়ালু[৩]।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِیًّا ۝٤٧

আল্লাহ রাগ হয়ে যান এবং তোমার উপর কোনো কঠিন বিপদ নাযিল করেন, যার মধ্যে পতিত হয়ে তুমি সর্বদার জন্য শয়তানের সাথী হয়ে যাও। অর্থাৎ কুফর ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত থাকার কারণে ভবিষ্যতে ঈমান ও তওবার তাওফীক না জোটে, ফলে শয়তানের দলে শামিল হয়ে তুমি চিরকালীন আযাবে প্রবেশ কর।

অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতের এই অর্থই করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ভয় হচ্ছে- না জানি কুফরীর শাস্তিস্বরূপ কোন বিপদ আসে, আর তুমি শয়তানের কাছে অর্থাৎ মূর্তি ও প্রতিমার নিকট সাহায্য চাইতে শুরু কর। অধিকাংশ মানুষ এমনি সময়ে শিরক করে থাকে।'

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা শুনে তাঁর পিতা বলল, মনে হয়, আমাদের উপাস্যদের প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই। তুমি তোমার অবিশ্বাস ও ওয়াজ-নসীহত বন্ধ কর, নতুবা তোমাকে অন্য কিছু শুনতে হবে, বরং আমার হাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে আমার নিকট থেকে আজীবনের জন্য দূর হয়ে যাও। আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না। তোমার উপর আমার হাত ওঠার আগেই তুমি এখান থেকে চলে যাও।

২. এটি বিদায় গ্রহণের বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সালাম, যেমন আমরা (উর্দূ ভাষীরা) এমন ক্ষেত্রে বলে থাকি, فلاں بات یوں ہے تو ہمارا اسلام لو , কুরআনের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে- وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (তারা যখন নিরর্থক কথাবার্তা শোনে, তখন তা থেকে দূরে থাকে এবং বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞলোকদের সঙ্গ চাই না। -কাসাস, আয়াত ৫৫)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জানা গেল, যদি দীনি বিষয়ে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হয় এবং ঘর থেকে বের করে দেয়, আর ছেলে মিঠা কথা বলে বের হয়ে যায়, তবে সে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কছিন্নকারী বলে গণ্য হবে না।'

৩. আশা করি, তিনি নিজ মেহেরবানীতে আমার পিতার গোনাহ মাফ করে দেবেন।

৪৮. 'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তাদের। আর আমি আমার রবেরই ইবাদত করব। আশা করি, আমি আমার রবের ইবাদত করে বিফল হব না[১]।'

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا۝

৪৯. অতঃপর তিনি যখন ওদের থেকে এবং ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং উভয়কে করলাম নবী[২]।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۝

হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষমা প্রার্থনার এ ওয়াদা অনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু যখন দেখলেন, এতে আল্লাহ তাআলার মর্যি নেই, তখন তা মওকূফ করে দিলেন। সূরা তওবাতে مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ الخ (আয়াত নং ১১৩) এর অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ আমার নসীহতে যেহেতু তোমাদের কোন ফায়দা নেই, বরং উলটা তোমরা আমাকে হুমকি দিচ্ছ, অতএব আমি নিজেই তোমাদের লোকালয়ে আর থাকতে চাই না। তোমাদের ও তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের ছেড়ে আমি দেশ থেকে হিজরত করছি, যাতে একাগ্রচিত্তে প্রশান্ত মনে এক খোদার ইবাদত করতে পারি। আল্লাহ তাআলার ফযল ও রহমতে আমার পরিপূর্ণ আশা এই যে, তাঁর বন্দেগী করে আমি নিষ্ফল ও অকৃতকার্য হব না। দেশান্তরিত ও অসহায় অবস্থায় যখন তাঁকে ডাকব, সেদিক থেকে অবশ্যই সাড়া পাব। আমার আল্লাহ পাথরের মূর্তি নন যে, যতই ডাকি ও কাঁদি না কেন তিনি শুনতে পাবেন না।

২. অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলেন এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে সরে গেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের চেয়ে উত্তম আপনজন তাঁকে দান করলেন, যাতে বিদেশ-বিভূঁইয়ের একাকীত্ব বিদূরিত হয় এবং মহব্বত ও প্রশান্তি হাসিল হয়।

এস্থলে হযরত ইসমাঈলের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়নি যে, তিনি হযরত ইবরাহীমের নিকট থাকতে পারেননি। বাল্যকালেই তাঁকে পৃথক করে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি তাঁর স্বতন্ত্র আলোচনা সামনে আসছে।

বি. দ্র. হযরত ইসহাক (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র, আর হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইসহাক (আ) এর পুত্র। ইয়াকুব (আ.) থেকেই বনী ইসরাঈলের বংশধারা চালু হয়, যাদের মধ্যে শতশত নবী জন্মলাভ করেন।

৫০. আর আমি তাদের দান করলাম আমার রহমত এবং তাদের দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি[১]।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۟

[রুকূ - ৪]

৫১. আপনি কিতাবে মূসার কথা উল্লেখ করুন[২]। নিশ্চয় তিনি ছিলেন মনোনীত এবং ছিলেন রাসূল, নবী[৩]।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۡ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا۟

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজের বিশেষ রহমত তাঁদের দান করেন এবং দুনিয়াতে তাঁদের সুখ্যাতি প্রসারিত করেন এবং সর্বদার জন্য তাঁদের সুনাম জারী রাখেন। এর ফলেই সমস্ত ধর্ম ও মিল্লাত তাঁদের গুণকীর্তন ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সদাসর্বদার জন্য নিজেদের নামাযে এভাবে দুরূদ পাঠ করে : اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

হযরত ইবরাহীম (আ) দো'য়া করেছিলেন- وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি দান করুন।) বস্তুত উক্ত সুখ্যাতি এরই ফসল।

২. অর্থাৎ কুরআন করীমে মূসা আলাইহিস সালামের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তা লোকদের সামনে তুলে ধরুন। কারণ, তিনি ছিলেন ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশে ইসরাঈলী ধারার বিশিষ্ট পয়গম্বর এবং তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বড় শরীয়তধারী। আর যেমনিভাবে হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-এর আলোচনার দ্বারা বিশেষভাবে খ্রিস্টানদের সংশোধন করা এবং ইবরাহীম (আ)-এর উল্লেখ দ্বারা মক্কার মুশরিকদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের আলোচনা দ্বারা সম্ভবত ইহুদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, দেখ– কুরআন কত উদারচিত্তে তোমাদের মহান নেতার প্রকৃত গুণাবলি ও সৌন্দর্যরাশি তুলে ধরেছে। অতএব তোমাদের জন্য উচিত, এ মহা মর্যাদাশালী পয়গম্বরের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসমাঈল বংশীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত ও নবুওয়াতকে স্বীকৃতি প্রদান করা। সম্ভবত এ জন্যই হযরত মূসা (আ)-এর পর আলোচনার ধারা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তির কাছে ওহী আসে তিনি 'নবী'। আর নবীদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন অর্থাৎ কাফেরদের মোকাবেলায় স্বতন্ত্র উম্মতের প্রতি প্রেরিত হন অথবা নতুন কিতাব ও স্বতন্ত্র শরী'য়তধারী হন, তাঁদের 'রাসূল-নবী' বা 'নবী-রাসূল' বলা হয়। শরী'য়তের শাখাগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ, যেমন কোন সাধারণ (عام) বিধানকে সুনির্দিষ্ট করা বা ব্যাপক (مطلق) বিধানকে সীমিত করা প্রভৃতি –এসব রাসূলের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়, সাধারণ নবীগণও তা করতে পারেন।

৫২. আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং তাঁকে নিকটবর্তী করেছিলাম গুপ্ত কথা বলার জন্য*১।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমি নিজ মেহেরবানীতে তাঁকে দান করেছিলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে২।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৪. (এ) কিতাবে ইসমাঈলের কথাও উল্লেখ করুন, তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী এবং ছিলেন রাসূল, নবী১।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

অবশ্য নবী নন, এমন ব্যক্তিদের জন্য 'রাসূল' বা 'মুরসাল' শব্দের প্রয়োগ, যেমন পবিত্র কুরআনের কোনো কোন স্থানে পাওয়া যায় –তো এসব স্থানে পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অন্যান্য বিবেচনায় সেখানে রাসূল/মুরসাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁকে বিশেষ নৈকট্য দান করলাম যে, তিনি (আমার সাথে) একান্তে কথোপকথন করলেন।

১. অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম যখন আগুনের ফুলকি মনে করে তূর পাহাড়ের সেই অংশে পৌঁছলেন, যা ছিল তাঁর ডানে, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ডাক দিলেন এবং নিজের সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য দান করলেন। সূরা 'তা-হা'-তে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

বলা হয় যে, মূসা আলাইহিস সালাম তখন চতুর্দিক থেকে এবং শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে পাচ্ছিলেন, যা ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হচ্ছিল। আর রূহানীভাবে তিনি এতই নৈকট্য হাসিল করেন ও উচ্চস্তরে উপনীত হন যে, গায়বী কলমের (লেখার) শব্দ শুনতে পারছিলেন, যার মাধ্যমে তাওরাতের কপি তৈরি হচ্ছিল।

আর ওহীকে 'গুপ্ত কথা' (بهيد) এজন্য বলা হয়েছে যে, তখন অন্য কোনো মানুষ সেই কালাম শুনছিল না, একমাত্র মূসাই শুনছিলেন। যদিও পরে অন্য লোকদেরও তা অবহিত করা হয়েছিল।

২. অর্থাৎ হারূন আলাইহিস সালাম হযরত মূসার নবুওয়াতি কাজে সহযোগী হন, মূসা (আ.) নিজেই এর জন্য দরখাস্ত করে বলেছিলেন- وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي (আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে পাঠান, যেন সে আমার সমর্থন করে। –সূরা কাসাস, আয়াত ৩৪) এবং – وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي الخ (আর আমাকে দিন আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী– অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে। –সূরা তাহা, আয়াত ২৯) –আল্লাহ তাআলা দরখাস্ত কবুল করলেন এবং হারূনকে নবী বানিয়ে মূসার সাহায্য ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। হারূন বয়সে বড় ছিলেন। বলা হয় যে, দুনিয়াতে কেউ নিজ ভাইয়ের জন্য তত বড় সুপারিশ করেননি, যেমনটি মূসা আলাইহিস সালাম হযরত হারূনের জন্য করেছিলেন।

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

৫৫. এবং তিনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন[২]।

১. এর দ্বারা হযরত ইসহাকের তুলনায় হযরত ইসমাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইসহাক (আ)-কে কেবল নবী বলেছেন, আর ইসমাঈল (আ)-কে 'রাসূল-নবী' বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل (আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমের সন্তানসন্ততির মধ্য থেকে [বিশেষভাবে] ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন।) (হাদীসটি জামে তিরমিযীতে পাওয়া গিয়েছে, হাদীস নং ৩৯৩২)

হযরত ইসমাঈল (আ) হলেন হিজাযীয় আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ এবং আমাদের নবী আলাইহিস সালামের পূর্বপুরুষদের একজন। তিনি ইবরাহীমী শরী'য়তসহ 'জুরহুম' গোত্রের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি 'ওয়াদা-রক্ষাকারী' হিসাবে খুবই খ্যাত ছিলেন। আল্লাহর সঙ্গে বা বান্দার সাথে যে ওয়াদাই করতেন, তা তিনি পূর্ণ করে ছাড়তেন। একবার এক ব্যক্তির সাথে ওয়াদা করেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না আসবে আমি এখানেই থাকব।' কথিত আছে, সে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত আসেনি, আর তিনি সেখানেই এক বছর অবস্থান করেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হামসা নামে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'আপনি এখানে থাকুন, আমি এখনি আসছি।' হযরত তিন দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। সে ব্যক্তি ফিরে আসলে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ, আমি ওয়াদা মত তিনদিন যাবৎ এখানেই আছি।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯৬)

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ওয়াদা পালনের চরম পরাকাষ্ঠা তখন প্রকাশ পায়, যখন তিনি নিজ পিতা ইবরাহীম (আ)-কে বলেছিলেন- يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা করে ফেলুন। আপনি আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। –সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২), এবং তিনি তেমনই করে দেখিয়েছিলেন।

২. কেননা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে পরিবার-পরিজন হেদায়াতের প্রথম হকদার এবং তাদের দ্বারাই হেদায়াতের ধারা সম্মুখে প্রবাহিত হয়। এ জন্যই অন্যত্র বলা হয়েছে- وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (আর আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন। –সূরা তা-হা, আয়াত ১৩২) এবং– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর। –সূরা তাহরীম, আয়াত ৬) স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে-وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (আর আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করুন। –সূরা শু'আরা, আয়াত ২১৪)

কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'আহ্‌ল' (পরিবার-পরিজন) দ্বারা হযরত ইসমাঈল আ.-এর সমগ্র জাতি উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মুসহাফে أهله এর স্থলে قومه ছিল। والله أعلم

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

আর তিনি ছিলেন তাঁর রবের নিকট পছন্দনীয়[১]।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا

৫৬. (এ) কিতাবে ইদরীসের কথাও উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি সত্যবাদী, নবী[২]।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

৫৭. এবং আমি তাঁকে উন্নীত করেছি এক উচ্চস্থানে[৩]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا

৫৮. এঁরাই সেই নবীগণ, যাঁদের প্রতি আল্লাহ (বিশেষ) অনুগ্রহ করেছেন – (এঁরা সবাই) আদমের বংশধর, আর (কতক) তাঁদের বংশধর যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম এবং (কতক) ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর[৪], আর (তাঁরা সবাই) এমন যে, আমি (তাঁদের)

---

১. অর্থাৎ তিনি অন্যদের হেদায়েত করতেন এবং নিজের কাজকর্মে ও কথাবার্তায় ছিলেন সন্তোষভাজন, অবিচল ও সদাচারী।

২. অধিক নির্ভরযোগ্য মত এই যে, হযরত ইদরীস (আ.) আবির্ভূত হন হযরত আদম (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তীকালে। বলা হয় যে, দুনিয়াতে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, কলম দিয়ে লেখা, কাপড় সেলাই করা, ওজন ও মাপের সরঞ্জাম এবং অস্ত্রসস্ত্র তৈরি –করা– সর্বপ্রথম তাঁর দ্বারা চালু হয়। والله أعلم –মেরাজের রাতে চতুর্থ আকাশে তাঁর সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮২)

৩. অর্থাৎ আল্লাহ নৈকট্য ও মারেফতের অতি বুলন্দ মাকাম ও উঁচু স্থানে তাঁকে পৌছান।

কেউ কেউ বলেন, হযরত মাসীহর ন্যায় তাঁকেও জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এখন পর্যন্ত সেখানে জীবিত আছেন। কারো কারো ধারণা, আকাশে নিয়ে গিয়ে তাঁর রূহ কব্‌জ করা হয়। মুফাসসিরগণ তাঁর সম্পর্কে বহু ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে কাছীর (র) সেগুলোর সমালোচনা করেছেন।

৪. অর্থাৎ আলোচ্য সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত যত নবীর উল্লেখ হয়েছে, তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহ-বৃষ্টি বর্ষন করেছেন। এঁরা সকলে আদম (আ)-এর সন্তানসন্ততি এবং ইদরীস (আ) ছাড়া অবশিষ্ট সকলে তাঁদেরও সন্তান-সন্ততি, যাঁদের আমি নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। আর কিছু সংখ্যক ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর, যেমন- ইসহাক, ইয়াকূব, ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম। আর কেউ কেউ ইসরাঈল (ইয়াকূব) আলাইহিস সালামের বংশধর, যেমন- মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা আলাইহিমুস সালাম।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

হেদায়েত দান করেছি ও মনোনীত করেছি[১]। যখন তাঁদের সম্মুখে দয়াময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন[২]।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

৫৯. অতঃপর, তাঁদের পরে অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এল, যারা নামায নষ্ট করে ফেলল এবং (নফসের) কামনা-বাসনার অনুগামী হয়ে গেল। অতএব তারা শীঘ্রই গোমরাহীর (পরিণামের) সম্মুখীন হবে[☆][৩]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৎপথের দিশা দান করেছেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন।

২. অর্থাৎ এত উচ্চ মর্যাদা ও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করা সত্ত্বেও বন্দেগী ও দাসত্ব তাঁদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর কালাম শুনে এবং এর বিষয়বস্তুর প্রভাবে তাঁরা অত্যন্ত নম্রতা ও খুশূ-খুযূর সাথে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন এবং তা স্মরণ করে ক্রন্দন করতেন। এ জন্যই আলেমদের সর্বসম্মত মত এই যে, এ আয়াত পড়লে বা শুনলে সেজদা করা উচিত, যাতে উল্লিখিত নৈকট্যধারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য হাসিল হয়ে যায়। কতক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সূরা মারয়াম পাঠ করে সেজদা করলেন এবং বললেন- هذا السجود فأين البكاء (এ তো হল সেজদা, কিন্তু কান্না কোথায়?) [তাফসীরে তবারী ১৫/৫৬৬]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এস্থলে آيات الرحمان দ্বারা বিশেষ করে সেজদার আয়াতসমূহ এবং سجّدا দ্বারা তেলাওয়াতের সেজদা উদ্দেশ্য। তবে এস্থলে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য। হাদীসে আছে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং কাঁদ। তবে কান্না না এলে (কমপক্ষে) কান্নার ভান কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস : ১৩৩৭; মুসনাদে বায্যার, হাদীস ১২৩৫– এর সনদ দুর্বল)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।' বা: গাইয়্যা (জাহান্নামের একটি গহ্বর)-তে প্রবেশ করবে।

৩. সেটা তো ছিল পূর্ববর্তীদের অবস্থা, আর এ হচ্ছে পরবর্তীদের অবস্থা। এরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় মত্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে গেল, এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযকে বিনষ্ট করল। কেউ কেউ তো নামায যে ফরয, তাই অস্বীকার করে বসল। কেউ কেউ ফরয স্বীকার করল বটে, কিন্তু পড়ল না। কেউ কেউ তো পড়ল, কিন্তু জামাত ও ওয়াক্ত, শর্তাবলি ও নিয়মাবলির প্রতি গুরুত্ব দিল না।

৬০. তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র জুলুম করা হবে না[১];

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ۝٦٠

৬১. (প্রবেশ করবে) চিরকাল বসবাসের উদ্যানরাজিতে, যার ওয়াদা দয়াময় (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের সঙ্গে করেছেন তাদের অলক্ষে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হবেই[২]।

جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا ۝٦١

৬২. তারা সেখানে সালাম ছাড়া কোন নিরর্থক কথা শুনবে না[৩] এবং তাদের জন্য সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় থাকবে রিযিক[৪]।

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝٦٢

এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোমরাহীর ফল দেখে নেবে যে, তা কেমন ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হয় এবং কী ধরনের শাস্তির মধ্যে ফাঁসিয়ে দেয়। এমনকি, এদের কতককে জাহান্নামের সেই নিকৃষ্টতম গহ্বরে প্রবেশ করানো হবে, যার নামই হচ্ছে غَيّ ।

১. অর্থাৎ তওবার দরজা এহেন অপরাধীদের জন্যও বন্ধ নয়। যে গোনাহগার খাঁটি দিলে তওবা করে ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে এবং নিজের চাল-চলন দুরুস্ত রাখবে, বেহেশতের দ্বারসমূহ তার জন্য খোলা থাকবে। তওবার পর যেসব নেক আমল করবে, পূর্ববর্তী গোনাহের কারণে এসব আমলের প্রতিদানে কোনো কমতি করা হবে না এবং কোন ধরনের পাওনাও বিনষ্ট হবে না। হাদীসে আছে- التائب من الذنب كمن لاذنب له (গোনাহ থেকে তওবাকারী এমন, যেমন সে গোনাহ করেইনি।) (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪২৫০; ফাতহুল বারী : ১৩/৪৭১) اللّٰهُمَّ تب علينا إنك أنت التواب الرحيم

২. যেহেতু এ বান্দারা পয়গম্বরদের কথায় অদৃশ্যের বিষয়াদির প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে না দেখেও তাঁর ইবাদত করেছে, সুতরাং আল্লাহ তাআলাও তাদের সঙ্গে জান্নাতের অদৃশ্য নে'য়ামতের ওয়াদা করেছেন, যে ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা, আল্লাহর ওয়াদা একেবারে অকাট্য ও অটল হয়ে থাকে।

৩. অর্থাৎ জান্নাতে অযথা কথাবার্তা এবং অহেতুক হট্টগোল হবে না। তবে ফেরেশতা ও মুমিনদের পক্ষ থেকে সালামের আওয়াজ উচ্চারিত হতে থাকবে।

৪. সকাল-বিকাল বলতে এস্থলে জান্নাতের সকাল-বিকালই উদ্দেশ্য। সেখানে তো দুনিয়ার মত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হবে না, এবং এর দ্বারা রাতদিন ও সকাল-বিকাল নিরূপিত হবে না। বরং সেখানে বিশেষ ধরনের 'নূর' (আলো ও জ্যোতি) উদ্ভাসিত হতে থাকবে, যার দ্বারা সকাল-বিকাল নিরূপিত হবে। নিয়মিতভাবে সকালে ও বিকালে জান্নাতি খাবার-দাবার পরিবেশিত হবে, এক মিনিটের জন্যও জান্নাতাবাসীদের ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। সেই খাবার কীরূপ হবে? আল্লাহই তা জানেন।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৩. এ-ই সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের বানাব, যারা পরহেযগার[১]।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৪. (জিবরাঈল বললেন,) 'আমরা আপনার রবের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা কিছু আমাদের সামনে, যা কিছু আমাদের পিছনে এবং যা কিছু এর মধ্যস্থলে– সবই তাঁর মালিকানাধীন। আর আপনার রব ভুলে যাওয়ার নন[২]।

হাদীসে আছে- يسبحون الله بكرة وعشيا (জান্নাতীরা সকালে ও বিকালে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করবেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩২৪৫) অর্থাৎ দৈহিক খাদ্যের সাথে আত্মিক খাদ্যও পরিবেশিত হতে থাকবে।

১. অর্থাৎ তারা হযরত আদমের মীরাছ লাভ করবে। তাঁর মীরাছ এই অর্থে যে, তিনিই প্রথমে বেহেশত লাভ করেন। আর 'মীরাছ' শব্দটি সম্ভবত এজন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে, মালিকানার যত ধরন আছে, তার মধ্যে মীরাছ বা উত্তরাধিকারই সর্বাপেক্ষা মজবুত ও পূর্ণাঙ্গ, কেননা এই মালিকানায় ভঙ্গ করা বা ফেরত নেওয়া অথবা বাতিল করার আশংকা নেই।

২. একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কয়েক দিন পর্যন্ত আগমন করেননি। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুণ্ঠিত ছিলেন। এদিকে কাফেররা বলতে লাগল, মুহাম্মদকে তাঁর প্রভু অসন্তুষ্ট হয়ে ত্যাগ করেছেন। এই ঠাট্টা-বিদ্রূপে তিনি আরো ভারাক্রান্ত হলেন। পরিশেষে জিবরাঈল তশরীফ আনলেন। হুযূর তাঁকে এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অন্য হাদীসে আছে, তিনি জিবরাঈলকে বললেন- ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا (আপনি যতটা আসেন, তার থেকে আরো বেশি আসতে পারেন না?) আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে নির্দেশ দিলেন যে, উত্তরে বল– ومانتنزل إلا بأمر ربك الخ (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭৪৫৫)। এটা এমন, যেমন আল্লাহ আমাদের বলতে শিখিয়েছেন– اياك نعبد واياك نستعين

জিবরাঈলের উত্তরের সারকথা এই যে, আমরা একান্ত আল্লাহর দাস, তাঁর আদেশ ছাড়া একটু নড়তেও পারি না। আমাদের উপরে ওঠা ও নীচে অবতরণ করা সবই তাঁর হুকুম ও অনুমতির অধীন। তিনি নিজের পরিপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী যখন মুনাসিব মনে করেন, তখন আমাদের নীচে অবতরণের হুকুম দেন। কেননা, সমস্ত কাল (অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান) ও সমস্ত স্থান (আকাশ, পৃথিবী ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান) সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান তাঁরই আছে এবং তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও প্রভু। তিনিই জানেন, ফেরেশতাকে পয়গম্বরের নিকট কখন পাঠানো উচিত। সর্বাপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালী

৬৫. (তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, তার রব। অতএব আপনি তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতে অবিচল থাকুন[১]। আপনি কি তাঁর নামের কাউকে জানেন[*][২]?

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۟

পয়গম্বরেরও অধিকার নেই- যখন ইচ্ছা কোথাও চলে যাওয়ার অথবা কাউকে নিজের কাছে ডেকে পাঠানোর। আল্লাহ তাআলার সকল কাজ যথাযথ ও যথাসময়ে হয়ে থাকে। ভুল-ভ্রান্তি বা বিস্মৃতি ও গাফলতের কোনো অবকাশই তাঁর দরবারে নেই।

মোটকথা, জিবরাঈলের তরিৎ বা দেরিতে আগমনও আল্লাহর হেকমত ও ইচ্ছার অধীন।

বি. দ্র. ১.

ফেরেশতা (ما بين أيدنا...) আমাদের 'সামনে-পিছনে' যা আছে- বলে আকাশ ও পৃথিবী উদ্দেশ্য করেছেন। অবতরণ করার প্রাক্কালে পৃথিবী সামনে ও আকাশ পিছনে, আর উপরে আরোহন করার সময় পৃথিবী পিছনে ও আকাশ সামনে থাকে। আর যদি 'সামনে-পিছনে' দ্বারা কালের আগ-পর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'যা কিছু সামনে' বলতে ভবিষ্যৎকাল, 'যা কিছু পিছনে' বলতে অতীতকাল আর 'যা কিছু এর মাঝে' বলতে বর্তমানকাল উদ্দেশ্য হবে।

বি. দ্র. ২.

পূর্বে বলা হয়েছে, জান্নাতের উত্তরাধিকারী হচ্ছে আল্লাহভীরু পরহেজগারগণ। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, ভয় করতে হবে একমাত্র সেই সত্তাকে, যার কব্জায় রয়েছে সমস্ত কাল ও স্থান এবং যাঁর হুকুম ও অনুমতি ছাড়া বড় থেকে বড় ফেরেশতাও এক কদমও নড়তে পারেন না। মানুষের উচিত, জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে চাইলে ফেরেশতাদের মত আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাওয়া।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, যেই আল্লাহ পাক আপন খাঁটি বান্দাদের দুনিয়াতে ভোলেন না, তিনি আখিরাতেও তাদের ভুলবেন না– অবশ্যই জান্নাতে পৌছে দিয়ে ছাড়বেন। হাঁ, প্রত্যেক জিনিসের একটি সময় আছ, জান্নাতে প্রত্যেকের প্রবেশ নির্ধারিত সময়ে হবে। আর দুনিয়াতে যেমন ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পয়গম্বরের নিকট আসেন, তেমনি জান্নাতে জান্নাতবাসীদের রূহানী ও দৈহিক খাদ্যও সকাল-বিকাল নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাবে।

১. অর্থাৎ কারো কথার পরোয়া করবেন না। আপনি নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীতে একনিষ্ঠ রাখুন, যিনি নিখিল জাহানের রব এবং সকল থেকে আলাদা (বিশিষ্ট) গুণাবলির অধিকারী।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁর সমগুণের কাউকে জানেন'?

২. আল্লাহর নাম হচ্ছে তাঁর গুণাবলি, সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে– তাঁর সমগুণের কেউ আছে কি? যখন কেউ নেই, তখন বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া আর কে হতে পারে?

[রুকূ - ৫]

৬৬. মানুষ বলে, 'আমি যখন মরে যাব, তখনও কি আমাকে জীবিত করে আবার (মাটি থেকে) বের করা হবে[১]?'	وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
৬৭. মানুষের কি স্মরণ নেই যে, আমি তাঁকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না[২]?	اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾
৬৮. অতএব আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই ওদের ও শয়তানদের সমবেত করব[৩]। অতঃপর ওদের অবশ্যই জাহান্নামের পাশে নতজানু অবস্থায় হাযির করব[৪]।	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾
৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দল থেকে তাদের পৃথক করে নেব, যারা তাদের মধ্যে দয়াময়ের সবচেয়ে বেশি অবাধ্য ছিল।	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

১. পূর্বের রুকূতে নেককার ও বদকারদের মৃত্যু-পরবর্তী পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছিল। আর এখানে যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব ও অকল্পনীয় মনে করে, তাদের সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, মানুষ বিস্ময় প্রকাশ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলে, মরে-পচে যখন আমাদের হাড়-গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে এবং মাটিতে মিশে যাবে, তার পরও কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে ওঠানো হবে এবং আমরা অনস্তিত্ব থেকে বের হয়ে পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করব?

২. অর্থাৎ মানুষ হয়ে এত মোটা কথাও বুঝতে পারে না যে, কিছুকাল পূর্বে সে কোনো বস্তুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলেন। তো, যেই সত্তা নির্বস্তুকে বস্তুতে এবং অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে পরিণত করলেন, তিনি কি একটি জিনিস ফানা (নিঃশেষ) করে দিয়ে তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? মানুষের যদি তার প্রথম অস্তিত্বের কথা মনে থাকত, তবে দ্বিতীয়বারের অস্তিত্বের বিষয়ে ঠাট্টা করতে পারত না। وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। -সূরা রোম, আয়াত ২৭)

৩. অর্থাৎ এই অস্বীকারকারীদের কিয়ামতের দিন শয়তানদের সাথেই আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে, যারা তাদের পথভ্রষ্ট করত। প্রত্যেক অপরাধীর শয়তান তার সাথে উপস্থিত হবে।

৪. অর্থাৎ প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্কের কারণে ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না– দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যাবে, আবার নিশ্চিন্ত অবস্থায়ও বসে থাকতে পারবে না। একেই বলা হয়ছে, নতজানু অবস্থায় হাজির করা হবে।

৭০. আর আমিই তাদের সম্পর্কে বেশি অবগত, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য[১]।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا۝

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। এটা আপনার রবের যিম্মায় অবধারিত (এবং) মীমাংসিত বিষয়।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۝

৭২. তারপর আমি, যারা (স্বীয় রবকে) ভয় করেছে তাদের বাঁচিয়ে নেব এবং অপরাধীদের তাতে নতজানু অবস্থায় ফেলে রাখব[২]।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا۝

৭৩. আর যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেররা ঈমানদারদের বলে, 'দু'দলের মধ্যে কোনটির আবাসস্থল উৎকৃষ্ট এবং কোনটির মজলিস অধিক সুন্দর[৩]?'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا۝

---

১. অর্থাৎ কাফেরদের প্রত্যেক দলে যারা সবচেয়ে অবাধ্য ও অহংকারী ছিল, তাদেরকে সাধারণ অপরাধীদের থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। আর এদের মধ্যে কে কঠোরতর শাস্তির যোগ্য ও দোযখের খুবই উপযুক্ত, তা আল্লাহর খুব জানা আছে। তাকে অন্যান্য অপরাধীর পূর্বে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক নেককার ও বদকার, অপরাধী ও নিরপরাধ এবং মুমিন ও কাফের –সকলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মীমাংসা করে ফেলেছেন যে, তাদের অবশ্যই দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। কেননা, জান্নাতে যাওয়ার পথই দোযখের উপর দিয়ে, যাকে সাধারণভাবে 'পুলসিরাত' বলা হয়। তার উপর দিয়ে অবশ্যই সকলকে যেতে হবে। আল্লাহভীরু মুমিনগণ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সেখান দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে যাবেন, আর পাপীরা হোঁচট খেয়ে দোযখে পতিত হবে (আল্লাহর পানাহ!)।

কোনো কোনো রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, দোযখের আগুনে (দোযখী, বেহেশতী নির্বিশেষে) প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাখিল করা হবে, তবে পুণ্যাত্মাদের জন্য সেই আগুন শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাবে। তারা কোন কষ্ট ছাড়া তার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৫২০)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ প্রবেশের বহু হেকমত বয়ান করেছেন। তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ কাফেররা পবিত্র কুরআনে নিজেদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা শুনে হাসে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অহংকার করে গরীব মুসলমানদের বলে, 'তোমাদের মুখে আখেরাতে আমাদের যে

৭৪. ওদের পূর্বে আমি এমন কত সম্প্রদায় ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল আসবাব-সরঞ্জামে ও সাজ-সজ্জায় (ওদের চেয়ে) শ্রেষ্ঠ[১]।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا۝

৭৫. আপনি বলুন, 'যে ভ্রান্তিতে আছে, তাকে দয়াময় ঢিল দিয়ে রাখুন*[২]। অবশেষে ওরা যখন সেই বস্তু দেখবে যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হচ্ছে– হয় শাস্তি না হয় কিয়ামত– তখন জানতে পারবে, কার বাসস্থান নিকৃষ্ট ও কার বাহিনী বেশি দুর্বল[৩]।

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا۝

পরিণতির কথা শুনি, উভয় পক্ষের বর্তমান অবস্থা ও পার্থিব মর্যাদা অনুযায়ী তা সঠিক মনে হয় না। আজ আমাদের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ তোমাদের চেয়ে কি উত্তম নয়? এবং আমাদের মজলিস বা সমাজ তোমাদের সমাজ থেকে বেশি সম্মানজনক নয়? আমরা যারা তোমাদের মতে বাতিলের উপর আছি, নিশ্চয় সত্যপন্থীদের চেয়ে বেশি সুখের অবস্থায় রয়েছি এবং আমাদের দলও অনেক ভারী। অতএব (আখেরাত বলে কিছু থাকলে) সেখানে আমরাই বেশি সুখী হব। আর যারা আমাদের ভয়ে আজ সাফা পর্বতের উপত্যকায় নজরবন্দী, তাদের ব্যাপারে কি এ কথা বিশ্বাস করা যায় যে, কাল তারাই এক লাফে জান্নাতে গিয়ে পৌছবে, আর আমরা দোযখে পড়ে জ্বলতে থাকব?

১. কাফেরদের উক্ত কথার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যারা দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমকে বর্তমানের কাফেরদের চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল। কিন্তু তারা যখন নবীদের মোকাবেলায় ঔদ্ধত্য দেখাল এবং খুব গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মূলোৎপাটন করে দিলেন। ফলে দুনিয়ার বুকে তাদের নাম-নিশানও অবশিষ্ট থাকেনি।

অতএব মানুষের উচিত, দুনিয়ার নশ্বর শান-শওকতে ও ক্ষণস্থায়ী বসন্তে প্রতারিত না হওয়া। সাধারণত অহংকারী সম্পদশালীরাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ধন-সম্পদ ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মকবুলিয়ত ও শুভ পরিণতির প্রমাণ নয়।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'তাকে তো দয়াময় অবকাশ দিবেনই।'

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় ভ্রষ্টতায় পতিত হয়, ওকে তিনি ভ্রষ্টতায় থাকতে দেন। কারণ, দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। এখানে প্রত্যেককে মোটামুটি আমলের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় কোন রাস্তা অবলম্বন করে, ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়ার পর তাকে সেই রাস্তাতেই চলার স্বাধীনতা দিয়ে রাখা হয়।

৩. অর্থাৎ কাফেররা মুসলমানদের হীন ও দুর্বল এবং নিজেদের সবল ও সম্মানিত মনে করছে। ওরা নিজেদের চাকচিক্যময় বাসস্থান ও বড় বড় সৈন্যবাহিনী ও জনবল নিয়ে গৌরব করছে।

৭৬. যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের হেদায়েত (সমঝ-বুঝ) বাড়াতে থাকেন[১], আর চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার রবের নিকট প্রতিদানেও উৎকৃষ্ট এবং পরিণামেও শ্রেষ্ঠ[২]।

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

৭৭. আচ্ছা, আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, 'আমাকে অবশ্যই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দেওয়া হবে[৩]?'

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৮. সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে নিয়েছে, না কি সে দয়াময়ের নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে[৪]?

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

কেননা, আল্লাহ তাআলাও ওদের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। যখন পাকড়াও করা হবে– চাই পার্থিব শাস্তির আকারে বা কিয়ামতের পরে, তখন ওরা টের পাবে, কার বাসস্থান মন্দ ও কার জনবল দুর্বল। সেই সময় ওদের সাজসরঞ্জাম ও সৈন্যদল কোনো কাজে আসবে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিপথগামীদের যেমন অবকাশ দেন, তাদের বিপরীতে যারা বুঝে-সুঝে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করে, তাদের বুঝ-সুঝ, চিন্তা-বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিকে আরো সতেজ করে দেন, ফলে সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে দ্রুতগতিতে ছুটে চলতে থাকে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার চাকচিক্য আল্লাহর নিকট কোনো কাজের নয়। হাঁ, সৎকর্মসমূহ (সবই) অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। আর দুনিয়া যখন ফানা হয়ে যাবে, তখন আখেরাতে প্রত্যেক নেকীর উত্তম বিনিময় ও উত্তম পরিণাম পাওয়া যাবে।

৩. **শানে নুযূল**

জনৈক বিত্তবান কাফের এক মুসলমান কর্মকারকে বলল, 'তুমি ইসলাম ত্যাগ কর, তবেই আমি তোমার মজুরী প্রদান করব।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না।' তখন কাফের বলে কি, 'আমি যদি মরে আবার জীবিত হই, তবে সেখানেও আমি এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পাব। তোমাকে সেখানেই মজুরী দেব।' এর উত্তরে বর্তমান আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২০৯১)

আয়াতের মর্ম এই যে, সেখানে সম্পদ লাভ হবে ঈমান থাকলে। কাফের চাইলেও এখানকার ঐশ্বর্য ওখানে পাবে না, কুফর সত্ত্বেও পরকালীন আরাম-আয়েশ ভোগ করবে– এ কখনো সম্ভব নয়।

৪. অর্থাৎ এমন একীন ও প্রত্যয়ের সাথে যে সে দাবি করছে, সে কি তাহলে গায়বের খবর পেয়ে গেছে, না কি আল্লাহর নিকট থেকে কোনো ওয়াদা নিয়ে এসেছে? জানা কথা, উভয়টির

كَلَّا ۭ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۙ﴿۷۹﴾

৭৯. কক্ষনো নয়। (বরং) সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং ওর জন্য শাস্তি বাড়াতে থাকব[১]।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿۸۰﴾

৮০. আর সে যার কথা বলছে, আমি তার ওয়ারিস হয়ে যাব এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী[২]।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۙ﴿۸۱﴾

৮১. ওরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বূদ অবলম্বন করেছে, যাতে তারা ওদের জন্য সহায় হয়[৩]।

كَلَّا ۭ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۲﴾

৮২. কখনো নয়, বরং তারা ওদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং ওদের বিরোধী হয়ে যাবে[৪]।

কোনটিই নয়। একটা অপবিত্র কাফেরের এ সামর্থ্য আছে কি যে, সে এমন অদৃশ্য বিষয়াবলি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে? কখনো না। রইল আল্লাহর ওয়াদা– তা এমন লোকদের ব্যাপারে হতে পারে, যারা আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে এবং কলেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও সৎকর্মের আমানত তাঁর নিকট জমা রেখেছে।

১. অর্থাৎ তার উক্ত কথাও তার আমলনামায় লিখে রাখা হবে। আর সম্পদ ও সন্তানাদির পরিবর্তে তার শাস্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

২. 'সে যার কথা বলছে' অর্থাৎ 'ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি'। তো, আমি সেসব নিয়ে নেব। সে মত ঐ কাফেরের উভয় ছেলে মুসলমান হয়ে গেল। (মুযেহুল কুরআন)–

অথবা অর্থ এই যে, এসব কিছু তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। ফলে, কিয়ামতে সে একলা হাযির হবে– ধন-সম্পদও উপকারে আসবে না, সন্তানসন্ততিও সাহায্য করবে না।

৩. অর্থাৎ ওরা ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির চেয়েও নিজেদের মিথ্যা উপাস্যদের সাহায্যের বেশি আশাবাদী। ওরা আশা করে যে, ঐ মাবুদরা আল্লাহর দরবারে ওদের বড় বড় মর্যাদা দেওয়াবে। অথচ কষ্মিনকালেও এমনটি হওয়ার নয়। এটা শুধুই ওদের কল্পিত ভ্রান্ত ধারণা।

৪. অর্থাৎ সেই উপাস্যরা ওদের সাহায্য করা দূরের কথা, তারা ওদের বন্দেগীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং ওদের বিরোধী হয়ে মর্যাদা বাড়ানোর পরিবর্তে ওদের জন্য আরো বেশি লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে।

[রুকূ - ৬]

৮৩. আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যাতে অনবরত ওদের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৪. অতএব আপনি ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; আমি তো ওদের জন্য (দিন-ক্ষণ) গণনা করছি[১]।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫. (স্মরণ কর), যেদিন আমি পরহেযগারদের দয়াময়ের নিকট সমবেত করব আমন্ত্রিত মেহমানরূপে;

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬. এবং অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব[২]।

وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭. মানুষ সুপারিশের ক্ষমতা রাখবে না, তবে একমাত্র সে (সুপারিশ করতে পারবে), যে দয়াময় থেকে ওয়াদা নিয়েছে[৩]।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

---

১. অর্থাৎ শয়তান এমন হতভাগাদেরই পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে এবং আঙ্গুলের ইশারায় নাচাতে থাকে, যারা নিজেরাই কুফর ও অস্বীকৃতির পথ অবলম্বন করে। এমন হতভাগারা যদি শয়তানের উস্কানী ও প্ররোচনায় ভ্রষ্টতায় এগিয়ে যেতে থাকে, তবে এগিয়ে যেতে দিন। আপনি ওদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ তাআলা ওদের ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যাতে ওদের জীবনের নির্ধারিত দিনগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। ওদের এক একটা শ্বাস, এক একটা মুহূর্ত এবং এক একটা আমল আমার এখানে গুণে রাখা হচ্ছে। সামান্য থেকে সামান্য বিষয়ও আমার জ্ঞান ও ওদের আমলনামা থেকে বহির্ভূত নয়। যখন সময় হবে জীবনের সমস্ত আমল এক এক করে ওদের সামনে রেখে দেওয়া হবে।

২. গবাদি পশু যেমন পিপাসার্ত অবস্থায় পানির ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ অপরাধীদের দোযখের ঘাটে নামানো হবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গ– তাঁরাই আপন মর্যাদানুপাতে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে মুখ নাড়ানোও সম্ভব হবে না। আর তাঁরা এমন লোকদের জন্যই সুপারিশ করতে পারবেন, যাদের ব্যাপারে সুপারিশ গৃহীত হবে বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ হবে না।

৮৮. ওরা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন[১]।'	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾
৮৯. নিশ্চয় তোমরা এক ভয়ানক কথা বলেছ;	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾
৯০. মনে হয় যেন এখনই আকাশমণ্ডলী ফেটে যাবে, যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয় যাবে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়বে-	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾
৯১. এ কারণে যে, ওরা দয়াময়ের জন্য সন্তানের দাবি করে[২]।	اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾
৯২. অথচ এটা সম্ভবই না যে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করবেন[৩]।	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, তাদের সকলে বান্দারূপে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে[৪]।	اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

১. বহু লোক তো আল্লাহ ছাড়া অন্যকে মা'বূদ (উপাস্য) সাব্যস্ত করেছে, আর এক দল আছে, যারা আল্লাহ তাআলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেছে। যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-কে, কতক ইহুদী উযায়রকে আল্লাহর পুত্র বলে । আর আরবের কতক মুশরিক ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলত। نعوذ بالله من ذلك

২. অর্থাৎ এটা এমন গুরুতর উক্তি এবং এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা যে, তা শুনে যদি আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত আতঙ্কের কারণে বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে, তবে তা অসম্ভব নয়। এহেন ধৃষ্টতার কারণে আল্লাহর ক্রোধ উত্তেজিত হয়ে উঠলে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আসমান-যমীন পর্যন্ত টুকরা-টুকরা হয়ে যাবে। কিন্তু এ আল্লাহ তাআলার সহনশীলতা যে, তিনি এসব ধৃষ্টতা ও মূর্খতা দেখেও দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন না। যে পবিত্র সত্তার একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করছে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের উর্ধ্বের ও নিম্নের প্রতিটি অণুপরমাণু, তাঁর জন্য সন্তানের প্রয়োজন সাব্যস্ত করাটা কত বড় ধৃষ্টতা।

৩. এটা তাঁর পাক-পবিত্রতা, মহিমা ও পরম অমুখাপেক্ষিতার পরিপন্থী যে, তিনি কাউকে সন্তান বানাবেন। খ্রিস্টানরা যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, অর্থাৎ 'কাফফারা' (পাপের প্রায়শ্চিত্ত), আল্লাহ তাআলাকে 'রাহমান' (পরম দয়াময়) মেনে নেওয়ার পর তার প্রয়োজনই থাকে না।

৪. অর্থাৎ সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা, আর বান্দা হিসাবেই তাঁর সামনে হাযির হবে। অতএব বান্দা সন্তান হয় কী করে? আর সবাই যাঁর আজ্ঞাধীন ও মুখাপেক্ষী, তাঁর আবার পুত্র গ্রহণের প্রয়োজনই বা কী?

৯৪. নিশ্চয়ই তিনি ওদের পরিসংখ্যান নিয়ে রেখেছেন এবং যথাযথভাবে ওদের গুণে রেখেছেন।

لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

৯৫. আর ওদের প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে আসবে একাকী[১]।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا

৯৬. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় দয়াময় তাদেরকে ভালবাসা দান করবেন*[২]।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

---

১. অর্থাৎ কোন মানুষ তাঁর দাসত্বের বাইরে নয়। আর সকলকেই আল্লাহর সামনে একাকী হাযির হতে হবে। তখন পরস্পরের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। কল্পিত উপাস্য ও নাতি-পুত্র কোনো উপকারে আসবে না।

☆ **২য় তরজমা–** 'তাদের জন্য ভালবাসা পয়দা করে দেবেন।'

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে নিজ ভালবাসা দান করবেন (অর্থাৎ তিনি তাদের প্রিয় হবেন), অথবা তিনি নিজেই তাদের মহব্বত করবেন (অর্থাৎ তারা তাঁর প্রিয় হবে), কিংবা সৃষ্টির অন্তরে তাদের জন্য মহব্বত পয়দা করে দেবেন।

হাদীসে আছে, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন প্রথমে জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, 'আমি অমুক বান্দাকে মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত কর।' তিনি (জিবরাঈল) তখন সমস্ত আকাশে এর ঘোষণা দেন। আর আকাশগুলি থেকে তাঁর মহব্বত পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এবং পৃথিবীবাসীরা সেই বান্দাকে প্রিয়-পাত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি, তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে যাদের কোনো বিশেষ লাভ ও ক্ষতি সম্পৃক্ত নয়, এমন সম্পর্কহীন লোকেরাও তাকে মহ্ববত করতে আরম্ভ করে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭৪৮৫)

তবে এ ধরনের মাকবূলিয়াতের সূচনা হয় পুণ্যাত্মা মুমিন ও আল্লাহর আজ্ঞাবহ লোকদের দ্বারা। প্রথমে তাঁদের অন্তরে তার মহব্বত স্থাপন করা হয়। অতঃপর সাধারণ্যে তার কবুলিয়ত হাসিল হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, প্রথমে শুধু সাধারণ্যে কবুলিয়ত হাসিল হওয়া এবং পরে কোন কোন পুণ্যাত্মারও ভুলবশত বা অন্য কোনো কারণে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া– এ আল্লাহর নিকট মকবুলিয়তের প্রমাণ নয়। খুব ভাল করে বুঝুন।

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতটি মক্কী। আর মক্কা শরীফে মুসলমানদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হয়েছিল, অল্পদিন পরেই তা এমনভাবে পূর্ণ হয় যে, দুনিয়া বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের মধ্যে তাঁদের প্রতি এমন মহব্বত ও ভালবাসা পয়দা করে দেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল।

৯৭. নিশ্চয় আমি এ কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দেন এবং কলহপ্রিয় লোকদের সতর্ক করে দেন[১]।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

৯৮. আর আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনি কি ওদের কারো অস্তিত্ব টের পান, অথবা শুনতে কি পান ওদের কোন সাড়া-শব্দ[২]?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

---

১. অর্থাৎ কুরআন কারীম সহজ সরল ও পরিষ্কার ভাষায় সুস্পষ্টভাবে পরহেজগার লোকদের সুসংবাদ শোনায় এবং কলহপ্রবণ লোকদেরকে তাদের অসৎকর্মের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে।

২. অর্থাৎ কত হতভাগা জাতি নিজেদের পাপাচারের পরিণামে ধ্বংস হয়েছে, যাদের নাম-নিশানাও দুনিয়ার বুক থেকে মুছে গেছে। আজ ওদের পদধ্বনি কিংবা গর্ব-অহংকারের দাপট কিছুমাত্র শোনা যায় না। অতএব যারা এখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধী হয়ে আল্লাহর আয়াতের অস্বীকৃতি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, ওরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকে। হতে পারে , এমন কোনো ধংসাত্মক আযাব এসে তাদেরও বেষ্টন করে নেবে, যা চোখের পলকে তাদের তছনছ করে ফেলবে।

সূরা তোয়া-হা

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২০ । ১৩৫ আয়াত । ৮ রুকূ । মক্কী

آیاتہا ۱۳۵، رکوعاتہا ۸

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-হা।

طٰهٰ ۝

২. আমি আপনার প্রতি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন।

مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ۝

৩. বরং (তা অবতীর্ণ করেছি)– যে ভয় করে তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য[১]।

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

৪. (তা) তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন[২]।

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝

---

১. অর্থাৎ কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, যাদের দিল নরম ও আল্লাহর ভয়ে ভীত, তারা যেন তার আয়াতসমূহের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং রূহানী ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য হয়। কুরআন নাযিল করে আপনাকে কঠিন দুশ্চিন্তা ও কষ্টে পতিত করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কুরআন এমন বস্তুও নয়, যার ধারক ও বাহক কখনো বিফল ও ব্যার্থ হতে পারে। সুতরাং আপনি অবিশ্বাসীদের কথা শুনে বিব্রত ও দুঃখিত হবেন না, ওদের পিছনে পড়ে বেশি কষ্টও করবেন না। সত্যের পতাকাধারী শেষ পর্যন্ত কামিয়াব হবেই। আপনি ভারসাম্য ঠিক রেখে ইবাদত ও দাওয়াতে রত থাকুন।

কোন কোন হাদীছে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমদিকে রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে অনেক বেশি পরিমাণ কুরআন পড়তেন। হযরতের এই মেহনত ও সাধনা দেখে কাফেররা বলত, কুরআন অবতরণের ফলে বেচারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দারুণ কষ্ট ও পরিশ্রমে পড়ে গিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তর প্রদান করা হয়েছে। (তাফসীরে তবারী ১৬/৫; মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৯২৬)

প্রকৃতপক্ষে কুরআন দুশ্চিন্তা ও কষ্টের কারণ নয়, বরং তা নূর ও রহমত। যার পক্ষে যতটুকু সহজ, ততটুকুই আনন্দের সাথে পড়া উচিত, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে : فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (এখন কুরআন থেকে ততটুকু পড়, যতটুকু সহজ হয়। –মুয্যাম্মিল, আয়াত ২০)

২. অতএব সৃষ্টিকুলের পক্ষে অত্যন্ত খুশী মনে ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র কুরআনকে গ্রহণ করা উচিত। এমন রাজকীয় সংবিধানকে অমান্য করা অনুচিত।

৫. (তিনি) বড় মেহেরবান, আরশে সমাসীন হয়েছেন[১]।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

৬. আকাশমণ্ডলীতে যা-কিছু আছে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, এ দুয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু আছে আর্দ্র ভূমির নীচে- সব তাঁরই[২]।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

৭. তুমি যদি উচ্চস্বরে কথা বল, তবে তিনি তো গুপ্ত কথা বরং আরো অধিক গোপন বিষয়ও জানেন[৩]।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝

৮. (তিনিই) আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। উত্তম নামসমূহ তাঁরই[৪]।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝

---

১. إِسْتَوَاء عَلَى الْعَرْش এর বিশদ ব্যাখ্যা সূরা আরাফে (আয়াত নং ৫৪) দ্রষ্টব্য। 'আরশ' সম্বন্ধে হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, তার পায়া আছে এবং বিশিষ্ট ফেরেশতারা তা বহন করেন। আর তা আকাশের উপর গম্বুজের মত (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪১২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৭২৬)। তফসীরে 'রূহুল মাআনী'র লেখক বর্তমান আয়াতের অধীনে عرش এবং استواء على العرش সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার ইচ্ছা দেখতে পারেন।

২. অর্থাৎ তিনিই লা-শরীক এক আল্লাহ, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ও পৃথিবী থেকে ভূগর্ভ (تحت الثرى) পর্যন্ত নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। তাঁরই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সমগ্র সৃষ্টিধারা বিরাজমান।

বি. দ্র. আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সৃষ্টি বলতে হয় বায়ুমণ্ডলের বস্তুরাজি উদ্দেশ্য, যা সর্বদা উভয়ের মাঝখানেই থাকে- যথা বাতাস, মেঘ ইত্যাদি। অথবা সেইসব বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত, যা প্রায়ই শূন্যে বিচরণ করে- যেমন পক্ষীকুল। আর الثرى দ্বারা মাটির নিম্নস্তর উদ্দেশ্য, যা পানির নিকটবর্তী বা এর সংলগ্ন হওয়ার কারণে ভিজা থাকে।

৩. পূর্বে আল্লাহর অসীম কুদরত ও আধিপত্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ- যে কথা উচ্চস্বরে বলা হয়, তা সেই 'আল্লামুল গুয়ূব' থেকে কীভাবে গোপন থাকতে পারে, যিনি গুপ্ত, বরং গুপ্ত থেকে গুপ্ততর বিষয় পর্যন্ত জানেন। যে কথা নির্জনে আস্তে বলা হয় আর যে কথা অন্তরে এসেছে, এখনো মুখে উচ্চারিত হয়নি, এমনকী যে কথা এখনো অন্তরে উদয় হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে হবে- সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। এ জন্যই নিষ্প্রয়োজনে উচ্চস্বরে যিকির করতেও আলেমগণ নিষেধ করেছেন। তবে যেসব ক্ষেত্রে উচ্চস্বরের যিকির বর্ণিত আছে, অথবা নির্ভরযোগ্য কারণে অভিজ্ঞদের কাছে উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্র সাধারণ নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত হবে না।

৪. পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার যেসব গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ তিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বাধিপতি, করুণাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী)- তার দাবি এই যে,

৯. আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে[১]?

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝

১০. যখন তিনি এক আগুন দেখলেন। তিনি তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে থাক, আমি এক আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি তোমাদের নিকট তা থেকে একটা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব অথবা আগুনের কাছে গিয়ে পথের সন্ধান পাব।'

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْٓ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

১১. অতঃপর তিনি যখন আগুনের কাছে আসলেন, তখন ডাক আসল– 'হে মূসা[২]!

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰى ۝

'ইলাহ' বা উপাস্য একমাত্র তাঁকেই বানানো হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে দাসত্বের মাথা নত করা যাবে না। কেননা, শুধু উল্লিখিত গুণরাজিই নয়, বরং সমস্ত উত্তম গুণ ও ভাল নাম তাঁরই সত্তার জন্য নির্দিষ্ট– দ্বিতীয় কোন সত্তা এমন গুণবিশিষ্ট নয়, যাতে সে মাবূদ হতে পারে। আবার এসব গুণ ও নাম একাধিক হওয়ার কারণে তাঁর সত্তাও একাধিক হবে এমন কোন কথা নেই। কতক জাহেল আরববাসীর ধারণা এরূপ ছিল, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

১. এখান থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআনের অবতরণ কোন অভিনব বিষয় নয়। বরং এর পূর্বে মূসা আলাইহিস সালাম যেমন ওহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনিও হয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেরিত ওহীতে যেমন তাওহীদ প্রভৃতির শিক্ষা ছিল, তদ্রূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীতেও উক্ত মৌলিক বিষয়াদির গুরুত্বারোপ করা হয়। হযরত মূসা (আ) যেমন সত্যের প্রচার-প্রসারে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেরূপ সহ্য করতে হবে এবং উনি যেমন শেষ পর্যন্ত সাফল্য ও বিজয় লাভ করেছেন, আর শত্রুরা পরাজিত ও অপদস্থ হয়েছে– ইনিও নিশ্চিতরূপে সফল ও বিজয়ী হবেন এবং তাঁর দুশমনরা লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হবে।

যেহেতু সূরার সূচনাতে কুরআন অবতীর্ণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই সামঞ্জস্য রক্ষার্থে মূসা (আ)-এর ঘটনার শুরুতেই তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে।

২. এ কাহিনীর বিভিন্ন অংশ সূরা কাসাস, সূরা তোয়াহা ও সূরা আ'রাফ থেকে একত্র করা যেতে পারে। এখানে মাদয়ান থেকে মিসরের দিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

মাদয়ানে হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালামের কন্যার সঙ্গে হযরত মূসার বিবাহ হয়েছিল। সেখানে কয়েক বছর বসবাসের পর হযরত মূসা মিসর গমনের ইচ্ছা করলেন। গর্ভবতী স্ত্রী

১২. 'নিশ্চয় আমিই তোমার রব। অতএব তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি তো পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছ'[১]।

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

সহযাত্রী ছিলেন। রাত ছিল অন্ধকার। প্রচণ্ড শীত। সঙ্গে আরো ছিল ছাগলের পাল। এ অবস্থায় রাস্তা গেলেন ভুলে। ছাগলগুলি হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন, তদুপরি স্ত্রীর প্রসবব্যাথা শুরু হল। সব মিলিয়ে অন্ধকারে তিনি পেরেশান, দিশাহারা। প্রচণ্ড শীতে উষ্ণতা লাভের জন্য আগুনও ছিল না। চকমকি পাথর ঘষেও আগুন জ্বালানো গেল না। এহেন বিপদাপদ ও চরম পেরেশানীর অবস্থায় হঠাৎ দূরে আগুনের একটি ঝলক দৃষ্টিগোচর হল। আসলে তা পার্থিব আগুন ছিল না– ছিল আল্লাহ তাআলার মহিমা প্রকাশক নূর বা অগ্নি-যবনিকা– نور جلال يا حجاب ناري (মুসলিম শরীফে [হাদীস ১৭৯] যার উল্লেখ রয়েছে)।

মূসা আলাইহিস সালাম জাগতিক আগুন মনে করে পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানে থাক, আমি যাই, হয়ত ঐ আগুনের একটি শিখা আনতে পারব অথবা সেখানে গিয়ে পথের সন্ধানদাতা কাউকে পাব।

কথিত আছে, সেই পবিত্র প্রান্তরে পৌছে তিনি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পান। তিনি দেখেন যে, একটি গাছে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং আগুন যত বেশি প্রজ্বলিত হচ্ছে, গাছটি ততই সজীব হয়ে উঠছে, আর গাছের দীপ্তি ও সজীবতা যতই বাড়ছে, আগুনের শিখা ততই তীব্রতর হচ্ছে। গাছের কোন ডাল পুড়ে গিয়ে ভেঙ্গে পড়লে তা উঠিয়ে নেওয়া যাবে এই নিয়তে তিনি আগুনের নিকটে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি আগুনের যত নিকটবর্তী হতে চান, আগুন ততই দূরে সরে যায়, আর যখন আতঙ্কিত হয়ে সরে আসেন, তখন আগুন তাঁর পিছনে ছুটে আসে। এই বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আওয়াজ আসল- إني أنا ربك (নিশ্চয় আমিই তোমার রব), যেন সেই গাছটি তখন অদৃশ্য টেলিফোনের কাজ করছিল।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম যখন يا موسى (হে মূসা!) ডাক শুনতে পান, তখন তিনি কয়েকবার لبيك বলে সাড়া দেন এবং আরয করেন যে, আমি তোমার ডাক শুনছি ও উপস্থিতি অনুভব করছি, কিন্তু তুমি কোথায় আছ তা দেখছি না। আওয়াজ এল, 'আমি তোমার উপরে আছি, তোমার সঙ্গে আছি, তোমার সামনে আছি, তোমার পিছনে আছি এবং তোমার প্রাণের চেয়েও তোমার বেশি কাছে আছি।' (তাফসীরে বাগাবী ৩/২১৩) বলা হয়, তখন মূসা আলাইহিস সালাম সব দিক থেকে এবং নিজের এক একটি পশম থেকেও আল্লাহর কালাম শুনতে পাচ্ছিলেন।

১. 'তুওয়া' হচ্ছে উক্ত প্রান্তরটির নাম, প্রান্তরটি হয়ত পূর্ব থেকেই বরকতময় ছিল, তা না হলে এখন হল! মূসা আলাইহিস সালামের জুতা নাপাক ছিল, তাই খোলার নির্দেশ দেওয়া হল। অবশ্য মোজা বা জুতা পাক থাকলে তাতে নামায পড়া যায়– বিস্তারিত মাসলা ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

১৩. 'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব (তোমার কাছে) যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোন[১]–

وَاَنَا اخۡتَرۡتُكَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی ۝

১৪. 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর[২]।

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِكۡرِیۡ ۝

১৫. 'কিয়ামত অবশ্যই আসবে– আমি তা গোপন রাখতে চাই*[৩]– যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হয়[৪]।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخۡفِیۡهَا لِتُجۡزٰی كُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا تَسۡعٰی ۝

---

১. 'মনোনীত করেছি'- অর্থাৎ সারা জগতের মধ্য থেকে তোমাকে নবুওয়াত, রিসালাত ও আমার সাথে কথোপকথনের জন্য নির্বাচন করেছি। এজন্য সম্মুখে যেসব নির্দেশ দেওয়া হবে, তা নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে শোন।

২. এতে খাঁটি তাওহীদ এবং সব রকমের দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলে এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে। তাছাড়া এও বলা হয়েছে যে, নামাযের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণ। অতএব, নামায থেকে গাফেল হওয়ার অর্থ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া। আর যিকরুল্লাহ (আল্লাহর স্মরণ) সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَاذۡكُرۡ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیۡتَ অর্থাৎ, কখনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র তাঁকে স্মরণ কর –(কাহ্ফ, আয়াত ২৪)। নামাযের ব্যাপারে ঠিক একই হুকুম– যথাসময়ে আদায় করতে গাফিলতি ও ভুল হয়ে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র কাযা করে নেবে- فليصلها إذا ذكرها

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সম্ভব হলে আমি তা (নিজের থেকেও) গোপন রাখতাম'।

৩. অর্থাৎ তার আগমন-সময়টি সকলের থেকে গোপন রাখতে চাই। এমনকি, যদি স্বয়ং আমার থেকেও গোপন রাখা সম্ভব হত তবে তাই করতাম, কিন্তু তা আদৌ সম্ভব নয়।

এ বাকভঙ্গিতে যে আতিশয্য (مبالغة) রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এ ধরণের আতিশয্যস্বরূপ এক হাদীছে বলা হয়েছে–: لا تعلم شماله ماتنفق يمينه ('তার ডান হাত যা ব্যয় করে, বাম হাত তা জানে না।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৬০)— এবং এক কবি বলেছেন :

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم ÷ گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم

'চোখ থেকে লজ্জা চলে গেছে। তাকে তোমায় দেখতে দেব না। তদ্রূপ, কানকেও তোমার কথা শুনতে দেব না।'

বস্তুত কিয়ামতের সময়ের বিষয়ে মোটামুটিভাবে যতটুকু প্রকাশ করা হয়েছে, তাও করা হত না যদি এতটুকু প্রকাশের পিছনে অনেক কল্যাণ নিহিত না থাকত।

৪. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন এ জন্য জরুরী, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ভাল বা মন্দ কর্মের প্রতিফল লাভ করে এবং বাধ্য ও অবাধ্য ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়।

১৬. 'সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে, অন্যথায় তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে[১]।'

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝١٦

১৭. হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী[২]?

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝١٧

১৮. তিনি বললেন, 'এ আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর করি, এ দিয়ে নিজের ছাগলের জন্য (পাতা-পল্লব) ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার আরো প্রয়োজন রয়েছে[৩]।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۝١٨

১৯. আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ۝١٩

তাওহীদ ও ইবাদতের পর এস্থলে পরকালের আকীদা-বিশ্বাসের তালীম দেওয়া হল।

১. عنها –তা থেকে, অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে, বা নামায থেকে যেন বিরত না করে। আল্লাহ তাআলা এস্থলে মূসা আলাইহিস সালামকে মন্দ লোকের সংস্রব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে অন্যদের করণীয় কী, তা সহজেই অনুমেয়। (মুযেহুল কুরআন)

মোটকথা, দুনিয়া-পূজারী কাফেরদের চাটুকারিতা অথবা তাদের প্রতি অতি নম্রতা ও শিথিলতা প্রদর্শন করতে নেই। কেননা, তাতে মানুষের আপন উচ্চ মর্যাদা থেকে নীচে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (আল্লাহর পানাহ!)

২. এটা হচ্ছে মূসা (আ.)-কে নবুওয়াত প্রদানসম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকা। যেহেতু বিবিধ মুজিযা দিয়ে তাঁকে ফেরাওনের কাছে পাঠানো হচ্ছে, সেজন্য প্রথমে লাঠির মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'তোমার হাতে ওটা কী?' –এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম যেন নিজ লাঠিটির প্রকৃতি ও এর উপকারিতাসমূহ মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন, যাতে পরবর্তীতে এর দ্বারা যে মু'জিযা প্রকাশ পাবে তার মু'জিযা হওয়াটা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার মনের মধ্যে থাকে। অর্থাৎ খুব দেখে শুনে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বল, তোমার হাতে ওটা কী? এমন যেন না হয় যে, তা সাপ হয়ে যাওয়ার পর সন্দেহ হল– সম্ভবত আমি ভুলবশত লাঠি না এনে অন্য কিছু নিয়ে এসেছি। তো, এমন সন্দেহ যাতে না হয় সেজন্য এখনই হাতের বস্তুটি দেখভাল করে নাও।

৩. অর্থাৎ এতে সন্দেহের কী আছে? এ সেই লাঠি, যা সর্বদা হাতে রাখি, এর উপর ভর করে থাকি, ছাগলের জন্য পাতা পাড়ি, শত্রু ও ক্ষতিকারক জীবজন্তু তাড়াই এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় কাজে এর সাহায্য নিয়ে থাকি।

২০. অতএব তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে গেল, যা ছোটাছুটি করছে[১]!

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ বললেন, 'ওটা ধর এবং ভয় করো না। আমি এখনই তাকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব[২]।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২২. 'আর তুমি তোমার হাত নিজ বগলে রাখ– তা কোন রোগ ছাড়া শুভ্র হয়ে বের হবে[৩]; (এ হচ্ছে) দ্বিতীয় নিদর্শন—

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

২৩. যাতে আমি তোমাকে আমার কিছু বড় বড় নিদর্শন দেখাই[৪]।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৪. 'তুমি ফেরাওনের কাছে যাও, সে উদ্ধত হয়ে গেছে।'

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

[রুকূ - ২]

২৫. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন[৫],

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾

---

১. অর্থাৎ মাটিতে ফেলামাত্র লাঠির স্থলে এক অজগর দেখা গেল, যা ক্ষীণকায় সাপের ন্যায় দ্রুতবেগে ছোটাছুটি করছিল। এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে মূসা আলাইহিস সালাম স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

২. অর্থাৎ তোমার হাতে এসে পুনরায় লাঠি হয়ে যাবে। কথিত আছে, প্রথমে মূসা আলাইহিস সালামের হাত দিয়ে ধরার সাহস হচ্ছিল না, শেষে হাতে কাপড় জড়িয়ে ধরতে গেলেন। ফেরেশতা বললেন, 'মূসা! আল্লাহ বাঁচাতে না চাইলে এ বস্ত্রখণ্ড তোমাকে বাঁচাতে পারবে?' মূসা (আ) বললেন, 'না, তবে আমি দুর্বল জীব, দুর্বলতা থেকেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতঃপর মূসা (আ) হাত থেকে কাপড় সরিয়ে অজগরের মুখ ধরে ফেললেন। হাত দিয়ে ধরামাত্র হাতে সেই লাঠিটিই দেখতে পেলেন। (তাফসীরে বাগাবী ৩/২১৫)

৩. অর্থাৎ হাত বগলে চাপা দিয়ে বের করলে তা উজ্জ্বল, সাদা হয়ে বের হবে। আর এ শুভ্রতা শ্বেত রোগের কারণে হবে না, তাই একে খুঁত বা দোষ বলা যাবে না।

৪. অর্থাৎ লাঠি ও শুভ্রহস্তের মু'জিযা সেইসব বড় বড় নিদর্শনের দু'টি, যেগুলি আমি তোমাকে দেখাতে চাই।

৫. অর্থাৎ আমাকে সহনশীল, গাম্ভীর্যপূর্ণ, সৎসাহসী ও উন্নতমনা বানিয়ে দিন, যেন মর্যির খেলাফ বা অপ্রিয় আচরণে উত্তেজিত না হই এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যেসব

২৬. 'আমার কাজ সহজ করে দিন[১]।	وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾
২৭. 'এবং আমার জিহ্বার গিরা খুলে দিন (জড়তা দূর করে দিন),	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
২৮. 'যাতে ওরা আমার কথা বোঝে[২]।	يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾
২৯. 'আর আমাকে দিন আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী–	وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. 'অর্থাৎ আমার ভাই হারূন[৩]।	هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾
৩১. 'তার মাধ্যমে আমাকে শক্তিশালী করুন।	اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾
৩২. 'এবং তাকে আমার কাজে শরীক করুন[৪]।	وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
৩৩. 'যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বর্ণনা করতে পারি,	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾
৩৪. 'এবং বেশি করে আপনাকে স্মরণ করতে পারি[৫]।	وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. 'আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা[৬]।'	اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

কঠোরতার সম্মুখীন হতে হবে তাতে বিচলিত না হই, বরং তা যেন প্রশস্ত হৃদয় ও হাসিমুখে সইতে পারি।

১. অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন, যেন এ মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজ হয়ে যায়।

২. বাল্যকালে মূসা (আ) এর জিহ্বা পুড়ে গিয়েছিল (যার ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে বর্ণিত আছে)। ফলে তিনি স্পষ্টরূপে কথা বলতে পারতেন না। তাই এ দো'য়া করলেন।

৩. ইনি বয়সে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে বড় ছিলেন।

৪. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যেন আমরা একে অন্যের সহায়ক ও সাহায্যকারী হই।

৫. অর্থাৎ উভয়ে মিলে যেন দাওয়াত ও তাবলীগ উপলক্ষে খুব জোরে-শোরে আপনার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি। তাছাড়া যখন পরস্পরের সহযোগিতায় উভয়ের মধ্যে রূহানী শক্তি হাসিল হবে, তখন নির্জন অবস্থায়ও আপনার যিক্র অধিক পরিমাণে করতে পারব।

৬. অর্থাৎ আপনি আমাদের সকল অবস্থা উত্তমরূপে দেখছেন। আর আমি যেসব দো'য়া করছি তা কবূল করা আমাদের জন্য কতখানি উপকারী হবে, তাও আপনার ভালভাবে জানা আছে। যদি আমাদের অবস্থা ও যোগ্যতার পূর্ণ খবর আপনার না থাকত, তবে নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য আমাদের মনোনীতই বা কেন করতেন এবং এমন কঠিন শত্রুর প্রতি

৩৬. আল্লাহ বললেন, 'তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল হে মূসা![1]

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

৩৭. 'নিশ্চয়ই আমি আরো একবার তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছিলাম[2]–

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۝

৩৮. 'যখন আমি তোমার মায়ের প্রতি সেই আদেশ পাঠিয়েছিলাম যা পাঠানোর ছিল[3]–

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۝

৩৯. তা এই যে, 'তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দাও। অনন্তর, নদী তাকে তীরে নিয়ে ফেলবে, তখন তাকে আমার ও তার এক শত্রু উঠিয়ে নেবে[4]।

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ

কেনই বা পাঠাতেন? সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আপনি যা কিছু করেছেন উত্তমরূপে জেনেশুনেই করেছেন।

১. অর্থাৎ যা কিছু তুমি চেয়েছ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তা তোমাকে দেওয়া হল।

২. অর্থাৎ আমি তো পূর্বেও একবার প্রার্থনা ছাড়াই তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছি। সুতরাং এখন যে একটি সংগত বিষয় প্রার্থনা করছ তা দেব না কেন? অবশ্যই দেব।

৩. অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে অথবা জাগ্রতাবস্থায়, এলহামসূত্রে কিংবা সে যুগের কোন নবীর মাধ্যমে তোমার মাতার কাছে সেই আদেশ পাঠাই, যা পাঠানো সংগত ছিল। (এর বিবরণ সামনের আয়াতে আসছে)।

বি. দ্র. اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর মাতার নবী হওয়া প্রমাণিত হয় না, যেমন পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। নবী তো বলা হয় তাকে, যার প্রতি বিধি-বিধানের ওহী আগমন করে এবং তা প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট হন। এ সংজ্ঞা হযরত মূসার মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

৪. অর্থাৎ (নবজাতক শিশু) মূসাকে সিন্দুকে রেখে সিন্দুক নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদীর প্রতি আমার নির্দেশ রয়েছে যে, সে তাঁকে পূর্ণ হেফাজতের সাথে একটি বিশেষ তীরে পৌঁছিয়ে দেবে, যেখান থেকে তাঁকে এমন এক ব্যক্তি উঠিয়ে নেবে, যে আমারও শত্রু এবং তারও শত্রু।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

ঘটনা এই যে, ফেরাওন ঐ বছর গণকদের পরামর্শে খুঁজে খুঁজে বনী ইসরাঈলের শিশু-পুত্রদের হত্যা করছিল। মূসার জন্মের পর তাঁর মায়ের ভয় হল, ফেরাওনের সিপাই জানতে পারলে শিশুকে মেরে ফেলবে এবং এ কথা গোপন করার কারণে পিতামাতাকেও নির্যাতন করবে। তখন আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে উক্ত তদবীর অবলম্বন করার জন্য এলহাম হয়।

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۝

আর আমি তোমার উপর আমার পক্ষ থেকে ঢেলে দিলাম ভালবাসা[১]। এবং (এটা এজন্য করেছিলাম) যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও[২]।'

اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ۭ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬

৪০. (স্মরণ কর), যখন তোমার বোন চলছিল, অতঃপর সে (ফেরাওনের লোকদের) বলতে লাগল, 'আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তির কথা বলব, যে একে লালন-পালন করবে?' অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয় এবং সে চিন্তা না করে[৩]। আর তুমি এক

সে মত মূসা আলাইহিস সালামের মাতা সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। নদীর একটি শাখা ফেরাওনের বাগানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তার ভিতর দিয়ে সিন্দুকটি তীরে গিয়ে ভিড়ল। ফেরাওনের সতী-সাধ্বী পুণ্যবতী স্ত্রী (ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত) হযরত আছিয়া শিশুটিকে তুলে নিয়ে ফেরাওনের সামনে রেখে বললেন, 'চল, তুমি ও আমি একে পুত্র বানিয়ে নিই।' শিশুটি দেখে ফেরাওনের অন্তরেও ভালবাসার উদ্রেক হল। যদিও সে (কোন কোন বর্ণনা মত) পুত্র বানাতে অস্বীকার করে, কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার খাতিরে পুত্রের মতই তাকে প্রতিপালন করতে থাকে এবং এভাবে আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরতের মহিমা প্রকাশ পায়।

বি. দ্র. ফেরাওনকে আল্লাহর শত্রু বলার কারণ স্পষ্ট, সে সত্যের শত্রু ছিল এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে আল্লাহ হওয়ার দাবি করত। আর মূসা (আ)-এর শত্রু এজন্য বলেছেন যে, তখন সে বনী ইসরাঈল-এর সকল শিশুর সাথে ঘোর শত্রুতা করছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ করে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা করার ছিল।

১. অর্থাৎ আমি নিজের তরফ থেকে সৃষ্টিজীবের অন্তরে তোমার মহব্বত ঢেলে দিলাম, যাতে যে-ই দেখুক তোমাকে যেন ভালবাসে ও আদর-স্নেহ করে। অথবা অর্থ এই যে, আমার এক বিশেষ মহব্বত তোমার উপর ঢেলে দিলাম, ফলে তুমি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলে। বলা বাহুল্য, যাকে খোদা ভালবাসেন তাকে বান্দারাও ভালবাসতে শুরু করে।

২. অর্থাৎ মানুষের অন্তরে তোমার ভালবাসা ঢেলে দেওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তুমি যেন আমার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে লালিত-পালিত হও এবং এরূপ ঘোর শত্রুর ঘরে প্রতিপালিত হওয়ারকালেও কেউ তোমার কোন ক্ষতি না করতে পারে।

৩. বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র (সূরা কাসাসে) আসবে। সিন্দুক নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ) এর মাতা মানবীয় দুর্বলতার কারণে অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান ছিলেন যে, শিশুর কী পরিণতি হয়েছে– সে জীবিত আছে, না হিংস্রজীবের খোরাকে পরিণত

ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তার পর আমি তোমাকে সেই দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করলাম[১]। আর আমি তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলাম[২]।	وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۚ

হয়েছে। তিনি হযরত মূসা (আ) এর বোনকে গোপনভাবে খবর রাখতে বললেন। অন্যদিকে আল্লাহর ইচ্ছায় এমন হল যে, শিশু মূসা কোন নারীরই দুগ্ধ পান করছিলেন না– অনেক ধাত্রী ডাকা হল, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফলে গেল। তখন মূসা (আ)-এর বোন বলল, আমি একজন মহিলা আনতে পারি, আশা করা যায়- তিনি কোন উপায়ে দুধ পান করিয়ে শিশুটিকে প্রতিপালন করতে পারবেন।

সে মত মূসা (আ)-এর মাকে নিয়ে সে উপস্থিত হল। বুকে লাগাতেই শিশু দুধ পান করতে লাগল। ফলে ফেরাওন পরিবারে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। মূসা (আ)-এর মাতা বললেন, আমি এখানে থাকতে পারব না। অনুমতি দিলে শিশুকে আমার নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে পরিপূর্ণ আদর-যত্নে লালন-পালন করব। শেষ পর্যন্ত তিনি ফেরাওনের পক্ষ থেকে ধাত্রী হিসাবে শিশুর প্রতিপালনে নিয়োজিত হন এবং তাকে নিজ ঘরে নিয়ে আসেন, আর রাজকীয় মর্যাদায় মূসা (আ)-এর প্রতিপালন করতে থাকেন।

১. ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সূরা কাসাসে আসবে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, যৌবনে পদার্পন করার পর মূসা আলাইহিস সালামের হাতে কিবতী সম্প্রদায়ের এক লোক নিহত হয়েছিল। এতে তিনি দুনিয়াতে গ্রেফতার হওয়ার এবং আখেরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হন। এই উভয় পেরেশানী থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুক্তি দিলেন– তওবার তাওফীক দিয়ে ও তা কবূল করে পরকালীন পেরেশানী থেকে মুক্তি দিলেন এবং মিসর থেকে বের করে মাদয়ানে পৌঁছে দিয়ে পার্থিব পেরেশানী থেকে নাজাত দান করলেন। আর এই মাদয়ানে হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালামের কন্যার সঙ্গে হযরত মূসা (আ)-এর শুভ বিবাহও সম্পন্ন হয়। কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ সূরা কাসাসে আসবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে কয়েকভাবে পরীক্ষা করেছেন, আর তাতে তুমি খাঁটি প্রমাণিত হয়েছ।

বি. দ্র. এস্থলে মুফাসসিরগণ حديث الفتون নামে একটা দীর্ঘ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে কাছীর (র) বলেন-

وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الاسر ئيليات من كعب الأحبار وغيره، والله أعلم، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا

('এ ইবনে আব্বাসের বাচন, এতে সামান্য অংশ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নেই। সম্ভবত ইবনে আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবার প্রমুখ থেকে বর্ণনা করা যায় এমন যে ইসরাঈলী রেওয়ায়াতসমূহ গ্রহণ করেছেন, এও তার অন্তর্ভুক্ত (আল্লাহই

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾	অতঃপর তুমি মাদয়ান -বাসীদের মাঝে কয়েক বছর অবস্থান করলে। তারপর হে মূসা! তুমি তাকদীর মোতাবেক (এখানে) আসলে*১।
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿٤١﴾	৪১. আর আমি তোমাকে আমারই জন্য তৈরি করেছি২।
اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾	৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে যাও, আর আমার স্মরণে শিথিলতা করো না৩।

ভাল জানেন)। আমি আমাদের শায়খ হাফেজ আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী (র)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি।')

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তুমি (আল্লাহ কর্তৃক) নির্ধারিত সময়ে আসলে'।

১. অর্থাৎ এখন মাদয়ান থেকে বের হয়ে পথ ভুলে গেছ এবং তকদীর মোতাবেক এমন স্থানে পৌছেছ, যার কল্পনাও তুমি করনি। সত্য বটে–

خدا کی دین کا موسی سے پوچھئے احوال ÷ کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے-

(খোদার দীনের হাল শুধাও মূসায় ÷আগুন আনিতে গিয়ে নবুওয়াতী পায়।

২. অর্থাৎ আমার ওহী ও রিসালাতের জন্য তৈরি করে তোমাকে নিজের বিশিষ্ট ও নৈকট্যধারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং আমার নিজ ইচ্ছা মত তোমার প্রতিপালন করিয়েছি।

৩. অর্থাৎ যে কাজের জন্য তোমাকে পয়দা করা হয়েছে, তার জন্য নিজের ভাই হারূনকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং প্রয়োজনের সময় আমার প্রদত্ত নিদর্শন ও মুজেযাগুলি প্রকাশ করো।

যেহেতু ইতিপূর্বে দো'য়া করার সময় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا, সেহেতু এখানে وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ বলে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ -আল্লাহর নামের প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট হও এবং সর্বাবস্থায় সাধারণভাবে আর দাওয়াত ও তাবলীগের সময় বিশেষভাবে আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো। কেননা, এটাই আল্লাহওয়ালাদের সফলতার বড় চাবিকাঠি এবং দুশমনের মোকাবেলায় সর্বোত্তম অস্ত্র। হাদীছে আছে- وان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه (আমার পূর্ণাঙ্গ বান্দা সে-ই, যে যুদ্ধরত অবস্থায়ও আমাকে স্মরণ করে।) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৮৯৭; তারীখে দামেশ্ক : ৩৬/২৬৬)

৪৩. তোমরা ফেরাওনের কাছে যাও, সে উদ্ধত হয়ে গেছে[১]।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚ

৪৪. এবং ওকে নম্র কথা বল, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে[২]।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৫. তারা বললেন, 'হে আমাদের রব! আমাদের আশঙ্কা হয় যে, সে আমাদের উপর (কথা পূর্ণ হওয়ার) আগেই আক্রমণ করে বসবে, অথবা (কথা শোনার পর) চরম উদ্ধত হয়ে উঠবে[৩]।'

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৬. আল্লাহ বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও দেখি[৪]।'

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতে যাত্রা করার নির্দেশ ছিল। এখন স্থানের কথা বলা হচ্ছে যে, কোথায় কার নিকট যেতে হবে। তাছাড়া এ বাক্যটি সামনের আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকাস্বরূপ।

২. অর্থাৎ দাওয়াত, তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহতের সময় নম্র-ভদ্র, সহজ-সরল, মর্মস্পর্শী ও যথার্থ কথা বল। যদিও ফেরাওনের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা দৃষ্টে (তোমাদের কথা) গ্রহণের খুব একটা আশা নেই, তবুও এ কারণে নম্রতার সাথে কথা বল যে, হয়ত সে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে নসীহত গ্রহণ করবে, অথবা আল্লাহর মহিমা ও অসীম ক্ষমতার কথা শুনে ভীত হবে এবং আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকবে।

দীনের দায়ী ও মুবাল্লিগদের কর্মপন্থা কেমন হবে– এ বিষয়ে আয়াতে বড় দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ মর্মে অন্যত্র পরিষ্কার বলা হয়েছে- ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (–সূরা নাহ্ল, আয়াত ১২৫)

৩. অর্থাৎ সে ভয় করবে– এ আশা তো দূরের কথা। তার দাপট ও শক্তি এবং আমাদের অসহায়ত্ব দৃষ্টে আমরা ভয় করছি যে, সে আমাদের কথা আদৌ শুনবে কি না। আশঙ্কা করছি, আমাদের পুরো কথা শোনার পূর্বেই সে উত্তেজিত হয়ে যাবে, অথবা তা শোনার পর চরম উদ্ধত হয়ে পড়বে এবং আপনার শানে বেয়াদবী করতে শুরু করবে কিংবা আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। ফলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

বি. দ্র. মূসা আলাইহিস সালামের এ ভীতি ও তাঁর বক্ষ সম্প্রসারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কামেল বান্দারা বিপদ নাযিল হওয়ার পূর্বে ভয় করেন ও আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা করেন, কিন্তু বিপদ এসে পড়লে পূর্ণ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে তা মোকাবেলা করেন।

৪. অর্থাৎ ফেরাওন ও তোমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে বা যা কিছু ঘটবে, তা সবই আমি শুনব ও দেখব। আমি কখনই তোমাদের থেকে পৃথক নই। আমার সাহায্য-সহোযোগিতা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, তাই বিচলিত ও চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

৪৭. অতএব তোমরা ওর কাছে যাও এবং বল, 'আমরা তোমার রবের রাসূল। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও এবং তাদের কষ্ট দিয়ো না[১]। আমরা তো তোমার কাছে তোমার রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি[২]। আর শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে সৎপথের অনুসরণ করে।

فَأْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝٤٧

৪৮. 'আমাদের কাছে এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়[৩]।'

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٤٨

৪৯. ফেরাওন বলল, 'তবে হে মূসা! তোমাদের রব কে[৪]?'

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝٤٩

---

১. এখানে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে– (১) ফেরাওনের ও সকল মাখলুকের একজন রব আছেন, যিনি রাসূল প্রেরণ করেন (২) আমরা দুজন তাঁর রাসূল, সুতরাং আমাদের আনুগত্য ও রবের ইবাদত করা কর্তব্য। মোটকথা, এ বাক্যে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আর এ কথাই সূরা 'নাযিআতে' এভাবে বলা হয়েছে– فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (এবং বল, তোমার কি এ আগ্রহ আছে যে, তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করব, ফলে তুমি তাকে ভয় করবে? –আয়াত ৮৮) (৩) তৃতীয় বিষয়টি এমন, সে সময় যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ ফেরাওন ও তার দলবলের অবমানকর দাসত্ব থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তি।

فَأَرْسِلْ مَعَنَا... –অর্থাৎ এই অভিজাত বংশের মর্যাদাশালী লোকদের উপর অত্যাচার করো না, বরং দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করে তাদেরকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও, যাতে তারা স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা জীবন যাপন করতে পারে।

২. অর্থাৎ আমাদের নবুওয়াতের দাবি প্রমাণহীন নয়, বরং নিজেদের সত্যতার পক্ষে আমরা আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছি।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের কথা মেনে সরল পথে চলবে, তার জন্য উভয় জগতে রয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য আযাব নিশ্চিত– শুধু আখেরাতে, বা দুনিয়া ও আখেরাত– উভয় জাহানে। এখন নিজেদের পরিণাম চিন্তা করে যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর।

৪. অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে যে রবের রাসূল বলছ, সেই রব কে ও তার প্রকৃতি কী? (এ প্রশ্ন দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, ফেরাওন নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, অথবা শুধু বিব্রত করার জন্যই এ প্রশ্ন করেছিল।)

৫০. তিনি বললেন, 'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথপ্রদর্শন করেছেন[১]।'	قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝
৫১. সে বলল, 'তবে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থা কী?'	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝
৫২. তিনি বললেন, 'তাদের খবর আমার রবের কাছে, এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভোলেনও না[২]।	قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۝

১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আকার-আকৃতি, শক্তি-সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য-গুণ ইত্যাদি দান করেছেন এবং তাকে যেমন বানানো কাম্য ছিল, পরম হেকমতের সাথে তেমনই বানিয়েছেন। অতঃপর সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকের অস্তিত্ব ও স্থিতির জন্য যেসব উপায়-উপকরণের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা করেছেন। এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার বস্তুগত কাঠামো, আভ্যন্তরীণ শক্তি-সামর্থ্য ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথ শিখিয়ে দিয়েছেন। তদুপরি এই পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করে আমাদেরও বুঝিয়ে দিয়েছেন, কী করে সৃষ্টির অস্তিত্ব দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তিনি সকল প্রাণীকে পানাহার করার বোধ-শোধ দান করেছেন, যেমন শিশুকে দুগ্ধপান তিনি না শেখালে অন্য কেউ শেখাতে পারত না।'

২. অর্থাৎ ফেরাওন বলল– আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের যদি উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ থেকে থাকে এবং যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আহ্বান করছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা বিগত জাতিসমূহ সম্বন্ধে কিছু বল। এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্তমান থাকতে তাদের অনেকে সত্যকে গ্রহণ করল না কেন? আর গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে তাদের সকলকেই কি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে? তোমরা পয়গম্বর হয়ে থাকলে সকল জাতির বিস্তারিত অবস্থা তোমাদের জানা থাকার কথা।

এসব নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণা ফেরাওন এজন্য করে, যাতে হযরত মূসার হেদায়েতমূলক আলোচনা এসব বাজে কথাবার্তার মধ্যে হারিয়ে যায়।

যা হোক, হযরত মূসা (আ) উত্তরে বললেন, পয়গম্বরের জন্য সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরী নয়। প্রত্যেক জাতির বিস্তারিত অবস্থা জানেন আল্লাহ তাআলা। আর তা এক কিতাব– লওহে মাহফূজে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহর ইলম থেকে কোন বিষয় গায়েব থাকতে পারে না, আর তিনি তাঁর জ্ঞাত কোন বিষয় এক সেকেণ্ডের জন্য ভোলেনও না। যে জাতি যা-কিছু আমল করেছে, সব কিছুর পরিপূর্ণ হিসাব লিপিবদ্ধ রয়েছে– যথাসময়ে তা পেশ করে দেওয়া হবে।

৫৩. '(তিনিই ঐ সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন, তোমাদের জন্য তাতে চলার পথসমূহ করে দিয়েছেন[১] এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি তার দ্বারা উৎপন্ন করেছি নানা রকমের উদ্ভিদ[২]।'

الَّذِىۡ جَعَلَ لَـكُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّسَلَكَ لَـكُمۡ فِيۡهَا سُبُلًا وَّاَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿۵۳﴾

৫৪. 'তোমরা (নিজেরা) আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও[৩]। নিশ্চয় তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য [৪]।'

كُلُوۡا وَارۡعَوۡا اَنۡعَامَكُمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿۵۴﴾

[রুকূ - ৩]

৫৫. মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেই এবং তা থেকেই তোমাদের পুনর্বার বের করব[৫]।

مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى ﴿۵۵﴾

---

১. অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে উপত্যকা, সাগর ও পাহাড়সমূহের মধ্যে বহু পথ তৈরি করে দিয়েছেন। সে সবের উপর দিয়ে তোমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পার।

২. অর্থাৎ পানির সাহায্যে নানা রকমের শাক-সব্জী, শস্য-ফসল ও ফল-মূল পয়দা করেছেন।

৩. অর্থাৎ উত্তম খাদ্যদ্রব্য তোমরা খাও, আর যা তোমাদের খাদ্য নয় তা নিজেদের গবাদি পশুকে খাওয়াও, যাদের পরিশ্রমে এসব দ্রব্য লাভ হয়।

৪. নাস্তিকদের চোখ খোলার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কলা-কৌশল ও কুদরতের লীলা-খেলা লক্ষ কর। আকল-বুদ্ধি থেকে থাকলে বুঝতে পারবে যে, এসব সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আপনাআপনি ও ঘটনাচক্রে কায়েম হতে পারে না।

তো, এসব আয়াতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। সামনে পুনরুত্থান ও পরকালের আলোচনা রয়েছে।

৫. মানবগোষ্ঠীর আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছে। আর যেসব খাদ্যদ্রব্য দ্বারা মানুষের শরীর প্রতিপালিত হয়, তাও মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষদের মাটিতে মিশে যেতে হবে। আর হাশরের দিনে মাটিতে মিশে যাওয়া শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনরায় একত্র করে নতুনভাবে পয়দা করে দেওয়া হবে এবং যারা কবরে সমাহিত ছিল, তাদের কবর থেকে বের করা হবে।

৫৬. আমি তো ফেরাওনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অমান্য করল[১]।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৭. সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ, যাতে তোমার যাদু বলে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে পার[২]?

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৮. 'অতএব আমরাও অবশ্যই তোমার মোকাবেলায় অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন সমতল ময়দানে* (একত্রিত হওয়ার) সময় নির্ধারণ কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না[৩]।'

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

---

১. অর্থাৎ যেসব নিদর্শন ওকে দেখানোর ইচ্ছা ছিল, আনুষঙ্গিক বিষয়াবলিসহ তা সবই দেখালাম– যথা, লাঠি, শুভ্র হাত ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও হতভাগা মানল না, বরং অস্বীকৃতির উপর জিদ ধরে রইল।

২. ফেরাওন ওর স্বজাতি 'কিবতী'দের মধ্যে মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলল। অর্থাৎ সে বলল, মূসার উদ্দেশ্য এই মনে হচ্ছে যে, সে যাদুবলে আমাদের বের করে দেবে এবং এই প্রতারণা দ্বারা সাধারণ মানুষকে নিজের পক্ষে নিয়ে নেবে এবং এভাবে কিবতীদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ দখল করে নেবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সবার জন্য একসমান- এমন স্থানে...'।

৩. অর্থাৎ তুমি উক্ত অভিপ্রায়ে সফল হতে পারবে না, আমাদের কাছেও বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে। অতএব, তাদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যাক।

তো, যেদিন ও যেস্থানে মোকাবেলা হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা তোমার এখতিয়ারে দিলাম। তবে যে সময়টা নির্ধারিত হবে, আমাদের কোন দলই যেন ঐ সময় অনুপস্থিত না থাকে। এবং স্থানটি এমন হতে হবে, যেখানে উভয় পক্ষের জন্য আসা ও বসা সমভাবে সহজ। সেখানে বসা ইত্যাদি বিষয়ে রাজা ও প্রজা, কিংবা শাসক ও শাসিত অথবা ছোট ও বড়র প্রশ্ন যেন না দাঁড়ায় (বরং সবাই বসতে পারে)। প্রত্যেক দল যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের যাদুশক্তি প্রদর্শন করতে পারে। ময়দানটিও উন্মুক্ত, সমতল হতে হবে, যাতে দর্শকরা সকলেই অনায়াসে যাদু-প্রদর্শনী দেখতে পারে।

৫৯. তিনি বললেন, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে উৎসবের দিন এবং (সেদিন) লোকজনকে পূর্বাহ্নেই সমবেত করা হবে[১]।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝٥٩

৬০. অতঃপর ফেরাওন প্রস্থান করল, এবং নিজের সমস্ত কৌশল একত্র করল। তারপর (যাদুকরদের নিয়ে মূসার মোকাবেলায়) এল[২]।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۝٦٠

৬১. মূসা তাদের বললেন, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করো না, অন্যথায় তিনি তোমাদের কোন আপদ দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে মিথ্যারোপ করে, সে বিফল হয়[৩]।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝٦١

---

১. পয়গম্বরদের কাজে কোন ফাঁকিবাজি থাকে না। তাঁদের সকল ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার ও খোলাখুলি হয়ে থাকে। তাই মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের এখানে যে বিরাট মেলা ও উৎসব হয়ে থাকে, সেই উৎসব-দিবসেই পূর্বাহ্নে মোকাবেলা হওয়া উত্তম, যাতে বেশি থেকে বেশি সংখ্যক লোকের সমাবেশ হতে পারে। সেখানে এ কাজ বহু সংখ্যক লোকে দেখতে পারবে এবং তা দেখতে কোন দ্বিধা-সন্দেহ হবে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'উভয় পক্ষই খোলা মাঠে সর্বসমক্ষে মোকাবেলা করার আগ্রহ করেছিল। কারণ, উভয়ই চাচ্ছিল একে অন্যকে জনগণের সামনে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ের গৌরব নিতে। আর মিসরের সকল শহরে উক্ত উৎসব-দিনটি ফেরাওনের জন্মদিন হিসাবে নির্ধারিত ছিল।'

২. অর্থাৎ ওই সিদ্ধান্তের পর ফেরাওন মজলিস থেকে উঠে গেল এবং যাদুকরদের জড়ো করতে ও পরিকল্পনা সফল করতে সব রকমের চেষ্টা-তদবীর ও কলা-কৌশল করতে লাগল। অনন্তর সার্বিক প্রস্তুতির পর সদলবলে যথাসময়ে মোকাবেলার জন্য ময়দানে উপস্থিত হল। যাদুকরদের বিরাট বাহিনী সাথে ছিল। তাদের পুরস্কার ও মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছিল, আর হযরত মূসা (আ)-কে পরাস্ত করার সব রকমের চিন্তা-ফিকির চলছিল।

৩. বোঝা যায়, সেই সমাবেশে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী নসীহত করেন। যাদুকররা যেহেতু যাদু দ্বারা সত্যের মোকাবেলা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেহেতু ওদের সতর্ক করলেন– দেখ, নিজ হাতে নিজেদের সর্বনাশ করো না। আল্লাহর নিদর্শন ও নবীদের মু'জেযাকে যাদু বলা এবং প্রতিষ্ঠিত সত্যের মোকাবেলায় অসার ও অসত্য বিষয় পেশ করা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করারই নামান্তর। আর মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কখনো শুভ হয় না, বরং এরূপ লোকদের উপর এমন আসমানী বিপদ পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, যা ওদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৬২. তখন তাদের পরস্পরে নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে বিরোধ হল এবং তারা চুপিসারে শলা-পরামর্শ করল[১]।

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ۝٦٢

৬৩. তারা বলল, 'নিশ্চয় এ দুজন যাদুকর, এরা চায় নিজেদের যাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট রীতি-নীতি রহিত করে দিতে[২]।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ۝٦٣

৬৪. 'অতএব তোমরা নিজেদের কৌশল সুসংহত করে নাও, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আর আজ সে-ই সফল হবে যে জয়ী হবে[৩]।'

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ۝٦٤

৬৫. তারা বলল, 'হে মূসা! হয় আপনি (প্রথমে) নিক্ষেপ করুন, না হয় আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝٦٥

৬৬. তিনি বললেন, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর[৪]'। (তারা তাই করল), অমনি তাদের

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ

---

১. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বক্তৃতা যাদুকরদের উদ্বিগ্ন করে তুলল। তাদের পরস্পরে বিতর্ক হল যে, এ ব্যক্তিকে কী মনে কর? তার কথাবার্তা তো যাদুকরদের মত মনে হয় না। মোটকথা, তারা বিবাদ করতে লাগল এবং সবার থেকে আলাদা হয়ে পরামর্শ করল। শেষ পর্যন্ত ফেরাওনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এমন কথা বলল, যা সামনে উল্লেখ হচ্ছে।

২. অর্থাৎ তোমাদের যে দীন-ধর্ম ও রীতি-নীতি পূর্ব থেকে চলে এসেছে, তা নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের ধর্ম ও রীতি-নীতি চালু করতে চায়। এবং যে যাদু-শাস্ত্রের বলে তোমাদের মান-সম্মান ও কামাই-রোজগার হচ্ছে, তা দু'ভাই তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা এককভাবে তার দখলদার হয়ে যেতে চায়।

৩. অর্থাৎ সময়-সুযোগ হাতছাড়া হতে দিয়ো না। সাহস ও সর্বশক্তি নিয়ে সকলে মিলে তাদের পরাভূত করার কৌশল বের কর এবং যৌথভাবে এমন আক্রমণ কর, যাতে প্রথম যুদ্ধেই তাদের পা পিছলে যায়। মনে রেখো! আজকের এ যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, আজিকার কামিয়াবী স্থায়ী কামিয়াবী– যে দল আজ জয়ী হবে, তারা সর্বদার জন্য সফল ও প্রবল পরিগণিত হবে।

৪. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত নির্ভয়ে উত্তর দিলেন– না, তোমরা প্রথমে নিজেদের বাসনা চরিতার্থ কর এবং নৈপুণ্য প্রদর্শন কর, যাতে বাতিলের শক্তি-পরীক্ষার পর সত্যের বিজয় সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সূরা আ'রাফে এ কাহিনী গত হয়েছে (আয়াত ১২০-১২২ এর ব্যাখ্যা)। তা দ্রষ্টব্য।

وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى ۝

যাদুর প্রভাবে তাঁর মনে হল, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে[১]।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰى ۝

৬৭. ফলে মূসা মনে মনে ভীতি অনুভব করতে লাগলেন[২]।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى ۝

৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই হবে বিজয়ী[৩]।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى ۝

৬৯. 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর। এটা তারা যা কিছু বানিয়েছে তা গিলে ফেলবে[৪]। তারা যা কিছু বানিয়েছে তা তো যাদুকরের কারসাজিমাত্র এবং যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হয় না[৫]।'

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هٰرُونَ وَمُوسٰى ۝

৭০. অতঃপর যাদুকররা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম হারূন ও মূসার রবের প্রতি[৬]।'

---

১. অর্থাৎ যাদুকরদের ভেলকিবাজির ফলে মূসা আলাইহিস সালামের মনে হল, দড়ি ও লাঠিগুলো সাপের মত দৌড়াচ্ছে, অথচ আসলে এমন ছিল না।

২. অর্থাৎ এ ভয় হল যে, যাদুকরদের ভেলকিবাজি দেখে সাধারণ লোকেরা ধোঁকায় পড়ে যাবে এবং যাদু ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তাদের নিকট সত্যের বিজয় সুস্পষ্ট হবে না। ভয়ের এ অর্থ সামনের আয়াত থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

৩. অর্থাৎ অন্তর থেকে ভয় দূর করে দাও। মনে এ রকম ওয়াসওয়াসা এনো না। আল্লাহ তাআলা সত্যকে অবশ্যই সমুন্নত ও জয়যুক্ত করবেন।

৪. অর্থাৎ নিজের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর, তা ওদের সব ভোজবাজি এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করে ফেলবে।

৫. অর্থাৎ যাদুকরদের ভেলকি যত নিখুঁত হোক না কেন, সত্যের মোকাবেলায় তা সফল হতে পারে না। যাদুকরও কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই হাদীছে যাদুকরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০)

৬. যাদুকররা যাদুশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। শাস্ত্রীয় মূলনীতির আলোকে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল যে, এ যাদু হতে পারে না, বরং যাদুর ঊর্ধ্বের কোন সত্য। ফলে তাদের অন্তরে ঈমান এল এবং তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। বিস্তারিত কাহিনী সূরা আ'রাফে গত হয়েছে (আয়াত নং ১২০-১২২ এর ব্যাখ্যা)। তা দ্রষ্টব্য।

قَالَ اٰمَنۡتُمۡ لَهٗ قَبۡلَ اَنۡ اٰذَنَ لَكُمۡ ؕ اِنَّهٗ
لَكَبِيۡرُكُمُ الَّذِيۡ عَلَّمَكُمُ السِّحۡرَ ۚ
فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ
خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمۡ فِيۡ جُذُوۡعِ النَّخۡلِ ۟
وَلَتَعۡلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبۡقٰى ﴿۷۱﴾

৭১. ফেরাওন বলল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসার কথায় ঈমান নিয়ে আসলে! নিশ্চয় সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে[১]। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও অপর দিকের পা কর্তন করে দেব[২] এবং তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব[৩]। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠোর ও অধিক স্থায়ী[৪]।'

قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ
الۡبَيِّنٰتِ وَالَّذِيۡ فَطَرَنَا فَاقۡضِ مَاۤ اَنۡتَ
قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقۡضِيۡ هٰذِهِ الۡحَيٰوةَ
الدُّنۡيَا ﴿۷۲﴾

৭২. তারা বলল, 'আমরা আমাদের নিকট যেসব সুস্পষ্ট দলীল এসেছে তার উপরে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিপরীতে তোমাকে কখনো প্রাধান্য দেব না। অতএব তোমার যা করার, তা করে ফেল। তুমি তো (যা করার) এ দুনিয়ার জীবনেই করবে।

اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغۡفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا
وَمَاۤ اَكۡرَهۡتَنَا عَلَيۡهِ مِنَ السِّحۡرِ ؕ

৭৩. 'আমরা তো নিজেদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের গোনাহসমূহ ও তুমি জবরদস্তি করে আমাদের দ্বারা যে যাদু করিয়েছ তা ক্ষমা করেন[৫]।

---

১. অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই ঈমান নিয়ে আসলে, আমার ফয়সালারও অপেক্ষা করলে না? বোঝা গেল, এটা তোমাদের ও মূসার যৌথ দুরভিসন্ধি। আসলে তোমরা কৃত্রিম লড়াই করে জনসাধারণকে প্রতারিত করতে চাও। সূরা আ'রাফ দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা, অথবা বাম হাত ও ডান পা।

৩. যাতে তোমাদের অবস্থা দেখে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৪. অর্থাৎ তোমরা ঈমান এনে মনে করছ যে, তোমরাই মুক্তি লাভ করবে, আর অন্য লোকেরা (অর্থাৎ ফেরাওন ও তার সঙ্গীসাথী) সকলেই চিরস্থায়ী আযাবে পতিত হবে। কিন্তু এখনি তোমরা জানতে ও বুঝতে পারবে, কার আযাব বেশি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী।

৫. অর্থাৎ আমরা এরূপ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণকে তোমার খাতিরে ছাড়তে পারি না এবং আমাদের প্রকৃত স্রষ্টার মোকাবেলায় তোমার কোন পরোয়া করতে পারি না। এখন তুমি যা করতে পার কর। তুমি বড় জোর এটা করতে পার যে, আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবন খতম করে দেবে।

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

আর আল্লাহ সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী[১]।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৭৪. বস্তুত, যে কেউ তার রবের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সে তাতে মরবেও না, বাঁচবেও না[২]।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

৭৫. পক্ষান্তরে, যারা তাঁর নিকট ঈমান নিয়ে উপস্থিত হবে (আর) তারা সৎকর্মও করে থাকবে– তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ–

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

৭৬. চিরকাল বসবাসের উদ্যানরাজি, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে[৩]। আর এটা তার প্রতিদান, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে[৪]।

তো, কোনই ক্ষতি নেই– আমরা প্রথমেই ক্ষণস্থায়ী আবাসের মোকাবেলায় চিরস্থায়ী নিবাস অবলম্বন করেছি। এখন আমাদের শুধু এই কামনা যে, আমাদের মালিক যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের সব গোনাহ, বিশেষত তোমার ভয়ে বাধ্য হয়ে এই যে যাদুর গোনাহ করেছি তা যেন ক্ষমা করে দেন।

কথিত আছে, যাদুকররা হযরত মূসা (আ)-এর মুজেযা দেখেই বুঝে ফেলেছিল, এ যাদু নয়, অতএব এর মোকাবেলা করা উচিত নয়। কিন্তু ফেরাওনের ভয়ে তারা তা করেছিল।

১. অর্থাৎ তুমি যেসব পুরস্কার ও মর্যাদা আমাদের দিতে, তার চেয়ে অনেক উত্তম ও স্থায়ী প্রতিদান মুমিনরা আল্লাহর নিকট পাবে।

২. অর্থাৎ মানুষের উচিত সর্বাগ্রে আখেরাতের ফিকির করা, মাখলুকের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য না হওয়া। বলা বাহুল্য, যে আল্লাহর অবাধ্য হবে, তার ঠিকানা খুবই মন্দ– তা থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট যতই কঠিন হোক, মৃত্যু এসে সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু দোযখে কাফেরের মৃত্যুও হবে না, যাতে তার দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটে, আর বাঁচাও বাঁচার মত হবে না। জীবন এমন হবে যে, মৃত্যু জীবনের চেয়ে হাজার গুণ বেশি ভাল মনে হবে। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অবাধ্য অপরাধীদের মোকাবেলায় এখানে অনুগত বান্দাদের পরিণামও বর্ণনা করা হল।

৪. অর্থাৎ ভুল চিন্তাধারা, বাতিল আকিদা-বিশ্বাস, অসৎ চরিত্র ও মন্দ আমল থেকে পবিত্র হয়েছে।

[রুকূ - ৪]

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

৭৭. নিশ্চয় আমি মূসার প্রতি এ নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম যে, 'তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, অতঃপর তাদের জন্য সাগরে শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। তুমি (শত্রু এসে) ধরে ফেলার আশঙ্কাও করবে না এবং (ডুবে যাওয়ার) ভয়ও করবে না।'

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

৭৮. তার পর ফেরাওন স্বীয় সৈন্যদলগুলি নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, ফলে সমুদ্রের যে জিনিস ওদের আচ্ছন্ন করার, তা ওদের আচ্ছন্ন করে নিল[১]।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝

৭৯. মূলত ফেরাওন নিজ সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে এবং (তাদের) সুপথ দেখায়নি[২]।

---

১. যখন ফেরাওনের লোকেরা মোকাবেলার ময়দানে পরাজিত হল, যাদুকররা ঈমানের সৌভাগ্য লাভ করল, বনী ইসরাঈলের প্রভাব বাড়তে লাগল এবং বছরের পর বছর ধরে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নিদর্শন প্রদর্শন করে ওদের জন্য ওযর-আপত্তির পথ বন্ধ করে দিলেন, তা সত্ত্বেও ফেরাওন সত্য গ্রহণ করতে এবং বনী ইসরাঈলকে স্বাধীনতা দিতে রাজি হল না- তখন আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন, সকল বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলায় মিসর থেকে হিজরত কর, যেন বনী ইসরাঈলের করুণ অবস্থা ও দাসত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। পথিমধ্যে সমুদ্র (লোহিত সাগর) পড়বে, কিন্তু তোমার ন্যায় বিশিষ্ট পয়গম্বরের পথে সমুদ্রের তরঙ্গমালা বাধা হবে না, বরং তারই ভিতর দিয়ে নিজের জন্য শুষ্ক পথ বের করে নেবে। এ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাও করো না এবং পিছন থেকে শত্রুরা এসে তোমাদের ধরে ফেলবে এ ভয়ও করো না।

উক্ত হেদায়েত অনুযায়ী মূসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রের বুকে লাঠির আঘাত করলেন। ফলে পানি সরে গিয়ে পথের সৃষ্টি হল। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে আদেশ করলেন মাটিকে তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে দিতে। এভাবে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে শুষ্ক পথ তৈরি হয়ে গেল, যার উভয় দিকে পানির পাহাড় দাঁড়িয়ে রইল এবং বনী ইসরাঈল অনায়াসে উক্ত পথ অতিক্রম করে গেল। পিছন থেকে ফেরাওন স্বীয় বাহিনী নিয়ে ধাওয়া করে আসছিল, শুষ্ক পথ দেখে তাতেই নেমে পড়ল। যখন বনী ইসরাঈল পার হয়ে গেল এবং ফেরাওন স্বীয় সৈন্যসামন্তসহ সাগরপথের মাঝখানে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, চতুর্দিক থেকে ওদের সকলকে ঘিরে নাও। অমনি সমুদ্র-তরঙ্গ ওদের সকলকে চিরতরে নিমজ্জিত করে ফেলল।

২. অর্থাৎ মুখে তো অনেক দাবিই করত, যেমন- وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (আর আমি তোমাদের সে পথই দেখাচ্ছি যা কল্যাণকর -সূরা মু'মিন, আয়াত ২৯)। কিন্তু সে স্বজাতিকে

৮০. হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের শত্রু থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে তূর পর্বতের ডান পাশের ওয়াদা করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মান্ ও সালওয়া ।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝

৮১. (এবং বলেছিলাম), আমি তোমাদের যে পবিত্র বস্তুরাজি দিয়েছি তা থেকে খাও এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না[১]। অন্যথায় তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হল, সে ধ্বংস হয়ে গেল[২]।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝

এমন ভাল পথই দেখাল যে, এই উদাহরণটি বাস্তবে পরিণত হল : 'আমরা তো ডুবছিই, প্রেমাস্পদগণ! তোমাদের নিয়ে ডুবব।' আর দুনিয়ায় যে অবস্থা হল, পরকালেও তাই হবে। দুনিয়ায় যেমন সমুদ্র-গর্ভে ডুবল, আখেরাতে সবাইকে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হবে- يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ (সে কিয়ামতের দিন নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে। অতঃপর সে ওদের আগুনে অবতরণ করাবে। -সূরা হূদ, আয়াত ৯৮)

১. এস্থলে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করেছেন যে, দেখ! আমি তোমাদের প্রতি কত রকমের অনুগ্রহ করেছিলাম। সুতরাং তোমাদের উচিত, এসবের হক আদায় করা। তিনি ফেরাওনের ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী দুশমনের কবল থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং ওকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেন যে, মিসর থেকে শামদেশে যাওয়ার পথে 'তূর' পর্বতের যে বরকতময় অংশ হাতের ডানদিকে পড়ে, সেখানে আসার পর তোমাদের 'তাওরাত' দান করা হবে। তাছাড়া 'তীহ' এর বিজন প্রান্তরে তোমাদের আহারের জন্য মান্ ও সাল্ওয়াহ অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এসব অনুগ্রহের দাবি এই যে, আল্লাহ তাআলা যেসব হালাল, পবিত্র, সুস্বাদু ও পরিচ্ছন্ন দ্রব্যসামগ্রী তোমাদের দান করেছেন, সেগুলি আগ্রহের সাথে ব্যবহার করবে। কিন্তু এ বিষয়ে সীমা অতিক্রম করো না- অর্থাৎ না-শোকরী বা অপব্যায় করো না, অথবা এসব পেয়ে অহংকারে লিপ্ত হয়ো না, কিংবা তার জরুরী হক আদায়ে অবহেলা করো না, অথবা আল্লাহপ্রদত্ত ধন-সম্পদ গোনাহর কাজে ব্যয় করো না, অথবা যখন ও যেখানে সঞ্চয় করে রাখায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখানে সঞ্চয় করার পিছনে পড়ো না। মোটকথা, আল্লাহর দেওয়া নে'য়ামতসমূহকে পাপাচার ও অবাধ্যতার হাতিয়ার বানিয়ো না।

২. অর্থাৎ সীমালঙ্ঘন করলে তোমাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হবে এবং তোমরা লাঞ্ছনা ও শাস্তির অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

৮২. আর নিশ্চয় আমি তার প্রতি অতি ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অতঃপর সৎপথে (অবিচল) থাকে[১]।

وَاِنِّىۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰى

৮৩. হে মূসা! তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার সম্প্রদায় থেকে আগে চলে এলে কেন?

وَمَاۤ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى

৮৪. তিনি বললেন, 'ঐ তো তারা, আমার পিছনে পিছনে (আসছে)। আর হে আমার রব! আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও[২]।

قَالَ هُمۡ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى

৮৫. আল্লাহ বললেন, 'আমি তো তোমার (চলে আসার) পরে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি এবং সামেরী তাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে[৩]।'

قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ

---

১. অভিশপ্তদের বিপরীতে এখানে ক্ষমাপ্রাপ্তদের কথা বলা হয়েছে— অর্থাৎ যত বড় পাপীই হোক না কেন, অন্তর থেকে তওবা করে ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার উপর অবিচল থাকলে আল্লাহর নিকট হতে মার্জনা ও রহমত লাভ করবে।

২. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পূর্ব ওয়াদা মোতাবেক অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তূর পাহাড়ে পৌছলেন। সম্ভবত কওমের কতক প্রধানকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আদেশ ছিল, তারা কিছুটা পিছনে পড়ে গেল। হযরত মূসা (আ) অতি আগ্রহে তূর পাহাড়ে পৌছলেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মূসা! তুমি এত তাড়াহুড়া করলে কেন যে, কওমকে পিছনে রেখে চলে আসলে?' তিনি আরয করলেন, 'হে রব! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি হাযির হয়ে গেছি। আর কওমও বেশি দূরে নয়, তারা আমার পিছনে পিছনে চলে আসছে।' كذا في التفاسير، ويحتمل غير ذلك

৩. অর্থাৎ তুমি তো এখানে চলে এসেছ, অন্য দিকে আমি তোমার কওমকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছি— কার্যকারণের জগতে (عالم اسباب) যার কারণ সামেরী। কেননা, ওরই প্ররোচনায় বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে বাছুর-পূজা শুরু করে দিয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে গত হয়েছে (আয়াত নং ১৪৮)। তা দ্রষ্টব্য।

বি. দ্র. সামেরীর নাম কারো কারো মতে মূসা ছিল। কেউ কেউ তাকে ইসরাঈল বংশীয় বলেছেন, আবার কারো মতে সে কিবতী ছিল। যা হোক, অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, এ লোকটা হযরত মূসা (আ)-এর যুগের মুনাফিক ছিল এবং মুনাফিকের মতই প্রতারণা ও ফন্দি-কৌশলের দ্বারা মুসলমানদের গোমরাহ করার ফিকিরে থাকত। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীরের ভাষ্য অনুযায়ী ইসরাঈলী বই-পুস্তকে ওর নাম হারূনও উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৬. তখন মূসা ক্রুদ্ধ হয়ে অনুতাপ করতে করতে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব কি তোমাদের উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তো, তোমাদের জন্য মেয়াদটা কি দীর্ঘ হয়ে গেল, নাকি তোমরা চেয়েছ, তোমাদের উপর তোমাদের রবের ক্রোধ আপতিত হোক। এ কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করলে[১]?'

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۬ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾

৮৭. ওরা বলল, 'আমরা আপনার সঙ্গে স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের দ্বারা (ফেরাওনী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের অনেক বোঝা বহন করানো হয়েছিল। আমরা তা ফেলে দিলাম। আর এমনিভাবে সামেরীও ফেলল[২]।

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

---

১. অর্থাৎ তোমাদের সাথে আল্লাহ এ ওয়াদা করেছেন যে, আমার আনুগত্য করলে তোমাদের দীনী ও পার্থিব সব রকমের মঙ্গল লাভ হবে। সে মত তোমরা বহু বড় বড় কল্যাণকর বিষয় ইতিমধ্যে নিজেদের চোখে দেখতে পেয়েছ, আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তাও অতি সত্বর দেখতে পাবে। এটাই তোমাদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা। তো, এরপর কি দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, যার ফলে তোমরা পিছনের অনুগ্রহসমূহের কথা ভুলে গেছ এবং ভবিষ্যত নে'য়ামতসমূহের অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? নাকি জেনে-শুনে তোমরা আমার সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করলে? এবং তাওহীদের উপর কায়েম না থেকে আল্লাহর গযব ক্রয় করলে? (ইবনে কাছীর র. আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন)।

তবে আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ত্রিশ-চল্লিশ দিনের ওয়াদা করেছিলেন যে, এ পরিমাণ সময় মূসা (আ) 'তূর' পাহাড়ে ই'তেকাফ করলে তোমরা তাওরাত শরীফ লাভ করবে। এ ওয়াদার পর কি অনেক বেশি সময় পার হয়েছে, ফলে তোমরা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে গেছ এবং বাছুর-পূজা অবলম্বন করেছ? নাকি তোমরা কোন কারণ ছাড়াই এ আচরণ করে আল্লাহর গযবের পাত্র হলে?

আর أخلفتم موعدي আয়াতাংশে সেই ওয়াদা উদ্দেশ্য, যা বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে করেছিল। তা এই যে, আপনি আমাদের আল্লাহর কিতাব এনে দিন, তাহলে আমরা তদনুযায়ী আমল করব এবং আপনার আনুগত্যের উপর অবিচল থাকব।

২. অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছায় এমনটা করিনি। এই কাজ সামেরী আমাদের দ্বারা করিয়েছে। ঘটনা এই যে, ফেরাওনী কওমের যে অলঙ্কারাদি আমাদের কাছে ছিল, আমরা তা কী করব বুঝতে পারিছলাম না। শেষে আমরা পরামর্শক্রমে তা ফেলে দেই। সামেরী সেগুলো আগুনে গলিয়ে

৮৮. তারপর সে তাদের জন্য বের করে আনল একটা বাছুর তথা একটা দেহ, যার মধ্যে ছিল গরুর আওয়াজ। তখন তারা বলতে লাগল, 'এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন[১]।'

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ

৮৯. আচ্ছা, তারা কি দেখে না যে, সেটা তাদের কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাদের ক্ষতি বা উপকারের ক্ষমতাও রাখে না[২]?

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا

[রুকূ - ৫]

৯০. হারূন ইতিপূর্বেই তাদের বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! বস্তুত এ বাছুরের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে আর তোমাদের রব তো তিনি, যিনি 'রহমান' (পরম করুণাময়)। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর[৩]।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ

বাছুরের আকৃতি তৈরি করে দিল। এ ঘটনা সূরা আ'রাফে গত হয়েছে– সেখানকার তাফসীর দ্রষ্টব্য (আয়াত ১৪৮-১৫১)

বি. দ্র. ফেরাওনের জাতির অলঙ্কারাদি কী করে বনী ইসরাঈলের হস্তগত হল? তাদের থেকে বনী ইসরাঈল ধার নিয়েছিল, না গনীমতের ধন হিসাবে হস্তগত হয়েছিল, না অন্য কোন উপায়ে লাভ করেছিল– এতে মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। তবে যে উপায়েই পেয়ে থাকুক, বনী ইসরাঈল এগুলো ব্যবহার করাকে জায়েয মনে করত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিমা বানিয়ে তার পূজা করাকে বৈধ মনে করল। (যেন অন্যের জিনিস ব্যবহার করা অবৈধ, কিন্তু বাছুর-পূজা বৈধ!!)

১. অর্থাৎ মূসার ভুল হয়েছে– তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়েছেন, অথচ আল্লাহ তো এখানে বর্তমান, অর্থাৎ এই বাছুরই খোদা (معاذ الله) ! সম্ভবত ওদের মধ্যে যারা চরম সীমালঙ্ঘন করেছিল, এটা তাদের উক্তি।

২. অর্থাৎ যারা মূর্খ, তারা এ সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না যে, যে মূর্তি কারো সাথে কথাও বলতে পারে না, কারো সামান্যতম লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখে না, সে কী করে উপাস্য বা খোদা হতে পারে?

৩. অর্থাৎ হযরত হারূন নম্রতার সাথে মৌখিক নসীহত করে বলেছিলেন, যে বাছুরের প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হচ্ছ, তা আল্লাহ হতে পারে না। বরং তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই একক রহমান, যিনি এখন পর্যন্ত বিপুল রহমতের বৃষ্টি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছেন।

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝

৯১. তারা বলল, 'আমরা এর নিকটেই স্থির বসে থাকব* যে পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরে আসেন[১]।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝

৯২. মূসা বললেন, 'হে হারূন! যখন তুমি দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে বাধা দিল—

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝

৯৩. 'আমার কাছে চলে আসতে**? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে[২]?

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۝

৯৪. হারূন বললেন, 'হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ও মাথা ধরো না[৩]। আমি তো আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে- 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণ রাখনি[৪]।'

তাঁকে ছেড়ে তোমরা কোন্ দিকে যাচ্ছ? আমি মূসার স্থলাভিষিক্ত এবং আমি নিজেও নবী। যদি নিজেদের মঙ্গল চাও, তবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আমার অনুসরণ করা এবং আমার কথা মান্য করা। সামেরীর ধোঁকায় পড়ো না।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমরা এর উপাসনাতেই রত থাকব।

১. অর্থাৎ মূসার ফিরে না আসা পর্যন্ত তো আমরা একে নিয়েই আছি। আর তিনি আসলে পর দেখা যাবে- তখন যা সংগত মনে হবে, তাই করব।

** **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমার অনুসরণ করতে'?

২. অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) বানিয়ে এবং হুকুম করে গিয়েছিলাম যে, আমার অনুপস্থিতিতে ওদের ইসলাহ করবে এবং ফেতনা-ফাসাদকারীদের পথে চলবে না। তা, তুমি কী ইসলাহ করলে? কেন তুমি নিজের সমর্থনকারীদের নিয়ে কঠোরতার সাথে এই বাছুর-পূজকদের প্রতিরোধ করলে না? আর যদি তা না-ই করতে পারলে, তবে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার নিকট কেন চলে আসলে না? মোটকথা, তুমি এরূপ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা লক্ষ করেও কেন আমার কর্মপন্থার অনুসরণ করলে না?

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জোশের আতিশয্যে হারূন আলাইহিস সালামের দাড়ি ও মাথার চুল ধরে ফেলেছিলেন। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফে (আয়াত ১৫০) গত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ আমি এটাই মনে করেছিলাম যে, তোমার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার কারণ হতে পারে- এমন কোনো কাজ করার চেয়ে তোমার আগমনের

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বললেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী[১]?'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾

৯৬. সে বলল, 'আমি এমন একটি জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম যা অন্যরা দেখেনি। অতএব আমি প্রেরিত (ফেরেশতার) পায়ের নীচ থেকে* এক মুঠ (মাটি) তুলে নিলাম এবং তাই নিক্ষেপ করলাম। আর আমার নফ্স আমাকে এমনই মন্ত্রণা দিয়েছে[২]।'

অপেক্ষা করাই ভাল। কেননা, এ কথা পরিষ্কার যে, আমি যদি ওদের প্রতিরোধ করতে যেতাম অথবা তা না পেরে ওদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, তবে সেক্ষেত্রে কিছু লোক তো আমার সঙ্গে থাকত কিন্তু অনেকে আমার বিরুদ্ধে থাকত। এ অবস্থায় আমার আশঙ্কা হল যে, তুমি এসে আমাকে অভিযুক্ত করতে পার এবং বলতে পার যে, আমি তোমার অপেক্ষা করলাম না কেন? এবং জাতির মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টি করলাম কেন?

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব লেখেন– মূসা (আ) হারূন (আ)-কে নসীহত করে গিয়েছিলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ রেখো। সে জন্য তিনি বাছুরপূজারীদের মোকাবেলা করেননি, মুখে বুঝিয়েছেন বটে, কিন্তু ওরা মানেনি, বরং ওরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

১. অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম সামেরীকে ধমক দিয়ে বললেন, এখন তুই নিজের ব্যাপারটা খুলে বল– এই কাজ তুই কেন করলি, আর কী কারণেই বা বনী ইসরাঈল তোর প্রতি ঝুঁকে পড়ল?

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'পদচিহ্ন থেকে (অর্থাৎ যেখানে তাঁর ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখেছিলাম, সেখান থেকে)'।

২. সামেরী বলল, আমার এমন এক বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছিল- যা অন্যরা দেখতে পায়নি। অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে ঘোড়ার উপর আরোহী দেখতে পাই। সম্ভবত এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সাগরে প্রবেশ করেছিল এবং পিছনে পিছনে ফেরাওনের বাহিনী প্রবেশ করে। তখন জিবরাঈল উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে এক দল অন্য দলের সাথে মিলিত না হতে পারে।

যা হোক, সামেরী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রমাণ দ্বারা অথবা নিছক উপলব্ধির মাধ্যমে কিংবা কোন পূর্ব পরিচয়হেতু বুঝতে পেরেছিল যে, ইনি জিবরাঈল। তখন সে তাঁর পা বা তাঁর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে এক মুঠ মাটি তুলে নিল। সেই মাটি সোনার তৈরি বাছুরের ভিতর নিক্ষেপ করল। ওর মনে হয়েছিল, 'রূহুল কুদুস' এর পদধূলিতে কোন বিশেষ প্রভাব অবশ্যই থাকবে।

৯৭. মূসা বললেন, 'তুমি দূর হও, তোমার জন্য জীবনভর তো এই (শাস্তি) যে, তুমি বলতে থাকবে, 'স্পর্শ করো না'[১]। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি, তোমার সঙ্গে যার বরখেলাফ কিছুতেই করা হবে না[২]। আর তুমি তোমার উপাস্যকে দেখ, যার কাছে তুমি স্থির বসে থাকতে। আমরা অবশ্যই একে জ্বালিয়ে দেব, তারপর এ(-র ছাইগুলি) সাগরে বিক্ষিপ্ত করে দেব[৩]।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'উক্ত সোনা কাফেরদের সম্পদ ছিল, অবৈধ উপায়ে হস্তগত হয়েছিল। তাতে বরকতের মাটি পতিত হওয়ায় হক ও বাতিল মিশ্রিত হয়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিল। প্রাণীর ন্যায় আত্মা ও শব্দ বাছুরটিতে সৃষ্টি হয়ে গেল। এরূপ বিষয়াদি থেকে খুব বেঁচে থাকা উচিত। এ থেকেই মূর্তিপূজা প্রসার লাভ করে।'

বি. দ্র. আয়াতের উল্লিখিত তাফসীরই সাহাবা, তাবেঈন ও বিজ্ঞ মুফাসসিরগণ থেকে বর্ণিত। যেসব বক্রমনা লোক এই তাফসীরের সমালোচনা করে আয়াতের দূরবর্তী তাবীল করেছে, 'রূহুল মাআনী'র লেখক তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে তার উল্লেখ সম্ভব নয়। (যার ইচ্ছা, সেখানে দেখে নিন।)

১. অর্থাৎ আমাকে স্পর্শ করো না, আমার থেকে দূরে থাক।

যেহেতু সে পদ ও নেতৃত্বের লোভে বাছুরের এই চালবাজি করেছিল, যাতে লোকেরা তার অনুসারী হয়ে তাকে সরদার হিসাবে গ্রহণ করে, তাই তার উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, কেউ যেন তার নিকট না যায়। যে কেউ তার নিকটবর্তী হবে, তাকে সে নিজেই দূরে থাকতে বলবে। এভাবে সে দুনিয়ায় একটা লাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য ও বন্যপশুর ন্যায় জীবন যাপন করবে।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দুনিয়ায় তার এই শাস্তি হল যে, সে বনী ইসরাঈল থেকে দূরে পৃথক থাকত। কেউ তার সাথে বা সে কারো সঙ্গে মিলিত হলে উভয়েই জ্বরে আক্রান্ত হত। এ জন্যই সে লোকদেরকে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলত। আর এই যে বলা হয়েছে, 'একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার বরখেলাফ হবে না'– সম্ভবত এর দ্বারা আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য। আর দাজ্জালের আবির্ভাবও উদ্দেশ্য হতে পারে। সেও ইহুদীদের মধ্যে সামেরীর ফাসাদ ও মিশনকে পূর্ণতায় পৌঁছাবে।

৩. অর্থাৎ এ তো হল তোর শাস্তি। এখন তোর মিথ্যা উপাস্যের স্বরূপও উন্মোচন করে দিচ্ছি। যে বাছুরকে তুই খোদা বানালি এবং সারাদিন তার কাছে স্থির বসে থাকলি, তোর চোখের সামনে তা ভেঙে-চুরে, জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেব। অতঃপর সে ভস্ম সাগরে ভাসিয়ে দেব,

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তোমাদের মা'বূদ তো আল্লাহই, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তাঁর ইলম সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত[১]।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. এমনিভাবে আমি আপনার নিকট যারা পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের হাল-অবস্থা বর্ণনা করি*[২] আর আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে দান করেছি পড়ার কিতাব**[৩]।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০. যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা কিয়ামতের দিন বহন করবে (কঠোর আযাবের) বোঝা–

خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০১. যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। আর কিয়ামতের দিন তা হবে ওদের জন্য অতি মন্দ বোঝা[৪]–

যাতে তার পূজারীদের সামনে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে নিজের অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারে না, সে কীভাবে অন্যের লাভ-লোকসান করবে!

১. বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে একই সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে সত্যের দিকেও আহ্বান করলেন– অর্থাৎ বাছুর দূরে থাক, বড় থেকে বড় কোন বস্তুও মা'বূদ হতে পারে না। প্রকৃত মা'বূদ তো সেই এক অদ্বিতীয় সত্তা, যিনি ছাড়া কারো বন্দেগী দীনি দলিল-প্রমাণ, সাধারণ যুক্তি-বুদ্ধি ও সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি কোন কিছুর আলোকেই বৈধ নয় এবং যাঁর অসীম জ্ঞান ছোট-বড় সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'পূর্বে যা-কিছু ঘটেছে, তার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করি'।

২. অর্থাৎ মূসা ও ফেরাওনের মত বিগত আরো বহু জাতির ঘটনা আমি আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে থাকি, যার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে– যথা জ্ঞানের সমৃদ্ধি, নবীজীর মু'জেযার আধিক্য, পয়গম্বর ও মুসলমানদের সান্ত্বনা, বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। তাছাড়া এসব ঘটনায় অবাধ্যদের জন্য সতর্কতা ও ভয়-ভীতির উপায়-উপকরণও থাকে।

** দ্বিতীয় তরজমা– 'এক স্মারকগ্রন্থ (অর্থাৎ কুরআন)'।

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত শিক্ষণীয় ঘটনাবলি ও বহু তত্ত্ব-তথ্যসম্বলিত কুরআন কারীম দান করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাকে মিথ্যা বলার কারণে গোনাহর যে বোঝা ওদের উপর কিয়ামতের দিন চাপানো হবে তা কখনো লাঘব হবে না– চিরকাল

১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এবং সে দিন আমি অপরাধীদের সমবেত করব নীল চক্ষুবিশিষ্ট অবস্থায়[১]।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০৩. ওরা পরস্পরে চুপি চুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছ'[২]।

يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৪. ওরা যে কথা বলবে আমি তা উত্তমরূপে জানি[৩], যখন ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলবে, 'তোমরা কেবল একদিন অবস্থান করেছ[৪]।'

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

তার নীচে পিষ্ট হতে থাকবে। অতএব এহেন বোঝা কোন হাসি-তামাশার বস্তু নয়। যখন ওরা তা বহন করবে তখন বুঝতে পারবে, কত মন্দ ও কঠিন বোঝার নীচে ওরা নিষ্পেষিত হচ্ছে।

১. زُرْقًا –অর্থাৎ হাশরের মাঠে সমবেত হবে অন্ধ হয়ে। অথবা অর্থ এই যে, সেদিন তারা নীল চক্ষুবিশিষ্ট হবে, যাতে তাদের কদর্য দেখায়। এখন যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা। পরে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হবে, যাতে দোযখ ইত্যাদি দেখতে পারে –(সূরা কাহফ আয়াত ৫৩ ও সূরা মারয়াম আয়াত ৩৮) দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ আখেরাতের দীর্ঘতা এবং সেখানকার ভয়াবহ অবস্থা দেখে দুনিয়া বা কবরের জীবন এতই স্বল্পকালীন মনে হবে যে, যেন ওরা আট-দশদিনের বেশি বাস করেনি। অতি তাড়াতাড়ি দুনিয়া খতম হয়ে গেল। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ভুলে যাবে, আর অনর্থক কর্মে জীবন নষ্ট করার জন্য অনুতাপ করবে।

অথবা এমনও হতে পারে যে, ওরা ওযর-আপত্তিস্বরূপ এরূপ বলবে, অর্থাৎ দুনিয়াতে অতি-স্বল্প সময় রয়েছি, ফলে আখেরাতের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করার সুযোগ পাইনি। যেমনঃ অন্যত্র বলা হয়েছে- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ الخ (যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে, ওরা (দুনিয়াতে বা কবরে) এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি...। –সূরা রূম, আয়াত ৫৫)

৩. অর্থাৎ চুপি চুপি বলায় ওদের কথা আমার নিকট থেকে গোপন থাকবে না। ওরা পরস্পর যেসব কানাঘুষা করবে, তা আমার বেশ জানা আছে।

৪. অর্থাৎ ওদের মধ্যে যে তুলনামূলক বেশি বুদ্ধিমান ও সতর্ক-সচেতন হবে, সে বলবে, মিয়া, দশ দিন কোথায়? মাত্র একদিন থেকেছ।

একে বেশি বুদ্ধিমান ও সচেতন বলার কারণ এই যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও নশ্বরতা, আখেরাতের চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতা এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতা অন্যদের তুলনায় সে বেশি বুঝেছে।

[রুকূ - ৬]

১০৫. ওরা আপনাকে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, 'আমার রব তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۝

১০৬. অতঃপর তিনি পৃথিবীকে সমতল ময়দানে পরিণত করবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

১০৭. 'তাতে তুমি দেখবে না কোন বক্রতা ও সামান্য উচ্চতাও[১]।'

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝

১০৮. সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার আহ্বানে কোন বক্রতা নেই*[২]। এবং 'রহমান'-এর ভয়ে ক্ষীণ হয়ে যাবে সকল আওয়াজ, ফলে তুমি মৃদু পদধ্বনি ছাড়া কিছু শুনবে না[৩]।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝

১. অর্থাৎ কিয়ামতের কথা বলা হলে পুনরুত্থানের অস্বীকারকারীরা উপহাস করে বলে, 'তবে এত কঠিন ও বিরাট পাহাড়গুলির অবস্থা কী হবে? এসবও কি ভেঙে-চুরে যাবে?' এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের সামনে পাহাড়-পর্বতের কী মূল্য আছে? এসবকে মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বালু-কণা ও ধুনিত তুলার মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর পৃথিবীকে একেবারে পরিষ্কার ও সমতল করে দেওয়া হবে, যার উপর কোনো আঁকাবাঁকা ও উঁচুনিচু থাকবে না, পাহাড়-পর্বতের প্রতিবন্ধকতা এক মুহূর্তে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যার আহ্বানের অন্যথা করা যাবে না'।

২. অর্থাৎ যেদিকে ফেরেশতা আওয়াজ দেবেন অথবা যেখানে ওদের ডাকা হবে, ওরা সোজা সেদিকে তীরের ন্যায় দৌড়ে যাবে। আহ্বানকারীর কথাও বক্র (ও ভুল) হবে না এবং মানুষরাও তার কথার কোন অন্যথা করতে পারবে না। আফসোস! দুনিয়াতেও যদি মানুষ আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে সোজা তাঁর দিকে ধাবিত হত, তবে আখেরাতে উপকারে আসত। কিন্তু এখানে বহু মানুষ নিজেদের দুর্ভাগ্য ও বক্র স্বভাবের কারণে সর্বদা বাঁকা পথে চলতে থাকে।

৩. অর্থাৎ সেই সময় রহমানের ভয় ও ভীতির আতিশয্যে হাশরের মাঠের দিকে চলার আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ শোনা যাবে না। কেউ কিছু বললেও তা এমন নিঃশব্দে বলবে, যেন কানাঘুষা করা হচ্ছে।

১০৯. সেদিন কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না, যাকে 'রহমান' অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন[১]।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০. যা কিছু তাদের সামনে ও যা কিছু তাদের পশ্চাতে, সবই তিনি জানেন (অর্থাৎ তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকল অবস্থা তিনি জানেন), আর তারা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা তাঁকে মোটেই আয়ত্ত করতে পারে না[২]।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১১. (সেদিন) চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সকল চেহারা অবনমিত হবে[৩]। আর সে ব্যর্থ হয়েছে যে জুলুমের বোঝা বহন করেছে[৪]।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

---

১. অর্থাৎ শুধু তার সুপারিশ উপকারে আসবে, যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুপারিশ করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হবে এবং যার কথা বলা আল্লাহর পছন্দ হবে, আর সে সংগত কথাই বলবে। উল্লেখ্য, সে এমন ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ করবে, যার কথা আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেছে অর্থাৎ সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ চলবে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞান সকলকে বেষ্টন করে আছে, কিন্তু বান্দার জ্ঞান তাঁকে বা তাঁর জ্ঞাত বিষয়াদিকে বেষ্টন করতে পারে না। অতএব তিনিই তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের আলোকে জানেন, কাকে সুপারিশের সুযোগ দেওয়া সমীচীন, আর কাকে নয়।

৩. অর্থাৎ সেদিন বড় বড় অবাধ্য, অহংকারীরও মস্তক সর্বসমক্ষে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার সামনে দীন-হীন বন্দীদের ন্যায় অবনমিত হবে। যারা কখনো আল্লাহর সামনে মাথা নত করেনি, তারাও সেদিন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত অবস্থায় তাঁর দরবারে উপস্থিত হবে।

৪. অর্থাৎ সেদিন জালেমের অবস্থা যে কীরূপ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'জুলুম' শব্দটির মধ্যে শিরক ও অন্যান্য অপরাধও অন্তর্ভুক্ত। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (নিশ্চয়ই শিরক ভয়াবহ জুলুম। -সূরা লুকমান, আয়াত ১৩) এবং - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الخ (আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে... -সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৩৫)। আর প্রত্যেক জালেমের শাস্তি তার জুলুমের স্তর ও পরিমাণ হিসাবে হবে।

১১২. আর যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে এবং সে হবে মুমিন, সে অবিচারেরও ভয় করবে না এবং কম প্রাপ্তিরও না[১]।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১৩. আর এমনিভাবে আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষার কুরআনরূপে এবং তাতে বিভিন্নভাবে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা ভয় করে অথবা তা তাদের অন্তরে চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে*[২]।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৪. অতএব আল্লাহ অতি মহান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ[৩]। আপনি কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না আপনার প্রতি তার অবতরণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আর বলুন, 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন'[৪]।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

---

১. অবিচার বলতে– কোন নেকী নষ্ট করে দেওয়া, অথবা যে গোনাহ করা হয়নি তার শাস্তি দেওয়া। আর কম প্রাপ্তির অর্থ প্রতিদান কম দেওয়া।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের কারণ হয়'।

২. অর্থাৎ উপরের আয়াতগুলিতে যেমন হাশরের মাঠের অবস্থাদি এবং সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ফলাফল পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি, তদ্রূপ আমি সম্পূর্ণ কুরআনকে পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে এর প্রথম শ্রোতারা তা পাঠ করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। আর এতটুকু না হলেও কমপক্ষে তাদের অন্তরে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে কিছুটা চিন্তার উদ্রেক হয়। হতে পারে, এ চিন্তা-ফিকিরই ধীরে ধীরে তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসবে এবং তাদের মাধ্যমে অন্যদেরও হেদায়েত লাভ হবে।

৩. তিনিই এরূপ মহামর্যাদাশালী কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং নিজ বান্দাদের উপকারের জন্য তাদের এমন সত্য ও খাঁটি বাণীসমূহ শুনিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ কুরআন যখন এমন কল্যাণকর ও বিস্ময়কর বস্তু, সুতরাং আমি যেমন একে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করছি, আপনিও তা জিবরাঈল (আ) থেকে গ্রহণ করতে তাড়াহুড়া করবেন না। যখন ফেরেশতা ওহী পাঠ করে শোনাতে থাকেন, তখন আপনি দ্রুত তার সঙ্গে পড়বেন না। আমি দায়িত্ব নিয়েছি যে, কুরআন আপনার সীনা থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং ভুলে যাওয়ার চিন্তায় চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। এ চিন্তায় না পড়ে বরং দো'য়া করতে থাকুন, যেন আল্লাহ তাআলা কুরআনের আরো বেশি বুঝ এবং বেশি থেকে বেশি

১১৫. আমি ইতিপূর্বে আদমকে (একটি বিষয়ে) জোরালো আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি[১]।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝

[রুকূ - ৭]

১১৬. (স্মরণ কর), যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর'। তখন তারা সকলে সেজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে অমান্য করল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ۝

১১৭. অতএব আমি বলে দিলাম, 'হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং এ যেন জান্নাত থেকে তোমাদের বের করে না দেয়। তা হলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে[২]।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝

১১৮. তুমি এই পেলে যে– জান্নাতে তুমি ক্ষুধার্তও হবে না, বিবস্ত্রও হবে না,

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝

জ্ঞান-তত্ত্ব দান করেন। দেখুন, আদম (আ) একটি বিষয়ে অহেতুক তাড়াহুড়া করেছিলেন, তার পরিণাম ভাল হয়নি

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জিবরাঈল যখন কুরআন নিয়ে আসতেন, তখন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁর পড়ার সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পড়তে শুরু করতেন। আল্লাহ তাআলা পূর্বে সূরা কিয়ামাতে এটা নিষেধ করেছেন : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ এবং সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন যে, কুরআনকে (আপনার) স্মরণে রাখা এবং মানুষের নিকট পৌছানো আমার দায়িত্ব। কিন্তু তিনি তো মানুষ, সম্ভবত ভুলে গিয়ে থাকবেন, তাই বর্তমান আয়াতে পুনরায় সতর্ক করলেন। এবং মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া যে স্বাভাবিক, তার প্রমাণ হিসাবে সামনে আদম (আ) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

১. অর্থাৎ তিনি ভুলে গিয়ে এক গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। 'ভুলে গেলেন' অর্থাৎ (নির্দেশের উপর) অবিচল থাকতে পারেননি। সম্মুখে এই ঘটনার কিছুটা তফসীল আসছে।

২. কারণ, বেহেশতের সুখ-শান্তি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।(বেহেশতের বাইরে) খাওয়া-পরা ও বসবাস করার জন্য চেষ্টা-তদবীর ও কষ্ট করতে হবে।

১১৯. আর তুমি তাতে পিপাসাও বোধ করবে না এবং রোদের কষ্টও পাবে না[১]।	وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব– অনন্ত জীবন লাভের বৃক্ষের কথা এবং এমন রাজত্বের কথা যা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না[২]?'	فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾
১২১. তার পর তারা তা থেকে খেয়ে ফেললেন। ফলে তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তারা নিজেদের উপর জান্নাতের পাতা-পল্লব জড়াতে লাগলেন[৩]। আর আদম স্বীয় রবের আদেশ অমান্য করলেন, ফলে তিনি পথচ্যুত হলেন।	فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾
১২২. অতঃপর তাঁর রব তাঁকে (কবুলিয়ত ও নৈকট্যের মর্যাদা দানের জন্য) মনোনীত করলেন, সুতরাং তাঁর প্রতি সদয় হলেন এবং (তাঁকে) পথে আনয়ন করলেন[৪]।	ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১. এগুলিই মানুষের মৌলিক চাহিদা– পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী বাসস্থান। জান্নাতে এসবের কোন কষ্ট নেই, বরং সকল দিক দিয়েই সুখ আর সুখ। কবি বলেন:

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

'বেহেশত এমন স্থান, যেখানে কোনো কষ্ট নেই।'

এস্থলে বেহেশতের সুখ-সম্ভোগের উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু বিভিন্ন কষ্ট না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভবত এই ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, জান্নাত থেকে বের হলে এসব ব্যাপারে কষ্ট করতে হবে।

২. অর্থাৎ এমন বৃক্ষের কথা বলব, যার ফল খেলে কখনো মৃত্যু আসবে না এবং অবিনশ্বর রাজত্বের মালিক হওয়া যাবে?

৩. এ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফে ও অন্যত্র করা হয়েছে। সেসব স্থানে আমরা ঘটনার এক একটি অংশ নিয়ে বিশদ ও যথেষ্ট আলোকপাত করেছি। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ২২ দ্রষ্টব্য)

৪. অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে তাঁর ত্রুটি হল, তিনি স্বীয় মর্যাদানুপাতে সংকল্প ও দৃঢ়তার পথে অবিচল থাকতে পারেননি। একেই আল্লাহ তাআলা শক্ত ভাষা ব্যবহার করতঃ

১২৩. আল্লাহ বললেন, 'তোমরা উভয়ে এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে[১]। তার পর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত পৌছে[২], তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হেদায়েতের অনুসরণ করবে, সে বিভ্রান্তও হবে না এবং কষ্টেও পড়বে না[৩]।'

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন[৪]।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

عصى وغوى শব্দে ব্যক্ত করেছেন, তাও নিতান্ত حسنات الأبرار سيئات المقربين -এর নিয়মানুসারে। এ বিষয়টিও পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ثم اجتباه অর্থাৎ তাঁর উপর শয়তানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেননি, বরং তৎক্ষণাৎ তাঁকে তওবার তাওফীক দান করেন, কবূলিয়তের রাজকীয় মর্যাদা দান করেন এবং অত্যধিক মেহেরবানীর সাথে তাঁর প্রতি সুদৃষ্টি দান করেন এবং স্বীয় সন্তুষ্টির পথের উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেন।

১. আয়াতে সম্বোধন যদি শুধু আদম ও হাওয়ার প্রতি হয়, তবে অর্থ এই যে, তাঁদের সন্তানসন্ততি পরস্পরে একে অন্যের শত্রু হবে। তাঁরা দু'জন ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রুটি করেছিলেন। এই একতার বিনিময় এভাবে দেওয়া হল যে, তাঁদের সন্তানসন্ততি পরস্পরের শত্রু হল।

আর যদি উক্ত সম্বোধন আদম ও ইবলীসের প্রতি হয়, তবে উদ্দেশ্য এই হবে যে, উভয়ের বংশধরের মধ্যে এই শত্রুতা চিরদিন কায়েম থাকবে। শয়তান-জাতি সর্বদা আদম-সন্তানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে।

২. অর্থাৎ নবী ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে।

৩. অর্থাৎ জান্নাতের পথ থেকে বিভ্রান্তও হবে না এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্টও ভোগ করবে না। যে আসল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, পুনরায় নিশ্চিন্তে সেখানে গিয়ে পৌঁছবে।

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার নশ্বর জীবনকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়, তার জীবনকে পঙ্কিল ও সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। যদিও বাহ্যত তার নিকট বিস্তর ধন-ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার অন্তর অল্পে-তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল থেকে শূন্য হওয়ার কারণে সর্বদা দুনিয়ার লোভ, বেশি বেশি উন্নতির চিন্তা ও অভাবের আশঙ্কায় অশান্ত থাকে। সে কখনই অর্থার্জনের লোভ-লালসা থেকে বাইরে আসতে পারে না। অপরদিকে নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তা ও ধনবিলুপ্তির আশঙ্কা তো স্বতন্ত্র অশান্তির কারণ হয়েই

وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব[১]।'

থাকে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ধনাঢ্য বিলাসীদের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, রাতদিনে কারো দু ঘণ্টা, আর যার কিসমত ভাল তার তিন চার ঘণ্টা ঘুম ভাগ্যে জোটে। অনেক বড় বড় কোটিপতি দুনিয়ার দুশ্চিন্তায় অসহ্য হয়ে জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের সমাজে এ ধরনের আত্মহত্যার বিস্তর উদাহরণ রয়েছে।

কুরআন-হাদীছের বাণী ও অভিজ্ঞতা এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, এ দুনিয়ায় আল্লাহর যিকির ছাড়া কারো অন্তরে শান্তি ও প্রকৃত সুখ হাসিল হতে পারে না– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (জেনে রাখ! অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্তি পায়।) কিন্তু কবির ভাষায়-

ذوق ایں بادہ ندانی بخدا تانہ چشی

'খোদার কসম! যতক্ষণ না চেখে দেখবে, ততক্ষণ সুরার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না।'

معيشة ضنكا-এর ব্যাপারে বিবিধ মতামত

কোন কোন মুফাসসিরের মতে معيشة ضنكا দ্বারা এমন জীবন উদ্দেশ্য, যার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। যেন সেই জীবন এমন সংকীর্ণ যে, তাতে কল্যাণ প্রবেশ করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একজন কাফের- যে দুনিয়ার নেশায় মত্ত ও বিভোর, তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ শেষ পর্যন্ত তার জন্য বিপদের কারণ হবে। অনতিকাল পরই যে সুখ-সম্পদের পরিণাম চিরস্থায়ী ধ্বংস, তাকে কী করে সুখ-সম্পদ বলা যায়?

কোন কোন মুফাসসির বলেন, معيشة দ্বারা এস্থলে কবরে 'বরযখের' জীবন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে তার উপর দারুণ সংকীর্ণতার এক যুগ আসবে, যখন কবরের মাটিও তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে।

কোনো কোনো সাহাবী معيشة ضنكا এর তাফসীর 'কবরের আযাব' করেছেন, বরং মুহাদ্দেছ বাযযার নির্ভরযোগ্য সনদে আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। (মুসনাদে বায্যার, ৯৪০৭; সহীহ হিব্বান, ৩১১৯)

যা হোক, معيشة ضنكا শব্দ দ্বারা উল্লিখিত সকল অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। والله أعلم

১. অর্থাৎ চোখ অন্ধ অবস্থায় তাকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হব। আর সে অন্তরের দিক দিয়েও অন্ধ হবে। ফলে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এটা হাশরের প্রথম অবস্থার কথা। পরবর্তীতে তার চোখ খুলে দেওয়া হবে, যাতে হাশরের মাঠে দোযখ প্রভৃতির ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করতে পারে।

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার রব! তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে কেন? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম[১]।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝

১২৬. তিনি বলবেন, 'এভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে[২]।'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

১২৭. আর এভাবেই আমি (প্রত্যেক) সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং স্বীয় রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না[৩]। আর নিশ্চয় আখেরাতের আযাব অধিকতর কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী[৪]।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝

১২৮. সুতরাং এ বিষয়টিও কি ওদেরকে আলোর পথ দেখাল না* যে, আমি ওদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে ওরা চলাফেরা করে[৫]? নিশ্চয়ই

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কাফের বাহ্যিকভাবে চক্ষুবিশিষ্ট ছিল, সে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করবে, কী দোষে এখন আমার চোখ ছিনিয়ে নেওয়া হল?

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমার আয়াতগুলি দেখা ও শোনা সত্ত্বেও তুমি তা বিশ্বাসও করনি, সে অনুযায়ী আমলও করনি; বরং সেগুলি এমন ভুলে রয়েছিলে যে, সব কিছু শোনা সত্ত্বেও না শোনার মতই ছিল। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তো তুমি অন্ধ থেকেছিলে, এখানে সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ায় এবং অন্ধ অবস্থায় উঠানোয় বিস্মিত হচ্ছ কেন?

৩. অর্থাৎ এমনিভাবে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অবস্থা অনুপাতে শাস্তি দেওয়া হবে।

৪. অতএব বড় বোকামীর বিষয় হবে, যদি এখানকার (দুনিয়ার) দুঃখ-কষ্টকে ভয় করা সত্ত্বেও সেখানকার (পরকালের) আযাব থেকে বাঁচার ফিকির করা না হয়।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, ولعذاب الآخرة أشدّ 'অর্থাৎ অন্ধ হওয়ার শাস্তি হবে হাশরের ময়দানে, আর দোযখে রয়েছে আরো গুরুতর শাস্তি।'

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এ বিষয়টিও কি ওদের হেদায়েতের কারণ হল না ...'

৫. অর্থাৎ পরকালের শাস্তির প্রতি তো তাদের বিশ্বাস নেই, কিন্তু তারা কি ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে না? এই মক্কাবাসীদেরই আশেপাশে কত সম্প্রদায়কে স্বীয় কুফর

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

এতে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

[রুকূ - ৮]

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

১২৯. আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত একটি কথা না থাকত এবং না থাকত একটি নির্দিষ্ট সময়, তবে অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হত*[১]।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

১৩০. অতএব ওরা যা বলে আপনি তাতে ধৈর্য ধরুন[২] এবং স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা

ও অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করা হয়েছে, যাদের কাহিনী এখনো লোকমুখে চালু রয়েছে। আর শাম প্রভৃতি দেশের সফর করতে গেলে স্বয়ং এরাও কতক সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করে, যা দেখে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্মৃতি সজীব হওয়া উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে, কীভাবে এ স্থানগুলিতেই ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল?

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** '(তাদের জন্য) শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।'

বা– 'অবশ্যই (তাদের উপর) শাস্তি আপতিত হয়ে যেত'।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর গযব থেকে অধিক ও অগ্রবর্তী। এ জন্যই তিনি অপরাধীকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংশোধনের অবকাশ দেন এবং হুজ্জত পূর্ণ করা (ওজরের পথ বন্ধ করা) ছাড়া ধ্বংস করেন না। এই উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ এ সুসংবাদও দিয়েছেন– وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم الخ আপনি ওদের মধ্যে থাকাবস্থায় আল্লাহ কিছুতেই ওদের শাস্তি দেবেন না– আনফাল : ৩৩) এবং নিজ মেহেরবানীতে তিনি সমূলে ধ্বংসকারী ব্যাপক আযাব এই উম্মত থেকে তুলে নিয়েছেন।

এ-ই হল সেই বিষয়, যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে স্থির হয়ে আছে। এ যদি না হত এবং প্রত্যেক অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য আযাবের একটি বিশেষ সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যই আযাব এসে ওদের ঘিরে ফেলত। কেননা, ওদের কুফর ও দুষ্কৃতির দাবি এটাই যে, ওদের তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হোক। কিন্তু উল্লিখিত কারণগুলির বিবেচনায় শাস্তি এখনো মুলতবী রয়েছে। তবে পরকালে নিদারুণ আযাবের স্বাদ ওদেরকে ভোগ করতেই হবে এবং যখন সময় আসবে তখন দুনিয়াতেও শাস্তির কিছুটা নমুনা দেখতে পাবে– যেমন বদরের জেহাদে মুসলমানদের হাতে কিছুটা নমুনা দেখেছিল।

২. অর্থাৎ আযাব যথা সময়ে অবশ্যই আসবে। বিলম্ব দেখে এরা যা কিছু বলুক না কেন, আপনি আপাতত এদের কথা সহ্য করতে থাকুন এবং ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে শেষ ফলাফলের অপেক্ষা করুন। এদের কুফরী কথায় বেশি অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বর্ণনা করতে থাকুন– সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে[১] এবং পবিত্রতা বর্ণনা করুন রাতের কিছু অংশে[২] ও দিনের প্রান্তসমূহে[৩], যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন[৪]।

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾

১৩১. আর আপনি সেসব বস্তুর দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না, যা আমি কাফেরদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের চাকচিক্যরূপে উপভোগ করতে দিয়েছি– যাতে তার দ্বারা ওদের পরীক্ষা করি। আর আপনার রবের রিযিক সর্বোত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী[৫]।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿۱۳۱﴾

---

১. এ দ্বারা ফজর ও আসরের নামায উদ্দেশ্য। আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে, নির্বোধ ও দুরাত্মাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করবেন না, বরং ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে স্বীয় রবের ইবাদতে (নামাযে) রত থাকুন। কেননা, ধৈর্য ও নামায– এ দুটি জিনিস দ্বারা আল্লাহর সাহায্য লাভ হয়- وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর– বাকারা : ৪৫)

২. এর দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। বরং কোন কোন মুফাসসিরের মতে তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. এ হল জোহরের নামায। কেননা, এ সময় দিনের প্রথমার্ধের শেষ প্রান্ত ও দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম প্রান্ত- এ দুই প্রান্তের সংযোগস্থল।

'সিহাহ' ও 'কামূস' প্রভৃতি অভিধানের কিতাবসমূহে আছে– أطراف এর এক বচন طرف , আর طرف বলে طائفة من الشيء অর্থাৎ কোন বস্তুর অংশবিশেষকে, তা সীমা বা প্রান্ত হওয়া জরুরী নয়। অতএব نهار-কে জাতিবাচক ধরে أطراف النهار -দ্বারা প্রতি দিনের একটা বিশেষ অংশ উদ্দেশ্য হতে পারে, যেখানে দিন সমান দুভাগে ভাগ হয়।

৪. অর্থাৎ উক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ করে চললে আপনি সর্বদা দুনিয়া ও আখেরাতে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমি বিভিন্ন শ্রেণীর কাফেরকে- যথা ইহুদী, নাসারা, মুশরিক, অগ্নিপূজক প্রভৃতিকে ভোগ-বিলাসের যেসব উপায়-উপকরণ দিয়েছি, সেগুলির দিকে আপনি কখনো চোখ তুলেও দেখবেন না (যেমনটি এখন পর্যন্ত দেখেননি।) এ কয়েক দিনের চাকচিক্যমাত্র, যা দিয়ে আমি ওদের এই পরীক্ষা করে থাকি যে, কে শোকর করে এবং কে অবাধ্য হয়।

আর আল্লাহ তাআলা (হে পয়গম্বর!) আপনার জন্য যে বিরাট মর্যাদাকর দৌলতসমূহ নির্ধারিত করেছেন– যথা, কুরআন কারীম, রিসালাতের মর্যাদা, বিরাট বিরাট বিজয়, সুনাম-সুখ্যাতি ও পরকালের সর্বোচ্চ মর্তবা, এসবের সামনে ঐ সব ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ উপায়-উপকরণের কোনই মূল্য নেই। আপনার ভাগ্যে যে দৌলত এসেছে, তা এদের ধন-দৌলত

১৩২. আর আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন[১]। আমি আপনার নিকট রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তো পরহেযগারীর*[২]।	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝
১৩৩. ওরা বলে, 'সে আমাদের কাছে তার রবের নিকট থেকে কোন নিদর্শন আনে না কেন[৩]?'	وَقَالُوْا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

থেকে কতই না উত্তম এবং তা চিরস্থায়ী। যা হোক, আপনি ওদের অবিশ্বাস ও উপেক্ষার কারণে অস্থিরও হবেন না এবং ওদের পার্থিব উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

১. অর্থাৎ নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও আপন অনুসারীদের নামাযের তাগিদ করতে থাকুন। এ জন্যই হাদীছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শিশু যখন সাত বছরের হয়ে যায়, তখন (অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য) নামায পড়াও এবং যখন দশ বছরের হয়, তখন মেরে হলেও নামায পড়াও।" (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪০৯)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'পরহেযগারী (অবলম্বনকারীদের) জন্য'।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় মনিবরা তো দাসদের দিয়ে জীবিকা উপার্জন করায়। কিন্তু সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলা আপন বান্দা থেকে শুধু দাসত্ব চান এবং দাসদের তিনি নিজেই জীবিকা দান করেন (মূযেহুল কুরআনে এমনই আছে)।

মোটকথা, আমাদের নামায দিয়ে তাঁর কোন উপকার হয় না, বরং আমাদের লাভ হয়। কারণ, নামাযের বরকতে সহজে জীবিকা লাভ হয়– وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্য (সংকট) থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাও করবে না –সূরা তালাক, আয়াত ২-৩); এ কারণেই ফরয নামায ও জীবিকা অর্জনে সংঘর্ষ দেখা দিলে আল্লাহ তাআলা জীবিকা অর্জনের জন্য নামায তরক করার অনুমতি দেন না। নামায সর্বাবস্থায় আদায় করতেই হবে। যে আল্লাহর নামায পড়া হয়, সেই আল্লাহই জীবিকা দেন।

সংক্ষিপ্ত কথা, আল্লাহ তাআলা জীবিকা অর্জনের এমন উপায়-উপকরণ গ্রহণের অনুমতি দেননি, যেগুলো ফরয ইবাদত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরহেজগারী অবলম্বন করা– পরিণামে সে দেখতে পাবে, আল্লাহ কীভাবে তার সাহায্য করেন।

৩. অর্থাৎ তিনি এমন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখান না কেন, যার পর আমাদের পক্ষে অস্বীকার করার কোন অবকাশ থাকবে না? রোজ রোজ সতর্কতা ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা কী লাভ? এরূপ বড় নিদর্শন দেখালেই তো হয়।

ওদের নিকট কি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা রয়েছে তার প্রমাণ পৌঁছেনি*[১]?

اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৪. আর যদি আমি তার পূর্বে (অর্থাৎ কুরআন নাযিল করার পূর্বে) কোন আযাব দ্বারা ওদের ধ্বংস করে দিতাম, তবে অবশ্যই ওরা বলত, 'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালে না কেন? তা হলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম।'

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾

১৩৫. আপনি বলুন, 'সকলেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কারা সরল পথের অনুসারী এবং কে সৎপথ পেয়েছে[২]।'

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের নিকট কি পূর্ববর্তী সহীফাগুলির বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা (অর্থাৎ কুরআন কারীম) পৌঁছেনি'?

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সর্বশেষ রাসূলের সংবাদ রয়েছে।

অথবা অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শনই যথেষ্ট। বর্তমান পয়গম্বর মূলত তাঁদের কথারই জোর তাকীদ করে থাকেন, কোন নতুন কথা বলেন না। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ কিতাব যে পূর্ববর্তী কিতাবগুলির অনুকূল ঘটনাবলি বয়ান করে থাকে, এটাই তো নিদর্শন।'

তবে আমার মতে আয়াতের উত্তম তাফসীর তা-ই, যা প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাছীর প্রমুখ অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ এই লোকগুলো তো বলে থাকে যে, তিনি কোন নিদর্শন আনেন না কেন? জিজ্ঞাসা করি, অপরাপর হাজারো নিদর্শন বাদেও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহামর্যাদাশালী এই কুরআন কি ওদের নিকট আসেনি? এই কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলির মৌলিক বিষয়াদির সংরক্ষণকারী এবং সেগুলির সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ ও সাক্ষীস্বরূপ এবং এর অলৌকিকতা সূর্যের চেয়েও সমুজ্জ্বল।

২. অর্থাৎ কুরআনের মত মহান নিদর্শন দেখার পরও ওরা বলে, তিনি কোনো নিদর্শন কেন আনলেন না? এখন ধর, আমি যদি এই নিদর্শন না দেখাতাম অর্থাৎ কুরআন নাযিল না করতাম, বরং কিতাব-অবতরণ ও রাসূল-প্রেরণের পূর্বেই কুফর ও শিরকের কারণে ওদের ধ্বংস করে দিতাম, তবে ওরা অভিযোগের সুরে বলত, প্রভু হে! শাস্তি প্রদানের

আগে আমাদের নিকট কোন কিতাব ও সতর্ককারী পাঠানো উচিত ছিল, যাতে লাঞ্ছনা পোহানোর আগে সতর্ক হওয়ার সুযোগ লাভ হয়। সেক্ষেত্রে দেখতেন, আমরা কীরূপ আপনার কথামত চলি।

কুরআন (ও রাসূল) না আসলে ওরা এরূপ বলত। কিন্তু এখন কুরআন ছেড়ে অন্যান্য মনগড়া নিদর্শনের দাবি শুরু করেছে। ওদের উদ্দেশ্য হেদায়েত হাসিল করা নয়, বরং অযথা বাহানা বের করা। অতএব আপনি ওদের বলে দিন, তোমরা আমরা উভয়েই অপেক্ষা করছি– দেখি, অদৃশ্য জগত থেকে অদূর ভবিষ্যতে কার ভাগ্যে কী প্রকাশ পায়? তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন্ দলের পথ সঠিক-সরল এবং কে বা কারা সেই পথে সঠিকভাবে চলেছে।

সূরা আম্বিয়া

سُوْرَةُ الْاَنْۢبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২১ । ১১২ আয়াত । ৭ রুকূ । মক্কী

آياتها ۱۱۲، ركوعاتها ۷

পারা - ১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ①

১. মানুষের সন্নিকটে এসে গেছে তাদের হিসাব-কিতাব, অথচ তারা উদাসীনতায় লিপ্ত, বিমুখ[১]।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ②

২. যখনই তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা শোনে খেল-তামাশাচ্ছলে-

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

৩. এ অবস্থায় যে, তাদের অন্তর ক্রীড়া- কৌতুকে মত্ত*[২]। আর জালেমরা চুপিসারে বলাবলি করে- এ ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নয়, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে (তার) যাদু গ্রহণ করবে[৩]?

---

১. অর্থাৎ হিসাব-গ্রহণ ও কর্মফল প্রদানের সময় সন্নিকটে, শিয়রে উপস্থিত। কিন্তু এ (কাফের-মুশরিক) লোকগুলো চরম মূর্খতা ও উদাসীনতায় পড়ে আছে, কিয়ামতের জবাবদিহিতার কোনই প্রস্তুতি নেই। আর যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনিয়ে উদাসীনতার নিদ্রা ভাঙতে তাদের সতর্ক করা হয়, তখন নিতান্ত নির্ভীকতার সাথে তা এড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন ওদের কখনো আল্লাহ তাআলার দরবারে হাযির হতে ও হিসাব দিতে হবে না। সত্য বটে- الناس في غفلاتهم ورحیٰ المنية تطحن ('মানুষ উদাসীনতায় নিমগ্ন, অথচ তাদের মরণ-চাকা তো ঘুরে চলেছে।')

★ **দ্বিতীয় তরজমা**- 'তাদের অন্তর থাকে সম্পূর্ণ গাফেল'।

২. অর্থাৎ কুরআনের অমূল্য উপদেশগুলি একটা খেল-তামাশা হিসাবে শুনে। অথচ যদি আন্তরিকতার সাথে তা শুনত ও চিন্তা-ভাবনা করত, তবে তাদের দীন ও দুনিয়া সবই ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু অন্তরই যখন সেদিক থেকে উদাসীন এবং খেল-তামাশায় মত্ত, তখন চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ কোথায়!

৩. অর্থাৎ নসীহত শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে কতক জালেম গোপন মিটিং করল এবং কুরআন ও পয়গম্বর সম্বন্ধে বলতে লাগল- ইনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ- ফেরেশতাও নন,

৪. রাসূল বললেন, 'আমার রব (সকল) কথা জানেন– আসমানে হোক বা যমীনে। এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা[১]।'

قٰلَ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

৫. আবার কখনো ওরা বলে, '(এসব) অসংলগ্ন স্বপ্ন; না, বরং সে নিজে তা (কুরআন) রচনা করেছে; না, না, বরং সে একজন কবি। তা না হলে সে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তী (রাসূল)-গণ (নিদর্শনসহ) প্রেরিত হয়েছিলেন[২]।'

بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْیَاْتِنَا بِاٰیَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

আমাদের থেকে আলাদা বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী নন। তবে তিনি অবশ্যই যাদু জানেন। তিনি যে বাণী পড়ে শোনাচ্ছেন, তা যাদুবাণী নিশ্চয়ই। এরপরও তোমাদের কী হল যে, দেখে-শুনে তাঁর যাদুমন্ত্রে ফেঁসে যাচ্ছ? তোমাদের উচিত, তাঁর নিকটেও না যাওয়া।

সম্ভবত কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাব-শক্তি দেখে কুরআনকে যাদু বলেছে। আর গোপন বৈঠক সত্যের বিরুদ্ধে অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র আঁটার উদ্দেশ্যে করেছিল। বলা বাহুল্য, হুঁশিয়ার শত্রুরা নিজেদের শত্রুতামূলক কার্যকলাপ যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশ করতে চায় না, বরং গোপনে শলা-পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করতে থাকে। এজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে– তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করে।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তোমরা যতই গোপন পরামর্শ কর না কেন, আল্লাহর সবই জানা আছে। তিনি তো আকাশ ও পৃথিবীর সব বিষয়ই জানেন। অতএব তোমাদের গোপন কার্যক্রম ও অভিসন্ধি তাঁর কাছে কী করে গোপন থাকতে পারে?

২. কুরআন শ্রবণ করে হঠকারিতাবশত ওরা এমন বিব্রত হয়ে পড়ত যে, কোন এক কথার উপর স্থির থাকতে পারত না। কখনো কুরআনকে যাদু বলত, কখনো বা দুঃস্বপ্ন বলত, আর কখনো দাবি করত যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় রচনা করে কুরআন নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। শুধু এ-ই নয়। ওরা বলত, بل هو شاعر –অর্থাৎ তিনি কিছু কিছু বিষয়বস্তু ছন্দময় ও হৃদয়গ্রাহী গদ্যে প্রকাশ করছেন। যদি এমন না হয়, তবে তিনি পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় প্রকাশ্য কোনো মু'জেযা দেখান না কেন?

ওদের এ কথাটিও শত্রুতামূলক ছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিব্রত করা। কারণ, একে তো মক্কার এই জাহেল মুশরিকরা পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের মু'জেযা সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানত? দ্বিতীয়ত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অনেক প্রকাশ্য নিদর্শন ওরা স্বচক্ষে দেখেছিল, যেগুলি পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শনের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। এগুলির মধ্যে কুরআনই ছিল সবচেয়ে বড় মু'জিযা। ওরা অবশ্যই বুঝত, এটা যাদুর অর্থহীন বাক্যাবলি নয়, অমূলক স্বপ্নও নয়, কবিত্বও নয়। এ কারণেই প্রথমে একটি কথা বলত,

৬. ওদের পূর্বে এমন কোন জনপদ যা আমি ধ্বংস করে দিয়েছি- ঈমান আনেনি। তবে কি ওরা ঈমান আনবে[১]?	مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑥
৭. আমি আপনার পূর্বে মানুষদেরই রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যাদের নিকট আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব যারা প্রজ্ঞাবান তাদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জান[২]।	وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑦
৮. আর আমি তাঁদের এমন দেহবিশিষ্ট বানাইনি যে, তাঁরা আহার করতেন না। এবং তাঁরা চিরস্থায়ীও ছিলেন না[৩]।	وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ⑧

পরক্ষণেই যখন বুঝত যে, তা যথার্থ নয়, তখন তা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করত- اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (দেখুন, ওরা আপনার সম্বন্ধে কেমন সব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করছে। বস্তুত ওরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং এখন আর পথে আসতে পারবে না। -সূরা ফুরকান, আয়াত ৯)

১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ফরমায়েশী মু'জেযা দেখানো হয়েছিল, তবে ওরা তা দেখেও ঈমান আনেনি। অবশেষে আল্লাহর নীতি অনুযায়ী ওরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন যদি মক্কার মুশরিকদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয়, আর জানা কথা, এরাও ঈমান আনবে না- ফলে আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মানুসারে এরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর হেকমতের দাবি এই যে, এরা কিছুকাল বেঁচে থাকুক। এ জন্যই ফরমায়েশী মু'জেযা দেখানো হচ্ছে না।

২. বর্তমান আয়াতে هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -কাফেরদের এহেন উক্তির উত্তর রয়েছে। অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমরা পূর্ববর্তী যে নবীদের নিদর্শনের মত নিদর্শন দাবি করছ, তাঁরাও তো তাঁর মত মানুষই ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না। বাকি নিজেদের মূর্খতার কারণে যদি এমন সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ কথাও তোমাদের জানা না থাকে, তবে এ বিষয়ে যারা জ্ঞাত, তাদের জিজ্ঞাসা কর। যেমন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কধারী আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছেই এ কথাটি জেনে নাও যে, অতীতে যেসব নবী-রাসূল তশরীফ এনেছিলেন তাঁরা কী মানুষ ছিলেন, না আসমানের ফেরেশতা ছিলেন?

৩. অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহই ছিল- ফেরেশতাদের ন্যায় তাঁদের দেহ এমন ছিল না যে, তাঁরা কখনো খাদ্য গ্রহণ করেননি। আর তাঁরা খোদাও ছিলেন না যে, মৃত্যু ও ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়ে চিরজীবী হবেন।

৯. অতঃপর আমি তাঁদের সঙ্গে (আমার) ওয়াদা সত্যে পরিণত করলাম। অতএব তাঁদের ও যাকে ইচ্ছা রক্ষা করলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করে দিলাম[১]।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ۝

১০. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আছে তোমাদের জন্য আলোচনা☆। তোমরা কি বোঝ না[২]?

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

১. অর্থাৎ আর সব মানুষ থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়েত ও এসলাহর জন্য তাঁদের দাঁড় করানো হয়েছিল। আল্লাহ তাঁদের প্রতি ওহী প্রেরণ করতেন এবং সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তাঁদের সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি দান করতেন। সে অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন– সঙ্গী-সাথীসহ তাঁদের নিরাপদ রেখেছেন, আর তাঁদের সঙ্গে লড়াইকারী বড় বড় অহংকারী শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষ বটে, কিন্তু সেই শ্রেণীর মানুষ, সমগ্র দুনিয়ার মোকাবেলায় যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের উচিত, নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখা এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই আযাব শুরু হয়ে যেতে পারে– একথা মনে রাখা দরকার।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমাদের জন্য উপদেশ'। বা : 'তোমাদের সুনাম-সুখ্যাতি'।

২. অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের সব রকমের নসীহত ও হেদায়েত দান করা হয়েছে এবং ভালমন্দ সকল পরিণাম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমাদের যদি কিছুমাত্র আকল-বুদ্ধি থাকে, তবে আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর এবং এ কুরআনের মূল্য উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, যা প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার এক মহাসনদ। কেননা, এ মহাগ্রন্থ তোমাদের ভাষায় এবং তোমাদের জাতির একজন কামেল মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর এভাবে তা দুনিয়াতে তোমাদের চিরকালীন সুনাম-সুখ্যাতি দান করেছে। এখন যদি নিজেদের এমন উপকারী বন্ধুকে না মান, তবে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হবে এবং আখেরাতের শাস্তি তো আছেই।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সম্মুখে সেসব জাতির পার্থিব পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা নবীদের সঙ্গে শত্রুতা করে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।

[রুকূ - ২]

১১. আমি এমন কত জনপদ গুঁড়িয়ে দিয়েছি, যা (অর্থাৎ যার অধিবাসীরা) ছিল অপরাধী এবং সেগুলির পর অন্য লোকদের সৃষ্টি করেছি[১]।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝١١

১২. ওরা যখন আমার আযাবের পদধ্বনি অনুভব করল, অমনি সেখান থেকে পালাতে লাগল।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ۝١٢

১৩. (তখন বলা হল,) পালিয়ো না, বরং তোমরা যে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলে তাতে এবং নিজেদের ঘর-বাড়ীতে ফিরে যাও, সম্ভবত তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে[২]।

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ۝١٣

১৪. ওরা বলতে লাগল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম'।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝١٤

১৫. অতঃপর অনবরত চলতে থাকল ওদের এই আর্তনাদ, যাবৎ না আমি ওদের কর্তিত শস্য (সদৃশ) ও নির্বাপিত করে দিলাম[৩]।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۝١٥

---

১. অর্থাৎ ওদের সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে আল্লাহর যমীন মানবহীন হয়ে গেছে– তা নয়, বরং ওরা ধ্বংস হল আর ওদের জায়গায় অন্যদের আবাদ করা হল।

২. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আযাব এসে পড়ল, তখন ওরা সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু প্রকৃতির ভাষায় ওদের বলা হল, কোথায় পলায়ন করছ? থাম, এবং সেদিকেই প্রত্যাবর্তন কর যেখানে ভোগবিলাস করছিলে এবং যেখানে আনন্দ-ফুর্তির প্রচুর উপায়-উপকরণ জমা করে রেখেছিলে। সম্ভবত সেখানে কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে– জনাব! সেই ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের কী হল? সেই উপায়-উপকরণ কোথায় গেল? এবং যেসব নে'য়ামত আল্লাহ তাআলা আপনাদের দান করেছিলেন, তার শোকর কতদূর আদায় করেছেন?

অথবা 'জিজ্ঞাসা করা হবে' –এর অর্থ এই যে, আপনারা তো বড় লোক ছিলেন, সবাই আপনাদের সাথে পরামর্শ করত। এখন আপন বাড়ীতে চলুন, পালানোর প্রয়োজন নেই– যাতে লোকেরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এবং আপনাদের মতামত জানতে পারে। (এসব কথা বিদ্রূপ ও কটাক্ষস্বরূপ বলা হয়েছে।)

৩. অর্থাৎ যখন আযাব দেখতে পেল, তখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল এবং অনবরত এই বলে আর্তনাদ করতে থাকল যে, আমরা নিশ্চয় জালেম ও অপরাধী। কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া

১৬. আমি আসমান, যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি[১]।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. আমি যদি খেল-তামাশার আয়োজন করতে চাইতাম, তবে আমার নিজের পক্ষ থেকেই তা করতাম– যদি আমাকে (তা) করতেই হত।

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮. (বস্তুত, খেল-তামাশা উদ্দেশ্য নয়), বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি; ফলে তা মিথ্যার মাথা চূর্ণ করে ফেলে, আর তৎক্ষণাত তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তোমরা যেসব কথাবার্তা বল তার কারণে[২]।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۗ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করে কী লাভ! তা তো তওবা কবূল হওয়ার সময় ছিল না, স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনা সবই তখন অনর্থক ছিল। অবশেষে ওদের এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হল, যেমন ক্ষেতের ফসল একেবারে কেটে স্তূপাকারে রাখা হয়, অথবা কাঠ আগুনে পুড়ে ছাই-ভস্মে পরিণত হয়।

১. অর্থাৎ কোন উল্লেখযোগ্য, বড় হেকমত ও সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি। তাই বুদ্ধিমানদের উচিত বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করা এবং দুনিয়াকে শুধু খেল-তামাশা মনে করে পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন না থাকা। বরং ভালভাবে বুঝতে হবে যে, পরকালের জন্যই দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে সকল পাপ ও পুণ্যের পূর্ণ হিসাব হবে এবং প্রতিফল ও প্রতিদান ভোগ করতে হবে।

২. অর্থাৎ ধরে নেওয়া হোক, যদি খেল-তামাশা আমার শান ও মর্যাদার উপযোগী হত এবং আমি কোন আমোদ-প্রমোদ ও খেল-তামাশার আয়োজনের ইচ্ছা করতাম, তবে এটা আমি নিজের কুদরতের দ্বারাই করতাম। তাতে কেউ আমাকে ধরপাকড় ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতে পারত না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, দুনিয়া কোন খেল-তামাশা নয়, বরং একটি সংগ্রামের ক্ষেত্র– যেখানে সত্য ও মিথ্যার লড়াই চলে এবং সত্য আক্রমণ করে বাতিলের মাথা পিষ্ট করে ফেলে।

এ থেকেই তোমরা নিজেদের শিরকী ও জাহেলী কথাবার্তার পরিণতি বুঝে নাও। সত্য ও সততার বোমা যখন পূর্ণ শক্তিতে তোমাদের উপর পতিত হবে, তখন কী রকম দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসলীলাই না হবে এবং তখন কোন শক্তিই তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না!

বি. দ্র. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا الخ এর তাফসীর কয়েকভাবে করা হয়েছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্যের দিক থেকে যে অর্থ অধিকতর স্পষ্ট ও নিকটবর্তী ছিল, আমরা তাই অবলম্বন

১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা (সকলে) তাঁরই[১]। আর যারা তাঁর কাছে আছে, তারা অহংবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তও হয় না।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝

২০. তারা রাত-দিন তাসবীহ পাঠ করে, কোন অবহেলা করে না[২]।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝

২১. ওরা কি যমীন থেকে অন্যান্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যারা (ওদের) পুনর্জীবিত করবে[৩]?

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۝

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আরো মা'বূদ থাকত, তবে নিশ্চয় উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত[৪]।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

করেছি এবং مِنْ لَّدُنَّا ও اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ –এসব শব্দের তাৎপর্যের দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে দিয়েছি। والله أعلم

১. অতএব তিনি যদি ধ্বংস করতে চান, তবে কে রক্ষা করতে পারবে এবং কোথায়ই বা আশ্রয় পাওয়া যাবে?

২. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাগণ কিছুমাত্র অহংকার করেন না, বরং নিজ প্রভুর বন্দেগী ও দাসত্বকে গৌরব মনে করেন। এ কারণেই তাঁর গুণকীর্তনে ও মহিমা প্রকাশে তাঁরা কখনো আলস্য ও শৈথিল্য করেন না, দিনরাত তাঁর তাসবীহ পাঠে ও যিকিরে রত থাকেন– ক্লান্তও হন না, বিরক্তও হন না। বরং তাসবীহ ও যিক্‌রই তাঁদের খোরাক। আমরা যেমন অনবরত শ্বাস গ্রহণ করি এবং অন্যান্য কাজও করি, তাঁদের যিকির ও তাসবীহর অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁরা যে কোনো কাজে আদিষ্ট হন অথবা যে কোনো খেদমত করতে থাকুন, এক মুহূর্তের জন্যও তা থেকে গাফেল হন না।

আর যখন নিষ্পাপ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের এই অবস্থা, তখন গোনাহগার মানুষের তো নিজ প্রভুর বন্দেগী আরো বেশী করা উচিত।

৩. অর্থাৎ আকাশের ফেরেশতাগণ তো মহান আল্লাহর স্মরণে ও বন্দেগীতে রত থাকেন। প্রশ্ন হল- পৃথিবীর বুকে কি অন্যান্য সত্তা আছে, আল্লাহর মোকাবেলায় যাদের মা'বূদ সাব্যস্ত করা যায়? এবং আল্লাহ যখন এদের পূজারীদের ধ্বংস করবেন, তখন এরা কি তাদের পুনর্জীবিত বা ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনো না।

৪. এটা একাধিক 'ইলাহ' বা উপাস্য না হতে পারার একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ, যা পবিত্র কুরআন নিজস্ব ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে– ইবাদত হচ্ছে চরম

অতএব আরশের মালিক আল্লাহ সেসব কথা থেকে পবিত্র, যা ওরা বলছে[১]।	فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ۝

আনুগত্য ও পরম বিনয় প্রকাশের নাম, যা একমাত্র সেই সত্তার উদ্দেশ্যে হতে পারে, যিনি সত্তা ও গুণাবলি– উভয় দিক থেকে কামেল ও পরিপূর্ণ। তাঁকেই আমরা 'আল্লাহ' বা খোদা বলে থাকি। খোদার সত্তা অবশ্যই সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী। তিনি কোন দিক দিয়েই অথর্ব বা অসম্পূর্ণ হতে পারেন না, অক্ষম বা পরাস্তও হতে পারেন না। অন্য কারো সামনে তিনি নত হবেন না। তাঁর কাজে কেউ বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করবে– এটাও হতে পারে না।

এখন ধরা যাক– আকাশ ও পৃথিবীতে যদি দুই খোদা (নাউযুবিল্লাহ) থাকে, তবে উভয়কে উক্ত শানের হতে হবে। তখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের সৃষ্টি এবং উর্ধ্বলোক ও অধঃলোকের মহাব্যবস্থাপনা উভয়ের ঐক্যমতে হয়, না মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মতবিরোধও হয়? যদি উভয়ের ঐক্যমতে হয়, তবে দু'টি সম্ভাবনা : এক– একা একজনের দ্বারা কাজ হয় না বলে উভয়ে মিলে কার্য-সমাধা করেছে। এর অর্থ হল, দুজনের একজনও সর্বশক্তিমান নয়। দুই– আর যদি এমন হয় যে, একা একজনই পরিপূর্ণরূপে সমগ্র বিশ্বের পরিচালনা করে (আর অন্য জন কেবল সহমত পোষণ করে), তবে দ্বিতীয়জন বেকার সাব্যস্ত হল। অথচ আগেই বলা হয়েছে, খোদা বেকার হতে পারে না।

আর যদি উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ও বিবাদ হয়, তবেও দুই অবস্থা : হয় তাদের এই বিবাদে একজন পরাজিত হয়ে নিজ ইচ্ছা ও মত বর্জন করতে বাধ্য হবে, তাহলে আর খোদা রইল না। অথবা দুজনই একেবারে সমান শক্তি নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজ ইচ্ছা ও মতকে কার্যকর ও প্রবল করতে চাইবে। এক্ষেত্রে প্রথমত: খোদাদের এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলের ফলে কোনো বস্তু অস্তিত্বই লাভ করতে পারবে না। আর যদি অস্তিত্বপ্রাপ্ত বস্তুরাজির উপর শক্তিপরীক্ষা হতে থাকে, তাহলে সংঘর্ষের কারণে বস্তুজগত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যাবে।

ফলকথা এই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যদি দুই খোদা থাকত, তবে হয় আকাশ ও পৃথিবীর এই মহাব্যবস্থাপনা ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যেত; নতুবা এক খোদার অথর্বতা বা অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা প্রমাণিত হত। আর এ উভয়ই বাতিল ও বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, (সুতরাং দুই খোদার ধারণাও সম্পূর্ণ বাতিল-অসার)।

১. যিনি আরশের একচ্ছত্র মালিক, তাঁর রাজত্বে অংশীদারিত্বের অবকাশ নেই। দুই স্বাধীন বাদশাহ যখন এক সাম্রাজ্যে বাস করতে পারে না– অথচ তাদের স্বাধীনতাও নিতান্তই অসম্পূর্ণ, তখন দুজন স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বশক্তিমান খোদা কী করে একই সাম্রাজ্যের অংশীদার হবেন?

২৩. তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, কিন্তু ওদের প্রশ্ন করা হবে[১]।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. ওরা কি তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে?' আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর[২]। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং আমার পূর্ববর্তীদের কথা'।* কিন্তু ওদের অধিকাংশ সত্য বোঝে না, ফলে ওরা (তা থেকে) বিমুখ[৩]।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তো সেই সত্তার নাম, যিনি সর্বশক্তিমান ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর শক্তি ও ইচ্ছা রোধ করা তো দূরের কথা, তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতাও কারো নেই। তবে হাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও ধরপাকড় করতে পারার ক্ষমতা তাঁর আছে।

২. ইতিপূর্বে একত্ববাদ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক (عقلي) প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখন মুশরিকদের নিকট ওদের দাবির প্রমাণ তলব করা হচ্ছে– অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য তোমরা সাব্যস্ত করেছ, তাদের স্বপক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বা ধর্মীয় প্রমাণ আছে কি? থাকলে পেশ কর। –বলা বাহুল্য, ওদের নিকট ধারণা-কল্পনা ও বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কী থাকতে পারে? শিরকের সমর্থনে এমন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বা ধর্মীয় (نقلي) প্রমাণ নেই, যা ওরা পেশ করতে পারে। মুফাসসিরগণ এমনই বলেছেন।

তবে হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রথমে সেসব মা'বূদের আলোচনা হয়েছে, মুশরিকরা যাদের আল্লাহর সমতুল্য মনে করত এবং সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরূপ দুই মা'বুদ থাকলে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। বর্তমান আয়াতে তাদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের ওরা আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি ও অধীনস্ত শাসক হিসাবে ছোট ছোট খোদা সাব্যস্ত করত। বলা হচ্ছে: যদি তাই হয়, তবে মালিকের পক্ষ থেকে তাদের সনদ প্রয়োজন, সনদ ছাড়া নায়েব কী করে হবে? তো, যদি সনদ থাকে, তবে তা পেশ কর।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এটাই (খোদায়ী) উপদেশ– আমার সঙ্গীদের জন্য এবং পূর্ববর্তীদের জন্য'। বা : এই যে আছে আমার সঙ্গীদের 'যিক্র' (অর্থাৎ কুরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদের 'যিক্র' (তথা আসমানী কিতাবসমূহ। সবগুলোতে তাওহীদের কথাই আছে)।

৩. অর্থাৎ আমার উম্মত ও আল্লাহতে বিশ্বাসী পূর্ববর্তী উম্মতদের একই কথা যে, আরশের মালিক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন খোদা নেই। এই কথার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আসমানী ধর্মের অনুসারী সকল উম্মতের এই সর্বসম্মত আকীদার খেলাফ কোন দলীল-প্রমাণ যদি তোমাদের কাছে থাকে, তবে তা পেশ কর। আমার দাবি এই যে, এ উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মতগুলি, এবং এ উম্মতের কিতাব (পবিত্র কুরআন) ও পূর্ববর্তী উম্মতদের আসমানী কিতাব (তাওরাত, ইন্জীল, প্রভৃতি)– সবই একত্ববাদের দাবিতে

২৫. আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর[১]।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

২৬. ওরা বলে, 'রহমান' (দয়াময় আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন'। (এ থেকে) তিনি পবিত্র[২]; বরং (ফেরেশতারা তাঁর) সম্মানিত বান্দা।

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তাঁর থেকে আগে বেড়ে তারা কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁরই আদেশ অনুসারে কাজ করে[৩]।

لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

একমত। তাই অসংখ্য বিকৃতি সত্ত্বেও পূর্ববর্তী কিতাবগুলির পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখলে তাতে আজও তাওহীদের ঘোষণা ও শিরকের পরিষ্কার খণ্ডন পাওয়া যাবে।

بَلْ أَكْثَرُهُمْ ... কিন্তু জাহেলরা এ কথা কী বুঝবে? যদি বুঝ থাকত, তবে সত্য কথা শুনে তা এড়িয়ে যেত না।

১. অর্থাৎ তাওহীদই ছিল সকল নবী ও রাসূলের সর্বসম্মত আকীদা-বিশ্বাস। কোন পয়গম্বর কখনো এর খেলাফ একটি অক্ষরও বলেননি। তাঁরা সর্বদা এ শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। অতএব বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাধারণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা যেমন তাওহীদ প্রমাণিত এবং শিরক বাতিল হয়, তেমনি নবী-রাসূলদের উক্ত ঐক্যমত তাওহীদের দাবির সত্যতার বিষয়ে আরেকটি অকাট্য দলীল।

২. আরবের কতক গোত্র ফেরেশতাদের খোদা-কন্যা বলে অভিহিত করত। তাই বলা হয়েছে– এ আল্লাহর শান নয় যে, তিনি পুত্র-কন্যা গ্রহণ করবেন। অনন্য সত্তার সঙ্গে এ ধারণা মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং ইহুদীদের এক ফের্কা হযরত উযাইর (আ)-কে তাঁর পুত্র বলত। বর্তমান আয়াত দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের আকীদারও খণ্ডন হয়ে গেল।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতারা তাঁর সন্তানসন্ততি নন। হাঁ, তাঁরা তাঁর সম্মানিত বান্দা। আর অত্যন্ত সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভক্তি ও আনুগত্যের অবস্থা এই যে, আল্লাহর মর্যি ও অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁর সামনে আগে বেড়ে টু শব্দটিও করেন না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোন কাজও করেন না। এক কথায়, পরিপূর্ণ দাসত্ব ও বন্দেগীই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

২৮. তিনি জানেন, যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পিছনে আছে[১] এবং তারা (কারো জন্য) সুপারিশ করে না, তবে কেবল তার জন্য যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট[২], আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে[৩]।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ۝

২৯. আর তাদের মধ্যে যে কেউ বলবে, 'আল্লাহ ছাড়া আমিও মা'বূদ', আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব; এরূপ শাস্তিই আমি জালেমদের দিয়ে থাকি[৪]।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ۝

[রুকূ - ৩]

৩০. কাফেররা কি জানে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়ের মুখ খুলে দিয়েছি*[৫]? আর আমি

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۭ

---

১. আল্লাহ তাআলার জ্ঞান তাঁদের জাহেরী ও বাতেনী সকল হাল-অবস্থাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁদের কোন গতিবিধি এবং কোন কথা-কাজ তাঁর থেকে গোপন নয়। এজন্যই ফেরেশতাগণ সর্বদা নিজেদের অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন, যাতে কোন কাজ তাঁর মর্যির খেলাফ না হয়।

২. অর্থাৎ তাঁর মর্যি না জেনে তাঁরা কারো জন্য সুপারিশও করেন না। তবে যেহেতু তাওহীদবাদী মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট, সেহেতু তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁদের ওযীফা।

৩. এরূপ অবস্থায় তাঁদের কী করে খোদা বলা যায়? আর যেহেতু তাঁরা খোদা নন, তাই তাঁরা খোদার পুত্র বা কন্যাও হতে পারেন না। কারণ, প্রকৃত সন্তান পিতামাতার সমশ্রেণীর হয়ে থাকে।

৪. অর্থাৎ তোমরা যাদের খোদার সন্তান বা খোদা বানাচ্ছ, ধরা যাক– তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের ব্যাপারে (আল্লাহর পানাহ!) এহেন কথা বলে, তবে সীমালঙ্ঘনকারী জালেমদের জন্য দোযখের যে শাস্তি অবধারিত, তা আমি (আল্লাহ) তাকেও দেব। আমার শাস্তি থেকে সেও রক্ষা পাবে না। এর পরও কী করে তারা খোদা হতে পারে?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল, অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিয়েছি।

৫. رتق এর আসল অর্থ হল- দুই বস্তুর একটি অপরটির সাথে মিলিত হওয়া ও একে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করা। একেবারে শুরুতে আকাশ ও পৃথিবী অভিন্নরূপে অনস্তিত্বের অন্ধকারে

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ۝

পানি থেকে সৃষ্টি করেছি প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু[১]। এর পরও কি ওরা ঈমান আনবে না[২]?

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ۝

৩১. এবং যমীনে সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, যেন তা তাদের নিয়ে হেলে না পড়ে*[৩]। এবং তাতে সৃষ্টি করেছি প্রশস্ত পথসমূহ, যাতে তারা (গন্তব্যস্থানে) পৌছতে পারে[৪]।

পতিত ছিল। অতঃপর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপগুলিতেও উভয়ে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। পরে আল্লাহর কুদরত উভয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই বিচ্ছিন্ন করণের পর প্রত্যেকটির স্তরসমূহ আলাদা আলাদা অস্তিত্ব লাভ করে।

এই পর্যায়েও উভয়ের মুখ বন্ধ ছিল অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি হত না, যমীনে তরু-লতা উৎপাদিত হত না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মানব গোষ্ঠীর উপকারার্থে উভয়ের মুখ খুলে দিলেন– উপর থেকে পানির মুখ খুলল, নীচ থেকে যমীনের ছিদ্রগুলি উন্মুক্ত হল। এ পৃথিবীর বুক থেকে আল্লাহ তাআলা নদ-নদী ও নানা রকমের উদ্ভিদ উদ্‌গত করলেন। আর আকাশকে অসংখ্য তারকায় সুশোভিত করলেন এবং এদের প্রত্যেকের কক্ষপথ ও বিচরণক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন করে দিলেন।

১. অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রাণীজগতকে যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়– প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পানিই তাদের উৎস। তবে কোন সৃষ্টি সম্পর্কে যদি প্রমাণিত হয় যে, তার সৃষ্টিতে পানির ভূমিকা নেই, তবে তাকে এর ব্যতিক্রম মনে করতে হবে। তথাপি আয়াতের বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি উঠবে না। কারণ, অধিকাংশের ক্ষেত্রে কোন বিষয় প্রমাণিত হলে তা সকলের উপর প্রয়োগ করে দেওয়া হয়, ব্যতিক্রমের উল্লেখকে সর্বক্ষেত্রে জরুরী মনে করা হয় না (এখানে তেমনই করা হয়েছে)।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরতের এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন ও তাঁর পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা দেখেও কি আল্লাহর অস্তিত্বে ও তাঁর একত্ববাদে মানুষের বিশ্বাস হয় না?

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আন্দোলিত না হয়'।

৩. এর ব্যাখ্যা সূরা নাহলে গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য (আয়াত নং ১৫)।

৪. অর্থাৎ যাতে এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকার মানুষের কাছে যেতে পারে। যদি পাহাড়-পর্বতের কারণে পথঘাট বন্ধ হয়ে যেত, তবে এমন সম্ভব হত না। (মূযেহুল কুরআন)

তাছাড়া এসব প্রশস্ত পথঘাট দেখে মানুষ আল্লাহ তাআলার কুদরত, হেকমত ও তাওহীদের ব্যাপারেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

৩২. এবং আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ[১]। অথচ ওরা আসমানের নিদর্শনাদি থেকে বিমুখ[২]।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র[৩]; সকলেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে[৪]।

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ীত্ব দান করিনি; সুতরাং আপনি মৃত্যু বরণ করলে ওরা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে[৫]।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

১. অর্থাৎ তা পড়ে যায় না, ফেটে যায় না, পরিবর্তিতও হয় না এবং তা শয়তানদের চুরি করে (উর্ধ্বজগতের কথা) শোনা থেকেও সংরক্ষিত। আর দেখতে ছাদের মত মনে হয় বলে আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ ওরা লক্ষ করে দেখে না যে, কেমন পরিপক্ক ও দৃঢ় এবং প্রশস্ত ও সুউচ্চ ছাদ যুগ যুগ ধরে থাম ও খুঁটি ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে– তাতে সামান্য সৌন্দর্যহানিও হয় না, তার আস্তরও ঝরে পড়ে না।

৩. এ আয়াতে কিছু আসমানী নিদর্শনাদির উল্লেখ করা হল।

৪. অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য, বরং প্রতিটি তারকা-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমন করছে। یسبحون শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, তারকা-নক্ষত্র আল্লাহর নির্দেশে নিজেরাই চলে। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

৫. অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজীব যেমন আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তেমনি সকল মানুষের জীবনও তাঁরই দান, তিনি যখন ইচ্ছা নিয়ে নেবেন। আর মৃত্যু প্রত্যেকের সামনে এ কথা প্রমাণ করে দেবে যে, তোমার অস্তিত্ব তোমার আয়ত্তে নয়, বরং তা ছিল দুই দিনের লীলাখেলা, মৃত্যুতেই যার অবসান।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে বলত, ইসলামের এই জয়জয়কার এই লোকটির জীবন পর্যন্তই– দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

আর আমি মন্দ অবস্থা ও ভাল অবস্থা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করি[১] এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[২]।

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ أَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৬. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে নিয়ে আর কিছু নয় শুধুই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (ওরা বলে,) 'এ-ই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?' অথচ ওরা তো 'রহমান' (নামটি পর্যন্ত) উল্লেখ করার বিরোধী[৩]।'

এর উত্তর

এ দ্বারা যদি ওদের উদ্দেশ্য হয় যে, মৃত্যু নবুওয়াতের পরিপন্থী, তবে উত্তর হচ্ছে- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ অর্থাৎ নবী-রাসূলদের মধ্যে কে এমন ছিলেন, যাঁকে কখনো মৃত্যু বরণ করতে হয়নি এবং যিনি সর্বদা জীবিত আছেন?

আর যদি ওদের উদ্দেশ্য হয় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কল্পনা করে নিজেদের অন্তরজ্বালা ঠাণ্ডা করা– তবে এর উত্তর হচ্ছে- أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ অর্থাৎ আনন্দটা কীসের? তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তোমরা কি কখনো মরবে না, চীরজীবি হবে? তোমাদেরও যখন আগে বা পরে মরতে হবে, তখন পয়গম্বরের মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ কোথায়? এ পথ সকলকেই অতিক্রম করতে হবে– এমন কে আছে, যাকে কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে না?

পূর্বা-পর সম্পর্ক

তাওহীদ ও আল্লাহর কুদরতের দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করার পর বর্তমান আয়াতদ্বয়ে নবুওয়াত প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট ও আরাম-আয়েশ, রোগ ও সুস্থতা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা ইত্যাদি ভাল-মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের পরীক্ষা করা হয়, যাতে খাঁটি ও মেকী, আসল ও নকল পৃথক হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কারা দুঃখে-কষ্টে ধৈর্য ধরে ও সুখ-সম্পদে শোকর করে, আর কারা (প্রথম অবস্থায়) নৈরাশ্য বা অভিযোগ ও (দ্বিতীয় অবস্থায়) অকৃতজ্ঞতার রোগে আক্রান্ত হয়।

২. যেখানে তোমাদেরকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এবং প্রতিটি ভাল ও মন্দ আমলের প্রতিফল দেওয়া হবে।

৩. অর্থাৎ নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে এরা পয়গম্বর আলাইহিস সালামের প্রতি হাসিঠাট্টা করে এবং বিদ্রূপের সাথে বলে- أَهٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ এ লোকটিই কি তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?

৩৭. মানুষকে (যেন) সৃষ্টিই করা হয়েছে 'ত্বরাপ্রবণতা' থেকে। শীঘ্রই আমি তোমাদের আমার নিদর্শনাদি দেখাব। সুতরাং আমার নিকট (এর জন্য) তাড়াহুড়া করো না[১]।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

৩৮. আর ওরা বলে, 'এ ওয়াদা কখন (পূর্ণ) হবে? (বল) যদি তোমরা সত্যবাদী হও'[২]।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৯. কাফেররা যদি তখনকার অবস্থা জানত, যখন ওরা নিজেদের চেহারা ও পিঠ থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং ওদের সাহায্যও করা হবে না- (তবে কিছুতেই এরূপ বলত না)।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪০. বস্তুত তা ওদের উপর আপতিত হবে আকস্মিকভাবে, ফলে ওদের দিশাহারা করে ফেলবে। আর ওরা তা রোধ করতে পারবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না[৩]।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

অথচ ওরা কত নির্লজ্জ যে, নিজেরা প্রকৃত মা'বূদের উল্লেখ করতে ও 'রহমান' নাম পর্যন্ত নিতে বিরক্ত হয়। আল্লাহর সত্য কিতাবকে অস্বীকার করে, কিন্তু মিথ্যা উপাস্যদের সমালোচনা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। অতএব হাসিঠাট্টার পাত্র কি ওরা, না ওদের প্রতিপক্ষ?

১. কাফেরদের হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা শুনে কেউ কেউ হয়ত কামনা করে থাকবে যে, এদের উপর এখনি আযাব এসে গেলে ভাল হত। আর স্বয়ং কাফেররাও ঠাট্টাচ্ছলে বলত, সত্যিই যদি আমরা শাস্তিযোগ্য হই, তবে এখনি শাস্তি নিয়ে আস না কেন? –উত্তরে উভয় দলকে বলা হচ্ছে যে, মানুষ বড়ই ত্বরাপ্রবণ। তার স্বভাবেই যেন তাড়াহুড়া রয়েছে। কিছুটা সবর কর– শীঘ্রই আমি আমার ক্রোধ ও শাস্তির নিদর্শন তোমাদের দেখাব।

২. অর্থাৎ কাফেররা বলে– তোমরা তো বলছ, কিয়ামত আসবে এবং সকল কাফের চিরকাল দোযখে জ্বলবে। তো, এ ওয়াদা কবে পুরা হবে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে কিয়ামত ও জাহান্নাম এখনি ডেকে আন না কেন?

৩. অর্থাৎ ওদের নিকট যদি প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় এবং কিয়ামতে যে ভয়াবহ অবস্থা হবে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে, তবে কখনো এরূপ দরখাস্ত করবে না। এখন তো উক্ত কথাগুলো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বলছে। কিন্তু যখন সেই সময়টি উপস্থিত হবে, যখন সম্মুখ-পশ্চাৎ সকল দিক থেকে ওরা অগ্নি-পরিবেষ্টিত হবে, তখন কোন দিক থেকে তা রোধও করতে পারবে না, কোথাও থেকে সাহায্যও আসবে না, অবকাশও পাবে না। আগে থেকে তার ধারণাও করতে পারবে না,

৪১. নিশ্চয় আপনার পূর্বেও রাসূলদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে; অতঃপর তাঁদের বিদ্রূপকারীদের উপর তাই নিপতিত হয়েছে, যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত[১]।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۠

[রুকূ - ৪]

৪২. আপনি বলুন, 'কে তোমাদের রাতে ও দিনে রহমান (এর আযাব) থেকে রক্ষা করে[২]?' ওরা তো ওদের রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে[৩]।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ۝

৪৩. ওদের কি আমি ছাড়া আরো উপাস্য আছে, যারা ওদের রক্ষা করে? তারা (উপাস্যরা) তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং তারা আমার পক্ষ থেকেও সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারবে না☆[৪]।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ۝

সহসা তা সামনে এসে যাবে, ফলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। তখন বুঝতে পারবে, যে বিষয়ের সত্যতা নিয়ে ওরা হাসিঠাট্টা করত, তা কত বাস্তব বিষয় ছিল।

১. অর্থাৎ যে আযাব নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই এসে ওদের ঘিরে ধরল এবং ওদের হাসিঠাট্টার পরিণতি ওদের উপরই উলটে পড়ল।

২. অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহর আক্রোশ ও আযাব থেকে তোমাদের রক্ষাকারী কে? একমাত্র তাঁর সর্বব্যাপী রহমতই তাৎক্ষণিক আযাব থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু এরূপ সহনশীল ও ধৈর্যশীল আল্লাহর আক্রোশকে খুব বেশি ভয়ও করা উচিত। (نعوذ بالله من غضب الحليم)

৩. অর্থাৎ রহমানই যে ওদের হেফাজত করছেন, এর অনুভূতি ও স্বীকৃতি ওদের নেই। ভোগবিলাস, ধন-সম্পদ ও নিরাপদ জীবন ওদেরকে প্রকৃত প্রতিপালকের স্মরণ থেকে উদাসীন করে রেখেছে। এজন্যই যখন তাঁর পক্ষ থেকে কোন নসীহত করা হয়, তখন ওরা এই বলে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, এ আবার কোথাকার কথাবার্তা শুরু করা হল?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর না অন্য কেউ কাফেরদের আমা হতে বাঁচাতে পারবে'।

৪. অর্থাৎ স্বীয় মনগড়া উপাস্যদের সম্বন্ধে কি ওদের এ ধারণা যে, তারা ওদের হেফাজত করে এবং দুঃসময়ে আল্লাহ তাআলার গযব থেকেও রক্ষা করবে? জেনে রাখা উচিত– এই বেচারা-অসহায়দের পক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য ও হেফাজত করা তো দূরের কথা, স্বয়ং তারা নিজেদের হেফাজতও করতে পারে না। কেউ তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চাইলে অথবা তাদের নিকট থেকে কোন বস্তু ছিনিয়ে নিলে তাদের এতটুকু শক্তি নেই যে, আত্মরক্ষার জন্য

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. আসল কথা হল, আমি ওদের ও ওদের বাপদাদাদের সুখ-সম্ভোগ দিয়েছি, এমন কি ওদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়ে গেল[১]। তো, ওরা কি দেখছে না, আমি যমীনকে (ওদের জন্য) তার চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? তবুও কি ওরাই বিজয়ী হবে[২]?

قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আপনি বলুন, 'আমি তো ওহীর দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি; কিন্তু বধীরগুলো ডাক শোনে না যখন ওদের সতর্ক করা হয়[৩]।

নিজেরা হাত-পা হেলাবে, অথবা নিজেদের হেফাজতের খাতিরে আমার সাহায্য ও সহযোগিতা হাসিল করবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজত-ক্ষমতা এবং দেবদেবীর অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব যে ওরা বোঝে না তা নয়। কিন্তু ব্যাপার এই যে, ওরা বংশানুক্রমে উদাসীনতার জীবন কাটিয়ে এসেছে, আল্লাহর আযাবের কোন আঘাত ওদের লাগেনি। এতে ওরা অহংকারী হয়ে উঠেছে এবং আল্লাহর পয়গাম ও পয়গম্বরদের নসীহত কবুল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

২. অর্থাৎ আরব ভূমিতে ইসলাম প্রসার লাভ করছে এবং কুফর সংকুচিত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এখানকার মাটি কাফেরদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সরদারী-মাতব্বরি বিলুপ্ত হচ্ছে। পরাজয়ের এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও লক্ষণ দেখেও কি ওরা নিজেদের পরিণাম উপলব্ধি করতে পারছে না এবং এত সব দেখেও পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও মুসলমানদের উপর বিজয় লাভের আশা করছে?

পরিণামদর্শিতা থেকে থাকলে ওদের উচিত, ভবিষ্যত ও পরিণাম নিয়ে ভাবা। ওদের কি জানা নেই যে, নবীদের সঙ্গে শত্রুতা ও তাঁদের অস্বীকার করায় ওদেরই পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং সর্বদাই আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মিশন সফল হয়েছে? এর পরও কি ওরা শ্রেষ্ঠ নবী ও কামেল মুসলমানদের মোকাবেলায় জয়লাভের আশা করতে পারে? ইরশাদ হয়েছে : وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আশপাশের বহু জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং নানাভাবে আমার আয়াতগুলি শুনিয়েছি, যাতে ওরা ফিরে আসে। –সূরা আহকাফ, আয়াত ২৭)

বি. দ্র. এ জাতীয় আয়াত সূরা রা'দেও (আয়াত ৪১) রয়েছে। তার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ আমার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ওহী মোতাবেক নসীহত করা এবং পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করা। কিন্তু অন্তরের বধির যারা, তারা যদি এ ডাক না শোনে তবে আমার দোষ নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বধিরতার পরিণাম ভোগ করবে।

৪৬. আর যদি আপনার রবের আযাবের একটা ঝাপটাও ওদের স্পর্শ করে, তবে অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম পাপিষ্ঠ'[১]।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۝

৪৭. আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব; অতএব কারো প্রতি সামান্য অবিচারও করা হবে না। আর (আমল) যদি তিলের দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব[২]। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট[৩]।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ۝

৪৮. নিশ্চয় আমি মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম- (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী, আলো ও মুত্তাকীদের জন্য নসীহত[৪]-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ ওরা যে বধির হয়ে আছে, এই বধিরতা কতক্ষণ?! আল্লাহর আযাবের সামান্যতম ঝাপটা লাগামাত্র ওদের চোখ-কান সবই খুলে যাবে। তখন কিন্তু দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে বলবে, আমরা গুরুতর অপরাধী ছিলাম বলেই আমাদের এ দুর্দশা!

২. অর্থাৎ তিলের দানার সমান আমল থাকলে তাও পাল্লায় মাপা হবে, বাদ দেওয়া হবে না। আর কারো প্রতি অন্যায়-অবিচারও হবে না, সব কিছুর তিলে তিলে হিসাব হবে।

বি. দ্র. موازين হচ্ছে ميزان এর বহুবচন। সম্ভবত বহু পাল্লা থাকবে। অথবা একটি হলেও বিভিন্ন আমল ও বহু আমলধারীর হিসাবে একাধিক ধরা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমলের ওজন ও পাল্লা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সূরা আরাফে আলোচনা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য (আয়াত ৮-৯)।

৩. আমার হিসাবই চূড়ান্ত, যার পর দ্বিতীয় আর কোনো হিসাব হবে না। আর সমগ্র সৃষ্টির হিসাব নিতেও আমার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে না।

সম্মুখে বলা হচ্ছে, সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের ধারা পূর্ব থেকে চলে এসেছে। আজ যেসব বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন, পূর্ববর্তী নবীগণও তা সম্বন্ধে সতর্ক করে গেছেন।

৪. অর্থাৎ তাওরাত শরীফ দিয়েছিলাম, যা ছিল- হক ও বাতিল, হেদায়েত ও গোমরাহী এবং হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্যকারী; মূর্খতা ও গাফলতের অন্ধকারে আলো দানকারী এবং খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ।

৪৯. যারা স্বীয় রবকে না দেখেও ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্বন্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত[১]।

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ۝

৫০. আর এ (কুরআন) একটি বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার কর[২]?

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

[রুকূ - ৫]

৫১. নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম তাঁর (শান ও মর্যাদার উপযোগী) হেদায়েত[৩]। আর আমি তাঁর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলাম[৪]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝

৫২. (স্মরণ কর), যখন তিনি স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের নিকট তোমরা স্থির বসে থাক*[৫]?'

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْۤ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝

---

১. কিয়ামতের ভয়ও তারা এ জন্যই করে যে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি রয়েছে। ফলে সর্বদা চিন্তায় আছে, সেখানে না জানি কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, না জানি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির পাত্র হই কিনা? বলা বাহুল্য, এ ধরনের লোকেরাই উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ উপদেশসম্বলিত এ কুরআন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা মহা মর্যাদাশালী, মহা উপকারী ও মঙ্গলময়; আর এসব বিষয়ে এটি তাওরাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। তোমরা এমন সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল কিতাবকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তাকে অবিশ্বাস করার কোন অবকাশই নেই!

৩. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর পূর্বে আমি ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর উচ্চতর যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুপাতে রুশ্‌দ ও হেদায়েত দান করেছিলাম। এমনকি, যৌবনের পূর্বেই বাল্যকালে তাঁকে মহামর্যাদাশালী নবীদের পুণ্যপথে পরিচালিত করেছিলাম।

৪. অর্থাৎ তাঁর যোগ্যতা ও পারদর্শিতা এবং তাঁর ইলমী ও আমলী গুণ-গরিমা সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত। এ জন্যই যেমন রুশ্‌দ ও হেদায়েত তাঁর শানের উপযোগী ছিল, তাই তাঁকে দান করেছিলাম।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'যাদের ইবাদতে তোমরা রত থাক'?

৫. অর্থাৎ এগুলোর যথার্থতা ও তাৎপর্য একটু শোনাও দেখি! আচ্ছা, তোমাদেরই হাতে গড়া পাথর-মূর্তি খোদা হয়ে গেল কী করে?

৫৩. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদেরই পূজারী পেয়েছি[১]।'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝٥٣

৫৪. তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছ[২]।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٥٤

৫৫. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট (এ কথা) সত্য সত্যই বলছ, না তুমি কৌতুক করছ[৩]?'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ۝٥٥

৫৬. তিনি বললেন, 'না, বরং তোমাদের রব তো তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এরই সাক্ষ্য দিচ্ছি[৪]।

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٦

৫৭. 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব[*] যখন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে[৫]।'

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٥٧

---

১. অর্থাৎ আমাদের পক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, স্বভাব-প্রকৃতি ও দীন-ধর্মের দিক থেকে কোন প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, মূর্তি-পূজার সত্যতার সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ এই যে, বহু পূর্ব থেকে আমাদের বাপদাদারা এদেরই পূজা করে এসেছেন। সুতরাং আমরা আমাদের গুরুজনদের পথ কী করে পরিত্যাগ করি?

২. অর্থাৎ এ কথা দ্বারা তোমাদের সত্যতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত হয় না। হাঁ, এটা প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের বাপদাদারাও তোমাদের মত ভ্রষ্ট ও নির্বোধ ছিল, যাদের অন্ধ অনুসরণ করে তোমরা ধ্বংস হচ্ছ।

৩. সমগ্র জাতির আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ)-এর এরূপ উক্তি শুনে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তাই তারা বলতে লাগল, সত্য সত্যই কি তোমার এরূপ আকীদা, না কি তুমি আমাদের সঙ্গে শুধুই হাসিতামাশা ও কৌতুক করছ?

৪. অর্থাৎ এটাই আমার আকীদা-বিশ্বাস, এবং আমি পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার ও তোমাদের সবার রব সেই এক আল্লাহ, যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলির তত্ত্বাবধান তাঁরই হাতে– অন্য কিছুই তাঁর খোদায়ীর মধ্যে শরীক নয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা চালাব'।

৫. এ কথাটি তিনি আস্তে বলেছেন যে, কেউ কেউ শুনেছে, তবে অন্যরা শুনতে পায়নি। আর যারা শুনেছে তারাও কথাটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি, তারা ভেবেছে– একজন যুবক একা সমস্ত দেবদেবীর কী ক্ষতি করতে পারবে?

৫৮. অতঃপর তিনি সেগুলি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে ওরা (সম্প্রদায়ের লোকেরা) তার কাছে ফিরে যায়[১]।

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝٥٨

৫৯. ওরা বলতে লাগল, 'আমাদের উপাস্যগুলোর সাথে এ কাজ কে করল? নিশ্চয়ই সে বড় জালেম[২]!'

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٩

৬০. ওদের কেউ কেউ বলল, 'আমরা এক যুবককে মূর্তিগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়[৩]।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ۝٦٠

৬১. ওরা বলল, 'তোমরা তাকে জনসমক্ষে নিয়ে আস, যাতে লোকজন (তাকে) প্রত্যক্ষ করতে পারে[৪]।'

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۝٦١

---

১. যখন লোকেরা শহরের বাইরে একটি মেলায় চলে গেল, ইবরাহীম (আ) মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। তবে আকারে বা তাদের নিকট মর্যাদায় সর্ববৃহৎ মূর্তিটা রেখে দিলেন এবং যে কুড়াল দ্বারা ভেঙ্গেছিলেন, তা বড় মূর্তিটার গলায় ঝুলিয়ে রাখলেন– যাতে তারা ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বড়টাকে দোষী মনে করে, অথবা তাদের বলা যায় যে, তার কাছে যাও এবং তাকেই জিজ্ঞাসা কর যে, এসব কে করল?

২. অর্থাৎ আমাদের উপাস্যদের সাথে এ ধৃষ্টতা ও বেআদবী কে করল? যে এ কাজ করেছে, সে নিশ্চিত বড় জালেম ও দুষ্কৃতিকারী (استغفر الله)।

(من فعل هذا)– এ উক্তি সম্ভবত তারা করেছে, যারা হযরত ইবরাহীমের কথা– لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ শোনেনি।

৩. এ কথা তারাই বলে থাকবে, যারা হযরত ইবরাহীমের উক্তি শুনেছিল। তারা বলল, 'সে-ই একমাত্র ব্যক্তি, যে আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করে। নিঃসন্দেহে এ কাজ সে-ই করেছে।'

৪. অর্থাৎ তাকে ডেকে সর্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করা হোক, যাতে ব্যাপারটা সকলে দেখে এবং তার কথা শুনে সাক্ষী থাকে যে, জাতির পক্ষ থেকে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, সেটাই তার প্রাপ্য ছিল।

এ তো ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ইবরাহীম (আ)-ও চাচ্ছিলেন, সর্বসমক্ষে যেন মুশরিকদের অক্ষম ও লা-জওয়াব করার এবং সকলের উপস্থিতিতে সত্য প্রকাশের সুযোগ হয়।

৬২. ওরা বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এটা করেছ?'

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝

৬৩. তিনি বললেন, 'না, বরং তাদের এই বড়জন এটা করেছে। সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, যদি তারা কথা বলতে পারে[১]।'

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝

৬৪. তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করল, তারপর (পরস্পরকে) বলল, 'তোমরা নিজেরাই জালেম[২]।'

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই, বরং ধরে নাও– এই যে সুস্থ অক্ষত বড় ঠাকুরজি দাঁড়িয়ে আছেন এবং ভাঙ্গার যন্ত্র তার নিকট রয়েছে, তিনিই এ কাজ করে থাকবেন। তর্কের খাতিরে ও লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যে আমি যদি এ দাবি করি যে, বড় মূর্তিটাই ছোটগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে, তবে তা অস্বীকার করার কী দলীল তোমাদের নিকট আছে? দুনিয়াতে কি এমন হয় না যে, বড় সাপ ছোট ছোট সাপকে, বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে ফেলে এবং বড় রাজা ছোট ছোট রাজ্য ধ্বংস করে ফেলে?

(আর যদি আমার কথা নাই মান), তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসার সর্বোত্তম উপায় এই যে, তোমরা নিজেদের এই উপাস্যদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, এহেন ঘটনা কী করে ঘটল? তারা যদি কথা বলতে পারে, তবে কি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবে না?

বি. দ্র. উল্লিখিত ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা গেল, ইবরাহীম (আ.) بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا কথাটি বাস্তবতাবিরোধী সংবাদ পরিবেশনরূপে বলেননি যে, তাঁকে মিথ্যা বলা হবে। বরং তাদের বোকামী ও মূর্খতা প্রমাণ করার জন্য একটি সম্ভাবনাকে দাবির আকারে নিয়েছেন এবং অভিযোগরূপে কথাটি বলেছেন, যেমনটি সাধারণভাবে বিতর্কের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। সুতরাং একে মিথ্যা বলা যায় না। তবে বাহ্যত মিথ্যার মত মনে হওয়ায় কোন কোন হাদীসে এর উপর كَذِب (মিথ্যা) শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৩৩৫৮)

তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় আরো বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলেছেন, তবে আমাদের নিকট উপরোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর সুস্পষ্ট, সহজ ও হাদীসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।

২. অর্থাৎ ওরা বুঝতে পারল যে, পাথর পূজা করে কোন লাভ নেই। এটা বরং নিজের প্রতি জুলুম করার শামিল। অথবা অর্থ এই যে, ইবরাহীমের ধমকি শুনেও তোমরা সতর্ক না হয়ে মন্দিরটি এভাবে খোলা রেখে গেলে, নিজ উপাস্যদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে গেলে না– এই কাজ করে তোমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করলে।

৬৫. অতঃপর ওরা নিজেদের মাথা নিচু করে ফেলল[১] (এবং বলল,) 'তুমি তো জানই, এরা (কিছুই) বলতে পারে না[২]!'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰۤؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. ইবরাহীম বললেন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং তোমাদের অপকারও করতে পারে না?

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৭. 'ধিক্ তোমাদের ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তাদের! তোমরা কি বোঝ না[৩]?'

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. ওরা (পরস্পরকে) বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং নিজেদের উপাস্যদের সাহায্য কর যদি তোমরা (কিছু) করতে চাও[৪]।'

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

---

১. অর্থাৎ লজ্জায় মাথা তুলে তাকাতে পারছিল না।

২. অর্থাৎ জেনেশুনে তুমি আমাদের পাথর-মূর্তিকে জিজ্ঞেস করতে বলছ কেন? এ তো অসম্ভব ব্যাপার। পাথরও কি কোন দিন কথা বলতে পারে?

৩. অর্থাৎ তোমাদের তো ডুবে মরা উচিত। যে মূর্তি একটি শব্দও বলতে পারে না, বিপদের সময় কোন কাজেই আসে না, বিন্দু পরিমাণ লাভ-ক্ষতির সামর্থ্য যার নেই, তাকে তোমরা খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছ! এমন মোটা কথাও তোমরা বুঝ না?

৪. অর্থাৎ যুক্তিতর্কে তো তার সঙ্গে পেরে উঠব না। এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে। তা এই যে, (যে উপাস্যরা আমাদের, বরং স্বয়ং নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না), আমরা তাদের সাহায্য করব এবং তাদের শত্রুকে কঠিন শাস্তি প্রদান করব। যদি এটাও করতে না পারি, তবে আমরা কিছুই করলাম না।

অতএব উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত হল। যেন, ইবরাহীম (আ) যেমন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ওদের অন্তর জ্বালিয়েছিলেন, তদ্রূপ ওরা তাঁকে আগুনে জ্বালিয়ে মারার ইচ্ছা করল। পরিশেষে, জালেমরা একত্র হয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হযরত ইবরাহীমকে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করল।

৬৯. আমি বললাম, 'হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও[১]।'

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝۶۹

৭০. আর ওরা তাঁর অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি ওদেরকেই চরম ক্ষতিগ্রস্ত করলাম[২]।

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝۷۰

৭১. আর তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে বিশ্ববাসীদের জন্য বরকত রেখেছি[৩]।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝۷۱

---

১. অর্থাৎ তাক্বীনিভাবে আগুনকে আদেশ করা হল– ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যাও, তবে এত বেশি ঠাণ্ডা নয় যে, তাঁর কষ্ট হয়, বরং এমন পরিমিত ঠাণ্ডা, যা দেহ-মনের জন্য আরামদায়ক হয়।

বি. দ্র. হযরত ইবরাহীমের জন্য আগুনের ঠান্ডা হয়ে যাওয়াটা তাঁর মু'জেযা (বা অলৌকিকতা) ছিল। আর মু'জেযার অর্থ এটাই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সাধারণ নিয়মের বাইরে 'কারণ' ও 'ফলাফল' এ দুয়ের একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। (ফলে 'কারণ' পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও 'ফলাফল' পাওয়া যায় না, অথবা 'কারণ' ছাড়াই 'ফলাফল' ঘটে যায়।) এখানে (এমনই হয়েছে যে,) দাহিকাশক্তি তথা আগুন বর্তমান ছিল, কিন্তু এর 'ফলাফল' তথা দহন বা জ্বলন কার্যকর হয়নি।

মু'জেযা প্রভৃতি বিষয়ে আমি একটি বিশদ প্রবন্ধ লিখেছি, যা 'আল মাহমুদ' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ছেপেছে। তা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ ওরা ইবরাহীম (আ)-এর অমঙ্গল চাচ্ছিল, কিন্তু ওরা নিজেরাই অকৃতকার্য, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। সত্যের বিজয় হল এবং আল্লাহর কলেমা বুলন্দ হল।

البحر المحيط নামক তাফসীরে আছে-

قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام، والذي صح هو ما ذكره الله تعالى من أنه عليه السلام أُلقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما

('হযরত ইবরাহীব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনায় অনেকে [অতিরঞ্জনসহ] বহু রকমের আলোচনা করেছেন। তবে সত্য ও সঠিক তা-ই, যা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর আল্লাহ সেই আগুনকে তাঁর জন্য শীতল ও নিরাপদ করে দিলেন।')

৩. অর্থাৎ হযরত লূৎসহ হযরত ইবরাহীমকে নিরাপদে শামদেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে বহু জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বরকত রাখা হয়েছিল।

৭২. এবং তাঁকে দান করলাম ইসহাক, এবং অতিরিক্তরূপে ইয়াকুব[১]। আর সকলকে বানিয়েছিলাম অতি পুণ্যবান[২]।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝

৭৩. এবং তাঁদের বানিয়েছিলাম 'ইমাম' (অনুসরণীয়), যারা আমার নির্দেশে পথপ্রদর্শন করতেন[৩] এবং তাঁদের প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম– সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে[৪]। আর তাঁরা ছিলেন আমারই ইবাদতকারী[৫]।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

৭৪. এবং লূতকে দিয়েছিলাম বিচার-শক্তি[৬] ও প্রজ্ঞা এবং তাঁকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার (অধিবাসীরা) অশ্লীল কাজ-কর্ম করত; নিশ্চয় ওরা ছিল এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়, নাফরমান[৭]।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে (পুত্র তো বটেই) ইয়াকূবের ন্যায় পৌত্রও দান করলাম।

২. অর্থাৎ ইবরাহীম, লূৎ, ইসহাক, ইয়াকূব (আলাইহিমুস সালাম) সকলেই অতি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাঁরা সকলে নবী ছিলেন, আর নবীদের চেয়ে বেশি নেককার কে হতে পারে?

৩. অর্থাৎ তাঁরা এমনি কামেল ছিলেন যে, অন্যদেরও কামেল বানাতেন।

৪. অর্থাৎ তাঁদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম, যে ওহীতে এ বিষয়গুলিরও তাকীদ ছিল।

এ হচ্ছে তাঁদের ইলমী কামাল ও পরিপূর্ণতা।

৫. অর্থাৎ রাতদিন তাঁরা আমার বন্দেগীতে ডুবে থাকতেন, অন্য কোন দিকে চোখ তুলেও দেখতেন না। নবীদের শান এটাই যে, তাঁদের প্রত্যেক কাজে আল্লাহর বন্দেগীর ছাপ থাকে।

এ হল তাঁদের আমলী কামাল ও পরিপূর্ণতা।

৬. অর্থাৎ এমন বিচার-শক্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করা হয়, যা ছিল নবীদের শান মোতাবেক।

৭. জনপদ বলতে 'সাদূম' ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা উদ্দেশ্য। সেখানকার লোকেরা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করত এবং বহু অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। এদের কাহিনী পূর্বে কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৭৫. আর তাঁকে আমার রহমতে দাখিল করে নিয়েছিলাম; নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি পুণ্যবানদের একজন[১]।

[রুকূ - ৬]

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৬. এবং (স্মরণ কর) নূহকে, ইতিপূর্বে[২] যখন তিনি (আমাকে) ডেকেছিলেন। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করেছিলাম মহাসংকট থেকে।

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৭৭. আর তাঁকে সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয় ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। ফলে আমি ওদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম[৩]।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝

৭৮. এবং (স্মরণ কর) দাউদ ও সুলায়মানকেও, যখন তাঁরা খেতের বিষয়ে বিচার- মীমাংসা করছিলেন, যখন এক সম্প্রদায়ের ছাগল-পাল তাতে রাতের বেলা ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল নষ্ট করে ফেলেছিল)। আর আমি তাঁদের বিচার-মীমাংসা প্রত্যক্ষ করছিলাম।

---

১. অর্থাৎ যখন লূৎ (আ)-এর জাতির প্রতি আযাব পাঠালাম, তখন তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের আমি নিজ মেহেরবানী ও রহমতের চাদরে ঢেকে নিলাম, যাতে নেককার ও বদকারের পরিণাম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও লূৎ (আ)-এর পূর্বে।

৩. নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত স্বজাতিকে বোঝাতে থাকেন এবং এ দীর্ঘ সময়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দো'য়া করেন- أني مغلوب فانتصر (আমি অক্ষম হয়ে গিয়েছি, সুতরাং আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। -সূরা কামার, আয়াত ১০) এবং - رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (হে আমার রব! আপনি পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটা গৃহবাসীকেও রাখবেন না। -সূরা নূহ, আয়াত ২৬)। আল্লাহ তাআলা তাঁর দো'য়া কবুল করেন এবং প্লাবনে কাফেরদের ডুবিয়ে দেন, আর নূহ (আ)-কে সঙ্গীদেরসহ এই বিপদ ও কাফেরদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন। বিস্তারিত ঘটনা পূর্বে গত হয়েছে।

৭৯. তো, আমি সুলায়মানকে ফয়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম, আর উভয়কেই দান করেছিলাম বিচার-শক্তি ও প্রজ্ঞা[১]। আর আমি পাহাড়-পর্বত ও পাখিদের বশীভূত করে দিয়েছিলাম যে, তারা দাউদের সাথে তাসবীহ পাঠ করত[২]।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۙ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ

১. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম হলেন তাঁর পুত্র এবং তিনি নিজেও নবী ছিলেন। উভয়কে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব, বিচার-শক্তি এবং ইলম-হেকমত দান করেছিলেন। হযরত সুলায়মান বাল্যকালেই এমন অসাধারণ বুদ্ধির কথা বলতেন যে, শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ত।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দরবারে এ মর্মে একটি মুকাদ্দমা পেশ করা হল যে, এক ব্যক্তির খেতে রাতের বেলায় অন্য লোকদের ছাগলপাল ঢুকে ফসলের ক্ষতি সাধন করেছে। হযরত দাউদ (আ) দেখলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্য এবং ছাগলগুলোর মূল্য সমান। তাই তিনি ফয়সালা করে দিলেন যে, ছাগলগুলো ফসলের মালিককে দিয়ে দেওয়া হোক। হযরত সুলায়মান (আ) বললেন– আমার মতে, ফসলের মালিক ছাগলগুলো নিজের কাছে রেখে দুধ পান করতে থাকুক আর ছাগলের মালিক খেতে পানি দিয়ে চাষাবাদ করুক। যখন খেতের ফসল পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, তখন খেতের মালিক ছাগলগুলো ফেরত দিয়ে ফসল নিয়ে নিবে। এভাবে উভয়ই ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

এ বিচারে মুগ্ধ হয়ে দাউদ (আ) তা মেনে নিলেন এবং নিজ ফয়সালা প্রত্যাহার করলেন। বলা যায়, ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুলায়মান আলাইহিস সালামের استحسان (কিয়াসে খফী)-কে হযরত দাউদ (আ) নিজ কিয়াসে (জলী)-এর মোকাবেলায় গ্রহণ করে নিলেন।

পিতাপুত্রের উভয়ে মুকাদ্দমার যে মীমাংসা করলেন, তা আল্লাহ তাআলার সামনে ছিল এবং উভয়কেই আল্লাহ তাআলা নিজ তরফ থেকে বিচার-শক্তি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তবে এস্থলে তিনি সুলায়মান (আ)-কে সূক্ষ্ম কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। ফলে তিনি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, যা আল্লাহর নিকট বেশি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল এবং যা শেষ পর্যন্ত দাউদ (আ)ও গ্রহণ করলেন।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) রাজা-বাদশাহ হয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ন্যায় জনসাধারণের ছোট ছোট ব্যাপারের প্রতিও দৃষ্টি দান করেন।

২. হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল, তদুপরি পয়গম্বরসুলভ তাছির ও প্রভাব ছিল। যখন তিনি প্রাণভরে যবূর পড়তেন অথবা আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করতেন, তখন পাহাড়-পর্বত ও পাখিকুলও তাঁর সঙ্গে সজোরে তাসবীহ পড়তে শুরু করত।

وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ۝

আর (এ সবকিছু) আমি করেছিলাম[১]।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ۝

৮০. আর তাঁকে তোমাদের উপকারের জন্য এক প্রকার পোশাক তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছিলাম[২], যাতে তা (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমাদেরকে তোমাদের (শত্রুর) আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি শোকর করবে[৩]?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

৮১. আর সুলায়মানের (অনুগত করে দিয়েছিলাম) ঝড়ো হাওয়াকে, যা তাঁর হুকুমে সেই ভূখণ্ডের দিকে প্রবাহিত হত, যেখানে আমি বরকত রেখেছি[৪]। আর আমি সকল বিষয়

---

১. অর্থাৎ এ কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ো না যে, পাথর ও পশু-পাখী কী করে কথা বলতে ও তাসবীহ পড়তে পারে? এ সবকিছুই আমার কুদরতের কারিশমা ছিল। বলা বাহুল্য, আমার অসীম কুদরতের সামনে এসব বিষয় কিছুমাত্র অসম্ভব না।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-এর হাতে লোহাকে মোমের ন্যায় নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি তা দ্বারা পাতলা, মজবুত, নতুন ধরণের বর্ম তৈরি করতেন, যা যুদ্ধে কাজে আসবে।

৩. অর্থাৎ তোমাদের উপকারার্থে আমি দাউদের মারফত এরূপ চমৎকার হস্তশিল্পের প্রবর্তন করে দিলাম। এখন চিন্তা করে দেখ– তোমরা কি এ ধরনের নে'য়ামতের শোকর আদায় কর?

৪. হযরত সুলাইমান (আ) দো'য়া করেছিলেন- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي (হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর অন্য কারো হবে না। –সূরা সাদ, আয়াত ৩৫) –আল্লাহ তাআলা বাতাস ও জিনকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তিনি এমন একটি সিংহাসন তৈরি করেন, যার উপর তিনি রাজ্যের সভাসদসহ সমাসীন হতেন এবং জরুরী আসবাবও তাতে রাখা হত। অতঃপর প্রবল বাতাস এসে তা মাটি থেকে ওঠাত এবং উপরে যাওয়ার পর নম্র বাতাস সাধারণ গতিতে তাদের নিয়ে প্রবাহিত হত। যেমনঃ অন্যত্র বলা হয়েছে- رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (যা তাঁর আদেশে মৃদুমধুরভাবে প্রবাহিত হত। –সূরা সাদ, আয়াত ৩৬)।—এই বাতাস তাঁকে ইয়ামান থেকে শামদেশে এবং শাম থেকে ইয়ামানে, প্রতিবারে এক মাসের পথ, দুই প্রহরের মধ্যে (অর্থাৎ অর্ধ দিনে) পৌঁছে দিত।

আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানে বিস্ময়কর উড়োজাহাজের যুগেও বহু পথহারা লোক এ ধরনের ঘটনা অস্বীকার করে। তাদের ভাবা উচিত– পশ্চিমা জগৎ যে কাজ বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্যে করতে পারে, তা কি আল্লাহ তাআলা একজন পয়গম্বরের খাতিরে স্বীয় কুদরতে করতে পারেন না?

وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

সম্পর্কে পূর্ণ অবগত[১]।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. এবং (তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম) এমন কতক শয়তানকে, যারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া আরো কাজও করত[২]। আর আমিই তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ছিলাম[৩]।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং (স্মরণ কর) আইয়ূবকে, যখন তিনি স্বীয় রবকে ডেকে বললেন, 'আমার উপর আপতিত হয়েছে কষ্ট-যাতনা । আর আপনি তো সকল দয়াময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াময়।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ

৮৪. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম, আর তাঁকে দান করলাম তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ[৪]–

---

১. অর্থাৎ তাঁর জানা আছে, কাকে কোন্ ধরনের বিশেষত্ব দান করা সংগত এবং বাতাস প্রভৃতি উপাদানকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

২. 'শয়তান' দ্বারা এখানে অবাধ্য জিন সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। হযরত সুলায়মান (আ) তাদের দ্বারা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণিমুক্তা আহরণ করার কাজ, দালান-কোঠা নির্মাণে ভারী কাজ করাতেন, হাউজের সমান তামার বড় বড় গামলা এবং বিরাট ভারী ডেগ তৈরি করাতেন এবং আরো কঠিন কঠিন কার্য সম্পাদন করাতেন। বোঝা যায়, বর্তমান যুগে যে ধরনের বিস্ময়কর কার্যাদি আল্লাহ তাআলা বস্তুগত শক্তিসমূহ (মেশিন প্রভৃতি) দ্বারা করাচ্ছেন, পূর্বে সেগুলি অপ্রকাশ্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা করাতেন।

৩. অর্থাৎ আমি স্বীয় একচ্ছত্র শক্তি ও কুদরতে এসব শয়তানকে সুলায়মান (আ)-এর এমন আয়ত্তাধীন করে রেখেছিলাম যে, তিনি ওদের নিজ খুশি মত বেগার খাটাতেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারত না। নতুবা মানুষের জন্য সম্ভব ছিল না, এরূপ দুর্ধর্ষ সৃষ্টিকে নিজের বশ করে নেওয়া এবং পরাধীনতার শিকলে বেঁধে রাখ– وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ (আরো অনেককে, যারা ছিল পরস্পর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। –সূরা সাদ, আয়াত ৩৮)

৪. হযরত আইয়ূব (আ)-কে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সবদিক দিয়ে পরিতৃপ্ত রেখেছিলেন– বিষয়-সম্পত্তি, পশুপাল, দাস-দাসী, সুসন্তানাদি ও মনের মত স্ত্রী দান করেছিলেন। হযরত আইয়ূব (আ) বড়ই কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন– খেত-খামার জ্বলে গেল, পশুপাল মরে গেল, সন্তানাদি একত্রে মৃত্যুবরণ করল, বন্ধু-বান্ধব ও

আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ[১]।	رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَذِكۡرٰى لِلۡعٰبِدِيۡنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং (স্মরণ কর)- ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুলকিফলকে। তাঁরা সকলে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত[২]।	وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِدۡرِيۡسَ وَذَا الۡكِفۡلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ ﴿٨٥﴾

পরিচিত মহল সরে দাঁড়াল, শরীরে ফোড়া হয়ে তাতে পোকা ধরল, এক স্ত্রী সঙ্গী ছিলেন- শেষ পর্যন্ত সেই বেচারীও ধৈর্যহারা হতে শুরু করলেন।

কিন্তু হযরত আইয়ূব (আ) সুখের দিনে যেমন শোকরগুযার ছিলেন, দুঃখের দিনেও তদ্রূপ ধৈর্যশীল থাকেন। যখন দুঃখ ও দুর্দশা এবং শত্রুদের আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে গেল, এমন কি বন্ধু-বান্ধবও বলতে শুরু করল যে, নিশ্চয় আইয়ূব (আ) কোন শক্ত গোনাহ করেছেন, যার কারণে এমনি কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, তখন তিনি প্রভুর দরবারে দো'য়া করলেন- أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ —প্রভুকে ডাকামাত্র তাঁর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার এসে গেল। আল্লাহ তাআলা মরে যাওয়া সন্তানদের তুলনায় তাঁকে দ্বিগুণ সন্তান দান করলেন, মাটি থেকে একটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করলেন, তারই পানি পান ও গোসল করে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। এছাড়া হাদীসে আছে যে, তাঁর জন্য আল্লাহ তাআলা সোনার পঙ্গপাল বর্ষণ করলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৯১) মোটকথা, আল্লাহ পাক তাঁর সবকিছু দুরুস্ত করে দিলেন।

১. অর্থাৎ এ ছিল আইয়ূব (আ) এর প্রতি মেহেরবানী এবং সকল ইবাদতকারীর জন্য একটি উপদেশ যে, দুনিয়ায় কোন নেক বান্দার উপর দুর্দিন আসলে আইয়ূব (আ)-এর ন্যায় ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা উচিত এবং একমাত্র প্রভুর নিকটই ফরিয়াদ করা উচিত। এতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সুদৃষ্টি দান করবেন। তাছাড়া এরূপ বিপদ দেখে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট গযবের পাত্র হয়ে গেছে।

২. ইসমাঈল (আ) ও ইদ্রীস (আ) এর আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা 'মারয়ামে' গত হয়েছে। যুল-কিফল শুধু একজন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, না নবীও ছিলেন- এতে মতভেদ আছে। পবিত্র কুরআনে তাঁকে নবীদের সঙ্গে উল্লেখ করায় মনে হয়, নবী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি এক ব্যক্তির জামিন হয়ে কয়েক বছর কারাভোগ করেন, এ কষ্ট তিনি একমাত্র আল্লাহর জন্যই স্বীকার করেছিলেন।

বি. দ্র. বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ মুসনাদে ইমাম আহমদ (৪৭৪৭) ও জামে তিরমিযীতে (২৪৯৬) এক ব্যক্তির ঘটনা রয়েছে যে, সে প্রথম জীবনে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও ফাসেক-ফাজের ছিল। তবে পরবর্তীতে তওবা করায় আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতেই তার মাগফেরাতের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়ে দেন। হাদীসে এই ব্যক্তির নাম 'কিফ্‌ল' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইনি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যুলকিফ্‌ল বলে মনে হয় না। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

৮৬. আর আমি তাঁদের দাখিল করেছিলাম আমার রহমতে; নিশ্চয় তাঁরা অতি পুণ্যবানদের দলভুক্ত।

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৭. এবং (স্মরণ কর) মাছওয়ালাকে, যখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চলে গেলেন[১] আর ভাবলেন

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ

বর্তমান কালের কতক লেখকের ধারণা এই যে, 'হিযকীল' নামে খ্যাত যিনি, তিনিই যুলকিফ্ল। والله أعلم

১. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে। তাঁর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে (মুসল এলাকার পার্শ্ববর্তী) 'নীনাভা' (نینوی) শহরের লোকদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি কওমকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং সত্যের দিকে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা না মেনে বরং দিন দিন তাঁর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্রোহের মাত্রা বাড়াতে থাকে। জাতির আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে তিনি বদ-দো'য়া করেন এবং ক্রোধভরে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন– আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করলেন না। আর বলে গেলেন যে, তিনদিন পর তোমাদের উপর অবশ্যই আযাব আসবে।

তিনি চলে গেলে লোকদের বিশ্বাস জন্মিল যে, নবীর দো'য়া ব্যর্থ হওয়ার নয়। সম্ভবত আযাবের কিছু আলামতও দেখা দিল, তাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সকলে শিশুদের ও পশুপাল নিয়ে ঘরের বাইরে ময়দানে চলে গেল এবং শিশুদের থেকে মায়েদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। ময়দানে পৌছে সকলে কাঁদাকাটি শুরু করে দিল। শিশু ও মায়েদের, মানুষ ও পশু সবার চিৎকার ও কলরবে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। লোকালয়ের সকলে খাঁটি দিলে তওবা করল, মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। আর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করল। তারা হযরত ইউনুস (আ)-কে তালাশও করল, যাতে তাঁকে পেয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে। এতে আল্লাহ তাআলা আসন্ন আযাব ওদের থেকে সরিয়ে দিলেন- (তাফসীরে তবারী ১৬/৩৭৫)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

(তো কোন জনপদ কেন এমন হল না যে, তার অধিবাসীগণ ঈমান আনত, তার পর ঈমান আনয়ন তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যাতিক্রম। যখন তারা ঈমান গ্রহণ করল, তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। –সূরা ইউনুস, আয়াত ৯৮)

لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ

যে, আমি তাঁকে ধরব না[১]। অতঃপর তিনি অন্ধকাররাশিতে[২] (আল্লাহকে এভাবে)

অন্যদিকে ইউনুস আলাইহিস সালাম লোকালয় থেকে বের হয়ে এক দল লোকের সঙ্গে নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন বোঝা কমানোর জন্য আরোহীরা একজনকে নামিয়ে দিতে চাইল (অথবা নিজেদের ধারণা মতে তারা ভাবল, নৌকায় কোন পলাতক গোলাম রয়েছে)। যা হোক, মানুষটি বের করার জন্য তারা লটারী করল– তাতে ইউনুস আলাইহিস সালামেরই নাম উঠল। দু তিন বার লটারী ধরা হল, প্রত্যেকবার তাঁরই নাম উঠতে থাকল। এ অবস্থা দেখে ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলল। মাছটিকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন– ইউনুসকে তোমার পেটে ধারণ কর, তাঁর যেন একটুও ক্ষতি না হয়। ইনি তোমার খাদ্য নয়, বরং তোমার পেটকে তাঁর কারাগার বানানো হল। তাঁকে তোমার মধ্যে নিরাপদে রাখ। ইউনুস (আ) আল্লাহকে এভাবে ডাকতে লাগলেন– لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয় আমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।) তিনি নিজ ভুল স্বীকার করলেন যে, নিশ্চয় আমি ত্বরা করেছি– তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই লোকালয়বাসীদের ত্যাগ করে চলে এসেছি।

যদিও ইউনুস আলাইহিস সালামের এই ভুলটি এজতেহাদী ছিল, যা সাধারণ মানুষের জন্য মার্জনীয়। কিন্তু নবীদের শান অন্য সকল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বিষয়ে ওহী আগমনের আশা আছে, তার ক্ষেত্রে অপেক্ষা না করে জাতিকে ছেড়ে চলে যাওয়া একজন নবীর শানের উপযোগী ছিল না। তাই পাকড়াও শুরু হল। শেষ পর্যন্ত তওবার পর তিনি মুক্তি পান। মাছটি তীরে এসে তাঁকে উদগীরণ করে এবং তিনি সেই লোকালয়েই নিরাপদে ও সুস্থ দেহে ফিরে যান।

১. অর্থাৎ তিনি এ ধারণা করলেন যে, তাঁর এ আচরণে আমি (আল্লাহ) কোন ধর-পাকড় করব না। অথবা অর্থ এই যে, তিনি এমনভাবে বের হয়ে গেলেন, যেমন কোন ব্যক্তি এমনটা ভেবে বেরিয়ে গেল যে, আমি (আর) তাকে ধরতে পারব না। যেন, লোকালয় থেকে বের হয়ে আমার শক্তির নাগালের বাইরে চলে গেছে। (মোটকথা, হযরত ইউনুস (আ.)-এর বেরিয়ে পড়ার বাহ্যিক ধরন-ধারণ উক্ত ব্যক্তির ন্যায় ছিল)। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সত্যি সত্যিই এমনটি ভেবেছিলেন। এমন ধারণা তো একজন সাধারণ মুমিনও করতে পারে না। একজন নবী কী করে করবেন?

আর আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, তিনি তাঁর কামেল বান্দাদের সামান্যতম ত্রুটিকে অতি কঠিন ভাষায় প্রকাশ করেন (যেমন ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে আলোচনা হয়েছে)। আর এ দ্বারা কামেল বান্দাদের হেয় করা হয় না, বরং এতে তাঁদের উচ্চমর্যাদা প্রকাশ পায় যে, এত বড় হয়ে এমন মামুলি ত্রুটিই বা কেন করবেন?

২. অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতা, মাছের পেট ও আঁধার রাত– এসব কিছুর অন্ধকারে।

أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧

ডাকলেন– 'আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয় আমিই এক অপরাধী[১]।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম। আর এভাবেই আমি ঈমানদারদের নাজাত দিয়ে থাকি[২]।

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٨٩

৮৯. এবং (স্মরণ কর) যাকারিয়াকে, যখন তিনি আপন রবকে ডেকে বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একা রাখবেন না[৩]। আর আপনিই সর্বোত্তম ওয়ারিস[৪]।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۭ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۭ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝٩٠

৯০. সুতরাং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তাঁকে দান করলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে দুরস্ত করে দিলাম[৫]। নিশ্চয় তাঁরা সৎকাজসমূহে দ্রুত অগ্রসর হতেন এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকতেন। আর তাঁরা ছিলেন আমার সামনে বিনয়ী[৬]।

---

১. অর্থাৎ আমার ভুল ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আমার দ্বারা ভুল হয়েছে।

২. অর্থাৎ এরূপ মুক্তির ব্যবস্থা শুধু ইউনুস (আ)-এর জন্যই নয়, বরং যে ঈমানদাররাই আমাকে এভাবে ডাকবে, আমি তাদের বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেব।

হাদীসে হযরত ইউনুস (আ.)-এর এ দো'য়ার অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং দুঃখ-কষ্টে ও বালা-মুসীবতে সর্বদা এর উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৪৬২; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫০৫)

৩. অর্থাৎ আমাকে সন্তান দান করুন, যে আমার পর আমার সম্প্রদায়ের সেবা করবে এবং আমার শিক্ষার প্রচার-প্রসার করবে। সূরা মারয়ামের আয়াত ৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪. তিনি ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী চাচ্ছিলেন, তাই এ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নামের (وارث) দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করলেন।

৫. অর্থাৎ তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীকে সন্তান জন্মদানের যোগ্য করে দিলেন।

৬. কোন কোন সূফীসাধক বলে থাকে যে, আল্লাহকে যারা আশা নিয়ে ভয়ের সাথে ডাকে, তারা প্রকৃত প্রেমিক নয়! আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়। নবীগণের চেয়ে বড় আল্লাহপ্রেমিক আর কে হতে পারে? অথচ তাঁরা আল্লাহকে আশা ও ভীতির সাথেই ডাকে।

৯১. এবং (স্মরণ কর) সেই নারীকে, যে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল[১], অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকে দিলাম[২]। আর তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীদের জন্য বানালাম এক নিদর্শন[৩]।

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٩١

৯২. (তাওহীদের) এ দীনই তোমাদের দীন, যা (নবী-রাসূলদের) অভিন্ন দীন☆। আর আমি তোমাদের রব, অতএব আমারই ইবাদত কর[৪]।

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝٩٢

৯৩. কিন্তু লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে[৫]। তারা সকলে আমারই নিকট ফিরে আসবে[৬]।

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝٩٣

---

১. অর্থাৎ বৈধ ও অবৈধ উভয় পন্থা থেকে তিনি লজ্জাস্থানকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

২. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর গর্ভে লালন করেন, যিনি "রূহুল্লাহ" উপাধিতে ভূষিত।

৩. তাঁদের নিদর্শন হওয়ার বিষয়টি সূরা আলে-ইমরান ও সূরা মারয়ামে আলোচিত হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– '(নবী-রাসূলদের) এ জামাতই তোমাদের (জন্য অনুসরণীয়) জামাত, যারা ছিলেন (দীনের দিক থেকে) অভিন্ন জামাত'।

৪. অর্থাৎ আল্লাহও এক এবং তোমাদের আসল দীনও এক। সকল নবীগণ মৌলিক বিষয়াদিতে অভিন্ন এবং সকলের শিক্ষা মূলত একই। তবে শাখাগত বিষয়াদিতে যে পার্থক্য, তা স্থান ও কালের পার্থক্যের আলোকে নিতান্তই কল্যাণকর ও হেকমতপূর্ণ। হাঁ, মৌলিক বিষয়ে ভিন্নতা বা পার্থক্য অবশ্যই দূষনীয় (যা নবীগণের মাঝে অনুপস্থিত)।

অতএব সবাই যখন এক, তাই সকলে মিলে আল্লাহর বন্দেগী করা এবং মৌলিক বিষয়গুলিকে সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ধরা উচিত।

৫. আমি তো মৌলিক বিষয়াদির দিক থেকে অভিন্ন দীন-ধর্ম দিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষ নিজেরা মতভেদ সৃষ্টি করে তা ছিন্নভিন্ন করে নিয়েছে।

৬. আমার নিকট আসার পর সকল মতভেদের মীমাংসা হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। –সামনে প্রতিফলের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

[রুকূ - ৭]

৯৪. অতএব যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে আর সে হবে মুমিন, তার প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না। নিশ্চয় আমি তা লিখে রাখি[১]।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝

৯৫. আমি যে যে জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, তার (অধিবাসীদের) জন্য এটা সুনির্ধারিত যে, ওরা আর ফিরে আসবে না[২];

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

৯৬. অবশেষে ইয়াজূজ-মাজূজকে যখন মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে ছুটে নেমে আসবে[৩];

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ কারো মেহনত ব্যর্থ যাবে না– সৎকর্মের সুফল মুমিন পাবেই পাবে, সামান্যতম সৎকর্মও বিনষ্ট হবে না। প্রত্যেকটি ছোট-বড় আমলই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রাখি, কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে (এবং বিনিময় প্রদান করা হবে)।

২. পূর্বে মুক্তিপ্রাপ্ত মুমিনদের উল্লেখ ছিল। তার বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফেরদের আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ যাদের জন্য ধ্বংস ও বিনাশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, ওরা কখনো কুফর ও অবাধ্যতা ত্যাগ করে এবং তওবা করে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার নয়। না তারা মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে এসে পূর্ববর্তী জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি পোষাতে পারবে। অতএব ওদের জন্য মুক্তি ও সফলতার আশা কী করে করা যায়? ওদের জন্য তো একটিমাত্র সময়ই রয়েছে, যখন ওরা পুনর্জীবিত হয়ে আল্লাহ-অভিমুখী হবে এবং নিজেদের পাপাচারের কথা স্বীকার করে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার অনুতাপ কোনই কাজে আসবে না। বলা বাহুল্য, সেটি হচ্ছে কিয়ামতের সময়, যার নিকটবর্তী লক্ষণাদির অন্যতম হচ্ছে 'ইয়াজূজ-মাজূজ' এর আবির্ভাব। সামনে এরই বর্ণনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের পর যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীর ভেঙে ইয়াজূজ-মাজূজের বাহিনী সহসা বেরিয়ে আসবে। ওরা তখন নিজেদের আধিক্য ও বিপুল পরিমাণের কারণে সমস্ত উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির উপর ছড়িয়ে পড়বে। যেদিকেই দৃষ্টি পড়বে, কেবল ওদেরই দেখা যাবে। ওদের জনস্রোত এতই প্রবল হবে যে, কোন মানব-শক্তি তা রোধ করতে পারবে না। ওদের সংখ্যাধিক্য ও গতিবেগ দেখে মনে হবে যে, প্রত্যেক টিলা ও পাহাড় থেকে ওদের বাহিনী পিছলিয়ে ও গড়িয়ে চলে আসছে।

৯৭. আর সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) নিকটবর্তী হয়ে যাবে– তখন সহসা কাফেরদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে (আর বলবে), 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ থেকে উদাসীন ছিলাম[১]; না, বরং আমরা ছিলাম অপরাধী[২]।

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা তোমরা কর, সবাই দোযখের ইন্ধন; তোমাদের তাতেই প্রবেশ করতে হবে[৩]।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

সূরা 'কাহ্ফ' এর শেষের দিকে (আয়াত ৯৪-৯৯) এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা যা কিছু লিখেছি, তা আরেকবার পড়ে নিন।

১. অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি-প্রাপ্তির নির্ধারিত সময় যখন নিকটবর্তী হবে, তখন কাফেরদের চোখগুলো চরম ভয় ও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে থাকবে এবং ওরা নিজেদের উদাসীনতার জন্য আফসোস করে বলবে– হায় কপাল! কী করে আমরা আজকের দিন সম্বন্ধে এমন বেখবর রইলাম যে, এ দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হল। হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে এ বিপদ থেকে বাঁচার ফিকির করতাম!

২. অর্থাৎ আমরা বেখবর ছিলাম– এ কথা কীভাবে বলি? নবীগণ তো আমাদের স্পষ্টভাবে সকল বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি। কেননা, আমরা তাঁদের কথা মানিনি এবং সর্বদা দুষ্কৃতি ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছি।

৩. এই সম্বোধন মক্কার মুশরিকদের প্রতি। অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের উপাস্য (মূর্তিগুলো) সকলে দোযখের ইন্ধন হবে। যেমন অন্যত্র আছে– وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (বাকারা, আয়াত ২৪) –তবে এর অর্থ এই নয় যে, মূর্তিগুলোও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, বরং মূর্তিগুলোকে ইন্ধন এজন্য বানানো হবে, যাতে মূর্তিপূজারীদের খণ্ডন জোরালোভাবে হয় – এজন্যই সম্মুখে বলা হয়েছে: لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا – এবং যাতে তাদের আফসোস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় যে, যাদের থেকে উপকারের আশা রাখত, আজ তারা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারল না, অতএব অন্যদের রক্ষা করবে কীভাবে?

বি. দ্র. وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু মূর্তিগুলো। কেননা, আলোচনা এখানে মূর্তির পূজারীদের ব্যাপারেই। কিন্তু যদি ما শব্দটি দ্বারা 'ব্যাপক অর্থ' উদ্দেশ্য হয়, তবে شرط عدم المانع অর্থাৎ 'বাধা না থাকার শর্ত' প্রযোজ্য হবে। তাই আয়াতের এই অর্থ হবে যে, মিথ্যা মা'বূদদের মধ্যে যাদের জাহান্নামে প্রবেশে কোন বাধা নেই, তারা নিজেদের পূজারীদের সাথে দোযখের ইন্ধন হবে, যেমন শয়তান ও মূর্তিসমূহ। কিন্তু হযরত মাসীহ, উযায়র ও আল্লাহর ফেরেশতাগণ –যাদেরকে অনেক মানুষ উপাস্য সাব্যস্ত করেছে– তারা

৯৯. যদি এগুলো উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না; আর ওরা সকলে তাতে চিরকাল পড়ে থাকবে[১]।

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۚ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০. ওরা সেখানে আর্তনাদ করবে এবং ওরা সেখানে (কিছু) শুনবে না[২]।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. আমার পক্ষ হতে যাদের জন্য পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে[৩]–

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. তারা তার মৃদু আওয়াজও শুনবে না। আর তারা তাদের মন যা যা চায়, তার মধ্যে অনন্তকাল থাকবে[৪]।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. মহাভীতি তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না[৫] এবং ফেরেশতাগণ (এই বলে) তাদের অভ্যর্থনা জানাবে যে, এ তোমাদের সেই দিন, যার

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ

আল্লাহ তাআলার নিকট মকবূল ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আয়াতের এই ব্যাপক অর্থের আওতাভুক্ত হবেন না। এ কারণেই সম্মুখের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

১. অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসনাকারীরা সকলে চিরকাল দোযখে পড়ে থাকবে।

২. অর্থাৎ প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্ক, আযাবের কঠিন যন্ত্রণা এবং নিজেদের চিৎকার-চেঁচামেচির কারণে কিছু শুনতে পাবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এমন এক সময় আসবে যখন প্রত্যেক দোযখীকে একটি লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ করে উপরে পেরেক মেরে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের তলায় নিক্ষেপ করা হবে। হতে পারে, কিছু না শুনতে পারাটা এ সময়ের অবস্থা হবে। (তাফসীরে তবারী ১৬/৪১৪-৪১৫)

৩. অর্থাৎ একবার পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার পর তারা চিরকাল জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে এবং তার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়েও দোযখের কষ্ট ও দহন থেকে তাদের রক্ষা করা হবে।

৪. দোযখ থেকে বেহেশতীদের দূরত্ব এত বেশি হবে যে, তারা তার মৃদু শব্দও অনুভব করবে না এবং অত্যন্ত আরাম-আয়েশের সাথে অনন্তকাল জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করতে থাকবে।

৫. অর্থাৎ সেদিন যখন সমস্ত মাখলুক কঠিন বিভীষিকায় পতিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কষ্ট ও চিন্তা থেকে নিরাপদ রাখবেন।

ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হত[১]।

الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۝

১০৪. (সেই দিনকে স্মরণ কর), যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব যেমন কাগজপত্র লেখাসহ গুটিয়ে ফেলা হয়[২]। আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছি, তেমনি পুনরায় সৃষ্টি করব; এ আমার জন্য অবশ্য পালনীয় ওয়াদা; আমি অবশ্যই (এটি) পূর্ণ করব[৩]।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ۝

১০৫. আমি 'যিক্‌র' এর পর যাবূরে এ কথা লিখে দিয়েছি যে, (অবশেষে) যমীনের ওয়ারিস হবে আমার নেক বান্দাগণ[৪]।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ কবর থেকে ওঠার সময় অথবা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় ফেরেশতারা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন এবং বলবেন, যে সুখ-শান্তির ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছিল আজ তা পূর্ণ হবে।

২. অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে, তখন আকাশসমূহের স্তরগুলিকে গুটিয়ে ফেলা হবে, যেভাবে লিখিত কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে দেওয়া হয়, ইরশাদ হয়েছে– وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (এবং আকাশগুলি গোটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে — যুমার, আয়াত ৬৭)

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক লেখকের নাম 'سجل' ছিল। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রবিদদের পুরো এক জামাত তাকে দুর্বল বর্ণনা বরং موضوع সাব্যস্ত করেছেন, যেমন ইবনে কাছীর বলেছেন। সুতরাং– لا يعتبر بتخريج أبي داؤد والنسائي في سننهما (আবু দাউদ, নাসায়ী তাঁদের সুনানদ্বয়ে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।)

৩. অর্থাৎ প্রথমবার যেমন খুব সহজে দুনিয়া সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই (কিয়ামতের দিন) পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। এটা অকাট্য ওয়াদা, যা পূর্ণ হবেই হবে।

৪. কামেল অনুগত বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা দান করবেন এবং পৃথিবী ও জান্নাতের মাটির উত্তরাধিকারী বানাবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে : إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (–সূরা আ'রাফ, আয়াত ১২৮) এবং – إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (–সূরা মুমিন, আয়াত ৫১) এবং وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ (–সূরা নূর, আয়াত ৫৫)

১০৬. নিশ্চয় এতে ইবাদতকারী বান্দাদের জন্য (অভিষ্ট লক্ষ্যে) পৌছার উপকরণ রয়েছে*[১]।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ

১০৭. আর আমি আপনাকে বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতরূপেই পাঠিয়েছি[২]।

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

এ এমন অকাট্য ওয়াদা, যার সংবাদ আল্লাহ নিজ বিধানগ্রন্থে ও বিধিলিপিতে দিয়েছেন। 'লওহে মাহফূজ' তথা 'উম্মুল কিতাব'-এ এই প্রতিশ্রুতি লেখা হয়েছে এবং নবীদের মুখে বারবার তা ঘোষণা করা হয়েছে। দাউদ আলাইহিস সালামের কিতাব 'যাবূর' ২৯/৩৭ এ আছে, সত্যবাদীরা যমীনের ওয়ারিস হবে।

উক্ত ওয়াদা অনুযায়ী এ উম্মতের কামেল অনুগত ও সত্যবাদী বান্দারা দীর্ঘকাল যাবৎ যমীনের উত্তরাধিকারী ছিলেন, তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইসলামী শাসন কায়েম করেন, আদল ও ইনসাফের ঝাণ্ডা গেড়ে দেন এবং সত্য দীনের গৌরব জগতের বুকে প্রচার করেন। এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের হাতে বাস্তবায়িত হয় : إن الله تعالى زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ('আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সংকুচিত করলেন। তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলগুলি দেখলাম। আমার উম্মত সেসবের উপর আধিপত্য লাভ করবে, তা থেকে যেগুলি আমার জন্য চিহ্নিত করা হল।') [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৮৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২) –তাছাড়া এ ধরনের আরো ভবিষ্যদ্বাণী ইমাম মাহদী ও হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের যুগে অবশ্যই পূর্ণ হবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'নিশ্চয়ই এ কুরআনে ইবাদতকারীদের জন্য যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে'।

১. অর্থাৎ এ ধরনের সুসংবাদ শুনে এক আল্লাহর ইবাদতকারীরা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছেন। অথবা অর্থ এই যে, এরূপ সুসংবাদ ও হেদায়েতসম্বলিত পবিত্র কুরআনে ইবাদতকারীদের জন্য যথেষ্ট উপকারিতা ও সফলতা রয়েছে।

২. অর্থাৎ আপনাকে তো সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। তবে যদি কোন হতভাগা এ সর্বব্যাপী রহমত দ্বারা উপকৃত না হয়, তবে তা ওর দোষ। সূর্যের আলো ও তাপ সবারই জন্য, কিন্তু কেউ যদি নিজ ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়, তবে তা তার পাগলামী– সূর্যের কোন ত্রুটি নয়, সূর্যকিরণ সর্বব্যাপী।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'– সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁর অমৃতধারা এতই অবারিত ও প্রশস্ত যে, কোন হতভাগা উপকৃত না হতে চাইলে সেও কোন না কোন পর্যায়ে ইচ্ছার বাইরে হলেও এই রহমতের বারিধারায় উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন নবুওয়াতের শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানব সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পর্কিত ইসলামী নীতিমালার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ফলে প্রত্যেক মুসলমান ও অমুসলমান তা দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। তদুপরি আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী উম্মতের বিপরীতে এই উম্মতের কাফেরদেরকে (দুনিয়ায়) সামগ্রিক ও সমূলে ধ্বংসকারী আযাব থেকে হেফাজত করবেন।

১০৮. আপনি বলুন, 'আমার প্রতি এ ওহীই পাঠানো হয় যে, 'তোমাদের মা'বুদ এক মা'বুদ; সুতরাং তোমরা কি (তাঁর) আদেশ মান্যকারী হবে[১]?'

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১০৯. এর পরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি, (এখন উভয় দিক) সমান*[২]।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ

বরং আমি তো বলি যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতেন, তাও সামগ্রিক জগতের জন্য রহমতই ছিল। কেননা, তিনি যে বিশ্বজনীন রহমতের ধারক ও বাহক হয়ে দুনিয়ায় তশরীফ এনেছিলেন, জেহাদ দ্বারা তার হেফাজত হত এবং অনেক অন্ধ, যারা নিজেদেরকে দীনের আলো থেকে মাহরুম রাখতে চাইত, তারাও আলো পেয়ে যেত। এক হাদীসে আছে- والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله ولايتوفاني حتى يظهر الله دينه ('যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, আমি অবশ্যই ওদের সাথে যুদ্ধ করব, ওদের শূলে চড়াব এবং ওদের হেদায়েত করব, যদিও ওদের কাছে তা অপছন্দ। কেননা, আল্লাহ আমাকে রহমতরূপে পাঠিয়েছেন। আর তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন না, যাবৎ না তিনি তাঁর দীনকে প্রকাশিত করবেন।' -ইবনে কাছীর) (মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস : ১৫৩২; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, হাদীস : ৯৯৪০)

এই হাদীস দ্বারা তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝে আসে।

১. রেসালাতের আলোচনার পর বর্তমান আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ যে বিরাট রহমতধারা নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় তশরীফ এনেছেন, তার সারাৎসার হচ্ছে নিরংকুশ তাওহীদ বা একত্ববাদ। আর এটা এমন সুস্পষ্ট বিষয়, যা কবুল করতে মানুষের কিছুমাত্র দ্বিধা থাকা উচিত নয়। অতএব তোমরা আদেশ মানতে ও সত্যের সম্মুখে মাথা নত করতে প্রস্তুত আছ কি? যদি থাক, তবে তো ভাল, নতুবা আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, সুতরাং আমি দায়মুক্ত– তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি (আল্লাহর বার্তা) তোমাদের সকলকে সমানভাবে জানিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের কেউই তা সম্পর্কে অনবগত নয়)'।

২. অর্থাৎ সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়ার পরও যদি তোমরা না মান, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, এখন আমি তোমাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট এবং তোমরা আমার থেকে ভিন্ন– তোমাদের আমল তোমাদের সাথে, আর আমার আমল আমার সঙ্গে। প্রত্যেকের পরিণতি শীঘ্রই সামনে এসে পড়বে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'উভয় দিক সমান অর্থাৎ এখন তোমরা উভয় দিকের যে কোনটি গ্রহণ করতে পার— ঈমান আনতে পার অথবা অস্বীকার করতে পার! আমার পক্ষ হতে কোন জবরদস্তি নেই।

وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

আর আমি জানি না যে, তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হয় তা কি আসন্ন না দূরে[১];

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. আল্লাহ সশব্দে বলা কথা জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন[২]।

وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾

১১১. আমি জানি না, হয়ত তা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ[৩]।

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. রাসূল বললেন, 'হে আমার রব! আপনি ইনসাফের সাথে ফয়সালা করুন[৪]। আর আমাদের রবই পরম দয়াময়, যিনি তোমরা যা-কিছু বল তার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনার স্থল[৫]।'

---

১. অর্থাৎ না মানলে আযাবের যে ওয়াদা আছে, তা তো অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু তা শীঘ্র হবে, না দেরিতে– তা আমি জানি না।

২. তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং এও জানেন যে, কোন্ কাজের কী প্রতিদান হওয়া উচিত এবং তা কখন দেওয়া উচিত।

৩. অর্থাৎ আযাব আসতে যে বিলম্ব হচ্ছে, তার দ্বারা হয়ত তোমাদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য যে, তোমরা এ সময়ের মধ্যে সত্য বুঝে নিয়ে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হও কি না? আবার এটাও হতে পারে যে, তোমাদের অবকাশ দেওয়া উদ্দেশ্য, যেন তোমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত থেকে গোনাহর পাল্লা আরো ভারী করে নাও।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করাই আপনার নীতি, তাই সে অনুসারেই আমার ও আমার জাতির মধ্যে অতি সত্বর ফয়সালা করে দিন।

৫. অর্থাৎ তাঁরই নিকট আমরা ফয়সালা চাই এবং কাফেরদের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। অন্য নবীগণও (আলাইহিমুস সালাম) এ ধরনের দো'য়াই করতেন। যেমন- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ (হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দিন। আর আপনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। –সূরা আ'রাফ, আয়াত ৮৯)। কেননা, নিজেদের সত্যতা এবং আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের উপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল।

সূরা হজ্জ

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ২২ । ৭৮ আয়াত । ১০ রুকূ । মাদানী

آياتها ٧٨، ركوعاتها ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ①

১. হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর, নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ জিনিস!

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

২. যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী যাকে সে দুধ পান করায় তাকে পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, আর মানুষকে দেখে তোমার মনে হবে, তারা নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর[১]।

১. কিয়ামতের মহা প্রকম্পন দু'টি। একটি হবে একেবারে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়, অথবা শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর। আরেকটি হবে কিয়ামতের কিছু পূর্বে, আর এটি কিয়ামতের লক্ষণসমূহের অন্যতম। এখানে যদি দ্বিতীয় প্রকম্পন উদ্দেশ্য হয়, তবে আয়াতের জাহেরী অর্থই গ্রহণ করা হবে।

আর প্রথমটি উদ্দেশ্য হলে দুই অর্থের সম্ভাবনা আছে– **এক.** প্রকৃতই ভূকম্পন হবে এবং স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতী মহিলারা এই অবস্থায়ই হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। **দুই.** অথবা ভূকম্পন বলে কিয়ামতের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় অবস্থাসমূহ উদ্দেশ্য। এবং يوم ترونها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ الخ কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন ভয়াবহ অবস্থা ও বিভীষিকা হবে যে, স্তন্যদানকারী মহিলারা বর্তমান থাকলে ভয়-বিহ্বলতার কারণে নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভুলে যেত এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ঘটে যেত।

আর তখন লোকেরা এমনি দিশাহারা হয়ে পড়বে যে, দর্শক তাদের নেশাগ্রস্ত মনে করবে অথচ নেশার নাম-গন্ধও থাকবে না, বরং আল্লাহর আযাবের চিন্তা এবং বিভীষিকাময় অবস্থা তাদের দিশাহারা করে তুলবে।

একটি সংশয়ের উত্তর

উল্লিখিত বিভীষিকার অবস্থা যদি সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ এ আয়াতের কারণে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। -এর উত্তর এই যে, এ আয়াতে অধিকাংশ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পেরেশান হবে না। আর বর্তমান আয়াতে যে

৩. আর কতক মানুষ এমন, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে না জেনে বিতর্ক করে[১] এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের[২]–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝

৪. যার ব্যাপারে এ কথা লিখে দেওয়া হয়েছে– যে ওকে বন্ধু বানাবে, তাকে সে গোমরাহ করবে এবং তাকে দোযখের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে[৩]।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

৫. হে মানুষ! তোমরা যদি পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হও, তবে (ভেবে দেখ–) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি[৪] মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে[৫], অতঃপর জমাট রক্ত

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ

অবস্থার উল্লেখ আছে, তার সম্পর্ক কিছু সময়ের সাথে। আর যদি বর্তমান আয়াত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে হয়, সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তবে আদৌ কোন সংশয় থাকে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ের বর্ণনা দেন, তাতে এরা দ্বন্দ্ব-কলহ করে, উদ্ভট তর্ক-বিতর্ক করে এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দ্বিধা-সন্দেহ প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ কিয়ামত, পুনরুত্থান ও কর্মফল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে যে, মানুষ মরে গিয়ে যখন পচে যাবে আর হাড়গুলি পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন সে কীভাবে পুনর্জীবিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে?

২. অর্থাৎ জিন কিংবা মানুষের মধ্য থেকে যে শয়তানই তাকে নিজের দিকে ডাকে, সে তৎক্ষণাৎ তার পিছনে ছোটে। কেমন যেন পথভ্রষ্ট হওয়ার পরিপূর্ণ যোগ্যতা সে রাখে! ফলে যে কোন শয়তান তাকে যে কোন দিকেই ডাকুক, সে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

৩. অর্থাৎ অবাধ্য শয়তানের ক্ষেত্রে এটা সুনিশ্চিত যে, যে কেউ ওর সাথে বন্ধুত্ব ও ওর অনুসরণ করবে, তাকে ও নিজের সাথে নিয়ে ডুববে এবং দোযখে না নিয়ে ছাড়বে না।

৪. অর্থাৎ তোমাদের যদি সন্দেহ হয় যে, (হাড়গুলি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কীভাবে জীবিত হবে, তবে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখ, কেমন করে তা হল?

৫. অর্থাৎ প্রথমে তোমাদের আদিপিতা আদমকে মাটি থেকে, তারপর তোমাদেরকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথবা অর্থ এই যে, মাটি থেকে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন, যা থেকে বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে শুক্র তৈরি হয়। অতঃপর শুক্র থেকে আরো কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে তোমাদের আকার-আকৃতি তৈরি হয় ও সৃষ্টি সাধিত হয়।

مُضۡغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَیۡرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمۡ ؕ وَنُقِرُّ فِی الۡاَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ثُمَّ نُخۡرِجُکُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوۡۤا اَشُدَّکُمۡ ۚ وَمِنۡکُمۡ مَّنۡ یُّتَوَفّٰی وَمِنۡکُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِکَیۡلَا یَعۡلَمَ مِنۡۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَیۡـًٔا ؕ وَتَرَی الۡاَرۡضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡهَا الۡمَآءَ اهۡتَزَّتۡ

থেকে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতির মাংসপিণ্ড থেকে[১], যাতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট করি[২]। আর আমি যাকে ইচ্ছা, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মায়ের) গর্ভে স্থিত রাখি[৩]। তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করে আনি, অনন্তর (তোমাদের বাঁচিয়ে রাখি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। আর তোমাদের মধ্যে কতকের (আগেই) মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউ কাউকে পৌছানো হয় নিকৃষ্টতম বয়সে (অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ ও অকর্মন্য বয়সে), যেন সে বোঝার পর কিছু না বোঝে[৪]। আর তুমি ভূমিকে শুষ্ক অবস্থায় দেখ। অতঃপর আমি যখন তার উপর পানি বর্ষণ করি, তা সজীব ও

---

১. অর্থাৎ শুক্র থেকে জমাট রক্ত এবং রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মানুষের পূর্ণ আকৃতি (হাত, পা, চোখ, নাক প্রভৃতি) বানিয়ে দেওয়া হয়। আর পূর্বে একটা সময় এমন রয়েছে, যখন পূর্ণ আকৃতি থাকে না। অথবা অর্থ এই যে, কতকের সৃষ্টি পূর্ণ করে দেওয়া হয় আর কতকের অপূর্ণ অবস্থায়ই গর্ভপাত হয়ে যায়। অথবা এমনও বলা যায় যে, কতক মানুষ ত্রুটিহীন এবং কতক ত্রুটিযুক্ত আকারে জন্ম নেয়।

২. অর্থাৎ এটা স্পষ্ট করি যে, স্বয়ং তোমাদের মূল কী ছিল? এবং কত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা মানুষরূপে সৃষ্টি হয়েছ। বস্তুত এটাই সেই বিষয়, যা বুঝতে পারলে অনেক সত্য ও রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান যে সম্ভব, তা (দুনিয়াতেই) বুঝে আসবে।

৩. অর্থাৎ যাকে যতদিন মাতৃগর্ভে রাখা সংগত, ততদিনই রাখা হয়, তথা– কমপক্ষে ছয় মাস এবং বেশির পক্ষে দুই বছর বা চার বছর।

৪. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যেমন অনেক স্তর ও অবস্থা অতিক্রম করে, তদ্রূপ বাইরে এসেও ক্রমান্বয়ে বহু পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে শৈশবকাল, যখন মানুষ একেবারে দুর্বল ও অক্ষম থাকে এবং তার সমস্ত শক্তি সুপ্ত থাকে। তারপর এক সময় আসে, তখন সুপ্ত শক্তিসমূহ প্রকাশ পায় এবং দৈহিক দিক দিয়ে প্রত্যেক জিনিস পূর্ণ যৌবনে পৌছে যায়। অতঃপর কেউ যৌবনেই মরে যায়; আর কেউ এমন বার্ধক্যে পৌছে, যখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য জওয়াব দিয়ে দেয়, অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান হওয়ার পর বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে এবং কর্মোপযোগী হওয়ার পর কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, মুখস্ত বিষয় ভুলে যায় এবং জানা বিষয় না জানা হয়ে যায়, যেন বুড়ো হয়ে পুনরায় শিশু হয়ে যায়।

وَرَبَتْ وَأَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝

স্ফীত হয়ে ওঠে এবং উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ[১]।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনি মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান;

وَأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

৭. এবং এজন্য যে, কিয়ামত আসবেই, তাতে সন্দেহ নেই এবং এজন্য যে, যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন[২]।

---

১. অর্থাৎ যমীন মৃতাবস্থায় পড়ে থাকে, রহমতের বৃষ্টি পড়তেই তা জীবিত হয়ে ওঠে এবং সতেজ হয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। মৃত ধরণীর বুক সুজলা হওয়ামাত্র শস্যশ্যামলাহয়ে ওঠে। আল্লাহর কুদরতের হাতে রকমারী, সুদৃশ্য, মনোমুগ্ধকর তরুলতা ও গাছ-গাছড়া অঙ্কুরিত হয়।

২. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি ও তৃণ-লতা অঙ্কুরিত হওয়ার যে উদাহরণগুলি পূর্বে বর্ণিত হল, তা থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হল। এক– নিশ্চয় আল্লাহ বিদ্যমান, নতুবা এরূপ সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও বিজ্ঞানময় কারিগরিসমূহ কীভাবে প্রকাশ পেল? দুই– আল্লাহ তাআলা মৃত ও নির্জীব জিনিসকে জীবিত ও সজীব করে তোলেন। যেমন: শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করা এবং মৃত ও নির্জীব যমীনে তৃণ-লতা উৎপন্ন করে দেওয়া এর জীবন্ত সাক্ষী। অতএব দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তিন– তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। যদি সবকিছু তাঁর ক্ষমতাধীন না হত, তবে কিছুতেই এসব কাজ করতে পারতেন না।

চার– কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং এ জীবনের পরে আর একটি জীবন অবশ্যই আসবে। কেননা, এত বিরাট বিশ্বব্যবস্থা অযথা ও নিরর্থক হতে পারে না। যে প্রজ্ঞাময় অধিপতি ও সর্বশক্তির অধিকারী তাঁর পরিপূর্ণ হেকমত ও নিরঙ্কুশ শক্তি বলে মানুষকে এরূপ বিরল ও বিস্ময়কর গুণাবলিসহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে অহেতুক সৃষ্টি করেছেন বলে ধারণা করা যায় কি? কশ্মিনকালেও না, বরং মানুষের এ সসীম জীবন, যেখানে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ পরস্পর মিশ্রিত থাকে এবং পরীক্ষা ও প্রতিশোধের ক্ষেত্রগুলির একটি অন্যটি থেকে সুস্পষ্টরূপে পৃথক হয় না– এর দাবি এই যে, দ্বিতীয় আর একটি জীবন হোক, যেখানে ভাগ্যবান ও হতভাগা, পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা স্পষ্টরূপে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেককেই সেই স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, যেখানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার যোগ্যতা সে নিজের মধ্যে রাখে (এটাই পরকালীন জীবন)।

বস্তুগত দিক থেকে বীর্যের যেসব অংশে শুক্র সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা ছিল, তা থেকে শুক্র তৈরি হল। অতঃপর শুক্রের সুপ্ত শক্তিগুলি জমাট রক্তে, জমাট রক্তের শক্তিগুলি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডের শক্তিগুলি শিশুর মধ্যে এল, আর যৌবনের সময় সেই শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ঘটল। তদ্রূপ মাটির গোপন শক্তিগুলি বৃষ্টিপাতের ফলে প্রকাশ পেল। ঠিক তেমনি

৮. আর মানুষের মধ্যে কেউ এমন, যে আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে বিনা জ্ঞানে, বিনা প্রমাণে ও বিনা উজ্জ্বল কিতাবে[১]—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

৯. নিজের ঘাড় বাঁকিয়ে[২], যাতে (লোকদের) আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তার জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা, আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব[৩]।

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১০. (তাকে বলা হবে,) 'এ (শাস্তি) সেসব কর্মের কারণে, যা তুমি নিজে ইতিপূর্বে করেছ, এবং এ কারণে যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন[৪]।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

[রুকূ - ২]

১১. আর মানুষের মধ্যে কেউ এমন, যে আল্লাহর ইবাদত করে কিনারায় থেকে। তো, যদি

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ

এটাও জরুরী যে, মানুষের মধ্যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যে আত্মিক শক্তিগুলি গচ্ছিত আছে অথবা ভাল ও মন্দের মধ্যে বেড়ে ওঠা ও বৃদ্ধি পেতে থাকার যে বিরাট শক্তি রাখা হয়েছে, তা তার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছবে এবং পরিপূর্ণ আকার-আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। এরই নাম মৃত্যু-পরবর্তী পুনর্জীবন, যা দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তিতে প্রকাশ পাবে।

১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-বুদ্ধি থাকার পরও কোন কোন বক্র ও অবাধ্য লোক আল্লাহর বাণীসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া-কলহ করে কোন সনদ ছাড়া। তার নিকট না আছে কোন উপকারী ইলম, না আছে কোন জ্ঞানগত প্রমাণ বা ধর্মীয় দলীল। নিছক ধারণা-কল্পনার পিছনে পড়ে এমন বিবাদ করে।

২. অর্থাৎ অবজ্ঞা ও অহংকারের সাথে ঘাড় বাঁকিয়ে ঝগড়া করে।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া শুধু অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর বাণীসমূহ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং লোকদের ঈমান ও বিশ্বাসের পথ থেকে হটিয়ে দিতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করবেন, আর পরকালের আযাব তো আলাদা আছেই।

৪. অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার সময় বলা হবে, আল্লাহর তরফ থেকে কারো উপর কোন জুলুম ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে না, বরং তোমার নিজ হাতে কৃত কার্যকলাপের স্বাদই তুমি আজ ভোগ করছ।

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪

তার মঙ্গল লাভ হয়, তবে তার উপর (অর্থাৎ ইবাদতের উপর) স্থির হয়ে যায়; আর যদি তার উপর কোন আপদ পতিত হয়, তবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। সে দুনিয়াও হারাল এবং আখেরাতও; এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি[১]।

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫

১২. সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার ক্ষতিও করতে পারে না এবং তার উপকারও করতে পারে না; এ-ই চরম গোমরাহী[২]।

يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ⑬

১৩. সে তাকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকার থেকে অধিক নিকটবর্তী[৩]। কত মন্দ এই সাহায্যকারী এবং কত মন্দ এই সঙ্গী[৪]!

---

১. অর্থাৎ কোনো কোন মানুষ শুধু দুনিয়ার স্বার্থে দীন গ্রহণ করে এবং তার অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত থাকে– যদি দীনে প্রবেশ করে দুনিয়ার কল্যাণ দেখে, তবে বাহ্যত দীনের উপর কায়েম থাকে, আর কষ্টে পতিত হলে দীন ছেড়ে দেয়। ফলে একদিকে দুনিয়া যায়, অপরদিকে দীনও যায়।

(কিনারায় থেকে) অর্থাৎ তার অন্তর না এদিকে, না সেদিকে। যেমন: কেউ বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে– যখন ইচ্ছা পালিয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থ লাভ না হওয়ায় আল্লাহর বন্দেগী ছাড়ল। এখন সে এমন কিছুকে ডাকে যাদের ক্ষমতায় না আছে বিন্দুমাত্র কল্যাণ, আর না আছে অকল্যাণ। আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের যে জিনিস দেননি, তা কি তারা পাথর-মূর্তিদের থেকে হাসিল করবে? এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?

৩. অর্থাৎ মূর্তি থেকে কল্যাণ লাভের যে আশা, তা তো কাল্পনিক। কিন্তু এর পূজা-অর্চনার যে ক্ষতি, তা তো নিশ্চিত ও অকাট্য। সুতরাং কল্যাণ লাভের প্রশ্ন তো পরে, ক্ষতি তো এখনি নগদ হয়ে গেল।

৪. কিয়ামতের দিন যখন মূর্তিপূজার কুফল প্রকাশ্যে দেখতে পাবে, তখন মূর্তিপূজারীরাও বলবে– لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ অর্থাৎ যাদের থেকে বিরাট সাহায্য ও সহযোগিতার আশা ছিল, তারা অত্যন্ত মন্দ সহচর ও মন্দ সাহায্যকারী প্রমাণিত হল। কারণ, উপকার হওয়া তো দূরের কথা, তাদের কারণে উলটা ক্ষতি হল। কবি বলেন :

مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا ÷ موم سمجھا تھا ترے دل کو سو پتھر نکلا

১৪. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত[১]। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন[২]।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

১৫. যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) দুনিয়া ও আখেরাতে কিছুতেই সাহায্য করবেন না, সে আকাশ পর্যন্ত একটি দড়ি টানিয়ে নিক, অতঃপর (ওহীর ধারা) বন্ধ করে দিক! অনন্তর সে দেখুক– তার চেষ্টা-তদবীর তার আক্রোশ দূর করতে পারে কি না[৩]!

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝

('তোমার কাছে দয়ার আশা করেছিলাম, কিন্তু তুমি অত্যাচারী প্রমাণিত হলে। তোমার অন্তরকে মোমের মত মনে করেছিলাম, কিন্তু তা পাথরের মত কঠিন প্রমাণিত হল।')

১. বিতর্ককারী, অস্বীকারকারী ও সন্দেহবাদীদের আলোচনার পর বর্তমান আয়াতে মুখলিস মুমিনদের শুভ পরিণামের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

২. যাকে সমীচীন মনে করেন শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করেন– তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

৩. আয়াতে لن ينصره -এর মধ্যে ه যমীর বা সর্বনাম দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। বলতে গেলে তাঁর কথা কুরআন-পাঠকের মন-মস্তিষ্কে সর্বদা বিরাজমান থাকে। কেননা, তিনিই তো পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি (অতএব সর্বনাম দ্বারা যে তিনিই উদ্দেশ্য, পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারে)।

পূর্বা-পর সম্পর্ক ও মর্ম

ইতিপূর্বে মুমিনদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে যেন তাদের পয়গম্বরের ভবিষ্যতের উল্লেখ হল। সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ রাসূলের সঙ্গে ইহ ও পরকালীন সাহায্য ও বিজয়ের বিষয়ে যেসব ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কাফের ও হিংসুকেরা যতই আক্রোশ দেখাক না কেন এবং খোদায়ী সহায়তা বন্ধ করার যতই চেষ্টা-তদবীর করুক না কেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও সফলতা কোনক্রমেই বাধাগ্রস্ত হতে পারে না– তা নিশ্চিতরূপে আসবেই আসবে।

এতে যদি কাফের ও হিংসুকদের আক্রোশ বৃদ্ধি পায় এবং তারা মনে করে যে, আমরা কোন না কোন উপায়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে রহিত করতে পারব, তবে একটি দড়ি উপরে লটকিয়ে

১৬. এভাবেই আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমগ্ররূপে; তবে (কথা হল), আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করেন[১]।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ۝

১৭. যারা মুমিন ও যারা ইহুদী, এবং সাবী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক- নিশ্চয় আল্লাহ এদের (সকলের) মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন[২];

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٔيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তা গলায় বাঁধুক এবং ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করুক। অথবা সম্ভব হলে আসমান পর্যন্ত একটি দড়ি টানিয়ে নিক এবং উপরে গিয়ে আসমানী সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে আসুক। তারপর দেখুক, এ সকল তদবীরের দ্বারা সেই জিনিসের আগমন বন্ধ হয় কি না, যার জন্য ওদের এত আক্রোশ ও জ্বালা-যন্ত্রণা।

ভিন্ন ব্যাখ্যা

অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতের এ তাফসিরই করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) এ আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াত – وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ এর সাথে সংযুক্ত ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে أن لن ينصره الخ এর কর্মবাচক সর্বনাম من كان يظن-কেই নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, দুনিয়ার কষ্টের কারণে যে কেউ আল্লাহর প্রতি নিরাশ হয়ে তাঁর বন্দেগী ছেড়ে দেয় এবং মিথ্যা দেব-দেবীর পূজার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে দিলকে শান্ত করার জন্য এ উদাহরণ নিয়ে ভাবুক- যেমনঃ এক ব্যক্তি উপরে প্রলম্বিত একটি দড়িতে ঝুলছে এবং উপরে চড়তে না পারলেও তার আশা আছে যে, দড়িটিকে উপরে টানা হলে সে উপরে উঠতে পারবে। কিন্তু দড়িটি কেটে দেওয়া হলে আর কোন আশাই থাকবে না।

তদ্রূপ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেলে কামিয়াবী পাওয়ার কোন আশাই আর থাকবে না। দৃষ্টান্তটিতে যেন আল্লাহর নিকট আশা করাকে দড়ির সাথে লটকে থাকা, নিরাশ হওয়াকে দড়িটি কর্তন করে দেওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর আসমানের দ্বারা উপরকে বোঝানো হয়েছে। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

১. অর্থাৎ খুবই পরিষ্কার দৃষ্টান্ত ও সুস্পষ্ট কথা বর্ণিত হল। কিন্তু বোঝে তারাই, যাদের আল্লাহ তাআলা জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন।

২. 'মাজূস' (المجوس) একটি সম্প্রদায়, যারা আগুনের পূজা করে এবং দুই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে– একজন কল্যাণের স্রষ্টা, যার নাম 'ইয়াযদান' এবং দ্বিতীয়জন অকল্যাণের, যাকে 'আহরামান' বলে। তারা একজন নবীর নামও নিয়ে থাকে। এরা কি গোড়া থেকেই ভ্রান্ত ও অগ্নিপূজক ছিল, না (শুরুতে তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিলো), পরবর্তী কালে ভ্রষ্ট হয়েছে– তা জানা

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

আল্লাহ তো সকল বস্তুর সম্যক দ্রষ্টা[১]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾

১৮. তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু ও বহু মানুষ[২]? এবং বহু মানুষ এমন, যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে[৩]। আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন, তার কোন সম্মানদাতা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন[৪]।

নেই। ইমাম শাহ্‌রাস্তানী (র.) 'আলমিলাল্ ওয়ান্ নিহাল্' গ্রন্থে এদের ধর্মের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তা দ্রষ্টব্য।

আর 'সাবী'দের সম্পর্কে ইতিপূর্বে (বাকারা, ৬২ ও মায়েদা, ৬৯) আলোচনা করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সকল ধর্ম ও ফেরকার বিরোধ-বিবাদের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে, আর সকলকে আলাদা আলাদা করে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। কে কোন্ স্থানের এবং কোন্ শাস্তির যোগ্য, তা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২. এক সেজ্‌দা এমন, যার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সকল মাখলুক শামিল রয়েছে। তা এই যে, সৃষ্টিগতভাবে সকলেই আল্লাহর ক্ষমতার সম্মুখে অনুগত ও বাধ্য এবং অক্ষম ও অসহায়। সকলকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর সামনে মাথা নত ও বশ্যতা স্বীকার করতে হয় (একেই সেজ্‌দা শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে)। দ্বিতীয় সেজ্‌দা এমন যে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। তা এই যে, যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার তাতে রত হওয়া। অনেক মানুষ এ সেজদা করে, অনেকে করে না। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য সব সৃষ্টি তা করে থাকে।

এ হিসাবে إن الله يسجد له الخ আয়াতে প্রত্যেকের স্বীয় শান্ অনুযায়ী সেজ্‌দা উদ্দেশ্য হবে। অথবা من في الأرض এর পরে দ্বিতীয় يسجد উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ ... ويسجد الشمس

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে বর্তমান আয়াতের সামাঞ্জস্য এই যে, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা পরস্পর মতভেদ করে, অথচ অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য। সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষের উচিত ছিল, অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৩. অর্থাৎ সেজদা করতে অস্বীকার করা এবং তা থেকে বিরত থাকার কারণে তারা শাস্তির যোগ্য।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে তারই দুষ্কর্মহেতু লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেন, তাকে লাঞ্ছনার গর্ত থেকে উদ্ধার করে মর্যাদার আসনে কে বসাবে?

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ⑲

১৯. এরা দু'টি পক্ষ, যারা তাদের রব সম্বন্ধে বিবাদ করে[১]। অতএব যারা কাফের, ওদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে[২], ওদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি-

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ⑳

২০. যার দ্বারা ওদের পেটে যা-কিছু আছে তা এবং চামড়া গলে যাবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ㉑

২১. ওদের জন্য আরো রয়েছে লোহার হাতুড়ি[৩]।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ

২২. যখনই ওরা যন্ত্রণার কারণে দোযখ থেকে বের হতে চাইবে, ওদের তার ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং (বলা হবে), তোমরা জ্বলন্ত

১. অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ الخ আয়াতে যেসব সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের সকলকে হক ও বাতিলের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি দলে ভাগ করা যেতে পারে- একটি মুমিনদের দল, যারা আপন প্রভুর সকল কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং তাঁর বিধানের সামনে সেজদাবনত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি কাফেরদের দল, যাদের মধ্যে ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, মুশরিক, সাবী ও অন্য সকল কাফের শামিল রয়েছে- যারা প্রভু-পরওয়ারদেগারের হেদায়েত কবুল করে না এবং তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে না।

এই দুই দল দাবি-দাওয়া, বিতর্ক এবং জেহাদ ও যুদ্ধে একে অপরের বিরোধিতা করে থাকে। যেমন: বদরের রণক্ষেত্রে হযরত আলী, হযরত হামযা ও উবায়দা বিন হারেছ রাযিয়াল্লাহু আনহুম তিন কাফের- (উতবা ইবনে রবীআ, শাইবা ইবনে রবীআ ও ওলীদ ইবনে উৎবা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সামনে উভয় দলের পরিণতি বর্ণিত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ পোশাক যেমন মানুষের দেহ ঢেকে রাখে, তদ্রূপ জাহান্নামের আগুন ওদের ঘিরে রাখবে। অথবা অর্থ হল- এমন বস্তুর পোশাক ওদের পরানো হবে, যা আগুনের চেয়ে অধিক গরম এবং দ্রুত দহনকারী হবে।

৩. দোযখীদের মাথা হাতুড়ি দ্বারা ফাটিয়ে দিয়ে উপর থেকে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, যা মগজের মধ্য দিয়ে পেটে পৌঁছবে। ফলে, ভিতরের নাড়ি-ভুঁড়ি সব কিছু গলে বের হয়ে পড়বে। আর শরীরের বাহিরের অংশে যখন পানির ছোঁয়া লাগবে, তখন দেহের চামড়া গলে যাবে। অতঃপর ওদের দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বারবার একই শাস্তি দেওয়া হবে- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ (যখনই ওদের চামড়া পুড়ে যাবে, আমি তার বদলে ওদের অন্য চামড়া দেব, যাতে ওরা অনবরত শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে। -সূরা নিসা, আয়াত ৫৬)

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করতে থাক[১]।

[রুকূ - ৩]

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

২৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেথায় তাদের সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হবে[২] এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের[৩]।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوْٓا

২৪. আর তাদেরকে পবিত্র কথার তাওফীক দান করা হয়েছে[৪] এবং তাদের প্রদর্শন করা

১. অর্থাৎ দোযখের মধ্যে ছটফট করতে করতে কোথাও ভেগে যেতে চাইবে, আর অগ্নিশিখা ওদের উপরের দিকে ঠেলে দিবে। তখন ফেরেশতাগণ লোহার গদা দ্বারা প্রহার করে ওদের নীচে নিক্ষেপ করবেন এবং বলা হবে, চিরকাল আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাক, এ থেকে কস্মিনকালেও বের হতে পারবে না। (আল্লাহর পানাহ!)

২. অর্থাৎ, তারা বিপুল সাজসজ্জা ও শোভাসৌন্দর্যের ভিতর থাকবে এবং সর্বদিক দিয়ে শানশৌকত ও আরাম-আয়েশের ভাব প্রকাশ পাবে।

৩. ইতিপূর্বে قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ আয়াতাংশে দোযখীদের পোশাকের বর্ণনা ছিল। তার বিপরীতে এখানে বেহেশতীদের পরিচ্ছদের কথা বলা হচ্ছে যে, তাদের পোশাক হবে রেশমের।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এই যে বলা হয়েছে, স্বর্ণ ও রেশম সেখানে তথা বেহেশতে প্রদান করা হবে, এতে বোঝা গেল– দুনিয়াতে এ দুটি বস্তু পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। আর বালা এজন্য পরানো হবে যে, দাসের খেদমতে মনিব খুশি হলে তাকে বালা পরানো হয়।'

বি. দ্র. হাদীসসমূহে আছে, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমের পোশাক পরবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস : ৫৮৩২)

পরিধানকারী যদি কাফের হয়, তবে তো সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে না, ফলে জান্নাতীদের পোশাকও পরতে পারবে না। আর পরিধানকারী যদি মুমিন হয়, তবে সম্ভবত কিছু কাল উক্ত পোশাক থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হবে, এর পর অনন্তকালের জন্য পরতে থাকবে। আর অনন্তকালের মোকাবেলায় এ স্বল্পকাল খুবই নগণ্য। (যা হোক, যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে– প্রত্যেক মু'মিন পরকালে জান্নাতে রেশমের পোশাক অবশ্যই পরবে)।

৪. এ তাওফীক দুনিয়াতেও পেয়েছে। কারণ, তারা কলেমা لا إله إلا الله বলেছে, পবিত্র কুরআন পড়েছে, আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করেছে, এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে

اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

হয়েছিল সকল প্রশংসার অধিকারীর (অর্থাৎ আল্লাহর) পথ[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ

২৫. নিশ্চয় (তারা কঠোর শাস্তির উপযুক্ত), যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, আর (মানুষকে) বাধা দেয় আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে, যা আমি সকল মানুষের জন্য এভাবে বানিয়েছি যে, তাতে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয়ই সমান[২]।

নিষেধ করেছে। আর আখেরাতেও এই সৌভাগ্য এভাবে লাভ হবে যে, ফেরেশতাগণ সকল দিক থেকে এসে তাদের সালাম করবেন (আর তারা এর উত্তর দেবে) এবং তারা পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে পবিত্র কথা-বার্তা বলবে। জান্নাতে আজেবাজে কথাবার্তা হবে না। তাছাড়া জান্নাতের অফুরন্ত নে'য়ামতের জন্য তারা আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকবে, যেমন বলবে- الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض (আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদের এই যমীনের অধিকারী বানিয়েছেন। –যুমার, ৭৪) আর সূরা 'ফাতের'-এ আছে- يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ الخ (সেখানে তাদের পরানো হবে সোনার বালা ও মুক্তা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। আর তারা বলবে, 'আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করেছেন... –আয়াত ৩৩-৩৪)। এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান আয়াতের তাফসীর হয়। ('রূহুল মা'আনী'তে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)

১. অর্থাৎ তারা দীনে ইসলাম লাভ করেছে, যা আল্লাহর পথ। এ পথ এবং এ পথের মালিক উভয়ই প্রশংসিত। অথবা অর্থ এই যে, তারা সেই স্থানের খোঁজ পেয়েছে, যেখানে পৌঁছে মানুষ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে।

২. ইতিপূর্বে هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا الخ আয়াতে (১৯) মুমিন ও কাফেরদের বিরোধ-বিবাদের উল্লেখ ছিল, এরই কিছু নমুনা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এমন লোকও রয়েছে, যারা নিজেরা তো গোমরাহ হয়েছেই। সেই সাথে অন্যদেরও সৎপথে চলতে বাধা দেয়। এই কাফেররা চায়, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে না চলুক। এমন কি যে সকল মুসলমান নিজেদের পয়গম্বরের সঙ্গে উমরা আদায় করার জন্য মক্কা শরীফে যাচ্ছিলেন, তাদের পথিমধ্যে বাধা দিল। অথচ মসজিদুল হারাম (বা হরম শরীফের যে অংশের সাথে মানুষের ইবাদত ও হজের সম্পর্ক, তা) সকলের জন্যই একরকম– যেখানে দেশি-বিদেশি ও মুকীম-মুসাফির সকলের থাকার ও ইবাদত করার সমান অধিকার রয়েছে। হাঁ, সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার উপযুক্ত কেবল তারাই, যারা শিরক ও দুষ্কৃতি করে এই পবিত্র ভূখণ্ডের সাথে বেআদবী করে।

আর যে ব্যক্তি তাতে অন্যায়ভাবে বক্রতার ইচ্ছা করবে, তাকে আমি যাতনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাব[১]।	وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۝

[রুকূ - ৪]

২৬. (স্মরণ কর), যখন আমি ইবরাহীমকে বাইতুল্লাহর স্থান জানিয়ে দিলাম[২] (এবং তাঁকে আদেশ করলাম) যে, আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না[৩] এবং আমার গৃহ পবিত্র রাখ– তওয়াফকারী, কিয়ামকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য[৪]।	وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۝

বি. দ্র. মক্কার ঘরবাড়ীর স্বত্বাধিকার এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির মাসলাটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। 'রূহুল মাআনী' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, এখানে সেই সুযোগ নেই।

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে স্বেচ্ছায় হরম শরীফে দীনবিরোধী কোন কিছু ও দুষ্কৃতি করবে, তাকে অন্যত্র এরূপ কাজ করার যে শাস্তি, তার চেয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এ থেকেই তাদের শাস্তি বুঝে নাও, যারা জুলুম ও দুষ্কৃতিপূর্বক মুসলমানদের এখানে আসতে বাধা দেয়।

২. কাবা শরীফের স্থান আদিকাল থেকেই ছিল সম্মানিত। তবে কালক্রমে তার চিহ্ন মুছে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি নির্দেশ আসে, বাইতুল্লাহ নির্মাণ কর। তখন এই পবিত্র স্থানের চিহ্ন তাঁকে দেখানো হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতে 'মসজিদুল হারামের' উল্লেখ হয়েছিল বলে বর্তমান আয়াতগুলিতে প্রসঙ্গত কাবা শরীফের নির্মাণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেক দূর পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্কিত আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এই ঘরের বুনিয়াদ (ভিত্তি) খালেস তাওহীদের উপর রাখ, যেন কোন মানুষ এখানে এসে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কোন শিরকী কাজ না করতে পারে।

কিন্তু মক্কার কাফেররা এমনি কাজ করল যে, এখানে তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপন করল। আল্লাহর পানাহ! অবশেষে নবী আলাইহিস সালাম আগমন করে চিরকালের জন্য তাদের অপবিত্রতা থেকে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করলেন।

৪. অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শুধু এ লোকদের জন্যই খোলা থাকবে, আর অন্য সব লোক থেকে তাকে পবিত্র রাখতে হবে (অর্থাৎ অমুসলিমরা প্রবেশ করবে না– অনুবাদক)।

وَاَذِّنۡ فِی النَّاسِ بِالۡحَجِّ یَاۡتُوۡكَ رِجَالًا وَّعَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ یَّاۡتِیۡنَ مِنۡ كُلِّ فَجٍّ عَمِیۡقٍ ﴿۲۷﴾

২৭. আর তুমি মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে চলে আসবে পদব্রজে ও প্রতিটি ক্ষীণকায় উটের উপর আরোহণ করে, যে উটগুলি প্রত্যেক দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে আসবে[১]–

لِّیَشۡهَدُوۡا مَنَافِعَ لَهُمۡ وَیَذۡكُرُوا اسۡمَ اللّٰهِ فِیۡۤ اَیَّامٍ مَّعۡلُوۡمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمۡ مِّنۡۢ بَهِیۡمَةِ الۡاَنۡعَامِ ۚ

২৮. যাতে তারা তাদের বহুবিধ কল্যাণের কাছে উপস্থিত হতে (ও তা অর্জন করতে) পারে[২] এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে চতুষ্পদ গবাদি পশুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে, যা তিনি তাদের দিয়েছেন[৩]। অতএব তোমরা তা

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পূর্ববর্তী উম্মতদের নামাযের মধ্যে রুকূ ছিল না। এটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদিয়ার নামাযে আছে। সুতরাং এ আয়াতে ইশারা আছে যে, তারাই পরবর্তী কালে বাইতুল্লাহর আবাদকারী হবে। وفيه نظر فتأمل ('এ কথায় আপত্তি আছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে তা বুঝে আসবে')।

১. যখন কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল, এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ডাকলেন, 'হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন। সুতরাং হজ করতে আস।'

আল্লাহ তাআলা এই আওয়াজ চতুর্দিকে প্রত্যেক রূহকে পৌঁছিয়ে দিলেন (যেমন বর্তমান যুগে আমরা ঘরে বসে সুদূর লন্ডন-আমেরিকার খবর শুনতে পাই।) যার ভাগ্যে হজ লেখা ছিল, তার আত্মা 'লাব্বাইক' বলল। এই সুপ্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ যে, হাজারো মানুষ পদব্রজে বহু কষ্টে সেখানে উপস্থিত হয় এবং অনেকে এত দূরদূরান্ত থেকে আসে যে, চলতে চলতে তাদের উটনী ক্লান্ত-শ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। (তখনকার দুর্দিনে) সাধারণত সব হাজীরা উত্তম উটনী পেতেন না। তাই পাতলা-দুর্বল উটনীতে আরোহন করেই মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে আসতে হত। এ যেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিম্ন লিখিত দোয়ারই ফসল - فَاجۡعَلۡ اَفۡـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ (আপনি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। –সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৭)

২. হজে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য দীনী ও পরকালীন উপকার ও কল্যাণ হাসিল করা। অর্থাৎ হজ, উমরা ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং রূহানী উন্নতির সোপানে আরোহণ করা। তদুপরি হজকেন্দ্রিক আজীমুশ্শান সমাবেশের মধ্য দিয়ে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপকারিতাও হাসিল করা যেতে পারে।

৩. أيام معلومات (জানা কয়েকটি দিন) দ্বারা কারো কারো মতে যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন, আর কারো কারো মতে কুরবানীর তিন দিন উদ্দেশ্য। যা হোক, এই দিনগুলিতে আল্লাহর

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

থেকে আহার কর এবং দুস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও[১]।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূরণ করে এবং এই প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে[২]।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ

৩০. এসব (বিধান তো শুনলে)। আর যে কেউ আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহের সম্মান করবে, তার জন্য তার রবের কাছে তা অতি উত্তম।[৩] আর তোমাদের জন্য গবাদি পশু

যিকিরের বড়ই ফযীলত রয়েছে। কুরবানীর জন্তুসমূহ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া এবং بسم الله الله أكبر বলা এই যিকিরের বিশেষ অংশ। এ দিনগুলিতে আল্লাহর নামে (কুরবানীর জন্তু) যবেহ করাই উত্তম আমল।

১. কতক কাফেরের ধারণা ছিল, কুরবানীর গোশত স্বয়ং কুরবানীদাতার না খাওয়া উচিত। এ ধারণার সংশোধন করার জন্য বলা হচ্ছে, 'আগ্রহের সাথে তা খাও, বন্ধু-বান্ধবদের দাও এবং বিপদগ্রস্ত অভাবীদের খাওয়াও।'

২. হজের এহরাম বাঁধা এবং লাব্বাইক বলা শুরু করার পর হাজীরা হাজামত (ক্ষৌরকার্য) করে না, নখ কাটে না, চুলে তেল দেয় না। শরীরে ধূলা-বালি পড়ে ময়লা জমে যায়, বেশি ঘষা-মাঝা করেও গোসল করে না– এক আজীব প্রেমময় ও আত্মহারা অবস্থা প্রকাশ পেতে থাকে। জিলহজের দশ তারিখে এসব অবস্থার পরিসমাপ্তি হয়– হাজামত করে, গোসল করে, সেলাই করা কাপড় পরে, তারপর তওয়াফে-যিয়ারত করতে যায়। যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, সে প্রথমেই যবেহ্‌র কাজ সেরে নেয়।

আর وليوفوا نذورهم-এর অর্থ এই যে, নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য যেসব মানত করেছিল, তা পূর্ণ করা উচিত। আর মানত আল্লাহর নামেই করতে হয়, অন্য কারো নামে নয়। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, نذور শব্দ দ্বারা হজের কার্যাদি ও হজের ওয়াজিবসমূহ উদ্দেশ্য। এ অর্থই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। والله أعلم

বি. দ্র. عتيق শব্দের অর্থ পুরাতন । আর কারো কারো মতে بيت عتيق এ জন্য বলা হয়েছে যে, এ ঘরকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে শক্তিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, আল্লাহ তাআলা ওকে সফল হতে দেবেন না, যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং তা তুলে নিতে মনস্থ করবেন।

৩. অর্থাৎ হারাম বিষয়াদিকে গুরুতর মনে করে তা বর্জন করা এবং আল্লাহ যেসব বিষয়কে সম্মানিত সাব্যস্ত করেছেন, তার আদব ও মর্যাদা রক্ষা করা বড় পুণ্যের কাজ, যার পরিণাম অত্যন্ত ভাল। কুরবানীর জন্তু, বাইতুল্লাহ, সাফা-মারওয়াহ, মিনা, আরাফাত, সকল মসজিদ,

হালাল করা হয়েছে[১]– সেগুলি ছাড়া, যা তোমাদের পড়ে শোনানো হয়[২]। অতএব তোমরা অপবিত্রতা অর্থাৎ মূর্তিগুলি থেকে দূরে থাক[৩] এবং বেঁচে থাক মিথ্যা কথা থেকে[৪]—	وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝
৩১. এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সঙ্গে শিরক না করে[৫]। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর	حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

কুরআন, বরং সকল খোদায়ী আহকাম –এ সবই সম্মানিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত । তবে এখানে বিশেষভাবে মসজিদুল হারাম ও কুরবানীর জন্তুকে মর্যাদাদানের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে একক আল্লাহর ইবাদতকারীদেরকে বাইতুল্লাহয় যেতে বাধা না দেওয়া হয় এবং কুরবানীর নিয়তে আনীত জন্তুগুলিকে ফেরত যেতে বাধ্য না করা হয়, বরং মূল্যবান ও মোটাতাজা পশু কুরবানী করা হয়।

১. অর্থাৎ এসব পশু যবেহ করা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়াদির মর্যাদাপরিপন্থী নয়। কেননা, যে প্রভু এসব পশুর সম্মানের হুকুম দিয়েছেন, তাঁরই নির্দেশে এবং তাঁরই নামে এসব কুরবানী করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ যেসব জন্তুর হারাম হওয়ার কথা সময় সময় তোমাদের শোনানো হচ্ছে– যেমনঃ সূরা আনআমে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তা হালাল নয়।

৩. অর্থাৎ জীবজন্তু যেহেতু আল্লাহরই সৃষ্টি ও তাঁরই মালিকানাধীন, তাই তাঁর অনুমতিতে তাঁরই নামে যবেহ করা যেতে পারে এবং তাঁরই ঘরের নিয়ায হতে পারে। পক্ষান্তরে যে জন্তু কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হল, তা মৃতবৎ। এহেন শিরেকী কার্যক্রম ও অপবিত্র কাজকর্ম থেকে আত্মরক্ষা অত্যন্ত জরুরী।

৪. মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহর সৃষ্ট জীব-জন্তুকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা, কোন জিনিসকে শরী'য়তের দলীল ছাড়া হালাল বা হারাম বলা– এ সবই قول الزور এর অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা কথার ভয়াবহতা এ থেকেও বোঝা যায় যে, এস্থলে আল্লাহ তাআলা একে শিরকের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (–সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩৩)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসসমূহে অত্যন্ত তাকীদ ও কঠোরতার সাথে মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

৫. অর্থাৎ সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহমুখী থাক। তোমাদের কর্ম ও নিয়ত সবই নির্ভেজালভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হতে হবে।

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

সঙ্গে শির্‌ক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে (উড়িয়ে নিয়ে) কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল[১]।

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

৩২. এসব (বিষয় তো শুনলে)। আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করবে, তবে এ তো অন্তরের পরহেযগারীর দাবী*[২]।

১. এখানে শিরকের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। সারকথা এই যে, তাওহীদের আসন অনেক উঁচু ও বুলন্দ। মানুষ যখন তা ছেড়ে কোন সৃষ্টির সম্মুখে অবনত হয়, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং তাওহীদের সুউচ্চ আকাশ থেকে নিজেকে নীচের দিকে নিক্ষেপ করে। বলা বাহুল্য, এত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে সে জীবিত থাকতে পারে না। এখন হয় হীন জল্পনা-কল্পনা ও কুচিন্তা-কুপ্রবৃত্তির কাক-শকুন চতুর্দিক থেকে এসে ওকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খাবে, অথবা অভিশপ্ত শয়তান ঝড়ো বাতাসের ন্যায় ওকে উড়িয়ে নিয়ে এমন গহ্বরে নিক্ষেপ করবে যে, ওর (শবদেহের) হাড়-গোড় পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না (অর্থাৎ তাওহীদ ছাড়ার পর সে আর সরল পথের উপর থাকতে পারবে না, তাকে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান ধ্বংস করে ছাড়বে)।

অথবা এমন বলা যেতে পারে যে, দৃষ্টান্তের মধ্যে দুই ধরনের মুশরিকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যে মুশরিক শিরকের মধ্যে পরিপূর্ণ পাকা নয়, দোদুল্যমান– কখনো একদিকে, কখনো অন্য দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার অবস্থা হচ্ছে– فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ। আর যে মুশরিক নিজ শিরকের মধ্যে পরিপক্ব ও অটল, তার অবস্থা হচ্ছে– تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ এর মত। অথবা تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ দ্বারা মানুষের হাতে নিহত হওয়া এবং تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ দ্বারা স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ তাফসীরকার দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় এ সম্ভাবনাগুলিই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যার নিয়ত এক আল্লাহমুখী, সে অটল অবিচল। আর যার নিয়ত বহুমুখী, বহুজনে তাকে (পেরেশান করবে ও) বিভ্রান্ত করবে, অথবা সে সবকিছুকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে যাবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** অন্তরের পরহেযগারী থেকে উদ্ভূত।

২. অর্থাৎ 'শাআইরুল্লাহ' তথা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের তাজীম করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার অন্তরে পরহেজগারী এবং এক আল্লাহর ভয় থাকবে, সে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের সম্মান অবশ্যই করবে। এই সম্মান করা শিরক নয়, বরং এটি তাওহীদেরই একটি দাবী। কেননা, আল্লাহ-প্রেমিকরা প্রত্যেক এমন বস্তুর সম্মান করে, যা বিশেষভাবে আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

৩৩. তোমাদের জন্য গবাদি পশুতে নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; অতঃপর সেগুলির (কুরবানীর) স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট[১]।

[রুকূ - ৫]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা চতুষ্পদ গবাদি পশুর উপর (অর্থাৎ তা যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, যে পশুগুলি তিনি তাদের দান করেছেন। তোমাদের মা'বুদ এক মা'বুদ। অতএব তাঁরই আদেশ মান্য কর[২]। আর আপনি সুসংবাদ দিন বিনয়ীদের[৩]—

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى

৩৫. আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে, যারা তাদের উপর পতিত বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে[৪], নামায

---

১. 'প্রাচীন ঘর' হচ্ছে বাইতুল্লাহ শরীফ, আর এখানে সম্ভবত ব্যাপক অর্থে সমস্ত হরম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি থেকে তোমরা অনেক উপকার লাভ কর, যথা– আরোহণ করা, দুধ পান করা, এগুলির বংশ বৃদ্ধি করা, লোম ইত্যাদি ব্যবহার করা। কিন্তু এসব তখন পর্যন্ত করা যাবে, যতক্ষণ না ওদের هدي (বা কুরবানীর জন্য নির্ধারণ) করা হয়। هدي হয়ে যাওয়ার পর (নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া) এ ধরণের উপকার গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাকে কাবার কাছে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর নামে কুরবানী করে দিতে হবে। এটাই তার পরকালীন বড় উপকার।

২. অর্থাৎ আল্লাহর নামে চতুষ্পদ জন্তু কুরবানী করা প্রত্যেক আসমানী ধর্মেই ইবাদত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে এই ইবাদত কর, তবে তা শিরক হয়ে যাবে, যা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। তাওহীদপন্থীর কর্তব্য এই যে, একক আল্লাহর নামেই কুরবানী করবে, আর তাঁর হুকুমের বাইরে যাবে না।

৩. অর্থাৎ সেই লোকদের আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, যারা একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মান্য করে, তাঁর সম্মুখেই মাথা নত করে, তাঁরই সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁরই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

৪. অর্থাৎ ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট মোকাবিলা করে, কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে[১]।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৩৬. আর কুরবানীর উটগুলিকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছি। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। অতএব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা থেকে (নিজেরা) আহার কর[২] এবং ধৈর্যশীল (অভাবগ্রস্ত)-কে ও (অধৈর্য) যাচনাকারীকে আহার করাও[৩]। এভাবেই আমি সেগুলিকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শোকর কর[৪]।

---

১. বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে বহু বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া সফর অবস্থায় প্রায়ই নামায নষ্ট বা কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, ধন-সম্পদও যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। সম্ভবত এ জন্যই এখানে উপরোক্ত গুণাবলি ও স্বভাব-চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পূর্বে (আয়াত ৩২) সাধারণ 'শাআইরুল্লাহ' (আল্লাহর নিদর্শনাদি)-এর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের নির্দেশ ছিল। এখন পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে, উট প্রভৃতি কুরবানীর জন্তুও শাআইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। কুরবানীর জন্তু হিসাবে এগুলির মধ্যে এবং আদবের সাথে এগুলি কুরবানী করার মধ্যে তোমাদের জন্য ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে আল্লাহর পবিত্র নাম নিয়ে এগুলি যবেহ করা উচিত।

আর উট যবেহ করার উত্তম পন্থা হল 'নহর'– অর্থাৎ একে কেবলামুখী দাঁড় করিয়ে এবং ডান বা বাঁ দিকের এক হাত (অর্থাৎ সামনের এক পা) বেঁধে বুকের উপর ছুরি চালানো। সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়ার পর যখন তা পড়ে যাবে, তখন গোশত কাটবে। আর বহু সংখ্যক উট হলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নেবে।

৩. দু'শ্রেণীর অভাবীর কথা বলা হল। এক, যে ধৈর্যের সাথে বসে আছে, কিছু চায় না, অল্প পেলেও তুষ্ট হয়। দুই, যে অধৈর্য হয়ে চেয়ে বেড়ায়, কিছু পেলেও অস্থিরতা কাটে না।

৪. অর্থাৎ শরীর ও শক্তিতে তোমাদের তুলনায় অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও এমন বড় বড় জন্তুকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা এগুলির দ্বারা অনেক রকম উপকার পেয়ে থাক

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৩৭. আল্লাহর নিকট সেগুলির গোশত ও রক্ত পৌছে না, কিন্তু তাঁর নিকট পৌছে তোমাদের তাকওয়া[১]। এভাবেই তিনি সেগুলিকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, কেননা তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। আর আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন[২]।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে (শত্রুকে) প্রতিহত করবেন[৩]। আল্লাহ তো কোন

এবং কত সহজে এগুলি যবেহ করে থাক। এ আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ, তাই তাঁর শোকর আদায় করা উচিত। শিরক করে উলটা তাঁর না-শোকরীতে লিপ্ত হয়ো না।

১. এ আয়াতে কুরবানীর মূল দর্শন বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা পশু যবেহ করে শুধু গোশত খেলে ও খাওয়ালে অথবা তার রক্ত প্রবাহিত করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। না এই রক্ত ও গোশত উপরে উঠে তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌছে। তাঁর কাছে পৌছে তোমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও তাকওয়া-পরহেজগারী। তোমরা (মু'মিনরা) কতই না সন্তুষ্ট চিত্তে ও আল্লাহ-প্রেমের সাথে একটি মূল্যবান ও পবিত্র বস্তুকে তাঁরই অনুমতিক্রমে, তাঁর নামে, তাঁর ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে কুরবানী কর। কেমন যেন, এ কুরবানীর মাধ্যমে তোমরা (মু'মিনরা) একথা প্রকাশ করে দাও যে, আমরা নিজেরাও তোমার পথে (হে আল্লাহ) কুরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

তো, এই তাক্ওয়ারই উল্লেখ করা হয়েছে এই আয়াতে– وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ এবং এ তাক্ওয়ারই বদৌলতে খোদা-প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

২. (لتكبروا الله) -অর্থাৎ بسم الله الله اكبر اللّٰهُمَّ لك ومنك (আল্লাহর নামে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইয়া আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যে এবং তোমা থেকে)— বলে যবেহ কর এবং এ কথা ভেবে আল্লাহর শোকর কর যে, তিনি তোমাদেরকে মহব্বত ও দাসত্ববোধ প্রকাশের কী সুন্দর পথ বাতলে দিয়েছেন এবং একটি জন্তুর কুরবানীকে যেন স্বয়ং তোমাদের জান কুরবানী করার স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন।

৩. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতে (২৫) সেই কাফেরদের আলোচনা ছিল, যারা মুসলমানদেরকে হরম শরীফের যিয়ারত এবং হজ ও উমরা প্রভৃতি করতে বাধা দিত। মাঝখানে মসজিদুল হারাম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তাজীম ও আদবের আহকাম বর্ণিত হয়েছে। এখন পুনরায় আগের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না[১]।

[রুকূ - ৬]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

৩৯. যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হল, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে[২]– আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পরিপূর্ণ সক্ষম[৩]–

অর্থাৎ –মুসলমানরা নিশ্চিন্ত থাকুক, আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই শত্রুদের থেকে তাদের পথ নিরাপদ করে দেবেন। মসজিদুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে এবং এতদসংক্রান্ত হুকুম-আহকাম পালন করতে কোন বাধা থাকবে না– নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে মুসলমানগণ হজ ও উমরা পালন করতে পারবে। বস্তুত, وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ আয়াতাংশে যেসব সুসংবাদ দেওয়ার নির্দেশ ছিল, তারই একটি হচ্ছে এ সুসংবাদ।

১. অর্থাৎ দাগাবাজ, অকৃতজ্ঞদের একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ায় এমন মনে করো না যে, ওরা আল্লাহ তাআলার সন্তোষভাজন। এই অবকাশ বরং বিভিন্ন হেকমত ও কারণহেতু। শেষ পরিণাম এ-ই যে, সত্যপন্থিরা বিজয়ী হবে এবং বাতিলপন্থিদেরকে পথ থেকে ছাঁটাই করা হবে।

২. যতদিন পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ছিলেন, ততদিন মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় ধৈর্য ধারণের ও হাত সংযত রাখার নির্দেশ ছিল। সে অনুযায়ী তাঁরা পূর্ণ তেরটি বছর অমানুষিক নির্যাতনের বিপরীতে অতুলনীয় ধৈর্য ও স্থিরতার পরিচয় দেন। যখন মদীনা 'দারুল ইসলাম' হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মুষ্টিমেয় জামাত একটি স্বতন্ত্র মারকাযে সমবেত হল, তখন যেসব নির্যাতিত মুসলমানের সঙ্গে কাফেররা সর্বদা লড়াই করত তাদের অনুমতি দেওয়া হল, বরং তাদের প্রতি নির্দেশ এল– জালেমদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করার এবং নিজেদের দল ও ধর্মের হেফাজত করার। এ ধরনের একাধিক আয়াত সেই যমানায় নাযিল হয়।

৩. অর্থাৎ মুসলমানগণ যেন নিজেদের স্বল্পতা ও নিরস্ত্রতার কারণে না ঘাবড়ায়, কেননা আল্লাহ তাআলা মুষ্টিমেয় দরিদ্র জামাতকে দুনিয়ার বিরাট বিরাট বাহিনী ও রাজত্বের বিরুদ্ধে বিজয়ী করতে পারেন।

আসলে, এটা হচ্ছে রাজকীয় কায়দায় মুসলমানদেরকে সাহায্য ও বিজয় দানের একটি ওয়াদা। যেমন: দুনিয়াতে রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাগণ ওয়াদা করার ক্ষেত্রে নিজ মর্যাদা ও অমুখাপেক্ষীতা প্রকাশের জন্য বলে থাকেন– 'হাঁ, তোমাদের অমুক কাজটি আমি করে দিতে পারি।' কুরআনে এ ভঙ্গি সম্ভবত এজন্য অবলম্বন করা হয়, যাতে শ্রোতা বুঝতে

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

৪০. যাদের স্বীয় ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে, শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ[১]।' আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হত– (পাদ্রীদের) ইবাদতখানা, গীর্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে আল্লাহকে সাহায্য করবে; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী[২]।

পারে যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ করতে বাধ্য নন। বরং তিনি যা কিছু করেন, নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছায়ই করে থাকেন।

১. অর্থাৎ যে মুসলমান মুহাজিররা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদের কোন অপরাধও ছিল না, তাদের কাছে কারো কোন পাওনাও ছিল না। বরং কারণ শুধু এই ছিল যে, তারা এক আল্লাহকেই কেন আপন রব হিসাবে গ্রহণ করল? তারা পাথর-মূর্তির পূজা কেন করল না? বলতে গেলে, কাফেরদের দৃষ্টিতে মুমিনদের কোন গুরুতর অপরাধ থেকে থাকলে তা এই যে, তারা সকল দিক থেকে নির্লিপ্ত হয়ে এক আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত হল কেন?!

২. অর্থাৎ কোন সময়েই এবং কোন অবস্থাতেই যদি এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুমতি দেওয়া না হয়, তবে এটা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী হবে। কেননা, তিনি দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এরূপ রেখেছেন যে, প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক ব্যক্তি বা দল নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য জিনিস, অন্য ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে। যদি এমনটি না হত এবং আল্লাহ তাআলা নিজ তত্ত্বাবধানে পুণ্যকে পাপের বিরুদ্ধে দাঁড় না করাতেন, তবে পুণ্যের নাম-নিশানা ভূপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকত না। সেক্ষেত্রে অধার্মিক ও দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকেরা সমস্ত পবিত্র স্থান ও স্মৃতিসমূহের অস্তিত্ব সর্বদার জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিত– কোনই ইবাদতখানা, খানকা, মাদরাসা ও মসজিদ রক্ষা পেত না। এ কারণেই মন্দের শক্তি-ক্ষমতা যতই সুসংহত হোক না কেন, কুদরতের তরফ থেকে এমন এক সময় আসা অত্যাবশ্যক ছিল, যখন পুণ্যের পবিত্র হাতে মন্দের আক্রমণকে প্রতিহত করা হবে এবং যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের সাহায্যকারীদেরকে নিজে সাহায্য করে সত্য ও ন্যায়ের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি এতই শক্তিশালী ও

৪১. তারা এমন যে, আমি তাদের পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে[১]। আর সবকিছুর পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে[২]।	اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

ক্ষমতাবান যে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর দলও বড় বড় শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে।

যা হোক, সেই সময় মুসলমানদেরকে জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের অনুমতি উল্লিখিত নিয়মের অধীনেই দেওয়া হয়েছে। আর এটা সেই সাধারণ নিয়ম, যা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে না। প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার এ নিয়ম না থাকলে নিজ নিজ যুগে পাদ্রীদের ভজনালয়, খ্রিস্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদ (যেখানে আল্লাহর যিকির প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে)– কোন কিছুই কায়েম থাকত না। এসব ইবাদতের স্থানগুলি ভেঙ্গে-চুরে সমান করে দেওয়া হত। সুতরাং উক্ত সাধারণ নিয়মের অধীনেই মুসলমানদের মুনাসিব সময়ে আপন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া জরুরী ছিল।

১. আলোচ্য আয়াতে সেই মুসলমানদেরই কথা বলা হচ্ছে, যারা নির্যাতিত হয়েছেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য কেন করবেন না যখন তাঁরা এমন জাতি যে, আল্লাহ যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেন, তবুও তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে উদাসীন হবেন না, বরং তারা নিজেরাও দৈহিক ও আর্থিক পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকবেন এবং অন্যদেরও এ পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করবেন।

বাস্তবেও আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর শাসনক্ষমতা তাদের দান করেন এবং যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।)— উল্লেখ্য যে, এ আয়াতের দ্বারা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম, বিশেষত মুহাজেরীন এবং আরো বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) এর সত্যতা, মকবূলিয়ত ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।

২. অর্থাৎ যদিও আজ মুসলমানদের দুর্বল ও কাফেরদের সবল ও শক্তিশালী দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অবশেষে এই দুর্বলদের প্রবল ও বিজয়ী করে দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার রয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, এ উম্মত এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আল্লাহর দীন কায়েম রাখবে– তারপর কী হবে তা আল্লাহই জানেন।

৪২. ওরা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে ওদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায়;

وَاِنۡ یُّکَذِّبُوۡکَ فَقَدۡ کَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوۡدُ ۙ﴿۴۲﴾

৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়;

وَقَوۡمُ اِبۡرٰهِیۡمَ وَقَوۡمُ لُوۡطٍ ﴿ۙ۴۳﴾

৪৪. এবং মাদয়ানবাসীরা[১], আর অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও[২]। আর আমি কাফেরদের অবকাশ দিয়েছিলাম, পরে ওদের পাকড়াও করেছি। অতএব (দেখ), কেমন ছিল আমার পাকড়াও[৩]!

وَّاَصۡحٰبُ مَدۡیَنَ ۚ وَکُذِّبَ مُوۡسٰی فَاَمۡلَیۡتُ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ثُمَّ اَخَذۡتُهُمۡ ۚ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ﴿۴۴﴾

৪৫. আমি কত জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন সেগুলি (অর্থাৎ তার অধিবাসীরা) অপরাধ করেছিল। ফলে সেসব ধসে পড়েছিল স্ব স্ব ছাদের উপর[৪]। এবং (ধ্বংস করেছি) কত কূপ, যা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং কত সুউচ্চ পাকা মহল[৫]।

فَکَاَیِّنۡ مِّنۡ قَرۡیَۃٍ اَهۡلَکۡنٰهَا وَهِیَ ظَالِمَۃٌ فَهِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوۡشِهَا وَبِئۡرٍ مُّعَطَّلَۃٍ وَّقَصۡرٍ مَّشِیۡدٍ ﴿۴۵﴾

---

১. যাদের প্রতি হযরত শুআ'য়ব আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করেছিল।

৩. অর্থাৎ মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয় দানের যেসব ওয়াদা করা হচ্ছে, কাফেররা যেন নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তিমত্তার কারণে তাকে মিথ্যা মনে না করে। ওদের বর্তমান অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশমাত্র। পূর্ববর্তী জাতিগুলোও আল্লাহপ্রদত্ত সাময়িক অবকাশের ধোঁকায় পড়ে নিজ পয়গম্বরদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। কিন্তু দেখে নাও– অবশেষে ওদের কীরূপে পাকড়াও করা হয়েছে! এবং আল্লাহ তাআলা ওদের দুষ্কৃতির কারণে যে আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন, তা কীরূপে সামনে এসে গেছে। পরবর্তী আয়াতে এরই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৪. অর্থাৎ ভিত্তিসমূহ উপড়ে যাওয়ায় প্রথমে ছাদ ধ্বসে পড়ল, তারপর দেয়াল ও সমস্ত ঘর-দোর বিধ্বস্ত ছাদের উপর পতিত হল। আয়াতে সেগুলির উলট-পালট হওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

৫. অর্থাৎ যেসব কুয়া থেকে পানি তুলতে ভিড় লেগে থাকত, আজ সেখানে কেউ নেই এবং সুউচ্চ, পাকা, কারুকার্যখচিত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে বাস করার কেউ নেই।

৪৬. তবে কি ওরা যমীনে ভ্রমণ করেনি? করলে ওদের এমন অন্তর লাভ হত, যার দ্বারা বুঝত; অথবা এমন কর্ণ লাভ হত, যার দ্বারা শুনত[১]। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, কিন্তু অন্তর অন্ধ হয়ে যায়, যা আছে বক্ষের ভিতরে[২]।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭. ওরা আপনাকে আযাব তাড়াতাড়ি আনতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা কিছুতেই ভঙ্গ করবেন না[৩]। আর আপনার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান[৪]।'

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমি কত জনপদ-(বাসীদের) অবকাশ দিয়েছি, যদিও ওরা ছিল অপরাধী, অতঃপর আমি ওদের পাকড়াও করেছি। আর আমারই কাছে (সবাইকে) ফিরে আসতে হবে[৫]।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

---

১. অর্থাৎ ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকাগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে কখনো ওরা চিন্তা-ফিকির করেনি। করলে সত্য কথা ওদের বুঝে আসত এবং কান খুলে যেত।

২. অর্থাৎ চোখে দেখেও যদি অন্তর দিয়ে চিন্তা না করে, তবে তা না দেখার সমান। তার চর্মচোখ খোলা থাকলেও অন্তরের চোখ অন্ধ। আর চোখের অন্ধত্বের তুলনায় অন্তরের অন্ধত্বই অধিকতর আশঙ্কাপূর্ণ। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ আযাব যথাসময়ে আসবেই আসবে– অস্বীকার ও বিদ্রূপ করে তা তাড়াতাড়ি চাওয়া বৃথা।

৪. অর্থাৎ তোমাদের হাজার বছর তাঁর কাছে একদিনের সমান। অপরাধী আজ যেমন তাঁর মুঠিতে রয়েছে, হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁর মুঠিতে ও আয়ত্তাধীনেই থাকবে। কোথাও পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অথবা অর্থ এই যে, হাজার বছরের কাজ তিনি একদিনেই করতে পারেন, তবে তিনি তা-ই করেন যা তাঁর হেকমত ও বিবেচনাপ্রসূত হয়। কারো তাড়াহুড়া করায় কিছু আসে-যায় না।

এ অর্থও হতে পারে যে, পরকালীন আযাবের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে, অর্থাৎ কিয়ামত আসবেই এবং তোমরা পুরাপুরি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, ভয়াবহতা ও কঠোরতার হিসাবে তা হাজার বছরের সমান হবে। সুতরাং এহেন আযাব সম্পর্কে এত ত্বরা করছ কেন?

৫. অর্থাৎ অবকাশ দেওয়ার কারণে কি ওরা কোথাও পালিয়ে যেতে পেরেছে? না, পরিশেষে সকলকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হয়েছে, আমি ওদের পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিয়েছি।

[রুকূ - ৭]

৪৯. আপনি বলুন, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী[১]।'

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٤٩

৫০. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক[২]।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٥٠

৫১. আর যারা আমার আয়াতগুলিকে ব্যর্থ করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করে, তারা জাহান্নামী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝٥١

৫২. আমি আপনার পূর্বে যে রাসূল বা নবীই পাঠিয়েছি, তিনি যখন কোন ধারণা পোষণ করেছেন তখন শয়তান তাঁর ধারণার মধ্যে (কোন ভুল) মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বিদূরিত করেন শয়তানের মিশ্রিত বিষয়কে। তার পর পরিপক্ক করে দেন নিজ আয়াতগুলিকে*। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٢

---

১. অর্থাৎ আমার কর্তব্য হচ্ছে, অবহিত ও সতর্ক করে দেওয়া। আযাব নিয়ে আসা আমার কব্জায় নয়, বরং তা আল্লাহরই মুঠিতে রয়েছে। তিনি অনুগত ও পাপী সকলের মাঝে মীমাংসা করবেন এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত স্থানে (জান্নাতে বা দোযখে) পৌঁছে দেবেন।

২. অর্থাৎ জান্নাতে ফলমূল, নানা রকমের নে'য়ামত ও আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তিনি যখন (আল্লাহর বাণী) পাঠ করেন, তখন শয়তান তাঁর পঠিত বিষয়ে (নানা রকমের সন্দেহ-সংশয়) সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সৃষ্টি করা (সন্দেহ-সংশয়) অপসারিত করে দেন। তার পর পরিপক্ক করেন তাঁর আয়াতগুলি।'

৩. আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মতপার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞ মুতারজিম হযরক শাইখুল হিন্দ (র) নিজ পূর্বসূরী হযরত শাহ আবদুল কাদের রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত অবলম্বন করেছেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহও (র) তাঁর গ্রন্থ حجة الله البالغة এর শেষের দিকে এ ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) 'মূযেহুল কুরআনে' লেখেন– 'নবীর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যে নির্দেশ (বা সংবাদ) আসে, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র তারতম্য হতে পারে না। তবে যেটা নবীর নিজ অন্তরের ধারণা (ও স্বীয় এজতেহাদ), তা কখনো ঠিক হয়, কখনো হয় না। যেমন: হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন (আর নবীর স্বপ্ন ওহীর সমতুল্য) যে, তিনি মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে উমরা করছেন। তাঁর ধারণা হল, সম্ভবত এ বছরই এমনটি (অর্থাৎ উমরা) হবে। সে মত উমরার নিয়তে সফর শুরু করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে এহরাম খুলতে হল এবং পরবর্তী বছর স্বপ্নের তাবীর পূর্ণ হল। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হল যে, কাফেরদের উপর বিজয় লাভ হবে। তাঁর ধারণা হল, এটা এ বছরের যুদ্ধেই হবে। কিন্তু তা না হয়ে পরের বছর হল।

মোটকথা, নবীর ধারণা কখনো ভুল হয়। তবে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন যে, যতটুকু নির্দেশ বা ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, তাতে মোটেই হেরফের হয়নি।' হাঁ, নবীর ব্যক্তিগত ধারণা ও এজতেহাদের মধ্যে এমন হতে পারে। যদিও নবী আসল ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিশ্রিত করে ব্যক্তিগত ধারণার প্রচার করেন না, বরং উভয়কে পৃথক পৃথক রাখেন। আর এক্ষেত্রে যে القاء (মিশ্রিত করণ)-কে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হল, এটা তেমন, যেমন وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَن أَذكره –আয়াতে إنساء (অর্থাৎ ভুলিয়ে দেওয়া)-কে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অগ্রগণ্য তাফসীর

অধমের নিকট আলোচ্য আয়াতের সর্বোত্তম ও সহজতম তাফসীর তা-ই, যার মূল কথাটুকু পূর্ববর্তী মনীষীদের নিকট থেকে বর্ণিত– অর্থাৎ تمنى শব্দটি দ্বারা তিলাওয়াত করা বা হাদীস বর্ণনা করা এবং أُمْنِيَّة বলে পঠিত আয়াত বা হাদীস উদ্দেশ্য। ফলে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, পূর্ব থেকে এই নিয়ম চলে এসেছে যে, যখন কোন নবী বা রাসূল কোন কথা বয়ান করেন অথবা আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, তখন শয়তান সেই কথায় অথবা পঠিত আয়াতে নানা রকমের সন্দেহ উদ্রেক করে– অর্থাৎ তা সম্পর্কে অনেক মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। যেমন: নবী حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ আয়াতখানি (মায়েদা, ৩) পড়ে শোনালেন, আর শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করল যে, নিজের মারা (অর্থাৎ যবেহকৃত) জীবজন্তু তো হালাল, আর আল্লাহর মারা জীবকে (যা যবেহ ছাড়া মরেছে) হারাম বলা হচ্ছে। অথবা তিনি পড়লেন– إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর উপাসনা তোমরা কর, তা দোযখের ইন্ধন –আম্বিয়া, ৯৮)। আর সে সন্দেহ সৃষ্টি করল যে, مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ এর মধ্যে হযরত মাসীহ, উযাইর ও ফেরেশতাগণও তো শামিল। অথবা নবীজী হযরত মাসীহ সম্বন্ধে পড়লেন– وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ (তিনি হচ্ছেন আল্লাহর কালিমা, যা তিনি মারয়ামের দিকে নিক্ষেপ করেছেন, এবং তাঁর রূহ –নিসা, ১৭১)। আর শয়তান কুমন্ত্রণা দিল যে, এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মাসীহ খোদা-পুত্র ও উপাস্য।

এভাবে শয়তান اِلقاء তথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যায়। কিন্তু তার এহেন اِلقاء-এর খণ্ডনে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই সকল আয়াত শোনান, যেগুলো সম্পূর্ণ

স্পষ্ট ও পরিপক্ক (محكم) এবং এমন পরিষ্কার বিষয়াদি বয়ান করেন, যেগুলি শুনে সংশয় ও সন্দেহের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। অর্থাৎ متشابهات তথা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ নিয়ে শয়তান যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে, آيات محكمات বা পরিপক্ক আয়াতগুলি তারই মূলোচ্ছেদ করে এবং তা শুনে সকল দ্বিধা ও সন্দেহ একেবারে দূরীভূত হয়ে যায়।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এখন প্রশ্ন হতে পারে- দুই ধরনের আয়াত কেন অবতীর্ণ করা হয়? এবং পরবর্তীতে আয়াতগুলির পরিপক্কতার যে ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ 'মুহকাম' আয়াত নাযিল করা- প্রথম থেকেই তা কেন করা হয় না?

উত্তর হল, এটা মূলত আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ও হেকমতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বকে পরীক্ষার স্থলরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই এ ধরনের বিষয়ের দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করা হয় যে, কোন্ ব্যক্তি নিজ অন্তরের রোগ বা কাঠিন্যের কারণে ভিত্তিহীন সংশয় ও সন্দেহের আবর্তে পতিত হয়ে যায়, আর কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ ইলম ও তাহকীক দ্বারা ঈমান ও বিশ্বাসের উচ্চ মাকামে পৌছে যায়। সত্য তো এই যে, মানুষ সদিচ্ছা ও ঈমানদারীর সাথে বুঝতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন এবং সরল পথে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। বাকি রইল অস্বীকারকারী ও সন্দেহবাদীরা, কিয়ামত পর্যন্ত ওদের বিশ্বাস হাসিল হবে না। প্রবাদ আছে- ہرچہ گیرد علتی علت شود ('দোষী ব্যক্তি যা কিছু স্পর্শ করে, তা-ই দোষযুক্ত হয়ে যায়।')

আমাদের এ ব্যাখ্যা দ্বারা সামনের কয়েকটি আয়াতেরও অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। জ্ঞানী ব্যক্তি উল্লিখিত ব্যাখ্যার অংশগুলোকে আয়াতসমূহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নিতে পারবেন।

বর্তমান আয়াতগুলির সাথে আলে ইমরানের কিছু আয়াতের সাদৃশ্য

এই আয়াতগুলি আলে ইমরানের আয়াত (৭)- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ الخ এর সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। দেখুন : এখানকার আয়াত- إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ এর মধ্যে متشابهات এর উল্লেখ এবং- ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاته এর মধ্যে محكمات এর উল্লেখ হয়েছে। আর- لِيَجْعَلَ مَايُلْقِي الشَّيْطَانُ فتنة الخ এর মধ্যে দুই শ্রেণীর زائغين এর উল্লেখ হল, তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী- الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ এর কাজ হচ্ছে- ابتغاء فتنة এবং দ্বিতীয় শ্রেণী- الْقَاسِيَةُ قُلُوْبُهُمْ এর কাজ হল ابْتِغَاءَ تَأْوِيْل

পরবর্তী আয়াত- لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ الخ আলে-ইমরানের- والرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেখানে- رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا الخ দ্বারা যে দো'য়া করা হয়েছিল, এখানে- إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم এর মধ্যে তার কবুলিয়তের উল্লেখ হয়েছে- এবং সেখানকার- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ এর মুনাসিব আয়াত এখানে আছে। তা হল- وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ إلى قوله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

৫৩. (আল্লাহ শয়তানকে এজন্য মিশ্রণ করতে দেন), যাতে তিনি শয়তানের মিশ্রিত বিষয়কে তাদের জন্য পরীক্ষার (কারণ) বানান*, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং তাদের জন্যও, যারা পাষাণহৃদয়। নিশ্চয় অপরাধীরা ঘোরতর বিরোধিতায় লিপ্ত;

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৪. এবং যাতে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানতে পারে যে, তা-ই (অর্থাৎ আল্লাহর কথা) সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে (প্রেরিত); অতঃপর তারা তার প্রতি ঈমান আনে এবং তার সামনে তাদের অন্তর নম্র হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের সরল পথ দেখিয়ে দেন[১]।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৫. আর কাফেররা কুরআন সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না ওদের উপর সহসা কিয়ামত এসে পড়বে অথবা

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ

বি. দ্র. বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ غرانيق এর যে কাহিনী উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। সূরা 'নাজমে' হয়তো কিছু লেখা হবে। আমরা মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

যা হোক, পূর্ববর্তী মনীষীদের তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। বস্তুত, ইতিপূর্বে وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ آيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ আয়াতে আল্লাহর আয়াতসমূহ বাতিল করার যে অপচেষ্টার উল্লেখ ছিল– বর্তমান আয়াতসমূহে যেন তারই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** '(আল্লাহ শয়তানকে সেই সুযোগ এজন্য দেন), যাতে তিনি শয়তানের সৃষ্ট (সন্দেহ-সংশয়)–কে তাদের জন্য পরীক্ষার (কারণ) বানান ...'

১. 'মূযেহুল কুরআনে' আছে, 'অর্থাৎ তাতে পথভ্রষ্টরা বিভ্রান্ত হয়। ওদের কাজই তো হচ্ছে বিভ্রান্ত হওয়া। পক্ষান্তরে, ঈমানদাররা আরো বেশি পরিপক্ক হয়– কেননা, ঐ কালামে বান্দার কোনো হাত নেই। যদি থাকত, তবে তাও বান্দার ধারণার মত কখনো সহীহ এবং কখনো ভুল হত। আর যে বিশ্বাস করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে এ বিষয় বুঝিয়ে দেন।'

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) এ ব্যাখ্যা নিজ রুচির অনুসরণে লিখেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের যে মত, তা পূর্ববর্তী টীকায় লেখা হয়েছে।

يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

ওদের উপর এসে পড়বে কল্যাণ-শূণ্য দিনের আযাব[১]।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৬. সেদিন রাজত্ব হবে শুধু আল্লাহর; তিনি তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন[২]। অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে নে'য়ামতের উদ্যানসমূহে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, ওদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

[রুকূ - ৮]

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন স্থানে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল[৩]।

---

১. অর্থাৎ যখন কিয়ামতের মত ভয়াবহ বিষয় অতর্কিতে সংঘটিত হবে, অথবা কিয়ামত-দিবসের আযাব সামনে উপস্থিত হবে, একমাত্র তখন ওদের সন্দেহের অবসান হবে। আর عذاب يوم عقيم দ্বারা দুনিয়ার আযাবও উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ ওরা দুনিয়ার মধ্যেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, যা থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহরই রাজত্ব চলবে। নামকাওয়াস্তেও অন্য কারো জাহেরী বা বাতেনী হুকুমত থাকবে না। তখন সমগ্র দুনিয়ার বিচার-মীমাংসা করে দেওয়া হবে, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

৩. (সাধারণ) মুমিনদের পরিণামের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে তাদের মধ্যকার এক বিশিষ্ট জামাতের আলোচনা বিশেষভাবে করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা বাড়িঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছেন, তারা যুদ্ধে শহীদ হোন বা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুন, উভয় অবস্থায় আল্লাহর নিকট তাদের বিশেষ সমাদর করা হবে– পানাহার, বাসস্থান সবই তাদের মর্যিমত হবে।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ– আল্লাহ তাআলা উত্তমরূপে জানেন, তারা কিসে সন্তুষ্ট হবে এবং এ-ও জানেন, কারা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করেছেন। এমন

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

৬০. এসব (তো শুনলে)। আর যে ব্যক্তি ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করল, যে পরিমাণ কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তার উপর আবার বাড়াবাড়ি করা হল- তাকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল[২]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

৬১. তা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান[৩]। এবং এজন্য যে,

---

মুহাজের ও মুজাহিদদের ভুল-ত্রুটি আল্লাহ তাআলা মার্জনা করবেন এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অথবা عليم ও حليم গুণ দুটি উল্লেখ করে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরও জানেন, যারা এমন খাঁটি বান্দাদের কষ্ট দিয়ে বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করছে, কিন্তু তিনি নিজ সহনশীলতার কারণে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না।

১. অর্থাৎ মজলুম যদি জালেম থেকে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে, অতঃপর নতুনভাবে জালেম তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে, তবে সে পুনরায় মজলুম সাব্যস্ত হল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাকে সাহায্য করবেন। কেননা, মজলুমকে সাহায্য করাই তাঁর চিরাচরিত নিয়ম। হাদীসে আছে- واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ('মজলুমের বদ-দো'য়াকে ভয় কর। কারণ, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৪৯৬)। কবির ভাষায়-

بترس از آه مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن ÷ اجابت از در حق بہر استقبال می آید

('মজলুমের আহাজারিকে ভয় কর। কেননা, তাদের বদদোয়া সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।')

২. অতএব বান্দাদেরও উচিত, নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়াদিতে ক্ষমা ও মার্জনা শিক্ষা করা, প্রতিশোধ নেওয়ার পিছনে পড়ে না থাকা। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন না, যদিও প্রতিশোধ না নেওয়া শ্রেয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা কাফেরদের জুলুমের প্রতিশোধ নিলেন। তারপর কাফেররা বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে আগমন করে, তখন পুনরায় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পূর্ণ সাহায্য করলেন।"

৩. অর্থাৎ তিনি এত পরাক্রমশালী যে, রাতদিনের আবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি তাঁরই অধীনে রয়েছে। তাঁরই নির্দেশের ফলে কখনো দিন বড় হয়, কখনো রাত বড় হয়। সুতরাং মজলুম জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য করে জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করা, বরং ওদের উপর বিজয়ী করে দেওয়ার শক্তি কি তাঁর নেই?

وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[১];

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَالْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَالْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

৬২. তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং ওরা তিনি ছাড়া যেসব বস্তুকে ডাকে, তা সম্পূর্ণ অসার। এবং এজন্য যে, আল্লাহই মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ[২]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

৬৩. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন; ফলে ভূমি সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে[৩]? নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত*, সব বিষয়ে অবহিত[৪]।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই; এবং আল্লাহ– তিনিই অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার অধিকারী[৫]।

ইতিপূর্বে মুসলমান মুহাজিরদের আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শীঘ্রই রাতদিনের (পরিবর্তনের) মত অবস্থার বড় পরিবর্তন হবে। আল্লাহ তাআলা রাতকে যেমন দিনের মধ্যে দাখিল করেন, তদ্রূপ কুফরের ভূখণ্ডকে ইসলামের বুকে দাখিল করে দেবেন।

১. অর্থাৎ তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শুনেন এবং জালেমের কর্মকাণ্ড দেখেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এত বিরাট পরিবর্তন আর কারো দ্বারা হতে পারে না। কারণ, সত্য ও সঠিক মাবূদ তো তিনিই, আর তাঁকে ছেড়ে মাবূদ নামে অন্য যা কিছু গড়া হয়েছে তা সবই ভ্রান্ত, মিথ্যা ও বাতিল। মাবূদ তো তাঁকেই বলা উচিত, যিনি সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, সকলের ঐক্যমতে এ মর্যাদা একমাত্র আল্লাহরই।

৩. তদ্রূপ, কুফরের শুষ্ক ও বিজন ভূমিকে ইসলামের বৃষ্টি দ্বারা শ্যামল-সজীব বাগানে পরিণত করে দেবেন।

✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'অতি মেহেরবান'।

৪. তিনিই জানেন, বৃষ্টির পানিতে তৃণলতা কীভাবে উৎপন্ন হয়? তিনি ভিতরে ভিতরে এমন কলা-কৌশল করে থাকেন যে, শুষ্ক মাটি পানি ইত্যাদির অংশগুলিকে নিজের ভিতরে শুষে নিয়ে সতেজ ও সজীব হয়ে ওঠে। এমনিভাবে, তিনি নিজ মেহেরবানী, সূক্ষ্ম তদবীর ও তরবিয়ত এবং সর্বব্যাপী জ্ঞানের দ্বারা মানব-সন্তানের অন্তরকে ইসলামের অমৃতধারায় সতেজ ও সজীব করে তুলবেন।

৫. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই যেহেতু তাঁর স্বত্ব ও সৃষ্টি এবং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন– অতএব সেসবের মধ্যে তিনি যেরূপ ইচ্ছা হস্তক্ষেপ ও রদবদল

[রুকূ - ৯]

৬৫. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছুকে এবং জলযানকে, যা তাঁর হুকুমে সমুদ্রে বিচরণ করে? এবং তিনি আকাশকে সামলিয়ে রেখেছেন, যাতে তা পৃথিবীর উপর তাঁর হুকুম ছাড়া পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু[১]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۭ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬৬. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর আবার তোমাদের জীবিত করবেন[২]। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ[৩]।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

করতে পারেন। এতে কোনই প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিপত্তি আসতে পারে না। অবশ্য পরিপূর্ণ ধনাঢ্যতা ও একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তা-ই করেন, যা সম্পূর্ণরূপে হেকমতপূর্ণ ও সঠিক বিবেচনাপ্রসূত। তাঁর সকল কাজ প্রসংশনীয় এবং তাঁর সত্তা সর্বগুণের ও সমস্ত সৌন্দর্যের আধার।

১. অর্থাৎ তোমাদের বা আর কারো চাপে নয়, নিতান্তই দয়া ও মায়াবশত আল্লাহ জল ও স্থল ভাগের সব কিছু তোমাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছেন। তদুপরি তিনিই নিজ কুদরতে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিসহ আকাশকে কোন বাহ্যিক খুঁটি ছাড়া সামলে রেখেছেন, ফলে নিজ স্থান থেকে তা নীচে পতিত হয় না। নতুবা তা পতিত হয়ে এবং আঘাত হেনে পৃথিবীকে টুকরা টুকরা করে ফেলত। যাবৎ তাঁর আদেশ না হবে, আকাশ স্বস্থানেই কায়েম থাকবে– একটুও এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় নেই।

اِلَّا بِاِذْنِهٖ –দ্বারা তাঁর মহাশক্তির পক্ষে জোর দেওয়া উদ্দেশ্য। অথবা হতে পারে, এর দ্বারা কিয়ামতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. এমনিভাবে, কুফর ও মূর্খতার কারণে যে জাতি রূহানীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল, তিনি ঈমান ও মা'রেফতের রূহ দ্বারা তাদের জীবিত করে তুলবেন।

৩. অর্থাৎ এতসব অনুগ্রহ ও নে'য়ামত পেয়েও আল্লাহর শোকর করে না, বরং প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ছেড়ে অন্যদের সামনে মাথা নত করে।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি ইবাদতের একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যার অনুসরণ তারা করে। অতএব তারা যেন এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিবাদ না করে। আর আপনি নিজ রবের দিকে ডাকতে থাকুন। নিশ্চয় আপনি রয়েছেন সরল পথের উপর।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর তারা যদি আপনার সঙ্গে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলুন, 'তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ ভাল করেই জানেন।'

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তোমরা মতভেদ করতে[১]।

---

১. দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সমস্ত নবী-রাসূল এক ও অভিন্ন। অবশ্য যুগের বিভিন্নতা অনুসারে একেক উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা ইবাদত-বন্দেগীর একেক উপায়-পদ্ধতি সাব্যস্ত করেছেন। তা অনুসারে উম্মতরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে। এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যও একটি বিশেষ শরী'য়ত পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আসল দীন সকল যুগে অভিন্নই ছিল। কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর ইবাদত বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এ জন্য তাওহীদ ও অন্যান্য সর্বসম্মত বিষয়ে কারো জন্য কোন অবস্থাতেই ঝগড়া-বিবাদ করা সমীচীন নয়।

এমন সুস্পষ্ট বিষয়াদিতেও যদি বিবাদ করা হয়, তবে আপনি তার কোন পরোয়া করবেন না। আপনি যে সরল পথের উপর রয়েছেন, মানুষকে তার দিকে ডাকতে থাকুন আর অযথা বিবাদ-কারীদের বিচারের ভার এক আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করুন। তিনি স্বয়ং ওদের সকল কর্মকাণ্ড উত্তমরূপে জানেন, কিয়ামতের দিন তিনি সকল মতভেদ ও ঝগড়ার মীমাংসা করে দেবেন। আপনি দাওয়াত ও তবলীগের গুরুদায়িত্ব পালন করুন, ওদের চিন্তায় মাথা ঘামাবেন না। এহেন অবাধ্যদের প্রতিকার আল্লাহই করবেন।

বি. দ্র. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ –এর (এক অর্থ তো উপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হল। তবে তার) অর্থ এও হতে পারে যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ভিন্ন কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, সুতরাং এ উম্মতের জন্য যদি নতুন শরী'য়ত এসে থাকে তবে তা নিয়ে ঝগড়া করার কী আছে?

কোন কোন মুফাসসির منسك এর অর্থ যবেহ ও কুরবানী করেছেন। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাফসীর তাই, যা বিজ্ঞ মুতারজিম (র) অবলম্বন করেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন!)

৭০. তুমি কি জান না যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সব বিষয় জানেন? নিশ্চয় এসব একটি কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে; নিশ্চয় এ আল্লাহর জন্য সহজ[১]।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

৭১. ওরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের উপাসনা করে, যার ব্যাপারে তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে ওদের কোন জ্ঞান নেই[২]। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই[৩]।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝

৭২. যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখতে পাবে[৪]। মনে হয় যেন এখনই ওরা তাদের উপর আক্রমণ চালাবে যারা ওদেরকে আমার আয়াতসমূহ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ

---

১. অর্থাৎ শুধু ওদের ক্রিয়াকলাপই নয়, বরং আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ তাআলার জানা– তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। আর বিবিধ কল্যাণ বিবেচনায় ও হেকমতের কারণে এই জ্ঞান অনুযায়ী সমস্ত বিষয়াবলি 'লওহে-মাহফূজে' সংরক্ষিতও রয়েছে এবং আদম-সন্তানদের সমস্ত আমল তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হবে। সে অনুসারেই কিয়মাতের দিন মীমাংসা হবে।

إن ذلك على الله يسير– এত অসংখ্য বিষয় ঠিক ঠিক জানা ও লিখে দেওয়া এবং ঠিক তা অনুযায়ী প্রত্যেকের বিচার-মীমাংসা করা– এগুলির কোন কিছুই আল্লাহর নিকট কঠিন নয় এবং এর কারণে তাঁকে কিছুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা পোহাতে হবে না।

২. অর্থাৎ শুধু বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণে এরূপ করে, ওদের নিকট এর কোন ধর্মীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ নেই।

৩. সবচেয়ে বড় জুলুম ও অবিচার হচ্ছে আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করা। সুতরাং এহেন জুলুমে লিপ্ত লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বিপদ আসলে ওদের শরীকরা কোন উপকারে আসবে না এবং তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই সাহায্য করতে পারবে না।

৪. অর্থাৎ কুরআনে তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ের আয়াতগুলি শুনে কাফের-মুশরিকদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং ওরা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি, রাগে-গোস্বায় উন্মাদ হয়ে আয়াতগুলির তেলাওয়াতকারীদের উপর আক্রমণ করতে চায়, বরং কোন কোন সময় করেও বসে।

قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۲﴾

পড়ে শোনায়। আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদের তার চেয়ে নিকৃষ্ট এক বস্তুর সংবাদ দিব? (তা হচ্ছে) আগুন। আল্লাহ কাফেরদের সাথে তার ওয়াদা করেছেন। আর (তা) কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল[১]।'

[রুকূ - ১০]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾

৭৩. হে মানুষ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তা মনযোগ দিয়ে শোন[২]: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এ উদ্দেশ্যে একত্র হোক। আর মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। কত দুর্বল এই প্রার্থী ও প্রার্থিত (উপাসনাকারী ও তার উপাস্য)[৩]!

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতগুলি শুনে তোমাদের মধ্যে যে আক্রোশ ও অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি অসহনীয় আরেকটি জিনিস আছে, যা তোমরা মোটেই সইতে পারবে না। তা হচ্ছে দোযখের আগুন, যার ওয়াদা কাফেরদের জন্য করা হয়েছে। এখন উভয়টির মধ্যে তুলনা করে মীমাংসা কর যে, কোনটির স্বাদ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।

২. তাওহীদের বিপরীতে শিরকের অসারতা ও ঘৃণ্যতা প্রকাশার্থে এখানে একটি উপমা বর্ণিত হয়েছে, যা মনোযোগ সহকারে শোনা ও চিন্তা-ফিকিরের সাথে বোঝা উচিত, যাতে এহেন ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকতে পার।

৩. মাছি অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র একটি প্রাণী। যেসব প্রতিমার মধ্যে এতটুকু শক্তিও নেই যে, সকলে মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে, অথবা মাছি তাদের অর্ঘ্য-উপচারী থেকে কোন কিছু নিয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনতে পারে, তাদের নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার সঙ্গে মাবূদের সিংহাসনে সমাসীন করা কতই না নির্বুদ্ধিতা! বস্তুত, মাছিও দুর্বল, মাছি থেকে অধিক দুর্বল মূর্তিসমূহ এবং মূর্তির চেয়ে আরো দুর্বল সেই পূজারী, যে এরূপ তুচ্ছ ও দুর্বল বস্তুকে নিজ উপাস্য ও প্রয়োজন পূরণকারী বানিয়ে নিয়েছে।

৭৪. ওরা আল্লাহর মর্যাদা যথাযথ উপলব্ধি করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী[১]।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ۝

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও[২]। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

اَللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌۢ بَصِیْرٌ ۝

৭৬. তিনি তাদের সম্মুখের ও তাদের পশ্চাতের সব অবস্থা জানেন। এবং আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সকল বিষয়[৪]।

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۭ وَاِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৭৭. হে ঈমানদারগণ! রুকূ কর, সেজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও[৫]।

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

---

১. আল্লাহ তাআলার মর্যাদা বুঝলে এহেন বে-আদবী করত না। আল্লাহর শান ও মর্যাদা কি এই যে, এহেন দুর্বল বস্তুগুলোকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা হবে? (আল্লাহর পানাহ!) তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদার সম্মুখে তো বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও পয়গম্বরও সম্পূর্ণ অক্ষম ও নিরুপায়।

সম্মুখে তাঁদের উল্লেখ হচ্ছে।

২. অর্থাৎ কোন কোন ফেরেশতা দ্বারা বার্তা প্রেরণের কাজ নেন (যেমন: জিব্রাইল আলাইহিস সালাম) এবং কোন কোন মানুষকেও আল্লাহ তাআলা এই পদমর্যাদার জন্য নির্বাচিত করেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের মর্যাদা সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে হওয়া উচিত।

৩. অর্থাৎ তাদের সব বিষয় এবং তাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব অবস্থা তিনি দেখেন। এ জন্য অবস্থা ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ করে যাকে রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাকে করে দেন। আর তা করার অধিকার একমাত্র তাঁরই- اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি নিজ পয়গাম কোথায় পাঠাবেন। –সূরা আন'আম, আয়াত ১২৪)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে পয়গম্বর সর্বোত্তম। ফেরেশতাদের মধ্যেও পয়গাম বহনকারী ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁদের আনীত হেদায়েত ছেড়ে মূর্তিদের উপাসনা করা'– কত বড় নির্বুদ্ধিতার কথা!

৪. অর্থাৎ উল্লিখিত ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণেরও কোন এখতিয়ার নেই, সকল বিষয়ে এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। (মুযেহুল কুরআন)

৫. শিরকের কদর্যতা ও মুশরিকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বর্ণনার পর মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা আপন রবের ইবাদত-বন্দেগী করতে থাক– তাঁরই সামনে নত হও, তাঁরই হুযূরে মাটিতে মাথা রাখ এবং তাঁর উদ্দেশ্যে অন্যান্য মঙ্গলজনক কাজকাম কর, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَاجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَسَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا

৭৮. এবং আল্লাহর জন্য সাধনা কর, যেমন সাধনা তাঁর জন্য করা উচিত*[১]। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন[২] এবং তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা (সাধ্যাতীত কষ্ট) আরোপ করেননি[৩]। (তোমরা আঁকড়ে ধর) তোমাদের পিতা ইবরাহীমের[৪] দীনকে। পূর্বে তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান এবং এই কুরআনেও[৫]; যাতে রাসূল

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আল্লাহর পথে জেহাদ কর, যেমন জেহাদ তাঁর পথে করা উচিত'।

১. নিজের নফসের সংশোধন এবং দুনিয়ার সংস্কার সাধনের মত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দাবী করে, তেমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা অক্লান্তভাবে করে যাও। দেখ, পার্থিব স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে সফলতা লাভের জন্য কত চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত করা হয়। আর এ তো হচ্ছে দীনের ও আখেরাতের সফলতার পথ– এ পথে যত বড় মেহনতই করা হোক না কেন, বস্তুত তা স্বল্পই বটে।

বি. দ্র. مُجَاهدة শব্দটির মধ্যে মৌখিক, লৈখিক, দৈহিক ও আর্থিক সব রকমের চেষ্টা-সাধনাই শামিল রয়েছে এবং 'জেহাদ' এর সকল শ্রেণী (যথা নফসের সঙ্গে জেহাদ বা সংগ্রাম, শয়তানের সাথে জেহাদ, কাফেরদের সাথে জেহাদ, বিদ্রোহীদের সঙ্গে জেহাদ, বাতিলপন্থীদের সাথে জেহাদ) এর অন্তর্ভুক্ত।

২. এভাবে যে, তোমাদেরকে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং সকল শরী'য়তের মধ্যে পূর্ণতম শরী'য়ত দান করেছেন। সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তোমাদের নির্বাচন করেছেন এবং সকল উম্মতের উপর তোমাদের শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলা দীনের এমন কোন জটিল কাজ তোমাদের উপর চাপাননি, যা পালন করা দুঃসাধ্য। আহকামের ক্ষেত্রে সব রকমের অবকাশ ও আসানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে তোমরা নিজেরা কোনো সহজ বিষয়কে নিজেদের উপর কঠিন করে নিলে তা ভিন্ন কথা।

৪. ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্ধ্বতন পিতামহ বলে তিনি সমগ্র উম্মতের পিতা। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আরব জাতির পিতা, যারা কুরআনের প্রথম সম্বোধিত জাতি। সুতরাং 'তোমাদের পিতা' এর অর্থ– তোমরা আরব জাতির পিতা।

৫. 'তিনি' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং এ কুরআনে তোমাদের 'মুসলিম' নামে অভিহিত করেছেন, যার অর্থ আজ্ঞাবহ ও প্রতিশ্রুতি-রক্ষাকারী। অথবা (هو সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম আ. উদ্দেশ্য। এ হিসেবে অর্থ হবে)– ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম তোমাদের এ নাম রেখেছিলেন, কারণ, তিনি দো'য়ার মধ্যে বলেছিলেন- وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (এবং আমাদের সন্তানসন্ততির মধ্যেও একটি 'মুসলিম' জামাত বানান। –সূরা বাকারা, আয়াত ১২৮) এবং কুরআনের মধ্যে সম্ভবত তাঁরই প্রার্থনার কারণে এই নামকরণ হয়েছে।

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

তোমাদের বাতলে দেন এবং তোমরা (অন্যান্য) মানুষকে বাতলে দাও*[১]। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক; কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী[২]!

যা হোক, তোমাদের নাম 'মুসলিম'। যদিও আরো উম্মতও মুসলিম ছিল, কিন্তু এ উপাধিতে তোমরাই ভূষিত হয়েছ। সুতরাং এই উপাধির মর্যাদা রক্ষা করা উচিত।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও (অন্য) লোকদের ব্যাপারে'।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের এজন্য মনোনীত করেছেন যে, তোমরা অন্য লোকদের শিক্ষা দেবে এবং রাসূল তোমাদের শিক্ষা দেবেন। বস্তুত, এই উম্মত যে সর্বশেষে এসেছে, তার উদ্দেশ্য এ-ই যে, এরা আর সকল উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করবে এবং মানুষকে সরল পথের সন্ধান দেবে। মোটকথা, যে মহান মর্যাদা এই উম্মতের লাভ হয়েছে, তা একমাত্র এজন্য যে, তারা সারা দুনিয়ার শিক্ষক হবে এবং তাবলীগী চেষ্টা-মেহনত করবে।

বি. দ্র. অন্যান্য মুফাসসির شهيد ও شهداء শব্দ দুটির অর্থ 'সাক্ষী' করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতরা বলবে, পয়গম্বরগণ আমাদের নিকট দীন-ধর্মের বাণী প্রচার করেননি, আর তাদের পয়গম্বরদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে– তখন তাঁরা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করবেন। তখন এ উম্মত সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয় পয়গম্বরগণ দাওয়াত ও তাবলীগ করে আল্লাহর হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তখন প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কী করে জানলে? তারা উত্তরে বলবে, আমাদের নবী আমাদের অবগত করেছিলেন, আল্লাহর সুরক্ষিত কিতাব (কুরআন কারীম) এর সাক্ষী।

অর্থাৎ উল্লিখিত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তোমাদের এজন্য দান করা হয়েছে যে, তোমাদের একটি মর্যাদাশালী মুকদ্দমায় সম্মানিত সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াতে হবে। তবে তোমাদের সাক্ষ্য তোমাদের পয়গম্বরের বদৌলতেই শোনা হবে এবং গ্রহণও করা হবে। কেননা, তিনি তোমাদের সত্যতার সমর্থন করবেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের সম্মান কর, নিজেদের নাম ও উপাধি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষা কর এবং মনে রাখ, তোমাদের অনেক বড় কাজের জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। এ জন্য প্রথমে নিজেদের আদর্শরূপে তৈরি কর, নামায ও যাকাত (অন্য কথায় দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত-বন্দেগী)-তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে দিয়ো না। সকল কাজে আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে ধরে রাখ, সত্যের পথ থেকে একটুও যেন পদস্খলন না হয়। আর তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতের উপর ভরসা রাখ, তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য দুর্বল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করো না, একমাত্র তাঁকেই নিজ মাওলা ও মালিক মনে কর। তাঁর চেয়ে উত্তম মালিক ও সাহায্যকারী আর কাকে পাওয়া যাবে?

সূরা মু'মিনূন

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২৩ । ১১৮ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

آياتها ١١٨، ركوعاتها ٦

পারা - ১৮

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত[১],

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

---

১. খুশূ' (خشوع) এর অর্থ, কারো সামনে ভয়-ভীতির কারণে স্থির ও বিনীত হওয়া। এজন্যই ইবনে আব্বাস (রা) خاشعون এর তাফসীর করেছেন- ساكنون ও خائفون (ভীত ও বিনয়ী)। আর আয়াত- تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (তুমি ভূমিকে দেখতে পাও যে, তা নিস্তেজ পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপরে পানি বর্ষণ করি, তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে ওঠে– হা-মীম-সাজদাহ:৩৯) প্রমাণ করে যে, خشوع এর মধ্যে এক ধরনের 'স্থিরতা ও বিনয়'এর ভাব রয়েছে।

কুরআন করীমে খুশূকে— চেহারা, চোখ, স্বর প্রভৃতির গুণ বা বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (ঈমানদারদের জন্য কি সে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের জন্য বিগলিত হবে?)– এ আয়াতে (হাদীদ ১৬) খুশূ'কে অন্তরের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, প্রকৃত খুশূ' হচ্ছে অন্তরের খুশূ'। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুশূ' তারই প্রকাশমাত্র।

নামাযে যখন অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনীত ও ধীর-স্থির হবে, তখন চিন্তা-ফিকির এদিক সেদিক যাবে না, বরং এক আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হবে। ফলে ভয়-ভীতি এবং বিনয় ও নম্রতার লক্ষণাদি দেহের উপরও প্রকাশ পাবে। নামাযী তখন মাথা অবনত রাখবে, দৃষ্টি নিম্নমুখী হবে, আদবের সাথে দাঁড়াবে, এদিক-সেদিক তাকাবে না, গায়ের কাপড় বা দাড়ি ইত্যাদি নিয়ে খেলা করবে না, আঙুল মটকাবে না। মোটকথা, যেসব কাজ ও অবস্থা খুশূরই আনুষঙ্গিক ব্যাপার, নামাযী তার প্রতি খেয়াল রাখবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নামাযে এমন ধীর-স্থির হতেন, যেন একটি নিষ্প্রাণ কাঠ। এজন্যই বলা হত, এটাই হচ্ছে নামাযের খুশূ'।

ফেকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, খুশূবিহীন নামায শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিনা? রূহুল মাআনীর লেখক বলেছেন, নামায সহী হওয়ার জন্য খুশূ' শর্ত না হলেও কবূল হওয়ার জন্য তা শর্ত বটে। আমার মতে এরূপ বললে ভাল হয়, উত্তমরূপে কবূল হওয়ার জন্য খুশূ শর্ত। والله أعلم এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। ইমাম গাযযালী রচিত إحياء العلوم ও তার ভাষ্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩. যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে[১],	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ
৪. যারা যাকাত আদায় করে*[২],	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ
৫. যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে–	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

যা হোক, সেই মুমিনরাই অশেষ কল্যাণ ও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবেন, যারা খুশূ' ও খুযূ'র সাথে নামায পড়েন এবং সম্মুখে বর্ণিত গুণাবলিতে গুণান্বিত হন।

১. অর্থাৎ অযথা ও বাজে কাজকর্মে সময় নষ্ট করে না, বরং অন্য কেউ নিরর্থক ও বাজে কথা বললে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুত আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্নতার ফলে তাদের এতটুকু অবকাশই হয় না যে, নিরর্থক কাজকর্মে নিজেদের জড়াবেন। কবির ভাষায়-

چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو ÷ چو بگذشت بر عارف جنگجو

گرایں مدعی دوست بشناختے ÷ بہ پیکار دشمن نہ پرداختے

(হাস্যময় বাহলুল কত সুন্দর বলেছেন, যখন তিনি এক ঝগড়াটে দরবেশের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন– 'যদি এ ব্যক্তি সত্যিই বন্ধু চিনত, তবে শত্রুর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হত না।')

✫ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'যারা (নিজেদেরকে মন্দ থেকে) পরিশুদ্ধ করে'।

২. অর্থাৎ তারা সর্বদা যাকাত আদায় করতে থাকে। এমন নয় যে, কখনো দিলাম, কখনো দিলাম না। খুব সম্ভব এজন্যই يؤدون الزكوة-এর পরিবর্তে للزكوة فاعلون বলা হয়েছে। যেন বলে দেওয়া হল, যাকাত আদায় করাটা তাদের সর্বদার কাজ। বিজ্ঞ মুতারজিম دیا کرتے ہیں (অর্থাৎ দিয়ে থাকে) বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আয়াতের আরেক তাফসীর

কোন কোন মুফাসসির এস্থলে الزكاة -কে 'তাহারাত' (পবিত্রতা) বা আত্মাকে বিশুদ্ধকরণের অর্থে নিয়েছেন। যেন আলোচ্য আয়াতকে قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى বা قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর সমার্থক ধরেছেন। যদি এ উদ্দেশ্যই হয়, তবে زكاة -কে ব্যাপক অর্থে নেওয়া হবে, যার মধ্যে- দেহ, অন্তর ও সম্পদ পবিত্র করা সবই অন্তর্ভুক্ত। যাকাত ও দান-খয়রাতেও ধন-সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয়। এজন্যই ইরশাদ করা হয়েছে- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেবেন। –সূরা তওবা, আয়াত ১০৩)

প্রশ্ন হতে পারে, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়, অথচ মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি। এর উত্তরে ইবনে কাছীর (র) বলেছেন যে, যাকাতের মূল বিধান মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে তার পরিমাণ ও নেসাব ইত্যাদি মদীনায় হিজরতের পর নির্ধারণ করা হয়। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

৬. তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের ব্যতীত। কারণ, (এ ক্ষেত্রে) তারা অভিযুক্ত হবে না।	اِلَّا عَلٰۤی اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُوۡمِیۡنَ۟
৭. আর যারা তা ছাড়া অন্য পথ অন্বেষণ করবে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী[১]।	فَمَنِ ابۡتَغٰی وَرَآءَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ۟
৮. এবং যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান[২],	وَالَّذِیۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ۟
৯. এবং যারা নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে[৩]।	وَالَّذِیۡنَ هُمۡ عَلٰی صَلَوٰتِهِمۡ یُحَافِظُوۡنَ۟

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী বা দাসী ছাড়া যৌন সম্ভোগের অন্য কোন পথ খুঁজে, সে হালাল ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রমকারী। ব্যভিচার, সমমৈথুন, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সবই এই সীমা অতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বরং কোন কোন মুফাসসির এ আয়াত দ্বারা 'মুত্আ' (متعة) হারাম হওয়ার বিষয়েও দলীল গ্রহণ করেছেন। তবে এ ব্যাপারটি দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ, যা এখানে সম্ভব নয়। রূহুল মাআনী দ্রষ্টব্য।

২. তারা আমানত এবং কথা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আমানতে খেয়ানত করে না এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না– আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারেও না এবং বান্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেও না।

৩. তারা সকল নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে তার আদব ও হক (অর্থাৎ সকল সুন্নত)-সহ আদায় করে, দুনিয়ার কাজকামে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল হয় না।

সফলকাম মুমিনদের গুণাবলির সারনির্যাস

এ পর্যন্ত সফলকাম মুমিনদের ছয়টি গুণ ও অভ্যাস বর্ণিত হল– ১. খুশূ'-খুযূ'র সাথে নামায পড়া, অর্থাৎ নামাযে নিবেদিত প্রাণে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। ২. অহেতুক, নিরর্থক ও বাজে বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা। ৩. যাকাত অর্থাৎ সম্পদসংশ্লিষ্ট হক আদায় করা; অথবা নিজ দেহ, আত্মা ও ধন-সম্পদকে পবিত্র রাখা। ৪. যৌনপ্রবৃত্তি সংযত রাখা। ৫. আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, অন্যভাবে বললে সমস্ত মুআমালা সঠিকভাবে করা। ৬. এবং নামাযসমূহের পরিপূর্ণ হেফাজত করা, অর্থাৎ সঠিক ওয়াক্তে আদব ও শর্তাবলিসহ তা আদায় করা।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩

১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী–

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

১১. যারা জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে[১]। তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ⑫

১২. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে[২]।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ⑬

১৩. অতঃপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক স্থির জায়গায়[৩]।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

১৪. তার পর আমি ঐ শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে রূপান্তর করি, অতঃপর সেই জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করি, তারপর ঐ মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তর করি, অনন্তর অস্থিসমূহকে গোশত দিয়ে ঢেকে দেই[৪]। তার পর তাকে ভিন্ন এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি*[৫]।

উপসংহারে পুনরায় নামায যথাসময়ে যথানিয়মে পড়ার কথা উল্লেখ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার নিকট নামাযের কী মর্যাদা এবং তা কত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, নামায দিয়েই আলোচনার আরম্ভ এবং তা দিয়েই সমাপ্তি।

১. জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। (সূরা মারয়াম : ৬৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

২. কেননা, সকলের পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটির নির্বাচিত অংশ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সকল আদম-সন্তান বীর্য থেকে পয়দা হয়, আর বীর্যও মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্য-সামগ্রীর নির্যাস।

৩. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে, যেখান থেকে তা কোথাও সরতে পারে না।

৪. অর্থাৎ গোশতের কিছু অংশ শক্ত করে অস্থি বানিয়ে দেই এবং অস্থিসমূহের কাঠামোর উপর ফের গোশত-চামড়া চড়িয়ে দেই।

সূরা হজে (আয়াত ৫) মানব-সৃষ্টির আলোচনায় এরই কাছাকাছি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি তাকে বানিয়ে দেই ভিন্ন এক সৃষ্টি'।

৫. অর্থাৎ 'রূহে-হায়াত' বা জীবাত্মা ফুঁকে দিয়ে এক জীবন্ত, জাগ্রত মানুষ বানিয়ে দেই। অতঃপর তার উপর দিয়ে বিবিধ অবস্থা তথা শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য অতিক্রম করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

অতএব আল্লাহ বড় বরকতময়, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা[১]।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

১৫. তার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে[২]।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ

১৬. অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে[৩]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ

১৭. নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধ্বে সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছি[৪] আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন নই[৫]।

---

১. যিনি অত্যন্ত শিল্পনৈপুন্যের সাথে মানবের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তিসমূহকে সুন্দরতম আকৃতি দান করেছেন এবং তার অঙ্গসৌষ্ঠবকে আপন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী খুবই সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন।

২. অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্ব নিজস্ব ও তোমাদের মালিকানাধীন নয়– বরং ধার করা, অন্যের দান। তাই মৃত্যু এসে সমস্ত কিছু তছনছ করে দেয়। তখন তার শক্তিশালী পাঞ্জা থেকে তোমরা নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পার না। নিশ্চয়ই কোন প্রবল-পরাক্রান্ত সত্তা তোমাদের উপর রয়েছেন, যিনি তোমাদের অস্তিত্বের লাগাম নিজ হাতে ধরে রেখেছেন – যখন ইচ্ছা ঢিল দেন, যখন ইচ্ছা টেনে ধরেন।

৩. যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনর্বার জীবন দান করবেন, যাতে ইহকালের দৌড়-ঝাঁপ এবং কাজকর্মের ফলাফল উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। যার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এই বিশাল কারখানা (দুনিয়া) অযথা, নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।

৪. কোন কোন মুফাসসির ও ভাষাবিদের নিকট طرائق এর অর্থ طبقات –অর্থাৎ তিনি উপরে-নীচে আসমানের সাতটি স্তর বানিয়েছেন, যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন- كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কেমন করে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে-স্তরে? –সূরা নূহ, আয়াত ১৫)।

আর কেউ কেউ طرائق কে পথের অর্থে নিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি ফেরেশতাগণের বিচরণক্ষেত্র। সমকালীন কোন কোন লেখক বলেন- طرائق দ্বারা সাত গ্রহের কক্ষপথ উদ্দেশ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

৫. বরং প্রত্যেক বস্তুকে আমি পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপন, পরিপক্কতা ও অবগতির সাথে সৃষ্টি করেছি এবং তার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। আকাশমণ্ডলের বস্তুসামগ্রী ও ভূমণ্ডলীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যা আমার জ্ঞান ও শক্তিসীমার

১৮. এবং আমি আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি[১]। অতঃপর তা ভূমিতে জমিয়ে রাখি[২]। আর আমি তা ছিনিয়ে নিতেও অবশ্যই সক্ষম[৩]।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৯. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল এবং তা থেকে তোমরা খাও[৪]।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۱۹﴾

২০. এবং (উৎপন্ন করি) সেই বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে উদ্‌গত হয় (এবং) যা উৎপন্ন হয় তেল ও ভক্ষণকারীদের জন্য ব্যঞ্জনসহ[৫]।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿۲۰﴾

বাইরে। এমনটি হলে সমস্ত ব্যবস্থাপনাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (তিনি জানেন- যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা তা থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতরণ করে ও যা কিছু তাতে আরোহণ করে। -সূরা হাদীদ, রুকূ ১ আয়াত ৪)

১. অর্থাৎ এত বেশিও নয় যে, দুনিয়া অসময়ে ধ্বংস হয়ে যায়, আর এত কমও নয় যে, প্রয়োজনাদি পুরণ না হয়।

২. অর্থাৎ মাটি বৃষ্টির পানি চুষে নিয়ে নিজের মধ্যে জমা রাখে, যাতে আমরা কূপ ইত্যাদি খনন করে তা বের করতে পারি।

৩. অর্থাৎ বর্ষণ না করতে চাইলে তাও পারি, আর বর্ষণ করার পর তা থেকে তোমাদের বঞ্চিত করতে চাইলে তাও পারি- যেমন: পানি মাটির এত গভীরে নামিয়ে দেওয়া যে, তোমরা ওঠাতে ব্যর্থ হও; অথবা শুষ্ক করে বায়ুতে উড়িয়ে দেওয়া; অথবা পানিকে লোনা ও তিক্ত করে (ব্যবহারের অযোগ্য করে) দেওয়া- এসব কিছুই আমি করতে পারি।

৪. অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুরের বাগ-বাগিচার দৃশ্য দেখে তোমরা আনন্দিত হও এবং সেগুলির কোনটা ফল হিসাবে এবং কোনটা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কর।

৫. অর্থাৎ যয়তুনের গাছ উদ্‌গত করি, যা থেকে তেল বের হয়। এই তেল মালিশ ইত্যাদির কাজে আসে, আর বহু দেশের মানুষ ব্যঞ্জনরূপে তা ব্যবহার করে।

বিভিন্ন উপকার এবং বিশেষ গুণ ও মানের কারণে এ গাছের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ জন্যই সূরা তীনে এর নামে শপথ করা হয়েছে। আর 'তূর' পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে, এ পাহাড়ের বরকত ও গুরুত্ব প্রকাশ করা। সেখানে এর উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুতে রয়েছে শিক্ষা; তাদের উদরে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদের পান করাই, আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে আরো বহু ফায়দা এবং তাদের কতককে তোমরা ভক্ষণ কর[১];

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তোমরা তার উপর ও নৌযানে আরোহণ করে থাক[২]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। অতএব তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?'

---

১. উদ্ভিদজগতের পর এবার প্রাণীজগতের আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ, আমি নিজ কুদরতে তোমাদের চতুষ্পদ জীবজন্তুর দুধ পান করাই এবং এগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরো বহু ধরনের উপকারিতা রেখেছি। এমনকি, কোন কোন পশুর গোশত খাওয়াও হালাল করে দিয়েছি।

২. অর্থাৎ স্থলে জন্তুর পিঠে চড়ে এবং সমুদ্রে জাহাজ ও নৌকায় আরোহন করে দূর-দূরান্তে চলে যাও এবং বড় বড় ভারী বোঝা এগুলোর উপর তুলে নিয়ে যাও।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

নৌকার আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা নৌযান বানালেন, যা মহাপ্লাবনের সময় মুমিনদের রক্ষার ওসীলা হয়। অতঃপর নূহ আলাইহিস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে আরো কয়েকজন নবীর ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্ভবত নবীদের ঘটনাগুলির উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিতও আছে যে, আল্লাহ যেমন তোমাদের দৈহিক প্রয়োজনাদি পূরনের ব্যবস্থা করেছেন যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হল, তদ্রূপ আল্লাহ রহমান তোমাদের রূহানী (বা আত্মিক) প্রয়োজন পূরণ করনার্থে মানব জীবনের প্রথম থেকেই ওহী ও রেসালাতের ধারাও কায়েম করে দিয়েছেন। অথবা এমন বলা যেতে পারে যে, উপরে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি বর্ণনার পর তাওহীদের প্রতি মনোযোগী করার প্রয়োজন ছিল। তাই এখান থেকে নবুওয়াতের ও নবীদের আলোচনা শুরু হল, যার ভিতর দিয়ে নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের শুভ পরিণাম এবং অবিশ্বাসী ও অবাধ্যদের অশুভ পরিণামের কথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২৪. তখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানেরা বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ[১]। সে তোমাদের উপর (নিজের) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ চাইলে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করতেন[২]; আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি[৩]।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝

২৫. 'আর কিছু নয়, সে একজন উন্মাদ, অতএব তোমরা তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা কর[৪]।'

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

২৬. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কেননা ওরা আমাকে অস্বীকার করেছে[৫]।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

---

১. অর্থাৎ তার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কী পার্থক্য আছে যে, তোমরা না হয়ে তিনি রাসূল হয়ে যাবেন?

২. অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে বড় হয়ে থাকতে চান। তাই এসব ঢং শুরু করেছেন। নতুবা আল্লাহ কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠাতে চাইলে এ কাজের জন্য কি শুধু ইনিই ছিলেন, কোন ফেরেশতাকে রাসূলরূপে পাঠাতে পারতেন না?

৩. অর্থাৎ আমরা এরূপ অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি যে, আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহর রাসূল বনে যাবেন এবং সকল দেব-দেবীকে হটিয়ে শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য করাবেন!

৪. মনে হয়, এই বেচারার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, সমস্ত জাতির খেলাফ এবং নিজ পূর্বপুরুষদেরও খেলাফ এমন কথা মুখে আনা, যা কোন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না— নিছক পাগলামী ছাড়া আর কী? সুতরাং উত্তম এই যে, কয়েক দিন ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা কর, হয়ত কিছুদিন পর এর সম্বিত ফিরে আসবে, পাগলামি চলে যাবে। আর মরে গেলে তো পুরো বিষয়টিরই পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে। (আল্লাহর পানাহ!)

৫. অর্থাৎ যখন নূহ (আ)-এর সমস্ত চেষ্টা-তদবীর বৃথা প্রমাণিত হল, সাড়ে নয়শ বছর কষ্ট-যাতনা সহ্য করেও ওদের সত্যের পথে আনতে সফল হলেন না। তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, এই দুর্ভাগাদের বিরুদ্ধে আমায় সাহায্য করুন। কেননা, বাহ্যত এরা আমাকে অস্বীকার করেই যাবে, এ থেকে বিরত হবে না, বরং অন্যদেরও বিপথগামী করবে।

فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. তখন আমি তাঁর নিকট ওহী পাঠালাম যে, 'তুমি আমার দৃষ্টির সামনে ও আমার নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে যাবে এবং উনান (থেকে পানি) উথলে উঠবে, তখন তুমি প্রত্যেক (জীবের) এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নিয়ো এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও[১], তবে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পূর্বেই (শাস্তির) কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা ছাড়া[২]। আর জালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না, নিশ্চয় ওদের নিমজ্জিত হতে হবে[৩]।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. 'অতঃপর যখন তুমি ও যারা তোমার সঙ্গে আছে তারা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বলবে- 'শোকর আল্লাহর, যিনি জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন[৪]।'

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আরো বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে বরকতময়ভাবে অবতরণ করান। আপনিই সর্বোত্তম অবতারণকারী[৫]।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। আর আমি তো পরীক্ষাকারী[৬]।

---

১. এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা হূদ (আয়াত ৩৭-৪৬) প্রভৃতিতে গত হয়েছে, সেখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ কাফেরদের আরোহণ করাবে না, চাই তোমার বংশের হোক না কেন।

৩. অর্থাৎ আযাবের অকাট্য হুকুম জারি হয়ে গেছে! এ হুকুম অটল, এটা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এখন আর জালেমদের কাউকেই রক্ষার জন্য আমার নিকট সুপারিশ করো না।

৪. অর্থাৎ তাদের থেকে আমাদের আলাদা করেছেন এবং আযাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

৫. অর্থাৎ নৌকায় আরামের উত্তম স্থান দিন এবং নৌকা থেকে যেখানে নামানো হবে, সেখানেও যেন কোন কষ্ট না থাকে। সর্বত্র ও সর্বতোভাবে আপনার রহমত ও বরকত যেন আমাদের সাথী হয়।

৬. পরীক্ষা এই যে, কে এসব নিদর্শনের কথা শুনে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং কে করে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (আর আমি

৩১. অনন্তর, আমি তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করলাম[১]।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا اٰخَرِيۡنَ ۚ

৩২. এবং তাদের মধ্যে তাদেরই থেকে একজন রাসূল[২] পাঠালাম– (এ বার্তাসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় কর না?'

فَاَرۡسَلۡنَا فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَـكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ

[রুকূ - ৩]

৩৩. তখন তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা কাফের ছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করত এবং যাদের আমি দুনিয়ার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম[৩]– তারা বলল, এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; সে তা আহার করে যা তোমরা আহার কর এবং তা পান করে যা তোমরা পান কর[৪]।

وَقَالَ الۡمَلَاُ مِنۡ قَوۡمِهِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِلِقَآءِ الۡاٰخِرَةِ وَاَتۡرَفۡنٰهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ ۙ يَاۡكُلُ مِمَّا تَاۡكُلُوۡنَ مِنۡهُ وَيَشۡرَبُ مِمَّا تَشۡرَبُوۡنَ

৩৪. 'তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে[৫]।

وَلَٮِٕنۡ اَطَعۡتُمۡ بَشَرًا مِّثۡلَـكُمۡ اِنَّكُمۡ اِذًا لَّخٰسِرُوۡنَ

তা নির্দশনস্বরূপ রেখে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী? –সূরা কামার, রুকূ ১, আয়াত ১৫)

১. এ হচ্ছে 'আদ' বা 'ছামূদ' জাতির আলোচনা।

২. অর্থাৎ হযরত হূদ আলাইহিস সালাম বা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। [কেননা, আদ জাতির প্রতি হূদ (আ) এবং ছামূদ জাতির প্রতি সালেহ (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। –অনুবাদক।]

৩. অর্থাৎ মরণের পর একদিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, এ আকীদা-বিশ্বাস ওদের ছিল না। দুনিয়ার জীবন ও এর আরাম-আয়েশই ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

৪. অর্থাৎ বাহ্যত কোন বিষয়েই তিনি তোমাদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যধারী নন।

৫. অর্থাৎ নিজেদের মতই একজন সাধারণ মানুষকে অযথা মান্যবর বানিয়ে নেওয়া– এর চেয়ে মন্দ ও অপমানকর কাজ আর কী হতে পারে?

৩৫. 'সে কি তোমাদের এই ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মাটি ও হাড়-গোড় হয়ে যাবে, তখন তোমরা উত্থিত হবে?

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. 'অসম্ভব, তোমাদের যার ভয় দেখানো হচ্ছে তা অসম্ভব[১]।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'জীবন তো এই আমাদের পার্থিব জীবনটাই। আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমরা পুনরুত্থিত হব না[২]।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. 'আর কিছু নয়, সে এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই[৩]।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কেননা ওরা আমাকে অস্বীকার করেছে[৪]।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৪০. আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয় অচিরেই ওরা অনুতপ্ত হবে[৫]।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

---

১. অর্থাৎ হাড়-গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তোমরা কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে– এটা কতটা নির্বুদ্ধিতার কথা! এমন আজগুবি কথা মানতে কে তৈরি হবে?

২. অর্থাৎ কিসের আখেরাত, আর কিসের হিসাব-কিতাব? আমরা তো জীবন বলতে শুধু দুনিয়ার এই জীবনকেই জানি এবং আমরা একবারই জন্মগ্রহণ করি ও মৃত্যুবরণ করি– যা সবার চোখের সামনে সংঘটিত হতে থাকে। এর বাইরে আর কিছু নেই।

৩. অর্থাৎ এই মিথ্যা রচনা করেছে যে, আমি আল্লাহর পয়গম্বর এবং তিনি মৃতদের পুনর্বার জীবিত করে আযাব ও ছওয়াব দান করবেন। এ উভয় দাবিই এমন যে, আমরা কখনো তা মানতে পারি না। এমন মিথ্যা দাবির ব্যাপারে অযথা ঝগড়া করে ও মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?

৪. অর্থাৎ কাফেরদের দিক থেকে নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত পয়গম্বর (আ) দো'য়া করলেন।

৫. অর্থাৎ আযাব আসবেই আসবে। তখন ওরা অনুশোচনা করবে, কিন্তু সেই অনুতাপে কোন লাভ হবে না।

৪১. অতঃপর সত্যিই ওদের আঘাত করল এক বিকট শব্দ*[১], ফলে আমি ওদের আবর্জনায় পরিণত করলাম[২]। অতএব দূর হোক অপরাধী সম্প্রদায়[৩]!

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪২. অনন্তর, আমি তাদের পরে সৃষ্টি করলাম আরো বহু সম্প্রদায়।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

৪৩. কোন সম্প্রদায় তার নির্ধারিত সময়ের আগেও যেতে পারে না এবং (তা থেকে) পিছনেও থাকতে পারে না[৪]।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

৪৪. অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূলদের পাঠাতে থাকি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাদের রাসূল আগমন করেছেন, ওরা তাঁকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আমিও ওদের একের পর এককে ধ্বংস করতে থেকেছি এবং ওদের পরিণত করেছি কিস্‌সা-কাহিনীর বিষয়ে[৫]। সুতরাং দূর হোক[৬] ঐ সম্প্রদায়, যারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۭ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'অতঃপর সত্য (প্রতিশ্রুতি) অনুযায়ী ওদের পাকড়াও করল এক বিকট শব্দ।'

১. এর দ্বারা বাহ্যত মনে হয় যে, আয়াতে বর্ণিত কাহিনী 'ছামূদ' জাতির। কেননা, ওরাই বিকট গর্জনে মরেছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. অর্থাৎ বন্যার স্রোতে যেমন খর-কুটা ভেসে যায়, তেমনি খোদায়ী আযাবের বন্যায় ওরা ভেসে গেল।

৩. অর্থাৎ খোদার রহমত থেকে (দূর হোক)।

৪. অর্থাৎ যেসব জাতি পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছে, তারা নিজ নিজ প্রতিশ্রুত সময়েই ধ্বংস হয়ে গেছে (কোন জাতিরই ধ্বংস নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট আগে-পরে হয়নি)।

৫. আমি একের পর এক পয়গম্বর পাঠাতে থেকেছি এবং অস্বীকারকারীদের মধ্যেও একের পর এককে ধ্বংস করেছি। একদিকে পয়গম্বরদের প্রেরণ, অন্যদিকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস সাধন– এ উভয়টি পাশাপাশি চলতে থাকে। ফলে, এমন অনেক জাতি ধ্বংস ও নিপাত করে দেওয়া হয়েছে, দুনিয়াতে যাদের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। আজ ওদের উপখ্যান কেবল শিক্ষা গ্রহণের জন্য পড়া ও শোনা হয়।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে।

৪৫. তার পর আমি মূসা ও তাঁর ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম–

ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰی وَ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۬ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ۙ﴿۴۵﴾

৪৬. ফেরাওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু ওরা অহং প্রকাশ করল, আর ওরা ছিলই উদ্ধত সম্প্রদায়[১]।

اِلٰی فِرۡعَوۡنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَ كَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ ﴿ۚ۴۶﴾

৪৭. তো, ওরা বলল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের সেবাদাস[২]?'

فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَ قَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ ﴿ۚ۴۷﴾

৪৮. মোটকথা, ওরা তাঁদের অস্বীকার করল, ফলে ওরা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

فَكَذَّبُوۡهُمَا فَكَانُوۡا مِنَ الۡمُهۡلَكِيۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৯. আর নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে[৩]।

وَ لَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَی الۡكِتٰبَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৫০. এবং আমি মারয়াম-পুত্র ও তাঁর মাতা (মারয়াম)-কে নিদর্শন বানিয়েছিলাম[৪] এবং তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম অবস্থান-উপযোগী ও প্রবহমান নহরবিশিষ্ট এক উচ্চভূমিতে[৫]।

وَ جَعَلۡنَا ابۡنَ مَرۡيَمَ وَ اُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّ اٰوَيۡنٰهُمَاۤ اِلٰی رَبۡوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِيۡنٍ ﴿ؒ۵۰﴾

---

১. সেজন্য আল্লাহর পয়গামকে ওরা অন্তরে স্থান দেয়নি, গর্ব ও অহংকারের নেশা ওদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে ফেলেছিল।

২. অর্থাৎ মূসা ও হারূনের সম্প্রদায় (বনী ইসরাঈল) তো আমাদের গোলামী করছে, তাদেরই দুই ব্যক্তিকে কী করে আমরা নিজেদের নেতা বানাতে পারি?

৩. অর্থাৎ ফেরাওনীদের ধ্বংসের পর আমি মূসা (আ)-কে তাওরাত শরীফ দান করি, যাতে লোকেরা এর বাতানো পথের অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির মনযিল তথা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

৪. অর্থাৎ আমার কুদরতের নিদর্শন বানিয়েছিলাম যে, পিতা ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পয়দা করে দিলাম। ইতিপূর্বে সূরা 'আলে-ইমরান' (আয়াত ৪৫) ও সূরা 'মারয়ামে' (আয়াত ২১) এর আলোচনা করা হয়েছে।

৫. **رَبۡوَة– দ্বারা কী উদ্দেশ্য?**

সম্ভবত এর দ্বারা সেই টিলা বা উচ্চভূমি উদ্দেশ্য, যেখানে হযরত মারয়াম (শিশু ঈসাকে) জন্মদানকালে অবস্থান করেছিলেন। কেননা, সূরা মারয়ামের এই আয়াতগুলি- فَنَادٰىهَا مِنۡ

تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ،وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا –প্রমাণ করে যে, সেই স্থানটি উঁচু ছিল, আর নীচে ঝরনা বা নহর প্রবাহিত হচ্ছিল এবং খেজুরবৃক্ষ নিকটেই ছিল (ইবনে কাছীর)।

তবে সাধারণত মুফাসসিরগণ লেখেন, এটি হযরত মাসীহর বাল্যকালের ঘটনা। হেরেদোস নামক এক জালেম বাদশাহ গণকদের নিকট শুনতে পেল যে, হযরত মাসীহ সরদার হবেন। এতে সে তাঁর বাল্যকালেই তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় ছিল। হযরত মারয়াম ইলহাম সূত্রে জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে মিসর চলে গেলেন এবং এ জালেমের মৃত্যুর পর পুনরায় শামে ফিরে আসেন। 'মথি'-এর ইনজীলেও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

তো, এখানে ربوة দ্বারা মিসর উদ্দেশ্য। আর মিসর নীল নদ থেকে উঁচু ছিল। তা না হলে মিসর পানিতে ডুবে যেত। আর معين বলতে 'নীল' নদ উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ ربوة (উঁচু ভূমি) দ্বারা শাম বা ফিলিস্তিন উদ্দেশ্য করেছেন। আর এমনও হতে পারে যে, জন্মদানের সময় মারয়ামের অবস্থান যে টিলার উপর ছিল, উপরোক্ত আশঙ্কার সময়ও তাঁদেরকে সেখানেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। (والله أعلم)

একটি অসার ধারণার অপনোদন

যা হোক, মুসলমানদের কেউই ربوة দ্বারা কাশ্মীর বোঝেননি এবং কাশ্মীরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কবর আছে বলেও মত প্রকাশ করেননি। তবে বর্তমান কালের কোন কোন বিকৃতমনা লোক দাবি করেছে যে, ربوة দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য এবং সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে বলে মত পোষণ করে। এ কথার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ শুধু মিথ্যা ও রটনা ছাড়া কিছুই নয়। শ্রীনগরের 'খান-ইয়ার' নামক মহল্লায় যে কবরটি 'ইয়ূয-আসিফ' নামক ব্যক্তির বলে প্রসিদ্ধ এবং যার সম্বন্ধে تاريخ أعظمي-এর প্রণেতা স্রেফ জনশ্রুতি উল্লেখ করেছেন যে– 'লোকেরা ওকে কোন নবীর কবর বলে থাকে'। আসলে তিনি নবী নন, কোন রাজপুত্র ছিলেন এবং বিদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। একে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের কবর আখ্যায়িত করা নিতান্তই নির্লজ্জতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। এহেন কল্পনাবিলাসীদের কথায় হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের হায়াতকে বাতিল সাব্যস্ত করা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও পাগলামি বৈ কিছু নয়।

উল্লিখিত কবর সম্বন্ধে তথ্যবহুল কথা কাম্য হলে এবং 'ইয়ূয-আসিফ' কে ছিলেন, তা জানতে হলে জনাব মুন্সী হাবিবুল্লাহ অমৃতসরীর লেখা পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, যা এ বিষয়েই তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এতে উল্লিখিত অমূলক ধারণা-কল্পনার প্রাসাদ চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের ও সমগ্র মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

[রুকূ - ৪]

৫১. 'হে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র বস্তুরাজি খাও ও সৎকর্ম কর[১]। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত[২]।

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ ؕ﴿۵۱﴾

৫২. (তাওহীদের) এ দীনই তোমাদের দীন– যা (নবী-রাসূলদের) অভিন্ন দীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর।'

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿۵۲﴾

৫৩. অতঃপর লোকেরা (মতভেদ করত) নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে[৩]।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُرًا ؕ

১. অর্থাৎ সকল নবীর দীন-ধর্মে এই বিধান চলে এসেছে যে, হালাল উপায়ে উপার্জন করে খেতে হবে এবং নেককাজ করতে হবে। নেককাজ কী, তা সকলের জানা। তাই তো সকল পয়গম্বর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও পরিপক্কতার সাথে হালাল খাদ্য খাওয়া, সত্য কথা বলা ও নেক আমল করার ব্যাপারে সদা যত্নবান থেকেছেন এবং নিজ উম্মতদের এরই তাকীদ করে গিয়েছেন।

এস্থলে রাসূলদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কুরআন কারীমের অন্যত্র একই ধরনের হুকুম সর্বসাধারণ মুমিনদের দেওয়া হয়েছে। আয়াতে খ্রিস্টানদের সন্ন্যাসব্রতেরও খণ্ডন রয়েছে, যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। হাদীস থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তির পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম সম্পদ দ্বারা অর্জিত, তার জন্য উচিত নয় নিজ দো'য়া কবুল হওয়ার আশা করা (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০১৫)। কোন কোন হাদীসে আরো আছে, যে শরীর হারাম খাদ্যে পালিত হয়েছে, দোযখের আগুনই তার বেশি উপযোগী (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৬১৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১৭২৩)।

২. অর্থাৎ যারা হালাল খায় এবং নেক কাজ করে, তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কাজ ও অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত। সে অনুসারেই তিনি তাদের সাথে আচরণ করবেন। আয়াতে রাসূলদের সম্বোধন করে মূলত উম্মতদের শোনান উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ মৌলিক বিষয়াদির দিক থেকে সকল নবীর দীন এক, আর সকলের আল্লাহও এক, যাঁর নাফরমানী থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত। কিন্তু লোকেরা মতবিরোধ সৃষ্টি করে আসল দীন-ধর্মকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথ বের করে নিয়েছে। এভাবে বিভিন্ন মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে হাজারো ফেরকা (বা সম্প্রদায়) ও ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ বিভেদ নবীদের শিক্ষার ফল নয়। কারণ, স্থান ও কালের পার্থক্যের কারণে তাঁদের মাঝে শাখা বিষয়াদিতে পার্থক্য ছিল, তবে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।

সাধারণত মুফাসসিরগণ আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপেই করেছেন।

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত[১]।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ

৫৪. অতএব ওদেরকে ওদের অজ্ঞানতায়* নিমজ্জিত থাকতে দিন কিছুকাল পর্যন্ত।[২]

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ

৫৫. ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের যে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি–

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

৫৬. (তা দ্বারা) ওদের জন্য কল্যাণসমূহ তরান্বিত করছি[৩]? (এমন নয়), বরং ওরা উপলব্ধি করছে না[৪]।

কিন্তু হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেক পয়গম্বরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তৎকালীন লোকদের ব্যাধি ও বিকৃতির সংশোধন করিয়েছেন। পরবর্তীতে লোকেরা ভাবল, নবীদের দীন ভিন্ন ভিন্ন। সর্বশেষে আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে সকল বিকৃতির সংস্কার (ও সমস্ত ব্যাধির চিকিৎসা) একত্রে বাতলিয়ে দিলেন। এখন সকল দীন মিলে এক দীন হয়ে গেল' এবং সকল জাতিকে একই পতাকাতলে সমবেত করে দেওয়া হল।

১. অর্থাৎ ওরা মনে করছে যে, আমরাই হকের উপর আছি এবং আমাদের পথই সরল-সোজা পথ।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা– 'ভ্রষ্টতায়'।**

২. অর্থাৎ যারা নবীদের অভিন্ন হেদায়াতসমূহে বিভেদ সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন ফেরকা ও ধর্মমত কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রত্যেক ফেরকা নিজ আকীদা-বিশ্বাস ও খেয়ান-ধারণায় অটল-অবিচল! আপনি যতই নসীহত করুন না কেন, কোন মতেই ওরা তা থেকে ফিরতে চায় না। অতএব আপনি ওদের চিন্তায় পেরেশান হবেন না, বরং ওদের কিছু দিনের অবকাশ দিন– যাতে ওরা নিজেদের গাফলত ও মূর্খতার ভেতর ডুবে থাকে। অবশেষে সেই মুহূর্ত উপস্থিত হবে, যখন ওদের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে– অর্থাৎ মৃত্যু বা আল্লাহর আযাব মাথার উপর চক্কর দিতে শুরু করবে।

৩. ওদের এ ধারণাই ছিল! এজন্যই ওরা বলত- نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ (আমরা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে তোমাদের থেকে অধিক এবং আমাদের উপর আদৌ আযাব আসবে না। –সূরা সাবা, রুকূ ৪, আয়াত ৩৫)–অর্থাৎ আমরা যদি আল্লাহর নিকট ধিকৃত ও বিরাগভাজন হতাম, তবে তিনি এই ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির প্রাচুর্য কেন দিতেন?

৪. অর্থাৎ ওরা বুঝতে পারছে না যে, সম্পদ ও সন্তানের উক্ত প্রাচুর্য ওদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে নয়, বরং ঢিল ও অবকাশ দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়েছে। যতই অবকাশ দেওয়া হচ্ছে, ততই ওদের অপরাধ ও শাস্তির পাল্লা ভারী হচ্ছে।

৫৭. যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত[১],	اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. যারা নিজেদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে[২],	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. যারা নিজেদের রবের সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে না[৩],	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. এবং যারা যা কিছু দান করে কম্পিত হৃদয়ে দান করে, কেননা তাদেরকে আপন রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে[৪]—	وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. এমন লোকেরাই কল্যাণরাজি অর্জনে সচেষ্ট থাকে এবং তারা তা সর্বাগ্রে লাভ করে☆[৫]।	اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

১. অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সত্ত্বেও মুমিনগণ কাফের ও অহংকারীদের মত আল্লাহর মকর (বা কৌশল) থেকে নির্ভয় থাকে না, বরং সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত থাকে– কি জানি, দুনিয়াতে যে এতসব নে'য়ামতের বৃষ্টিধারা হচ্ছে, তা অবকাশরূপে নয় তো? হাসান বসরী (র)-এর উক্তি রয়েছে- إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا (মুমিন সৎকর্ম করে শঙ্কিত থাকে, আর মুনাফিক অসৎকর্ম করে নিশ্চিন্ত থাকে।)

২. অর্থাৎ তারা (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ ও (কুরআনের) আয়াতসমূহ– উভয়ের প্রতি ঈমান রাখে। তারা বিশ্বাস করে, যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তা নিতান্তই হেকমতপূর্ণ, যে সংবাদ দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ সত্য এবং যে নির্দেশ আসে তা সবদিক থেকে সঠিক ও সংগত।

৩. অর্থাৎ তাঁরা খাঁটি ঈমান ও তাওহীদের উপর রয়েছে। প্রত্যেকটি আমল সততা ও এখলাসের সাথে আদায় করে। তাতে প্রকাশ্য বা গোপন শিরকের ছায়াও মিশ্রিত হতে দেয় না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করেও তাদের এই সংশয় থেকে যায় যে, কী জানি, আল্লাহর নিকট কবুল হল কি না? ভবিষ্যতে কাজে আসবে কি না? তারা নিজ আমলের উপর গৌরব করে না, বরং সৎকর্ম করা সত্ত্বেও ভীত থাকে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তারাই দ্রুত অগ্রসর হয় নেক কাজ-কর্মে এবং তারাই তার জন্য প্রতিযোগিতা করে'।

৫. দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন- فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ (অতঃপর আল্লাহ তাদের দান করেছেন দুনিয়ার প্রতিফল ও আখেরাতের উত্তম প্রতিদান। –সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৪৮)– সুতরাং বোঝা গেল, আসল কল্যাণ

৬২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করি না। এবং আমার নিকট রয়েছে এক কিতাব ('আমলনামা'), যা সত্য বলে দেবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[১]।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۝

৬৩. বস্তুত ওদের অন্তর এ বিষয়ে উদাসীনতায় নিমজ্জিত, আর তা ছাড়া ওদের অন্য কাজ-কর্ম রয়েছে, ওরা তাই করছে[২]।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ۝

৬৪. অবশেষে আমি যখন ওদের ঐশ্বর্যশালী লোকদের আযাবে পাকড়াও করব, তখনই ওরা আর্তনাদ করতে শুরু করবে।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ۝

৬৫. (তখন বলা হবে), 'আজ আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না[৩]।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ۝

ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে নয় যেমনটি কাফেররা ভাবে, বরং তা সৎকর্ম, উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং উন্নত আদর্শ ও গুণাবলির মধ্যে নিহিত।

১. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেসব সৎকর্ম ও গুণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মানব-শক্তির বহির্ভূত নয়। মানুষকে সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দেওয়া আমার নীতি নয়। এসব বিষয় এমন যে, মনোযোগ দিলে সহজেই হাসিল করা যায়। আর যারা পূর্ববর্তী কামেলদের স্তরে পৌছতে পারে না, তাদেরও সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। এটাই তাদের দায়িত্ব।

(...وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ) আর আমলনামাগুলিতে প্রত্যেকের আমল লিখিত রয়েছে, যেগুলি কিয়ামতের দিন সকলের সামনে খুলে রাখা হবে এবং তা অনুযায়ীই প্রতিদান দেওয়া হবে। মানুষের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না, কারো নেকী বিনষ্ট হবে না, প্রতিদান হ্রাস করা হবে না, বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে একের বোঝা অন্যের উপর চাপানো হবে না।

২. অর্থাৎ কাফেররা আখেরাতের হিসাব-কিতাব সম্বন্ধে উদাসীন এবং দুনিয়ার অন্যান্য কাজে এমনভাবে মেতে আছে যে, আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার এবং সেসব থেকে বের হওয়ার অবসরই পায় না। অথবা অর্থ এই যে, ওদের অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং উদাসীনতা-মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এটা তো হল ওদের বড় পাপ। এর বাইরেও অনেক পাপ আছে, যা ওরা করছে, কিছুতেই তা থেকে বিরত হচ্ছে না। আর বিরত হবেই বা কেমন করে? যেসব কাজ ওদেরই অযোগ্যতার কারণে ওদের ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা তো করেই ছাড়বে এবং এর খেসারতও অবশ্যই পোহাতে হবে।

৩. অর্থাৎ যখন ইহকালীন বা পরকালীন আযাবের সম্মুখীন হবে, তখন চিৎকার করে বলবে, 'এ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাও! কিন্তু সেখানে বাঁচাবে কে? হুকুম হবে, 'চেঁচামেচি করো না,

৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পড়ে শোনানো হত। তখন তোমরা পিছন ফিরে চলে যেতে–	قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝٦٦
৬৭. কুরআনের সঙ্গে অহংকার করে[১]; (যেন) তোমরা এক গল্পবাজকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে*[২]।	مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝٦٧

এ চিৎকার-আর্তনাদ নিরর্থক। আজ কেউই তোমাদের সাহায্যে আসবে না, কেউ আমার আযাব থেকে তোমাদের রেহাই দিতে পারবে না।'

দুনিয়াতেই আযাবের কিছু নমুনা!

এ আযাবের একটি নমুনা মক্কার কাফেরদেরকে বদরের প্রান্তরে দেখানো হয়েছে, যেখানে ওদের বড় বড় সরদার নিহত বা বন্দী হয়। মহিলারা মাসের পর মাস শোক প্রকাশ করতে থাকে– মাথার চুল কেটে বিলাপ করে, চিৎকার করে, আর্তনাদ করে, বুক চাপড়ায়। কিন্তু এসবে কোনই কাজ হয়নি।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বদ-দো'য়া করেন। ফলে লাগাতার সাত বছর দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে– অগত্যা ওরা মৃত জীবজন্তুর চামড়া ও হাড়গোড় ভক্ষন করতে ও রক্ত পান করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ওরা দয়ার সাগর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দো'য়ার দরখাস্ত করে। তিনি দোয়া করেন, ফলে আল্লাহ তাআলা আযাব তুলে নেন। তখন তো ওদের দেব-দেবী অর্থাৎ 'লাত', 'মানাত' বা 'হুবল', 'নায়েলা' কোন কাজেই আসেনি। (সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১১২৮৯)

১. অর্থাৎ এখন কেন চিল্লাচিল্লি করছ? সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন খোদার পয়গম্বর তোমাদেরকে কুরআনের আয়াত পড়ে শোনাতেন, আর তোমরা পিছন ফিরে চলে যেতে, তা শুনতে পর্যন্ত অসহনীয় লাগত। আসলে তোমাদের গর্ব ও অহংকার সত্যকে গ্রহণ করতে এবং পয়গম্বরের কথা শুনতে তোমাদের অনুমতি দিত না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা রাতে গল্প-গুজব করতে (আর কুরআনকে) পরিত্যাগ করতে। বাঃ ('এর ব্যাপারে) আজে-বাজে কথা বলতে'।

২. অর্থাৎ নবীজির দরবার থেকে এমনভাবে উঠে যেতে, যেন কোন বাজে গল্পকারকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ।

سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ –এর এ অর্থও হতে পারে যে, তোমরা রাতের বেলা হরম শরীফে বসে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও কুরআন কারীম সম্বন্ধে নানা কথা বলতে– কেউ বলতে 'যাদু', কেউ বলতে 'কবিত্ব', কেউ 'গণকের কথা' বলতে, কেউ অন্য কিছু। এ ধরনের বাজে কথা ও অর্থহীন প্রলাপ করতে। আজ তার মজা উপভোগ কর। চিল্লাচিল্লি করে কোন লাভ হবে না।

৬৮. তবে কি ওরা এ বাণীতে চিন্তা-ভাবনা করেনি[১]? না কি ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে, যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি[২]?

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

৬৯. অথবা ওরা কি নিজেদের রাসূলকে চিনেনি, ফলে তাঁকে অস্বীকার করছে[৩]?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۝

৭০. অথবা ওরা কি বলে, 'সে উন্মাদ'? (তা নয়), বরং তিনি তো ওদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ওদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে[৪]।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ এরা কুরআনের সৌন্দর্য-মহিমা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। করলে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হত এবং বুঝতে পারত যে, নিঃসন্দেহে এ আল্লাহ তাআলার কালাম, যার মধ্যে ওদের রোগের সঠিক এলাজ বাতলানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ উপদেশদাতাদের আগমন-ধারা চিরকাল বিদ্যমান, পয়গম্বরগণ বা পয়গম্বরদের অনুসারীগণ সর্বদা বর্তমান ছিলেন। আসমানী কিতাবও যুগে যুগে অবতীর্ণ হতে থেকেছে– কখনো এক স্থানে, কখনো অন্য স্থানে। সুতরাং পয়গম্বরের আগমন অভূতপূর্ব বিষয় নয়, যার নমুনা পূর্বে ছিল না। তবে এখন সব চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও জ্ঞানগর্ভ কিতাব এসেছে। এর সমকক্ষ ও সমমর্যাদার কিতাব পূর্বে কখনো আসেনি। অতএব এর দাবি তো এই যে, ওরা এমন নে'য়ামতের অধিকতর কদর করবে এবং এর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবে– যেমনটি করেছিলেন সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

বি. দ্র. সম্ভবত এখানে آباء أوّلين দ্বারা آباء أبعدين অর্থাৎ দূরবর্তী পূর্বপুরুষ উদ্দেশ্য। আর সূরা ইয়াসীনে (আয়াত ৬) যে আছে- لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, সেখানে آباء أقربين তথা নিকটবর্তী বাপদাদারা উদ্দেশ্য। (আল্লাহই ভাল জানেন)।

৩. অর্থাৎ ওরা কি রাসূল (সা.) কে এ কারণে অস্বীকার করছে যে, ওরা তাঁর হাল-অবস্থা জানে না?! অথচ সারা আরবের লোকে জানে, তিনি বাল্যকাল থেকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী এবং পবিত্র ও সচ্চরিত্র। তাই তো দেখা যায়, হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহর সামনে হযরত জাফর (রা), কিসরার (পারস্য-সম্রাটের) প্রতিনিধির সামনে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা এবং আবু সুফয়ান কাফের থাকাকালে রোমের সম্রাট কায়সারের দরবারে এ স্বীকারোক্তি করেছিলেন। সুতরাং এরূপ প্রখ্যাত ও সর্বজনপরিচিত সত্যপরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধে কী করে ধারণা করা যায় যে, তিনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করতে শুরু করেছেন?

৪. অর্থাৎ উন্মাদ ও পাগলদের কথাবার্তা কি কখনো এমন নিখুঁত ও সত্য হয়? আসল কথা এই যে, ওরা মুখে তো অস্বীকার করে, তবে ওদের অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, যা কিছু তিনি আনয়ন

৭১. আর যদি সত্য খোদা ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতেন*, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং যারা এসবের মধ্যে আছে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত[১]। বস্তুত আমি ওদের নিকট ওদের নসীহত পৌঁছে দিয়েছি[২], কিন্তু ওরা ওদের নসীহত থেকে বিমুখ[৩]।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝

৭২. অথবা আপনি কি ওদের নিকট কোন প্রতিদান চান? বস্তুত আপনার রবের প্রতিদানই উৎকৃষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা[৪]।

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ۝

করেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু সত্য কথা ওদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূল ছিল না বলে তা খারাপ লাগত এবং তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হত না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আর যদি সত্য ওদের খেয়াল-খুশীর অনুগত হত...'।

১. অর্থাৎ সত্য ওদের কাছে খারাপ লাগলে লাগতে দিন। সত্য ওদের মর্যি ও প্রবৃত্তির অনুসারী হতে পারে না। যদি সত্য খোদা ওদের মর্যি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেন, তবে তিনি কেমন খোদা? তিনি তো সে ক্ষেত্রে বান্দার হাতে খেলার পুতুল হয়ে যাবেন। এ অবস্থায় পৃথিবী ও আকাশরাজ্যের এ পরিপক্ক ব্যবস্থা কী করে কায়েম থাকবে? পৃথিবী ও আকাশরাজ্যের ব্যবস্থাপনা তো বিরাট ব্যাপার, একটি ছোট্ট গ্রামের ব্যবস্থাপনা যদি শুধু জনসাধারণের খেয়াল-খুশীর অধীন করে দেওয়া হয়, তবে তাও দু চার দিন টিকে থাকতে পারে না। কেননা, জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিরোধী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক হতে দেখা গেছে। এই সংঘাতের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে যাবে।

২. আর এরই আকাঙ্ক্ষা ওরা করত। যেমন: ইরশাদ হয়েছে– لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ، لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের মত কোন উপদেশবাণী থাকত, তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা হয়ে যেতাম। –সাফ্ফাত :১৬৮-১৬৯।)

৩. যখন উপদেশ এসে গেল এবং এমনভাবে আসল, যার ফলে জাতি হিসাবে ওদের বিরাট গৌরব ও মর্যাদা অর্জিত হল– তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে, এত বড় মহামর্যাদা ও গৌরবকে হেলায় হাতছাড়া করল।

৪. অর্থাৎ আপনি দাওয়াত ও তাবলিগ এবং উপদেশ ও হিতাকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে ওদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাচ্ছেন না। আল্লাহ তাআলাই আপনাকে ইহ ও পরকালে যে দৌলত দান করেছেন, তা এহেন পারিশ্রমিক থেকে কতই না উত্তম!

৭৩. আর আপনি তো ওদের সরল পথের দিকে আহবান করেন ।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৭৪. কিন্তু যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা পথ থেকে বিচ্যুত[১] ।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ۝

৭৫. আর আমি যদি ওদের প্রতি দয়া করি এবং ওদের যে দুঃখ-কষ্ট আছে তা দূর করে দেই, তবুও ওরা উদভ্রান্ত হয়ে নিজেদের অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকবে[২] ।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

৭৬. আমি তো ওদের আযাবে পাকড়াও করেছিলাম, তারপরও ওরা নিজেদের রবের সামনে অবনত হয়নি এবং কাকুতি-মিনতি করেনি[৩] ।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ আপনার সততা, সাধুতা ও সত্যবাদিতার কথা সকলে জানে। আপনি যে কালাম নিয়ে এসেছেন, তার গুণাবলি দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট। আপনার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেনি, ওদের থেকে আপনি কোন বিনিময়ের প্রত্যাশাও করেন না। যে পথের দিকে আপনি আহ্বান করছেন, তা সম্পূর্ণ সরল ও পরিষ্কার পথ, যা প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই অনায়াসে বুঝতে পারে– তাতে কোন বক্রতা ও জটিলতা নেই। তবে এ সরল পথে চলা তাদেরই ভাগ্যে জুটবে, যারা মৃত্যু–পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী এবং নিজেদের পরিণাম কী হবে তা সম্বন্ধে ভীত। পরিণামের ভয় ও প্রতিফলের ফিকিরই যার নেই, সে কি আর সরল পথে চলবে? সে নিশ্চিতরূপে বক্রই থাকবে এবং সরল পথের পরিবর্তে বক্রপথেই চলবে।

২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট দূর করত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও এরা শোকর করবে না এবং দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত হবে না। হুজূর (সা.)-এর দো'য়ার কারণে একবার মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল, তারপর তাঁরই দো'য়ার বরকতে মুক্ত হয়। সম্ভবত আয়াতে উক্ত ঘটনাই উদ্দেশ্য।

অথবা অর্থ এই যে, যদি আমি নিজ রহমতে ওদের দুর্বলতা দূর করে দিই অর্থাৎ কুরআনের বুঝ দিয়ে দিই, তবুও ওরা নিজেদের চির দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার কারণে আনুগত্য অবলম্বন করবে না, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (আল্লাহ যদি ওদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন, তবে ওদের শুনিয়ে দিতেন। আর যদি এখন ওদের শুনিয়ে দেন, তবুও ওরা অবশ্যই মুখ ফিরিয়ে পালাবে। –সূরা আনফাল, আয়াত ২৩)

৩. উদাহরণস্বরূপ, ওদের উপর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিপদাপদ আপতিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ওরা নত হয়ে আল্লাহর কথা মানেনি।

৭৭. অবশেষে আমি যখন ওদের জন্য এক কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব, তখনই ওরা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে[১]।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيۡدٍ اِذَا هُمۡ فِيۡهِ مُبۡلِسُوۡنَ ﴿۷۷﴾

[রুকূ - ৫]

৭৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর; (তবে) তোমরা খুব কমই শোকর কর[২]।

وَهُوَ الَّذِيۡۤ اَنۡشَاَ لَـكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـئِدَةَ‌ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৯. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের তাঁরই নিকট একত্র করা হবে[৩]।

وَهُوَ الَّذِىۡ ذَرَاَكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَاِلَيۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۷۹﴾

৮০. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; তোমরা কি বোঝ না[৪]?

وَهُوَ الَّذِىۡ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُ وَلَـهُ اخۡتِلَافُ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ‌ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮১. বস্তুত ওরা সেরূপ কথাই বলছে, যেরূপ বলেছিল পূর্ববর্তী লোকেরা।

بَلۡ قَالُوۡا مِثۡلَ مَا قَالَ الۡاَوَّلُوۡنَ ﴿۸۱﴾

---

১. بَابًاذَا عَذَابٍ شَدِيْد- এ দ্বারা হয় আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য, নতুবা সেসব যুদ্ধবিগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া উদ্দেশ্য, যাতে ওরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে।

২. কানের দ্বারা তাঁর নাযিলকৃত আয়াত শোন, চোখের দ্বারা তাঁর কুদরতের নিদর্শনাদি দেখ এবং অন্তরের দ্বারা আয়াত ও নিদর্শন উভয়টি বোঝার চেষ্টা কর।

আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য তাঁর কাজে নিয়োজিত করলে তাঁর নে'য়ামতের শোকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু এমনটি হয়নি, অধিকাংশ মানুষ প্রায় সময় এসব শক্তির অপব্যবহার করে।

৩. সেখানে প্রত্যেকে শোকর ও না-শোকরের প্রতিফল লাভ করবে। সে সময় কোন ব্যক্তি বা কোন আমল অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর যে আল্লাহ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে (সকলকে) একত্র করা মোটেই কঠিন নয়।

৪. জীবিত থেকে মৃত এবং মৃত থেকে জীবিত করা, অথবা অন্ধকার থেকে আলোকিত এবং আলো থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনর্জীবিত করা এবং চোখের সেই পর্দা অপসারিত করে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়, যার পর সব সত্য, সকল বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে- فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْد (অতএব তোমার দৃষ্টি আজ প্রখর)।

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. ওরা বলে, 'কী! আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়-গোড় হয়ে যাব, তখনো কি আমাদের পুনর্জীবিত করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. 'আমাদের ও ইতিপূর্বে আমাদের বাপদাদাদেরও এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এসব পূর্ববর্তীদের বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছুই নয়[১]।'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আপনি (ওদের) বলুন, 'পৃথিবী এবং তাতে যারা আছে তারা কার? (বল) যদি তোমরা জান।'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. ওরা অবশ্যই বলবে, '(সবই) আল্লাহর'। আপনি বলুন, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না[২]?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. আপনি বলুন, 'কে সাত আসমানের মালিক ও মহা আরশের মালিক?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. ওরা অবশ্যই বলবে, '(এ সবও) আল্লাহর'। আপনি বলুন, 'তবুও কি তোমরা ভয় করবে না[৩]?'

---

১. অর্থাৎ এই কাফেররা কোনো জ্ঞান-বুদ্ধির কথা নয়, নিছক পুরানো লোকদের অন্ধ অনুকরণে কথা বলছে এবং এরা সেই পুরনো সন্দেহই প্রকাশ করছে, যা এদের পূর্ববর্তীরা পেশ করত। অর্থাৎ– মাটিতে মিশে যাওয়া ও অণু-পরমাণু হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের কীভাবে জীবিত করা হবে? এমন উদ্ভট কথাবার্তা, যা আমাদের শোনানো হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা তো আজ পর্যন্ত এমন ঘটতে দেখিনি। আসলে, এসব নিছক বানায়োট কথা, যা পূর্ববর্তী লোকেরা রচনা করে গেছে। আর এখন তাই পুনরাবৃত্ত করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ এই উপদেশ যে, যার কব্জায় সমস্ত পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু-সামগ্রী, তোমাদের মাটি ও হাড়-গোড় কি তাঁর ক্ষমতার বাইরে?

৩. অর্থাৎ তোমরা কি এ ভয় কর না যে, সেই মহান শাহানশাহ (রাজাধিরাজ) এসব ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার কারণে তোমাদের কঠিন পাকড়াও করতে পারেন? এমন নিরঙ্কুশ শাহানশাহকে একটা নগন্য বিষয়ে অক্ষম মনে করা কি চরম ধৃষ্টতা নয়?

৮৮. আপনি বলুন, 'কে তিনি, যার হাতে সকল বস্তুর কর্তৃত্ব এবং তিনি আশ্রয় দান করেন, তাঁর মোকাবেলায় (কাউকে) আশ্রয় দেওয়া যায় না? (বল) যদি তোমরা জান[১]।'

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

৮৯. ওরা অবশ্যই বলবে, (সকল কর্তৃত্ব) আল্লাহর। আপনি বলুন, 'তাহলে কীভাবে তোমরা যাদুগ্রস্ত (চরম প্রতারিত) হচ্ছ[২]?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ۝

৯০. (এসব বানানো কথা নয়), বরং আমি ওদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু ওরা তো মিথ্যাবাদী[৩]।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ۝

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদও নেই। এমন হলে প্রত্যেক মা'বূদ তার সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং তাদের একজন অপরজনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত[৪]।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

১. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁরই ক্ষমতা চলে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা আশ্রয় দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

২. অর্থাৎ যাদুগ্রস্তের ন্যায় সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলছ যে, মোটা কথাগুলিও বুঝতে পার না। তিনিই যখন সমস্ত পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁরই ক্ষমতাধীন, তখন তোমাদের শরীরের হাড়গোড় ও অণু-পরমাণুও তো তাঁর মালিকানাধীন। অতএব এসবের উপর সেই ক্ষমতাবান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজ ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারবেন না?

৩. অর্থাৎ দলিল-প্রমাণের দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যা কিছু ওদের বলা হচ্ছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও সঠিক। কিন্তু ওরা শুধু মিথ্যা ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করছে।

৪. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক ও অভিভাবক তিনিই। তাঁর পুত্র-সন্তান বা সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তাঁর রাজত্ব ও শাসন-ব্যবস্থায় এমন কোন অংশীদার নেই, যার তিল পরিমাণ স্বতন্ত্র এখতিয়ার আছে। এমন হলে প্রত্যেক অধিপতি নিজ অধীনস্থদের নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং নিজ দলবল নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হত। ফলে নিখিল বিশ্বের বর্তমান মজবুত ও পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা কয়েক দিনও টিকে থাকতে পারত না। সূরা আম্বিয়ার আয়াত (২২)- لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا এর ব্যাখ্যাতে এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

ওরা যা-কিছু বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র[১]–

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৯২. (যিনি) গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা। অতএব ওরা যাদের শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে[২]।

[রুকূ - ৬]

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝

৯৩. আপনি বলুন, 'হে আমার রব! ওদেরকে যার (অর্থাৎ যে আযাবের) ভয় দেখানো হয়, তা যদি আপনি আমাকে দেখিয়ে দেন–

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৯৪. তবে হে আমার রব! আমাকে এমন জালেম লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না[৩]।'

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝

৯৫. আর আমি ওদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছি, তা আপনাকে দেখাতে আমি অবশ্যই সক্ষম।

---

১. এ আল্লাহর শান নয় যে, কেউ তাঁর সামনে ক্ষমতা দেখাবে, অথবা কণা বরাবর কোন বস্তু তাঁর হুকুমের বাইরে থাকবে।

২. অর্থাৎ যাঁর সর্বময় ও সর্বব্যাপী ক্ষমতার অবস্থা তা, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং যাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের পরিধি এমন যে, কোন গোপন ও প্রকাশ্য বস্তুই তাঁর থেকে গুপ্ত নয়— তাঁর রাজত্বে কি সেসব জিনিস শরীক হতে পারে, যেগুলির শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সবই সীমিত ও ধারকৃত?

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এমন অশুভ আচরণ করা হচ্ছে বলে নিশ্চয় কোন কঠিন বিপদ আসবেই। এজন্য প্রত্যেক মুমিনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সে যেন আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এ প্রার্থনা করে– 'আয় মা'বূদ! যখন জালেমদের উপর আযাব আসবে, তখন আমাকে ওদের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' যেমন হাদীসে এসেছে- وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫১৬)। এর সারাসার এই যে– ইয়া আল্লাহ! আমাদের আমৃত্যু ঈমান ও সৎকর্মের পথে দৃঢ় রাখুন। আমাদের দ্বারা এমন ত্রুটি যেন না হয়, যার কারণে আপনার আযাবের কবলে পতিত হতে হয়। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (আর তোমরা সেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাক, যার শাস্তি তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষ করে শুধু জালেমদের উপরেই পতিত হবে না। –সূরা আনফাল, আয়াত ২৫)

উল্লেখ্য, এস্থলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও মূলত অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য। আর এটি কুরআন কারীমের একটি সাধারণ নীতি।

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ السَّیِّئَةَ ؕ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا یَصِفُوۡنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. আপনি মন্দের মোকাবেলা এমন পন্থায় করুন যা উত্তম। ওরা যা কিছু বলে আমি তা ভালো করেই জানি[১]।

وَ قُلۡ رَّبِّ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیۡنِ ﴿۹۷﴾

৯৭. আর আপনি বলুন, 'হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে[২]।

وَ اَعُوۡذُ بِكَ رَبِّ اَنۡ یَّحۡضُرُوۡنِ ﴿۹۸﴾

৯৮. 'এবং হে আমার রব! আমার নিকট ওদের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি[৩]।'

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ارۡجِعُوۡنِ ﴿۹۹﴾

৯৯. অবশেষে যখন ওদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হবে, সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন;

لَعَلِّیۡۤ اَعۡمَلُ صَالِحًا فِیۡمَا تَرَكۡتُ

১০০. 'যাতে, আমি যে (দুনিয়া) রেখে এসেছি সেখানে কিছু সৎকর্ম করতে পারি[৪]।'

---

১. অর্থাৎ এ দুনিয়াতেই আপনার চোখের সামনে ওদেরকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু আপনার উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত আদর্শের দাবি এই যে, আপনি সদ্ব্যবহারের দ্বারা যতদূর সম্ভব ওদের অসদাচরণের প্রত্যুত্তর দিতে থাকুন, আর ওদের অবান্তর কথাবার্তায় উত্তেজিত হবেন না। কারণ, আমি ওদের অবান্তর কথাবার্তা উত্তমরূপে জানি, যথাসময়ে ওদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। ওদের আচরণের বিপরীতে আপনার উপেক্ষা ও নম্র ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, অনেক মানুষ মুগ্ধ হয়ে আপনার প্রতি ঝুঁকবে এবং এতে দাওয়াত ও ইসলাহর উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

২. প্রথমে মানুষ-শয়তানদের সাথে ব্যবহার কী হবে, তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিন-শয়তানরা এই উপায়ে প্রভাবিত হবে না, কোন তদবীর বা নম্রতা ওদের বশ করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে এসে যাওয়াই একমাত্র প্রতিকার, যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ওদের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শয়তানের আক্রমণ হচ্ছে দীনী বিষয়ে আলোচনার সময় অযথা রাগ সৃষ্টি করে দেওয়া ও লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া। তাই বলা হয়েছে, মন্দের উত্তর ভাল জিনিস দ্বারা দাও।'

৩. অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই শয়তানকে আমার কাছে আসতে দেবেন না, যাতে সে আমার উপর আক্রমণ চালাতে না পারে।

৪. অর্থাৎ আপনি কারফেরদের মন্দ আচরণ উত্তম তরীকায় প্রতিহত করতে থাকুন, আর যেসব মন্দ কথা ওরা বানায়, তা আমার নিকট সোপর্দ করুন। অবশেষে, যখন ওদের

كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۚ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

কখনই নয়! এ একটা কথামাত্র, যা সে বলছে[১]। আর ওদের সম্মুখে রয়েছে 'বরযখ' (আড়াল) ওরা পুনরুত্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত[২]।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۝

১০১. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন ওদের মধ্যে কোন আত্মীয়তাও থাকবে না এবং ওরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাও করবে না[৩]।

মধ্যে কারো মৃত্যু-সময় এসে যাবে, তখন মৃত্যু-যন্ত্রণার মাঝে আযাবের প্রথম ঝাপটা দেখেই অনুশোচনা শুরু করবে এবং করজোড়ে বলবে– প্রভু হে! কবরে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন, যাতে পূর্ব জীবনে যেসব ভুল-ত্রুটি করেছিলাম, এখন নেক আমল করে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারি। ভবিষ্যতে এহেন গোনাহর কাজ আর করব না। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (আমি তোমাদের যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, সেই সময় আসার পূর্বে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসবে, আর তখন সে বলবে, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে কিছুকাল কেন অবকাশ দিলেন না, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করতাম এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।' –সূরা মুনাফিকূন, আয়াত ১০)

১. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় এসে যাওয়ার পর আমল করার জন্য ওকে ফেরত পাঠানো সম্ভব না। আর ধরা যাক– যদি পাঠানোও হয়, তবু সে নেক কাজ করবে না, বরং পূর্বের দুষ্কৃতিই করার প্রয়াস পাবে- وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (আর যদি ওদের আবারো পাঠানো হয়, তবে আবারো সেই কাজই করবে যা করতে ওদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর ওরা তো মিথ্যাবাদী। –সূরা আন'আম, আয়াত ২৮)। لعلي اعمل صالحا – এ শুধু ওর কথা, যা সে মুখে বলছে। প্রবল আফসোস ও অনুশোচনার কারণে চুপ থাকতে পারছে না। সে এ কথা বলতে থাকুক– আমার দরবারে তা শোনা হবে না।

২. অর্থাৎ মৃত্যুতেই এত ঘাবড়ে গেল! সামনে তো আরেক জগত 'আলমে বরযখ' রয়েছে, যেখানে পৌঁছলে দুনিয়াবাসীদের থেকে আড়াল হয়ে যায়, আর আখেরাতও সামনে আসে না। তবে আখেরাতের আযাবের কিছুটা নমুনা প্রকাশ পায়, যার স্বাদ কিয়ামত পর্যন্ত ভোগ করতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ বরযখের জীবনের পর কিয়ামত আসবে। দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকারের পর সমস্ত সৃষ্টিকে একই ময়দানে সমবেত করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে– সন্তান মাতাপিতার সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে এবং স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। কেউ কারো কথা জিজ্ঞাসা করবে না- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ

১০২. যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই এমন লোক, যারা নিজেদের চরম ক্ষতি করেছে। ওরা জাহান্নামেই চিরকাল থাকবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আগুন ওদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং সেখানে ওদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে[১]।

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মাতা, তার পিতা থেকে, তার স্ত্রী ও পুত্রদের থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এক গুরুতর অবস্থা হবে, যা সবকিছু থেকে তার বে-খেয়াল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। –সূরা আবাসা, আয়াত ৩৪-৩৭)

তবে অন্য সময়ে কোন কোন আত্মীয় দ্বারা কিছুটা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে তাদের সঙ্গে মিলিত করব এবং তাদের থেকে তাদের কৃতকর্ম কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। –সূরা তূর, আয়াত ২১)

বি. দ্র. কোন কোন হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ সেগুলি কোন কাজে আসবে না)- إلا نسبي وصهري (তবে আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া)। বোঝা গেল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কাদি সাধারণ নিয়মবহির্ভূত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৮৯০৭; মুসতাদরাক, হাদীস : ৪৭৪৭; মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৭৪; মুজামে কাবীর, হাদীস : ২৬৩৩, ১১৬২১)–এ হাদীস শুনে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মেয়ে উম্মে কুলছূমকে বিবাহ করেন এবং চল্লিশ হাজার দেরহাম মহর প্রদান করেন।

হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সেখানে পিতা-পুত্র একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, প্রত্যেকের কাছ থেকে তার নিজের আমলের হিসাব নেওয়া হবে।'

১. জ্বলতে জ্বলতে শরীর ফুলে যাবে। নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভী পর্যন্ত, উপরের ঠোঁট স্ফীত হয়ে মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত পৌছে যাবে এবং জিহ্বা বের হয়ে মাটিতে ঝুলতে থাকবে, যা দোযখীরা পদদলিত করবে। (আয় আল্লাহ! এ আযাব ও অন্য সবরকম আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন!)

১০৫. (আল্লাহ ওদের বলবেন), তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করতে[১]।

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. ওরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের উপর দুর্ভাগ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং আমরা ছিলাম গোমরাহ সম্প্রদায়।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. 'হে আমাদের রব! আমাদের এ আগুন থেকে বের করুন। আমরা যদি পুনরায় করি, তবে অবশ্যই অপরাধী হব[২]।'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তিনি বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় তাতে পড়ে থাক এবং আমার সঙ্গে কথা বলো না[৩]।'

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৯. নিশ্চয় আমার বান্দাদের একদল এমন ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১১০. 'কিন্তু তোমরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছ, এমনকি তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিল; আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করে গেছ[৪]।

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

---

১. কিয়ামতে ওদের এ কথা বলা হবে। যেন বলা হবে যে, 'তোমরা যেসব বিষয়কে দুনিয়াতে অস্বীকার করেছ, এখন চোখে দেখে নাও– তা কি মিথ্যা ছিল, না সত্য।'

২. অর্থাৎ স্বীকার করে বলবে, 'আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের প্রতারিত করেছে, ফলে আমরা সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে চিরধ্বংসের গর্তে পতিত হয়েছি। এখন আমরা সবকিছু দেখে নিয়েছি। দয়া করে একবার আমাদের এখান থেকে বের করে দিন। এরপর যদি কখনো সেসব করি, তবে আমরা পাপী হব– তখন যে শাস্তি ইচ্ছা আমাদের দেবেন।'

৩. অর্থাৎ বকবক করো না। দুনিয়াতে যা করেছিলে, এখন তার শাস্তি ভোগ কর। হাদীস থেকে জানা যায়, এই উত্তরের পর ওদের প্রার্থনা বন্ধ হয়ে যাবে; চিৎকার ও আর্তনাদ ছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারবে না। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫৮৬)

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় মুসলিমগণ যখন নিজ প্রভুর সামনে দো'য়া ও এস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করত, তখন তোমাদের হাসি পেত। তাদের নেক আমল দেখে এতই উপহাস করতে

১১১. তাদের ধৈর্যধারণের ফলে আজ আমি তাদের এ বিনিময় দান করলাম যে, তারাই সফলকাম[১]।'

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝١١١

১১২. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে বছরের গণনায় কতকাল থেকেছ?'

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝١١٢

১১৩. ওরা বলবে, 'আমরা একদিন অথবা এক দিনেরও কম সময় থেকেছি! আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন[২]।'

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ۝١١٣

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা স্বল্পকালই থেকেছ। কত ভাল হত যদি তোমরা জানতে (ও বুঝতে)[৩]।'

قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١٤

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?[৪]

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝١١٥

যে, তাদের পিছনে পড়ে তোমরা আমাকেও স্মরণ রাখনি। তোমাদের মাথার উপর যেন কোন প্রভুই ছিল না, যিনি কোন সময় কর্মের হিসাব নিতে এবং দুষ্কৃতি-দৌরাত্ম্যের শাস্তি দিতে পারেন।

১. বেচারা মুসলিমগণ তোমাদের দেওয়া দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল। দেখ, আজ তোমাদের বিপরীতে তারা কেমন প্রতিদান লাভ করল। তাদের এমন স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা সর্বতোভাবে সফল এবং সব রকমের ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-খুশীতে বিমোহিত।

২. অর্থাৎ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন, যারা প্রত্যেকটি নেকী ও বদী যেমন গুণে রেখেছেন, তেমনি এরও হিসাব রেখে থাকবেন।

لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ -এর দ্বারা কবরে অবস্থান উদ্দেশ্য বা দুনিয়ার জীবন। এই জীবনও সেখানে স্বল্পই মনে হবে। আর এ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, ওরা দুনিয়ায় দ্রুত আযাব চাইতো! এখন জানল যে, তা দ্রুতই এসেছে।' ('মূযিহুল কুরআন')

৩. অর্থাৎ সত্যই দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এ বিষয়টি যদি ওরা পয়গম্বরদের কথায় দুনিয়ায় বুঝে নিত, তবে এ নশ্বর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কখনো পরিণাম সম্বন্ধে গাফিল হত না এবং সেসব দুষ্কৃতি করত না, যা দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনে করেছে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় নেকী ও বদীর পরিপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ পায় না। তাই এ জীবনের পর আরেকটি জীবন না হলে সবকিছু শুধু খেল-তামাশা ও নিরর্থক প্রমাণিত হত। অথচ আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করাই যায় না। এ থেকে তাঁর সত্তা বহু উর্ধে।

১১৬. অতএব আল্লাহ অতি মহান, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) মহিমান্বিত আরশের অধিপতি[১]।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে যার বিষয়ে ওর নিকট কোন প্রমাণ নেই– ওর হিসাব তো ওর রবের নিকট হবে[২]; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

১১৮. আপনি বলুন, 'হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু[৩]।'

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১. যখন তিনি মহান, মহিমান্বিত, শাহানশাহ ও নিরঙ্কুশ অধিপতি, তখন তিনি বাধ্য ও অনুগত এবং অবাধ্য ও অপরাধীদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যেখানে তাদের জিজ্ঞাসা করার কেউ থাকবে না।

২. আর হিসাব-নিকাশের পর অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তিও দেওয়া হবে।

৩. অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং নিজ রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের সম্মানিত করুন– আপনার অসীম রহমতের সামনে কোন কিছুই কঠিন নয়।

أفحسبتم থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি বড় ফযীলতপূর্ণ ও সুফলবিশিষ্ট। কোন কোন হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং বুযুর্গদের অভিজ্ঞতালব্ধ। সুতরাং এই আয়াতগুলি ওযীফা হিসাবে নিয়মিত পড়া উচিত। (আমালুল য়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী, বর্ণনা ৭৭)

একটি বরকতময় দোয়া

সমাপ্তিতে বরকত ও সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আলোচ্য আয়াতগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল সেই দো'য়াখানি নকল করছি, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন–।

اللّٰهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

ইয়া আল্লাহ! আমি নিজের নফসের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গোনাহ-মার্জনাকারী কেউ নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমায় ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৮৩৪)

সূরা নূর

সূরা ২৪ । ৬৪ আয়াত । ৯ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا ٦٤، رُكُوْعَاتُهَا ٩

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (এ) একটি মহান সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং যা(-র বিধি-বিধান)-কে অবশ্যপালনীয় করেছি, আর এতে অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ[১]।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

১. সূরার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

আলোচ্য সূরাটির মধ্যে অত্যন্ত জরুরী হুকুম-আহকাম ও হুদূদ (দণ্ডবিধি), উপমা ও উপদেশ, তাওহীদের তত্ত্বকথা এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু সতর্ককারী ও সংশোধনমূলক আয়াত রয়েছে। সূরার সেই অংশটি সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয়, যা 'ইফ্ক' (অপবাদ)-এর ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার উপর মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। তাতে কতক সরলমনা খাঁটি মুসলিমেরও কিছুটা পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল। এ অপবাদ কেবল হযরত আয়েশা সিদ্দীকার পক্ষেই মানহানিকর ছিল না, এক হিসেবে স্বয়ং পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মান-মর্যাদাকেও আঘাত করেছিল। এজন্য কুরআন কারীমে জোরদারভাবে এহেন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন ও ভুল-বোঝাবুঝির সংশোধন এবং সর্বদার জন্য ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে তারা ভবিষ্যতে কখনো শত্রুদের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে এরূপ পদস্খলনের শিকার না হন। পয়গম্বর আলাইহিস সালামের মহা মর্তবা, তদ্রুপ মুসলিম-মাতাদের পবিত্র মর্যাদা এমন নয়, যা উপলব্ধি করতে ও স্মরণ রাখতে কোন মুসলমান কোন সময়ে কিছুমাত্র অসাবধানতার শিকার হতে পারে।

সম্ভবত এ জন্যই সূরার সূচনা হয়েছে এভাবে- سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا الخ যাতে শ্রোতারা বুঝে নিতে পারে যে, এর আলোচ্য বিষয়গুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব বেশি সংরক্ষণ ও আঁকড়ে ধরে রাখার উপযুক্ত। এতে যেসব সুস্পষ্ট নসীহত ও খাঁটি কথা বলা হয়েছে, তা মনে-প্রাণে ধারণ করা ও স্মরণ রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি- এক মিনিটের জন্যও তার প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত নয়। অন্যথায় দীন ও দুনিয়ার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশ করে চাবুক মার[১],

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

১. এ শাস্তি সেই যিনাকারী (ব্যভিচারী) পুরুষ ও নারীর জন্য, যারা স্বাধীন, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন, সাবালক ও অবিবাহিত, অথবা বিবাহিত হয়েও সহবাস করেনি। আর যে স্বাধীন নয় (অর্থাৎ অন্যের দাস বা দাসী), তার শাস্তি পঞ্চাশ দোররা (চাবুক)। পঞ্চম পারার প্রথম রুকূর শেষাংশে (নিসা : ২৫) এই দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি-বিধানের উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তি সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন বা সাবালক নয়, সে 'মুকাল্লাফ' (শরঈ বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত) নয়।

محصن যিনাকারীর শাস্তি 'রজম' এবং এটি শরীয়তের অকাট্য বিধান

আর যে মুসলিমের মধ্যে উক্ত সবগুণ রয়েছে (অর্থাৎ স্বাধীনতা, সাবালকত্ব, সুস্থবুদ্ধি, বিবাহ ও সহবাস), এরূপ ব্যক্তিকে محصن বলা হয়। যিনা করলে তার শাস্তি হচ্ছে 'রজম' বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু প্রদান করা। এ শাস্তির বিষয়ে সূরা মায়েদায় (আয়াত ৪৩) বলা হয়েছে- وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ الخ (ওরা কীভাবে আপনাকে বিচারক বানায়, অথচ ওদের নিকট তো তাওরাত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর বিধান আছে।) আল্লাহর এই বিধানটি ছিল 'রজম'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বিধান মতই ফয়সালা করলেন এবং বললেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أول من أحيا أمرك إذأماتوه (ইয়া আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আপনার বিধানকে জীবিত করল, যখন ওরা তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল।') (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭০০) অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইহুদীদেরই নয়, বরং এ ধরনের যত ঘটনা সামনে এসেছে, সবগুলোতেই محصن যিনাকারীকে রজমের শাস্তিই প্রদান করেন এবং তাঁর পরে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমও সর্বদা রজমের বিধানই চালু রাখেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোন ব্যক্তিই এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণের দুঃসাহস করেনি। বলতে গেলে, সুন্নাতে মুতাওয়াতির (سنت متواترة) এবং আহলে হকের ইজমা (সর্ববাদীমত) ঘোষণা করে দিল যে, এ বিষয়ে শরী'য়তে মুহাম্মদী তাওরাতের বিধান বহাল রেখেছে।

অনুরূপ, ইচ্ছাকৃত কতল (قتل عمد) এর শাস্তি হল কতল (বা খুনের বদলে খুন)। এর কথাও পবিত্র কুরআন তাওরাতের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছে- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (আর আমি ওদের প্রতি তাওরাতে লিখে দিয়েছিলাম, 'প্রাণের বদলে প্রাণ ... –মায়েদা : ৪৫')। তাছাড়া বনী ইসরাঈলের প্রতি মুরতাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আরোপিত হওয়ার কথা সূরা বাকারায় (৫৪) বর্ণিত হয়েছে- فَتُوْبُوْا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ (অতএব এখন তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের হত্যা কর।)। তাওরাতের এই বিধান দুটিও উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বহাল রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে مُحْصَن এর শাস্তি রজম এবং কিসাসের বিধান (খুনের বদলে খুন) বর্ণিত হওয়ার পর অত্যন্ত কঠোরতা ও তাকীদের সাথে আল্লাহর বিধান বর্জনের অনিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিশেষে ঘোষিত হয়েছে- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আর আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে ওদের প্রতি যেন তোমাদের করুণা না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ[১]। আর মুসলমানদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে[২]।

مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ الخ (আর আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলির সংরক্ষকরূপে। অতএব আপনি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন—মায়েদা :৪৮)। সম্ভবত এসবের উদ্দেশ্য এই কথাই বলা যে, তাওরাতের উক্ত বিধানগুলি এখন পবিত্র কুরআনের দ্বারা সংরক্ষিত। এগুলি বহাল রাখার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারো মতামত ও অভিপ্রায়ের পরোয়া করা উচিত নয়। বস্তুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করেননি, তাঁর খলীফাগণও করেননি।

এমনকি, 'রজম'এর ব্যাপারে যখন হযরত উমর (রা) এর আশঙ্কা হল যে, ভবিষ্যতে কোন কোন কুচক্রী এ বিধান অস্বীকার করতে পারে (যেমনটা করেছিল খারেজী সম্প্রদায় এবং বর্তমান কালের এক বিকৃত বাতিল ফেরকা), তখন তিনি মিম্বরে আরোহণপূর্বক সাহাবী ও তাবেঈনদের সমাবেশে এই খোদায়ী বিধানের অকাট্যতা সম্বন্ধে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন এবং কুরআনের একটি আয়াতের উল্লেখ করলেন, যাতে 'রজমের' স্পষ্ট হুকুম ছিল এবং যার তেলাওয়াত পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেলেও হুকুমটি পূর্বের ন্যায় বহাল থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮২৯)

বি. দ্র. কোন আয়াতের শুধু তেলাওয়াত রহিত হয়ে যাওয়া এবং তার হুকুম বহাল থেকে যাওয়া– এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যার বিশদ ব্যাখ্যা এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরে সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহুল আযীয স্বতন্ত্র তাফসীর লেখার সুযোগ হলে সেখানে লেখা হবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁর আহকাম ও হুদূদ (দণ্ড) জারী করায় কোনো ইতস্তত করো না। এমন যেন না হয় যে, অপরাধীর প্রতি দয়া অনুভব করে শাস্তিই দিলে না, বা তা হ্রাস করে দিলে, অথবা এমন হালকা ও বে-ফায়দা পন্থা অবলম্বন করলে যে, তাতে কোন শাস্তিই হল না। ভাল করে বুঝে নাও, আল্লাহ তাআলা নিরঙ্কুশ বিচারক এবং নিজ বান্দাদের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী করুণাময়। কঠোর হোক বা নরম– তাঁর কোনো হুকুম সমষ্টিগত বিচারে হেকমত ও রহমতশূন্য নয়। মনে রেখো, তোমরা যদি তাঁর আহকাম ও হুদূদ প্রয়োগে ত্রুটি কর, তবে আখেরাতে তোমাদের পাকড়াও করা হবে।

২. অর্থাৎ শাস্তি গোপনে নয়, বরং মুসলমানদের সমাবেশে প্রদান করা উচিত। তাহলে (শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির) এই অপমানকর অবস্থা শাস্তির পূর্ণতাবিধানে ও প্রচারে সহায়ক হবে এবং এতে দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা লাভ করবে। অধিকন্তু, এতে এ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে যে,

اَلزَّانِیْ لَا یَنْكِحُ اِلَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۘ وَّالزَّانِیَةُ لَا یَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

৩. ব্যভিচারী বিয়ে করে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিক ছাড়া আর কোন নারীকে এবং ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করে না ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া আর কোন পুরুষ[১]। আর তা হারাম করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্য[২]।

অপরাধীর এ অবস্থা দর্শনে মুসলমান দর্শকদের মনে করুণার উদ্রেক হবে এবং তার জন্য ক্ষমার দো'য়া করবে। والله اعلم

১. যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি উল্লেখের পর বর্তমান আয়াতে এই কুকার্যের চরম ঘৃণ্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে– অর্থাৎ যে নর বা নারী এই ঘৃণ্য অভ্যাসে লিপ্ত, বস্তুত কোন সচ্চরিত্র মুসলমানের সঙ্গে তাদের বিবাহ ও সহবাসের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত না। তাদের নোংড়া স্বভাবের পক্ষে এটাই সংগত যে, অনুরূপ কোন ব্যভিচারী নর ও নারীর সাথে অথবা এর চেয়ে নিকৃষ্ট কোন মুশরিক নর ও নারীর সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষেরা অপবিত্র নারীদের জন্য। আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষেরা পবিত্র নারীদের জন্য। –সূরা নূর : ২৬)। এক কবি বলেন-

کند ہمجنس با ہمجنس پرواز ÷ کبوتر با کبوتر باز با باز

('সমজাতি সমজাতির সাথে উড়ে চলে– কবুতর কবুতরের সাথে, বাজপাখি বাজপাখির সাথে।')

যা হোক, তাদের জঘন্য আচরণের আসল দাবি তো এটাই। তবে আল্লাহ তাআলা অপরাপর হেকমত ও মঙ্গল বিবেচনায় নামেমাত্র কোন মুসলমানেরও বিয়ে মুশরিক নর বা নারীর সাথে জায়েয রাখেননি। অপরদিকে ব্যভিচারীর বিয়ে যদি সতী-সাধ্বী নারীর সঙ্গে হয়ে যায়, তবে তা একেবারে বাতিল সাব্যস্ত করেননি।

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত তাফসীর একেবারে সহজ ও সরল। এতে لاینکح এর অর্থ তেমনই ধরা হয়েছে, السلطان لایکذب জাতীয় বাগ্‌ধারায় যে ধরনের অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [অর্থাৎ 'বাদশাহ মিথ্যা বলেন না' বললে আমরা এ অর্থ বুঝি যে, বাদশাহ মিথ্যা বলতে পারেন না, তদ্রূপ لاینکح দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— ব্যভিচারী, ব্যভিচারিনী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারে না, তার পক্ষে ব্যভিচারিনী ছাড়া অন্যকে বিয়ে করা সাজে না।–অনুবাদক] বলা যায়, যে কাজ করা সাজে না, তা ঘটে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। فافهم واستقم

২. অর্থাৎ যিনা মুমিনের জন্য হারাম। একজন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় কী করে এই কুকর্ম করতে পারে? হাদীসে আছে– لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن অন্তরে ঈমান থাকা অবস্থায় যিনাকারী যিনা করে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৭৮)

৪. যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে[১], তাদের আশিটি চাবুক মার এবং কখনো তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করো না[২]। আর তারাই হচ্ছে নাফরমান[৩]।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৫. তবে যারা তার পর তওবা করবে ও আত্মসংশোধন করবে, তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, মেহেরবান[৪]।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, প্রকৃত অর্থেই মুমিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য এমন পবিত্র পুরুষদের জন্য যিনাকারী নারীকে বিয়ে করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে– অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে তাদের পবিত্র অন্তরকে এহেন নোংড়া স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। তাহলে, حُرِّمَ এর অর্থ সেরূপ, যেরূপ অর্থ حرمنا عليه المراضع এর মধ্যে, অথবা حرام على قرية أهلكناها এর মধ্যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

১. যাদের ব্যভিচারী হওয়া শরী'য়তসম্মত কোন দলীল বা আলামত দ্বারা প্রমাণিত নয়– এমন সতীসাধ্বী নারীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার শাস্তি আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, সচ্চরিত্র পুরুষের উপর অপবাদ আরোপের একই হুকুম। তবে আয়াতগুলো এক নারীর ঘটনায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এতে শুধু নারীদের কথা বলা হয়েছে।

আর অপবাদ আরোপকারী যদি চারজন সাক্ষী পেশ করে এবং তাদের সাক্ষ্য শরী'য়তের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়, তবে অভিযুক্ত নর বা নারীর উপর যিনার 'হদ' বা শাস্তি জারী করা হবে।

২. অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি এই যে, مقذوف তথা অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করলে অপবাদ আরোপকারীকে আশি দুররা বা চাবুক লাগানো হবে এবং ভবিষ্যতে সর্বদার জন্য মুআমালাতে অর্থাৎ লেনদেন জাতীয় বিষয়ে তার সাক্ষ্য বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তওবার পরও মুআমালাতে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

৩. যদি জেনেশুনে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, তবে তো স্পষ্টতই ফাসেক ও নাফরমান। আর যদি তারা বাস্তবে সত্য বর্ণনা করে থাকে, অথচ তারা জানত যে, চারজন সাক্ষী দ্বারা এ দাবি প্রমাণ করতে পারবে না– তাহলে এ কথা প্রকাশ করার দ্বারা একজন মুসলমানের মানহানি ও গোপন বিষয় ফাঁস করা ছাড়া আর কোন লাভ হল না। আর এটাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ, এবং আলেমগণ একে কবীরা গোনাহ গণ্য করেছেন। (অতএব, এক্ষেত্রেও এক প্রকার ফাসেক হল)

৪. অর্থাৎ তওবা করলে এবং নিজেকে শুধরে নিলে সে আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত থাকবে না । তবে পূর্বের গোনাহ قذف এর শাস্তি হিসাবে এখনো সে مردود

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে[১] এবং নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী না থাকে, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যের (পদ্ধতি) এই যে: সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে চারবার এ সাক্ষ্য দেবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

৭. এবং পঞ্চমবার এই (সাক্ষ্য দেবে) যে, তার উপরে আল্লাহর লা'নত, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞

৮. আর স্ত্রী থেকে শাস্তি টলে যাবে যদি সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, সে (অর্থাৎ তার স্বামী) নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞

৯. এবং পঞ্চম বার এই (সাক্ষ্য দেয়) যে, তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) উপরে আল্লাহর গজব, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়[২]।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

الشهادت থাকবে। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। সালাফের মধ্যে কাজি শুরায়হ্, ইবরাহীম নাখায়ী, সাঈদ বিন যুবায়ের, মাকহুল, আঃ রহমান বিন যায়েদ বিন জাবের, হাসান বসরী, মুহাঃ বিন সীরিন ও সাঈদ বিন মুসাইয়িবের (রহঃ) মাযহাব এটাই– كما في الدر المنثور وابن كثير

১. অর্থাৎ যিনার অপবাদ দেয়, অথবা শিশু সম্পর্কে বলে যে, এ আমার ঔরষের নয়।

২. অর্থাৎ যে পুরুষ নিজ স্ত্রীর উপর যিনার অভিযোগ আরোপ করবে, তার নিকট চারজন সাক্ষী তলব করা হবে। চার সাক্ষী পেশ করতে পারলে স্ত্রীকে যিনার শাস্তি প্রদান করা হবে। আর সাক্ষী আনতে না পারলে স্বামীকে বলা হবে, কসম খেয়ে চার বার বল, সে নিজ দাবিতে সত্য (অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে যে অভিযোগ করেছে, তাতে সে মিথ্যা বলেনি)। এভাবে তার চারটি কসমবিশিষ্ট সাক্ষ্যই যেন চার সাক্ষীর স্থলে হল। এবং শেষে পঞ্চম বারে তাকে এ কথা বলতে হবে যে, 'সে নিজ দাবিতে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর খোদার লা'নত ও অভিসম্পাত।'

এখন যদি উল্লিখিত বাক্যগুলি বলতে স্বামী অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করে রাখা হবে এবং বিচারক তাকে দুই বিষয়ের একটিতে বাধ্য করবেন– হয় সে নিজের মিথ্যা স্বীকার করবে, তাহলে তাকে অপবাদ আরোপের শাস্তি (আশি চাবুক) প্রদান করা হবে; অথবা সে পাঁচবার উল্লিখিত বাক্যগুলিই বলবে।

১০. যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত এবং আল্লাহ অত্যধিক তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাবান না হতেন- (তবে তোমাদের কী কষ্টই না হত!)[১]।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

যদি সে বললই, তবে তার স্ত্রীকে কসম খেয়ে চার বার বলতে বলা হবে যে, 'এই ব্যক্তি (স্বামী) তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চম বারে এ কথা বলবে যে, 'এ ব্যক্তি নিজ দাবিতে সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক।' এ বাক্যগুলি না বলা পর্যন্ত স্ত্রীকে বন্দী করে রাখা হবে এবং তাকে দুয়ের একটিতে বাধ্য করা হবে- হয় সে পরিষ্কারভাবে স্বামীর দাবির সত্যতা স্বীকার করবে, তাহলে তার উপর যিনার শাস্তি জারী হবে; অথবা উল্লিখিত বাক্যগুলোর দ্বারা স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলবে।

সেও যদি স্বামীর ন্যায় উক্ত বাক্যাবলি বলে এবং 'লিআন' (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর লানত করা- অনুবাদক) সমাপ্ত হয়, তাহলে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস এবং সহবাসের প্রতি আকর্ষণকারী সকল আচরণ হারাম হয়ে যাবে। অতঃপর স্বামী যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে উত্তম। নতুবা বিচারক তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন (যদিও উভয়ে সম্মত না হয়)- অর্থাৎ তিনি মুখে বলে দেবেন, আমি এদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালাম। উল্লেখ্য যে, এই বিচ্ছেদ 'তালাকে বাইন' হিসাবে পরিগণিত হবে।

বি. দ্র. স্বামী-স্ত্রীর দ্বারা উল্লিখিত বাক্যাবলি বলানোকে শরী'য়তে لعان বলে, যা তখনই প্রযোজ্য, যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়। স্ত্রী ছাড়া অন্য সাধারণ সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করলে কী বিধান,তা ইতিপূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

১. অর্থাৎ শরী'য়তে যদি লিআনের এই বিধান চালু না করা হত, তবে স্বামীকে (সাক্ষীর অভাবে) সাধারণ নিয়মানুসারে হদ্দে কযফ (অর্থাৎ যিনার অপবাদের শাস্তি) ভোগ করতে হত এবং তাকে আজীবন অন্তর্জ্বালা ভোগ করে মরতে হত। কারণ, এমনো হতে পারে যে, সে আসলেই আপন কথায় সত্যবাদী। স্বামী ছাড়া অন্যের ব্যাপার ভিন্ন, কারণ অন্য ব্যক্তি ঘটনা প্রকাশে বাধ্য নয়। সেজন্য তার বিষয়ে এত সব বিবেচনার প্রয়োজন নেই।

অন্য দিকে শুধু স্বামীর দাবি ও কসম খাওয়ার কারণে যদি যিনা সাব্যস্ত হয়ে যেত, তবে স্ত্রীর পক্ষে কঠিন বিপদ হত। কারণ স্ত্রীই সত্যবাদী, সে যিনা করেনি- এ সম্ভাবনাও থাকে। অনুরূপ, স্ত্রীর কসম খাওয়ার কারণেই যদি তাকে নির্দোষ মনে করে নেওয়া হত, তবে স্বামীর উপর অপবাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে যেত- অথচ তারও সত্যবাদী হওয়ার সমসম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব সকলের কল্যানের প্রতি লক্ষ্য রেখে লিআনের বিধান জারী করাটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমত এবং তাঁর হেকমতেরই নিদর্শন। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের যে সত্যবাদী, সে অন্যায় শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। আর যে মিথ্যাবাদী, দুনিয়াতে তার দোষ

[রুকূ - ২]

১১. যারা সেই অপবাদ রচনা করেছে[১], তারা | إِنَّ الَّذِينَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ

ঢেকে রেখে তাকে অবকাশ দেওয়া হল– হয়ত সে তওবা করে নেবে। অতঃপর তার তওবা কবুল করে নেওয়া আল্লাহ তাআলার আরেকটি গুণের নির্দশন। তা এই যে, তিনি অনেক বেশি তওবা কবূলকারী।

১. **'ইফকে'র সংক্ষিপ্ত ঘটনা**

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নামে যে ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, এখান থেকে তার উল্লেখ হচ্ছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, হিজরী ছয় সনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুসতালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর জন্য একটি আলাদা উটের ব্যবস্থা ছিল। তিনি পর্দাঘেরা হাওদায় বসতেন, যা উটচালক উটের পিঠে চাপিয়ে দিতেন। পথিমধ্যে এক মনযিলে অবস্থানের পর যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আয়েশার প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি জঙ্গলের দিকে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়, সেটির তালাশে দেরি হয়। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। উটচালক যথা নিয়মে উটের পিঠে হাওদা বাঁধতে এসে তা পর্দাবেষ্টিত দেখে ভাবলেন যে, মা আয়েশা ভিতরেই আছেন। আর তিনি অল্প বয়স্কা, ক্ষীণকায় থাকায় হাওদা ওঠাতে গিয়ে সন্দেহও হয়নি যে, তিনি ভিতরে নেই। যা হোক, উটচালক হাওদা বেঁধে কাফেলার সাথে উট হাঁকিয়ে দিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) ফিরে এসে দেখলেন, সেখানে কেউ নেই। অধীর না হয়ে তিনি অত্যন্ত স্থিরভাবে চিন্তা করলেন যে, সামনে অগ্রসর হয়ে যখন তাঁকে পাওয়া যাবে না, তখন তাঁকে খুঁজতে সাথীরা এখানেই আসবে– সুতরাং এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখাহে অবস্থান করলেন। রাতের বেলা ছিল, তিনি চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

পশ্চাতে কোন কিছু থেকে গেল কি না, তার খোঁজ রাখার উদ্দেশ্যে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফেলা থেকে কিছুটা দূরত্বে পিছনে থাকতেন। তিনি ভোরে সেখানে পৌছে দেখলেন, কোন মানুষ শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তিনি কাছে এসে চিনতে পারলেন, তিনি মা আয়েশা (রা)। (কারণ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন।) সেখানে তাঁকে দেখামাত্র তিনি বিচলিত হলেন এবং "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়লেন। এতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজ উট তাঁর নিকটে এনে বসিয়ে দিলেন। তিনি পর্দার সাথে তার উপর আরোহণ করলেন। আর সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে দুপুর বেলায় কাফেলার সাথে মিলিত হলেন।

مِّنۡكُمۡ ؕ لَا تَحۡسَبُوۡهُ شَرًّا لَّكُمۡ ؕ بَلۡ هُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ

তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল[১]। তোমরা তাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২]। ওদের

মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বড় খবীছ, দূরাত্মা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু ছিল। হতভাগা পাপিষ্ঠ এই ঘটনার সুযোগ নিল এবং মারাত্মক কথা বলতে শুরু করল। কিছু সংখ্যক সরলমতি মুসলমানও, যেমন পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান ও হযরত মিসতাহ এবং মেয়েদের মধ্যে হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে পড়ে আপত্তিকর আলোচনা করলেন। সর্বসাধারণ মুসলমান ও স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বিশ্রী আলোচনা ও অপপ্রচারে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এক মাস পর্যন্ত এর চর্চা হতে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন, কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতেন না, যদিও মনে মনে ক্রোধান্বিত ছিলেন।

এক মাস পর মুসলিম-জননী আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা অপপ্রচার সম্বন্ধে অবগত হলেন এবং দুঃখ-কষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাতদিন কেবল কাঁদতেন– এক মিনিটের জন্যও চোখের পানি বন্ধ হত না। এ সময়ের মধ্যে আরো অনেক ঘটনা সংঘটিত হয় ও কথাবার্তা চলতে থাকে। যেগুলো সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত আছে এবং তা পড়ার মত। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৭০; ফাতহুল বারী : ৮/৪৫৮)

অবশেষে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও নিষ্কলুষতা ঘোষণা করত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের বর্তমান আয়াতগুলি নাযিল করেন। এ নিয়ে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) গৌরবও করতেন। বস্তুত তিনি যতই গৌরব করে থাকুন, তা কমই ছিল।

১. অর্থাৎ এই জঘন্য অপবাদ (প্রকাশ্য কাফেররা নয়) বরং এমন লোকেরাই আরোপ করেছে, যারা ন্যায় বা অন্যায়ভাবে ইসলামের নাম নেয় এবং নিজেদের মুসলমান বলে। তাদের কয়েক ব্যক্তি মিলে ষড়যন্ত্র করেছে আর কিছু লোক না জেনে তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ যে, অধিকাংশ মুসলমান এই জালে জড়ায়নি।

২. এ কথা সেই মুমিনদের সান্ত্বনার জন্য বলা হচ্ছে, যারা এ মর্মান্তিক ঘটনায় দুঃখিত ছিলেন। বিশেষত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর পরিবারবর্গ। বলা বাহুল্য, তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত ও বেদনাহত ছিলেন। অর্থাৎ– বাহ্যত উক্ত আলোচনা ছিল জঘন্য, পীড়াদায়ক ও অপ্রীতিকর। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাতে তোমাদের জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত।

তোমরা যে এতদিন ধরে এরূপ মর্মঘাতী আক্রমণ ও দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করলে, তা ব্যর্থ যেতে পারে না। এ কত মর্যাদার কথা যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র কালামে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার কথা অবতীর্ণ করেছেন, শত্রুদের অপমানিত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য তাঁর সুনাম-সুখ্যাতির আলোচনা কুরআন পাঠকারীদের মুখে জারী করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের পয়গম্বর আলাইহিস সালামের

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِیْ تَوَلّٰی كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝

প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে রয়েছে সে যে পাপ করেছে। আর ওদের মধ্যে যে ঐ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি[১]।

لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَیْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِیْنٌ ۝

১২. যখন তোমরা তা শুনেছিলে, তখন ঈমানদার পুরুষেরা ও ঈমানদার নারীরা তাদেরই আপনজন সম্পর্কে কেন সুধারণা করল না এবং বলল না, 'এটা সুস্পষ্ট অপবাদ[২]'?

স্ত্রীদের ও আহলে বাইতের যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করার নিমিত্ত মুসলমানদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন, যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। (অতএব আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)।

১. অর্থাৎ উক্ত অপবাদের ঘটনায় যে ব্যক্তি যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে সেই পরিমাণ গোনাহর ভাগী ও শাস্তির যোগ্য হয়েছে। যেমন কেউ কেউ খুশিচিত্তে খুব মজা নিয়ে সেসব বাজে কথা বলেছে, আর কতক আফসোস প্রকাশ করতঃ তার আলোচনা করেছে, আবার কিছু লোক মজলিসে খোঁচা মেরে আলোচনা তুলে দিয়েছে অতঃপর নিজে চুপ থেকেছে! বাকি রইল যারা (অন্যের মুখে) তা শুনেছে, তাদের কেউ কেউ শুনে সংশয়ে পড়ে গেছে, আর অনেকে চুপ থেকেছে। তবে অনেকে শোনামাত্র খণ্ডন করে দিয়েছে। এদের আচরণকেই আল্লাহ পছন্দ করেছেন। অন্য সবাইকে আপন আপন আচরণের ধরন অনুসারে অভিযুক্ত করেছেন।

والذي تولى كبره

সবচেয়ে বড় ভূমিকাপালনকারী ছিল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। বহু সংখ্যক হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (বুখারী, ৪৭৪৯) এই খবীছই লোকদের জমা করে উত্তেজিত করত এবং কৌশলে নিজেকে আড়ালে রেখে অন্যদের দিয়ে প্রচার করাত। ওর ভাগ্যে আখেরাতে বিরাট শাস্তি তো আছেই, দুনিয়াতেও সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার আলোচনা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে হতে থাকবে।

২. একজন মুসলিমের অন্য মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি সুধারণা রাখা উচিত। আর যখন শুনবে, লোকেরা একজন নেক ব্যক্তির প্রতি না জেনে নিছক ধারণার ভিত্তিতে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে, তখন নিজ অন্তরে এরূপ ধারণা প্রশ্রয় না দিয়ে তা অস্বীকার করা উচিত। পয়গম্বর আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে মুসলমান ভাইয়ের অগোচরে তার সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৩৬০৭) যাচাই না করে অপবাদ আরোপ করা ঈমানপরীপন্থী। মানুষের উচিত নিজ মান-সম্ভ্রমের সাথে অন্যদের মান-সম্ভ্রমের তুলনা করা। যেমন করেছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখ, 'ইফ্‌ক' এর ঘটনায়। একদিন তাঁর স্ত্রী বললেন, লোকেরা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্বন্ধে এরূপ বলে। তিনি বললেন, তারা মিথ্যাবাদী, তুমি কি এমন কাজ করতে পারবে? উত্তর দিলেন,

১৩. ওরা এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না কেন? যেহেতু ওরা সাক্ষীদের উপস্থিত করেনি, সুতরাং ওরা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী[১]।

لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. আর যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার কারণে তোমাদের উপর নিশ্চয় কোন বিরাট আযাব পতিত হত[২]—

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۴﴾

১৫. যখন তোমরা সে কথাটা নিজেদের জবান দ্বারা চালাচালি করছিলে এবং নিজেদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যার বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা তাকে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা গুরুতর[৩]।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾

কখনোই নয়। তখন তিনি বললেন, (সিদ্দীকের কন্যা ও নবীর বিবি) আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তো তোমার চেয়ে বেশি পাক-পবিত্র ও সতী-সাধ্বী, তাঁর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা কীভাবে করা হবে? (তাফসীরে তবারী ১৭/২১২)

১. অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও তাঁর শরী'য়ত অনুযায়ী সেসব লোক মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত, যারা কারো উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না এবং যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া এরূপ সাংঘাতিক কথা বলে বেড়ায়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে পয়গম্বর আলাইহিস সালামের ওসীলায় দুনিয়ার আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। নতুবা এ বিষয়টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল (মূযেহুল কুরআন)। তদুপরি তোমাদের মধ্যকার খাঁটি মুসলমানদের তওবার তাওফীক দান করেছেন ও অন্যায় ক্ষমা করে দিয়েছেন, নতুবা মুনাফিকদের ন্যায় তারাও কিয়ামতের দিন গুরুতর আযাবে ধৃত হত।

৩. অর্থাৎ গুরুতর শাস্তির যোগ্য হবে না কেন, যেখানে তোমরা এরূপ ভিত্তিহীন ও সুস্পষ্ট বাতিল একটি কথা পরস্পরে চালাচালি করছিলে এবং মুখ থেকে এমন অনুমানের কথা বের করছিলে যার বাস্তবতা সম্বন্ধে তোমাদের কোনই খবর ছিল না। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট বড় জঘন্য অপরাধরূপে পরিগণিত– এমন একটি বিষয়কে (অর্থাৎ কোন সতী-সাধ্বী নারী বিশেষত পয়গম্বর আলাইহিস সালামের পবিত্র বিবি ও মুমিনদের রূহানী মায়ের উপর অপবাদ আরোপ করাকে) নিতান্তই হালকা ও মামুলি বিষয় মনে করা আসল অপরাধ থেকেও বড় অপরাধ ছিল।

وَلَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬. যখন তোমরা তা শুনেছিলে, তখন কেন বললে না, 'আমাদের জন্য এ কথা মুখে আনা আদৌ উচিত নয়; আপনি (হে আল্লাহ!) পবিত্র, এ তো গুরুতর অপবাদ[১]।'

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, এহেন কাজ পুনরায় কখনই করো না যদি তোমরা ঈমানদার হও[২]।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্ট করেন গুপ্ত বিষয়াদি।* আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

---

১. অর্থাৎ ইতিপূর্বে মুমিনদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণের যে তাকিদ করা হয়েছে, তার দাবি তো হল অন্তরেও এই ঘৃণ্য ধারণাকে স্থান না দেওয়া। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় কারো অন্তরে যদি কোন খারাপ ওয়াসওয়াসা এসেই পড়ে, তখনো এহেন জঘন্য কথা মুখে উচ্চারণ করা বৈধ নয়। বরং একজন মুমিনের উচিত নিজ অবস্থান ও ঈমানদারীর দাবি থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া যে, এরূপ ভিত্তিহীন কথা মুখে আনাও আমার পক্ষে সমীচীন নয়। আয় আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র– কীভাবে মানুষ এহেন জঘন্য কথা বলতে পারে! যে সতী-সাধ্বী নারীকে তুমি নবীসর্দার ও মুত্তাকীপ্রধানের জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে নির্বাচিত করেছ, তিনি কি (নাউযুবিল্লাহ) নিজ মর্যাদা বিসর্জন দিতে ও নবীর মর্যাদাকে দাগী করতে পারেন? নিশ্চয় শত্রুরা তাঁর প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছে।

২. অর্থাৎ মুমিনদের সবদিক দিয়ে সতর্ক-সাবধান থাকতে হবে। পাপাচারী মুনাফিকদের জালে যেন তারা কখনো পা না দেয়। পয়গম্বর আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আহলে বাইতের মহান মর্যাদার প্রতি তাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'সুস্পষ্টভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন।'

৩. (গুপ্ত বিষয়াদি)– যেমন এ বিষয় যে, এই জঘন্য অপবাদ কারা রচনা করল? তা মূলত রচনা করেছে গোপন শত্রু মুনাফিকরাই, যেমন সামনের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। (মূযেহুল কুরআন)।

অধিকাংশ মুফাসসির آيات দ্বারা আহকাম, নসীহত, হুদূদ (দণ্ডবিধি) ও তওবা কবূল করা ইত্যাদি বিষয়ের আয়াত উদ্দেশ্য করেছেন। আয়াতে আল্লাহ তাআলার 'ইলম' ও 'হেকমত' গুণ দুটির উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যারা খাঁটি, তিনি তাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থা উত্তমরূপে জানেন, সেজন্য তিনি তাদের তওবা কবূল করেছেন। আর যেহেতু তিনি অতি প্রজ্ঞাবান, তাই নিতান্ত হেকমত ও বিজ্ঞতার সাথে তিনি তোমাদের তরবিয়ত ও সংশোধন করেছেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১৯. যারা কামনা করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক[১], নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি- দুনিয়া ও আখেরাতে[২]। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না[৩]।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০. যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত এবং আল্লাহ অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু না হতেন (তবে তোমাদের কী বিপদই না হত!)[৪]।

[রুকূ - ৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক

---

১. অর্থাৎ ব্যভিচার প্রসারিত হোক, অথবা ব্যভিচারের খবরাখবর প্রচারিত হোক। এরূপ কামনা করত মুনাফিকরা। কিন্তু ওদের আলোচনা করে মুমিনদেরও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, ঘটনাক্রমে কারো অন্তরে যদি একটি খারাপ বিষয়ের ধারণা এসে থাকে এবং অসতর্কভাবে কোন কথা মুখেও বলে থাকে, তবু এখন আর সেই বিষয়ের চর্চা করে বেড়ানো উচিত নয়। স্মরণ রেখো- কেউ যদি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোন মুমিনের মর্যাদা নষ্ট করে, তবে তার মান-ইজ্জতও রক্ষা পাবে না। আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে ছাড়বেন।

২. দুনিয়াতে 'হদ্দে কযফ'- অপবাদ আরোপের শাস্তি, লাঞ্ছনা ও নানা রকম গঞ্জনা। এবং আখেরাতে দোযখের শাস্তি।

৩. অর্থাৎ ফেতনাবাজদের আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, যদিও তোমরা তাদের জান না। আর কার অপরাধ কী পরিমাণ এবং কার কী উদ্দেশ্য- এও তাঁর জানা রয়েছে।

বি. দ্র. অশ্লীলতার প্রসার কামনাও হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতির ন্যায় আত্মিক রোগসমূহের একটি এবং এটাও অন্তরের একটি আমল। এটা নিছক ইচ্ছা-এরাদার পর্যায়ভুক্ত বস্তু নয়। সুতরাং এর কারণেও যে শাস্তি পেতে হবে, তাতে মতভেদ করা উচিত নয়। (فتنبه له)

৪. অর্থাৎ এমন ভয়ঙ্কর বিষয় সম্মুখে এসেছিল যে, অনেকেই তার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও রহমতে এবং মেহেরবানীতে তোমাদের মধ্যে তওবাকারীদের তওবা কবুল করেছেন এবং কতককে শরী'য়তসম্মত হদ (শাস্তি) প্রয়োগের দ্বারা পবিত্র করেছেন। আর যারা খুব বেশি খবীছ ছিল, ওদের কিছুটা অবকাশ দিয়েছেন।

الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুসরণ করবে, তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়[১]। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত, তবে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২২. তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এ মর্মে কসম না খায় যে– আত্মীয়স্বজনকে, অভাবীদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের দান-খয়রাত করবে না। বরং তারা যেন ক্ষমা করে ও মার্জনা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

---

১. অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত সম্বন্ধে সর্তক থেকো। মানুষ ও জিন উভয় প্রকারের শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে মুসলমানের বেঁচে থাকা কর্তব্য। মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দের দিকে নিয়ে যাওয়াই ওদের একমাত্র মিশন। লক্ষ্য করে দেখ, শয়তান একটু প্রতারণা করে কত জঘন্য অপবাদ চাউর করে দিল এবং কয়েকজন সাদাসিধা মুসলমান কিভাবে ওর ফাঁদে পড়ে গেল।

২. অর্থাৎ শয়তান তো সকলকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ত, একজনকেও সরল পথে থাকতে দিত না। এ আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত যে, তিনি তাঁর খাঁটি বান্দাদের সাহায্য করেন– অনেককে নিরাপদে রাখেন এবং কতককে আপদে জড়িত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দান করেন।

এ বিষয়টি এক আল্লাহরই ক্ষমতায় রয়েছে এবং তিনিই স্বীয় সর্বব্যাপী ইলম ও কামেল হেকমতের দ্বারা জানেন, কোন বান্দা সংশোধিত হওয়ার যোগ্য এবং কার তওবা কবুল হওয়ার মত। তিনি সকলের তওবা প্রভৃতি শুনেন এবং তাদের অন্তরের অবস্থা উত্তমরূপে জানেন।

৩. **শানে নুযুল**

হযরত আয়েশা (রা)-এর নামে যারা অপবাদ আরোপ করেছিল, কতক মুসলমানও না জেনে তাদের সাথে অংশ নিয়েছিল। এদের একজন ছিলেন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাগনে কিংবা খালাত ভাই হযরত মিসতাহ। তিনি একজন গরীব মুহাজির ছিলেন। অপবাদের ঘটনার পূর্বে হযরত সিদ্দীকে আকবর তাঁকে সাহায্য করতেন ও তাঁর যত্ন নিতেন। যখন উক্ত

২৩. যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরলা ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি[১]।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

ঘটনার সমাপ্তি হল এবং আসমান থেকে আয়েশা সিদ্দীকার নিষ্কলুষতা ঘোষিত হয়ে গেল, তখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কসম খেলেন যে, ভবিষ্যতে মিসতাহকে আর সাহায্য করবেন না। সম্ভবত অন্য কতক সাহাবীর ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটে থাকবে। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৪১, তাফসীরে তবারী : ১৭/২২৫)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দীনী মর্যাদা ও দুনিয়াবী স্বচ্ছলতা দান করেছেন, তাদের পক্ষে এরূপ কসম খাওয়া সমীচীন নয়। তাদের মন খুব উদার এবং চরিত্র অনেক উন্নত হওয়া উচিত। মন্দের উত্তরে সদ্ব্যবহার করাই বদান্যতার পরিচায়ক। গরীব আত্মীয়দের ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বদেশত্যাগীদের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া বুযুর্গ ও বাহাদুরদের কাজ নয়। কসম খেয়ে ফেললে এরূপ কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা দিয়ে দিতে হবে। অন্যায়কারীদের অন্যায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের শান হওয়া চাই। এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দেন? যদি কর, তবে তোমাদের পক্ষেও তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে এ আচরণ করা উচিত। বলতে গেলে, এর মধ্যে تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ এর শিক্ষা দান করা হয়েছে।

হাদীসে আছে, যখন হযরত আবু বকর (রা) শুনলেন- أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ (তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন), তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন بلى يا ربنا إنا نحب (নিশ্চয় হে প্রভু! আমরা অবশ্যই চাই)। এই বলে তিনি মিসতাহকে যে সাহায্য দিতেন, তা পূর্ববৎ চালু করে দিলেন (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭৫০,৪৭৫৭)। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আগের চেয়ে দ্বিগুণ করে দিলেন। (দুররে মানসূর)

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে,

اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحروقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربوا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

সাতটা ধ্বংসকর কর্ম থেকে তোমরা দূরে থাক- (১) আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ নিষেধ করেছেন এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা, তবে আইনসংগত হলে ভিন্ন কথা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সরলমতী মুমিন সতী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮৯)

এ থেকে বোঝা যায়, যে কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করাই ধ্বংসকর বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে পয়গম্বরের বিবিদের, বিশেষ করে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা কী জঘন্য পর্যায়ের পাপ হবে!

২৪. যেদিন ওদের জিহবা ও ওদের হাত-পা ওদেরই বিরুদ্ধে ওরা যা কিছু করত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে[১]–

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤

২৫. সেদিন আল্লাহ ওদেরকে ওদের উপযুক্ত প্রতিফল (তথা শাস্তি) পুরাপুরি দেবেন এবং ওরা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, সুস্পষ্টকারী[২]।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝٢٥

২৬. অপবিত্র (দুশ্চরিত্র) নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষরা অপবিত্র নারীদের জন্য। আর পবিত্র (সচ্চরিত্র) নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের জন্য[৩]। লোকেরা যেসব কথা বলে

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ

বিজ্ঞ আলেমদের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতগুলি অবতরণের পর যে ব্যক্তি আয়েশা সিদ্দীকা অথবা নবীজির (স.) স্ত্রীদের যে কোন একজনকে অপবাদ দেবে, সে কাফের, কুরআনের অস্বীকারকারী ও ইসলামের সীমা থেকে খারিজ। আর 'তবারানী'র এক হাদীসে আছে- قذف المحصنة يهدم عمل مأة سنة (সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ শত বর্ষের আমল ধ্বংস করে দেয়।) (মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস : ৩০২৩,; মুসনাদে বায্যার-কাশফুল আসতার, হাদীস : ১০৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৮৭১২)

১. অর্থাৎ অপরাধী নিজ মুখে বলতে ও প্রকাশ করতে চাইবে না, কিন্তু স্বয়ং তার জিহ্বা ও হাত-পা কথা বলবে এবং এগুলির প্রত্যেক অঙ্গ সেই আমলের কথা বলবে, যা তার দ্বারা করা হয়েছিল।

লক্ষণীয় : অপবাদ আরোপকারী মুখে অপবাদ দিয়েছিল এবং তার থেকে চারজন সাক্ষী তলব করা হয়েছিল, যা সে পেশ করতে পারেনি। এর বিপরীতে এখানে পাঁচটি বস্তুরই উল্লেখ হয়েছে– এক: জিহ্বা, যা অপবাদের আসল অঙ্গ। আর দু'হাত ও দু'পা, যেগুলি তার দুষ্কর্মের সাক্ষী হবে।

২. যিনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলও প্রকাশ করে দেবেন এবং যাঁর হিসাব সম্পূর্ণ পরিষ্কার। তাঁর দরবারে কোন রকমের জুলুম ও বাড়াবাড়ি নেই। কিয়ামতের দিন সকলের সামনে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ যিনাকারী ও দুশ্চরিত্র নারীরা তাদের মত পুরুষদেরই যোগ্য। তদ্রূপ যিনাকারী ও চরিত্রহীন পুরুষদের সম্পর্ক তাদের মত নারীদের সঙ্গেই মানায়। নাপাক-যিনাকারী লোকদের সাথে পাক-পবিত্র লোকদের কোন সম্পর্ক হতে পারে না।

مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۲۶﴾

তা থেকে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র[১]। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক[২]।

[রুকূ - ৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার বাসিন্দাদের সালাম কর। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম। (এ নির্দেশ দেওয়া হল), যাতে তোমরা স্মরণ রাখ[৩]।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, পয়গম্বরের বিবি বদকার (ব্যভিচারিণী) হন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের আবরু-ইজ্জত (সতীত্ব) হেফাজত করে থাকেন। (মূযেহুল কুরআন)

বি. দ্র. আয়াতের এই ব্যাখ্যা (আয়াতের) তরজমা অনুযায়ী করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, الخبيثات ও الطيبات এখানে মহিলাদের বিশেষণ নয়, বরং এ দ্বারা কথাবার্তা ও বাক্যাবলি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নোংরা কথা নোংরা মানুষেরই পক্ষে শোভা পায়, আর পাক-পরিচ্ছন্ন কথা পাক-পরিচ্ছন্ন লোকদেরই পক্ষে শোভনীয়। পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন নর-নারী নোংরা অপবাদ আরোপ থেকে পবিত্র থাকে, যেমনঃ সম্মুখের আয়াতাংশ– أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। অথবা এটা বলা যায় যে, নোংরা কথাবার্তা নোংরা লোকদের মুখ থেকেই বের হয়। অতএব যারা কোন পাক-পবিত্র মানুষ সম্বন্ধে নোংরা কথা বলল, বুঝতে হবে যে, তারা নিজেরাই নোংরা।

১. অর্থাৎ নোংরা লোকেরা যেসব বাজে কথা বলে বেড়ায়, পরিচ্ছন্ন লোকেরা তা থেকে পাক-পবিত্র।

২. অর্থাৎ মানুষেরা মন্দ বলায় পবিত্র লোকেরা মন্দ হয়ে যায় না, বরং তারা যখন তাতে ধৈর্যধারণ করে, তা তাঁদের গোনাহ-খাতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর দুনিয়াতে মন্দকারী লোকেরা তাদের যে পরিমাণ অপমানিত করে, আখেরাতে তাঁরা এর পরিবর্তে সে পরিমাণ মর্যাদাকর জীবিকা লাভ করে।

৩. অর্থাৎ, একমাত্র নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়া অন্য কারো থাকার ঘরে খবর না দিয়ে প্রবেশ করতে নেই। কে জানে, সে কী অবস্থায় আছে এবং সে কারো ভিতরে প্রবেশকে পছন্দ করবে কিনা? সুতরাং ভিতরে যাওয়ার আগে অনুমতি নেবে। এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে সালাম। হাদীসে আছে, তিনবার সালাম দেবে এবং প্রবেশের অনুমতি চাবে। তিনবার সালামের পরও যদি অনুমতি না পাওয়া যায়, তবে ফিরে যাবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৫৩)

২৮. আর যদি তাতে কাউকে না পাও, তবে তাতে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়[১]। আর যদি তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যেয়ো। এটি তোমাদের জন্য খুবই পরিচ্ছন্ন পন্থা[২]। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবগত[৩]।

فَاِنۡ لَّمۡ تَجِدُوۡا فِیۡهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدۡخُلُوۡهَا حَتّٰی یُؤۡذَنَ لَكُمۡ ۚ وَ اِنۡ قِیۡلَ لَكُمُ ارۡجِعُوۡا فَارۡجِعُوۡا هُوَ اَزۡكٰی لَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلِیۡمٌ ﴿۲۸﴾

২৯. এমন ঘরে প্রবেশ করায় তোমাদের কোন গোনাহ হবে না, যেখানে কেউ বাস করে না (এবং) যেখানে তোমাদের কোন জিনিস রয়েছে☆[৪]।

لَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَدۡخُلُوۡا بُیُوۡتًا غَیۡرَ مَسۡكُوۡنَةٍ فِیۡهَا مَتَاعٌ لَّكُمۡ

বস্তুত এটি এমন হেকমতপূর্ণ শিক্ষা, যার অনুসরণ বাড়িওয়ালা ও আগন্তুক উভয়ের জন্যই উত্তম। আফসোসের বিষয়, বর্তমানে মুসলমানরা এসব আদর্শ ও কল্যাণময় শিক্ষা ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ তাদের থেকেই অন্যান্য জাতি এই শিক্ষাগুলি গ্রহণ করে উন্নতি করছে।

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সামঞ্জস্য

সূরার প্রথম থেকে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ প্রভৃতির আহকাম বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ এ বিষয়গুলো পর্যন্ত নিয়ে যায়, তাই আলোচ্য আয়াতগুলিতে অনুমতি চাওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

১. যদি জানা যায়, ঘরে কেউ নেই, তবু অন্যের ঘরে মালিকের অনুমতি ছাড়া যেয়ো না। কেননা, অন্যের স্বত্বে অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। কে জানে, অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কী সমস্যা সৃষ্টি হয়? হাঁ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকলে প্রবেশে কোন বাধা নেই।

২. অর্থাৎ এরূপ বললে মনে কষ্ট নিয়ো না। অনেক সময় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে মন চায় না অথবা সাক্ষাতে কোন অসুবিধা থাকে অথবা তখন এমন কোন কাজে থাকে, যা অন্যকে জানাতে চায় না। এ অবস্থায় তাকে অযথা বিব্রত করার কী প্রয়োজন? এভাবে মনের উপর চাপ সৃষ্টি করলে সম্পর্ক ভাল থাকে না।

৩. তিনি তোমাদের অন্তরের অবস্থা ও সমস্ত কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত। যা কিছু করবে এবং যে নিয়তে করবে, আল্লাহ তাআলা সে অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। আর তিনি নিজের সর্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করেই উক্ত বিধান প্রদান করেছেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যার দ্বারা উপকৃত হওয়া (-র অধিকার) তোমাদের আছে'।

৪. অর্থাৎ যেসব ঘরে কোন নির্দিষ্ট লোক বাস করে না, যাতায়াতে কোন বাধা-বিপত্তিও নেই– যথা মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মুসাফিরখানা প্রভৃতি, সেখানে যদি তোমাদের কোন

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

আর আল্লাহ জানেন– যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর[১]।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৩০. আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি যথাসম্ভব নত রাখে[২] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে[৩]; এটি তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র পন্থা। তারা যা কিছু করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত[৪]।

জিনিস থাকে অথবা কিছু সময় সেখানে থাকার প্রয়োজন হয়, তবে সেখানে অবশ্যই যেতে পার। এর জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়ের মাসলা-মাসায়েল বিস্তরিতভাবে জানার জন্য ফেকাহশাস্ত্রের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

১. তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখেই এসব বিধান জারী করেছেন, যাতে ফেতনা-ফাসাদের সকল দ্বার বন্ধ করা যায়। মুমিন বান্দার এ উদ্দেশ্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি রেখেই আমল করা উচিত।

২. কুদৃষ্টি সাধারণত যিনার প্রথম সোপান। এর দ্বারাই বড় বড় নির্লজ্জ কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পবিত্র কুরআন ব্যভিচার ও অশ্লীলতার যাবতীয় দ্বার বন্ধ করার জন্য প্রথমে এই ছিদ্রটি বন্ধ করতে চেয়েছে। মুসলমান নর ও নারীকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং নিজ কুপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। যদি একবার অনিচ্ছায় কোন পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের অথবা কোন পরপুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি পড়েও যায়, তবে দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় সেদিকে তাকাবে না। কেননা, দ্বিতীয়বারের দেখা নিজ ইচ্ছায় হবে– এতে সে অক্ষম বিবেচিত হতে পারে না।

মানুষ যদি তার দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস করতে থাকে এবং ইচ্ছা করে নিষিদ্ধ বিষয়াদির প্রতি চোখ তুলে তাকানো থেকে বিরত থাকে, তবে অতিসত্বর তার আত্মার সংশোধন হতে পারে। প্রথমবার যেহেতু হঠাৎ করে অনিচ্ছায় দৃষ্টি পড়ে, যৌন আসক্তির বশবর্তী হয়ে নয়, সেজন্য হাদীসে একে ক্ষমার্হ ধরা হয়েছে। সম্ভবত এখানেও من أبصارهن-এর من টি تبعيضية বা অংশবাচক এবং এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য (অর্থাৎ কতক দৃষ্টি ক্ষমার্হ।)

৩. অর্থাৎ তারা যেন ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকে এবং কারো সামনে সতর না খোলে। তবে শরী'য়ত যার সামনে খোলার অনুমতি দিয়েছে– যেমন: স্ত্রী ও ক্রীতদাসী, তাদের সামনে খোলা যাবে।

৪. অর্থাৎ চোখের চুরি, দিলের কথা ও নিয়তের অবস্থা সবই তিনি জানেন। এ কথা চিন্তা করে কুদৃষ্টি ও সব রকমের পাপাচার থেকে বিরত থাক। নতুবা তিনি নিজ ইলম অনুযায়ী তোমাদের

৩১. এবং ঈমানদার নারীদেরও বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি যথাসম্ভব নত রাখে ও নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এবং নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে এর যেটুকু প্রকাশ পেয়েই যায় (তার কথা ভিন্ন)[১]। এবং তারা যেন আপন বক্ষদেশের

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

শাস্তি প্রদান করবেন- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (তিনি চোখের চুরি এবং অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তা জানেন। –সূরা মুমিন, আয়াত ১৯)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) ما يصنعون দ্বারা খুব সম্ভব জাহেলী যুগের পাপাচার ও অন্যায়-অবিচার উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ, যেসব পাপাচার পূর্ব থেকে তোমরা করে এসেছ, তা সবই আল্লাহর জানা। এজন্যই এখন তিনি স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে এসব বিধান প্রেরণ করেছেন, যাতে তোমাদের আত্মশুদ্ধি হয়।

১. سنگار এর প্রচলিত অর্থ কৃত্রিম সাজগোছ, যা পোশাক বা অলঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা অর্জিত হয়। অধমের মতে এস্থলে زينة এর তরজমা سنگار এর পরিবর্তে زیبائش 'সৌন্দর্য' করা হলে অধিকতর ব্যাপক ও সংগত হত। কেননা, এ শব্দটি সৃষ্টিগত ও কৃত্রিম সব রকমের সৌন্দর্য বোঝায়– চাই তা দেহের সৃষ্টিগত সৌন্দর্য হোক; অথবা পোশাক, অলঙ্কার প্রভৃতি কৃত্রিম প্রসাধনীর সৌন্দর্য হোক।

সারকথা এই যে, নারীর পক্ষে কোন রকমের দৈহিক বা কৃত্রিম সৌন্দর্য মাহরাম ছাড়া কারো সামনে প্রকাশ করা জায়েয নয়। মাহরাম পুরুষদের আলোচনা পরবর্তীতে আসছে। কিন্তু যতটুকু সৌন্দর্যের প্রকাশ অনিবার্য, যা প্রকাশ হয়েই যায়, প্রকাশ না করে পারা যায় না, তা প্রয়োজনে বা অনন্যোপায় হয়ে খোলা রাখতে দোষ নেই, তবে শর্ত এই যে, ফেতনার আশঙ্কা যেন না থাকে।

الا ماظهر- এর ব্যাখ্যা

হাদীস ও সাহাবীদের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, চেহারা ও দু'হাতের তালু الاما ظهر – এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ, দীন ও দুনিয়ার অনেক কাজে মানুষ এগুলি খোলা রাখতে বাধ্য হয়। সর্বাবস্থায় এগুলি আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হলে মেয়েরা কাজকর্মে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ মুখ ও হাতের উপর কিয়াস করে দু'পাকেও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া উক্ত অঙ্গগুলির আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রী– যথা, আংটি, মেহেদী, কাজল প্রভৃতিও ব্যতিক্রমবিশিষ্ট হুকুমের আওতাধীন।

তবে প্রকাশ থাকে যে, الا ماظهر দ্বারা শুধু প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য উক্ত অঙ্গগুলি খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের জন্য চোখ তুলে তাকানোর এবং নারীর উক্ত অঙ্গগুলি দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সম্ভবত এ জন্যই উক্ত অনুমতি প্রদানের আগেই আল্লাহ তাআলা চোখ অবনত রাখার নির্দেশটি মুমিনদের শুনিয়ে দিয়েছেন। বোঝা গেল,

وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اٰبَآئِهِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِهِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ

উপর নিজেদের ওড়না ফেলে রাখে[১]। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা[২], শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগনে, নিজেদের স্ত্রীলোক[৩], যারা তাদের

এক পক্ষকে কোন অঙ্গ খোলা রাখার অনুমতি প্রদান এ কথা বোঝায় না যে, অন্য পক্ষ কর্তৃক তা দেখারও অনুমতি আছে। দেখুন, পুরুষের জন্য পর্দার বিধান নেই, অথচ মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে তাদের দিকে তাকাতে।

হিজাবের বিষয় সতরের মাসআলা থেকে ভিন্ন

আরো স্মরণীয়, বর্তমান আয়াতে শুধু সতরের মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নারীর পক্ষে নিজ ঘরে হোক বা বাইরে, কোন্ অবস্থায় দেহের কোন্ অংশ কার সামনে খোলা রাখা জায়েয! বাকী হিজাবের মাসআলা, অর্থাৎ শরী'য়ত তাকে কোন্ কোন্ অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে নেই। এর কিছু আলোচনা ইনশাআল্লাহ সূরা আহযাবে আসবে।

আর আমরা ফেতনার আশঙ্কা না থাকার যে শর্ত যোগ করেছি, তা অন্যান্য দলীল-প্রমাণ ও শরী'য়তের সাধারণ নিয়ম-নীতি থেকে গৃহীত, যা সামান্য চিন্তা-ফিকির এবং পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দান করলেই জানা যেতে পারে।

১. দেহের সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্ট হচ্ছে বুকের পরিস্ফুটন। তাই বুকের অধিকতর সতরের বিষয়ে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। এভাবে জাহেলী যুগের কুপ্রথা মেটানোর উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে মেয়েরা চাদর (ওড়না) মাথায় পরে তার দুই প্রান্ত বুকের পরিবর্তে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিত। এভাবে বুকের রূপ-সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত থাকত। এ ছিল সৌন্দর্যের প্রদর্শনী। কুরআন কারীম নির্দেশ দিল, ওড়না মাথার উপর থেকে টেনে বুকের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে কান, ঘাড় ও বুক সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে।

২. চাচা ও মামারও এই হুকুম। এই মাহরামদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন: যে সৌন্দর্য স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে পারে, তা অন্য মাহরামদের সামনে পারে না। তদ্রুপ সৌন্দর্য প্রকাশেরও বিভিন্ন স্তর আছে, যার বিস্তারিত আলোচনা বড় বড় তাফসীর ও ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, গায়র-মাহরাম বা বেগানা পুরুষদের সামনে যতটুকু পর্দা করা জরুরি, মাহরামদের সামনে ততটুকুর প্রয়োজন নেই। মাহরামদের প্রত্যেকের সামনে প্রত্যেক অঙ্গই প্রকাশ করতে পারবে- এটা উদ্দেশ্য নয়।

৩. অর্থাৎ যে নারীরা তাদের কাছে ওঠা-বসা করে। তবে শর্ত এই যে, তারা সচ্চরিত্র হতে হবে। অসচ্চরিত্র নারীদের সামনে (সৌন্দর্য) প্রকাশ করা যাবে না। সালাফে সালেহীনের অনেকের মতে, نسائهن দ্বারা মুসলমান নারীরা উদ্দেশ্য। আর কাফের নারী বেগানা পুরুষের ন্যায়।

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ التَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

মালিকানাধীন[১], এমন পুরুষ সেবক, যাদের (নারীদের প্রতি) কোনো চাহিদা নেই[২] ও নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ বালক[৩]—(এরা) ছাড়া কারো নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তারা যেন এমনভাবে নিজেদের পা না ফেলে, যার ফলে তাদের গোপন সৌন্দর্য জানা হয়ে যায়[৪]। আর হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও[৫]।

وَأَنكِحُوا الْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّـٰلِحِينَ

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী বা স্বামীহীন, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর[৬] এবং তোমাদের দাস-

---

১. অর্থাৎ নিজ বাঁদী। আর সালাফে সালেহীনের কারো কারো মতে ক্রীতদাসও এর অন্তর্ভুক্ত। আয়াত থেকে বাহ্যত এমনই মনে হয়। তবে অধিকাংশ ইমাম ও সালাফে সালেহীনের মাযহাব কিন্তু তা নয়।

২. অর্থাৎ এমন পুরুষ চাকর-বাকর, যারা শুধু নিজেদের কাজে মগ্ন এবং আহার-নিদ্রায় ব্যস্ত থাকে, নারীদের প্রতি কোন আকর্ষণ রাখে না। অথবা যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লুপ্ত, যারা অপ্রকৃতিস্থ– শুধু পানাহারে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যুক্ত।

৩. অর্থাৎ যে বালকেরা এখনো নারীর গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং যাদের যৌনবোধ এখনো জাগ্রত হয়নি।

৪. অর্থাৎ চাল-চলন এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে অলঙ্কার প্রভৃতির শব্দে পরপুরুষদের আকর্ষণ ও মনোযোগ হয়। অনেক সময় এ ধরণের শব্দ যৌনপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে আকৃতি দেখার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে।

৫. অর্থাৎ পূর্বে যা-কিছু হয়ে গেছে, তা থেকে তওবা কর। আর ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক নর ও নারীর উচিত, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাক্‌ওয়ার পথ অবলম্বন করা। এতেই ইহ-পরকালের কল্যাণ ও কামিয়াবী নিহিত।

৬. ইতিপূর্বে অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ, দৃষ্টি অবনত রাখা, পর্দা করা প্রভৃতি বিধান বর্ণিত হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের দ্বার বন্ধ হয়। বর্তমান আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাদের বিবাহ হয়নি অথবা হয়ে বিধবা হয়ে গেছে, যথাযোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'হে আলী! তিন কাজে বিলম্ব করো না– ফরয নামাযের সময় হলে, জানাযা উপস্থিত হলে এবং

مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

দাসীদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদেরও বিবাহ করাও[১]। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন[২]। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ[৩]।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ

৩৩. আর যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে না তারা যেন নিজেদের সংযত রাখে, যাবৎ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করেন[৪]। আর

স্বামীহীন স্ত্রীলোকের যোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১০৯৮; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২৬৮৬)

যেসব লোক বিধবা নারীদের বিবাহকে অপছন্দ করে, তাদের ঈমান নিরাপদ নয়।

১. অর্থাৎ দাস-দাসীর মধ্যে যারা বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তোমাদের খেদমত ছেড়ে দেবে না বলে মনে কর, তাদেরও বিয়ে দিয়ে দাও।

২. কিছু লোক এ কথা ভেবে বিবাহে দ্বিধাবোধ করে যে, বিবাহ হলে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির ব্যয়ভার বহন করবে কী করে? তাদের বলা হচ্ছে যে, এরূপ কাল্পনিক আশঙ্কার কারণে বিবাহ থেকে বিরত থেকো না। কারণ, তোমাদের ও পরিবার-পরিজনের রিযিক আল্লাহ তাআলার হাতে। হতে পারে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ওসীলায় তোমাদের জীবিকায় বরকত দান করবেন। একলা থাকলে স্বাচ্ছন্দ্য, আর বিয়ে করলে দারিদ্র্য আসবে– এ সত্য নয়। স্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয়ে থাকে, যেমন অন্যত্র তিনি বলেছেন- وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ (আর যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ কৃপায় তোমাদের ধনী বানিয়ে দেবেন– তওবা : ২৮)

আর জাহেরী আসবাবের হিসাবেও বলা যায় যে, বিয়ে করলে অথবা বিবাহের নিয়ত করলেই মানুষের উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। ফলে সে উপার্জনের জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক চেষ্টা ও পরিশ্রম করে। তদুপরি স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং কোন কোন সময় স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনও জীবিকার্জনে সহযোগিতা করে।

যা হোক, রিযিকের অভাব বা প্রশস্ততা বিয়ে করা বা একাকী থাকার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং দারিদ্রের ভয় বিয়েতে প্রতিবন্ধক হবে কেন?

৩. যার জন্য তিনি ভাল মনে করেন, তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন।

৪. অর্থাৎ এই মুহূর্তে যাদের বিবাহ করার মত সংগতি নেই, আল্লাহ তাআলা সংগতি দান না করা পর্যন্ত তাদের উচিত নিজেদের নফসকে সংযমে রাখা এবং সচ্চরিত্র থাকার চেষ্টা করা।

হতে পারে, আত্মসংযম ও পবিত্রতারই বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের স্বচ্ছল করে দেবেন এবং বিয়ের উত্তম সুযোগ করে দেবেন।

يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۭ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ

তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতে পাও[১]। এবং তোমরা তাদের 'আল্লাহর সম্পদ' থেকে দান কর, যা তিনিই তোমাদের দিয়েছেন[২]। আর তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না, যদি তারা পবিত্র থাকতে চায়[৩]। আর যে

---

১. অর্থাৎ কারো দাস বা দাসী যদি মৌখিকভাবে অথবা অধিক নিশ্চয়তার জন্য লিখিতভাবে এমন চুক্তি করতে চায় যে, 'আমি এত দিনে এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আপনাকে উপার্জন করে দিলে আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন,' তবে মালিকের তা কবুল করা উচিত। (এ চুক্তিকে 'মুকাতাবাত' বলে এবং দাস-দাসীদের আযাদ করার এ একটি বিশেষ উপায়)।

কিন্তু উক্ত প্রস্তাব মালিক তখনি কবুল করবে যখন সে বুঝবে, এই দাস বা দাসীর পক্ষে মুক্তি উত্তম হবে। দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চুরি বা পাপাচার অথবা অন্য কোন বদমায়েশী করে বেড়াবে না। এই নিশ্চয়তা থাকলে তাকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সে মুক্ত হয়ে নিজের উন্নতি করতে পারে এবং কোথাও বিয়ে করতে চাইলে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে। দাসত্বের কারণে তার উন্নতির ক্ষেত্র যেন সংকীর্ণ না হয়।

২. সম্পদশালী মুসলমানদের বলা হয়েছে, এরূপ দাস-দাসীর আর্থিক সাহায্য কর– চাই যাকাত দ্বারা হোক অথবা অন্য কোন দান-খয়রাত দ্বারা, যাতে তারা শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে পারে। আর মালিক যদি নির্ধারিত মুক্তিপণের অংশবিশেষ মাফ করে দেয়, তবে এটাও বিরাট সাহায্য হিসাবে পরিগণিত হবে।

বি. দ্র. যাকাতের খাতসমূহের মধ্যে وفِي الرقاب বলে যে একটি খাত আছে, তা দাসদাসীদেরই মুক্ত করার জন্য একটি ফাণ্ডবিশেষ। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বাইতুল মাল থেকে এরূপ (মুকাতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ) দাসদাসীর সাহায্য করা হত।

৩. **শানে নুযূল**

ইসলামপূর্ব যুগে কতক লোক নিজেদের দাসীদের দিয়ে অর্থ কামাই করত। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কয়েকজন দাসী ছিল, যাদের দ্বারা দেহ-ব্যবসা করিয়ে সে অর্থ উপার্জন করত। তাদের কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় এহেন জঘন্য কাজ করতে অস্বীকার করল। এতে ঐ অভিশপ্ত মুনাফিক তাদের মারধর করত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩০২৯)

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং শানে-নুযূলের প্রেক্ষাপটে অধিকতর ঘৃণা ও জঘন্যতা প্রকাশার্থে إن أردن تحصنا এবং لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا শর্ত দুটি উল্লেখ

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

কেউ তাদের বাধ্য করবে, তো তাদের বাধ্য করার পর আল্লাহ (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান[১]।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের শিক্ষণীয় বৃত্তান্ত ও আল্লাহ-ভীরুদের জন্য নসীহত[২]।

[রুকূ - ৫]

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ

৩৫. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 'নূর'[৩]। তাঁর 'নূরে'র উদাহরণ এমন: যেমন একটি

করা হয়েছে। নতুবা ক্রীতদাসীদের দ্বারা দেহব্যবসা করা সর্বাবস্থায়ই হারাম এবং অর্জিত অর্থ সবই অবৈধ– চাই দাসীরা এ কাজ সেচ্ছায় করুক, অথবা তাদের বলপ্রয়োগে করানো হোক। হাঁ, দাসীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু দুনিয়ার নিকৃষ্ট ফায়দা হাসিলের জন্য যদি তাতে বাধ্য করে, তবে এটা অধিকতর শাস্তিযোগ্য এবং অতি কদর্য ও ঘৃন্য কাজ।

১. অর্থাৎ ব্যভিচার এমন ঘৃণিত বিষয় যে, তা বলপ্রয়োগের দ্বারা হলেও ঘৃণিতই থাকে। কিন্তু যে নারীকে এতে বাধ্য করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার নিরুপায় অবস্থা দেখে নিজ রহমতে তাকে ক্ষমা করে দেন। এ ক্ষেত্রে مكرِه (বা বলপ্রয়োগকারীর) কঠোর শাস্তি হবে, তবে مُكْرَه বা যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার প্রতি দয়া করা হবে।

২. অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে নসীহত, হুকুম-আহকাম ও অতীত জাতিসমূহের শিক্ষামূলক ঘটনা সবকিছু বর্ণিত হয়েছে, যাতে আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করে।—অথবা مثلا من الذين خلوا দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, অতীত উম্মতগুলোর প্রতিও সেই ধরনেরই দণ্ডবিধি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যা এ সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মাঝেও এ সূরায় বর্ণিত 'ইফক' এর ঘটনার ন্যায় কিছু ঘটনাদি সংঘটিত হয়েছিল।

তো, আল্লাহ তাআলা যেমন শত্রুদের অপবাদ থেকে হযরত মারয়াম সিদ্দীকা ও হযরত ইউসুফ সিদ্দীককে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের নিষ্কলুষতা প্রমাণ করেছিলেন, তেমনি আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা) এর নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতাও কোরআনের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সৎপরায়ণ লোকদের অন্তরে পাথরের ন্যায় খোদিত করে দিয়েছেন এবং শত্রুদের মুখ কালো করে দিয়েছেন।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর দ্বারাই পৃথিবী ও আকাশসমূহের আলো-উজ্জ্বলতা ও বসবাস-যোগ্যতা। তাঁর সাহায্য না হলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। (মূযেহুল কুরআন)

সকল সৃষ্টি তাঁর কাছ থেকেই অস্তিত্বের আলো লাভ করেছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেশতা, পয়গম্বর ও ওলীদের মধ্যে যে বাহ্যিক বা রুহানী আলো রয়েছে, তা সকল আলোর উৎস (আল্লাহ) থেকেই উৎসারিত। যে যতটুকু হেদায়েত ও মারেফতের দীপ্তি পায়, তা তাঁরই মহান দরবার থেকে পায়। সমস্ত উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগত তাঁর সৃষ্টিগত নিদর্শনাদি ও নাযিলকৃত আয়াতসমূহ দ্বারা আলোকিত হয়ে আছে। শোভা-সৌন্দর্য ও রূপ-গুণের ঝলক যদি কোথাও দেখা যায়, তবে তা তাঁরই জ্যোতির্ময় ও মুবারক সত্তার সৌন্দর্য ও গুণের একখানি প্রতিবিম্বমাত্র।

উক্ত 'নূরে'র উল্লেখসম্বলিত কিছু মাছুর দোয়া

সীরাতে ইবনে ইসহাক-এ আছে, তায়েফে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হন, তখন তাঁর মুখে এ দো'য়া উচ্চারিত হচ্ছিল-

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة إلا با الله

('আপনার পবিত্র সত্তার যে নূরের দ্বারা অন্ধকার আলোকিত হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের কাজকাম যথানিয়মে চলছে, সেই নূরের ওসীলায় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমার উপর আপনার ক্রোধ পতিত না হয় অথবা আমার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি নাযিল না হয়। আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনারই অভিমুখী হয়ে থাকব; আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।) (মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস : ১৪৮৬৪; তাফসীরে ইবনে কাসীর)

রাতের আঁধারে নবীজি (স.) স্বীয় প্রভুকে এভাবে ডাকতেন- أنت نور السموات والأرض ('আপনি তো আসমান ও যমীনের নূর।') এবং নিজের কান, চোখ ও অন্তরসহ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বরং নিজের গোটা সত্তার জন্য তাঁর নিকট 'নূর' ভিক্ষা করতেন এবং দোয়ার শেষে সারসংক্ষেপরূপে বলতেন- واجعل لي نورا অথবা واعظم لي نورا, অথবা واجعلني نورا অর্থাৎ আমার নূর বৃদ্ধি করে দিন বরং আমাকে আপাদমস্তক নূর বানিয়ে দিন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৩১৬, ৭৪৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৬৩, ৭৬৯)

অপর হাদীসে আছে- إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل (আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন অন্ধকারে, অতঃপর তাদের উপর তাঁর নূরের অংশ নিক্ষেপ করে দিলেন। সে সময় যে ব্যক্তি আল্লাহর নূর (তথা তাঁর তাউফীক) থেকে অংশ পেয়েছে, সে হেদায়েতের পথে এসেছে। পক্ষান্তরে যে তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। -ফতহুল বারী ৬/৪৩০) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৮৩৩)

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলার অন্যান্য গুণাবলি যথা: শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি প্রভৃতির যেমন কোন কাইফিয়াত বা রূপ বর্ণনা করা সম্ভব না, ঠিক তদ্রূপ তাঁর সিফাত 'নূর'কেও সৃষ্টিরাজ্যের কোন নূরের সাথে তুলনা করা যাবে না। বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম গাজ্জালী প্রণীত 'মেশকাতুল আনওয়ার' দ্রষ্টব্য।

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ
فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى
نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ

দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে। কাঁচপাত্রটি এমন, যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রদীপটি জ্বালানো হয় বরকতময় এক গাছ অর্থাৎ যয়তুন গাছের (তেল) দ্বারা, যা পূর্বেও অবস্থিত নয় এবং পশ্চিমেও নয়। মনে হয় যেন তার তেল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই জ্বলে উঠবে। 'নূরের' উপরে 'নূর'। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর 'নূরে'র দিকে পথ দেখান। আর আল্লাহ মানুষের জন্য বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত[১]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নূর থেকেই সমস্ত সৃষ্টিকুলের বিকাশ। তবে হেদায়েতপ্রাপ্ত মুমিনগণ তাঁর নূর থেকে হেদায়েত ও মারেফতের এক বিশেষ অংশ পেয়ে থাকে। যা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে এরূপ বলতে হয়– খাঁটি মুমিনের দেহ যেন একটি দীপাধারের ন্যায়, যার ভিতর নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল একটি কাঁচপাত্র (বা আলোকাধার) রাখা আছে অর্থাৎ তার অন্তর, যার সম্পর্ক উর্ধ্বজগতের সাথে। উক্ত কাঁচপাত্রের (আলোকাধারের) মধ্যে মারেফত ও হেদায়েতের আলো জ্বলছে।

এই আলো এমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম তেল দ্বারা জ্বলছে, যা অতি বরকতময় একটি গাছ (যয়তুন) থেকে আহরিত। আর যয়তুন গাছটি কোন আড়ালের কারণে পূর্বেও অবস্থিত নয়, পশ্চিমেও নয়। অর্থাৎ রোদ কোন দিক থেকেই তার উপর আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। (গাছটি) পরিষ্কার খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে, যার উপর সকাল ও বিকাল উভয় সময়ের রোদ পড়ে। অভিজ্ঞতা বলে, এমন যয়তুন গাছের তেল আরো বেশি স্বচ্ছ হয়ে থাকে। মোটকথা, তার তেল এতই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল যে, মনে হয় আগুন ছাড়াই নিজে নিজে জ্বলে উঠবে।

আমার মতে উক্ত তেল হচ্ছে সেই উত্তম যোগ্যতা ও তাওফীকপ্রাপ্তির উপমা, যা সৃষ্টির সূচনাপর্বে আল্লাহর দেওয়া বরকতময় নূর থেকে মুমিন ব্যক্তি হাসিল করেছিল। আর বরকতময় গাছটিকে যেমন لاشرقية ولاغربية বলা হয়েছে, তদ্রূপ সেই নূরে-রাব্বানীও সীমার বন্ধন থেকে পবিত্র।

উদাহরণটির সারমর্ম

সারকথা এই যে, মুমিনের দিল যা কাঁচস্বরূপ, অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে থাকে এবং খোদার তাওফীকে তাতে সত্য গ্রহণের এমন শক্তিশালী যোগ্যতা-আলো পাওয়া যায় যে, দিয়াশলাই ছাড়াই তা জ্বলে উঠতে প্রস্তুত থাকে। এখন যেই না একটুখানি আগুন ছোঁয়ানো হল, অর্থাৎ ওহী ও কুরআনের তেজোদীপ্ত আলো তাকে স্পর্শ করল, অমনি তার জন্মগত আলো জ্বলে উঠল– একেই نور على نور বলা হয়েছে।

৩৬. যেসব ঘরকে সমুন্নত করতে[১] এবং যেগুলিতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে[২] আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا

يهدي الله لنوره... والله.. عليم

তবে সব কিছুই আল্লাহ তাআলার হাতে– তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ আলো দান করেন। (যাকে ইচ্ছা দান করেন না)। আর তিনিই জানেন, কাকে এই আলো দেওয়া সমীচীন এবং কাকে নয়। এসব বিরল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার উদ্দেশ্যও এই যে, যারা যোগ্যতাসম্পন্ন তারা যেন অন্তর্দৃষ্টির কিছু আলো পেতে পারে। আর কখন কীরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করা সংগত, তাও তিনিই জানেন। তিনি ছাড়া আর কে এমন জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ উপমা-উদাহরণ পেশ করতে পারে?

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সামনে বলা হয়েছে, আল্লাহর উক্ত আলো লাভ করার (উৎকৃষ্ট) উপায় হলো- আল্লাহর ঘর মসজিদের সাথে অন্তরকে জুড়ে দেওয়া এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা, যে মসজিদসমূহে কামেল ব্যক্তিরা সকাল ও সন্ধ্যায় ইবাদত-বন্দেগী করে।

বি. দ্র. মুফাসসিরগণ বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন বহু রূপে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র)ও 'মুযেহুল কুরআনে' অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমার কাছে যে ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, তা আমি পেশ করেছি- وللناس فيما يعشقون مذاهب

প্রকাশ থাকে যে, ولو لم تمسسه نار ও يوقد এর মধ্যে যে আগুনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, আমি তার দ্বারা ওহী ও কুরআন উদ্দেশ্য করেছি। এর সূত্র হযরত শাহ সাহেব (র) এর সেই ব্যাখ্যা, যা তিনি (সূরা বাকারার আয়াত) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا সম্বন্ধে লিখেছেন এবং যার সমর্থন বুখারী ও মুসলিম শরীফের একখানি হাদীসে পাওয়া যায়, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إنما مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن فيها الخ (বুখারী, হাদীস : ৬৪৮৩; মুসলিম, হাদীস : ২২৮৪)

১. অর্থাৎ সম্মান করা ও পবিত্র রাখা। উদ্দেশ্য এই যে, সেগুলির যত্ন নিতে হবে এবং সব রকমের অপবিত্রতা এবং অনর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে তাকে পাক রাখতে হবে। উল্লেখ্য, মসজিদে যাওয়ার পর দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামায পড়াও মসজিদের তাজীমের অন্তর্ভুক্ত।

২. তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি সকল যিকিরই এর অন্তর্ভুক্ত।

بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾

তাসবীহ পাঠ করে[১]–

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

৩৭. এমন লোকেরা, ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের গাফেল করে না[২]– আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা থেকে। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন (মানুষের) অন্তর ও চোখগুলি উলটে যাবে[৩]।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের উত্তম আ'মলগুলির প্রতিদান দান করবেন* এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো অধিক দেবেন[৪]। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব দান করেন[৫]।

---

১. অর্থাৎ সকল উপযুক্ত সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, غدو দ্বারা ফজরের নামায উদ্দেশ্য এবং آصال এর মধ্যে অবশিষ্ট চার নামায দাখিল রয়েছে। কেননা, এর প্রয়োগ হয় দুপুরের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য।

২. অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের নানা ধান্ধা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও খোদায়ী বিধান পালন থেকে গাফেল করতে পারে না। বড় থেকে বড় ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ছোট-খাট বেচাকেনা– কোন কিছুই আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত রাখতে পারে না। সাহাবীদের এ অবস্থাই ছিল।

৩. অর্থাৎ সেদিন অন্তরসমূহ সেসব বিষয় বুঝতে পারবে, যা ইতিপূর্বে বোঝেনি এবং চোখসমূহ সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাবলি দেখতে পাবে, যা কখনো দেখেনি। অন্তরে কখনো মুক্তির আশা জাগবে, কখনো ধ্বংসের ভয় দেখা দিবে। আর চোখ কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে তাকাবে, না জানি তারা কোন্ দিক থেকে ধৃত হয় অথবা কোন্ দিক থেকে আমলনামা হাতে দেওয়া হয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'ফলে আল্লাহ তাদের দান করবেন তাদের আমলের অতি উত্তম প্রতিদান।

৪. অর্থাৎ সৎকর্মের যে প্রতিদান নির্ধারিত, তা তো পাওয়া যাবেই, আল্লাহ তাআলার রহমতে আরো বেশি দেওয়া হবে, যার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে এখনই বলা সম্ভব না।

৫. অর্থাৎ তাঁর নিকট কোন কিছুর কমতি নেই– জান্নাতীদের যদি বে-হেসাব দান করা হয়, তবে কোনই অসুবিধা নেই।

৩৯. আর যারা কাফের তাদের কর্মগুলি মরুভূমির মরীচিকার মত, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে সে যখন তার নিকট এল তখন দেখল, তা কিছুই নয়। এবং নিজের কাছে পেল আল্লাহকে, আর তিনি ওকে ওর হিসাব পরিপূর্ণভাবে চুকিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব-গ্রহণকারী[১]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءًۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِۙ

৪০. অথবা (ওদের কর্মগুলি) গভীর সমুদ্রের অন্ধকারপুঞ্জের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার উপর আরেক তরঙ্গ, (আর) তার উপর আছে মেঘমালা। (শুধু) অন্ধকার আর অন্ধকার, এক স্তরের উপর তার আরেক স্তর[২]। সে যখন নিজের হাত বের করে, তা আদৌ

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَاۗ

১. **দুই শ্রেণির কাফেরদের দুই উদাহরণ**

কাফেরদের দুই শ্রেণী। এক, যারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী কিছু ভাল কাজ করে এবং মনে করে, মৃত্যুর পর তা কাজে আসবে। অথচ কোন কাজ বাহ্যত ভাল হলেও কুফরের কারণে তা আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যহীন।

এই প্রতারিত কাফেরদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন: মরুভূমির বুকে এক পিপাসিত পথিক দূর থেকে মরীচিকা দেখে পানি মনে করল এবং পিপাসায় অস্থির হয়ে সেখানে পৌঁছল। গিয়ে দেখে, পানি বলতে কিছু নেই, তবে তার সামনে ধ্বংসমুহূর্ত দাঁড়িয়ে এবং সারা জীবনের হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা উপস্থিত। অতএব এই অস্থিরতা ও হতাশার সময় আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত হিসাব-কিতাব মুহূর্তের মধ্যে সেরে দিলেন। কারণ, তাঁর দরবারে হিসাব নিতে দেরি হয় না। মুহুর্তেই সারা জীবনের গাফলত ও দুষ্কৃতির পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া হয়!

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাফের তারা, যারা আপদমস্তক দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত এবং কুফর ও অজ্ঞতা, অনাচার ও পাপাচারের অন্ধকারে পতিত। এদের দৃষ্টান্ত সামনে বর্ণিত হবে। এদের নিকট ততটুকু আলোও নেই, যতটুকু মরীচিকায় প্রতারিত মরুচারীর দৃষ্টিতে পড়ছিল। এ লোকগুলো নির্ভেজাল অন্ধকারে, ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন– কোন দিক থেকেই আলোর লেশমাত্র তারা গ্রহণ করে না।

২. অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরে একে তো খোদ সমুদ্রের অন্ধকার, তার উপর আছে উত্তাল তরঙ্গমালা, যেগুলো একের উপর এক আছড়ে পড়ে। আবার উপরে আছে ঘন মেঘের অন্ধকার; সেই সাথে সময়টি রাত হলে পুঞ্জীভূত অন্ধকার অধিকতর নিবিড় ও গহীন হয়ে উঠবে।

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

দেখতে পায় না[১]। আর আল্লাহ যাকে 'নূর' দেননি, তার ভাগ্যে কোনো 'নূর' নেই[২]।

[রুকূ - ৬]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪১. তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে; এবং পাখিরাও, যারা পাখা বিস্তার করে রাখে[৩]? প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইবাদত ও তাসবীহ (এর পদ্ধতি) জেনে রেখেছে[৪]। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত[৫]।

---

১. অর্থাৎ নিজের হাত তুলে চোখের কাছে নিলেও অন্ধকারের কারণে তা দেখা যায় না, যাকে বলে, 'হাতকে হাত চেনে না' সেই অবস্থা।

২. পূর্বে (আয়াত ৩৫) মুমিনদের আলোচনায় বলা হয়েছিল- يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ এখানে তার বিপরীতে এ কথা বলা হল- অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাআলা আলো দেবেন না, তাকে অন্য কেউ আলো পৌছাতে পারবে না। আর এই কাফেররা অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশে পতিত হয়ে নিজেদের উপর আলোর সকল দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং আলো কোথা থেকে পাবে?

৩. পাখিদের কথা পৃথকভাবে সম্ভবত এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তখন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে শূন্যে ঝুলন্ত থাকে। আর এভাবে বাতাসে তাদের উড়তে থাকাটা আল্লাহর কুদরতের বিরাট নিদর্শন।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে তার অবস্থা অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী ও তাসবীহ পড়ার যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা অনুযায়ী তারা নিজেদের ওজীফা আদায় করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানুষরূপী বহু লোক অহংকার ও উদাসীনতা, মূর্খতা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আপন মালিকের স্মরণ ও দাসত্ব থেকে বিরত রয়েছে।

বি. দ্র. সৃষ্টিকুলের তাসবীহ সংক্রান্ত কিছু বিষয় বনী ইসরাঈলে ৪৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য। এক হাদীসে আছে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পুত্রদের তাসবীহ পাঠের ওসিয়ত করে বললেন- وانها لصلوة الخلق (এটাই অন্যান্য সৃষ্টির নামায।) [সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ১০৬০০]

৫. অর্থাৎ তাদের বন্দেগী ও তাসবীহ তোমরা না বুঝলেও আল্লাহ তাআলা সবই জানেন যে, কে কী করে।

৪২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে[১]।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪৩. তুমি কি দেখনি, আল্লাহ মেঘমালা হাঁকিয়ে নিয়ে যান, অতঃপর ওদের একত্র করেন, তারপর সেগুলি স্তরে স্তরে রাখেন[২]– অতঃপর তুমি তার মধ্য থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ। আর তিনি আকাশ থেকে অর্থাৎ তাতে যে পাহাড় আছে তা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর যার উপরে ইচ্ছা তা পতিত করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা তা হটিয়ে দেন[৩]। মনে হয় যেন তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে[৪]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান[৫]।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান যেরূপ সর্বব্যাপী, তদ্রূপ তাঁর সাম্রাজ্যও সমগ্র বিশ্বব্যাপী এবং সকলকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

সামনের আয়াতে তাঁর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব, মহা শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার বর্ণনা আসছে।

২. অর্থাৎ প্রথমে মেঘের ছোট ছোট খণ্ড আকাশে দেখা যায়, অতঃপর সেগুলি একত্র হয়ে বিরাট মেঘে পরিণত হয়, তারপর মেঘমালাকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করে দেওয়া হয়।

৩. পৃথিবীর বুকে যেমন পাহাড়-পর্বত রয়েছে, কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষীর মতে আকাশেও শিলা-পর্বতমালা রয়েছে। মুতারজিম (র) এ অনুযায়ী তরজমা করেছেন।

কিন্তু অধিকতর অগ্রগণ্য মত এই যে, سماء দ্বারা মেঘ উদ্দেশ্য। সুতরাং অর্থ এই যে, পর্বতসম পুরু ও ভারী মেঘমালা থেকে তিনি শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে অনেকের জান-মালের ক্ষতি হয় এবং অনেককে তা থেকে নিরাপদ রাখা হয়।

৪. অর্থাৎ বিদ্যুতের চমক এতই প্রখর যে, চোখ ঝলসে যায়। আশঙ্কা হয় যে, দৃষ্টি কেড়ে নেবে।

৫. অর্থাৎ দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন তাঁরই কুদরতে আসে। তিনিই কখনো রাতকে, কখনো দিনকে ছোট-বড় করতে থাকেন এবং তাদের উষ্ণতাকে শীতের দ্বারা ও শীতকে উষ্ণতার দ্বারা পরিবর্তন করেন।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَعِبۡرَۃً لِّاُولِی الۡاَبۡصَارِ ﴿۴۴﴾

নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য[১]।

وَاللّٰہُ خَلَقَ کُلَّ دَآبَّۃٍ مِّنۡ مَّآءٍ ۚ فَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰی بَطۡنِہٖ ۚ وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰی رِجۡلَیۡنِ ۚ وَمِنۡہُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰۤی اَرۡبَعٍ ؕ یَخۡلُقُ اللّٰہُ مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۴۵﴾

৪৫. আর আল্লাহ এক পানি থেকেই সকল বিচরণকারী জীব সৃষ্টি করেছেন[২]। অতঃপর ওদের মধ্যে কতক এমন, যা নিজের পেটের উপর ভর দিয়ে চলে[৩], কতক এমন, যা দু'পায়ের উপর চলে[৪]; আর কতক এমন, যা চলে চার পায়ের উপর[৫]। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[৬]।

لَقَدۡ اَنۡزَلۡنَاۤ اٰیٰتٍ مُّبَیِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰہُ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۴۶﴾

৪৬. নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্টকারী আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন[৭]।

وَیَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَبِالرَّسُوۡلِ وَاَطَعۡنَا ثُمَّ یَتَوَلّٰی فَرِیۡقٌ مِّنۡہُمۡ مِّنۡۢ

৪৭. ওরা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং অনুগত হয়েছি'। এর পরও ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুত

---

১. আল্লাহ তাআলার কুদরতের এরূপ মহানিদর্শন দেখে মানুষের উপদেশ ও শিক্ষা হাসিল করা উচিত এবং যাঁর হাতে এ সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরিবর্তনের চাবিকাঠি, সেই প্রকৃত মহাপ্রভুর দিকে খাঁটি অন্তরে রুজু হওয়া উচিত।

২. এর জন্য সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩০ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. যেমন: সাপ ও মাছ।

৪. যেমন: মানুষ ও পাখী।

৫. যথা, গরু, মহিষ প্রভৃতি।

৬. অতএব কোন জীবকে চার পায়ের বেশি দেওয়া হয়ে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই, তাঁর অসীম কুদরত ও ইচ্ছাকে কেউ সীমিত করতে পারে না।

৭. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত নিদর্শনগুলি ও নাযিলকৃত আয়াতসমূহ এতই স্পষ্ট যে, সেসব দেখে ও শুনে কোন মানুষেরই বিপথে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সরল পথে চলে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেছেন। লাখো মানুষ এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে, কিন্তু ফলাফলের বিবেচনায় তাদের দেখা না দেখা সমান।

بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ওরা আদৌ মুমিন নয়[১]।

وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪৮. আর যখন ওদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখনই ওদের একটা দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝

৪৯. আর যদি 'হক' ওদের পক্ষে হয়, তবে তাঁর নিকট চলে আসে অনুগত হয়ে[২]।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৫০. ওদের অন্তর কি ব্যাধিগ্রস্ত[৩], না ওরা সন্দেহে পতিত, নাকি ওরা এ ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ওদের প্রতি অবিচার করবেন? না, বরং ওরাই জালেম[৪]।

---

১. এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে– ওরা মুখে ঈমান ও আনুগত্যের দাবি করত, কিন্তু আমলের সময় এলে বিপরীত কাজ করত। বস্তুত ওদের অন্তরে শুরু থেকেই ঈমান ও আনুগত্যের কিছুই ছিল না, শুধু মৌখিক দাবি-দাওয়া ছিল। যার বাস্তবতা পরীক্ষা ও বিপদের পালা এলে ফাঁস হয়ে যেত।

২. অর্থাৎ কারো সঙ্গে যদি ওদের বিবাদ হয় এবং বুঝে যে, ওরাই অন্যায়ের উপর আছে– তাহলে বিরোধী পক্ষ বললেও ওরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মীমাংসার জন্য যেতে রাযী হয় না। কারণ, ওরা জানে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করবেন, যা ওদের বিপক্ষে যাবে। অথচ ওরা দাবি করত, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁদের হুকুম মানতে প্রস্তুত। এখন সে দাবি কোথায় গেল? —হাঁ, ঘটনাক্রমে কোন ব্যাপারে হক যদি নিজেদের দিকে হয়, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হুযূরের দরবারে গিয়ে হাযির হয় এবং মীমাংসার ভার একমাত্র তাঁরই হাতে ন্যস্ত করে। কারণ জানে, এ আদালতের ফয়সালা এবার ওদেরই পক্ষে হবে।

বলা বাহুল্য, এটা ঈমান ও ইসলামের তাবেদারী হল কোথায়? এ তো বরং কামনা-বাসনা ও স্বার্থের পূজামাত্র।

৩. ব্যাধি এই যে, আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জেনেও স্বার্থের কারণে তাঁদের পথে চলতে পারে না, যেমন রোগী চলতে চায়, কিন্তু তার পা চলে না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল সম্বন্ধে কি কোন বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা বা আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকারের ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে? অথবা

[রুকূ - ৭]

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥١

৫১. ঈমানদারদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের কথা এ-ই হয় যে তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম[১]।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝٥٢

৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর (অবাধ্যতা) পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য[২]।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل

৫৩. আর মুনাফেকেরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম করে বলে, আপনি ওদের আদেশ করলে ওরা অবশ্যই (যুদ্ধে) বের হবে। আপনি বলুন,

---

ওদের কি এ ধারণা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ওদের ব্যাপারে অন্যায় ফয়সালা করবেন? এ জন্য তাঁর দরবারে মোকদ্দামা নিয়ে যেতে চায় না?

তো মনে রোখা, সেখানে জুলুম ও অবিচারের কোন সম্ভাবনা নেই। আসল কথা হল, ওরাই অন্যায় করতে গোঁ ধরে আছে। ওরা নিজেদের হক পূর্ণরূপে আদায় করতে চায়, কিন্তু অন্যদের হক কিছুই দিতে চায় না। এ জন্যই সেই বিষয়গুলো খোদায়ী আদালতে নিয়ে যেতে ভয় করে, যেগুলোর ব্যাপারে বোঝে যে, রাসূলের বিচার আমাদের বিপক্ষে হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এ তো হল মুনাফিকদের অবস্থা। সামনে এদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর কথা আলোচিত হবে।

১. অর্থাৎ খাঁটি মুমিনরা এটাই করে এবং এ-ই করা উচিত যে, যখন তাদেরকে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ডাকা হবে, চাই তাতে তাদের লাভ থাক বা ক্ষতি, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করবে না, তৎক্ষণাৎ "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম" বলে হুকুম মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর মধ্যেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ ও আসল সফলতা নিহিত।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বর্তমানে ফরমাবরদারি করে যাচ্ছে, আর অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য লজ্জিত হয়ে ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তওবাও করে এবং ভবিষ্যতে সে সর্বদা অসৎ পথ থেকে বেঁচে থাকবে, তারই জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী রয়েছে।

কসম করো না, যথার্থ আনুগত্যই (কাম্য)* । তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত[১] ।'

لَا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৫৪. আপনি বলুন, 'তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং মান্য কর রাসূলের আদেশ। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখো), রাসূলের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তিনি তার যিম্মাদার। আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তোমরা তারই যিম্মাদার। আর তোমরা তাঁর আদেশ মান্য করলে সৎপথ পেয়ে যাবে। বস্তুত রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেওয়া[২] ।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

☆ দ্বিতীয় তরজমা- '(তোমাদের) আনুগত্যের (স্বরূপ) জানা আছে'!

১. অর্থাৎ মুনাফিকরা আপনাকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য অত্যন্ত জোরদার কসম খেয়ে বলে, আপনি আমাদের আদেশ করলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল নিয়ে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনি একটু ইঙ্গিত করলেই আমরা সব ধনসম্পদ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কুরবান করে দেব।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে, এত লম্বা-চওড়া কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানা হয়ে গেছে। মুখে বড় বড় দাবি, আর কাজের সময় চুপটি করে সরে পড়। খাঁটি মুসলমানদের মত হুকুম পালন করে দেখাও, মৌখিক শপথ দিয়ে কোন লাভ নেই। আর মনে রেখো, কসম করে করে মানুষকে নিজেদের কথা বিশ্বাস করাতে পারলেও আল্লাহ তাআলার সামনে কোন চালাকি ও ধোঁকা চলতে পারে না, তিনি তো সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের খবর রাখেন, ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতারণা ও মুনাফিকীর কথা ফাঁস করে দেবেন।

২. অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দীন প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তিনি তা পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, সত্যকে স্বীকার করা ও গ্রহণ করা এবং রাসূলের নির্দেশ অনুসারে চলা। তোমরা যদি নিজেদের এ দায়িত্ব উপলব্ধি করে তাঁর আদেশ মেনে চল, তবে উভয় জাহানের সফলতা লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তিতে থাকবে। তা না হলে নবী আলাইহিস সালাম-এর কোনো ক্ষতি নেই। তোমাদের অবাধ্যতার শাস্তি তোমাদেরই ভোগ করতে হবে। নবী তো নিজ কর্তব্য পালন করত আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত হয়ে গেছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন এবং তাদের জন্য তাদের সেই দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের দান করবেন নিরাপত্তা। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না[১]।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সম্মুখে রাসূলের আনুগত্যের ফল বর্ণিত হচ্ছে, যার ধারা দুনিয়াতেই আরম্ভ হয়ে যাবে।

১. আয়াতটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের লোকদের সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের মর্ম এই যে, তাদের মধ্যে যারা উচ্চস্তরের নেককার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী– রাসূলের পর আল্লাহ তাআলা তাঁদের পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা দান করবেন এবং তাঁদের মাধ্যমে দীন-ইসলামকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

استخلاف শব্দের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা নিছক দুনিয়াদার রাজা-বাদশাহদের মত হবেন না, বরং নবীজীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সত্য দীনের বুনিয়াদ মজবুত করবেন এবং জলে-স্থলে এ দীনের প্রভাব বিস্তার করবেন। তখন মুসলিমগণ কাফেরদের ভয়ে ভীত হবে না। বরং তারা নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে আপন পালনকর্তার ইবাদতে রত থাকবে এবং দুনিয়ার বুকে সুখ-শান্তির শাসনব্যবস্থা কায়েম থাকবে।

উক্ত মকবূল ও সম্মানিত লোকদের বৈশিষ্ট্য হবে, তারা একক আল্লাহর বন্দেগী করবে, যার মধ্যে শিরকের বিন্দুমাত্র মিশ্রন থাকবে না। শিরকে-জলীর তো কথাই নেই, শিরকে-খফীর বাতাসও তাঁদের কাছে পৌছবে না। তারা একমাত্র আল্লাহর গোলাম হবে– তাঁকেই ভয় করবে, তাঁরই কাছে আশা, তাঁরই উপর নির্ভর করবে, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হবে তাদের জীবন ও মরণ। অন্য কোনো সত্তার ভয়-ভীতি তাদের কাছেও ভিড়তে পারবে না। এমনকি, অন্য কারো সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরোয়াও তারা করবে না।

উক্ত খোদায়ী ওয়াদার বাস্তবায়ন

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা চতুষ্টয় (রা) এর হাতে পূর্ণ হয়েছে এবং বিশ্ববাসী এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখেছে। চার খলীফার পরও তাঁদের আদর্শে আদর্শবান কিছু কিছু মুসলিম রাজা-বাদশাহর আগমন হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা চাইলে ভবিষ্যতেও আসবে।

হাদীস থেকে জানা যায়, সর্বশেষ খলীফা হবেন ইমাম মাহ্দী রাযিয়াল্লাহু আনহু, যাঁর সম্বন্ধে বিরল সুসংবাদসমূহ শোনানো হয়েছে। তিনি আল্লাহর যমীনে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করবেন এবং আল্লাহর পথে বিস্ময়কর জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের কলেমা বুলন্দ করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ৩৮৭৯৩) اللهم احشرنا في زمرته وارزقنا شهادة في سبيلك إنك واسع المغفرة وذو الفضل العظيم

বি. দ্র.

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা খুলাফায়ে রাশেদীনের বিরাট ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ইবনে কাছীর (র) এ আয়াতের তাফছীর করতে গিয়ে নবুওয়াত-কাল থেকে শুরু করে হযরত উছমানের খেলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের বিজয়সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন এবং সর্বশেষে লিখেছেন-

وجُبِيَ الخراجُ من المُشارق والمُغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ولهذا ثبت في الصحيح أنّ رسول الله ﷺ قال: ان الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمّتي ما زُوِيَ لي منها فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فنسئل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا.

(পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন উছমান ইবনে আফফান রা.-এর নিকট কর ও খাজনা পাঠানো হত। এ ছিল তাঁর কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন পাঠ এবং উম্মতকে কুরআন সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ করার বরকতস্বরূপ। আর এজন্যই সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে গুটিয়ে আমার সামনে পেশ করেছিলেন। তখন আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তগুলি দেখেছি। পৃথিবীর যতটুকু গুটিয়ে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল, আমার উম্মতের রাজত্ব অতি সত্বর ততটুকু বিস্তৃত হবে।

ইবনে কাছীর বলেন : বর্তমানে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুত ভূ-ভণ্ডে বিজয়বেশে চলাফেরা করছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব

তার পরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই নাফরমান[১]।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আদেশ মান্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়[২]।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তুমি কক্ষনো মনে করো না যে, যারা কাফের তারা পৃথিবীতে (পালিয়ে আল্লাহকে) অক্ষম করে দেবে। ওদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, আর নিশ্চয় (তা) অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা[৩]।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

আল্লাহর নিকট আমরা ঈমান অটুট রাখার তাওফীক চাই এবং তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক এর শুকরিয়া আদায়ের সামর্থ্য চাই।)

১. অর্থাৎ, এমন মহা নে'য়ামতসমূহের পরও নাশোকরী করা মস্ত বড় নাফরমান ও চরম অপরাধীর কাজ।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) বলেন, যে কেউ খলীফা চতুষ্টয়ের খেলাফত এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব অস্বীকার করে, এ আয়াতাংশ (ومن كفر بعد ذلك..) দ্বারা তার অবস্থা বোঝা যায়।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

২. অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের অংশ পেতে চাইলে তোমরাও উল্লিখিত মকবূল বান্দাদেরই আদর্শ অনুসরণ কর। নামায কায়েম করা, যাকাত দিতে থাকা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের পথের উপর চলাই তাঁদের আদর্শ।

اللّٰهُمَّ ارزقنا متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم وتوفنا عليها وألحقنا بالصالحين ، آمين

৩. নেক বান্দাদের বিপরীতে এস্থলে দুর্ভাগা অভিশপ্ত লোকদের পরিণামের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ– যখন নেক বান্দাদের রাজত্ব ও পৃথিবীর খেলাফত দান করা হয়, তখন কাফের ও পাপাচারীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশল বিফল হয়ে যায়। আল্লাহর অভিপ্রায়কে কেউ রোধ করতে পারে না। যদি ওদের দল সারা দুনিয়ায় এদিক-সেদিক পালিয়েও বেড়ায়, তবুও আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না– নিশ্চিত ওদের জাহান্নামে যেতে হবে।

[রুকূ - ৮]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٨

৫৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা[১] এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা তিনটি সময়ে (ঘরে প্রবেশের জন্য) তোমাদের থেকে অনুমতি নেবে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা নিজেদের পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। তোমাদের জন্য এ তিন সময় শরীর খোলা থাকার সময়[২]। এই সময়গুলি ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা নেই। তোমাদের একের অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়[৩]। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

---

১. الذين ملكت...– দ্বারা দাসদাসী উদ্দেশ্য। পূর্বে ২৭-২৯ আয়াতে ঘরে ঢোকার সময় অনুমতি গ্রহণের মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ তারই পরিশিষ্ট। মাঝে বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গহেতু অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২. এ তিন সময়ে সাধারণত অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখা হয়, অথবা পোশাক বদলানো হয়। তাছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা সাধারণত এসব সময়েই হয়ে থাকে। মানুষ কখনো ফজরের পূর্বে অথবা দুপুরের সময় গোসল করার ইচ্ছা করে এবং চায় যে, কেউ না জানুক। এ জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই তিন সময়ে নাবালেগ ছেলেদের ও দাসদাসীদেরও অনুমতি নিয়ে আসা উচিত। অন্যান্য সময়ে আজনবী (বাইরের) লোকদের ন্যায় অনুমতি চাওয়ার দরকার নেই। তবে কেউ নিজ সুবিধার্থে অন্যান্য সময়েও অনুমতি গ্রহণের নিয়ম করে দিতে চাইলে, সে তা পারে।

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত সময়গুলি বাদে অন্য যেসব সময়ে সাধারণত একে অপরের নিকট অবাধে আসা-যাওয়া করে, তখন নাবালেগ ছেলেপেলে বা দাসদাসীকে প্রতিবারে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, এতটা বিধি-নিষেধ আরোপ করলে অনেক অসুবিধা এবং কাজকাম বিঘ্নিত হবে, যা আল্লাহ তাআলার হেকমতের খেলাফ।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾

৫৯. তোমাদের মধ্যকার নাবালকরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন তারাও যেন অনুমতি নেয় যেমন অনুমতি নিয়ে থাকে তাদের পূর্ববর্তীরা[১]। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِیْ لَا یَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِیْنَةٍ ؕ وَاَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۶۰﴾

৬০. বৃদ্ধা নারীগণ, যারা বিয়ের আশা রাখে না– তাদের জন্য এতে কোন গোনাহ নেই যে, তারা তাদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো ছাড়া। আর (এ থেকেও) বিরত থাকা তাদের জন্য উত্তম[২]। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৩]।

لَیْسَ عَلَی الْاَعْمٰی حَرَجٌ وَّلَا عَلَی الْاَعْرَجِ

৬১. অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, খঞ্জের জন্যও দোষ নেই, রোগীর জন্যও দোষ নেই[৪] এবং

---

১. অর্থাৎ ছেলে নাবালক থাকাকালে উল্লিখিত তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে অনুমতি ছাড়া আসা-যাওয়া করতে পারে। সাবালক হয়ে গেলে তাকেও সেই পুরুষদের ন্যায় অনুমতি নিতে হবে, যারা পূর্বে সাবালক হয়েছে এবং যাদের হুকুম পূর্ববর্তী– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বৃদ্ধা মহিলাগণ যদি বাড়িতে স্বল্প পোশাকে থাকে, তবে অসুবিধা নেই। আর পূর্ণ পর্দায় থাকলে আরো ভাল।'— বাড়ি থেকে বাইরে যেতেও তারা বোরকা প্রভৃতি অতিরিক্ত কাপড় না পরলে দোষ নেই, তবে শর্ত এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে (৩১) যে সৌন্দর্য গোপন রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ করা যাবে না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, যুবতী মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে কুরআন কারীমের অভিপ্রায় কী।

৩. অর্থাৎ এসব তো হল ফেতনা প্রতিরোধের বাহ্যিক ব্যবস্থা। তবে পর্দার ভিতরে থেকে যে সকল কথা বলা হয় ও ফেতনা করা হয়, স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাও শোনেন ও জানেন। সে হিসাবেই তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে আচরণ করবেন।

৪. এর এক অর্থ হল, যেসব কাজকর্ম কষ্টসাপেক্ষ, তা তাদের জন্য ক্ষমাযোগ্য– যথা: জেহাদ, হজ, জুমা ও জামাত এবং অনুরূপ কাজকর্ম (মূযেহুল কুরআন)।

অথবা অর্থ এই যে, এই অক্ষম ও দরিদ্র লোকদের জন্য সুস্থ-সবল লোকদের সঙ্গে একত্রে পানাহার করতে কোনো দোষ নেই।

حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

তোমাদের নিজেদের জন্যও (এতে) দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে নিজেদের ঘরে, অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মাতাদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে, অথবা সেসব ঘরে যেগুলির চাবির মালিক তোমরা[১], অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমাদের এতে কোন গোনাহ নেই যে, তোমরা আহার করবে একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে। আর যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আপন লোকদের প্রতি সালাম করবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত (এবং যা) বরকতময়,

---

ইসলামপূর্ব যুগে এ ধরনের দরিদ্র ও অক্ষম লোকেরা ধনী ও সুস্থ লোকদের সঙ্গে একত্রে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করত। তাদের ধারণা হত, সম্ভবত আমাদের সাথে খেতে লোকদের ঘৃণা লাগে এবং আমাদের কোন কোন আচার-ব্যবহারে তাদের কষ্ট হয়। আর বাস্তবেও এদের সাথে খেতে কতকের অস্বস্তি হত। তা ছাড়া, অতিরিক্ত সতর্কতা ও পরহেযগারির কারণে কতক মুমিন ভাবত যে, এ রকম অক্ষম ও রুগ্ন লোকদের সাথে খেতে গিয়ে হয়ত সমতা ও ন্যায়নীতি ঠিক থাকবে না, কারণ, অন্ধ সব খাদ্য দেখতে পায় না, খোঁড়া হতে পারে দেরিতে পৌছবে এবং যথাস্থানে বসতে পারবে না, রুগ্ন ব্যক্তির তো কথাই নেই। তাই ধনী ও সুস্থদের সঙ্গে তাদের খাওয়াতে দ্বিধাবোধ করত।

দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার এই হত যে, অক্ষম ও দরিদ্র লোকেরা হয়ত কারো নিকট গেল। সে ব্যক্তি স্বচ্ছল না হওয়ায় তাদেরকে নিজ বাপ, ভাই, চাচা, মামা প্রমুখ কোনো নিকট আত্মীয়ের ঘরে নিয়ে গেল। এতে অভাবী লোকদের ধারণা হত , আমরা তো এসেছিলাম এ ব্যক্তির নিকট, ইনি আমাদের অন্যের নিকট নিয়ে এলেন। কী জানি, সে আমাদের খাওয়াতে বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হয় কিনা।

আলোচ্য আয়াতে এ সমস্ত ধারণা-চিন্তার সংশোধন করত বলা হচ্ছে যে, অযথা এ ধরনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসায় পড়তে নেই। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের সংকীর্ণতায় ফেল কেন?

১. অর্থাৎ যে ঘর তোমাদের ব্যবহারে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন: কেউ তার ঘর ও জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধায়ক বা সংরক্ষক তোমাদের বানিয়ে দিয়েছে এবং ন্যায়সংগত পরিমাণে সেখান থেকে পানাহারের অনুমতি দিয়েছে।

مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

উৎকৃষ্ট। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও[১]।

[রুকূ - ৯]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا

৬২. মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। আর তারা যখন রাসূলের সঙ্গে কোন সম্মিলিত কাজে একত্র হয়, তখন তারা তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রস্থান করে না। যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেয়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে[২]। অতএব তারা যখন

---

১. মোটকথা, আপনদের ঘরবাড়িতে খাওয়ার জিনিসের ব্যাপারে সর্বদা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। এস্থলে আহারকারী সংকোচ করবে না, বাড়িওয়ালাও অনিচ্ছা দেখাবে না। তবে ঘর যদি স্বামীর হয়ে থাকে, তবে তার অনুমতি নিতে হবে।

আর 'এতে গোনাহ নেই যে, সকলে একসঙ্গে খাবে বা আলাদা খাবে'– অর্থাৎ এই চিন্তা করার দরকার নেই যে, কে কম খেল বা কে বেশি খেল। সকলে মিলে রান্না করেছ, সকলে মিলে খেয়েছ। তবে হ্যাঁ, সম্মতি ছাড়া কারো জিনিস খাওয়া অবশ্যই বৈধ নয়।

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا..

আর পরস্পর সাক্ষাতে সালামের আদেশ করা হয়েছে। কারণ, সালাম অপেক্ষা উত্তম দো'য়া আর নেই। যারা এটি ছেড়ে অভিবাদনের জন্য অন্য শব্দ রচনা করে, তাদের নির্বাচন আল্লাহর নির্বাচনের চেয়ে উত্তম হতে পারে না।

বি. দ্র. আয়াতের দ্বারা একা, আলাদাভাবে খাওয়ারও বৈধতা বোঝা যায়। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে যে, কোন মেহমান না আসা পর্যন্ত খেতেন না। এটা বাড়াবাড়ি। অবশ্য খাওয়ার সময় যদি কয়েকজন হয় এবং তারা একত্রে বসে খায়, তবে তা বরকতের কারণ। (হাদীস শরীফে এমনি এসেছে)। [সুনানে আবু দাউদ, ৩৭৬৪]

২. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনার আদেশ করা হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে বাইরে যাওয়ার সময় অনুমতি নেওয়ার আবশ্যকতার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, পূর্ণ ঈমানদার তারাই, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে হাযির হয় এবং যখন কোন সম্মিলিত কাজে শরীক হয়, যেমন জুমা, ঈদ, জেহাদ, পরামর্শসভা প্রভৃতি, তখন সেখান থেকে বিনা অনুমতিতে উঠে চলে যায় না। এরাই তারা, যারা সঠিক ও পরিপূর্ণ অর্থে আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করে।

اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

নিজেদের কোন কাজে আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

৬৩. তোমরা রাসূলের ডাককে নিজেদের মধ্যে এমন বানিয়ে ফেলো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডাক[২]। তোমাদের মধ্যে যারা (অন্যের) আড়াল নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জানেন[৩]; অতএব যারা তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন এ ভয় করে যে, না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা তাদের উপর

---

১. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার পর যাকে মুনাসিব মনে করেন, অনুমতি দিয়ে দিন। আর যেহেতু অনুমতি নিয়ে চলে যাওয়াটাও এক হিসেবে নবীজীর সাহচর্য থেকে বঞ্চিতি এবং বাহ্যত এতে দীনের উপর দুনিয়ার অগ্রগণ্যতার আভাস আছে, এ জন্য সেই মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, যাতে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনার বরকতে ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ নবীজি (স.) ডাকলে হাযির হওয়া ফরয হয়ে যায়, তাঁর ডাক অন্যদের মত নয় যে, ইচ্ছা হলে সাড়া দিলাম বা দিলাম না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে হাযির না হলে তাঁর বদ দো'য়া থেকে ভীত থাকা উচিত। কারণ, তাঁর দো'য়া সাধারণ মানুষের দো'য়ার মত নয়। তদ্রূপ, সম্বোধন করার ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও আজমতের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত, সাধারণ মানুষের ন্যায় 'হে মুহাম্মদ! প্রভৃতি বলে সম্বোধন করবে না, বরং 'ইয়া নবীআল্লাহ' ও 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে তাঁকে ডাকা উচিত।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হুজুর (স.) কোন কাজে ডাকলে তাতে সাড়া দেওয়া ফরয ছিল। সেই সাথে সেখান থেকে অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। এখনো মুসলমানদের জন্য নিজেদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করা কর্তব্য।

৩. এরা ছিল মুনাফিক, যাদের জন্য মজলিসে নববীতে বসা এবং ওয়াজ-নসীহত শোনা অসহনীয় হত। তারা প্রায়ই সুযোগ বুঝে অগোচরে মজলিস থেকে বিনা অনুমতিতে সরে পড়ত। যেমনঃ কোন মুসলমান অনুমতি নিয়ে উঠল, সেও তার আড়ালে থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। তাই বলা হয়েছে, তোমরা পয়গম্বর থেকে গোপন করলেও আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলের অবস্থা জানেন।

يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

এসে পড়ে কোন যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৬৪. জেনে রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই। তিনি অবশ্যই জানেন, তোমরা কী অবস্থায় আছ। এবং (জানেন) সেই দিনের কথা, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা-কিছু করত তা জানিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত[২]।

---

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অবাধ্যতা করে, তাদের ভয়ে থাকা উচিত যে, না জানি 'ফিতনা' তথা কুফর, নেফাক প্রভৃতি অন্তরে সর্বদার জন্য ঘর করে বসে কি না এবং এর কারণে দুনিয়ার কোন কঠিন বিপদ বা আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক আযাব পতিত হয়ে যায় কি না! (আল্লাহর পানাহ!)।

২. অর্থাৎ মানুষের চোখ এড়িয়ে কোন কাজ করে ফেলতে পার বটে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা থেকে তোমাদের কোন অবস্থা গোপন থাকতে পারে না। তাঁর পৃথিবী ও আকাশরাজ্য থেকে বের হয়ে কোথাও পালিয়েও যেতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ অবহিত, তদ্রূপ সেই দিনের অবস্থাদি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত, যেদিন সমস্ত মাখলুক হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং প্রত্যেকের সামনে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলও উপস্থিত করা হবে। সুতরাং এমন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমানের শাস্তি থেকে অপরাধী নিজেকে কী করে বাঁচাতে পারে?

সূরা ফুরকান

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২৫ । ৭৭ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

آيَاتها ٧٧، رکوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

১. বড় বরকতময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি[১] ফয়সালাকারী কিতাব[২] অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়[৩]।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

২. সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একমাত্র মালিক, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে যাঁর কোন অংশীদার নেই। আর তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য এক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন☆[৪]।

---

১. অর্থাৎ তাঁর কামেল-মুকাম্মাল ও পূর্ণতম বান্দা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। পূর্ণাঙ্গ 'আবদিয়াতের কারণে যাঁর বিশেষ উপাধিই হল 'আবদুল্লাহ' তথা আল্লাহর বান্দা।

২. فرقان (ফয়সালা বা মীমাংসার কিতাব) বলে কুরআন কারীমকে বোঝানো হয়েছে, যা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দিয়েছে এবং হালাল ও হারামের একটিকে অপরটি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দিয়েছে। এটিই সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলার মহামর্যাদা, অনন্য গুণরাজি এবং তাঁর হেকমত ও দয়ার পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছে, সমগ্র জগতের হেদায়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এবং তাদের কাছে অশেষ কল্যাণ ও অফুরন্ত বরকত নিয়ে এসেছে।

৩. অর্থাৎ কুরআন কারীম সমগ্র বিশ্বকে কুফর ও অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে। যেহেতু আলোচ্য সূরার মধ্যে অবিশ্বাসী ও নাফরমানদের আলোচনা বেশি হয়েছে, সম্ভবত সে কারণে এখানে نذير (সতর্ককারী) গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে, بشير (সুসংবাদদানকারী) গুণের উল্লেখ করা হয়নি।

আর للعالمين দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন কেবল আরবের নিরক্ষরদের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি, বরং সমগ্র জিন ও মানব জাতির হেদায়াত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সকলকে খুব মেপে-জোখে বানিয়েছেন'।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর জন্য এক বিশেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন, ফলে প্রত্যেক সৃষ্টি থেকে সেইসব বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, যেসবের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজের

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

৩. লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে এমনসব উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং খোদ তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা নিজেদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানেরও মালিক নয়[১]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ

৪. কাফেররা বলে, 'এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, যা সে রচনা করেছে এবং এতে তাকে অন্য লোকেরা সহায়তা করেছে[২]।'

নির্দিষ্ট সীমারেখা থেকে সে বাইরেও যেতে পারে না, আবার নিজ সীমার ভিতরে থেকে যথাকর্তব্য পালন করতেও অক্ষম হয় না।

মোটকথা, প্রত্যেক বস্তু এমনভাবে মেপেজোখে সৃষ্টি করেছেন যে, স্বীয় স্বাভাবিক পরিমাপের দিক থেকে তার মধ্যে কিছুমাত্র কমবেশি হতে পারে না। বড় বড় বিজ্ঞানী গবেষণার সমুদ্র মন্থর করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের এ কথাই বলতে হয়েছে- صنع الله الذي أتقن كل شيء {এসব আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন নিপুণভাবে।} এবং تبارك الله أحسن الخالقين (বরকতময় আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।)

১. অর্থাৎ বড় বেইনসাফি ও আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন সর্বশক্তিমান, সব কিছুর মালিক ও মহাপ্রজ্ঞাবান সত্তাকে যথেষ্ট মনে না করে অন্যান্য উপাস্য ও প্রভু সাব্যস্ত করে নেওয়া হয়েছে, যেন তারা খোদার রাজত্বে অংশীদার। অথচ এ বেচারাদের নিজ অস্তিত্বই স্বনির্ভর নয়। সামান্য অণুর সৃষ্টিও তাদের সামর্থ্যে নেই, জীবন ও মৃত্যু দানের ক্ষমতাও তাদের হাতে নেই। এমনকি, নিজ ক্ষমতাবলে তারা কারো কোন লাভ ও ক্ষতি করতে পারে না। বরং স্বয়ং নিজেদের জন্যও সামান্য ফায়দা হাসিল করার অথবা ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার ক্ষমতাও রাখে না। এরূপ অক্ষম-অসহায়দের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা কতটা বোকামী ও নির্লজ্জতা!

পূর্বা-পর সামঞ্জস্য

এ তো হল কুরআন অবতীর্ণকারীর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা এবং তাঁর সাথে মুশরিকরা যে অসংগত আচরণ করত তার খণ্ডন। সম্মুখে স্বয়ং কুরআন ও কুরআনের বাহক সম্বন্ধে ওদের মূর্খতাপূর্ণ ধারণা ও মন্তব্যের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ ওরা বলে, এটা মিথ্যা কথা যে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব। আসল কথা হল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতিপয় ইহুদীর সহযোগিতায় একটি কালাম রচনা করে নিয়েছেন এবং এই মিথ্যা কালামকে আল্লাহ তাআলার নামে চালিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তার অনুসারীরা এর প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ

বস্তুত ওরা অবিচার ও মিথ্যায় লিপ্ত হয়েছে[১]।

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৫. ওরা আরো বলে, 'এসব পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী, যা সে লিখে নিয়েছে। এখন তা-ই তার নিকট সকাল-সন্ধ্যায় পড়া হয়[২]।

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৬. আপনি বলুন, 'তা অবতীর্ণ করেছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয় জানেন[৩]। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৪]।'

---

১. অর্থাৎ এর চেয়ে বড় অন্যায় ও মিথ্যা অপবাদ আর কী হতে পারে যে, অলৌকিক কালাম ও জ্ঞানগর্ভ কিতাবকে, যার শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা দিবালোকের চেয়েও উজ্জ্বল– মিথ্যা ও মনগড়া রচনা বলা হচ্ছে! কতক ইহুদী ক্রীতদাসের সহযোগিতায় এমন কালাম কি রচনা করা যায়, যার মোকাবেলা করতে সমগ্র দুনিয়ার ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনেরা, বরং জিন ও মানবের সকলেই সর্বকালে ব্যর্থ হচ্ছে এবং যার উলূম ও জ্ঞানরাজির সামান্য ঝলক বড় বড় প্রতিভাবান জ্ঞানী-গুণী ও বৈজ্ঞানিকদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে?

২. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহলে কিতাবের নিকট থেকে কিছু কিচ্ছা-কাহিনী নোট করে নিয়েছেন, অর্থাৎ কারো দ্বারা নোট করিয়ে নিয়েছেন। তা-ই রাতদিন তাঁর সামনে পড়া হয়, নতুন নতুন ভঙ্গিতে সেগুলিই আওড়ানো হয়। এর বেশি কিছু নয়।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শুরুতে নামাযের শুধু দুই ওয়াক্ত ছিল– সকাল ও সন্ধ্যা। এ দুই সময়ে মুসলিমগণ নবীজির দরবারে সমবেত হতেন এবং সদ্য আগত কুরআনের আয়াতগুলি মুখস্ত করার জন্য লিখে নিতেন। তাই কাফেররা এ রকম বলতে শুরু করে।'

৩. অর্থাৎ স্বয়ং এ কিতাবই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ কোন একজন মানুষ বা কমিটির রচিত নয়, বরং ওই খোদার নাযিলকৃত কিতাব, আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই যার জ্ঞান-সীমার বাইরে নয়। এ কিতাবের অলৌকিক ভাষাশৈলী ও সাহিত্যসৌকর্য, জ্ঞান-গরিমা ও প্রজ্ঞামালা, অদৃশ্যের খবরাদি, বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি এবং তার গুপ্ত রহস্যাদি যার গভীরে খোদার সাহায্য ছাড়া মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়– এসব কিছু সুস্পষ্টভাবে এ সত্যই প্রকাশ করছে যে, এটি সীমিত জ্ঞানের অধিকারী একক মানুষ বা কোন কমিটি-রচিত কালাম নয়।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজ ক্ষমা ও দয়া গুণে এ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ('মূযেহুল কুরআন')। এর পরও যারা এরূপ সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করে, তিনি তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন না যদিও তিনি তাদের অপরাধের কথা জানেন। এও তাঁর ক্ষমা ও দয়ারই পরিচায়ক।

৭. ওরা আরো বলে, 'এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরাও করে[১]?! তার প্রতি কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন, তাহলে তিনি তার সঙ্গে সতর্ককারীরূপে থাকতেন?

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۙ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۟

৮. 'অথবা তাকে কোন ধনভাণ্ডার দেওয়া হত বা তার একটি বাগান থাকত, যা থেকে সে আহার করত[২]?' জালেমরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ[৩]।'

اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۟

৯. দেখুন, ওরা আপনার সম্বন্ধে কেমন সব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করছে। বস্তুত ওরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এখন আর পথে আসতে পারবে না[৪]।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۟

---

১. অর্থাৎ তিনি যখন আমাদের মতই আহার করেন এবং আমাদের মতই বেচাকেনার জন্য হাটবাজারে যান, তখন আমাদের ও তার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সত্যিই তিনি রাসূল হলে উচিত ছিল, ফেরেশতাদের ন্যায় পানাহার ও জীবিকা উপার্জনের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা।

২. অর্থাৎ পুরো ফেরেশতা-বাহিনী না হোক, কমপক্ষে এক-আধজন ফেরেশতা সত্যতা প্রমাণ ও প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ফলে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় লোকদের তাঁর কাছে মাথা নত করতে হত। আর যদি ফেরেশতা না-ই হলেন, তবে অন্তত আকাশ থেকে সোনা-রূপার কোন গায়বী খাজানা আসত! ফলে তিনি যথেচ্ছা অর্থ ব্যয়ে লোকদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতেন। আর এও না হলে, সাধারণ গোত্র-প্রধান ও জমিদারের ন্যায় আঙ্গুর, খেজুর প্রভৃতির একটি বাগান তাঁর মালিকানাধীন হত, যা থেকে অন্যদের না দিতে পারলেও অন্তত নিজের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যেত। এতটুকু যখন হয়নি, তখন কী করে আমরা বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের মহান মর্যাদা এমন মামুলি একজন মানুষকে দিয়েছেন?

৩. অর্থাৎ এই মিয়া সাবের এ অবস্থা, অথচ তার এত বড় দাবি! অতএব এ ছাড়া আর কী বলা যায় যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে; অথবা কেউ যাদু করে তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, ফলে এমন উলটাপালটা কথাবার্তা বলছে? نعوذ بالله

৪. অর্থাৎ ওরা কখনো বলে, তাঁর কথাবার্তা স্বরচিত ও মনগড়ামাত্র। কখনো বা দাবি করছে, অন্যদের নিকট থেকে শিখে নিজের ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন। কখনো বা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলছে। কখনো যাদুকর, কখনো গণক, কখনো কবি, কখনো পাগল বলছে। ওদের এ দ্বিধাগ্রস্ততা এবং একেক সময় একেক কথাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এসব উক্তি ও মন্তব্যের

[রুকূ - ২]

تَبٰرَكَ الَّذِیْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ یَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا۝

১০. বড় বরকতময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে সেসব থেকে উত্তম বস্তু দিতে পারেন অর্থাৎ এমনসব বাগান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। এবং আপনাকে দিতে পারেন বহু প্রাসাদ[১]।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا۝

১১. আসল কথা হল, ওরা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। আর যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য আগুন তৈরি করেছি[২]।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَیُّظًا وَّ زَفِیْرًا۝

১২. যখন আগুন দূর থেকে ওদের দেখবে, ওরা (দূর থেকেই) শুনতে পাবে তার ফোঁসফোঁসানি ও গর্জন[৩]।

কোনটাই তাঁর ব্যাপারে খাটে না। এ জন্যই কোন এক কথার উপর ওদের স্থিরতা নেই এবং তাঁকে অভিযুক্ত করার কোন যথাযথ পথ পাচ্ছে না। فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا–যারা নবীদের ব্যাপারে এহেন ধৃষ্টতা ও বেয়াদবী করে পথভ্রষ্ট হয়, তাদের সুপথে আসার কোনই আশা নেই।

১. অর্থাৎ আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি চাইলে এক বাগান কেন, ওদের ফরমায়েশী বাগান থেকে উত্তম অনেক বাগান আপনাকে দান করতে পারেন। বরং পরকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বাগান, ফোয়ারা, হূর ও অট্টালিকা লাভ করবেন, সেগুলি আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতেই দান করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেকমত উপস্থিত ক্ষেত্রে এমন করার পক্ষে নয়। আর বিরুদ্ধবাদীদের সকল চাহিদা ও ফরমায়েশ পূরণ করে দেওয়া হলেও ওরা সত্যকে স্বীকার করার নয়। অবশ্য পয়গম্বর আলাইহিস সালামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে সকল দলীল-প্রমাণ ও মুজেযা (অলৌকিক ঘটনাদি) পেশ করা দরকার ছিল, তা করা হয়েছে, সেগুলি যথেষ্টরও বেশি।

২. অর্থাৎ এরা যেসব দাবি করছে, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য সন্ধানের নিয়তে নয়, বরং শুধু দুর্বৃত্তি ও আপনাকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে। আর দুর্বৃত্তির কারণ এই যে, ওরা এখনো কিয়ামতে বিশ্বাসী নয়। তবে স্মরণ রাখা উচিত, ওদের অস্বীকার করায় কিছু আসে যায় না– কিয়ামত আসবেই আসবে এবং এ অস্বীকারকারীদের জন্য যে জাহান্নাম তৈরি রয়েছে, তাতে ওদের অবশ্যই যেতে হবে।

৩. অর্থাৎ হাশরের মাঠে দূর থেকে জাহান্নামীদের দেখেই দোযখের আগুন রাগে-গোসসায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে বড় বড় বাহাদুরের কলিজা শুকিয়ে যাবে।

وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑬

১৩. আর যখন দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে ওদের এভাবে নিক্ষেপ করা হবে যে, একই শিকলে ওদের কয়েকজন বাঁধা*–তখন সেখানে ওরা মৃত্যুকে ডাকবে[১]।

لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ⑭

১৪. (বলা হবে), আজ এক মৃত্যুকে ডেকো না, বহু মৃত্যুকে ডাক[২]।

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ⑮

১৫. আপনি বলুন, 'এটা শ্রেয়, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরহেযগারদের দেওয়া হয়েছে[৩]? তা হবে তাদের প্রতিদান ও শেষ ঠিকানা।

لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا ⑯

১৬. সেখানে তাদের জন্য তারা যা চাইবে তাই আছে[৪], তারা চিরজীবী হবে। এ আপনার রবের জিম্মায় এমন প্রতিশ্রুতি, যা অবশ্যই পূরণ করা হবে**[৫]।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'যখন বেড়ি পরিয়ে ওদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে'। অথবা– 'যখন (শিকল দিয়ে) ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় ওদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

১. অর্থাৎ দোযখে প্রত্যেক অপরাধীর জন্য বিশেষ স্থান থাকবে, যেখান থেকে সে নড়তে পারবে না। আর সমশ্রেণীর অপরাধীরা কয়েকজন করে একই শিকলে বাঁধা থাকবে। সে সময় কঠিন বিপদে পড়ে ওরা মৃত্যুকে ডাকবে যে, হায়! আমাদের মৃত্যু এসে যেত! তাহলে আমরা এই ভয়াবহ কষ্ট থেকে বেঁচে যেতাম!

২. অর্থাৎ একবার মৃত্যু হলে তো নিষ্কৃতিই পেয়ে যেত। কিন্তু দিনে হাজার বার মৃত্যু হলে দুর্গতির কোন সীমা থাকে না। (মুযেহুল কুরআন)

৩. অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের পরিণামের কথা তোমরা শুনলে। এখন নিজেরাই বল, কোন্‌টা পছন্দ– এটা, না মুমিন মুত্তাকীদের সঙ্গে যার ওয়াদা করা হয়েছে তা?

৪. আর তারা তা-ই চাইবে, যা তাদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'যা পূরণ করার আবেদন করা হবে'।

৫. وعدا مسئولا বলতে দৃঢ় ওয়াদা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় অবশ্য পালনীয় করে নিয়েছেন। অথবা অর্থ এই যে, মুত্তাকীগণ এই ওয়াদা পূরণের আবেদন করবে, যা অবশ্যই পূরণ করা হবে– যেমন দো'য়া রয়েছে- ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك

১৭. (স্মরণ কর), যেদিন তিনি ওদের এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করত তাদের একত্র করবেন। অতঃপর তিনি (উপাস্যদের) জিজ্ঞাসা করবেন, 'কী, তোমরা আমার এই বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে, না এরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল[১]?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

১৮. তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, আমাদের জন্য এ সম্ভবই ছিল না যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যান্য বন্ধু অবলম্বন করি[২]। কিন্তু আপনি ওদের ও ওদের পূর্বপুরুষদের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলেন, পরিণামে ওরা (আপনার) স্মরণ ভুলে গেল। আর ওরা ছিল ধ্বংসযোগ্য সম্প্রদায়[৩]।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৯. (আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন), 'অতএব তোমরা যা বলছ তাতে তো তারা তোমাদের

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا

১. অর্থাৎ পূজারীদের শুনিয়ে উপাস্যদের জিজ্ঞাসা করা হবে– তোমরা কি ওদের শিরক করতে এবং তোমাদের পূজা করতে উৎসাহিত করেছিলে, না ওরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা এবং উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

২. অর্থাৎ আমাদের আদৌ এই সাধ্য ছিল না যে, আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু ও সহযোগী মনে করি। যখন আমরা নিজেরাই আপনার মুখাপেক্ষী ছিলাম, তখন অন্যদের কী করে আদেশ করি যে, তারা যেন আমাদেরকে উপাস্য ও সহায়ক মনে করে!

৩. অর্থাৎ আসল ব্যাপার এই যে, এই হতভাগারা নিজেদের অপরাধের কারণে নিজেদেরই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, ধ্বংস ওদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা ওরা আরাম-আয়েশে মগ্ন হয়ে এবং গাফলতে নিমজ্জিত হয়ে আপনার স্মরণ ভুলে গিয়েছিল, কোন নসীহতে কর্ণপাত করেনি। নবীদের বাণী ও হেদায়াতের প্রতি ওরা একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং পার্থিব ভোগবিলাসের অহংকারে মেতে ওঠে। আপনি নিজ মেহেরবানীতে ওদের ও ওদের বাপদাদাদের যে পরিমাণ পার্থিব সম্পদ দান করেছিলেন, তারা সেই পরিমাণ গাফলত ও বিস্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল । উচিত তো ছিল আল্লাহর নেঁয়ামতাদি পেয়ে তাঁর বন্দেগী ও শোকর করা, কিন্তু তা না করে ওরা উলটা অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় মেতে উঠে। এভাবে আপনার দান করা অমৃতকে নিজেদের দোষে নিজেদের জন্য বিষে পরিণত করেছিল। ফলে ওরা ধ্বংস হয়ে যায়।

تَسۡتَطِيۡعُوۡنَ صَرۡفًا وَّلَا نَصۡرًا ۚ وَمَنۡ يَّظۡلِمۡ مِّنۡكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابًا كَبِيۡرًا ﴿۱۹﴾

মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল[১]! এখন তোমরা (আযাব) প্রতিহতও করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না[২]। আর তোমাদের মধ্যে (হে মানুষ) যে জুলুম করবে, তাকে আমি ভয়াবহ শাস্তি আস্বাদন করাব[৩]।

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ اِلَّاۤ اِنَّهُمۡ لَيَاۡكُلُوۡنَ الطَّعَامَ وَيَمۡشُوۡنَ فِى الۡاَسۡوَاقِ ؕ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٍ فِتۡنَةً ؕ اَتَصۡبِرُوۡنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيۡرًا ﴿۲۰﴾

২০. আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সকলেই আহার করতেন এবং হাট-বাজারে চলাফেরাও করতেন[৪]। আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে[৫]? আর আপনার রব সম্যক দ্রষ্টা[৬]।

---

১. অর্থাৎ তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইরশাদ হবে, দেখ! যাদের উপর তোমাদের ভরসা ছিল, তারা স্বয়ং তোমাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে।

২. অর্থাৎ এখন আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করতে পারবে না, তাঁর কথাও রদ করতে পারবে না, একে অপরকে সাহায্যও করতে পারবে না। যার যে শাস্তি হওয়ার, তার স্বাদ ভোগ করতে থাক।

৩. সম্ভবত এখানে জুলুম দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। আবার সব রকমের জুলুম ও গোনাহও উদ্দেশ্য হতে পারে।

৪. ওদের প্রশ্ন– مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ الخ এর উত্তরে এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার পূর্বে দুনিয়াতে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন, মানুষের ন্যায় তাঁরা পানাহার করতেন এবং সাংসারিক প্রয়োজনে বাজারে যেতেন। তাঁদের ফেরেশতা বানিয়ে প্রেরণ করা হয়নি যে, পানাহার ও মানবীয় প্রয়োজনাদি থেকে দূরে থাকবেন। সুতরাং বোঝা গেল, প্রয়োজনে বাজারে যাতায়াত ও চলাফেরা করা পবিত্রতা ও বুযুর্গীর পরিপন্থী নয়। বরং বাজারে না যাওয়ার কারণ যদি অহংকার হয়, তবে তা বুযুর্গীর পরিপন্থী।

৫. অর্থাৎ কাফেরদের ঈমান পরীক্ষার জন্য রয়েছেন পয়গম্বরগণ, আর পয়গম্বরদের ধৈর্য পরীক্ষার জন্য রয়েছে কাফেররা। এখন দেখা যাক, কাফেরদের মূর্খতাপূর্ণ সমালোচনা এবং নিরর্থক প্রশ্নাদি শুনে তোমরা কতদূর ধৈর্যধারণ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।

৬. অর্থাৎ কাফেরদের কুফর ও জুলুম-নির্যাতন এবং ধৈর্যশীলদের ধৈর্য ও সহনশীলতা সবই তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন।

পারা-১৯ [রুকূ - ৩]

২১. যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'আমাদের প্রতি ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হয় না কেন, অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?[১]' ওরা আপন মনে নিজেদের খুব বড় মনে করে এবং ওরা লিপ্ত রয়েছে চরম সীমালঙ্ঘনে[২]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۭ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝

২২. যেদিন ওরা ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, 'হায়! (আমাদের ও ফেরেশতাদের মাঝে) যদি কোন মজবুত প্রতিবন্ধক থাকত*[৩]।'

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

১. অর্থাৎ যাদের এ আশা নেই যে, একদিন আমার সামনে হাযির হয়ে হিসাব-কিতাব দিতে হবে, তারা শাস্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, ফলে তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলে। যেমন: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় আমাদের নিকট ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসলেন না কেন, অথবা আল্লাহ তাআলা সামনে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন না কেন? ফেরেশতাগণ আপনার সত্যতা প্রমানেই আসতেন, কিংবা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে আমরা স্বচক্ষে দেখতাম যে, তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আপনার দাবির সমর্থন করছেন! যেমন অন্যত্র রয়েছে- قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ الخ (ওরা বলে, 'আমরা ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আমাদের সে রকম বস্তু দেওয়া হবে, যা আল্লাহর রাসূলদের দেওয়া হয়েছে— আনআম : ১২৪)। এবং সূরা ইসরায় (আয়াত ৯২) যেমন আছে– أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا (অথবা আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাদের।)

২. অর্থাৎ ওরা আপন মনে নিজেদের এত বড় ভাবে যে, নিজেদের নিকট ওহী ও ফেরেশতা আগমনের আশা করছে!!! এ পাপিষ্ঠদের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, পাপাচার সত্ত্বেও ওরা দুনিয়াতেই চর্মচোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চায় এবং তাঁর সাথে কথা বলতে চাওয়ার ধৃষ্ঠতা দেখায়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওরা বলবে- বাঁচাও, বাঁচাও'।

৩. অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ো না, এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন ফেরেশতারা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবেন। তবে তাঁদের দেখে তোমাদের মত পাপিষ্ঠদের কোন আনন্দ লাভ হবে না, বরং

২৩. আর আমি ওরা যা কিছু আমল করেছে, তার নিকট আসব এবং তাকে পরিণত করব বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়[১]।

وَقَدِمۡنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنٰهُ هَبَآءً مَّنۡثُوۡرًا ۝٢٣

সেদিন ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে, এখন যারা ফেরেশতাদের অবতরণ কামনা করছে, তখন তারা حجرا محجورا বলে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং চাইবে, ওদের ও ফেরেশতাদের মধ্যে একটা কঠিন বাধা দাঁড়িয়ে যাক, যাতে ফেরেশতারা ওদের কাছে পৌছতে না পারেন।

কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না। তা কার্যকর হবেই হবে। সেদিন ফেরেশতাগণও حجرا محجورا বলে জানিয়ে দেবেন, আজ আনন্দ ও সফলতা আর তোমাদের মাঝে কঠিন দেয়ালের প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা চিরতরে তা থেকে মাহরুম হয়ে গেলে!

আয়াতে কোন্ সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে?

হতে পারে, আয়াতে ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যখন কাফেরদের মৃত্যু উপস্থিত হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ {আপনি যদি কাফেরদের তখন দেখতেন, যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের জান এ অবস্থায় কবজ করে যে, ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে। –সূরা আনফাল, আয়াত ৫০}। অন্য আয়াতে বলেছেন- وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ الخ {আপনি যদি (ওদের) তখন দেখতেন, যখন জালেমরা মৃত্যু-যাতনায় থাকে, আর ফেরেশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে বলে, 'তোমরা নিজেদের প্রাণ বের কর। আজ প্রতিফলস্বরূপ তোমাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে ...। –সূরা আন'আম, আয়াত ৯৩}

বস্তুত কাফেরদের অবস্থা হবে মুমিনদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের অবস্থা এ আয়াতে বলা হয়েছে- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ', অতঃপর তারা তার উপর অবিচল থেকেছে— নিশ্চয় তাদের উপর ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে আর বলবে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই বেহেশতের, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হত।' –সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত ৩০)

আর এমনও হতে পারে যে,এখানে কিয়ামতের দিনের আলোচনা করা হয়েছে। (আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন)।

১. ওরা যেমন আমাকে দেখতে চাইত, আমিও তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। তবে ওদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং ওরা নিজেদের অসার ধারণা অনুযায়ী যেসব ভাল কাজ করেছিল এবং যার উপর ওদের ভরসা ছিল, তা নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং সামান্য ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিয়ে অসার প্রমাণিত করতে এসেছি। অসার এজন্য যে, সেসব

২৪. সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে অতি উত্তম[১]।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

২৫. (স্মরণ কর), যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে মেঘ নেমে আসবে এবং ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হবে অনবরত[২]।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيلًا ۝

২৬. সেদিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে (শুধু) দয়াময়ের। আর সেই দিনটি কাফেরদের জন্য কঠিন দিন হবে[৩]।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِينَ عَسِيرًا ۝

আমল এখলাস ও ঈমানের রূহ থেকে একেবারে শূন্য ছিল। অথবা সত্য পথের সম্পূর্ণ উলটা ছিল। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন- مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ (যারা নিজেদের রবকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপমা হচ্ছে: তাদের আমলগুলো সেই ভস্মসদৃশ, যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রবলবেগে বাতাস বয়ে গেছে। –সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১৮)

১. অর্থাৎ এ কাফেররা তো সেদিন উক্ত বিপদে থাকবে। আর যাদের নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করত তারা জান্নাতে খুব আরাম-আয়েশের স্বাদ উপভোগ করবে।

২. কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উপর থেকে মেঘের ন্যায় একটি বস্তু অবতীর্ণ হবে, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ তাজাল্লী থাকবে। সম্ভবত এটি সে-ই বস্তু, যাকে আবু রাযীনের হাদীসে عماء এবং নাসায়ী শরীফের মে'রাজ সম্পর্কিত এক হাদীসে غيابة শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। তার সাথে অসংখ্য ফেরেশতার দল থাকবে এবং সেদিন ফেরেশতাগণ হাশরের মাঠে অবতীর্ণ হতে থাকবেন।

সূরা বাক্বারার ২১০ আয়াতেও এ জাতীয় বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য – সর্বপ্রকারের রাজত্ব একমাত্র রহমানের (দয়াময় আল্লাহর) হবে এবং শুধু তাঁরই হুকুম চলবে। যেমন: ইরশাদ হয়েছে- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ রাজত্ব কার? একক পরাক্রমশালী আল্লাহর। –সূরা মুমিন, আয়াত ১৬)

সুতরাং রাজত্ব যখন রহমানেরই, তখন যারা করুনার যোগ্য, তাদের জন্য করুনার কোনই অভাব হবে না। তাদের উপর অফুরন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষিত হবে। কিন্তু এরূপ অফুরন্ত রহমত সত্ত্বেও কাফেরদের জন্য সেদিনটি হবে বড়ই কঠিন ও বিপদসংকুল। কবি বলেন :

تہی دست را دل پراگندہ تر ÷ کہ بازار چنداں کہ آگندہ تر

বাজারে পণ্যের যত আমদানি, পকেট যার খালি তার তত যন্ত্রণা।

২৭. এবং (স্মরণ কর), যেদিন পাপিষ্ঠ নিজের হাত দুটো কামড়াতে থাকবে (আর) বলবে, 'হায়! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে (একই) পথ অবলম্বন করতাম[১]!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮. 'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম[২]!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯. 'সে তো আমার নিকট উপদেশ পৌছার পরও আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আর শয়তান তো মানুষকে প্রয়োজন-মুহূর্তে পরিত্যাগ করে চলে যায়[৩]।'

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

৩০. রাসূল বললেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে হট্টগোলের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে*[৪]।'

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

---

১. অর্থাৎ আক্ষেপ ও অনুশোচনার আতিশয্যে সে (দাঁত দিয়ে) নিজের হাত কামড়াবে এবং আফসোস করে বলবে, দুনিয়াতে কেন আমি রাসূলের পথ অবলম্বন করলাম না এবং কেন আমি মানুষ ও জিন শয়তানদের প্ররোচনায় পড়লাম, যার ফলে এই দুর্দিনের সম্মুখীন হলাম।

২. অর্থাৎ যাদের প্ররোচনায় গোমরাহ হয়েছিল তাদের সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলবে, আফসোস! এদের কেন বন্ধু মনে করেছিলাম। হায়! তাদের ও আমার মধ্যে যদি কখনো বন্ধুত্ব না হত।

বি. দ্র. মুফাসসিরগণ এস্থলে উকবা ইবনে আবি মু'আয়ত ও উবাই ইবনে খালফের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আয়াতকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। হাঁ, আমরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি তা অনুসারে এ ঘটনাও আয়াতের অধীনে আসে।

৩. অর্থাৎ পয়গম্বরের নসীহত আমার নিকট পৌঁছেছিল, যা হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং সম্ভাবনা ছিল যে,তা আমার অন্তরে স্থান করে নিবে। কিন্তু এ হতভাগার বন্ধুত্ব ধ্বংসের কারণ হয়েছে এবং আমাকে সেদিকে মনোযোগী হতে দেয়নি। নিঃসন্দেহে শয়তান বড় দাগাবাজ, মানুষকে প্রয়োজনের সময় ধোঁকা দেয় এবং পরিত্যাগ করে চলে যায়, কোন সাহায্য করে না।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এ কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত করেছে'।

৪. অর্থাৎ অবাধ্য লোকেরা যখন কোন ক্রমেই নসীহতে কান দিল না, তখন নবীজি (স.) আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলেন– আল্লাহ গো! আমার জাতি কথা শোনে না, ওরা কুরআনের মত মহান কিতাবকে বাজে জিনিস মনে করছে। যখন কুরআন পড়া হয়, ওরা খুব শোরগোল ও হৈচৈ করে, যাতে কোন ব্যক্তি শুনতে ও বুঝতে না পারে। এভাবে এ হতভাগারা কুরআনের মত মহামূল্যবান গ্রন্থকে একেবারে পরিত্যাক্ত করে রেখেছে।

৩১. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু তৈরি করেছি[১]। আর আপনার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট[২]।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۝

৩২. যারা কাফের তারা বলে, 'তার প্রতি সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন[৩]?' (আল্লাহ বলেন)– এভাবে (এজন্য অবতীর্ণ করেছি), যাতে এর দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত রাখি। আর আমি তা ক্রমে ক্রমে পাঠ করেছি (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল আ. পাঠ করে নবীজিকে শুনিয়েছেন)[৪]।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

বি. দ্র. আয়াতে যদিও শুধু কাফেরদের উল্লেখ রয়েছে, তবুও কুরআনকে না মানা, এতে চিন্তা-ফিকির না করা, এ অনুযায়ী আমল না করা, এর তেলাওয়াত না করা, শুদ্ধ করে পড়ার প্রতি মনোযোগী না হওয়া, তা থেকে বিমুখ হয়ে অন্যান্য অর্থহীন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া– এ সবই কুরআনকে পরিত্যাগ করার (هجران قرآن এর) বিভিন্ন স্তর ও ধাপ।

فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب .

১. যারা নবীর কথা মানতে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে এবং লোকদের সত্য গ্রহণে বাধা দেয়।

২. অর্থাৎ কাফেররা যতই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা (সাহায্য করবেন ও আপন) পথে নিয়ে আসবেন। অথবা অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চাইবেন হেদায়াত দান করবেন; আর যাদের ভাগ্যে হেদায়াত নেই, তাদের মোকাবেলায় আপনাকে সাহায্য করবেন। অথবা অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সাহায্য করবেন এবং আপনাকে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছিয়ে ছাড়বেন, কোন বাধাই তা প্রতিহত করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ নবীর শত্রুরা সাধারণ লোকদের গোমরাহ করার জন্য নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপন করত। যেমন তারা বলত– অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় সম্পূর্ণ কুরআন একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? বছরের পর বছর ধরে অল্প অল্প করে যে অবতীর্ণ হল, তা কি এ জন্য যে, আল্লাহকে (নাউযুবিল্লাহ) কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করতে হয়? এতে তো বরং সন্দেহ হয়, স্বয়ং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিন্তা করে এটা রচনা করেন, তারপর সুযোগ বুঝে অল্প-অল্প করে শোনাতে থাকেন।

৪. অর্থাৎ অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করার কারণ কক্ষনো তা নয়, যা তোমরা ধারণা করছ! যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তবে বুঝতে পারতে, এভাবে নাযিল করার মধ্যে এমন অনেক

৩৩. ওরা যখনই আপনার নিকট কোন উদাহরণ নিয়ে হাযির হয়, তখনি আমি আপনার নিকট পৌছিয়ে দিই সঠিক কথা ও উত্তম ব্যাখ্যা[১]।

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. যাদেরকে আপন মুখের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় একত্র করে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারাই মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সর্বাধিক পথভ্রষ্ট*[২]।

اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ إِلٰى جَهَنَّمَ ۙ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

উপকারিতা আছে, যা একসঙ্গে নাযিল করলে হাসিল হত না। যেমন: এতে কুরআন হেফজ করা অধিকতর সহজ হল, বুঝতেও সহজ হল, ঐশী কালাম পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হতে থাকল। এবং ক্রমান্বয়ে নাযিল করার মধ্যে যেসব কল্যাণ ও হেকমত নিহিত ছিল, লোকেরা ধাপে ধাপে তা জানতে থাকল। প্রত্যেক আয়াতের পৃথক শানে নুযূল দ্বারা তার সঠিক অর্থ নির্ধারণে সাহায্য হল। প্রত্যেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একেকটি বিষয়ের যথাসময়ে উত্তর পেতে থাকায় নবীজি ও মুসলমানদের অন্তরে সান্ত্বনা লাভ হতে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক আয়াতের অবতরণের সময় যেন কুরআনের অলৌকিকতার দাবি নতুন করে বিঘোষিত হতে থাকে। এ উপলক্ষে জিবরাঈল (আ) এর বারংবার আসা-যাওয়া হল, যা একটি স্বতন্ত্র বরকতের বিষয় ছিল।

এ ছাড়া আরো উপকারিতা এর মধ্যে নিহিত ছিল। আয়াতে মাত্র কয়েকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ কাফেররা যখন কুরআন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে, অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোন মন্দ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে, তখন পবিত্র কুরআন তার উত্তরে ঠিক ঠিক কথা বলে দেয়। এর মধ্যে কোন প্রকার হেরফের হয় না, বরং সুস্পষ্ট, ভারসাম্যপূর্ণ ও নির্ভেজাল কথা হয়ে থাকে। হাঁ, যাদের আকল-বুদ্ধিই বক্র হয়ে গেছে, তারা সহজ ও স্পষ্ট কথাকেও বক্র মনে করলে তা ভিন্ন ব্যাপার। এরূপ লোকদের স্বরূপ সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের বাসস্থান অতি নিকৃষ্ট এবং ওদের পথ সর্বাধিক ভ্রান্ত'।

২. এরাই সেসব লোক, যাদের আকল-বুদ্ধি বক্র হয়ে গেছে এবং যারা উত্তম বিষয়াদি ছেড়ে হীন স্বার্থ ও কামনা-বাসনার পিছনে পড়ে আছে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এরূপ কোন কোন জাতির কী পরিণাম হয়েছে, শিক্ষা গ্রহণের জন্য তা সামনের আয়াতগুলিতে বর্ণিত হচ্ছে।

[রুকূ - ৪]

৩৫. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই হারূনকে সাহায্যকারী বানিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝

৩৬. অতঃপর বলেছিলাম 'তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে[১]।' তার পর আমি ওদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছি।

فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝

৩৭. আর আমি নূহের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিলাম যখন ওরা রাসূলগণকে অস্বীকার করল[২] এবং তাদেরকে বানালাম মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন । আর আমি পাপিদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যাতনাদায়ক শাস্তি।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৩৮. এবং (ধ্বংস করেছি) 'আদ সম্প্রদায়, ছামূদ সম্প্রদায় ও কুয়াওয়ালাদেরকে[৩] এবং এদের মাঝখানে আরো অনেক সম্প্রদায়কে।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

---

১. অর্থাৎ ওরা বিশ্বজগতে বিরাজমান নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, যা আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তদ্রূপ পূর্ববর্তী নবীদের সর্বসম্মত বিষয়গুলিকেও মিথ্যা বলেছে, যার কমবেশি চর্চা পূর্ব থেকে চলে আসছিল। ওরা এসবকে অস্বীকার করে খোদা হওয়ার দাবি করতে শুরু করেছিল।

২. এক পয়গম্বরকে অস্বীকার করার অর্থ সকল পয়গম্বরকে অস্বীকার করা। কারণ, দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সকল পয়গম্বরই একমত। (এজন্যই 'নূহকে' না বলে 'রাসূলগণকে অস্বীকার করল' বলা হয়েছে)।

৩. أصحاب الرس বা কুয়াওয়ালারা কারা ছিল– এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'তে অনেক উক্তি নকল করে বলা হয়েছে- وملخص الأقوال أنهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم (সারকথা এই যে, ওরা এমন কোন জাতি ছিল, যারা নিজ পয়গম্বরকে অস্বীকার করার শাস্তিতে ধ্বংস হয়ে যায়।)

হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কোন এক উম্মত নিজ পয়গম্বরকে কুয়ায় আবদ্ধ করে রাখে। পরে ওদের উপর আযাব এলে সেই রাসূল মুক্ত হন।'

৩৯. আমি প্রত্যেকের জন্য বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং প্রত্যেককে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম[১]।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০. ওরা (মক্কার কাফেররা) তো সেই জনপদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার উপর অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল[২]। ওরা কি তা দেখেনি[৩]? আসলে, ওরা পুনরুত্থানের প্রত্যাশা করে না[৪]।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

৪১. আর ওরা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে আর কিছু নয়, কেবল বিদ্রূপের পাত্র বানায়– (বলে) 'এই ব্যক্তিকেই বুঝি আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪২. 'সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আঁকড়ে থাকতাম[৫]। ওরা

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ

---

১. অর্থাৎ প্রথমে সকলকে উত্তমরূপে বুঝিয়েছি। যখন কিছুতেই মানেনি, তখন ধ্বংস করে দিয়েছি।

২. হযরত লূত (আ) এর জাতির লোকালয় উদ্দেশ্য, যার ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে মক্কাবাসীরা শামদেশে যাতায়াত করত।

৩. অর্থাৎ এরা কি ওদের ধ্বংসাবশেষগুলো শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখেনি?

৪. অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ কীভাবে করবে, যেখানে ওদের এ কথার প্রতি ঈমানই নেই যে, মরণের পর পুনরায় জীবিত এবং আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। শিক্ষা তো সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যার অন্তরে কিছু হলেও ভয় থাকে এবং পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে নির্ভয় না হয়।

৫. অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে পয়গম্বরের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাই ওদের কাজ। যেমনঃ তাঁকে দেখে ঠাট্টাচ্ছলে বলে, ইনিই কি সেই বুযুর্গ, যাঁকে আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? কোথায় এর করুন অবস্থা, আর কোথায় নবুওয়াতের মর্যাদা! আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র ইনিই রাসূল হওয়ার যোগ্য রইলেন? রাসূল হতে হলে কিছু বৈশিষ্ট্য তো থাকতে হবে। ইনার মধ্যে কী আছে?!

হাঁ, তাঁর কথার মধ্যে যাদুর মত প্রভাব রয়েছে। ভাষার মাধুর্য ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা তিনি এমনি প্রভাব বিস্তার করেছেন যে, বড়দের পর্যন্ত পদস্খলন ঘটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাঁর

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

শীঘ্রই জানতে পারবে— যখন আযাব দেখতে পাবে— যে, কে অধিক পথভ্রষ্ট[১]।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝

৪৩. আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়েছে, আপনি কি তার যিম্মাদার হতে পারবেন[২]?

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪৪. অথবা আপনি কি মনে করেন, ওদের অধিকাংশ শোনে বা বোঝে? ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং ওরা আরো বেশি পথভ্রষ্ট[৩]।

যাদুকরী কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে প্রায় ভ্রষ্ট হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা দেব-দেবীর প্রতি অত্যন্ত ভক্ত ও পরিপক্ক ছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছি এবং তাঁর কোন কথায় প্রভাবিত হইনি। নতুবা ইনি আমাদের কবে পথভ্রষ্ট করে ছাড়তেন।

১. অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি যখন দেখবে তখন জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে কে পথভ্রষ্ট ছিল।

২. অর্থাৎ আপনি কি এমন প্রবৃত্তিপূজারীদের হকের পথে আনার দায়িত্ব নিতে পারেন, যাদের উপাস্য হচ্ছে একমাত্র প্রবৃত্তি? প্রবৃত্তি যেদিকে তাড়িত করে, তারা সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে; যা প্রবৃত্তির অনুকূল হয়, কবুল করে এবং যা প্রতিকূল হয়, প্রত্যাখ্যান করে। আজ একটি পাথর ভাল মনে হল, তার পূজা শুরু করল। কাল আরেকটি অধিকতর সুন্দর লাগল, অমনি প্রথমটি ছেড়ে দ্বিতীয়টির সামনে মাথা নত করে দিল।

৩. অর্থাৎ যতই সুন্দর নসীহত আপনি করেন না কেন, কোন ফল হবে না। চতুষ্পদ জন্তুরাও তো নিজেদের লালন-পালনকারী মনিবের সামনে মাথা নত করে দেয়, নিজ অনুগ্রহকারীকে চেনে, ভাল ও মন্দের কিছুটা পরিচয় বোঝে। উন্মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হলে তারা নিজেদের চারণভূমি ও পানি পান করার স্থানে পৌছে যায়। কিন্তু এই হতভাগাদের অবস্থা কী? এরা না নিজ স্রষ্টা ও প্রতিপালকের হক চিনল, না তাঁর অনুগ্রহ বুঝল, না ভাল-মন্দের পার্থক্য করল, না শত্রু-মিত্রের মধ্যে প্রভেদ করল, আর না রুহানী খাদ্য ও হেদায়াতের ঝরনাধারার দিকে অগ্রসর হল। বরং তা থেকে বহু দূরে ভেগে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা ওদের যে শক্তি-সামর্থ্য দান করেছিলেন,তা বেকার করে রেখেছে বরং অপাত্রে-কুপাত্রে ব্যয় করেছে।

যদি একটুও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করত, তবে এই বিশ্বজগতে এমন অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান ছিল, যেগুলি স্পষ্টরূপে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, পবিত্রতা, দীনের মৌলিক বিষয়াদির সত্যতা ও সততার প্রমান বহন করছে।

[রুকূ - ৫]

৪৫. তুমি কি আপন রবের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ করনি যে, কীভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমি সূর্যকে এর নির্দেশক বানিয়েছি।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ

৪৬. অনন্তর আমি ছায়াকে ধীরে ধীরে আমার দিকে গুটিয়ে আনি[১]।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۞

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এমন কতিপয় নিদর্শনের কথা সামনের আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. উষালগ্ন থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্বত্র ছায়া (রোদহীন অবস্থা) থাকে। যদি আল্লাহ তাআলা সূর্যকে উদয় হতে না দিতেন, তবে এই ছায়াই বিরাজমান থাকত। কিন্তু তিনি নিজ কুদরতে সূর্যকে উদিত করলেন, ফলে রোদ ছড়াতে শুরু করল এবং ছায়া ক্রমশ গুটিয়ে যেতে লাগল। রোদ না উঠলে আমরা ছায়ার মর্ম বুঝতেই পারতাম না। কারণ, বিপরীত দুটি বস্তুর একটির পরিচয় অপরটির আগমনে বুঝে আসে। (সূর্যের উপকারিতা বর্ণনা করত আল্লাহ ইরশাদ করেন–) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ الخ (আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কে আছে, যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে? –সূরা কাসাস, আয়াত ৭১)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শুরুতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া প্রলম্বিত থাকে। অতঃপর যেদিকে সূর্য গমন করে, তার বিপরীতে ছায়া ছোট হয়ে আসে, যাবৎ না তার মূলের সাথে এসে লাগে। 'আমার দিকে গুটিয়ে আনি' এর অর্থ এই যে, নিজ মূলের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। সকলের মূল আল্লাহ (মূযেহুল কুরআন)।

অতঃপর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে একদিকে রোদ সংকুচিত হতে শুরু করে এবং অপর দিকে ছায়া দীর্ঘ হতে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত দিন শেষে রোদ গায়েব (অদৃশ্য) হয়ে যায়।

আয়াতগুলোর গভীর মর্ম

দুনিয়ার ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্তই খাটে। প্রথমে কিছুই ছিল না। পরে অস্তিত্বের আলোয় এল। অবশেষে পুনরায় সকলে অনস্তিত্বের পর্দায় চলে যাবে। আর এই বস্তুগত নূর ও ছায়ার মাধ্যমে রূহানী নূর ও আঁধারের অবস্থা বোঝা যেতে পারে। কুফর ও অবাধ্যতা, মূর্খতা ও নাফরমানীর আঁধারের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের সূর্য উদিত না করতেন, তবে কেউই সঠিক মারেফতের রাস্তা পেত না।

৪৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাতকে পোশাক(-স্বরূপ) ও নিদ্রাকে বিশ্রাম (এ-র মাধ্যম) বানিয়েছেন এবং দিনকে বানিয়েছেন জেগে ওঠার (সময়)[১]।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝

৪৮. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) প্রাক্কালে বায়ু পাঠান সুসংবাদবাহীরূপে। এবং আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি পবিত্র পানি;

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

৪৯. যাতে তার দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্য থেকে বহু গবাদি পশু ও মানুষকে তা পান করাই[২]।

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

৫০. আর আমি তা মানুষের মাঝে নানাভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

---

১. অর্থাৎ রাতের আঁধার চাদরের ন্যায় সকলকে ঢেকে ফেলে, লোকেরা তখন কাজ-কারবার ছেড়ে আরাম করে। অতঃপর দিনের আলোর আগমন ঘটলে ঘুম থেকে উঠে এদিক সেদিক চলাফেরা শুরু করে। ঠিক এভাবে মৃত্যু-নিদ্রার পর কিয়ামতের প্রভাত হবে, সেই প্রভাতে সমগ্র জগত পুনরায় জেগে উঠবে।

এই একই অবস্থা দেখা দেয়, যখন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ওহী ও এলহামের আলো দ্বারা দুনিয়াকে আলোকিত করেন। আর তখন ঘুমন্ত সৃষ্টিকুল মূর্খতা ও গাফলতের নিদ্রা থেকে অবিলম্বে জেগে ওঠে।

২. অর্থাৎ প্রথমে প্রবহমান বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষে, যা নিজেও পাক এবং অন্য সকলকে পাক-পবিত্র করে। বৃষ্টির পানি পড়ামাত্র মৃত যমীনে প্রাণ সঞ্চার হয়। খেত-খামার শস্য-শ্যামল ও সজীব হয়ে ওঠে। যেখানে ধুলাবালি উড়ছিল, সেখানে সবুজ বাগ-বাগিচার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বহু জীব-জন্তু ও মানুষ বৃষ্টির পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করে।

এভাবেই কিয়ামতের দিন এক গায়বী বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে মিশে যাওয়া মৃত দেহগুলিকে জীবিত করে তোলা হবে। এমনিভাবে দুনিয়াতেও যেসব অন্তর মূর্খতা ও পাপাচারের মৃত্যুতে পতিত হয়, খোদায়ী ওহীর বৃষ্টি তাদের জীবিত করে তোলে। আর যেসব আত্মা অপবিত্রতায় নিমজ্জিত ছিল, সেগুলো এই রূহানী বৃষ্টির পানিতে পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং মারেফত ও আল্লাহর মিলন-পিপাসু ব্যক্তিরা তা পান করে পিপাসা নিবারণ করে।

কিছুতে সন্তুষ্ট নয়[১]।

৫১. আমি যদি ইচ্ছা করতাম, প্রত্যেক জনপদে অবশ্যই কোন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝٥١

৫২. অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, বরং ওদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জোরদার জেহাদ করতে থাকুন[২]।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝٥٢

৫৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন– একটি সুমিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক; আরেকটি লোনা, তিক্ত। আর উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় ও দুর্ভেদ্য আড়াল[৩]।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝٥٣

---

১. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি সকল যমীনে একরকম বর্ষে না, সকল মানুষের নিকট একভাবে পৌঁছে না। বরং কোথাও কম, কোথাও বেশি এবং কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও দেরিতে– আল্লাহ স্বীয় হেকমত অনুসারে যেভাবে চান, সেভাবে পৌঁছতে থাকে, যাতে মানুষ বোঝে যে, বৃষ্টির বন্টনব্যবস্থা কোন একচ্ছত্র অধিপতি মহাশক্তিশালীর হাতে রয়েছে। কিন্তু বহুলোক এসব বোঝে না এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করে না, উলটা কুফর ও নাশোকরীতে লিপ্ত হয়।

রূহানী বৃষ্টিরও এরূপ অবস্থা। নিজ নিজ যোগ্যতা ও পাত্র অনুযায়ী তা থেকে যার যতটুকু অংশ পাওয়ার, পেয়েছে। আর অনেকে এই মহান নে'য়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতে থাকে।

২. অর্থাৎ নবীর আগমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমনকি প্রতি জনপদে পৃথক নবী পাঠাতে এবং বহু সংখ্যক নবীর ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এই যে, এখন সমগ্র বিশ্বের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র নবী হবেন।

সুতরাং আপনি কাফেরদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দোষারোপ ও অজ্ঞতাপূর্ণ সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, বরং নিজ দায়িত্ব পূর্ণোদ্যমে আঞ্জাম দিতে থাকুন এবং পবিত্র কুরআন সামনে রেখে জোরে-শোরে কাফেরদের মোকাবেলা করতে থাকুন। আল্লাহ তাআলা সফলতা দান করবেন।

৩. 'বয়ানুল কুরআন'-এ দুজন বিশ্বস্ত আলেমের সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সাগরের অবস্থা এই যে, এর দুটি দিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দেখা যায়। একটির পানি স্বচ্ছ সাদা, আর একটির পানি কালো। কালো পানিতে সর্বক্ষণ উচ্ছ্বাস ও ঢেউয়ের খেলা চলে, কিন্তু স্বচ্ছ পানি সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত থাকে। নৌকা চলে স্বচ্ছ পানিতে। আর

৫৪. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার জন্য সৃষ্টি করেছেন বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর আপনার রব সর্বশক্তিমান।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۭ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

৫৫. তবুও ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা ওদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। আর কাফের ব্যক্তি স্বীয় রবের বিরুদ্ধে

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۭ

উভয়টির মাঝখান দিয়ে একটি সূক্ষ্ম রেখা দেখা যায়, যাকে উভয় প্রবাহের মিলনরেখা বলা যায়। লোকেরা বলে, সাদা পানি মিঠা আর কালো পানি লোনা।

বরিশালের কয়েকজন ছাত্র আমার নিকট বর্ণনা করেছে, এ জেলাতেও দুটি নদী আছে, যা একই সাগর থেকে প্রবাহিত। একটির পানি লবণাক্ত ও একেবারে তিতা, আর অন্যটির পানি অত্যন্ত মিঠা ও সুস্বাদু। গুজরাটের যেখানে আমি বর্তমানে বসবাস করছি (সুরাট জেলার ডাভেল অঞ্চলে), এখান থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরত্বে সাগর। সেখানকার নদনদীতে জোয়ার-ভাটা হতে থাকে। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে নোনা পানি যখন নদীর মিঠা পানির উপর দিয়ে জোরেশোরে প্রবাহিত হয়, তখনো নদীর মিঠা পানির সাথে তা একাকার না হয়ে উপরিভাগে আলাদা থেকে যায়। ফলে উপরের পানি নোনা এবং নীচের পানি মিঠা লাগে। অতঃপর ভাটার সময় উপরের নোনা পানি সবই নেমে যায় এবং নীচের মিঠা পানি যেমন ছিল তেমনি মিঠা থেকে যায়। (আল্লাহই ভাল জানেন!)

এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের আলোকে আয়াতের অর্থ খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ খোদার কুদরত লক্ষ কর, নোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে একটি থেকে অন্যটি আলাদা থাকে! (একেই বলা হয়েছে– وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا)

ভিন্ন তাফসীর

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা উভয় দরিয়াকে পৃথকভাবে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত করেছেন এবং উভয়ের মাঝে বহু স্থানে ভূমিকে আড়াল ও বাধা হিসাবে স্থাপন করেছেন। তাদের এ স্বাধীনতা দেননি যে, উভয়ে শক্তি খাটিয়ে মধ্যবর্তী ভূমিকে হটিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্বকেই বিলীন করে দেবে। তদুপরি উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির পানির যে স্বাদ, তা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন নয় যে, মিঠা দরিয়া নোনা বা নোনাটি মিঠা হয়ে যায়। মোটকথা, গুণাগুণ হিসাবে প্রত্যেকটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে।

এ ছাড়া আয়াতের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার নিকট প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

(শয়তানের) সহযোগী[১]।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি আপনাকে কেবল সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৭. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে যে ব্যক্তি আপন রবের কাছে (পৌছার) পথ অবলম্বন করতে চায়, (সে তা-ই করুক)[২]।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ

৫৮. আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করুন, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না[৩] এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন —আর নিজ

---

১. লক্ষ করার বিষয়! আল্লাহ তাআলা নিজ অসীম কুদরতে এক ফোঁটা পানিকে (বীর্য) বুদ্ধিদীপ্ত, পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছেন। পরবর্তীতে তার বংশধারা জারি করলেন এবং শ্বশুরালয়ের সাথে জামাই এর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করালেন। একটি নিকৃষ্ট ফোঁটাকে, কী থেকে কী করে দিলেন! (কোথায় ছিল এক ফোঁটা নাপাক বীর্য, আর হয়ে গেল সৃষ্টির সেরা মানুষ!)

কিন্তু জনাব(!) অতিশীঘ্র নিজের মূল ভুলে গেলেন এবং পরাক্রমশালী রবকে ছেড়ে অক্ষম সৃষ্টিকে খোদা বানিয়ে নিলেন। নিজ প্রভু আল্লাহর হকসমূহ চেনা তো দূরের কথা, তাঁর থেকে পিঠ ফিরিয়ে শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হলেন, যাতে বিভ্রান্ত করার মিশনে ওর সহযোগিতা করতে পারেন এবং মানুষকে গোমরাহ করার কাজে ওর হাতকে শক্তিশালী করতে পারেন। (নাউযুবিল্লাহ!)

২. অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অনুগতদের সুসংবাদ শোনানো এবং নাফরমানদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করা। কারো মানা বা না-মানায় আপনার কোন ক্ষতি নেই। আপনি কি এদের নিকট কোন পারিশ্রমিক আশা করেন যে, এদের না মানায় তা হাত ছাড়া হওয়ার আশঙ্কা হবে? আপনি তো এদের নিকট এতটুকুই চান যে, যার ইচ্ছা সে খোদার তাওফীকে স্বীয় প্রভুর পথ ধরুক। এখন তোমরা যদি একেই পারিশ্রমিক বল, বলতে পার!

৩. অর্থাৎ আপনি একমাত্র খোদার উপর ভরসা করে নিজ দায়িত্ব (অর্থাৎ তাবলীগ, দাওয়াত প্রভৃতি) আদায় করতে থাকুন। কারো বিরোধিতা বা সহযোগিতার পরোয়া করবেন না। যা নশ্বর, তার কোন ভরসা নেই। ভরসা তো একমাত্র তাঁরই উপর হতে পারে, যিনি অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, যার কখনো মৃত্যু নেই।

وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا

বান্দাদের গোনাহর খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট[১]—

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

৫৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন[২]। (তিনি) অতি দয়াময়। অতএব তাঁর সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা কর যিনি অবগত[৩]।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

৬০. যখন ওদের বলা হয়, 'রহমান' (পরম দয়াময়)-কে সেজদা কর', তখন বলে, 'রহমান' আবার কী? যাকে (সেজদা করতে) তুমি আমাদের বলবে, আমরা কি তাকেই সেজদা করব?' আর ওই কথা ওদের বিমুখতা আরো বাড়িয়ে দেয়[৪]।

---

১. অর্থাৎ তাঁরই উপর নির্ভর করুন এবং তাঁরই ইবাদত ও প্রশংসা করতে থাকুন। এ পাপিষ্ঠদের তিনি নিজেই দেখে নেবেন।

২. এর বিবরণ সূরা আরাফে গত হয়েছে। (আয়াত ৫৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহিমা-মর্যাদা ও দয়া-মায়া সম্বন্ধে যে জানে, তাকে জিজ্ঞাসা কর। এ জাহেল মুশরিকরা তাঁর সম্বন্ধে কী জানে?

আপন মহিমা, মর্যাদা ও গুণাবলি সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই, যেমন বলা হয়েছে– أنت كما أثنيت على نفسك। আর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর মহান সত্তাকে আল্লাহ তাআলা পূর্বাপর সকলের সমস্ত উলূমের (জ্ঞানমালার) আধার বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহামর্যাদা সম্বন্ধে জানতে হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

৪. অর্থাৎ এই জাহেল ও মুশরিকরা রহমানের মহামর্যাদা কতটুকুই বা বুঝতে পারবে, যাদের অবস্থা এই যে, তাঁর নামেও ওদের গায়ে জ্বালা ধরে। যখন উক্ত নাম শোনে, তখন চরম মূর্খতা বা জিদের বশে অজ্ঞ সেজে জিজ্ঞাসা করে, 'রহমান আবার কে', যাকে আমাদের দ্বারা সেজদা করাতে চান? শুধু আপনার বলাতেই আমরা এ কথা মেনে নেব? যেন, আপনি একটি নাম পেশ করলেন, আর আমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম!

মোটকথা, আপনি যতই ওদের রহমানের আনুগত্য ও ফরমাবরদারির প্রতি আকৃষ্ট করেন, ততই ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং তা থেকে পলায়ন করে।

[রুকূ - ৬]

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا ۝

৬১. বড়ই বরকতময় তিনি, যিনি আকাশে 'বুরূজ'সমূহ সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ[২] ও জ্যোতির্ময় চাঁদ।

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝

৬২. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরিবর্তনশীল বানিয়েছেন[*][৩]—সেই ব্যক্তির জন্য, যে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় অথবা চায় শোকর করতে[৪]।

---

১. অর্থাৎ বড় বড় নক্ষত্র বা আসমানী দুর্গ, যেগুলোর মধ্যে ফেরেশতারা পাহারা দেন। অথবা 'বুরূজ' বলতে সূর্যের সেই বারটি মনযিলও উদ্দেশ্য হতে পারে, যার কথা জ্যোতির্বিদরা বলেছেন। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আসমানের বারটি অংশ– এর এক একটিকে বুরূজ বলা হয় (বহুবচন হচ্ছে 'বুরূজ')। প্রত্যেকটির সাথে নক্ষত্রসমূহের সম্পর্ক রয়েছে। হিসাব রাখার উদ্দেশ্যে এই সীমাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। (মূযেহুল কুরআন)

২. অর্থাৎ সূর্য। সম্ভবত আলো ও তাপ এবং দাহিকাশক্তি থাকার কারণে এস্থলে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (এবং আকাশমণ্ডলে চাঁদকে রেখেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। –সূরা নূহ, আয়াত ১৬)

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'রাত-দিনকে পরস্পরের অনুগামী (বা : বদল) বানিয়েছেন'।

৩. 'পরিবর্তনশীল' বলতে রাতদিনের ছোটবড় হওয়াকে অথবা একটির পর অপরটির আসা–যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। অথবা خلفة-এর অর্থ এই যে, একটিকে অপরটির বদল ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। যেমন: দিনের অসমাপ্ত কাজ রাতে সমাপ্ত করল, রাতের ওজীফা রয়ে যাওয়ায় তা দিনে পূর্ণ করল ।

৪. অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির পরিক্রমণ এবং রাতদিনের অদল বদলের ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে যে, এতে চিন্তা–ভাবনা করে মানুষ মহাশক্তিশালী আল্লাহ তাআলার মারেফত লাভ করবে এবং বুঝবে, এসব বিরাট পরিবর্তন ও অদলবদল তাঁরই কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া রাতদিনের উপকার ও কল্যাণ লক্ষ করে তাঁর শোকর আদায়ে যত্নশীল হবে।

বস্তুত, সম্মুখে রহমানের যে মুখলেস বান্দাগণের আলোচনা আসছে, তারা এমনই করে থাকেন।

৬৩. 'রহমানে'র বান্দা তারা, যারা যমীনের বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে[১] এবং নির্বোধ লোকেরা তাদের সম্বোধন করে কোন কথা বললে তারা বলে, '(ভাই,) সালাম'[২]।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝٦٣

৬৪. এবং যারা রাত যাপন করে আপন রবের সামনে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়[৩]।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٤

৬৫. আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূর করে দিন, নিশ্চয় তার আযাব স্থায়ী আযাব।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥

৬৬. নিশ্চয় জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল ও বাসস্থান[৪]।

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝٦٦

---

১. অর্থাৎ তারা মুশরিকদের মত রহমানের নাম অপছন্দ করেন না, বরং উল্টো প্রত্যেক কাজে ও কথায় তাঁরই দাসত্ব প্রকাশ করেন। তাদের চালচলনে বিনয়, নম্রতা ও সরলতা প্রকাশ পায়। অহংকারীদের ন্যায় মাটির উপর দিয়ে ধুমধাম করে চলেন না।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা রিয়া ও লৌকিকতা করত রোগীদের মত পা ফেলেন। কারণ, হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাটার যে ভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে, তা এর সমর্থন করে না।

২. অর্থাৎ তারা নির্বোধ ও বেআদব লোকদের কথার উত্তর সুন্দরভাবে দিয়ে থাকেন। যখন কেউ মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে, তখন তারা নম্র কথা এবং 'আচ্ছা ভাই! সালাম' বলে প্রস্থান করেন। এরূপ লোকদের সাথে কথা কাটাকাটি করেন না, তাদের মত হয়ে যান না, তাদের সাথে ঝগড়াও করেন না। তাদের চরিত্র জাহেলী যুগের সেই কবির মত নয়, যে বলেছিল- ألا لا يجهلن علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين (ওহে, কেউ যেন আমাদের সঙ্গে মূর্খতাসূচক আচরণ না করে। তা হলে আমরা মূর্খদের মূর্খতার চেয়ে বেশি মূর্খতাসূচক আচরণ করব।)

এ তো ছিল রহমানের মুখলেস বান্দাদের দিনের বেলার কথা। সামনে তাদের রাতের বেলার অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ রাতের বেলায় যখন গাফেল লোকেরা নিদ্রা ও আরামের স্বাদে বিভোর থাকে, তখন এরা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান থেকে এবং সেজদায় পড়ে রাত কাটায়।

রুকূ যেহেতু কিয়াম ও সেজদার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম, সম্ভবত সেজন্য আলাদাভাবে তার উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি, এ দুটির মধ্যেই রুকূর কথা এসে গেছে।

৪. অর্থাৎ এত ইবাদত করার পরও তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে! তাহাজ্জুদের আট রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর আযাব ও আক্রোশ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় না।

৬৭. এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং (তাদের জীবনযাত্রা) হচ্ছে তার মাঝামাঝি, ভারসাম্যপূর্ণ[১]।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

৬৮. আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করেছেন, তাকে যথাযথ কারণ[২] ছাড়া হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এসব কাজ করবে, সে গোনাহর মধ্যে গিয়ে পড়বে*[৩]।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

৬৯. কিয়ামতের দিন ওর শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে তাতে চিরকাল পড়ে থাকবে লাঞ্ছিত অবস্থায়[৪]।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝

৭০. তবে যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মগুলো পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৫]।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

---

১. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে যথাস্থানে পরিমিতভাবে ব্যয় করে। ধনের মহব্বতও নেই, তার অপব্যয়ও নেই। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (আর তুমি তোমার হাত নিজ ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্তও করে দিয়ো না। -সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৯)

২. যথা, 'কতলে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত খুনের বদলে খুন করা, অথবা বিবাহিত যিনাকারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, অথবা যে ব্যক্তি দীন ত্যাগ করে মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাকে হত্যা করা- এসব বিষয় হাদীসের আলোকে إلا بالحق এর অন্তর্ভুক্ত।

* **দ্বিতীয় তরজমা-** 'সে গোনাহর (শাস্তির) সম্মুখীন হবে'।

৩. অর্থাৎ সে অতি কঠিন গোনাহ করল, যার শাস্তি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। কোন কোন হাদীসে এসেছে, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম أثام, যার মধ্যে ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। (তাফসীরে তবারী ১৭/৫১৪; মাজমাউয্ যাওয়াইদ ১০/৩৮৯- وينظر في إسناده) أعاذنا الله منها

৪. অর্থাৎ অপরাপর গোনাহ থেকে এসব গোনাহ গুরুতর। এগুলোর শাস্তিও গুরুতর হবে এবং প্রতি মুহূর্তে তা বাড়তে থাকবে।

৫. অর্থাৎ গোনাহর পরিবর্তে তাকে নেককাজের তাওফীক দান করবেন এবং কাফের অবস্থার গোনাহগুলো মাফ করে দেবেন। অথবা অর্থ এই যে, গোনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে তওবা ও

৭১. আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে তো আল্লাহর কাছে ফিরে আসে উত্তমরূপে[১]।	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝
৭২. এবং যারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না*[২] এবং তারা যখন খেল-তামাশার নিকট দিয়ে যায়, ভদ্রভাবে চলে যায়[৩]।	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
৭৩. এবং যখন তাদেরকে তাদের রবের আয়াত-সমূহের দ্বারা নসীহত করা হয়, তারা সেগুলির উপর অন্ধ–বধির হয়ে পতিত হয় না[৪]।	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝
৭৪. এবং যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করুন চোখের শীতলতা[৫]	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

সৎকর্মের বরকতে গোনাহর সংখ্যানুপাতিক নেকী লিখে দেবেন (যেমনটি কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায়।)

১. ইতিপূর্বে সেই কাফেরের অবস্থার উল্লেখ ছিল, যে পরে ঈমান এনেছে। আর এখানে গোনাহগার মুসলমানের কথা বলা হচ্ছে। সেও যখন তওবা করে অর্থাৎ অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়, তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। এতে জানা গেল, সূরা নিসায় যে বলা হয়েছে- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (যে কেউ কোন মুসলমানকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সে তাতে পড়ে থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহাশাস্তি। –সূরা নিসা, আয়াত ৯৩)— এ বিধান তওবা করেনি এমন ব্যক্তির জন্য। (আল্লাহই ভাল জানেন)।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না'।

২. (لا يشهدون الزور) অর্থাৎ তারা মিথ্যাও বলে না, মিথ্যা সাক্ষ্যও দেয় না এবং অসৎকর্ম ও গোনাহর মজলিসেও হাযির হয় না।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তারা গোনাহর কাজে শামিল হয় না এবং খেল-তামাশা ও অনর্থক বিষয়াদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং এসব নিয়ে (কারো সাথে) ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না।'

৪. বরং তারা গভীর চিন্তা-ফিকির ও মনোযোগসহ তা শ্রবন করে এবং শোনার পর প্রভাবিত হয়। মুশরিকদের ন্যায় পাথরের মূর্তি হয়ে থাকে না।

৫. অর্থাৎ এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যাদের দেখে চোখ শীতল ও অন্তর শান্ত হয়। বলা বাহুল্য, কামেল মুমিনের অন্তর তখনি শীতল হবে, যখন নিজের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর

وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

এবং আমাদের পরহেযগারদের জন্য আদর্শ বানান[১]।'

اُولٰٓئِکَ یُجۡزَوۡنَ الۡغُرۡفَۃَ بِمَا صَبَرُوۡا وَ یُلَقَّوۡنَ فِیۡهَا تَحِیَّۃً وَّ سَلٰمًا ﴿۷۵﴾

৭৫. এমন লোকদেরই প্রতিদানস্বরূপ বালাখানা দেওয়া হবে, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। এবং সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে দো'য়া ও সালাম দিয়ে[২];

خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿۷۶﴾

৭৬. সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। তা কত উৎকৃষ্ট অবস্থানস্থল ও বাসস্থান[৩]!

قُلۡ مَا یَعۡبَؤُا بِکُمۡ رَبِّیۡ لَوۡ لَا دُعَآؤُکُمۡ ۚ فَقَدۡ کَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ یَکُوۡنُ لِزَامًا ﴿۷۷﴾

৭৭. আপনি বলুন, 'আমার রব তোমাদের কোন পরোয়া করবেন না, যদি তোমরা তাঁকে না ডাক[৪]। তোমরা তো (সত্য) অস্বীকার করেছ। অতএব এটা শীঘ্রই (তোমাদের) গললগ্ন হয়ে যাবে[৫]।

আনুগত্যের পথে অগ্রসর পাবে এবং উপকারী জ্ঞানার্জনে মশগুল দেখবে। দুনিয়ার অপরাপর নে'য়ামত ও আনন্দের স্থান তাদের নিকট এসবের পরে।

১. অর্থাৎ এমন বানিয়ে দিন যে, লোকেরা আমাদের অনুসরণ করে মুত্তাকী হতে থাকে। মোটকথা, আমরা নিজেরাই শুধু হেদায়াতপ্রাপ্ত হই– তা নয়, বরং আমরা যেন অন্যদের জন্যও হেদায়াতকারী হই এবং আমাদের বংশধরগণও যেন পরহেজগারীতে আমাদের অনুসরণ করে।

২. অর্থাৎ জান্নাতে তারা উচ্চ স্তরসমূহ লাভ করবে এবং ফেরেশতারা দো'য়া ও সালাম জানিয়ে তাদের সাদর অভ্যর্থনা করবেন। তাছাড়া জান্নাতীদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতেও এই সালাম ও দো'য়ার শব্দাবলিই ব্যবহৃত হবে, যা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

৩. অর্থাৎ এমন স্থানে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করতে পারাও যেখানে সৌভাগ্যের বিষয়, সেখানে তা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে।

৪. অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ জানিয়ে দিয়েছেন। বান্দার উচিত অহংকারী ও নির্ভয় না হওয়া। আল্লাহ বান্দার পরোয়া করেন না। হাঁ, বান্দা কাকুতি-মিনতি করলে তিনি তার প্রতি দয়া করেন। এমন না করে বড়াই করতে থাকলে আসন্ন আযাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

৫. অর্থাৎ কাফেররা যে সত্যকে অস্বীকার করছে, এই অস্বীকার শীঘ্রই ওদের গলার বেড়িতে পরিণত হবে। অর্থাৎ এর শাস্তি থেকে কিছুতেই অব্যাহতি পাবে না। আখেরাতের চিরধ্বংস তো আছেই, দুনিয়াতেও (মুমিনদের পক্ষ হতে) জেহাদের মাধ্যমে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যেমন বদরের জেহাদে ওরা এর কিছু নমুনা দেখতে পেয়েছে।

সূরা শু'আরা

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২৬ । ২২৭ আয়াত । ১১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٢٢٧، ركوعاتها ١١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তা– সীন– মীম।

طٰسٓمّٓ ۞

২. এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[১]।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۞

৩. আপনি মনে হয় এই কষ্টে স্বীয় প্রাণনাশ করে ফেলবেন যে, ওরা ঈমান আনছে না[২]?

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞

৪. আমি ইচ্ছা করলে ওদের প্রতি আসমান থেকে (বড়) কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারি, ফলে তার সামনে ওদের ঘাড় নত হয়ে যাবে[৩]।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۞

---

১. المبين– অর্থাৎ এ কিতাবের অলৌকিকতা সুস্পষ্ট, এর আহকাম পরিষ্কার এবং এ কিতাব হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী।

২. অর্থাৎ এই হতভাগাদের চিন্তায় নিজেকে এমন ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। আপনি কি এদের কারণে নিজের জানকে হালাক করে দেবেন।? তা, দরদ ও সহানুভূতিরও তো একটা সীমা আছে।

৩. অর্থাৎ এ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। এখানে বান্দাদের আনুগত্য ও অবাধ্যতার পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ জন্যই মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কার্যক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া আল্লাহর হিকমতের অনুকূল নয়, বরং এর দাবি হল তা অবশিষ্ট রাখা। নতুবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমন কোন আসমানী নিদর্শন দেখাতেন, যার সামনে সকলেই ঘাড় নত করে দিতে বাধ্য হত। বড় বড় পাষণ্ডেরও অস্বীকার করার ও অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা থাকত না। কিন্তু উক্ত কারণে আল্লাহ তাআলা এমনটি করেননি। তবে তিনি এরূপ অনেক নিদর্শন পাঠিয়েছেন, যা দেখে মানুষ বুঝতে চাইলে অনায়াসে সত্যকে বুঝতে পারে, আর কখনো কখনো পরাভূত হয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

৫. ওদের কাছে দয়াময়ের নিকট থেকে যে কোন নতুন উপদেশই আসে, তা থেকে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়[১]।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝

৬. ওরা তো (সত্যকে) অস্বীকার করেছে। সুতরাং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার (যথার্থ) সংবাদাদি শীঘ্রই ওদের নিকট এসে যাবে[২]।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَأْتِيهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৭. ওরা কি যমীনের দিকে লক্ষ করে না যে, আমি তাতে সর্বপ্রকারের উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন করি?

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

৮. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়[৩]।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৯. আর আপনার রব- নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু[৪]।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

---

১. অর্থাৎ আপনি যাদের চিন্তায় ভারাক্রান্ত, তাদের অবস্থা এই যে, রহমান যখন নিজ রহমত ও দয়ায় তাদেরই কল্যাণার্থে কোন নসীহত ও উপদেশ পাঠান, তখন তারা সেদিকে মনোযোগী হয় না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করে। মনে হয় যেন তাদের সামনে কোন আপদ এসে উপস্থিত হয়েছে!!

২. অর্থাৎ শুধু উপেক্ষাই নয়, ওরা (সত্যকে) অবিশ্বাস ও তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে। সুতরাং শীঘ্রই দুনিয়া ও আখেরাতে এসব কার্যকলাপের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। যা নিয়ে এখন বিদ্রূপ করছে, তখন তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

৩. অর্থাৎ এ অবিশ্বাসীরা যদি চোখের সামনে পড়ে থাকা ভূমির অবস্থার কথাই চিন্তা করত, তবে তা ইহজগত ও পরজগতের মারেফত হাসিল করার জন্য যথেষ্ট হতে পারত। ওরা কি লক্ষ করে না যে, এ শুষ্ক ও তুচ্ছ মাটি থেকেই মনোমুগ্ধকর নানা বর্ণের ফুল, বিভিন্ন ধরনের শস্য ও ফল উৎপন্ন হচ্ছে? এ কি প্রমাণ করে না যে, অনন্ত হেকমত ও ক্ষমতার অধিকারী কোন মহান সত্তা এ মনোরম-সুশোভিত বাগানকে সাজিয়েছেন, যাঁর হাতে রয়েছে অস্তিত্বের লাগাম এবং তিনিই যখন ইচ্ছা একে বিজন ভূমিতে পরিণত করতে পারেন, তারপর পুনরায় একে সবুজ-শ্যামল বাগানে পরিণত করতে পারেন? সৃষ্টিগত এ নিদর্শনগুলি উপলব্ধি করার পর আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতসমূহের সত্যতা স্বীকার করতে কোন বাধা থাকতে পারে কি? কিন্তু যদি সত্যকে মানারই ইচ্ছা না থাকে, তবে ভিন্ন কথা।

৪. অর্থাৎ তিনি এমন ক্ষমতাশালী যে, ঈমান না আনলে তৎক্ষণাৎ আযাব পাঠাতে পারেন। কিন্তু দয়ার কারণে তিনি অবকাশ দেন, হয়ত ঈমান আনবে।

[রুকূ - ২]

১০. (স্মরণ করুন), যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি (এই) অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট যাও—

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

১১. (অর্থাৎ) ফেরাওনের সম্প্রদায়ের নিকট। ওরা কি ভয় করে না[১]?

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ

১২. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার ভয় হয়, ওরা আমাকে অস্বীকার করবে।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ؕ

১৩. 'আর আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহবা চলে না। সুতরাং হারূনকেও পয়গম্বরী দান করুন[২]।

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে ওদের এক অপরাধের অভিযোগ আছে [৩]। সুতরাং আমার আশঙ্কা হয়, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে[৪]।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۚ

পূর্বা-পর সম্পর্ক

শিক্ষা গ্রহণের জন্য সামনে মিথ্যাবাদীদের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যার দ্বারা প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ তাআলা ওদের অনেক অবকাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন কোনক্রমেই মানেনি, তখন ওদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম কাহিনী ফেরাওন জাতির, যা ইতিপূর্বে সূরা 'আরাফ', 'তাহা' প্রভৃতিতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

১. তুমি গিয়ে ওদের আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব সম্বন্ধে সতর্ক কর।

২. অর্থাৎ ভয় হয়, ওরা সম্পূর্ণ কথা শোনার পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করবে এবং মজলিসে আমার কোন সমর্থকও থাকবে না। ফলে হতে পারে, তখন বিব্রত ও পেরেশান হওয়ায় আমার মন বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং আমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারব না। অধিকন্তু পূর্ব থেকেই আমার মুখে কিছুটা তোতলামি আছে। তাই অস্বস্তিকর অবস্থায় কথা বলতে আরো বেশি সমস্যা হবে। এ জন্য আমার সমর্থন ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সুবক্তা হারূনকে আমার সহযোগী করে দিন, বড়ই মেহেরবানী হবে।

৩. অর্থাৎ এক কিবতীকে হত্যার অভিযোগ, যার বিস্তারিত বিবরণ সূরা কাসাসে আসবে।

৪. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্বেই আমার দফা-রফা করে দেয় কি না! বলবে, এ-ই তো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের লোককে হত্যা করে ভেগে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তাবলীগের দায়িত্ব কী করে আদায় করব?

১৫. আল্লাহ বললেন, 'কখনই নয়! তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাদি নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে (সব কিছু) শ্রবণ করছি[১]।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ⑮

১৬. অতএব তোমরা ফেরাওনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা বিশ্বজগতের রবের রাসূল–

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ⑯

১৭. '(আমরা এই বার্তা নিয়ে এসেছি) যে, আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও[২]।'

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۗ⑰

১৮. ফেরাওন বলল, 'আমি কি তোমাকে তোমার শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি[৩]? এবং তুমি তোমার জীবনের কয়েক বছর আমাদের মাঝে কাটিয়েছ[৪]।

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ⑱

১৯. 'আর তুমি যে কাণ্ড ঘটিয়েছ, তা তো ঘটিয়েছই[৫]। বস্তুত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ[৬]।'

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ⑲

---

১. অর্থাৎ তোমায় স্পর্শ করার সাধ্য কার? যাও, তোমার দাবি অনুযায়ী হারূনকেও সঙ্গে নাও এবং আমার মু'জেযা ও নিদর্শন নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হও। এ নিদর্শনগুলি সঙ্গে থাকতে তোমাদের কিসের ভয়? আর শুধু নিদর্শন কেন? আমি স্বয়ং সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আছি এবং উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনছি।

২. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে বনী ইসরাঈলের বাসস্থান ছিল শামদেশে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারণে তাদের মিসরে আগমন ঘটে। সেখানে তারা এক যমানা অতিবাহিত করে। এখন আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাদের শামদেশ প্রদান করতে চাইলেন। ফেরাওন দাসদাসীর ন্যায় তাদের বেগার খাটাচ্ছিল এবং মুক্তি দিচ্ছিল না। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের স্বাধীনতা দাবি করলেন।

৩. অর্থাৎ তুমি কি সেই লোক নও, যাকে আমরা নিজ গৃহে বড় আরাম-আয়েশে লালন-পালন করেছি এবং প্রতিপালন করত এতটা বড় করেছি? এখন তোমার এত বড় স্পর্ধা যে, আমাদেরই নিকট দাবি-দাওয়া করছ এবং আমাদেরকে নিজের অনুগত বানাতে চাচ্ছ।

৪. এত বছর পর্যন্ত তো কখনো এসব দাবি করনি। এখান থেকে চলে যাওয়ামাত্র রাসূল হয়ে গেলে!

৫. অর্থাৎ যে কাজটা (কিবতীর হত্যা) করে পালিয়ে গিয়েছিলে, তা আমরা ভুলে যাইনি।

৬. অর্থাৎ আমাদের সমস্ত অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে পয়গম্বরী দাবি করছ? ইতিপূর্বে তুমিও সেই লোকদেরই একজন ছিলে, যাদের আজ তুমি কাফের বলছ।

২০. মূসা বললেন, 'আমি তখন সেই কাজ করেছি বটে, কিন্তু আমি ছিলাম অজ্ঞ[১]।	قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝
২১. 'অতঃপর আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গেলাম যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম; তারপর আমার রব আমাকে হেকমত* দান করলেন এবং আমাকে বানালেন একজন পয়গম্বর[২]।	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
২২. 'আর তা অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রাখা কি কোন অনুগ্রহ, যার খোঁটা তুমি আমাকে দিচ্ছ**[৩]?'	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

১. অর্থাৎ কিবৃতীকে আমি জেনেশুনে হত্যা করিনি, ভুলে হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝিনি, এক ঘুষিতেই– যা মূলত শাসন করার জন্য মেরেছিলাম– ওর দম বের হয়ে যাবে : فوكزه موسى فقضى عليه (তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং খতম করে দিলেন।)

✯ দ্বিতীয় তরজমা–'নবুওয়াত'।

২. অর্থাৎ আমি ভীত হয়ে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন, তিনি আমাকে নবুওয়াত ও হেকমত দান করবেন। সে মত তিনি আপন মেহেরবানীতে আমাকে তা দান করেছেন এবং রাসূল বানিয়ে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। বস্তুত এটি আমার সত্যতার প্রমাণ যে, যে ব্যক্তি একদা তোমাদের ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, আজ সে-ই এভাবে নির্ভয়ে একা তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

✯✯ দ্বিতীয় তরজমা–'গোটা বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রাখার বিপরীতে তা (অর্থাৎ আমার লালন-পালন) কি এমন কোন অনুগ্রহ, যার খোঁটা তুমি আমাকে দিতে পার?'

অথবা– 'তা কি কোন অনুগ্রহ, যার খোঁটা তুমি আমাকে দিচ্ছ? (তার কারণ তো এই যে,) তুমি বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলে।

৩. অর্থাৎ বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করেছ– এমন অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়া তোমার জন্য মোটেই শোভা পায় না। শুধু একটি ইসরাঈলী শিশুর প্রতিপালন কি এর বিনিময় হতে পারে যে, তুমি সেই শিশুর সমগ্র জাতিকে দাস-দাসীতে পরিণত করে রেখেছিলে? বিশেষত যখন এ শিশুর প্রতিপালনও করতে হয়েছে স্বয়ং তোমার দুর্বিসহ জুলুম-অত্যাচারের কারণেই? বনী ইসরাঈলের শিশুদের তুমি যদি হত্যা না করতে, তবে আমার মা ভীত হয়ে আমাকে সিন্দুকে ভরে সাগরেও ভাসাতেন না এবং ভাসতে ভাসতে তোমার বাড়ী পর্যন্ত আমাকে পৌছতেও হত না। এসব বিষয় স্মরণ করে অনুগ্রহ প্রকাশ নয়, তোমার বরং লজ্জিত হওয়া উচিত।

২৩. ফেরাওন বলল, 'বিশ্বজগতের রব' আবার কী?১'	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٣
২৪. মূসা বললেন, '(তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও২।'	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٢٤
২৫. সে তার আশপাশের লোকদের বলল, 'তোমরা কি শুনছ না৩?	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝٢٥
২৬. মূসা বললেন, '(তিনি) তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব৪।'	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٦

আর আসল কথা এই যে, যে প্রতিপালক আমাকে তোমার ন্যায় শত্রুর ঘরে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনিই আজ তোমার উপকারের জন্যই আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আদেশ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ পালন করতে গিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম নিজেকে رب العالمين এর পয়গম্বর বললেন। এতে ফেরাওন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলল, 'রাব্বুল আলামীন আবার কী জিনিস? আমার বর্তমানে অন্য কাউকে রব বলার কী অর্থ?'

বস্তুত স্বজাতির সামনে এ হতভাগার দাবি এই ছিল যে— 'مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِيْ 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বলে জানি না। এবং أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ অর্থাৎ আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' সে মত ওর জাতির কতক লোক নিতান্ত মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এবং কতক ভয়ে বা লোভে পড়ে ওরই পূজা করত, যদিও এ অভিশপ্তও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত (১০২) দ্বারা বোঝা যায় لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {'তুমি তো জান, এই নিদর্শনগুলি আর কেউ নয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকই অবতীর্ণ করেছেন'- }

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু যার মালিকানাধীন, তিনিই 'রাব্বুল আলামীন।' তোমাদের অন্তরে যদি কোন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্যতা থেকে থাকে, তবে সর্বাগ্রে এ বিষয়ের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করবে, কেননা এর জন্য মানব-প্রকৃতিই যথেষ্ট।

৩. ফেরাওন জেনে-বুঝে গোলমাল পাকাতে চাচ্ছিল। তাই নিজের পারিষদবর্গকে উত্তেজিত করার জন্য এবং মূসা আলাইহিস সালামের বক্তব্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, তোমরা কি শুনছ, মূসা কী রকম উদ্ভট কথা বলছে? আমাকে ছাড়া আসমান ও যমীনে আর কোন প্রভু আছে বলে কি তোমরা বিশ্বাস কর?

৪. অর্থাৎ নির্বোধ হে! আমি যে 'রাব্বুল আলামীন'-এর কথা বলছি, তিনি স্বয়ং তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না (অর্থাৎ

২৭. সে বলল, 'তোমাদের রাসূল যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে- অবশ্যই উন্মাদ[১]।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ۝

২৮. মূসা বললেন, '(তিনি) পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যদি তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে[২]।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۝

২৯. সে বলল, 'তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারাবন্দী করে ফেলব[৩]।'

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ۝

৩০. তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট জিনিস নিয়ে এসে থাকি, তবুও[৪]?'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ۝

মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বে), তখন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালন ও পরিচালনার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন।

১. অর্থাৎ দেখ, কী রকম পাগলকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে! সে আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে যথেচ্ছা মন্তব্য করছে এবং আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না। মনে হয়, এর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

২. তখন হযরত মূসা লা-জওয়াব করে দেয় এমন একটি কথা বললেন, ঠিক যেভাবে ইবরাহীম (আ) নমরূদের সামনে পরিশেষে বলেছিলেন। মূসা আ. বললেন, 'রাব্বুল আলামীন' তিনি, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়-অস্তের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। তোমার মধ্যে কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকলে বল দেখি, এই বিরাট ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার ধারক আল্লাহ ছাড়া কে হতে পারে? তাঁর স্থাপিত এই ব্যবস্থাপনা এক সেকেণ্ডের জন্য ভেঙে বা বদলিয়ে দেয়- এমন শক্তি কারো আছে কি?

শেষের এ কথা শুনে ফেরাওন একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেল এবং তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পথ ছেড়ে হুমকী-ধমকী দিতে শুরু করল।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন, আর ফেরাওন তাঁর কথার মাঝখানে নিজ পারিষদবর্গকে উত্তেজিত করছিল, যাতে মূসার কথায় তারা বিশ্বাস না করে ফেলে।'

৩. এবার ফেরাওন তার মনের কথা পরিষ্কারভাবে বলে ফেলল যে, এখানে (মিসরে) আর কোনো খোদা নেই। সুতরাং আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের কর্তৃত্ব আছে বলে যদি দাবি কর, তবে মনে রেখো- জেলখানা প্রস্তুত রয়েছে।

৪. অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এত তাড়াহুড়া করো না। এতক্ষণ তো শুধু তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলাম। এখন সেইসব সুস্পষ্ট নিদর্শনও দেখ, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও

৩১. সে বলল, 'তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ فَأْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৩২. তখন তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল ।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

৩৩. এবং তিনি (বগলের নীচ থেকে) স্বীয় হাত বের করলেন, আর তখনই তা দর্শকদের সামনে শুভ্র হয়ে উঠল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

[রুকূ - ৩]

৩৪. সে তার আশপাশের পারিষদদের বলল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর—

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝

৩৫. 'যে তার যাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে চায়। সুতরাং আমাকে তোমরা কী করতে বল'[১]?'

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝

৩৬. ওরা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন, আর শহরগুলিতে সংগ্রাহকদের পাঠান–

قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

৩৭. 'যাতে তারা সকল সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার নিকট নিয়ে আসে ।'

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝

৩৮. অতঃপর যাদুকরদের একত্র করা হল এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে[২]।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

৩৯. এবং লোকদের বলা হল, 'তোমরা কি সমবেত হচ্ছ?

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝

আমার সত্যতা উভয়ই প্রকাশ পাবে। এরূপ নিদর্শনাবলি দেখালেও কি তোমার সিদ্ধান্ত একই থাকবে?

১. ফেরাওনের অবস্থা সত্যিই দেখার মত! ইতিপূর্বে তো 'খোদা' হওয়ার দাবি করছিল, আর এখন এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, নিজের গোলাম ও পূজারীদের নির্দেশ মত চলতে প্রস্তুত হয়ে গেল!! (তাই বলছে, তোমরা আমাকে কী করতে বল?!)

২. অর্থাৎ (ফেরাওনিদের) ঈদের দিন চাশতের সময় (দুপুরের আগে)।

৪০. 'সম্ভবত আমরা যাদুকরদের অনুগামী হব যদি তারাই বিজয়ী হয়[১]।'	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝
৪১. অতঃপর যখন যাদুকররা আসল, তারা ফেরাওনকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদের জন্য কি কোন পুরস্কার থাকবে যদি আমরাই বিজয়ী হই?'	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝
৪২. সে বলল, 'হাঁ, আর তখন তোমরা অবশ্যই নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে[২]।'	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
৪৩. মূসা ওদের বললেন, 'তোমরা যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ কর[৩]।'	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى أَلْقُوْا مَآ أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝
৪৪. তখন ওরা নিজেদের দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, 'ফেরাওনের সৌভাগ্যের বদৌলতে আমরাই বিজয়ী হব[৪]।'	فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ তোমাদের সকলের সমবেত হওয়া উচিত। আশা করি, আমাদের যাদুকররা বিজয়ী হবে এবং মূসার হার ও পরাজয়ের পর আমরা আমাদের যাদুকরদেরই পথ অনুসরণ করব।

ফেরাওনী কৌশল!

ফেরাওন যেন এ কথাই বলতে চাচ্ছিল যে, এতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। কোন জোর-জবরদস্তিও নেই। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন আমাদের বিজয় হবে, তখন নীতিগতভাবেই আমাদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে চলার অবকাশ থাকতে পারে না।

২. অর্থাৎ শুধু আর্থিক পুরস্কার ও সম্মান লাভই নয়, বরং তোমরা আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এই আয়াতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আ'রাফ (আয়াত ১১০-১১৫) ও 'তা-হা' (আয়াত ৫৭-৬৫) তে অতিবাহিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ যাদুকররা যখন মূসা (আ) কে বলল, আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব? তখন উত্তরে তিনি বললেন, তোমরাই প্রথমে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন কর।

৪. কেউ কেউ بعزة فرعون-কে কসমের অর্থে ধরেছেন, অর্থাৎ ফেরাওনের মর্যাদার কসম, আমরাই জয়লাভ করব।

৪৫. অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা যাদুকরদের অলীক সৃষ্টিগুলো গ্রাস করতে লাগল[১]।

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَ ۝

৪৬. তখন যাদুকররা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।

فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سٰجِدِیْنَ ۝

৪৭. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজগতের রবের প্রতি,

قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৪৮. 'যিনি মূসা ও হারূনের রব।'

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ۝

৪৯. ফেরাওন বলল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাকে বিশ্বাস করে নিলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে[২]। অতএব তোমরা শীঘ্রই (পরিণাম) জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিক থেকে তোমাদের পা কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِیْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَیْدِیَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

৫০. তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব[৩]।

قَالُوْا لَا ضَیْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

---

১. শায়খে আকবর লেখেন, 'দড়ি ও লাঠিগুলো থেকে গেল, আর সাপের যেসব আকৃতি বানিয়েছিল, মূসা (আ)-এর লাঠি তা গিলে ফেলল।'

২. অর্থাৎ মূসা তোমাদের বড় উস্তাদ। পরস্পরে এ ষড়যন্ত্র করে এসেছ যে, 'আপনি এরূপ করবেন, আমরা এরূপ বলব।'

আর হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, إنه لكبيركم –বলে রবকে বুঝিয়েছে, অর্থাৎ মূসা ও তোমরা সেই একই রবের শাগরেদ (যে রবের আলোচনা মূসা করেছিল!) والله أعلم

৩. অর্থাৎ যা কিছুই হোক, মৃত্যুর পর তো আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। এভাবে মরলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হবে।

এসব বিষয় সূরা আরাফ প্রভৃতিতে গত হয়েছে, সেখানের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫১. 'আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন, কেননা আমরা প্রথম ঈমান আনয়নকারী হলাম[১]।'	إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

[রুকূ - ৪]

৫২. আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়। তোমাদের অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবন করা হবে[২]।'	وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞
৫৩. অতঃপর ফেরাওন শহরগুলিতে সংগ্রাহকদের পাঠাল[৩]–	فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۞
৫৪. (সে বলল,) 'এরা তো একটি ক্ষুদ্র দল[৪]।	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞
৫৫. 'এবং তারা আমাদের প্রতি ক্রোধান্বিত*[৫]।	وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۞
৫৬. 'আর আমরা সকলে (তাদের কারণে) শঙ্কায় আছি[৬]।'	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞

১. অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত ও তাবলীগের উসিলায় আমরা সর্বপ্রথম ভরা সমাবেশে অত্যাচারী ফেরাওনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য গ্রহণের ঘোষণা করেছি। এতে আমরা আশা করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের বিগত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

২. অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বোঝানো ও নিদর্শনাদি দেখানোর পরও যখন ফেরাওন সত্য গ্রহণ করল না এবং বনী ইসরাঈলকে নির্যাতন করা বন্ধ করল না, তখন আমি মূসাকে হুকুম দিলাম– তুমি স্বজাতিকে নিয়ে রাতের বেলায় মিসর থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হও। আর মনে রেখো, ফেরাওন দলবলসহ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে (তবে এতে ঘাবড়িয়ো না।)

৩. যাতে সকল কিবতীকে সমবেত করে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে।

৪. অর্থাৎ এই মুষ্টিমেয় লোকগুলো তোমাদের জ্বালাতন করছে, অথচ তাদের কী-ই বা ক্ষমতা আছে যে, তোমাদের মোকাবেলায় কিছু করবে? — ফেরাওন স্বজাতিকে লজ্জা দেওয়া ও উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে এ কথাগুলো বলল।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমাদের ক্রোধ উদ্রেককারী'।

৫. অথবা অর্থ এই যে, তারা আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। মনে হচ্ছে, তাদের দুর্ভাগ্য তাদেরকে উত্তেজিত করেছে। (ফলে তারা আমাদের বিরক্ত করছে)।

৬. অতএব এই শঙ্কার গোড়াই (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) উপড়ে ফেল।

৫৭. অতঃপর আমি ওদের বের করে দিলাম বাগ-বাগিচা ও ঝরনারাজি থেকে,

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

৫৮. এবং ধনভাণ্ডারসমূহ ও উত্তম বাসস্থান থেকে।

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

৫৯. এভাবেই (আমি ওদের বের করে দিলাম)[১]। আর বনী ইসরাঈলকে সে সবের অধিকারী করে দিলাম[২]।

كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

৬০. তো ওরা (ফেরাওন ও তার দলবল) সূর্যোদয় হতেই তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝

৬১. তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলতে লাগল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম[৩]।'

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝

৬২. তিনি বললেন, 'কখনই নয়। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আছেন আমার রব, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ বলে দেবেন[৪]।'

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝

কোন কোন মুফাসসির আয়াতের তরজমা এভাবে করেছেন- 'আমরা এক বিরাট বাহিনী, যা অত্যন্ত সতর্ক বা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত'। এ হিসাবে বলা হবে, মনোবল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ফেরাওন এ কথা বলেছে।

১. অর্থাৎ এভাবেই কিব্‌তীরা বাড়িঘর, ধন-সম্পদ, খেত-বাগান ছেড়ে বনী ইসরাঈলের পিছনে বের হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যাবর্তন ওদের ভাগ্যে জুটেনি। এই কৌশলে যেন আল্লাহ তাআলা থেকে ওদের সবকিছু চিরমাহরুম করে দিলেন।

২. উক্ত ঘটনার পরই উল্লিখিত বিষয়-সম্পদ বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়। অথবা দীর্ঘকাল পরে তারা সেসবের মালিক হয়, যখন সুলায়মান আলাইহিস সালামের আমলে মিসরও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (আল্লাহই ভাল জানেন।) ইতিপূর্বে এ বিষয়ে মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে বনী ইসরাঈল সাগর পার হওয়ার চিন্তা করছিল, এমন সময় পিছন থেকে ফেরাওন বাহিনীকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল। ঘাবড়ে গিয়ে তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামকে বলতে লাগল, 'এখন ওদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাব? সামনে সাগর,আর পিছন থেকে ধেয়ে আসছে শত্রু।'

৪. অর্থাৎ ঘাবড়িয়ো না, আল্লাহর ওয়াদার উপর আস্থা রাখ। তাঁর সাহায্য ও সহায়তা আমার সাথে আছে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোন পথ বের করে দেবেন। শত্রু আমাদের ধরে ফেলবে- এ অসম্ভব।

৬৩. তখন আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' (তিনি আঘাত করলেন), ফলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল, আর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল[১]।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৪. আর সেথায় পৌঁছে দিলাম অন্যদের (অর্থাৎ ফেরাওনীদের)।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং মূসাকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের সকলকে রক্ষা করলাম।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অতঃপর অন্যদের ডুবিয়ে দিলাম[২]।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন। আর ওদের অধিকাংশই ঈমানদার ছিল না[৩]।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর নিশ্চয় আপনার রবই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু[৪]।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

[রুকূ - ৫]

৬৯. আপনি তাদের ইবরাহীমের বৃত্তান্ত পড়ে শোনান,

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

---

১. পানি ছিল অনেক গভীর, বারটি স্থান চিরে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হল। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র আলাদা আলাদাভাবে এসব পথ অতিক্রম করে গেল, আর দু'দিকে পানির পাহাড়গুলি স্থির দাঁড়িয়ে রইল। (মূযেহুল কুরআন)।

২. অর্থাৎ ফেরাওন-বাহিনীও এসে গেল এবং সাগরের মধ্যে পথ দেখে না বুঝেই বনী ইসরাঈলের পিছনে তাতে নেমে পড়ে। যখন পুরো বাহিনী সাগরের মাঝখানে এল, অমনি আল্লাহর হুকুমে পানির পাহাড়গুলি একে অপরের সঙ্গে মিলে গেল।

৩. অর্থাৎ যখন অধিকাংশ লোক সত্য গ্রহণ করল না, তখন আল্লাহ এ নিদর্শন দেখালেন, যার দ্বারা দুনিয়াতেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম প্রকাশ পেয়ে গেল।

৪. এখানে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার ফেরাওনরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে। তারপর নিজ ভূমির বাইরে 'বদরের প্রান্তরে' ধ্বংস হবে, যেমন ফেরাওন ধ্বংস হয়েছিল। (موضح القرآن)

৭০. যখন তিনি স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর[১]?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭১. ওরা বলল, 'আমরা মূর্তি-প্রতিমার উপাসনা করি এবং ওদেরই নিকট স্থির বসে থাকি*[২]।'

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۝

৭২. তিনি বললেন, 'এরা কি তোমাদের (ডাক) শোনে যখন তোমরা (তাদের) ডাক[৩]?'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

৭৩. 'অথবা তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে[৪]?'

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭৪. ওরা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এমনই করতে দেখেছি[৫]।'

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

৭৫. তিনি বললেন, 'তোমরা জান কি, যাদের উপাসনা করছ'–

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

৭৬. 'তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা[৬]—

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ এ জিনিসটা কী, তোমরা যার পূজা কর?

* দ্বিতীয় তরজমা– 'তাদেরই (ইবাদতে) রত থাকি'।

২. অর্থাৎ তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে জান না যে, এরূপ অবজ্ঞার সাথে প্রশ্ন করছ? আমরা এই মূর্তিগুলির পূজা করি এবং এদের প্রতি আমাদের এতই শ্রদ্ধা-ভক্তি যে, সারা দিন ভর আমরা এদেরই নিকট বসে থাকি।

৩. অর্থাৎ এত ডাকার পরও কি ওরা তোমাদের কথা শোনে? যদি না শোনে, তবে ডাকাটা নিরর্থক।

৪. অর্থাৎ পূজা-অর্চনা করলে তোমাদের কোন উপকার আর পূজা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারে কি? বলা বাহুল্য, যারা নিজেদের উপর থেকে মাছি পর্যন্ত তাড়াতে পারে না, তারা অন্যদের লাভ-ক্ষতি কীভাবে করবে? সুতরাং এরূপ অক্ষম ও জড় পদার্থকে উপাস্য বানানো কোন বুদ্ধির কাজ?

৫. অর্থাৎ এসব দার্শনিক যুক্তি ও বক্র তর্কবিতর্ক বুঝি না। তাছাড়া আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস ও উপাসনার ভিত্তিও এসব বিষয়ের উপর নয়। বস্তুত একটি প্রমাণই শত প্রমাণের শক্তি রাখে। তা এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এরূপ করে এসেছেন। এখন আমরা কি তাদের সকলকে নির্বোধ মনে করব? কিছুতেই না।

৬. অর্থাৎ এদের পূজা করা একটা প্রাচীন বিকার! নতুবা সামান্যতম লাভ-লোকসানের সামর্থ্য যার নেই, তার উপাসনা করা হয় কোন যুক্তিতে?

৭৭. 'তারা (সকলে) আমার শত্রু*১? বিশ্বজগতের রব ব্যতীত২–

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

৭৮. 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন৩।

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ

৭৯. 'এবং যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান,

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ

৮০. 'এবং আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

☆ দ্বিতীয় তরজমা–'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, কাদের উপাসনা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা করছ? (মনে রেখো), তারা (সকলে) আমার শত্রু'।

১. অর্থাৎ শুনে রাখ! আমি নির্ভয়ে ঘোষণা করছি, এই উপাস্যদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই। আমি এদের বারটা বাঁজিয়ে ছাড়ব। وَتَاللّٰهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِيْنَ (আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মূর্তিগুলো (ধ্বংস করার) জোর চেষ্টা চালাব, যখন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে। –সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৫৭)। এদের মধ্যে কোন শক্তি থাকলে আমার ক্ষতি করে দেখাক, যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّيْ شَيْئًا (আমি তাদের ভয় করি না, তোমরা যাদেরকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর। তবে আমার রবই (কোন কষ্ট দিতে) চাইলে ভিন্ন কথা। –সূরা আন'আম, আয়াত ৮০)। —নূহ আলাইহিস সালাম এমন ক্ষেত্রে বলেছেন- فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ {এখন তোমরা (সকলে মিলে) তোমাদের কর্ম-কৌশল স্থির করে নাও এবং তোমাদের শরীকদেরও সমবেত করে নাও। –সূরা ইউনুস, আয়াত ৭১} —আর হূদ (আ) বলেছেন : فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون (অতএব তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। –সূরা হূদ, আয়াত ৫৫)

আর কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এখানে ইবরাহীম আঃ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলছেন— তোমরা যাদের উপাসনা করছ, আমি তাদের নিজ দুশমন মনে করি। আমি যদি তাদের উপাসনা করি, তবে আমার শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। এ থেকেই বুঝে নাও, তোমরা তাদের উপাসনা করে নিজেদের কেবল ক্ষতি করছ।

২. কারণ, তিনিই আমার মা'বূদ, বন্ধু ও সাহায্যকারী।

৩. অর্থাৎ তিনি ইহ ও পরকালের সফলতার রাস্তা দেখান এবং সর্বোচ্চস্তরের কল্যাণ ও লাভালাভের পথ নির্দেশ করেন।

৮১. 'আর যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন। তার পর আবার আমাকে জীবিত করবেন[১]।

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝

৮২. 'এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, (শেষ) বিচারের দিন তিনি আমার ত্রুটি ক্ষমা করবেন[২]।

وَالَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

৮৩. 'হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন[৩]।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ۝

৮৪. 'আর আমাকে দান করুন পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি[৪]।

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

---

১. অর্থাৎ পানাহার করানো, জীবন-মৃত্যু দেওয়া ও আরোগ্য দান করা– সবই তাঁর ক্ষমতাধীন।

২. অর্থাৎ কোন বিষয়ে ভুলচুক বা তাঁর মর্যাদানুপাতিক ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহরই মেহেরবানীতে ক্ষমার আশা করা যায়, অন্য কেউ ক্ষমা করার নেই।

অতঃপর ইবরাহীম আ. আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা, গুণাবলি ও দয়া-মায়ার কথা বলতে বলতে ও তাঁর স্মরণের প্রাবল্যে দো'য়া শুরু করে দেন। বস্তুত এ পরম দাসত্বেরই পরিচায়ক। (সামনের আয়াতগুলিতে রয়েছে এ দোয়া'রই বর্ণনা)।

৩. অর্থাৎ আমাকে আরো ইলম, হেকমত এবং নৈকট্য ও মকবুলিয়ত দান করুন এবং সর্বোচ্চস্তরের পুণ্যবানদের দলে (অর্থাৎ নবী-রাসূলদের জামাতে) শামিল করুন, যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اللَّهُمَّ فِي الرفيق الأعلى। (বুখারী, ৪৪৩৭)

এ দো'য়া দ্বারা নিজের মুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করাই ইবরাহীম আ. এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবী হোন বা ওলী হোন, আল্লাহ তাআলা কারো ব্যাপারে দায়বদ্ধ ও বাধ্য নন, বরং তাঁরই দয়া ও কৃপার উপর সকলকে সর্বদা নির্ভর করতে হয়।

৪. অর্থাৎ আমাকে অতি সন্তোষজনক কীর্তি ও অনুপম আদর্শ রেখে যাওয়ার তাওফীক দিন, যেন পরবর্তী বংশধরেরা সর্বদা আমার সুখ্যাতি করে এবং আমার পথে চলতে আগ্রহী হয়। — অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, আখেরী যমানায় যেন আমার বংশধরদের থেকে নবী ও উম্মত আবির্ভূত হয় এবং তারা আমার দীন-শরীয়তকে পুনর্জীবিত করে।

বস্তুত তা-ই হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতে সকলের মধ্যে মকবূলিয়ত দান করলেন এবং তাঁর বংশ থেকে সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন, যিনি ইবরাহীমের মিল্লাতকে সঞ্জীবিত করেন। নবীজি সা. বলেছেন, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দো'য়ার ফসল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২৬১) আজো ইবরাহীম (আ)-এর সুনাম-সুখ্যাতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের মুখে মুখে রয়েছে এবং

৮৫. 'এবং আমাকে নে'য়ামতের বাগানের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন[১]।	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝
৮৬. 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন*[২]।	وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝
৮৭. এবং আমাকে সেদিন লাঞ্ছিত করবেন না, যেদিন সকল মানুষ পুনর্জীবিত হবে–	وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝
৮৮. 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে আসবে না।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝
৮৯. 'তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কলুষ- মুক্ত অন্তর নিয়ে আসবে, (সে-ই সফল হবে)[৩]।'	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

উম্মতে মুহাম্মদিয়া তো প্রত্যেক নামাযে- كما صليت على إبراهيم এবং كما باركت على إبراهيم পড়ে থাকে।

১. অর্থাৎ জান্নাতের ওয়ারিসদের (তথা অধিকারীদের) অন্তর্ভুক্ত করুন, যা আদম (আ)-এর মীরাস।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'তিনি তো পথহারাদের দলভুক্ত'।

২. তরজমা থেকে বোঝা যায়, এ দো'য়া পিতার মৃত্যুর পরে করেছিলেন। এতে প্রশ্ন হয় যে, ক্ষমার দোয়া কীভাবে করলেন? উত্তর হল– অন্যত্র স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, পিতাকে আল্লাহর দুশমন বলে জানতে পারার পর ইবরাহীম (আ) অসন্তুষ্টি ও তার থেকে দায়মুক্তি প্রকাশ করলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (আর ইবরাহীমের আপন পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাটা ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেলেন। –সূরা তওবা, আয়াত ১১৪)

আর যদি كان এর তরজমা 'ছিল' এর স্থলে 'আছে' দ্বারা করা হয়, তবে কোন প্রশ্ন হবে না। কেননা, জীবদ্দশায় ঈমান আনার সম্ভাবনা ছিল। অতএব দো'য়ার অর্থ এই যে, আয় আল্লাহ! তাকে ঈমানের সৌভাগ্যে ভূষিত করুন এবং কাফের অবস্থার গোনাহ-খাতা মাফ করে দিন।

এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। (সূরা তওবা, আয়াত ১১৩-১১৫ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৩. অর্থাৎ কুফর, নেফাক ও ভুল আকীদা-বিশ্বাস থেকে পবিত্র, সুস্থ ও কলুষ-মুক্ত অন্তরই সেখানে উপকারে আসবে। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে লাগবে না। কাফেররা

৯০. আর জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে,	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ۝
৯১. এবং জাহান্নামকে বিপথগামীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে[১]।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۙ۝
৯২. আর ওদের বলা হবে, 'তারা কোথায়, যাদের উপাসনা তোমরা করতে —	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ۝
৯৩. 'আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, অথবা প্রতিশোধ নিতে পারবে*[২]?'	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۭ۝
৯৪. অতঃপর তাদের ও পথভ্রষ্টদের অধোমুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۙ۝
৯৫. এবং ইবলীসের সকল বাহিনীগুলিকেও।	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۭ۝
৯৬. ওরা সেখানে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করত (নিজেদের উপাস্যদের) বলবে,	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۙ۝
৯৭. 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমরা ছিলাম প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে,	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ۝
৯৮. 'যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম।	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিকে মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে রেহাই পেতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। আর দুনিয়ার দান-খয়রাত ও নেক সন্তানাদি দ্বারা কিছু লাভের আশা তখনি করা যায়, যখন নিজ অন্তর কুফরের অপবিত্রতা থেকে পাক-ছাফ হবে। মোট কথা, আখিরাতে নাজাত লাভের প্রধান শর্ত– পবিত্র অন্তর নিয়ে হাজির হওয়া।

১. অর্থাৎ হাশরের মাঠে মুত্তাকীরা জান্নাতকে তার অশেষ আরাম-আয়েশ ও শোভা-সৌন্দর্যসহ নিকটে দেখতে পাবে এবং তা দেখে প্রবেশের পূর্বেই খুশী ও আনন্দিত হবে। অনুরূপ, দোযখকে পাপীদের কাছে আনা হবে। ফলে তাতে প্রবেশের পূর্বেই ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'নিজেদের রক্ষা করতে পারবে'?

২. অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া উপাস্যরা কোথায় গেল ? তারা এখন না তোমাদের সাহায্য করে এ আযাব থেকে তোমাদের মুক্ত করতে পারবে, না (তোমাদের পক্ষে) প্রতিশোধ নিতে পারবে, বরং স্বয়ং নিজেদেরও সাহায্য করতে পারবে না।

৯৯. 'আর আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল (এই) অপরাধীরাই ।

وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۝

১০০. 'ফলে (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই,

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۝

১০১. 'এবং নেই কোন সুহৃদ বন্ধুও[১]।

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝

১০২. 'হায়! আমরা যদি (দুনিয়াতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম! তা হলে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[২]।'

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

১০৩. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়[৩]।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

---

১. অর্থাৎ মূর্তি, মূর্তিপূজারী ও ইবলীসের সমস্ত দলবল— সকলকে অধোমুখ করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পর ঝগড়া করবে, একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং পরিশেষে নিজেদের গোমরাহী স্বীকার করে বলবে, সত্যিই আমরা গুরুতর অন্যায় করেছি। কারণ, আমরা তোমাদের (অর্থাৎ মূর্তিদের, বা অন্য যাদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছিল, তাদের) রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ করে দিয়েছিলাম। কী আর বলব! এ বড় শয়তানেরাই আমাদের দ্বারা এহেন গোমরাহীর কাজ করিয়েছে।

এখন আমরা এ মুসিবতে পড়েছি। কোন মূর্তিও কাজে আসছে না, কোন শয়তানও সাহায্য করছে না। ওরা নিজেরাই তো দোযখের খোরাকে পরিণত হচ্ছে। এতটুকুও হচ্ছে না যে, খোদার নিকট কেউ আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবে, অথবা কমপক্ষে এই বিপদমুহূর্তে বন্ধুরূপে একটু সহানুভূতিই প্রকাশ করবে। সত্যই— الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (বন্ধুরা সেদিন একে অন্যের শত্রু হবে, খোদাভীরুগণ ছাড়া। –সূরা যুখরুফ, রুকূ ৬, আয়াত ৬৭)

২. অর্থাৎ যদি একটি বারের জন্যও আমাদের দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সেখান থেকে পাক্কা ঈমানদার হয়ে আসব।— কিন্তু ওদের এ কথাও মিথ্যা– وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (আর যদি ওদের আবারো পাঠানো হয়, তবে নিশ্চয় আবারো সেই কাজই করবে, যা করতে ওদের নিষেধ করা হয়েছিল। বস্তুত ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। –সূরা আন'আম, রুকূ ৩, আয়াত ২৮)

৩. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)–এর উল্লিখিত কাহিনীর মধ্যে তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া এতে মুশরিকদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণামও দেখানো হয়েছে। কিন্তু লোকেরা মানে কোথায়?

১০৪. আর আপনার রব— নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

[রুকূ - ৬]

১০৫. নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছিল—	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِالْمُرْسَلِيْنَ
১০৬. যখন ওদের ভাই নূহ ওদের বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ
১০৭. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ
১০৮. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর[১]।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ
১০৯. 'আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো বিশ্বজগতের রবের যিম্মায়ই।	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
১১০. 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর[২]।'	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ
১১১. ওরা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ হীন লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে[৩]?'	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ
১১২. তিনি বললেন, 'তারা যা করে সে সম্পর্কে আমার জানার কী আছে?	قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

১. অর্থাৎ আমি পরম সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ তাআলার পয়গাম হুবহু তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহর পয়গাম পেয়ে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং আমার কথা মান্য করা কর্তব্য।

২. অর্থাৎ এমন একজন নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ মানুষের কথা মান্য করা তোমাদের কর্তব্য।

৩. অর্থাৎ কিছু সংখ্যক হীন ও নিম্ন শ্রেণীর লোক অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার ভক্ত হয়েছে। এরা আবার কী উঁচু কাজ করবে? আর আমরা মর্যাদাবানরাই বা কী করে এসব দীন-হীন লোকদের সাথে আপনার দরবারে বসতে পারি? প্রথমে আপনি এদেরকে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দিন। তারপর আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।

১১৩. 'তাদের হিসাব নেওয়া আমার রবেরই কাজ, যদি তোমরা বোঝ।

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ۝

১১৪. 'আর আমি ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না[1]।

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৫. 'আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী[2]।'

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

১১৬. ওরা বলল, 'হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে[3]।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

১১৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করেছে।

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝

১১৮. 'অতএব আমার ও ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে দিন[4] এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যে মুমিনরা আছে তাদের রক্ষা করুন[5]।'

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১১৯. সুতরাং আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা বোঝাই নৌযানে ছিল, তাদের রক্ষা করলাম।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝

---

১. অর্থাৎ আমার নিকট মূল্যবান হচ্ছে তাদের সততা ও ঈমান। তাদের পেশা কী, (অন্তরের) নিয়ত এবং অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম কেমন, এসব জানার কী প্রয়োজন? এর হিসাব তো আল্লাহ তাআলার যিম্মায়। অতএব তোমাদের খাতিরে গরীব ঈমানদারদের আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

২. অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া। তা করেছি। তোমাদের অনর্থক-অযৌক্তিক ফরমায়েশ পূর্ণ করা আমার কাজ নয়।

৩. অর্থাৎ আমাদের নসীহত করতে হবে না। আপনি এ থেকে ক্ষান্ত না হলে আপনাকে পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলা হবে।

৪. অর্থাৎ আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিন। এদের সুপথে আসার আর আশা নেই।

৫. অর্থাৎ আমাকে ও আমার সঙ্গী-সাথীদের পৃথক করে নিন, আর ওদের ধ্বংস করে দিন।

১২০. তারপর অবশিষ্টদের ডুবিয়ে দিলাম[১]।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۟

১২১. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۟

১২২. আর আপনার রব— নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۟

[রুকূ - ৭]

১২৩. 'আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছিল—

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ۟ۚ

১২৪. যখন ওদের ভাই হূদ ওদের বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۟ۚ

১২৫. 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۟ۙ

১২৬. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۟ۚ

১২৭. 'আর আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন বিনিময় চাই না। আমার বিনিময় তো বিশ্বজগতের রবেরই যিম্মায়।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟ؕ

১২৮. 'তোমরা কি অনর্থক কাজ করত প্রতিটি উঁচু ভূমিতে নির্মাণ করছ স্মৃতি-স্তম্ভ?

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۟ۙ

১২৯. 'আর নির্মাণ করছ কারুকার্যখচিত প্রাসাদসমূহ। যেন তোমরা চিরকাল থাকবে[২]!

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۟ۚ

---

১. এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে (যেমন, সূরা হূদ : ৩৭-৪৪) গত হয়েছে।

২. কোন প্রয়োজনে নয়; বরং নিছক নামের জন্য সুউচ্চ, পরিপক্ক সৌধ নির্মাণ করার শখ ওদের ছিল। আর ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে বাসস্থান হিসাবে খুব ঘটা করে দালান-কোঠাও তৈরি করত। এসব নির্মাণ কাজে ওরা খুবই শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হত, ওরা যেন চিরকাল এখানেই থাকবে এবং এই স্মৃতিসৌধ ও প্রাসাদসমূহ কোন দিন ধ্বংস হবে না। (অথচ আজ ওগুলোর ধ্বংসাবশেষও অবশিষ্ট নেই।)

১৩০. 'আর তোমরা যখন (কাউকে) আঘাত কর, তখন চরম অত্যাচারীরূপে আঘাত কর।	وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝
১৩১. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর[১]।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝
১৩২. 'এবং তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সেসব বস্তু দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা জান।	وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝
১৩৩. 'তোমাদের সাহায্য করেছেন— গবাদি পশু ও পুত্রসন্তানাদি দিয়ে,	اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۝
১৩৪. 'এবং উদ্যানসমূহ ও ঝরনারাজি দ্বারা।	وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝
১৩৫. 'আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক গুরুতর দিবসের শাস্তির ভয় করি[২]।'	اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
১৩৬. ওরা বলল, 'তুমি নসীহত কর বা না-ই কর, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।	قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝
১৩৭. 'এ পূর্ববর্তীদের স্বভাব ছাড়া আর কিছু নয়।	اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
১৩৮. 'আমরা আদৌ শাস্তিপ্রাপ্ত হব না[৩]।'	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ তোমরা অধীনস্থদের ও দুর্বলদের জুলুম-অত্যাচার করে অতিষ্ঠ করে রেখেছ। মনে হয়, ন্যায়বিচার ও নম্রতা বলে তোমরা কিছু শিখনি। আল্লাহর দুর্বল বান্দাদের তোমরা নিষ্ঠুরতার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত করছ। এমন করো না। আল্লাহকে ভয় কর, জুলুম ও অহংকার পরিহার কর এবং আমার কথা মান।

২. অর্থাৎ এতটুকু চিন্তা কর যে, এসব উপায়-উপকরণ তোমাদের কে দিয়েছেন? তোমাদের উপর কি সেই প্রকৃত অনুগ্রহকারীর কোনই হক ও অধিকার নেই? তোমরা যদি এমন দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতাই করতে থাক, তবে আমার আশঙ্কা, তোমাদের উপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় কোন কঠিন বিপদ আপতিত হয় কিনা। শোন! আমি তোমাদের সবরকম নসীহত করেছি। এখন নিজ পরিণাম ভাল করে ভেবে দেখ।

৩. অর্থাৎ আপনার নসীহত অহেতুক। এসব দ্বারা আমাদের উপর কোনই প্রভাব পড়বে না। পূর্বকাল থেকে এ নিয়ম চলে এসেছে যে, কিছু লোক নবী সেজে আযাবের ভয় দেখায়। আর জীবন-মৃত্যুর ধারাও পূর্ব থেকে চলে এসেছে। সুতরাং এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? আর আমরা যে তরীকায় আছি, তা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিল। আমরা কিছুতেই তা ছাড়তে পারি না। আযাবের ভয়-ভীতিরও আমরা পরোয়া করি না।

১৩৯. মোটকথা, ওরা তাঁকে অস্বীকার করল, ফলে আমি ওদের ধ্বংস করে দিলাম[১]। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٣٩
১৪০. আর নিশ্চয় আপনার রবই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝١٤٠

[রুকূ - ৮]

১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছিল—	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٤١
১৪২. যখন ওদের ভাই সালেহ ওদের বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٤٢
১৪৩. 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٤٣
১৪৪. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٤٤
১৪৫. 'আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো বিশ্বজগতের রবেরই যিম্মায়।	وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٤٥
১৪৬. 'তোমাদের কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে এখানকার বস্তুরাজিতে–	اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ۝١٤٦
১৪৭. 'উদ্যানসমূহে ও ঝরনারাজিতে,	فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٤٧
১৪৮. 'এবং খেত-খামার ও কোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে?	وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۝١٤٨

---

১. অর্থাৎ প্রবল তুফান পাঠিয়ে এদের ধ্বংস করে দিলাম।

এদের কাহিনীও ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফ (আয়াত ৬৫-৭২) প্রভৃতিতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৪৯. 'আর তোমরা পাহাড়-পর্বত কেটে নিপুনভাবে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছ।

وَتَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا فٰرِهِیۡنَ ﴿۱۴۹﴾

১৫০. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর[১]।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾

১৫১. 'আর সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না—

وَلَا تُطِیۡعُوۡۤا اَمۡرَ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫২. 'যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সংশোধন করে না[২]।'

الَّذِیۡنَ یُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا یُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۲﴾

১৫৩. ওরা বলল, 'তুমি তো একজন কঠিন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِیۡنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৪. 'তুমি আর কিছু নও, আমাদের মতই একজন মানুষ[৩]। অতএব কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও[৪]।'

مَاۤ اَنۡتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۚۖ فَاۡتِ بِاٰیَۃٍ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۱۵۴﴾

---

১. অর্থাৎ তোমাদের কি এই ধারণা যে, চিরকাল এই আরাম-আয়েশ ও বাগ-বাগিচার স্বাদ উপভোগ করবে এবং পাহাড় কেটে যে আড়ম্বরপূর্ণ বাসস্থান তৈরি করেছ তা থেকে কখনো বের হবে না? অথবা এই পাকা ও মজবুত অট্টালিকাগুলো কি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দেবে? কখনই না। এসব অলীক কল্পনা মন থেকে বের করে দাও এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত হয়ে আমার কথা মান। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি।

২. এ কথা তিনি সাধারণ লোকজনকে বলেছেন। অর্থাৎ, তোমরা এই বড় বড় ফাসাদকারী শয়তানদের অনুসরন করে ধ্বংস হয়ো না। এরা তো পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় প্রসারকারী, সংশোধনকারী ও সৎপরামর্শদানকারী নয়।

৩. অর্থাৎ আমাদের চেয়ে আপনার মধ্যে এমন বেশি কী আছে যে, আপনি নবী হয়ে গেলেন? মনে হয়, আপনাকে কেউ যাদু করেছে, যার ফলে আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

৪. অর্থাৎ আপনি যদি নবী হন এবং আমাদের চেয়ে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন, তবে আল্লাহকে বলে এমন কোন নিদর্শন দেখান, যা আমরাও স্বীকার করে নেব।

অতঃপর ওরা ফরমায়েশ করল, এই বিরাট পাথরখণ্ডটি থেকে একটি উটনী বের করে দিন, যা এমন এমন গুণবিশিষ্ট হবে। হযরত সালেহ (আ) দো'য়া করলেন, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে উক্ত নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন।

১৫৫. তিনি বললেন, '(নাও) এই যে এক উটনী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা[১]।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

১৫৬. 'আর তোমরা একে মন্দভাবে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক গুরুতর দিবসের শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে[২]।'

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৫৭. অতঃপর ওরা উটনীর পাগুলি কেটে ফেলল। তারপর ওরা অনুতপ্ত হল[৩]।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۝

১৫৮. অতঃপর আযাব ওদের পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৫৯. আর নিশ্চয় আপনার রবই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

[রুকূ - ৯]

১৬০. লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছিল—

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ۣالْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৬১. যখন ওদের ভাই লূত ওদের বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "আল্লাহর কুদরতে পাথর থেকে উটনী পয়দা হল, হযরত সালেহ (আ)-এর দো'য়ায়। তা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত। যে মাঠে সে চরতে বা যে পুকুরে পানি পান করতে যেত, অন্যসব চতুষ্পদ জন্তু ভয়ে পলায়ন করত। তাই তিনি স্থির করে দিলেন যে, একদিন এ উটনী এবং অন্যদিন ওদের পশু পানির ঘাটে যাবে।"

২. অর্থাৎ উটনীর সাথে অশুভ আচরণ করো না। নতুবা অতি কঠিন বিপদে পতিত হতে হবে।

৩. এক ব্যভিচারিনীর অনেক পশুপাল ছিল। উটনীর কারণে তার ঘাস ও পানির কষ্ট হচ্ছিল। সে নিজের এক অবৈধ প্রণয়ীকে উত্তেজিত করল। সেই লোক উটনীর পা কেটে তাকে মেরে ফেলল। এর তিনদিন পর আযাব আসল (মূযেহুল কুরআন)।

এ কাহিনীও পূর্বে বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে।

১৬২. 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১৬৩. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১৬৪. 'আর আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো বিশ্বজগতের রবের যিম্মায়ই।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৬৫. 'তোমরা কি বিশ্বজগতের পুরুষদেরই কাছে গমন কর*১?

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

১৬৬. 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের বর্জন কর? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়২।'

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

১৬৭. ওরা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও, তবে তোমাকে অবশ্যই বের করে দেওয়া হবে৩।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

১৬৮. তিনি বললেন, 'আমি তো তোমাদের কাজের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট৪।

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'বিশ্ববাসীর মধ্যে তোমরাই পুরুষদের নিকট গমন কর'। অথবা : বিশ্ববাসীর মধ্যে শুধু তোমরাই কি পুরুষদের নিকট গমন কর না?'

১. অর্থাৎ সারা দুনিয়াতে পুরুষরাই কি তোমাদের যৌন সম্ভোগের জন্য রয়ে গেল? অথবা অর্থ এই যে, সারা দুনিয়াতে কেবল তোমরাই কি এ ঘৃণ্য কাজ করছ না?

২. অর্থাৎ এই স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা থেকেও বের হয়ে গেছ।

৩. অর্থাৎ এই ওয়াজ ছাড়ুন। ভবিষ্যতে আমাদের বিরক্ত করলে আপনাকে লোকালয় থেকে বের করে দেব।

৪. তাই আমি এই কুকর্মের প্রতি অবশ্যই ঘৃণা প্রকাশ করে যাব এবং নসীহত করা থেকে বিরত হতে পারব না।

১৬৯. (অতঃপর তিনি দো'য়া করলেন): 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে ওরা যা করছে তা থেকে রক্ষা করুন[১]।'	رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. অতএব আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনের সকলকে রক্ষা করলাম—	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে (রয়ে গেল)[২]।	اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾
১৭২. অতঃপর আমি অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম।	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আমি ওদের উপর বর্ষণ করলাম এক বিশেষ বৃষ্টি। আর কত মন্দ ছিল যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের বৃষ্টি[৩]।	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. আর আপনার রব— নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

[রুকূ - ১০]

১৭৬. 'আয়কা'ওয়ালারা পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছিল[৪]—	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾

১. অর্থাৎ ওদের পাপাচার ও এর শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং ওদের ধ্বংস করুন।

২. এ ছিল তাঁর স্ত্রী। সে ঐ বদমাশগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখত। যখন আযাব এল, তখন সেও ধ্বংস হল।

৩. অর্থাৎ ওদের লোকালয় উলটিয়ে দিলাম এবং আসমান থেকে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ফলে ওরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। —এদের কাহিনীও বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফ (আয়াত ৮০-৮৪) প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

৪. তাফসীরবিশারদ ইবনে কাছীর লিখেছেন, 'আসহাবে আয়কা' বলতে মাদ্য়ান বাসীরাই উদ্দেশ্য (যাদের অন্যত্র 'আসহাবুল মাদয়ান' বলা হয়েছে)। 'আয়কা' একটি বৃক্ষ, তারা এর পূজা করত। এ কারণেই তাদের 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়েছে।

১৭৭. যখন শু'আয়ব ওদের বলেছিলেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?	اِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ
১৭৮. 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	اِنِّیۡ لَكُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ
১৭৯. 'অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর।	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ
১৮০. 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন বিনিময় চাই না; আমার বিনিময় তো বিশ্বজগতের রবের যিম্মায়ই।	وَ مَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ
১৮১. 'তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং ঠগদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।	اَوۡفُوا الۡكَیۡلَ وَ لَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِیۡنَ
১৮২. 'এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর[১]।	وَ زِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِیۡمِ
১৮৩. 'আর লোকদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্য কম দিয়ো না এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না[২]।	وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَهُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ
১৮৪. 'এবং তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদের ও পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টি করেছেন।'	وَ اتَّقُوا الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ وَ الۡجِبِلَّۃَ الۡاَوَّلِیۡنَ

আর তাদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' শব্দে উল্লেখ করায় এস্থলে শু'আয়ব (আ) কে 'أخوهم' বলে আখ্যায়িত করা হয়নি (বরং শুধু–قال شعيب বলা হয়েছে)। কেননা, নবীদের ভ্রাতৃত্ব শুধু জাতীয়তা ও বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে ছিল, ধর্মীয় দিক থেকে ছিল না। সুতরাং তাদের 'আসহাবে মাদ্‌য়ান' বলা হলে أخوهم বলা সংগত হত। যেহেতু 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়েছে, যা একটি ধর্মীয় সম্পর্ক নির্দেশ করে, এ জন্য এস্থলে হযরত শু'আয়বকে أخوهم (অর্থাৎ ওদের ভাই) বলা তাঁর মর্যাদার উপযোগী ছিল না।

যা হোক, 'আসহাবে মাদয়ান' ও 'আসহাবে আয়কা' একই জাতি। শু'আয়ব (আ) এ জাতির প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। পূর্বেও (আ'রাফ : ৮৫) এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে।

১. অর্থাৎ লেনদেনে খেয়ানত (অসাধুতা) ও বেইনসাফী করো না। বরং নেওয়ার সময় যেমন পূর্ণ মাত্রায় মেপে নাও, তদ্রূপ দেওয়ার সময়েও পূর্ণ মাত্রায় মেপে দাও।

২. অর্থাৎ দেশে লুটতরাজ করো না এবং মানুষের হক নষ্ট করো না।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. ওরা বলল, 'তুমি তো একজন কঠিন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. 'এবং তুমি আর কিছু নও, আমাদেরই মত একজন মানুষ। আর আমাদের ধারণায় তুমি অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী[১]।

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. 'তুমি আমাদের উপর আকাশের কোন খণ্ড ফেলে দাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও[২]।'

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. তিনি বললেন, 'তোমরা যা কিছু করছ তা আমার রব উত্তমরূপে জানেন[৩]।'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. মোটকথা, ওরা তাঁকে অস্বীকার করল। ফলে ওদের পাকড়াও করল চাঁদোয়া-দিবসের শাস্তি। নিশ্চয় তা ছিল এক গুরুতর দিবসের শাস্তি[৪]।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু ওদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

১৯১. আর নিশ্চয় আপনার রবই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

১. অর্থাৎ নবুওয়াতের দাবিতে এবং আযাব প্রভৃতির যে ভয় দেখাচ্ছেন তাতে আপনি মিথ্যাবাদী।

২. অর্থাৎ আপনি সত্যবাদী হলে আকাশ বা মেঘের খণ্ডবিশেষের পতন ঘটিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেন না কেন?

৩. অর্থাৎ তিনিই জানেন, কোন্ অপরাধে, কখন, কী পরিমাণ শাস্তি পাওয়া উচিত। শাস্তি প্রদান করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ ছিল সতর্ক করে দেওয়া, তা করেছি।

৪. অর্থাৎ ওদের উপর চাঁদোয়ার মত মেঘ নেমে এল এবং তা থেকে অগ্নিবর্ষণ হল। তাছাড়া পায়ের নীচের ভূমি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল, এর সাথে অতি ভয়ঙ্কর গর্জন হল। ফলে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

এদের ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে (আ'রাফ : ৮৫-৯৩) গত হয়েছে, সেখানকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[রুকূ - ১১]

১৯২. নিশ্চয়ই তা (কুরআন) বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।	وَاِنَّهٗ لَتَنۡزِيۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
১৯৩. তা নিয়ে অবতরণ করেছেন 'রূহ' (জিবরাঈল আ.), যিনি অতি বিশ্বস্ত—	نَزَلَ بِهِ الرُّوۡحُ الۡاَمِيۡنُ
১৯৪. আপনার অন্তরের উপর, যাতে আপনি একজন সতর্ককারী হন[১];	عَلٰى قَلۡبِكَ لِتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِيۡنَ

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

সূরার সূচনায় (আয়াত ২-৬) মহান কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং একে না মানলে শাস্তির ধমকি প্রদান করা হয়েছিল। মাঝে যুগে-যুগে সত্যকে অস্বীকারকারীদের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়। এখান থেকে আবার পূর্বের বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ-মর্ম

বলা হয়েছে, কুরআন কারীম এমন এক বরকতময় ও মহামর্যাদাশালী কিতাব, যা নিখিল বিশ্বের প্রভু অবতীর্ণ করেছেন। জিবরাঈল আমীন (আ) তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং আপনার নির্মল ও পবিত্র অন্তরে তা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহর জ্ঞানে আপনার মহান অন্তরই ছিল এ ভারী আমানতকে ধারণ ও বহন করার জন্য উপযুক্ত। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ ওহী কুরআনের আগমন হল এবং আপনার অন্তরে তা অবতীর্ণ হতে থাকল। আপনি তা সর্বান্তকরণে শুনলেন, বুঝলেন ও সংরক্ষণ করলেন।

নবীজির (সা.) উপর ওহী অবতরণের হাল-অবস্থা

ওহী অবতরণের দুটি উপায়ের কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে (অর্থাৎ কখনো صلصلة الجرس বা অবিরাম টুন্ টুন্ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আসা এবং কখনো মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতার সামনে এসে কথা বলা) [বুখারী হাদীস ২] । على قلبك -শব্দাবলি দ্বারা সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দুটির মধ্যে প্রথম উপায়েই অধিকাংশ সময় কুরআনের ওহী আগমন করত।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ মনীষীদের মতে উল্লিখিত দুই অবস্থার মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, প্রথমাবস্থায় পয়গম্বরকে মানব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ফেরেশতা-প্রকৃতির নিকটবর্তী হতে হত। তখন তিনি যেন দৈহিক শক্তিসমূহ (বা প্রকৃতিনিচয়)-কে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে একমাত্র রূহানী শক্তিগুলি ও আত্মিক অনুভূতিগুলি দ্বারা কাজ নিতেন– অন্তকরণে ওহীর শব্দ শুনতেন, অন্তর্চোখে ফেরেশতাকে দেখতেন এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ দ্বারা উক্ত ইলমরাজি শিখতেন ও সংরক্ষণ করতেন।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় অবস্থায় ফেরেশতাকে স্বীয় আসল প্রকৃতি থেকে নেমে মানব-প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে হত। তখন পয়গম্বর (সা) এ চর্মচোখেই ফেরেশতাকে দেখতেন এবং এ দৈহিক কানেই (তাঁর) আওয়াজ শুনতেন।

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়[১]। بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

১৯৬. আর নিশ্চয়ই তা পূর্ববর্তীদের কিতাবেও আছে*[২]। وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ

১৯৭. ওদের জন্য কি এটি স্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরা তার ব্যাপারে অবগত আছে[৩]? اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِيْلَ

এ জন্যই হাদীসসমূহে ওহীর প্রথম অবস্থার ব্যাপারে هو أشده علي (তা আমার উপর অত্যন্ত কঠিন ও ভারী হয়ে থাকে) বলা হয়েছে। কারণ, তাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব-প্রকৃতি থেকে ফেরেশতা-প্রকৃতির দিকে অধিরোহন করতে হত। (আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।)

১. অর্থাৎ কুরআনের অবতারণ হয়েছে অত্যন্ত অলঙ্কারসমৃদ্ধ, সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়। এতে বোঝা গেল, على قلبك এর অর্থ এটা নয় যে, শুধু কুরআনের বিষয়াবলি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারপর তিনি সেসব বিষয় নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বরং শব্দাবলি ও বিষয়াবলি (অর্থাৎ ভাষা ও ভাব) উভয়ই আল্লাহর ওহী দ্বারা হুযূরের অন্তর মুবারকে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও তার উল্লেখ রয়েছে।'

২. অর্থাৎ কুরআনের এবং এর আনয়নকারী অর্থাৎ নবীজির সংবাদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বদা এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তাই, বহু বিকৃতি ও পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো এ জাতীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী সেসব কিতাবে পাওয়া যায়।

আর (আয়াতের) অর্থ এও হতে পারে যে, কুরআনের অধিকাংশ বিষয় সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত উপকারী ঘটনাবলি, তাওহীদ, রিসালাত, পুনর্জীবন প্রভৃতি বিষয়। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয়ে সকল আসমানী কিতাব এবং নবী-রাসূলের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা ভালোভাবে জানে যে, এ-ই সেই কিতাব এবং ইনিই সেই নবী, যাদের সংবাদ পূর্বেই আসমানী কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছিল। সে মত তাদের অনেকে প্রকাশ্যে এবং অনেকে নিজেদের গোপন বৈঠকে এই সত্যের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। আর কিছু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ বিষয় জানা থাকার কারণেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন– যথা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ।

মোটকথা, অন্তরে সত্যের আকর্ষণ ও আল্লাহর ভয় আছে- এমন ন্যায়পরায়ণ বুঝমান ব্যক্তির নিকট কুরআনের সত্যতার বড় এক প্রমাণ এই যে, অন্যান্য ধর্মের আলেমরা নিজেদের অন্তরে কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করে থাকে, যদিও কোন কারণে অনেক সময় প্রকাশ্যে এর স্বীকারোক্তির সাহস করে না।

১৯৮. আমি যদি তা কোন অনারব ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম,

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. এবং সে তা ওদের পড়ে শোনাত— তবু ওরা তার প্রতি ঈমান আনত না[১]।

فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾

২০০. এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে তা (কুরআনের অস্বীকৃতি) ঢুকিয়ে দিয়েছি।

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০১. ওরা তার প্রতি ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যাতনাদায়ক আযাব দেখবে[২]।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾

---

১. অর্থাৎ আপনি প্রাঞ্জল আরবী ভাষার অধিকারী। তাই মক্কার মুশরিকরা বলতে পারে যে, কুরআন আপনি নিজে রচনা করে থাকবেন (অথচ কুরআন এমন অলৌকিকতাপূর্ণ যে, সমগ্র জিন ও মানব জাতি সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও এর কোন নজির পেশ করতে পারবে না)। তবু ওরা তর্কের খাতিরে এমন সম্ভাবনার কথা বলতে পারে।

কিন্তু ওদের একগুঁয়েমি, অবাধ্যতা ও দুর্ভাগ্যের অবস্থা এই যে, আমি যদি এ কুরআন কোন সাধারণ আরবীভাষী অথবা এক অক্ষরও আরবী বলতে পারে না এমন অনারব লোকের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, এমন কি অসম্ভব হলেও ধরে নাও, যদি কোন আকল-বুদ্ধিহীন জন্তুর প্রতিও অবতীর্ণ করতাম– তবুও এই লোকেরা কুরআনকে মানত না। তখন এরা অন্য ছল-ছুতা বা সন্দেহ বের করত।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা বলত, কুরআন এসেছে আরবী ভাষায়, আর এ নবীর ভাষাও আরবী। তাই সম্ভবত এ কিতাব তিনিই রচনা করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি অনারবের উপর আরবী কুরআন অবতীর্ণ হত, তবে তারা কি বিশ্বাস করত? আল্লাহ তাআলা তদুত্তরে বলেন, সন্দেহকারীদের মন কখনো স্থির হয় না– তখন অন্য কোন সংশয় বের করত। যেমন বলত, কেউ তাকে শিখিয়ে দিয়ে যায়!!

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরাধ ও পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং নিজ শক্তি-সামর্থ্য দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতায় নিয়োজিত করে, আল্লাহ তাআলাও নিজ রীতি অনুযায়ী তাকে ঢিল দিয়ে দেন, অস্বীকৃতি ও অস্বীকারকে তার মজ্জাগত করে দেন এবং তার অন্তরে তা বসিয়ে দেন। (এ রীতি অনুসারেই আল্লাহ কুরআনের অস্বীকৃতিকে মুশরিকদের অন্তরে বসিয়ে দিয়েছেন।)

দ্বিতীয় তাফসীর

এ ব্যাখ্যা তো আয়াতের তরজমা মোতাবেক করা হল। কিন্তু বহু মুফাসসির سلكناه এর ضمير (সর্বনাম)-কে কুরআনের দিকে ফিরিয়েছেন। এ হিসাবে অর্থ হবে, কুরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ ওরা অন্তরে খুব ভাল করে বোঝে যে, এ কিতাব মানুষের হতে পারে না। কিন্তু হঠকারিতার কারণে ঈমান আনতে পারে না। অস্বীকারই করে চলে। যাবৎ না দুনিয়া বা আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখতে পাবে,

২০২. তা তো ওদের উপর এমন আকস্মিকভাবে এসে পড়বে যে, ওরা বুঝতেও পারবে না।

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ

২০৩. তখন বলতে শুরু করবে, 'আমাদের কি কোন অবকাশ দেওয়া হবে[১]?'

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ؕ

২০৪. ওরা কি আমার আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ

২০৫. আচ্ছা বল তো, আমি যদি ওদের কয়েক বছর জীবনোপভোগ করতে দেই,

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۙ

২০৬. অতঃপর ওদের নিকট সেই জিনিস আসে, যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হচ্ছে—

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۙ

২০৭. তবে, জীভনোপভোগের যে সুযোগ ওদের দেওয়া হয়েছিল, তা ওদের কী উপকারে আসবে[২]?

مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ؕ

২০৮. আমি যেসব জনপদই ধ্বংস করেছি, সেসবের জন্য ছিল সতর্ককারীগণ—

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۛ

২০৯. স্মরণ করানোর জন্য। আর আমি জুলুমকারী নই[৩]।

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

ওরা এরূপ করে চলবে। অতঃপর যখন আযাব দেখতে পাবে, তখনি স্বীকার করবে যে, হাঁ পয়গম্বর সত্য ছিলেন এবং তাঁর আনীত কিতাবও সত্য ছিল। কিন্তু তখনকার স্বীকৃতিতে কোন লাভ হবে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব যখন একেবারে মাথার উপর এসে পড়বে, তখন বলবে, আমাদের কি কিছুটা অবকাশ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তওবা করে নিজেদের শুধরিয়ে নিতে পারি এবং পয়গম্বরের আনুগত্য করতে পারি? দুনিয়াতে তো আযাবের জন্য ত্বরা করত, আর এখন অবকাশ চাইতে শুরু করেছে!

২. অর্থাৎ বছরের পর বছর ওদের যে ঢিল ও অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, তখন তা কোন কাজে আসবে না। এ সুদীর্ঘ কালের অবকাশ তখন অনর্থক মনে হবে আর ভাববে যে, খুব তাড়াতাড়ি ধৃত হয়ে গেলাম।

৩. অর্থাৎ কোন জাতিকে সতর্ক না করেই অতর্কিতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়নি। বরং আযাব পাঠানোর পূর্বে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং সতর্ককারী পয়গম্বরগণও পাঠানো

২১০. তা (কুরআন) নিয়ে শয়তানেরা অবতরণ করেনি।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ۝

২১১. এ কাজ আদৌ ওদের উপযোগী নয় এবং ওরা (এর) সামর্থ্যও রাখে না[১]।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۝

হয়েছে, যাতে লোকেরা গাফলতে না থাকে। যখন কোন রকমেই মানেনি, তখন ধ্বংস করা হয়েছে। العياذ بالله

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

মাঝে অবিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন পূর্বের (আয়াত ১৯২-১৯৭) মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ কুরআনের মাহাত্ম ও গুরুত্ব এবং তার অবতারণের স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

কোথায় মহামর্যাদাকর কুরআন কারীম আর কোথায় শয়তানেরা!

বলা হয়েছে, এ কিতাব আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে জিবরাঈল আমীন নিয়ে এসেছেন। এ শয়তানদের শেখানো কালাম নয়। আর শয়তানদের দ্বারা এমন মহান কিতাবের রচনা কী করে সম্ভব? ওদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গোমরাহী, ফাসাদ ও অন্ধকার প্রসারিত করা; অথচ এ কিতাব আদ্যোপান্ত পথনির্দেশ, কল্যাণ ও হেদায়াতের নূরে ভরপুর। এ সেই কিতাব, যার শিক্ষায় এমন জামাত (সাহাবাগণ) তৈরি হয়েছে, যাদের চেয়ে অধিক পবিত্র, সত্যবাদী, খোদাভীরু, ইবাদতগুযার জামাত আকাশের নীচে নবীদের ছাড়া আর কোনটি নেই। সুতরাং এ কিতাবের উপকারী জ্ঞানরাজি, খায়র-কল্যাণ আর শয়তানদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই। না ওরা এই মহামর্যাদাকর বরকতময় আমানতের ভার বহন করার যোগ্য- لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله (আমি যদি এই কুরআন কোন পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তবে আপনি দেখতেন, আল্লাহর ভয়ে সেটি বিনীত, বিদীর্ণ হয়ে গেছে। -সূরা হাশর, রুকূ ৩, আয়াত ২১)

(সুতরাং এ কুরআন 'শয়তানেরা' শিখিয়ে দিয়েছে- এর চেয়ে বাস্তবতাবিবর্জিত দাবি আর কী হবে?!)

সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ

রেওয়ায়েতসমূহে আছে, কতিপয় মুশরিকের ধারণা ছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জিন এসে কুরআন শিখিয়ে যায়। বুখারী শরীফে (হাদীস : ৪৯৫০) আছে, একবার ওহীর আগমনে কিছু দেরি হলে এক নারী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে লাগল, আপনার শয়তান আপনাকে পরিত্যাগ করেছে (نعوذ بالله)। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই ধারণারই খণ্ডন রয়েছে।

২১২. ওদের তো (ওহী) শোনা থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে[১]।	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾
২১৩. অতএব আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকবেন না, অন্যথায় আপনি আযাবগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন[২]।	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾
২১৪. আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন[৩]।	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

---

১. অর্থাৎ কুরআন নাযিল করার সময় যখন হল, তখন শুরু থেকেই তার হেফাজতের জন্য আসমানে এমন গায়বী পাহারা বসানো হয়েছে যে, শয়তানেরা কাছেও ভিড়তে পারে না, তার একটি অক্ষরও ছিনিয়ে নিতে পারে না। যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا {আমরা (জিনেরা আকাশের) বিভিন্ন স্থানে (ওহী) শোনার উদ্দেশ্যে বসতাম। কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে, সে এক উল্কাপিণ্ড দেখতে পাবে, যা ওর জন্য ওঁত পেতে আছে। –সূরা জিন, আয়াত ৯}— আরো ইরশাদ করেছেন: فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (আর তিনি ফিরিশতার আগে-পিছে প্রহরী নিয়োজিত করেন। –সূরা জিন, আয়াত ২৭)— অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (তার মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়– না তার সামনে থেকে, না পিছন থেকে; তা প্রজ্ঞাবান, সমস্ত প্রশংসার অধিকারীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। –সূরা হা-মীম সেজদা,আয়াত ৪২)

বি. দ্র. শয়তানদের পক্ষে গায়বী খবরাদি শোনার চেষ্টা এবং এতে বিফল হওয়ার ব্যাপারে সূরা হিজরের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

২. এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ কিতাব নিঃসন্দেহে আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত, শয়তানের এতে বিন্দুমাত্র হাত নেই। সুতরাং এর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা উচিত, যার মূলমন্ত্র হচ্ছে তাওহীদ। অপরদিকে শিরক, কুফর ও অবিশ্বাস শয়তানী পথ, তা অবলম্বন করো না। অন্যথায় আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির কোনই উপায় নেই।

৩. অর্থাৎ অন্যদের আগে নিজ আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করুন। কারণ, তাদের কল্যাণ কামনা অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য। তাছাড়া মানুষের সততা ও সত্যতা নিকট আত্মীয়দের আচার-আচরণ দেখে যাচাই করা হয়। (সুতরাং তারা যদি হেদায়েতের উপর এসে যায়, তবে অন্যদের হেদায়েতের জন্য এটা সহায়ক হবে)।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শ বংশের সকল লোকদের, এমনকি নিজ ফুফু, চাচা ও কন্যাকে পর্যন্ত ডেকে বলে দিলেন, আল্লাহর দরবারে নিজেদের মুক্তির চিন্তা নিজেরা কর, তাঁর দরবারে আমিও তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না"।

২১৫. এবং স্বীয় ডানা নত করে দিন- যে ঈমানদাররা আপনার সাথে রয়েছে, তাদের জন্য[১]।	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
২১৬. আর ওরা যদি আপনার নাফরমানী করে, তবে বলে দিন, 'তোমরা যা কিছু কর তা থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক[২]।'	فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۚ
২১৭. এবং পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর নির্ভর করুন[৩]—	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ
২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন (নামাযে) দাঁড়ান,	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ
২১৯. এবং (দেখেন) সেজদাকারীদের মাঝে আপনার যাতায়াতকে☆[৪]।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ۞

১. অর্থাৎ মুমিনদের স্নেহ-ভালবাসায় জড়িয়ে রাখুন, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের খেলাফ যে করবে, তার থেকে আপনি নিঃসম্পর্ক হয়ে যান। সে আপন-পর যেই হোক।

৩. অর্থাৎ নাফরমান যে-ই হোক এবং যতই হোক, ওরা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের সকলের থেকে আপনি নিঃসম্পর্ক হয়ে এক আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, যিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর মোকাবেলায় কারো জোর চলে না। আর তিনি দয়াপরবশও। ফলে নিজ মেহেরবানীতে তিনি আপনার প্রতি সর্বদা সুদৃষ্টি রাখেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'সেজদাকারীদের সাথে আপনার ওঠা-বসাকে'।

৪. অর্থাৎ আপনি যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়ান এবং সঙ্গী-সাথীদের খবর নেন যে, তারা কি আল্লাহর যিকিরে আছে, না গাফেল হয়ে আছে (মূযেহুল কুরআন)।

অথবা (অর্থ এই যে), আপনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়ান এবং জামাতের নামাযে অন্য নামাযীদের সাথে ওঠা-বসা (অর্থাৎ রুকূ, সেজদা প্রভৃতি) করেন এবং মুক্তাদীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখেন, তখন তিনি আপনাকে দেখেন।

আর কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী বলেছেন, সেজদাকারীগণ বলতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃপুরুষগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আপনার নূর যে এক নবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্য নবীর পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং সর্বশেষে নবীর রূপ ধারণ করে আপনি তশরীফ আনয়ন করেন- এও আল্লাহ তাআলার গোচরে রয়েছে। এমনকি, কোন কোন মুফাসসির (تقلبك في الساجدين) এ শব্দাবলি দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতার ঈমান প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। والله أعلم

২২০. নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۲۲۰﴾
২২১. আমি কি তোমাদের বলব, শয়তানেরা কার কাছে অবতরণ করে?	هَلۡ اُنَبِّئُکُمۡ عَلٰی مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّیٰطِیۡنُ ﴿۲۲۱﴾ؕ
২২২. ওরা অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপীর কাছে[১]।	تَنَزَّلُ عَلٰی کُلِّ اَفَّاکٍ اَثِیۡمٍ ﴿۲۲۲﴾ۙ
২২৩. ওরা শোনা কথা (পাপীদের দিকে) ছুঁড়ে মারে*, আর ওদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী[২]।	یُّلۡقُوۡنَ السَّمۡعَ وَ اَکۡثَرُهُمۡ کٰذِبُوۡنَ ﴿۲۲۳﴾ؕ

১. এখানে পুনরায় কুরআনের সত্যতা ও মহামর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, এরূপ সেজদাকারী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের ইমাম (অর্থাৎ রাসূল সা.), যিনি আল্লাহর ব্যাপারে আপন-পর কারো পরোয়া করেন না এবং সারা দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন— তাঁর সম্পর্কে এমন কথা কি বলা যায় যে, শয়তান তাঁর প্রতি ওহী আনত? কক্ষনো না।

আস, আমি তোমাদের বলে দিই, শয়তানী ওহী কোন্ লোকদের উপর আসে। তা তো আসে মিথ্যাবাদী, অসৎ ও পাপীদের উপর। কেননা, শয়তান তো সত্যবাদী ও পুণ্যবান লোকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। কারণ, তারা ওকে খারাপ জানে। আর সে মিথ্যাবাদী ও দাগাবাজদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা ওর মর্যি মত চলে। অতএব! সকল সত্যবাদীর চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং সকল পুণ্যবানের চেয়ে অধিক পূণ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে এহেন শয়তানী ওহীর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা, আমানতদারী, পরহেজগারী, পবিত্রতা, আল্লাহ-ভীরুতা প্রভৃতি তাঁর এমন গুণাবলি, যা বাল্যকাল থেকে নবুওয়াত পর্যন্ত স্বজাতির নিকট স্বীকৃত ছিল। এজন্যই তাদের নিকট তিনি الصادق الأمين উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। (সুতরাং তাঁর কাছে শয়তান আসে কী করে? ও তো আসে শুধু মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠদের কাছে)!

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'ওরা (অর্থাৎ সেই পাপীরা, শয়তানদের দিকে) কান পেতে রাখে'।

২. অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের ছোটখাট বিষয় সম্পর্কে এক-আধটা অসম্পূর্ণ কথা শুনে শয়তানরা ছুটে পালায়, অতঃপর তাতে শত মিথ্যা মিলিয়ে নিজেদের গণক-বন্ধুদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এ হচ্ছে শয়তানী ওহীর স্বরূপ। পক্ষান্তরে, নবীদের ওহীর একটি অক্ষর, এমন কি একটি অক্ষরের বিন্দুও মিথ্যা হতে পারে না।

কেউ কেউ يلقون السمع এর অর্থ এই করেছেন যে, শয়তানেরা উর্ধ্ব জগতের দিকে কান পেতে থাকে, যাতে গায়বী কোন কথা কানে এসে পড়ে। অথবা এ অর্থ যে, মিথ্যাবাদী

২২৪. আর কবিরা– ওদের অনুসরণ করে শুধু ভ্রষ্টরা[১]।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۞

২২৫. তুমি কি দেখনি যে, কবিরা প্রত্যেক ময়দানে ঘুরে বেড়ায় উদভ্রান্ত হয়ে[২]?

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِیْ كُلِّ وَادٍ یَّهِیْمُوْنَ ۞

২২৬. এবং (দেখনি), ওরা বলে যা করে না[৩]?

وَاَنَّهُمْ یَقُوْلُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ ۞

পাপীরা শয়তানদের প্রতি কান পেতে রাখে, যাতে সেদিক থেকে কোন বিষয় হস্তগত হলেই তা (মানুষের মধ্যে) চালিয়ে দিতে পারে।

১. কাফেররা হুজুর (স.)-কে কখনো 'গণক' বলত, কখনো 'কবি' বলত। এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, কবিত্বের বিষয়াবলি শুধু কাল্পনিক হয়ে থাকে, বাস্তবতার সাথে তার সম্পর্ক থাকে না। এজন্য কবির কথায় আসর গরম হয়, সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং বাহ্ বাহ্ পাওয়া যায়। কিন্তু কারো জন্য সরাসরি হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা হয় না। অথচ এই পয়গম্বরের সুহবতে কুরআন শুনে শুনে হাজারো মানুষ কল্যাণ ও পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করছে।

২. অর্থাৎ যে বিষয় ধরল, তাকে বাড়াতেই থাকল। কারো প্রশংসা করল তো একেবারে আকাশে তুলে দিল, দোষ বর্ণনা করল তো সারা দুনিয়ার দোষ ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। হাঁ কে না, আর না কে হাঁ সাব্যস্ত করা তাদের হাতের খেলা মাত্র। মোটকথা, মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও কল্পনার যে ময়দানে তারা ছুটল, ছুটতেই থাকল, অতঃপর পিছন ফিরে আর দেখল না। এ জন্যই কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা বিখ্যাত– أكذبه أحسنه সবচে' মিছাটাই সেরা।

৩. অর্থাৎ কবিদের কবিতা পড়লে মনে হবে, তারা রুস্তমের চেয়ে বড় বাহাদুর এবং বাঘের চেয়ে বেশি সাহসী! কিন্তু কাছে গেলে দেখা যাবে, এক নম্বরের কাপুরুষ ও ভীতু। কখনো সাক্ষাত হলে দেখবে, খুব মোটাতাজা; কিন্তু কবিতা পড়লে মনে হবে, নাড়ী বন্ধ হয়ে এসেছে, জান বের হওয়ার অপেক্ষা। হালী তার 'মুসাদ্দাস' নামক কাব্যগ্রন্থে কবিদের মিথ্যাবাদের চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন।

মোদ্দাকথা, আল্লাহর একজন পয়গম্বর বিশেষত সর্বশেষ নবীর ন্যায় সত্তার এ দলের সাথে কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তাই তো কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهٗ (আমি তাঁকে কাব্য শিখাইনি। আর তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়— ইয়াসীন ৬৯)। তাঁর কথা তো অতি সত্য, সঠিক, তুলাদণ্ডে মাপা ও তত্ত্ব-তথ্যভিত্তিক। তদুপরি যে কথাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যায়, তাই কার্যে পরিণত হতে দেখা যায়। কবিদের কি এ রকম অবস্থা? আর নবীর এমন বাণীকে কি কবিত্ব বলে? কখনই না, কখনই না।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

২২৭. কিন্তু (তাদের কথা ভিন্ন), যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে[১]। আর জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, ওরা কোন্ পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে[২]?

---

১. যে সকল কবি নিজ কবিতায় আল্লাহর প্রশংসা করে, অথবা সৎকর্মে উৎসাহ দেয়, অথবা কুফরের নিন্দা ও গোনাহর খারাবী বর্ণনা করে, অথবা কোন কাফের ইসলামের বিদ্রূপ করলে তার উত্তর দেয়, অথবা কেউ কষ্ট দিলে সীমার মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর দেয়– এমন কবিতা দোষের নয়।

হযরত হাস্সান ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ এ ধরনের কবিতাই রচনা করতেন। এ জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, 'এই কাফেরদের জওয়াব দাও, রূহুল কুদ্স তোমার সঙ্গে আছেন।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৮৫-২৪৮৬)

২. এ কথা পূর্বের من بعد ما ظلموا এর প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের পরিণাম কী? সব চেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে আল্লাহর কিতাবসমূহ ও পয়গম্বরদের গণক ও কবি ঠাওরানো এবং তাদের অস্বীকার করা।

সূরা নাম্‌ল

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ২৭ । ৯৩ আয়াত । ৭ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٩٣، رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ①

১. তোয়া–সীন। এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. (এবং) হেদায়াত ও সুসংবাদ ঈমানদারদের জন্য—

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

৩. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

৪. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, আমি ওদের কার্যকলাপকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছি। অতএব ওরা ভ্রান্তিতে পড়ে থাকে[১]।

---

১. অর্থাৎ যাদের পরিণামের কোন ফিকির ও ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, ওরা এই নশ্বর দুনিয়ার চিন্তা-ফিকিরে ডুবে থাকে। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনই ওদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্যস্থল। এ কারণে ঐশী কিতাব বা পয়গম্বর দুনিয়া থেকে ওদের দৃষ্টি হটিয়ে পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করতে চাইলে ওরা সেদিকে মনোযোগ দেয় না। ওরা দুনিয়ার প্রেমে মেতে পথপ্রদর্শনকারীর প্রতি দোষারোপ করে, আসমানী কিতাবের সমালোচনা করে, পয়গম্বরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। আর এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে ওরা সর্বদা গোমরাহীতে তরক্কী (উন্নতি) করতে থাকে।

সংশয় নিরসন

প্রত্যেক বিষয়ের স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাআলা এবং কোন কারণে কিছু ঘটা তাঁর ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া হতে পারে না, সে হিসাবে গোনাহর কাজকে শোভন করে তোলার ব্যাপারটিকে তিনি নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন (এবং বলেছেন : زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ)। যেমন: অন্যান্য স্থানে গোমরাহ করা এবং দিলে মোহর মারা প্রভৃতি বিষয়কে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

সূরা 'নাম্‌ল' এর প্রাথমিক আয়াতগুলির বিষয়বস্তু সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতসমূহের সাথে খুবই সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং সেগুলি (ব্যাখ্যাসহ) পুনরায় দেখে নিলে ভাল হয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝

৫. ওরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং পরকালে ওরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

৬. নিশ্চয় আপনাকে কুরআন প্রদান করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তার নিকট থেকে[২]।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

৭. (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর পরিবারকে বলেছিলেন, 'আমি এক আগুন দেখেছি[৩]। সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসব, অথবা তোমাদের জন্য একটা জ্বলন্ত অঙ্গার আনব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার'[৪]।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي

৮. অতঃপর তিনি যখন আগুনের কাছে এলেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দেওয়া হল— 'বরকত

---

১. অর্থাৎ এ লোকগুলোই সেখানে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. অর্থাৎ ওই দুর্ভাগাদের গোমরাহীর তিমির আঁধারে নিমজ্জিত থাকতে দিন। ওরা যেহেতু সমুজ্জ্বল কুরআনের মর্যাদা বুঝল না এবং তার হেদায়াত ও সুসংবাদ দ্বারা উপকৃত হল না, অতএব ওদের এ পরিণামই তো হবে। আপনি ওদের ফিকির না করে আল্লাহর শোকর করুন যে, আপনাকে সর্বজ্ঞ ও পরম হেকমতওয়ালার সবচেয়ে মহামর্যাদাশালী কিতাব প্রদান করা হয়েছে। এ কিতাব দ্বারা বহুবিধ উপকার লাভ হচ্ছে। এর মধ্যে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এবং কাফেরদেরকে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাদি শোনানো হয়েছে, যাতে সত্যবাদীদের দিল মজবুত ও শক্তিশালী হয় এবং মিথ্যার সহযোগীরা নিজেদের মন্দ পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যায়।

এসব উদ্দেশ্যেই সম্মুখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাওনের দলবলের ঘটনা শোনানো হচ্ছে।

৩. 'মাদ্‌য়ান' থেকে যাওয়ার পথে 'তুওয়া' উপত্যকার নিকটে পৌছে এ কথা বললেন। তখন প্রচণ্ড শীতের অন্ধকার রাতে পথ ভুলে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা সূরা 'তা-হা' (আয়াত ১১) এর ব্যাখ্যায় গত হয়েছে– তা দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ আগুনের ধারে কেউ উপস্থিত থাকলে পথের খবর আনব, না হয় অন্তত আগুন তাপানোর জন্য একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব।

النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑧

হোক তার প্রতি, যে আগুনের মধ্যে আছে এবং তারও প্রতি, যে এর আশপাশে আছে[১]। আর আল্লাহ পবিত্র, যিনি বিশ্ব জগতের রব[২]।'

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑨

৯. 'হে মূসা! তিনি তো আমি আল্লাহই, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৩]।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ

১০. 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' তারপর তিনি যখন তাকে ছিপছিপে সাপের ন্যায় ছোটাছুটি করতে দেখলেন[৪], তিনি পিছন ফিরে দৌড় দিলেন, আর ফিরে তাকালেন না[৫]। (আল্লাহ বললেন), 'হে মূসা! ভয়

---

১. সেখানে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারলেন, এ পার্থিব আগুন নয়, বরং গায়বী ও নূরানী আগুন– যার মধ্যে আল্লাহর নূর প্রকাশ পাচ্ছিল বা তার 'তাজাল্লী' চমকাচ্ছিল। সম্ভবত এটি সেই জিনিসই, যার বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে– حجابه النار বা حجابه النور (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৯)

অতঃপর গায়ব থেকে আওয়াজ এল– أن بورك من في النار ومن حولها অর্থাৎ এই ভূখণ্ডটি বরকতময়, আগুনের মধ্যকার তাজাল্লীও বরকতময় এবং এর ভিতরে বা আশপাশে যেসব সত্তা রয়েছে– যথা, ফেরেশতা, স্বয়ং মূসা আলাইহিস সালাম, তাঁরা সকলেই বরকতময়। খুব সম্ভব মূসা আলাইহিস সালামকে আশ্বস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপনরূপে এরূপ বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ স্থান, দেহ, আকৃতি, রং ইত্যাদি যা কিছু সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, তা থেকে আল্লাহর সত্তা মুক্ত-পবিত্র। আগুনের মধ্যে তাঁর তাজাল্লী প্রকাশের অর্থ এই নয় যে, তাঁর পবিত্র সত্তা আগুনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। জগতকে আলো দানকারী সূর্যকে আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে কেউ যদি বলে, মহাসূর্য ছোট্ট আয়নার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, তবে সে নিরেট আহমক ছাড়া আর কী?!

৩. অর্থাৎ এ সময় তোমার সঙ্গে যিনি বাক্যালাপ করছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আমি আল্লাহ। –এ সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা 'তা-হা'তে (আয়াত ১০-১৪) আলোচিত হয়েছে।

৪. সম্ভবত শুরুতে হালকা-পাতলা সাপের ন্যায় ছিল, এজন্যই এখানে كَاَنَّهَا جَآنٌّ বলা হয়েছে (অতঃপর বিশাল সাপের আকৃতি ধারণ করে– فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ)। অথবা جَآنٌّ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে শুধুমাত্র দ্রুত ছোটাছুটি করার দিক থেকে, পাতলা গড়নবিশিষ্ট হওয়াতে নয়।

৫. এটি স্বভাবগত ভয়, যা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়।

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ⑩

পেয়ো না। নিশ্চয় আমার নিকট রাসূলগণ ভয় পান না[১]—

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑪

১১. 'তবে যে সীমা অতিক্রম করল, অতঃপর মন্দের পরে তার স্থলে সৎকর্ম করল— তো আমি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ⑫

১২. 'আর তোমার হাত আপন (জামার) গলায় ঢোকাও, তা কোন ত্রুটি ছাড়া শুভ্র হয়ে বের হয়ে আসবে। (এ দু'টিসহ) নয়টি নিদর্শন নিয়ে ফেরাওন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট যাও। নিশ্চয় ওরা নাফরমান সম্প্রদায়[৩]।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑬

১৩. অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ পৌছল যা ছিল অন্তর্চক্ষু উন্মোচনকারী☆– তখন ওরা বলল, 'এ সুস্পষ্ট যাদু।'

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ

১৪. এবং অন্যায় ও উদ্ধতভাবে সেগুলি অস্বীকার করল, অথচ ওদের অন্তর তা বিশ্বাস

---

১. অর্থাৎ এমন সান্নিধ্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানে এসে এরূপ সামান্য জিনিসে ভয় পাওয়ার কী অর্থ? আমার নৈকট্যপূর্ণ দরবারে এসে লাঠি, সাপ বা কোন সৃষ্টজীবকে ভয় পাওয়া রাসূলদের জন্য সমীচীন নয়। এখানে তো অন্তরে অশেষ স্বস্তি ও শান্তি হাসিল হওয়া উচিত।

২. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে পৌছে ভয় তারই পাওয়ার কথা, যে কোন সীমালঙ্ঘন বা গোনাহ ও ত্রুটি করে এসেছে। তবে তার সম্পর্কেও আমার নিয়ম এই যে, মন্দের পর যদি খাঁটি দিলে তওবা করে নিজ আচার-আচরণ শোধরিয়ে নেয় এবং সৎকর্ম করে মন্দের চিহ্ন মুছে ফেলে, তবে আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেন।

হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মূসা আলাইহিস সালামের হাতে ভুলবশত এক কাফের নিহত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর অন্তরে এর ভয় ছিল। তাঁকে তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেন।'

৩. নয়টি নিদর্শনের বর্ণনা সূরা বনী ইসরাঈল-এ (আয়াত নং ১০১) দ্রষ্টব্য।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পৌছল'।

করেছিল। অতএব দেখে নাও, ফাসাদকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল[১]।

ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

[রুকূ - ২]

১৫. নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বিশেষ ইলম দান করেছিলাম[২]। তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহর শোকর[৩], যিনি আমাদের তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[৪]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৬. আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন[৫]

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

---

১. অর্থাৎ ওদের চোখ খোলার জন্য পালাক্রমে যখন সেই নিদর্শনগুলি দেখানো হল, তখন ওরা বলতে লাগল, এসব যাদু। অথচ ওদের দিলে বিশ্বাস ছিল, মূসা আলাইহিস সালাম সত্য এবং তিনি যেসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন, তা নিশ্চিতরূপে খোদায়ী নিদর্শন! যাদু, প্রতারণা ও ভেলকিবাজি নয়। কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং গর্ব ও অহংকারের কারণে, জেনেশুনে নিজেদের মনের বিরুদ্ধে সত্যকে অস্বীকার করল।

ফলে কয়েক দিন পরেই স্পষ্ট হয়ে গেল, এরূপ জেদী ও ফাসাদকারীদের পরিণাম কী রকম হয়ে থাকে। ওদের সকলকে লোহিত সাগরের তরঙ্গমালা গ্রাস করে নিল, কারো কাফন-দাফনের ভাগ্যও হল না।

২. হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাউদ (আ)-এর সুযোগ্য পুত্র। পিতা-পুত্রের প্রত্যেককে আপন মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ইলমের বিশেষ অংশ দান করেন। শরী'য়ত, হুকুম-আহকাম এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি প্রভৃতি— এসব কিছুর জ্ঞান عِلْمًا- শব্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে যে ইলম দান করেছিলেন, তারই জন্য তাঁরা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতেন। আল্লাহর কোন নে'য়ামতের শোকর আদায়ের তাওফীক লাভ করা সেই নে'য়ামতের চেয়ে বড় নে'য়ামত।

৪. عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهٖ– এজন্য বলেছেন যে, আল্লাহর কতিপয় বান্দাকে তাঁদের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আর সারা জগতে সমস্ত সৃষ্টির উপর সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব একজন বান্দাই লাভ করেছেন, তিনি হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. অর্থাৎ দাউদ (আ)-এর পুত্রদের মধ্যে হযরত সুলায়মান (আ)-ই তাঁর প্রকৃত স্থলবর্তী হয়েছিলেন, যাঁর সত্তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও রাজত্ব উভয়ের সমাহার ঘটিয়েছিলেন। আর তাঁকে এমন রাজত্ব দান করেছিলেন, যা তাঁর পূর্বে বা পরে আর কাউকেই দেওয়া হয়নি। জিনজাতি, পক্ষীকূল ও বায়ুকে তাঁর বশীভূত করে দেওয়া হয়েছিল। সূরা সাবায় এর আলোচনা আসবে।

وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

এবং তিনি বললেন, 'হে মানুষ! আমাদের পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে' এবং

১. **পাখিদের কলধ্বনি ও বুলিসমূহ বিশেষ অর্থ ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বহন করে**

পাখিরা যেসব বোল বলে থাকে, তা ওরা পরস্পরে একটি পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই বোঝে। এ কথার অস্বীকৃতি একটি বাস্তবতারই অস্বীকৃতি। একটি পাখি যখন নিজ যুগলকে ডাকে, অথবা খাওয়ানোর জন্য নিজ বাচ্চাদের আওয়াজ দেয়, অথবা কোন কিছুর ভয় পেয়ে সতর্ক-শব্দ করে, তখন এসব বিবিধ অবস্থার বুলি (ভাষা) ও উচ্চারণের ভঙ্গি একরকম হয় না। বরং একেক অবস্থার জন্য পাখিরা একেক বুলি-ভঙ্গি ব্যবহার করে। ফলে প্রত্যেক পাখি সহজেই বুঝে নেয়, তাকে কী উদ্দেশ্যে আওয়াজ দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই আমরা বুঝি যে, অপরাপর অবস্থা ও প্রয়োজনের সময়েও তাদের কলধ্বনির মধ্যে এমন সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে, যা তারা পরস্পর বুঝে থাকে।

আপনি কোন টেলিগ্রাম অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাফের খট্‌খট্ ধ্বনি শুনতে থাকুন। আপনার নিকট তা অর্থহীন স্বর ও ধ্বনি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। কিন্তু টেলিগ্রাম মাষ্টার তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন, অমুক স্থান থেকে অমুক ব্যক্তি এ কথা বলছেন, অথবা অমুক বক্তার বক্তৃতা এসব খট্‌খট্ ধ্বনির মধ্যে শোনা যাচ্ছে। কেননা, তিনি টেলিগ্রাফের শব্দাবলির সাংকেতিক অর্থ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত। অনুরূপ, প্রকৃত স্রষ্টা (আল্লাহ) পাখীর স্বর ও ধ্বনিগুলিও বিভিন্ন অর্থ ও উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে তৈরি করেছেন। আর যেভাবে মানবশিশু স্বীয় মাতাপিতার ভাষা ক্রমান্বয়ে শিখতে থাকে, তেমনি পাখীশাবকরাও স্বীয় সহজাত যোগ্যতা দ্বারা স্বজাতির বুলিসমূহ বুঝতে শুরু করে। এমনিভাবে এও খুবই সম্ভব যে, পয়গম্বরসুলভ মু'জেযারূপে আল্লাহ তাআলা কোন নবীকেও পাখির বুলি বোঝার যোগ্যতা দান করে দিলেন।

পশু-পাখীর কিছু কিছু বিষয়ের বোধ আছে বলে পূর্ব থেকেই সকলে একমত। কিন্তু ইউরোপের আধুনিক গবেষণাসমূহ জীবজন্তুর বুদ্ধি-বৃত্তিকে মানববুদ্ধির সীমার নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। এমনকি, জীবজন্তুর বুলিসমূহের 'বর্ণমালা' তৈরি করা হচ্ছে।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পাখিদের কথাবার্তা বোঝা একটি মুজেযা

পবিত্র কুরআন সংবাদ দিয়েছে, 'প্রত্যেক বস্তু স্বীয় প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে, যা তোমরা বোঝ না এবং প্রত্যেক পাখী স্বীয় সালাত ও তাসবীহ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪ ও সূরা নূর-৪১ দ্রষ্টব্য)। আর সহীহ হাদীসসমূহে জীবজন্তুর কথা বলা, বরং নির্জীব পদার্থসমূহেরও কথা বলা ও তাসবীহ পাঠের কথা প্রমাণিত আছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৫৭৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১৭৯২) এ থেকে বোঝা যায়, মোটামুটিভাবে হলেও স্রষ্টার সঠিক পরিচয় প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং এদের তাসবীহ ও তাহমীদ অথবা কিছু কথাবার্তা সম্বন্ধে কোন কোন আল্লাহর বান্দাকে অস্বাভাবিকভাবে জ্ঞাত করে দেওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, হাঁ সাধারণ নিয়মের খেলাফ বটে। তবে মু'জেযা ও কারামত সাধারণ নিয়ম ও কার্যকারণের অনুকূল হবে না-

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ۝

আমাদের দান করা হয়েছে সবকিছু[১]। নিশ্চয় এ-ই সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।'

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ۝

১৭. সুলায়মানের জন্য তাঁর বাহিনীগুলি সমবেত করা হল, যাতে ছিল- জিন, মানুষ ও পাখিকুল। আার তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হত[২]।

এটাই স্বাভাবিক। এজন্যই তো তা মু'জেযা বা কারামত! (আমরা خوارق عادات তথা সাধারণ নিয়মের বাইরে সংঘটিত বিষয়াদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছি, তা দ্রষ্টব্য।)

বক্রমনা লোকদের অপব্যাখ্যার খণ্ডন

যা হোক, বর্তমান রুকূতে এ ধরনের কতিপয় মুজেযার উল্লেখ রয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে কিছু বক্রমনা লোকেরা অসার ও অবান্তর ব্যাখ্যা (মনগড়া বিকৃতি) শুরু করে দিয়েছে। কেননা, কতক পাখির নিজ ভাষায় মানুষের কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা, তদ্রূপ পিপীলিকার পরস্পরে একে অন্যকে সম্বোধন করে কথা বলা এবং সুলায়মান (আ)-এর পক্ষে তা বুঝে ফেলা– এসব বিষয় তাদের নিকট এতই নিরর্থক ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ যে, কোন শিশুও নাকি তা বিশ্বাস করতে পারে না!!

কিন্তু আমি বলি, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষী ও লাখো বিজ্ঞ গবেষকগণ অর্থহীন ও বাতিল বিষয়াদি খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান না করে যুগ-যুগ ধরে বিনাদ্বিধায় বয়ান করে গেছেন এবং আলোচ্য আয়াতগুলির সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য তাঁদের মধ্যে কেউ-ই বুঝেননি, যা তোমরা আজ বুঝতে পেরেছ– এহেন ধারণা তা থেকে বেশি নিরর্থক ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ, যাকে তোমরা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ মনে কর। যে কোন যুগে আলেমদের দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি বা ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু এটি কখনই হতে পারে না যে, প্রাত্যহিক জীবনের যেসব বোধগম্য বিষয় ও অত্যন্ত মামুলী বাস্তবতা শিশুরা পর্যন্ত জানে, সেগুলি শত শত বছর ধরে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ আলেমগণ এক দিনের জন্যও বুঝতে পারলেন না। স্মরণ রাখা উচিত, আমরা আজগুবি ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ সমর্থন করছি না। তবে পূর্ববর্তী মনীষীগণ সর্বসম্মতভাবে আল্লাহর কালামের যতটুকু উদ্দেশ্য ও মর্ম বয়ান করেছেন, তা অবশ্যই সঠিক বলে মানি, তা ইসরাঈলী বর্ণনাদির অনুকূলে হোক বা প্রতিকূলে হোক।

১. অর্থাৎ এরূপ বিশাল রাজত্ব ও নবুওয়াতের জন্য যেসব জিনিস ও উপকরণের দরকার ছিল, তা সবই তাঁকে দান করা হয়েছিল।

২. অর্থাৎ সুলায়মান আলাইহিস সালাম যখন কোন দিকে বের হতেন, তখন জিন, মানুষ ও পাখি তিনো প্রকারের বাহিনী থেকে প্রয়োজন ও বিবেচনা মত সদস্যবৃন্দ সঙ্গে নিতেন। এবং এই দলগুলির মধ্যে বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হত। যেমনঃ পিছনের দলগুলি দ্রুত

১৮. একসময় যখন তারা পিপীলিকার উপত্যকায় পৌছল[১], তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকারা! তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর, যাতে সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীগুলি তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষে না ফেলে[২]।'

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

চলে বা উড়ে সামনের দলগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না। তদ্রূপ কোন সিপাহী নিজ স্থান ও দায়িত্ব ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারত না, ঠিক বর্তমান কালে যেমন পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী বিশেষ শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীনে পরিচালিত করা হয়।

১. অর্থাৎ স্বীয় বাহিনীর সাথে সুলায়মান (আ) এমন একটি প্রান্তর অতিক্রম করলেন, যেখানে পিপীলিকার বিরাট বসতি ছিল।

বি. দ্র. যেখানে পিপীলিকা দলবদ্ধভাবে বিশেষ উপায়ে নিজেদের ঘর বানায়, তাকে আরবী ভাষায় قرية النمل পিপীলিকা-নগরী বলা হয়। মুফাসসিরগণ বিভিন্ন শহরের কতিপয় প্রান্তরের কথা বলেছেন, যেখানে পিপীলিকার বসতি বিস্তর পরিমাণে ছিল। সেগুলিরই কোন একটির উপর দিয়ে ঘটনাক্রমে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম যাচ্ছিলেন।

২. অর্থাৎ তারা জেনেশুনে তো তোমাদের ধ্বংস করবে না, তবে তাদের অজান্তে তোমাদের পিষে মরার সম্ভাবনা আছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে পিঁপড়ার আওয়াজ কেউ শোনে না, তিনি (সুলায়মান আলাইহিস সালাম) তা শুনলেন ও মর্ম বুঝে নিলেন। —এ মূলত তাঁর মু'জেযা ছিল।

বি. দ্র. প্রাণীবিদরা যুগ যুগ ধরে (অভিজ্ঞতার আলোকে) যেসব গবেষণা পরিচালনা করেছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে, এ ক্ষুদ্রতম প্রাণীটি নিজেদের সামাজিক জীবন-যাপনে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিস্ময়কর যোগ্যতাধারী এবং মানব রীতি-নীতির অনেকটা কাছাকাছি। মানুষের ন্যায় ওদের বংশ ও গোত্র রয়েছে। ওদের মধ্যে সহযোগিতার গুণ, পরস্পরে দায়িত্ব বণ্টনের নীতি এবং শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক মানব জাতির সদৃশ দেখা যায়। ইউরোপীয় গবেষকরা যেসব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পিপীলিকার আবাসস্থল বিদ্যমান সেখানে বহু বছরব্যাপী অবস্থান করে বহু মূল্যবান ফলাফল সরবারহ করেছেন। আফসোসের বিষয়, এ সংক্ষিপ্ত তাফসীরে সে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে دائرة المعارف المصرية (মিসরীয় বিশ্বকোষ) থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

فمتى داهم عدو قرية النمل اختفت العملة، وخرجت الجنود للقتال والنضال، فيخرج أولا واحد منها للاستطلاع، ثم يعود مخبرا بما رآى، وبعد هنيهة تخرج ثلاثة أو أربعة يتبعها عدد كثيف من

১৯. তার কথায় সুলায়মান মুচকি হেসে দিলেন[১] এবং বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে এমন সৎকর্ম করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন, আর আমাকে নিজ দয়ায় শামিল করুন আপনার নেক বান্দাদের মধ্যে[২]।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ⑲

২০. (একবার) তিনি পাখিদের সন্ধান নিলেন, তখন বললেন, 'কী ব্যাপার, হুদহুদকে যে দেখছি না! নাকি সে অনুপস্থিত[৩]?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ⑳

الجيوش بادية عليهم علائم الحنق، فتلدغ كلما صادفته ولا تفلت من تلدغه ولو قطعت أربا أربا، فاذا انتهى القتال رجع الفعلة، فأعادوا بناء ما تهدم، يتخللها عدد من الجنود للحراسة لا للعمل .

যার সারার্থ এই যে, বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে প্রথমে একটি পিঁপড়া বাইরে যায় এবং খবরাখবর জেনে এসে অন্যদের সতর্ক করে।

বাকি সুলায়মান (আ) যে পিঁপড়ার সতর্কীকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারলেন, এ তাঁর মু'জেযা ছিল।

১. পিঁপড়ের কথা বুঝতে পেরে তিনি চমৎকৃত হলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে শোকর আদায়ের জয্‌বায় ঢেউ উঠল। (সামনের কথাগুলো এরই বহিঃপ্রকাশ)

২. অর্থাৎ আমি খুঁজে পাই না, কী করে আমি আপনার বিরাট নে'য়ামতসমূহের শোকর আদায় করি। সুতরাং আপনারই নিকট আমার প্রার্থনা– আমাকে কথায় ও কাজে উভয় দিক দিয়ে পরিপূর্ণ শোকরগোযার (কৃতজ্ঞ) বানিয়ে দিন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেক বান্দাদের (অর্থাৎ নবী-রাসূলদের) অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

৩. কোন প্রয়োজনে সুলায়মান আলাইহিস সালাম পাখির বাহিনীর তদারকি করলেন। তখন হুদহুদ পাখি দৃষ্টিগোচর হল না। তিনি বললেন, ব্যাপার কী– হুদহুদকে দেখছি না যে। পাখিকুলের ভিড়ে আমার নজরে পড়ছে না, না আসলেই সে অনুপস্থিত?

বি. দ্র. পাখিদের দ্বারা সুলায়মান (আ) বিভিন্ন কাজ নিতেন। যেমন: আকাশ পথের ভ্রমণে পাখা বিস্তার করে তাঁর উপর ছায়া দিয়ে রাখা, অথবা প্রয়োজনের সময় পানি ইত্যাদির খোঁজ নেওয়া, অথবা পত্র বা সংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সম্ভবত সে সময় হুদহুদের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।

২১. 'আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব[১] অথবা যবেহ করে ফেলব, কিংবা ওকে অবশ্যই আমার কাছে (অনুপস্থিতির) স্পষ্ট কারণ পেশ করতে হবে[২]।'

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۱﴾

২২. অতঃপর হুদহুদ বেশি দেরি করল না, (কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হল) এবং বলল, 'আমি এমন বিষয় জেনেছি যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' থেকে আপনার নিকট এক নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি[৩]।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿۲۲﴾

২৩. 'আমি এক নারীকে পেলাম, যে তাদের উপর রাজত্ব করছে, আর তাকে প্রত্যেক (প্রয়োজনীয়) জিনিস দেওয়া হয়েছে[৪] এবং তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন[৫]।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

কথিত আছে, কোন স্থানে মাটির স্বল্প নীচে পানি থাকলে হুদহুদ তা অনুভব করে ফেলে। আর আল্লাহ তাআলা কোন জন্তুকে মানুষ বা অন্যান্য জন্তু থেকে অতিরিক্ত কোন বিশেষ অনুভূতিশক্তি দান করে থাকলে তা অসম্ভব কিছু নয়। হুদহুদ পাখি সম্পর্কেই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা বলেছেন, মাটির নীচে কেঁচো থাকলে তার অবস্থান শনাক্ত করে তৎক্ষণাৎ তা বের করে ফেলে। এমন কি, মাটি খুঁড়ে দু তিন হাত নীচ থেকেও বের করে আনে।

১. যেমন: ওর লোম ও পালক ছিঁড়ে ফেলব।

২. (سلطان مبين)-অর্থাৎ নিজ অনুপস্থিতির সুস্পষ্ট কারণ পেশ করতে হবে।

৩. হযরত সুলায়মান (আ) সেই দেশের বিস্তারিত অবস্থা জানতেন না, এখন জানলেন।

সাবা একটি সম্প্রদায়ের নাম, আরব এলাকাতেই ইয়ামানের দিকে তাদের আবাসভূমি ছিল (মূযেহুল কুরআন)।

আল্লাহ তাআলা হুদহুদের দ্বারা যেন বুঝিয়ে দিলেন যে, বড় থেকে বড় মানুষের জ্ঞানও কামেল ও সর্বব্যাপী নয়। এমন কি, যাঁদের সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন- ولقد آتينا داود وسليمان علما (নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম)— তাঁদেরও হুদহুদ পাখি একটি ছোট বিষয়ে অবগত করল।

৪. প্রত্যেক জিনিস বলতে ধন-দৌলত, আসবাবপত্র, সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রূপ-সৌন্দর্য প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

৫. সেই রানীর সিংহাসন এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত, পাথর জড়ানো ও মহামূল্যবান ছিল যে, সেই যুগে আর কোন বাদশাহর এমনটি ছিল না। মুফাসসিররা রানীর নাম বিলকিস উল্লেখ করেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন)।

২৪. 'আর আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। আর শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকর্মকে শোভন করে রেখেছে। এভাবে সে ওদের সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব ওরা সরলপথ পাচ্ছে না[১]।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

২৫. '(সরলপথ এই যে), ওরা শুধু আল্লাহকে সেজদা করবে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করেন এবং তিনি জানেন- যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর[২]।

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ এ জাতি সূর্য-পূজক। শয়তান ওদের বিভ্রান্ত করেছে এবং শিরেকী রীতি-নীতি ও কর্মকাণ্ডকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছে। এ জন্যই ওরা হেদায়াতের পথ পাচ্ছে না।

এসব কথা বলে হুদহুদ পাখি যেন সেই জাতির বিরুদ্ধে সুলায়মান আলাইহিস সালামকে জেহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করল।

২. খুব সম্ভব এও হুদহুদের বক্তব্যের অংশ। এতে বোঝা যায়, সৃষ্টিগত-স্বভাবগতভাবে জীবজন্তুরও আপন স্রষ্টার সঠিক মারেফত আছে। এও হতে পারে, অস্বাভাবিকরূপে সেই হুদহুদকে এ বিষয়ে বিশেষ মারেফত প্রদান করা হয়েছিল। এ অসম্ভব কিছু না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমন মারেফত একখণ্ড শুষ্ক কাঠের মধ্যেও পয়দা করে দিতে পারেন।

অবশ্য জীবজন্তুর মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে আপন স্রষ্টার সাধারণ মারেফত (সদরে শিরাজি اسفار اربعة-তে যাকে বলেছেন شعور بسيط বা علم حضوري) আছে বলে তাদের প্রতি নবী প্রেরিত হতে হবে—এমন কথা নেই। কারণ, এ মারেফত كسبي (তথা জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি খাটিয়ে অর্জন করা) নয়, বরং নিছক সৃষ্টিগত। আর নবী-প্রেরণের সম্পর্ক كسبيات-এর সাথে। অনুরূপ, কোন কিছুর মধ্যে কোন পর্যায়ের বুদ্ধি ও অনুভূতি থাকলেই তার مكلف (শরঈ বিধানের আওতাভুক্ত) হওয়া জরুরি নয়। যেমন: শরীয়ত নাবালককে مكلف সাব্যস্ত করেনি, যদিও সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে তার মধ্যে বিশেষ পরিমাণ বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে। এ থেকে জীবজন্তুর বুদ্ধিমত্তার আন্দাজ করা যেতে পারে।

বি. দ্র. হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বালির নীচ থেকে কিড়া বের করে খাওয়াই হুদহুদের রুযী। সে শস্যকণা বা ফলমূল কোনটাই খায় না। তার দ্বারা আল্লাহর এ কুদরতেরই প্রকাশ পেয়ে থাকে।'—সম্ভবত এ জন্যই এখানে বিশেষভাবে يخرج الخبء উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬. 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি[১]।'

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩

২৭. সুলায়মান বললেন, 'আমি এখনই যাচাই করে দেখছি, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী[২]।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

২৮. 'তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটি ওদের নিকট অর্পণ কর। অতঃপর ওদের নিকট থেকে সরে আসবে এবং দেখবে, ওরা উত্তরে কী বলে?[*৩]

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝

২৯. সে (নারী) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার নিকট একটি মর্যাদাপূর্ণ পত্র অর্পণ করা হয়েছে।

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝

৩০. 'পত্রটি সুলায়মানের পক্ষ থেকে[৪] এবং তা এই– 'আল্লাহর নামে (শুরু), যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

---

১. অর্থাৎ তাঁর মহা আরশের সাথে বিলকিসের সিংহাসনের কোন তুলনাই হতে পারে না।

২. অর্থাৎ তোমার সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা করছি।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'ওরা পরস্পরে কী বলাবলি করে'।

৩. অর্থাৎ সুলায়মান (আ) একটি পত্র লিখে হুদহুদের নিকট ন্যস্ত করলেন এবং বললেন, এটি সাবার রানীকে পৌঁছিয়ে দিয়ে উত্তর নিয়ে এসো। আর দেখো, পত্র পৌঁছিয়ে এক দিকে সরে যেয়ো। কেননা, পত্র পৌছানোর পর প্রাপকের মাথার উপর পত্রবাহকের দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এটা রাজদরবারের আদবেরও খেলাফ।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'তুমি (চিঠি অর্পণ করে) সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে যেয়ো, সেই সাথে সেখানকার পরিস্থিতিও অবলোকন করো। সে মতে হুদহুদ পত্র নিয়ে গেল এবং জানালার ফাঁক দিয়ে রাণীর ব্যক্তিগত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তার বুকের উপর তা রেখে দিল।'

৪. বিলকীস পত্রখানি পড়ে নিজ উপদেষ্টা ও সভাসদবর্গকে সমবেত করে বলল, 'এ পত্রখানি আমার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাশালী বাদশাহ (সুলায়মান) এর পক্ষ থেকে

৩১. 'তোমরা আমার মোকাবেলায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ো না, বরং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে আস[১]।'	اَلَّا تَعۡلُوۡا عَلَیَّ وَ اۡتُوۡنِیۡ مُسۡلِمِیۡنَ ﴿۳۱﴾

[রুকূ - ৩]

৩২. সে নারী বলল, 'হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দাও। আমি কোন বিষয় চূড়ান্ত করি না যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হও[২]।'	قَالَتۡ یٰۤاَیُّهَا الۡمَلَؤُا اَفۡتُوۡنِیۡ فِیۡۤ اَمۡرِیۡ ۚ مَا کُنۡتُ قَاطِعَۃً اَمۡرًا حَتّٰی تَشۡهَدُوۡنِ ﴿۳۲﴾
৩৩. তারা বলল, 'আমরা শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। তবে (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) ক্ষমতা আপনার হাতে। অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, কী আদেশ করবেন[৩]।'	قَالُوۡا نَحۡنُ اُولُوۡا قُوَّۃٍ وَّ اُولُوۡا بَاۡسٍ شَدِیۡدٍ ۬ۙ وَّ الۡاَمۡرُ اِلَیۡکِ فَانۡظُرِیۡ مَاذَا تَاۡمُرِیۡنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং তার সম্মানিত ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। আর এরাও তাই করবে।	قَالَتۡ اِنَّ الۡمُلُوۡکَ اِذَا دَخَلُوۡا قَرۡیَۃً اَفۡسَدُوۡهَا وَ جَعَلُوۡۤا اَعِزَّۃَ اَهۡلِهَاۤ اَذِلَّۃً ۚ وَ کَذٰلِکَ یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۳۴﴾

বিস্ময়করভাবে পৌঁছেছে।' সম্ভবত রাণী আগে থেকেই হযরত সুলায়মানের নাম এবং তাঁর অতুলনীয় রাজত্ব ও শান-শৌকতের খ্যাতি শুনে থাকবে।

১. এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও অভিজাত পত্র সম্ভবত ইতিপূর্বে দুনিয়ার কেউ লিখতে পারেনি। পত্রের মর্ম এই ছিল যে, আমার মোকাবেলায় জোর দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। কল্যাণ এতেই যে, ইসলাম গ্রহণ কর এবং আজ্ঞাবহ হয়ে ভদ্রভাবে আমার সামনে হাযির হয়ে যাও। আমার সামনে তোমাদের গর্ব ও অহংকার কিছুই টিকবে না।

২. অর্থাৎ কী উত্তর দেওয়া যায় এবং কী কর্মনীতি গ্রহণ করা যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দাও। তোমরা তো জানই, আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

৩. অর্থাৎ আমাদের নিকট শক্তি ও ক্ষমতা এবং রণসম্ভারের কোন কমতি নেই, কোন বাদশাহর সামনে নত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আপনার আদেশ হলে আমরা সুলায়মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। এখন আপনার ইখতিয়ার। বুঝেসুঝে একটা হুকুম দিন, আমরা তা শিরোধার্য করে নেব।

বোঝা যায়, সভাসদবর্গের ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ করা। কিন্তু রাণী তাতে তাড়াহুড়া করা সমীচীন মনে করল না, বরং মধ্যবর্তী একটি উপায় অবলম্বন করল- সামনে তার উল্লেখ রয়েছে।

৩৫. 'আমি তাদের নিকট কিছু হাদিয়া পাঠাচ্ছি। অতঃপর দেখি, প্রেরিত দূতরা কী উত্তর নিয়ে আসে[১]।'

وَاِنِّیْ مُرْسِلَةٌ اِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৩৬. অতঃপর দূত সুলায়মানের নিকট আসলে তিনি বললেন, 'তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? তবে (শোন), আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে উত্তম। বরং তোমরাই নিজেদের হাদিয়া নিয়ে খুশি থাক*[২]।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَیْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَاۤ اٰتٰىنِ ۧ اللّٰهُ خَیْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

৩৭. 'তুমি ওদের নিকট ফিরে যাও। আমরা অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমনসব বাহিনী নিয়ে

اِرْجِعْ اِلَیْهِمْ فَلَنَاْتِیَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ

১. বোঝা যায়, পত্রের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা এবং অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা বিলকিস নিশ্চিত হয়েছিল যে, এই বাদশাহর উপর আমরা জয়লাভ করতে পারব না। কমসে কম জয়লাভ না করার আশঙ্কা তো অবশ্যই ছিল। তাই রাণী বলল, এমন শক্তিধর বাদশাহর সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ নয়। যদি তিনি জয়ী হন, তবে রাজা-বাদশাহদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী তোমাদের শহর-নগর ধ্বংস করে ছাড়বেন এবং তাতে মর্যাদাশালী সর্দারদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে।

এজন্য আমার মতে উত্তম এ-ই যে, যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করি। বরং তাদের শক্তি, মনের গতি, রাজত্বের ধরন-ধারণ বোঝার চেষ্টা করি এবং এরও সন্ধান নিই যে, তাঁর হুমকির পিছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের কাছ থেকে কী চাচ্ছেন। যদি আমরা কিছু হাদিয়া-তুহ্ফা পাঠিয়ে আসন্ন মুসিবত মাথার উপর থেকে হটাতে পারি, তবে সেটাই সবচেয়ে উত্তম হবে। নতুবা তাঁর অভিপ্রায় কী, তা জেনে সেই মত কর্মপন্থা অবলম্বন করব।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বিলকীস বুঝতে চাচ্ছিল, বাদশাহর আগ্রহ কোন্ জিনিসে– ধন-সম্পদে, সুন্দর মানুষে, না দুর্লভ বস্তু-সামগ্রীতে। তাই সব রকমের জিনিস উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাল।'

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'আসলে, তোমরা তোমাদের হাদিয়া নিয়ে উৎফুল্ল'।

২. অর্থাৎ এই উপঢৌকন তোমাদের কাছেই থাকুক। তোমরা কি আমাকে নিছক একজন পার্থিব বাদশাহ মনে করছ যে, ধন-দৌলতের লোভ দেখাচ্ছ? তোমাদের জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে রূহানী ও জাগতিক দৌলত দান করেছেন, তা তোমাদের রাজ্য ও দৌলত থেকে অনেক উত্তম। এসব জিনিসপত্রের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

আসব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি ওদের নেই এবং আমরা সেখান থেকে ওদের অপদস্থ করে বের করে দেব, আর ওরা হবে লাঞ্ছিত*[১]।'

لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ۝

৩৮. সুলায়মান বললেন, 'হে পারিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আমার নিকট তার সিংহাসন নিয়ে আসবে– ওরা অনুগত হয়ে আমার নিকট আসার পূর্বেই[২]?

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ۝

৩৯. জিনদের মধ্যকার এক দৈত্য বলল*, 'আমি আপনার কাছে তা নিয়ে আসব আপনি নিজের

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ

☆ দ্বিতীয় তরজমা–'আর ওরা হবে বশীভূত'।

১. অর্থাৎ ওরা বন্দী হবে, দেশান্তরিত হবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ধন-সম্পদ ও রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (রা) লেখেন– আর কোন নবী এভাবে কথা বলেননি। সুলায়মান (আ) কে আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমতা দান করেছিলেন। ফলে এভাবে বলতে পেরেছেন।

২. সংবাদবাহক ফিরে গিয়ে যুদ্ধের খবর দিল। বিলকীস বিলক্ষণ বুঝল, ইনি কোন সাধারণ বাদশাহ নন। তাঁর ক্ষমতার পিছনে খোদায়ী শক্তি রয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে লড়াই করে কোন ফায়দা হবে না। কোন কৌশলে, কোন শক্তিতে তাঁকে পরাজিত করা যাবে না! অবশেষে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে জাঁকজমকের সাথে হযরত সুলায়মানের খেদমতে হাযির হওয়ার জন্য রওনা হল।

শামের কাছাকাছি পৌঁছলে হযরত সুলায়মান নিজ সভাসদদের বললেন, এমন কেউ আছ কি, যে বিলকীস আমার দরবারে পৌঁছার পূর্বে তার সিংহাসন আমার সামনে এনে উপস্থিত করবে? এতেও হযরত সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিল– বিলকীসের উপর কয়েকভাবে খোদাপ্রদত্ত মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করা। যাতে রাণী বুঝে নেয় যে, তিনি একজন বাদশাহমাত্র নন, অন্য কোন অলৌকিক শক্তিও তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

বি. দ্র. قَبْلَ أَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ – দ্বারা বোঝা গেল, আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হরবীর (অর্থাৎ 'দারুল-হারব'এর কাফেরের) ধন-সম্পত্তি মুবাহ।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা–'প্রচণ্ড শক্তিধর (বা ধূর্ত-দুষ্ট) এক জিন বলল'।

قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝

স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই[১]। আর আমি তার বিষয়ে অবশ্যই সক্ষম, বিশ্বস্ত[২]।'

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْٓ

৪০. যার নিকট ছিল কিতাবের (বিশেষ) জ্ঞান সে বলল, 'আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসছি, আপনি (কোনো দিকে তাকিয়ে সেদিক থেকে) স্বীয় দৃষ্টি ফেরানোর পূর্বেই[৩]।' অতঃপর তিনি যখন তা নিজের নিকট বিদ্যমান দেখলেন, তখন বললেন— 'এ আমার রবের অনুগ্রহ[৪], যাতে আমাকে

---

১. হযরত সুলায়মানের রাজদরবার প্রতিদিন এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলত। এই জিনের কথার অর্থ এই ছিল যে, আপনি দরবার থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই আমি সিংহাসনটি এনে উপস্থিত করব। কিন্তু এতেও কিছুটা বিলম্ব হওয়ার ছিল। হযরত সুলায়মান আরো তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলেন।

২. আমি 'সক্ষম'– অর্থাৎ স্বীয় শক্তিতে খুব তাড়াতাড়ি উঠিয়ে আনতে পারব, আল্লাহ আমাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন। আর 'আমি বিশ্বস্ত'- অর্থাৎ এতে খেয়ানত করব না।

কথিত আছে, সিংহাসনটি বহু মূল্যবান ছিল। সোনা-চান্দি ও মণি-মুক্তাখচিত ছিল।

৩. অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এ ব্যক্তি হলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহচর ও উযির আসিফ ইবনে বরখিয়া, যিনি আসমানী কিতাবসমূহের বিশিষ্ট আলেম এবং আল্লাহর নাম ও কালামের বিশেষ গুণ ও প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি আরয করলেন, আমি চোখের পলকে সিংহাসন এনে হাযির করতে পারি। আপনি কোনো দিকে তাকান, সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরানোর আগেই সিংহাসন আপনার সামনে রাখা থাকবে।

৪. অর্থাৎ এটি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর ভর করে আসেনি, বরং আল্লাহর খাস দয়ায় আমার সাথী এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে, তার দ্বারা এমন কারামত প্রকাশ পাওয়া শুরু করেছে। আর যেহেতু ওলীর, বিশেষত নবীর সাহাবীর কারামত সেই নবীর মুজেযা ও তাঁরই আনুগত্যের ফল হয়ে থাকে, এ কারণে হযরত সুলায়মান মনে করলেন, এর শোকর আদায় করা জরুরী।

বি. দ্র. বোঝা গেল, মু'জেযা ও কারামত প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তি আল্লাহরই কার্য, যা (তাঁর) ওলী বা নবীর হাতে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সুতরাং যাঁর কুদরতে সূর্য বা পৃথিবীর গোলক এক মুহূর্তে হাজারো মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে, তাঁর পক্ষে চোখের পলকে বিলকীসের সিংহাসনটি মাআরিব থেকে শামে পৌঁছিয়ে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। বিশেষত যখন সূর্য ও পৃথিবীর তুলনায় বিলকীসের সিংহাসনের উদাহরণ এমন, যেমন অণু বনাম পাহাড়।

পরীক্ষা করেন যে, আমি শোকর করি, না না-শোকরী করি[১]। আর যে কেউ শোকর করে, সে শোকর করে নিজের জন্যই। আর কেউ না-শোকরী করলে নিশ্চয় আমার রব তো অমুখাপেক্ষী, মহানুভব[২]।'

ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ۝

৪১. সুলায়মান বললেন, 'তোমরা ঐ নারীর সিংহাসনটি (রূপ বদল করে) তার কাছে অচেনা করে দাও। আমরা দেখি, সে কি দিশা পায়, নাকি সে দিশা পায় না এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়[৩]।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

৪২. অতঃপর সে এসে পৌছলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এ রকম?' সে বলল, 'এ যেন সেটাই[৪]। আর আমাদের তো এ ঘটনার পূর্বেই সঠিক জ্ঞান দান করা

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

---

১. হযরত সুলায়মান প্রতি কদমে কদমে আল্লাহ তাআলার নে'য়ামতের কথা উপলব্ধি করতেন এবং সর্বদা শোকরগোযারীর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বলতে গেলে, এ ছিল اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا (হে দাঊদ-পরিবার! শোকরগোযারী করত কাজ করে যাও)— এ আয়াতের (সাবা : ১৩ নির্দেশ পালন।

২. অর্থাৎ শোকর করার লাভ মানুষের নিজেরই। কারণ, এতে দুনিয়া ও আখেরাতে অধিকতর নে'য়ামত ও অনুগ্রহ লাভের তাওফীক হয়। আর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় আল্লাহর কী ক্ষতি? তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার মোটেই মুখাপেক্ষী নন, তিনি তো সকল গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত এবং সমস্ত পরিপূর্ণতার উৎস। আমরা তাঁর নে'য়ামতের শোকর না করলেও তাঁর মহৎ গুণাবলি অপরিবর্তিতই থাকে, অর্থাৎ তাতে কিছুই হ্রাস পায় না। এ তাঁর দয়া যে, অকৃতজ্ঞদের তিনি সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না। এমন দয়াময়ের প্রতি যে অকৃতজ্ঞ, সে এক নম্বরের নির্লজ্জ ও নির্বোধ।

৩. অর্থাৎ সিংহাসনের রং-রূপ পরিবর্তন করে ফেল এবং এর আকার-আকৃতি বদলে ফেল, যা দেখে বিলকীস সহজে বুঝতে না পারে।— এ দ্বারা বিলকীসের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বোঝা যায় যে, তার মধ্যে হেদায়াত লাভের যোগ্যতা কতদূর আছে?

৪. তিনি এ কথা বলেননি, 'হাঁ, এটা তো আমার সিংহাসনই', আবার একেবারে নাও করেননি। প্রকৃত বিষয়টি ঠিক ঠিক বলে দিলেন যে, সিংহাসন সেটিই, তবে কোন কোন দিক থেকে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন যেহেতু উল্লেখযোগ্য নয়, তাই বলা যায়, এ যেন সেটিই।

হয়েছে এবং আমরা তখনই বশ্যতা স্বীকার করেছি[১]।'

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. সে আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর উপাসনা করত, সেসব থেকে তিনি তাকে নিবৃত্ত করলেন*; নিশ্চয় সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ভুক্ত[২]।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তাকে বলা হল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর'। সে যখন তা দেখল, তাকে এক জলাশয় মনে করল এবং নিজের গোছা অনাবৃত করল[৩]। তিনি বললেন, 'এ তো স্বচ্ছ কাঁচ লাগানো মসৃণ প্রাসাদ[৪]।' সে বলল, 'হে আমার রব!

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ

১. অর্থাৎ এই মুজেযা দেখাবার প্রয়োজন ছিল না, আগেই আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে, সুলায়মান শুধু বাদশাহই নন, বরং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এজন্যই আমরা আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পথ অবলম্বন করেছি।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'সে আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর উপাসনা করত, তা তাকে (ঈমান আনা থেকে) বিরত রেখেছিল'।

২. 'তিনি' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা, অথবা আল্লাহর হুকুমে সুলায়মান আলাইহিস সালাম রানী বিলকীসকে সূর্য প্রভৃতির পূজা থেকে নিবৃত্ত করলেন, যার মধ্যে সে স্বজাতিসহ লিপ্ত ছিল।

অথবা অর্থ এই যে, সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হওয়ার আগে যে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি, এর কারণ এই যে, মিথ্যা দেবদেবীর কথা মনে পড়া এবং কাফের জাতির অনুকরণ ও সংশ্রব তাকে এমনটি করতে বাধা দিয়ে রেখেছিল। নবীর সংস্পর্শে পৌছামাত্র এই বাধা অপসারিত হয়ে গেল। নতুবা সুলায়মান আলাইহিস সালামের সত্যতার মোটামুটি জ্ঞান পূর্বেই লাভ হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ পানিতে নামার জন্য পায়ের গোছার কাপড় উত্তোলন করলেন, যেমন যে পানির গভীরতা ঠিক মত বুঝতে না পেরে পানিতে নামতে যায়, সে করে থাকে।

৪. হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম রাজদরবারে বসা ছিলেন। তাঁর সামনের চত্বরে পাথরের স্থলে কাঁচের ফরশ ছিল। স্বচ্ছ কাঁচ দূর থেকে পানির ন্যায় ঢেউ খেলছে বলে মনে হচ্ছিল। আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, কাঁচের নীচে সত্যিই জলাশয় ছিল, যার উপরিভাগে কাঁচের ছাদ দেওয়া হয়েছিল। রাণী পানিতে নামার জন্য পায়ের গোছা খুললে সুলায়মান ডেকে বললেন, এ কাঁচের ফরশ, পানি নয়। এতে তার নিকট নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং সুলায়মানের বুদ্ধির পূর্ণতা ধরা পড়ল। ফলে তিনি বুঝলেন যে, দীনের ব্যাপারেও সুলায়মান যা বুঝেছেন

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۝

আমি তো নিজের প্রতি অন্যায় করেছি, আর আমি সুলায়মানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করছি আল্লাহর নিকট, যিনি বিশ্বজগতের রব[১]।

[রুকূ - ৪]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِیْقٰنِ یَخْتَصِمُوْنَ۝

৪৫. নিশ্চয় আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই সালেহকে (এ বার্তাসহ) পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।' কিন্তু তখনই তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিবাদ করতে লাগল[২]।

قَالَ یٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

৪৬. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[৩]।'

তাই সঠিক হবে। তদুপরি এও দেখে নিলেন যে, তার স্বজাতি যে ধন-দৌলত নিয়ে গর্বিত, তা এখানে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান!

এ ঘটনায় সুলায়মান (আ:) যেন তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন যে, সূর্য-তারকার চমক দেখে ধোকা খাওয়া এবং এদের 'খোদা' মনে করে বসা এমন, যেমন কেউ চকচকে কাঁচ দেখে তাকে পানি মনে করল!

১. অর্থাৎ প্রভু হে! আমি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে সুলায়মানের পথ অবলম্বন করছি। এত দিন পর্যন্ত আমি কুফর ও শিরকে লিপ্ত থেকে নিজের উপর বড় জুলুম করেছি। এখন এসব থেকে তওবা-করত তুমি প্রভু-প্রতিপালকের অভিমুখী হচ্ছি।

২. অর্থাৎ ঈমানদারদের দল এবং কাফেরদের দল, যেমন: মক্কার লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে দু'দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া-কলহ শুরু করে। ছামূদ জাতির কলহের কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সূরা 'আরাফ' এর এই আয়াতগুলিতে (৭৫-৭৬) গত হয়েছে- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ الخ

৩. হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাদের খুব বোঝালেন, নানাভাবে নসীহত করলেন এবং সর্বশেষে আযাবের হুশিয়ারি শোনালেন। তখন ওরা বলতে লাগল- قَالُوْا یٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ অর্থাৎ আপনি সত্য হলে আমাদের উপর খোদায়ী আযাব পতিত করুন, বিলম্ব কিসের?

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ۝

৪৭. ওরা বলল, 'আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের অলক্ষুণে মনে করি[১]।' তিনি বললেন, 'তোমাদের অকল্যাণের (কারণ) আল্লাহর ইলমে আছে[২]। বস্তুত তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে[৩]।'

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ۝

৪৮. আর সেই শহরে নয় ব্যক্তি ছিল, যারা যমীনের বুকে ফেতনা-ফাসাদ করত এবং সংশোধনের কাজ করত না[৪]।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا

৪৯. ওরা (পরস্পরে) বলল, 'তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা অবশ্যই রাতের বেলায় তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা

হযরত সালেহ বললেন, হতভাগারা! দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ঈমান, তওবা ও মঙ্গলের পথ অবলম্বন না করে উল্টা অমঙ্গল কামনায় তাড়াহুড়া করছ। দুঃসময় এসে গেলে সমস্ত দর্প–অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে। এখনো সময় আছে, পাপাচার থেকে তওবা করে নিজেদের রক্ষা কর। তোমরা তওবা ও এস্তেগফার কর না কেন, যাতে আল্লাহ তাআলা আযাবের বদলে তোমাদের উপর রহমত নাযিল করেন?

১. অর্থাৎ যখন থেকে আপনার অশুভ আগমন হয়েছে এবং এসব বলতে শুরু করেছেন, তখন থেকে আমরা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কষ্টে পতিত হচ্ছি এবং আপনার কারণে আমাদের ঘরে ঘরে লড়াই-ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে।

২. অর্থাৎ এ কষ্ট-যাতনা বা অমঙ্গল আমার কারণে নয়, বরং তোমাদেরই দুর্ভাগ্যের কারণে। যে দুর্ভাগ্য তোমাদেরই দুষ্কৃতি ও অসৎকর্মের ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন (সুতরাং তোমাদের অকল্যানের কারণ তোমাদের পাপাচার)।

৩. অর্থাৎ কুফরের শাস্তিরূপে তোমাদের উপর দুঃখ-কষ্ট আপতিত করে পরীক্ষা করা হচ্ছে– তোমরা উপলব্ধি কর কিনা এবং সতর্ক হও কিনা ।

৪. এই নয় ব্যক্তি সম্ভবত নয়টি দলের প্রধান ছিল, যাদের কাজ দেশে ফেতনা-ফাসাদের প্রসার এবং বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। সংশোধন ও সংস্কারের প্রতি কখনো ওরা নজর দিত না।

কোন কোন মুফাসসির এদের নামও লিখেছেন।

মক্কাতেও কাফেরদের নয়জন প্রধান ছিল, যারা সর্বদা ইসলামের মূলোৎপাটন ও রাসূল (সা) এর শত্রুতায় সচেষ্ট থাকত।

مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۝

করব। অতঃপর তার ওয়ারিসকে (রক্তের দাবিদারকে) বলে দেব, 'আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষও করিনি,* আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী[১]।'

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

৫০. এভাবে ওরা এক চক্রান্ত করল। আর আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ ওরা বুঝতেই পারেনি[২]।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ۝

৫১. অতএব দেখে নাও, ওদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হল যে, আমি ওদের ও ওদের গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে ফেললাম[৩]।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'হত্যাকাণ্ডের সময়ে (বা: স্থানে) উপস্থিতই ছিলাম না।'

১. অর্থাৎ ওরা পরস্পর সংকল্প ও কসম করল যে, সকলে মিলে রাতে হযরত সালেহর ঘরে আক্রমণ করবে এবং কাউকেই জীবিত রাখবে না। অতঃপর কেউ তাদের রক্তের দাবি করলে বলে দেবে, আমরা কিছুই জানি না। আমরা সত্য বলছি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতেই আসেনি। অর্থাৎ আমরা এহেন কাজ করা তো দূরের কথা, ঘটনাস্থলেই আমরা উপস্থিতই ছিলাম না। এ ধরনের সম্মিলিত কূটকৌশল ও মিথ্যা কথার জোরে আমাদেরকে কেউ অভিযুক্ত সাব্যস্ত করতে পারবে না। ফলে তাঁর আত্মীয়দের পক্ষে আমাদের থেকে রক্তের প্রতিশোধ নেওয়াও সম্ভব হবে না।

২. ওদের চক্রান্ত উল্লিখিত সেই মিথ্যা ষড়যন্ত্র, আর আল্লাহর কৌশল ছিল ওদের ঢিল দেওয়া— যেন খুব সাধ মিটিয়ে যত দুষ্কৃতি করার করে নেয়, যাতে মহাশাস্তির পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে যায়, কোন অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। ওরা মনে করছিল, আমরা হযরত সালেহকে খতম করতে যাচ্ছি। অথচ ওদের খবর ছিল না যে, ভিতরে ভিতরে ওদেরই মূলোচ্ছেদ হচ্ছে এবং ওরাই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ওদের ধ্বংসের কারণগুলো পূর্ণতা পাচ্ছিল। কারণ, দুষ্কৃতি ষোলকলায় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত ধ্বংস আসে না।'

৩. প্রথমে সেই নয় দলপতি যোগসাজশ করে উটনীকে বধ করল। হযরত সালেহ বললেন, এখন আর তিন দিনের বেশি অবকাশ পাবে না, আযাব আসবেই আসবে। তখন ওরা পরস্পর সিদ্ধান্ত নিল, আমাদের তিন দিন পর ধ্বংস করে দেওয়া হবে নাকি। এর আগে তাঁকেই ধ্বংস করে ফেল।

সে মত ওরা রাতের বেলায় হযরত সালেহর ঘর আক্রমণ করার এবং পরিবারবর্গসহ তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। তারা এ নাপাক ইচ্ছা পূরণার্থে প্রস্তুত হয়ে বের হল। অন্যান্য কাফের ওদের অনুগত বা সহযোগী ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত সালেহকে রক্ষা করলেন,

৫২. ওই যে ওদের বাড়ীঘর ওদেরই জুলুমের কারণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে[১]। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য[২]।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥٢

৫৩. আর আমি তাদের রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং (কুফর-শিরক থেকে) বেঁচে থাকত[৩]।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝٥٣

৫৪. এবং (পাঠিয়েছিলাম) লূতকে, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা কি দেখে-শুনে অশ্লীল কাজ করছ*[৪]?

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٥٤

৫৫. 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন কর? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়[৫]।'

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝٥٥

ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়ে দিলেন। আর উক্ত নয় ব্যক্তি আসমানী আযাবে ধ্বংস হল এবং নিজেদের সাথে জাতিকেও ধ্বংস করল।

১. মক্কাবাসীরা শামের সফরকালে পথে ছামূদ জাতির লোকালয়সমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেত। فتلك بيوتهم خاوية– বর্তমান আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

২. অর্থাৎ ওদের লোকালয়ের পাশ দিয়ে যাতায়াতকারীদের উচিত উক্ত ভীতিকর ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৩. অর্থাৎ সালেহ (আ)–এর সঙ্গীসাথী, যারা ঈমান এনেছিল এবং কুফর ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকত, তাদের আমি আযাবের কবল থেকে রক্ষা করলাম।

আল্লাহর কুদরত দেখ– মুমিন ও কাফেররা একসঙ্গে একই লোকালয়ে বাস করে। কিন্তু আযাব যখন আসে, তখন বেছে বেছে কাফেরদের ধ্বংস করে, মুমিনদের স্পর্শও করে না।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছ, অথচ তোমরা নিজেরাও জান (যে, তা কত মন্দ কাজ)'!

৪. অর্থাৎ তোমরা (বিলক্ষণ) দেখছ এবং বুঝ, এটা কীরূপ নোংরা ও কদর্য কাজ! তারপরও এতে লিপ্ত হচ্ছ।

৫. অর্থাৎ তোমরা বুঝছ না যে, এ নির্লজ্জতার পরিণাম কী হবে? এক নম্বরের জাহেল ও আহমক তোমরা।

৫৬. তখন তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোনই উত্তর ছিল না যে, ওরা বলতে লাগল, লূতের পরিবারবর্গকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা তো এমন লোক, যারা খুব পবিত্র থাকতে চায়[১]।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ۝

৫৭. অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম[২]—তাঁর স্ত্রী ছাড়া; আমি ওকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলাম[৩]।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ۝

৫৮. আর ওদের উপর বর্ষণ করলাম এক বিশেষ বৃষ্টি। অতএব যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের বৃষ্টি কতই না মন্দ ছিল[৪]।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ নিজেদের বড় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বানাতে চায়। সুতরাং আমাদের মত নাপাকদের সাথে তাদের থাকার দরকার কী?

২. অর্থাৎ অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম, আর এদের রক্ষা করলাম।

৩. অর্থাৎ হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেল, সে এই বদমাশদের সাহায্য-সহায়তা করত।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করলেন এবং শহরটি উল্টিয়ে দিলেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) উপরোক্ত তিন ঘটনা (অর্থাৎ হযরত সুলায়মান আ., সালেহ আ. ও লূত আ. এর ঘটনা) সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন— হযরত সুলায়মানের ঘটনায় বলা হয়– আমরা এমন বাহিনী নিয়ে আসব, যাদের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কাবাসীদের ক্ষেত্রেও মক্কা বিজয়ের সময় একই অবস্থা হয়েছে।

আর হযরত সালেহ (আ)-এর ঘটনায় নয় ব্যক্তি রাতের বেলায় তাঁকে আক্রমণ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন এবং ওদের ধ্বংস করলেন। মক্কার লোকেরাও এমনই চেয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। যে রাতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, সেই রাতে কত কাফের এ উদ্দেশ্যে তাঁর ঘর ঘিরে রেখেছিল যে, ভোরের অন্ধকারে বের হওয়ামাত্র সকলে একজোট হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে (যাতে একজনকেও রক্তপণ না দিতে হয়।) হুযূর (সা) দিব্যি অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে গেলেন, ওরা বুঝতে পারল না।

আর লূতের জাতি চেয়েছিল পয়গম্বরকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিতে। মক্কাবাসীরাও তাই চেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ ইচ্ছায় শহর ছেড়ে বের হয়ে যেতে বললেন। আর এতেই তার উদ্দেশ্য সফল করলেন।

[রুকূ - ৫]

৫৯. আপনি বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি (বর্ষিত হোক) তাঁর বান্দাদের প্রতি, যাদের তিনি মনোনীত করেছেন[১]। আচ্ছা! উত্তম কি আল্লাহ, না তারা, যাদের ওরা শরীক করে[২]?	قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

পারা - ২০

৬০. আচ্ছা, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন* এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তার	اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ

১. উল্লিখিত কাহিনীসমূহ বর্ণনা করার পর آلله خير أما يشركون থেকে তাওহীদের বয়ান আরম্ভ হচ্ছে। বয়ানের শুরুতে খুতবা হিসাবে এ শব্দাবলি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে– الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'এখানে আল্লাহর প্রশংসা ও পয়গম্বরের প্রতি সালাম প্রেরণ করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।'

আর কোন কোন মুফাসসির বলেন, পূর্বে বর্ণিত কাহিনীগুলির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যেসব গুণ-গরিমা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণে পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করতে এবং তাঁর শোকর আদায় করতে বলা হয়েছে। এবং সাথে সাথে তাঁর মকবূল বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করতেও বলা হয়েছে, যাঁদের কয়েকজনের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এখান থেকে তাওহীদের বর্ণনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনাবলি শুনে এবং সৃষ্টিরাজ্যে বিদ্যমান আল্লাহর কুদরতের নির্দশনাদি ও কুরআন পাকে বর্ণিত দলীল-প্রমাণাদিতে গভীরভাবে চিন্তা করে তোমরাই বল– শরীকবিহীন এক আল্লাহকে মান্য করা উত্তম, লাভজনক ও যুক্তিযুক্ত, না তাঁর অক্ষম সৃষ্টিকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা উত্তম?

এটি এমন কোন কঠিন প্রশ্ন নয়, যার উত্তর দিতে অনেক মাথা ঘামাতে হবে বা তাতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তবুও অধিকতর উপদেশ দান ও সতর্ক করণের উদ্দেশ্যে সামনে আল্লাহ তাআলার কিছু শান ও গুণ বর্ণিত হচ্ছে। এগুলি তাওহীদের অকাট্য প্রমাণবিশেষ।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'(উত্তম কি তোমাদের শরীকরা), না সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ...।

حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ۞

দ্বারা মনোরম বাগানসমূহ উৎপন্ন করেছি? তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তার গাছপালা উৎপন্ন করা[১]। (অতএব) আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো প্রভু আছে কি? না, কিন্তু ওরা এমন সম্প্রদায়, যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়[২]।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ

৬১. আচ্ছা, কে পৃথিবীকে বাসস্থান বানিয়েছেন[✯][৩], তার মাঝে-মাঝে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন, তার (স্থিতির) জন্য সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন[৪] এবং দুই দরিয়ার মাঝে রেখেছেন অন্তরায়[৫]?

---

১. অর্থাৎ গাছ ও তরু-লতা উৎপাদন করার ক্ষমতাই তোমাদের নেই। তাতে ফুল-ফল উদ্‌গত করা তো আরো পরের বিষয়।

২. অর্থাৎ সমগ্র জগত জানে এবং মুশরিকরাও মানে যে, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা ও গাছপালা উৎপাদন করা– এ সবই আল্লাহ তাআলার কাজ, আর কারো নয়। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এ বিষয়ে খোদ ওদের স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। অতএব এতদূর মানার পরও ওরা কেন পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে? আল্লাহ তাআলা ছাড়া যখন এমন কোন সত্তা নেই, যে সৃষ্টি ও পালন করতে পারে অথবা কোন বিষয়ের স্বতন্ত্র ক্ষমতা রাখে, তখন আল্লাহর ঈশ্বরত্বে ও উপাস্যতায় আর কেউ কী করে অংশীদার হতে পারে? আর 'ইবাদত' হচ্ছে চরম বিনয়ের নাম। সুতরাং ইবাদত একমাত্র সেই মহান সত্তার হতে হবে, যিনি চরম পর্যায়ে পরিপূর্ণ ও ক্ষমতাবান। কোনো অপূর্ণ ও অক্ষম সৃষ্টিকে উপাস্যতায় স্রষ্টার সমকক্ষ করে দেওয়া চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা।

✯ দ্বিতীয় তরজমা–'(উত্তম কি তোমাদের শরীকরা), না সেই সত্তা– যিনি পৃথিবীকে বাসস্থান...'।

৩. অর্থাৎ পৃথিবী হচ্ছে মানুষ ও জীবজন্তুর বাসস্থান। তারা আরামে এর বুকে জীবন যাপন করে এবং এতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হয়।

৪. (رواسي)- অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী স্থির থাকে, প্রকম্পিত না হয়।

৫. এর বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা 'ফুরকান'-এ গত হয়েছে। এ সূরার ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ

(অতএব) আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো প্রভু আছে কি? না, তবে ওদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[১]।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ

৬২. আচ্ছা, কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করে দেন[২]? এবং কে পৃথিবীতে তোমাদের (এক দলকে অপর দলের) স্থলাভিষিক্ত করেন*[৩]? (অতএব) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো প্রভু আছে কি? তোমরা সামান্যই শিক্ষা গ্রহণ কর[৪]।

---

১. আর কোন ক্ষমতাবান সত্তা আছে কি, যার দ্বারা এসব কাজ সাধিত হতে পারে এবং এ কারণে সে উপাস্য হওয়ার যোগ্য? যেহেতু নেই, তাই বোঝা গেল, এ মুশরিকরা নিতান্ত মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাহেতু শিরক ও সৃষ্টির পূজায় লিপ্ত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, অস্থির ও অসহায় ব্যক্তির ফরিয়াদ শুনে তার বিপদ দূর করে দেন। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে- فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ (অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাক, তা দূর করে দেন । –সূরা আন'আম, আয়াত ৪১)

বস্তুত আল্লাহ দো'য়াকে স্বাভাবিক কারণসমূহের একটি বানিয়েছেন। ফলে তাঁর ইচ্ছায় দো'য়াটি বা ফরিয়াদটি কবুল হয়, তবে তখন, যখন কবুলের শর্তাবলি পাওয়া যায়, এবং তার বাধাসমূহ না থাকে।

আল্লামা তীবী (র) প্রমুখ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টের সময় তোমরাও তো অস্থির হয়ে তাঁকেই ডেকে থাক, তখন অন্যান্য উপাস্যকে ভুলে যাও। অতএব মানব-স্বভাব ও অন্তরের এই সাক্ষ্যকে শান্তি ও নিরাপত্তার সময় কেন স্মরণ রাখ না?

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'কে তোমাদের যমীনের খলীফা বানান?'

৩. অর্থাৎ এক জাতি বা গোষ্ঠী তুলে নেন এবং তার স্থলে অন্য জাতি বা গোষ্ঠী আবাদ করেন, যারা পৃথিবীর বস্তুরাজি স্বাধীনভাবে ও ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করে থাকে।

৪. অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা থাকলে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না, বরং নিজেদেরই বিবিধি প্রয়োজন ও অক্ষমতা এবং জাতিসমূহের রদবদল দেখে বুঝতে পারত যে, যিনি সকল প্রয়োজন পূরণ করেন এবং মানবের এক দলের পর অপর দল আবাদ করেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

৬৩. আচ্ছা, স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারপুঞ্জে কে তোমাদের পথপ্রদর্শন করেন[১] এবং কে তাঁর রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন[২]? (অতএব) আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো প্রভু আছে কি? আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে, যাকে ওরা শরীক করে[৩]।

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আচ্ছা, কে সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন[৪]? আর কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দেন[৫]? (অতএব) আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো প্রভু আছে কি? আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৬]।'

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

---

১. অর্থাৎ স্থলভাগের ও জলভাগের অন্ধকারে তারকার দ্বারা তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করে থাকেন, সরাসরি হোক অথবা কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে।

২. অর্থাৎ বৃষ্টির রহমত বর্ষণের পূর্বে তিনি বাতাস প্রবাহিত করেন, যা আসন্ন বৃষ্টির সুসংবাদ বহন করে।

৩. অর্থাৎ কোথায় সেই সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ, আর কোথায় অক্ষম ও অপূর্ণ সৃষ্টি, যাকে তাঁর প্রভুত্বে শরীক করা হচ্ছে!

৪. সৃষ্টির সূচনা যে আল্লাহ তাআলার কাজ, এ তো সকলেই স্বীকার করে। এ থেকে মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করার বিষয়টিও বুঝে নাও। পরজীবনকে অস্বীকারকারীরাও এ কথা বুঝত যে, যদি পুনরায় জীবিত করা হয়, তবে এ তাঁরই কাজ হবে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।

৫. অর্থাৎ কে তিনি, যিনি আসমানী ও পার্থিব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে নিজ হেকমত অনুযায়ী তোমাদের রিযিক দান করেন?

৬. অর্থাৎ এত পরিষ্কার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ শোনার পরও যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও শিরকের অসারতা স্বীকার না কর, তবে নিজেদের বাতিল দাবির সপক্ষে যদি কোন দলীল-প্রমাণ থাকে, তবে তা পেশ কর। এখনি তোমাদের দাবির বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের হাতে দলীল ও প্রমাণ কোথায়? শুধুই অন্ধ অনুসরণ।

৬৫. আপনি বলুন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না[১]।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

১. এ আয়াতের মধ্যে পূর্ববর্তী বিষয়ের সমাপ্তি ও পরবর্তী বিষয়ের সূচনা রয়েছে।

বর্তমান পারার শুরু থেকে এখান পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সার্বিক ক্ষমতা, সর্বব্যাপী রহমত ও পরিপূর্ণ রুবুবিয়াতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার সারাসার এই যে– তিনি যখন এসব গুণ ও মান-মর্যাদায় একক-অদ্বিতীয়, তখন উলূহিয়ত বা উপাস্যতায়ও তাঁকে একক-অদ্বিতীয় হতে হবে।

বর্তমান আয়াতে তাঁর উলূহিয়ত সম্বন্ধে আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, মা'বূদ তিনিই হতে পারেন, যিনি সার্বিক ক্ষমতার সঙ্গে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞানেরও অধিকারী। বলা বাহুল্য, এ এমনি এক গুণ, যা নিখিল বিশ্বের কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। একমাত্র মহাপ্রভুই এ মহাগুণে গুণান্বিত। সুতরাং এ হিসাবেও উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই সত্তার জন্য নির্ধারিত ।

علم الغيب (গায়বের ইলম) ও عالم الغيب সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা

সকল গায়বী তথা অদৃশ্য বিষয়ের ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আর কোন একটি গায়বী বিষয়ের ইলমও আল্লাহর দেওয়া ছাড়া স্বকীয়ভাবে কোন মানুষ লাভ করতে পারে না। তদ্রূপ গায়বের চাবিসমূহও (যার উল্লেখ সূরা 'আনআমে' (৫৯) করা হয়েছে) আল্লাহ কোন সৃষ্টির হাতে দেননি।

হাঁ, তিনি নিজ ক্ষমতায় কোন কোন বিশেষ বান্দাকে কোন কোন গায়বের বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে দেন, যে কারণে বলা যেতে পারে, অমুক বক্তিকে আল্লাহ তাআলা গায়বের বিষয়ে অবহিত করেছেন, অথবা গায়বের খবর দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এতটুকু কারণে কুরআন ও হাদীসের কোথাও এমন ব্যক্তিকে عالم الغيب বলা হয়নি। বরং তার সম্পর্কে يعلم الغيب শব্দও ব্যবহার করা হয়নি, অধিকন্তু হাদীসসমূহে একে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৫৫) এ জন্যই বিজ্ঞ আলেমগণ এ ধরনের শব্দাবলি কোন বান্দার জন্য প্রয়োগ করার অনুমতি দেন না, যদিও নিছক আভিধানিক দিক দিয়ে এটা ভুল নয়।

যেমন: কারো এ রকম বলা– إن الله لايعلم الغيب (গায়বের ইলম আল্লাহর নেই), খুবই অন্যায় ও বেআদবী, যদিও তার উদ্দেশ্য এই থাকে যে, আল্লাহ তাআলার হিসাবে কোন জিনিস গায়বই না। অথবা কেউ الحق দ্বারা মৃত্যু, الفتنة দ্বারা সন্তানাদি ও الرحمة দ্বারা বৃষ্টির অর্থ নিয়ে বলল- إني أكره الحق واحب الفتنة وأفر من الرحمة –এরূপ বলা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও দূষণীয়, অথচ নিয়ত ও উদ্দেশ্য হিসাবে কথা ভুল না। অনুরূপ فلان عالم الغيب ইত্যাদি শব্দের ব্যাপারটি বোঝা উচিত।

উল্লেখ্য, 'গায়বের ইলম' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কেবল 'আন্দাজ-অনুমান' ও 'ধারণা-কল্পনা' নয়। এবং যে ইলম লক্ষণ ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়, তাও নয়। বরং যে ইলম কোন প্রমাণ ও আলামতের মাধ্যম ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে হাসিল হয়, তা উদ্দেশ্য। সূরা 'আনআম'

وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ۞

আর তাদের এ কথা জানা নেই যে, কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে[১]।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ۞

৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে ওদের বিদ্যা-বুদ্ধি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।* বরং ওরা তা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং ওরা তার বিষয়ে অন্ধ[২]।

[রুকূ - ৬]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ۞

৬৭. যারা কাফের তারা বলে, 'কী! যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মাটি হয়ে যাব, তারপরও আমাদের (মাটি থেকে) বের করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۞

৬৮. 'আমাদের ও ইতিপূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরও তো এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে! এসব পূর্ববর্তীদের মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়[৩]।'

(আয়াত ৫৯) ও 'আ'রাফ' (আয়াত ১৮৮) এর মধ্যে এ বিষয় সম্পর্কে আরো লেখা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে, যার পর মৃতদের পুনরায় জীবিত করা হবে– এর খবর তাদের কারো কাছে নেই।

পূর্ব থেকে সৃষ্টির সূচনার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, এখান থেকে পুনর্জীবনের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'আখেরাতের (সময়ের) বিষয়ে ওদের জ্ঞান অক্ষম হয়ে গেছে'।

২. অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তারপরও আখেরাতের তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেনি। ফলে কখনো সন্দেহ পোষণ করে, কখনো অস্বীকার করে।

আর কোন কোন মুফাসসির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ওদের জ্ঞান আখেরাতের সঠিক উপলব্ধি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কিন্তু এই উপলব্ধি না থাকায় তা সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে– এমন নয়, বরং তা সম্পর্কে দ্বিধা-সন্দেহে পড়ে রয়েছে। শুধু দ্বিধা-সন্দেহই নয়, বরং সেসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাদি থেকে চোখ মুদে রয়েছে, যা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে সন্দেহের নিরসন হতে পারত।

৩. অর্থাৎ অতীতেও আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এ ওয়াদাই করা হয়েছিল। যা-কিছু পূর্বে বলা হয়েছিল, আজ এ পয়গম্বরও তাই আওড়াচ্ছেন। কিন্তু কত যুগ চলে গেল, আমরা তো আজ

৬৯. আপনি বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল[১]।'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৭০. আর আপনি ওদের কারণে দুঃখ করবেন না এবং ওরা যে চক্রান্ত করে তার কারণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না[২]।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

৭১. ওরা বলে, 'এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (বল), যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৩]।'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৭২. আপনি বলুন, 'হতে পারে, তোমরা যে জিনিস তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তার অংশবিশেষ তোমাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে[৪]।'

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

পর্যন্ত কোন মৃত ব্যক্তি মাটিতে মিশে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার জীবিত হয়েছে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে দেখিওনি, শুনিওনি।

১. অর্থাৎ কত কত অপরাধী দুনিয়াতেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেয়েছে এবং পয়গম্বরদের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। এ থেকেই বুঝে নাও যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং পরকালীন আযাবের যে খবর নবীগণ দিয়ে এসেছেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এ বিশ্বজগত এমন নয় যে, তার কোন প্রভু নেই এবং তিনি নিজ বান্দাদের মুফতে ছেড়ে দেবেন। এখানে যেহেতু সকল অপরাধী পূর্ণ শাস্তি পায় না, অতএব নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় একটি জীবন হবে, যেখানে প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। তোমরা যদি একে অস্বীকারই করতে থাক, তবে অন্য অস্বীকারকারীদের দুনিয়াতে যে পরিণাম হয়েছে, তোমাদেরও তা হতে পারে।

২. অর্থাৎ ওদের বুঝিয়ে এবং অসৎকর্মের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে আপনি নির্ভার হয়ে যান। যদি ওরা না মানে, তবে আপনি বেশি দুঃখ ও আফসোস করবেন না এবং সত্যের বিরুদ্ধে ওদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আপনি তো নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। এরূপ ধৃষ্ট পাপাচারীদের ব্যাপার আল্লাহ তাআলা নিজেই বুঝে নেবেন এবং পূর্ববর্তী পাপাচারীদের মত ওদেরও শাস্তি দেবেন।

৩. অর্থাৎ সেই কিয়ামত কবে আসবে? আর যে আযাবের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে, তা কবে নাযিল হবে?

৪. অর্থাৎ তাড়াহুড়া করো না, উক্ত ওয়াদা পূর্ণ হবেই হবে। আর সম্ভাবনা আছে যে, ওয়াদার কিছু অংশ তোমাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই তো বেশি দিন অতিবাহিত হতে পারেনি, তার আগেই বদরের যুদ্ধে শাস্তির কিছুটা মজা ওরা ভোগ করেছে। বাকী রইল 'কিয়ামতে কুব্‌রা' (বড় ও আসল কিয়ামত)- তো তারও কতিপয় লক্ষণ ও আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

৭৩. নিশ্চয় আপনার রব মানুষের প্রতি সদয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই শোকর করে না[১]।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ۝
৭৪. এবং নিশ্চয় আপনার রব জানেন— যা তাদের অন্তর গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।	وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ۝
৭৫. আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে নেই[২]।	وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۝
৭৬. এ কুরআন বনী ইসরাঈলের সামনে, তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছে তার অধিকাংশই বর্ণনা করে দেয় (অর্থাৎ সেসব বিষয়ে প্রকৃত সত্য কী, তা বলে দেয়)।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۝
৭৭. আর নিশ্চয়ই তা ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও রহমত[৩]।	وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি নিজ রহমতে আযাব অবতীর্ণ করায় বিলম্ব করেন, তবে এ অবকাশকে সৌভাগ্য মনে করা উচিত এবং তাঁর মেহেরবানীর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে ঈমান ও সৎকর্মের পথ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ওরা উলটা অকৃতজ্ঞতা করছে এবং নিজ মুখে আযাব চাচ্ছে।

২. অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন আমল, দিলের গুপ্ত বিষয়াদি, নিয়ত ও উদ্দেশ্য এবং আসমান ও যমীনের গোপন থেকে গোপনতর রহস্য— সবই আল্লাহর জ্ঞানে আছে এবং তাঁর হিসাবের খাতায় লিখিত রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয় যথাসময়ে সংঘটিত হবে, তাড়াহুড়া করে অথবা বিলম্ব চেয়ে কোন ফায়দা নেই। যে বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে স্থিরীকৃত হয়ে আছে, তা– আগে বা পরে– নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবেই এবং প্রত্যেকে তার আমল, নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ এখনো চূড়ান্ত ফয়সালা ও তা কার্যকরের সময় আসেনি, অবশ্য কী ফয়সালা হবে তা কুরআন ব্যক্ত করেছে ও জানিয়ে দিয়েছে। সে কালে আসমানী ইলম ও দীনী বিষয়াদিতে ‘বনী ইসরাঈল’কে সব চেয়ে জ্ঞানী মনে করা হত। কিন্তু আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও বর্ণনাদি সম্বন্ধে ওদের মাঝে যে মতবিরোধ ছিল, তার মীমাংসাও এই কুরআনই করেছে। বস্তুত পবিত্র কুরআনই সেই কিতাব, যা বিশ্ববাসীর নিকট আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী ও বিধান পৌঁছিয়েছে এবং ঈমান গ্রহণকারীদের পথপ্রদর্শন করেছে, যাতে মানুষ সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখে, যেদিন প্রত্যেক বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে তা কার্যকর করে ফেলা হবে।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

৭৮. নিশ্চয় আপনার রব নিজ ক্ষমতা বলে* ওদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ[১]।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

৭৯. অতএব আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি আছেন সুস্পষ্ট সত্যের উপর[২]।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

৮০. আপনি তো মৃতদেরকে আহ্বান শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরও তা শোনাতে সক্ষম হবেন না, যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়।

وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮১. আর অন্ধদেরও ওদের গোমরাহী থেকে পথে আনতে পারবেন না[৩]। আপনি তো কেবল তাদের শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তারা অনুগত হয়ে যায়[৪]।

---

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'স্বীয় বিধান দ্বারা...'।

১. অর্থাৎ কুরআন তো এসেছে বোঝানো ও সতর্ক করার জন্য। তবে সকল ব্যাপারে হেকমতপূর্ণ ও শাসকসুলভ মীমাংসা করবেন সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা।

২. অর্থাৎ আপনি কারো মতবিরোধ ও অবিশ্বাসের কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজ কর্তব্য পালন করতে থাকুন। যে স্বচ্ছ ও সঠিক পথে আপনি চলছেন, তাতে কোন সংশয় নেই। মানুষ যখন সঠিক পথে চলে এবং এক আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তখন আর চিন্তা কিসের?

৩. অর্থাৎ একজন মৃতকে সম্বোধন করা অথবা কোন বধিরকে ডাকা একেবারে অনর্থক, বিশেষ করে যখন বধির পিছন ফিরে চলে যেতে থাকে এবং আহ্বানকারীর প্রতি মোটেই মনোযোগী না হয় । অবিশ্বাসীদের অবস্থাও ঠিক এমনই, যাদের অন্তর মরে গেছে, যাদের দিলের কান বধির হয়ে গেছে এবং যারা শোনার ইচ্ছাও রাখে না। কেননা, ওদের জন্য কোন নসীহতই উপকারী ও ফলপ্রসূ নয়। এক নিরেট অন্ধ যাবৎ না চোখ খোলে, আপনি কী করে তাকে পথ বা কোন কিছু দেখাবেন? অবিশ্বাসীরাও মনের দিক থেকে অন্ধ এবং সেই অন্ধত্ব ঘোচাতেও ইচ্ছুক নয়। এমতাবস্থায় আপনি সত্য দেখালে ওরা দেখবে কেমন করে?

৪. অর্থাৎ নসীহত শোনানো তাদেরই জন্য উপকারী, যারা শুনে প্রভাব গ্রহণ করে। আর প্রভাব গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করে তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া।

৮২. যখন (কিয়ামত সম্পর্কে কুরআনের) কথা তাদের সামনে এসে যাবে (অর্থাৎ কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে), তখন আমি তাদের জন্য যমীন থেকে একটা জন্তু বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে। কেননা, মানুষ আমার নিদর্শনাদিতে বিশ্বাস করত না*১।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

[রুকূ - ৭]

৮৩. (স্মরণ করুন), যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একেকটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করত। অতঃপর ওদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হবে**২।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝

---

* দ্বিতীয় তরজমা-'যা তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার (অর্থাৎ আল্লাহর) আয়াতসমূহ বিশ্বাস করত না'।

১. হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কিয়ামতের কিছু পূর্বে মক্কার সাফা পাহাড় ফেটে যাবে এবং তা থেকে একটি জন্তু বের হয়ে মানুষের সঙ্গে এ কথা বলবে যে, কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। এবং জন্তুটি প্রকৃত ঈমানদার ও গোপন কাফেরদের চিহ্নিত করে পৃথক করে দেবে (মূযেহুল কুরআন)।

রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এ ঘটনা একেবারে শেষ যমানায় পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ের দিন ঘটবে। (সহীহ মুসলিম, ২৯৪১; আবু দাউদ, ৪৩১০) বিশ্বজগতের বর্তমান সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার নামই কিয়ামত, সুতরাং এ ধরনের ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যা কিয়ামতের নিকটবর্তীতার লক্ষণ ও পূর্বাভাস হিসাবে প্রকাশিত হবে।

دابة الأرض– এর আবির্ভাবের তাৎপর্য

دابة الأرض–এর মাধ্যমে সম্ভবত দেখানো হবে যে, পয়গম্বরদের কথায় ওরা যে বিষয় স্বীকার করেনি, আজ তা একটি জন্তুর কথায় মানতে হচ্ছে। কিন্তু তখন মেনে কোন লাভ হবে না। এ দ্বারা শুধু অবিশ্বাসীদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে। ঈমান আনার সময় তো চলে গেছে।

বি. দ্র. دابة الأرض সম্বন্ধে সঠিক-বেঠিক বহু উক্তি ও বর্ণনা তাফসীর গ্রন্থসমূহে রয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে মোটামুটি ততটুকুই প্রমাণিত হয়, যা শাহ সাহেব (র) লিখেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

** দ্বিতীয় তরজমা-'অতঃপর ওদের (বিচারের স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তখন ওদের অগ্রবর্তী দলকে) থামানো হবে-(যাতে অন্যদের থেকে আগে চলে না যায়)।

২. বিভিন্ন গোনাহ হিসাবে গোনাহগারদের পৃথক পৃথক দল ও জামাত হবে।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮৪. অবশেষে ওরা যখন (হিসাব-স্থলে) হাযির হবে, আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতগুলি ভালভাবে নিজেদের জ্ঞানায়ত্ত না করেই অস্বীকার করেছিলে? অথবা তোমরা কী করছিলে[১]?'

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝

৮৫. আর ওদের অপরাধের কারণে ওদের উপর কার্যকর হবে (শাস্তি)-বাণী। তখন ওরা (কিছুই) বলতে পারবে না[২]।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৮৬. তারা কি দেখে না যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিনকে করেছি আলোয় উজ্জ্বল? নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান রাখে তাদের জন্য[৩]।

বি. দ্র. অধিকাংশ মুফাসসির فهم يوزعون এর অর্থ করেছেন– ওদের বাধা দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের অবিশ্বাসীদের হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ওরা সংখ্যায় এত বেশি হবে যে, পিছনের লোকদের দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া হবে, যেন হুড়াহুড়ি না হয়, যেমন বিরাট লোকসমাগমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য করা হয়।

১. অর্থাৎ সেগুলি ভালভাবে বোঝার এবং সকল দিক থেকে তার বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা তোমরা করনি, প্রথমেই মিথ্যা বলতে শুরু করে দিয়েছ। অথবা বল, 'مَاذَا تَفْعَلُوْنَ?' অর্থাৎ এ ছাড়া তোমাদের কাজই বা আর কী ছিল?

আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, না বুঝে-শুনে শুধু অস্বীকারই করেছিলে? নাকি এ ছাড়া আরো গোনাহও করেছিলে?

২. অর্থাৎ ওদের অপরাধ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এর পর ওরা আর কী বলতে পারে?

অবশ্য কোন কোন আয়াতে ওরা ওজর-আপত্তি পেশ করবে বলে উল্লেখ আছে। তা সম্ভবত এর পূর্বে সংঘটিত হবে। যা হোক, কথা বলা ও না বলার ব্যাপারটি ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত।

৩. অর্থাৎ বহু উজ্জ্বল নিদর্শন আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে দেখিয়েছেন, কিন্তু তারা একটুও চিন্তা-ভাবনা করেনি। শুধু রাত-দিনের অবিরত পরিবর্তনের মধ্যেই যদি চিন্তা করত, তবে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ, পয়গম্বরদের প্রয়োজনীয়তা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন– সব কিছুই উপলব্ধি করতে পারত। কোন্ সেই মহাসত্তা, যিনি এরূপ পরিপক্ক ও সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে অব্যাহতভাবে দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন? আর যিনি

৮৭. (স্মরণ করুন), যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে[১]। ফলে আকাশমণ্ডলীতে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই ঘাবড়ে যাবে, তবে আল্লাহ যার ব্যাপারে (ভিন্ন) ইচ্ছা করবেন সে ছাড়া[২]। আর সকলেই বিনত হয়ে তাঁর কাছে এসে যাবে[৩]।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ

৮৮. তুমি (আজ) পাহাড়-পর্বত দেখে মনে কর, সেগুলো অটল, অথচ (সেদিন) তা মেঘমালার মত চলমান হবে[৪]।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

আমাদের বাহ্যিক দর্শনের জন্য রাতের আঁধারের পর দিনকে আলোকিত করেন, তিনি কি আমাদের আত্মিক দর্শনের জন্য অসার ধ্যান-ধারণা ও রিপু-প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যে মারেফত ও হেদায়াতের আলো প্রেরণ করবেন না?

আরেকটি বিষয় : রাত কী? তা ঘুমের সময়, যাকে আমরা মৃত্যুর একটি নমুনা বলতে পারি। রাতের অবসানে দিনের আগমন হয়, তখন চোখ মেলে এদিক-সেদিক যাওয়া শুরু করি। ঠিক তেমনি, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর মৃত্যুনিদ্রার আগমন ঘটান এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন, তবে একে অসম্ভব ভাবার কী আছে?

মোদ্দাকথা, বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য এই একটি মাত্র নিদর্শনই বহু জরুরী বিষয়ে মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট।

১. শিঙ্গায় ফুঁ দানকারী ফেরেশতা হচ্ছেন ইসরাফীল, যিনি শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন।

২. কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, إلا من شاء الله বলতে জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মউত উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ এর প্রয়োগস্থল শহীদদের সাব্যস্ত করেছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

৩. হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রথমবার শিঙ্গার ফুঁয়ে সৃষ্টিকুল মরে যাবে, দ্বিতীয় বারের ফুঁয়ে জীবিত হয়ে উঠবে, তৃতীয় ফুঁতে ঘাবড়ে যাবে, চতুর্থ ফুঁতে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং পঞ্চম ফুঁয়ে সংজ্ঞা লাভ করবে। মোটকথা, কয়েকবার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।

অনেক আলিমগণ শুধু দুই ফুঁয়ের কথা বলেন। অর্থাৎ মোট দু'বারই ফুঁ দেওয়া হবে এবং আনুষঙ্গিক সকল হাল-অবস্থা এ দুই ফুঁয়ের সাথে সম্পর্কিত। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

৪. অর্থাৎ আজ তোমরা যেসব বড় বড় পাহাড় দেখে ধারণা করছ, এগুলো সর্বদার জন্য মাটিতে স্থির হয়ে গেছে এবং কখনো আপন স্থান থেকে বিচ্যুত হবে না, সেগুলোই কিয়ামতের দিন তুলার মত আকাশে উড়তে থাকবে এবং মেঘের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে। ইরশাদ হয়েছে– وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا (পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে,

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ۝

(এসব) আল্লাহর কর্ম-কুশলতা*, যিনি সকল কিছু সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করেছেন[১]। নিশ্চয় তিনি তোমরা যা কিছু কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত[২]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَیْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ یَّوْمَىِٕذٍ اٰمِنُوْنَ۝

৮৯. যারা সৎকর্ম নিয়ে আসবে, তারা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিদান পাবে[৩] এবং তারা সেদিনের আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে[৪]।

ফলে তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। –সূরা ওয়াকে'আহ, আয়াত ৫-৬) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ –(এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত। –সূরা কারি'আহ, আয়াত ৫)— فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (আপনি বলে দিন, 'আমার রব তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।' –সূরা তা-হা, আয়াত ১০৫)

পৃথিবী স্থির নাকি পরিভ্রমণ রত– এ বিষয়ের সাথে আলোচ্য আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই, যেমনটি কোন কোন প্রগতিপন্থি বুঝেছেন।

* দ্বিতীয় তরজমা–'(এসব) করবেন আল্লাহ, যিনি...'।

১. অর্থাৎ যিনি প্রত্যেক বস্তুকে অতি হেকমতের সাথে সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনিই বর্তমানে পাহাড়-পর্বতকে এরূপ ভারী ও শক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই একদিন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন। এই উড়িয়ে দেওয়াটা শুধু ধ্বংস সাধানের উদ্দেশ্যে হবে না, বরং বিশ্বজগতকে ভেঙে-চুরে খোদায়ী পরিকল্পনার সেই পর্বে পৌছানো হবে, যেখানে পৌছানোর জন্যই তা সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ সমস্ত কিছু সেই মহান স্রষ্টারই নিপুণ কারিগরি, যাঁর কোন কার্যই হেকমতশূন্য নয়।

২. অর্থাৎ এই চুরমার ও বিরাট পরিবর্তনের পর বান্দার হিসাব-নিকাশ হবে। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ছোট ছোট আমল সম্বন্ধেও অবহিত, সুতরাং প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ীই পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। কারো উপর জুলুমও হবে না, কারো পাওনা কমও দেওয়া হবে না। সামনে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এর আলোচনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ একটি নেকীর প্রতিদান কমপক্ষে দশটি নেকীর হিসাবে দেওয়া হবে। এ প্রতিদান কখনো শেষ হওয়ার নয়।

৪. অর্থাৎ মহা আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন (আম্বিয়া : ১০৩)- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ (তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না মহাভীতি)। তবে কম স্তরের আতঙ্ক হলে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়।

৯০. আর যারা অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাদের অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে[১]।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

৯১. আমাকে তো এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এ শহরের প্রভুর ইবাদত করি, যিনি একে মর্যাদা দান করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই[২]। আর আমাকে এ আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি[৩]।

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝

৯২. আর আমি যেন কুরআন পড়ে শোনাই[৪]। এখন যে ব্যক্তি সৎপথে আসবে, সে নিজেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথে আসবে। আর কেউ বিভ্রান্ত হলে আপনি বলে দিন, 'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী[৫]।'

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কোন জুলুম করা হবে না, বরং এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল।। নিজ কৃতকর্মের প্রতিকার এ ছাড়া আর কী হবে?

২. শহর বলতে পবিত্র মক্কা উদ্দেশ্য, যাকে আল্লাহ তাআলা মহান ও সম্মানিত বানিয়েছেন। মক্কা শরীফকে যেহেতু আল্লাহ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, এ কারণে আল্লাহকে বিশেষভাবে (رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ) 'এ শহরের প্রভু' বলা হয়েছে। নতুবা তিনি তো প্রত্যেক বস্তুরই রব ও মালিক।

৩. অর্থাৎ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ফরমাবরদার এবং মনেপ্রাণে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।

৪. অর্থাৎ আমি যেন নিজে আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকি এবং অন্যদের পবিত্র কুরআন শুনিয়ে আল্লাহর রাস্তা বাতলাতে থাকি ।

৫. অর্থাৎ আমি নসীহত করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছি, না মানলে তোমাদেরই ক্ষতি।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٩٣

৯৩. আর বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই[১]। শীঘ্রই তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা সেগুলি চিনতে পারবে[২]। আর আপনার রব তোমরা যা কর সে সম্পর্কে অনবহিত নন[৩]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর অসংখ্য শোকর, যিনি আমাকে مهتدي ও هادي (অর্থাৎ অন্যদের হেদায়াতকারী, নিজে হেদায়াতপ্রাপ্ত) বানিয়েছেন। প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তাঁর সত্তাই। কোন ব্যক্তি কোন গুণ ও সৌন্দর্য পেয়ে থাকলে তাঁর নিকট থেকেই পেয়েছে।

২. অর্থাৎ ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমাদের সত্তার মধ্যে বা তোমাদের সত্তার বাইরে তাঁর কুদরতের এবং নবীজির সত্যতার এমন নিদর্শনাদি দেখাবেন, যেগুলো দেখে তোমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবে, এসব আল্লাহ তাআলার সেই নিদর্শন, যার সংবাদ আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার উপলব্ধি কোন কাজে আসবে কি না, সে আলাদা ব্যাপার।

কিয়ামতের আলামত ও অন্যান্য নিদর্শন উক্ত آياته -এর অন্তর্ভূক্ত।

৩. অর্থাৎ যেসব আমল ও আচার-আচরণ তোমরা কর, সবই তাঁর গোচরে। সে অনুযায়ীই তোমরা প্রতিফল লাভ করবে। শাস্তি ইত্যাদিতে বিলম্ব দেখে মনে করো না, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফেল রয়েছেন।

সূরা কাসাস

সূরা ২৮ । ৮৮ আয়াত । ৯ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ
آياتها ٨٨ ، ركوعاتها ٩

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-সীন-মীম।

طٰسٓمّٓ ۝

২. এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

৩. আমি আপনাকে মূসা ও ফেরাওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শোনাচ্ছি, ঈমান রাখে এমন লোকদের জন্য[১]।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৪. নিশ্চয় ফেরাওন (সেই) ভূখণ্ডে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল এবং তার অধিবাসীদের কয়েক দলে বিভক্ত করে তাদের এক দলকে দুর্বল করে রেখেছিল[২], যাদের পুত্রদের সে যবেহ করত আর তাদের নারীদের জীবিত রাখত[৩]।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ

---

১. অর্থাৎ এ ঘটনা শুনে জালেমদের মোকাবেলায় (মক্কার) মুসলিমগণ নিজেদের অবস্থা অনুমান করে নিক ('মূযেহুল কুরআন')।

যেভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে স্বীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও ফেরাওনগোষ্ঠীর শক্তির মোকাবেলায় বিজয়ী করেছিলেন, তদ্রূপ যে মুসলিমরা আজ মক্কায় স্বল্পসংখ্যক, দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী শত্রুদের মোকাবেলায় বিজয়ী হবে।

২. মিসরে ফেরাওনের জাতি 'কিবতী' আর বনী ইসরাঈল উভয় জাতিই বসবাস করত। কিন্তু অত্যাচারী ও অহংকারী ফেরাওন বনী ইসরাঈলকে দাবিয়ে রাখত এবং মাথা তুলতে দিত না। কিবতীরা সকলেই প্রভু হয়ে বসেছিল এবং পয়গম্বরদের বংশধর বনী ইসরাঈলকে নিজেদের দাস বানিয়ে রেখেছিল। তাদের দ্বারা অপমানকর কাজ করাত ও বেগার খাটাত এবং দেশে তাদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করার মত যোগ্য হতে দিত না।

৩. কথিত আছে, ফেরাওন একটি স্বপ্ন দেখেছিল। গণকেরা স্বপ্নটির ব্যাখ্যায় বলেছিল যে, এক ইসরাঈলী লোকের হাতে তোমার রাজত্ব ধ্বংস হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝

বস্তুত সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন[১]।

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ۝

৫. আর আমি তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করতে চাচ্ছিলাম, দেশের মধ্যে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। এবং তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিতে ও তাদেরকেই (ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী করে দিতে চাচ্ছিলাম।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا

৬. এবং (চাচ্ছিলাম) দেশের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে[২]; আর ফেরাওন, হামান[৩] ও এদের বাহিনীগুলিকে বনী ইসরাঈলের মাধ্যমে ঐ জিনিস দেখিয়ে দিতে, যার

হিসাবে সে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও নির্যাতনমূলক এক ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করল— ভবিষ্যতে ইসরাঈলীদের ঘরে যত ছেলেসন্তান পয়দা হবে, তাদের ঢালাওভাবে যবেহ করে ফেলা হবে। এভাবে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচা যাবে। আর কন্যাসন্তানদের থেকে যেহেতু আশঙ্কা নেই, তাই তাদের জীবিত রাখা উচিত। বড় হয়ে তারা দাসীর ন্যায় আমাদের খেদমত করবে।

আর ইবনে কাছীর (র) লেখেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা করত যে, একজন ইসরাঈলী যুবকের হাতে মিসর রাজ্যের পতন নির্ধারিত হয়ে আছে। ক্রমান্বয়ে এ আলোচনা ফেরাওনের কাছে পৌছল। তখন এই নির্বোধ তাকদীর (তথা ভাগ্যলিখন)-কে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জুলুম ও নির্যাতনের উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১. অর্থাৎ সে তো পৃথিবীর বুকে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী ছিল। ফলে এ ধরনের জুলুম ও নির্যাতন করতে ওর দ্বিধাবোধ হবে কেন? দিলে যাই এল, গর্ব ও অহংকারের উন্মাদনায় চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা করে ফেলল।

২. অর্থাৎ অভিশপ্ত ফেরাওনের কারসাজি তো তা ছিল, যা উপরে বলা হল। আর আমার ইচ্ছা ছিল দুর্বলদের সবল করা এবং যে জাতিকে ফেরাওন-গোষ্ঠী লাঞ্ছিত দাসদাসী বানিয়ে রেখেছিল, তাদের মাথায় দীনের নেতৃত্ব ও দুনিয়ার সরদারীর মুকুট পরিয়ে দেওয়া। অত্যাচারী ও অহংকারীদের হাত থেকে ভূমিগুলি নিয়ে মজলুম ও নিপীড়িত জাতি দ্বারা আবাদ করা এবং দীনী নেতৃত্বের পাশাপাশি পার্থিব নেতৃত্ব ও রাজ্যশাসনও এই মজলুম জাতির হাতে সমর্পণ করা।

৩. 'হামান' ছিল ফেরাওনের প্রধান উযীর, যে জুলুম-অত্যাচারে তার সহযোগী এবং তার সকল কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নকারী ছিল।

كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

আশঙ্কা ওরা করত[১]।

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৭. আমি মূসার মাকে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধ পান করাতে থাক। অতঃপর যখন তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে ফেলে দিয়ো[২]। আর তুমি ভয় করো না, দুঃখিতও হয়ো না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে বানাব রাসূলদের একজন[৩]।

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝

৮. অতঃপর ফেরাওনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল, যাতে সে হয় ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ। নিশ্চয় ফেরাওন, হামান ও ওদের বাহিনীগুলো ভুলের মধ্যে ছিল[৪]।

---

১. অর্থাৎ যে আশঙ্কার কারণে ওরা বনী ইসরাঈলের অসংখ্য শিশুদের হত্যা করেছে, আমার ইচ্ছা, সেই আশঙ্কাই ওদের সামনে বাস্তব রূপ লাভ করুক।

যে ইসরাঈলী শিশুর হাতে ফেরাওনের ধ্বংস নির্ধারিত ছিল, সে (ফেরাওন) সেই শিশু থেকে যে কোন উপায়ে নিরাপদ হওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করল এবং পূর্ণ শক্তিমত্তা ব্যয় করল। কিন্তু আল্লাহর 'তক্‌দীর' ছিল অটল ও অব্যর্থ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেই শিশুকে তারই কোলে, তারই পালঙ্কে, তারই অন্দরমহলে, রাজকীয় আদরযত্নে ও আরাম-আয়েশে লালন-পালন করালেন এবং দেখিয়ে দিলেন, আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না।

২. তাঁর মাতাকে এলহাম বা স্বপ্নযোগে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দেওয়া হল, যাবৎ শিশুর হত্যার আশঙ্কা না হয়, তাঁকে দুধ পান করাতে থাকবে। আশঙ্কা দেখা দিলে বাক্সে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেবে। সূরা 'তা-হা'-তে (আয়াত ৩৮-৪০) এ কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

৩. মাকে সান্ত্বনা দেওয়া হল– ভয় করবে না এবং নিশ্চিন্তে নদীতে ভাসিয়ে দিবে। শিশু বিনষ্ট হবে না। আরো বলা হল, শিশুর বিচ্ছেদে চিন্তিত না হতে। শীঘ্রই তাঁকে মাতৃকোলেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ এর দ্বারা বিরাট কাজ নেবেন। তাঁকে রিসালাতের মহান আসনে সমাসীন করা হবে। কোন শক্তিই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সামনে বাধা ও অন্তরায় হতে পারবে না। বরং সকল বাধাবিপত্তি দূর করে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হবে, যা এই সম্মানিত শিশুর জন্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৪. অবশেষে মা তার শিশুকে কাঠের সিন্দুকে ভরে পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে এক স্থানে গিয়ে ভিড়ল, যেখান থেকে তা ফেরাওনের স্ত্রী হযরত আছিয়ার হস্তগত হল।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

৯. আর ফেরাওনের স্ত্রী বলল, '(এ তো) আমার ও তোমার জন্য চোখের শীতলতা[১]। একে হত্যা করো না; হয়ত এ আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব[২]।' বস্তুত ওরা (এর পরিণাম) বুঝতে পারছিল না[৩]।

শিশুর মায়াবী আকৃতি তার হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁর চেহারা থেকে আভিজাত্য ও মর্যাদার লক্ষণ ঠিকরে পড়ছিল। সুতরাং লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে তুলে নিলেন।

ليكون لهم عدوًا وحزنًا

কিন্তু এর পরিণতি এই ছিল যে, এ শিশু বড় হয়ে ফেরাওন ও ফেরাওন-গোষ্ঠীর শত্রু হবে এবং ওদের প্রাণসংহারকারী হবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁকে তুলে নেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। অভিশপ্ত ফেরাওনের খবরই ছিল না, যে শত্রুর ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু হত্যা করিয়েছে, সে-ই হচ্ছে এই শিশু, যাকে অতি আদরযত্নের সাথে আজ তাদের কোলে লালন-পালন করানো হচ্ছে।

ان فرعون و...كانوا خاطئين

বস্তুত ফেরাওন এবং ওর উযীর ও পরামর্শদাতারা নিজেদের অপবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিরাট ভুল করেছিল, কেননা একটি সন্দেহের কারণে অসংখ্য ইসরাঈলী শিশুদের কতল করা সত্ত্বেও মূসাকে জীবিত থাকতে দিল। কিন্তু ভুল না করেই বা কী করতে পারত? আল্লাহর তাক্দীরকে কি পরিবর্তন করতে পারত, অথবা আল্লাহর ইচ্ছাকে কি প্রতিহত করতে পারত? আসলে অলঙ্ঘনীয় তাকদীরের ফয়সালা মানবীয় চেষ্টা-তদবীরের দ্বারা প্রতিহত করা যায় বলে মনে করাই ছিল ওদের মহাভুল।

১. অর্থাৎ কী চমৎকার শিশু, আমাদের কোন পুত্র নেই। চল, একে দিয়েই আনন্দ লাভ করি এবং চোখ শীতল করি।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ফেরাওন বলল- لكِ، لا لي (তোমার চোখের শান্তি হবে, আমার নয়।) (তাফসীরে তবারী, ১৮/১৬৩-১৬৪)

বস্তুত শাশ্বত তাক্দীর অভিশপ্ত ফেরাওনের মুখ দিয়ে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করাচ্ছিল। অবশেষে তাই হল।

২. অর্থাৎ বড় হয়ে কমপক্ষে আমাদের কাজে আসবে। আর সমীচীন মনে করলে আমরা তাঁকে পালকপুত্র বানিয়ে নেব।

৩. অর্থাৎ এ খবর তাদের ছিল না যে, বড় হয়ে সে কী করবে! তারা ভাবল, একে বনী ইসরাঈলেরই কেউ ভয়ে ভাসিয়েছে। তা, একটি ছেলেকে না মারলে কী আর হবে? যার ভয়ে আমরা ভীত, এ সেই শিশু নাও হতে পারে। তদুপরি আমরা যখন লালন-পালন করব, তখন আমাদেরই সঙ্গে শত্রুতা করতে সে নিজেই সংকুচিত হবে। তার দ্বারা এটি সম্ভব হবে না।

১০. আর মূসার মায়ের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সে মূসার বিষয় প্রকাশ করেই ফেলত, যদি না আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে দিতাম, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে[১]।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১. আর সে মূসার বোনকে বলল, 'মূসার পিছনে পিছনে যাও।' সুতরাং সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে দেখতে থাকল যে, ওরা টের পাচ্ছিল না[২]।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১২. আর আমি (বোনের আসার) আগে থেকেই মূসা থেকে ধাত্রীদের বাধা দিয়ে রেখেছিলাম। অতঃপর সে বলল, 'আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের কথা বলব, যারা একে

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ

তাদের খবরই ছিল না যে, এ শিশু সেই সত্তার বন্ধু হবে, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আর তোমরা যেহেতু সে সত্তার দুশমন, সেহেতু এ শিশু প্রকৃত প্রতিপালকের হুকুমে তোমাদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হবে। আচ্ছা! তোমরা মূসার বাহ্যিক প্রতিপালনের কারণে এমন ভাল ভাল আশা করছ, তাহলে প্রকৃত প্রভু-পরওয়ারদেগারের বিরুদ্ধে জোর গলায় أنا ربكم الأعلى বলতে লজ্জা লাগছে না?

১. মূসা আলাইহিস সালামের মাতা শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু মাতৃস্নেহ কি তাকে স্থির থাকতে দিতে পারে? থেকে থেকে শিশু মূসার চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। মূসার স্মরণ ছাড়া অন্তরে আর কিছু থাকল না। এ অবস্থায় তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হল। সকলের নিকট এ কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলেন যে, আমি নিজ শিশু সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি, কেউ সন্ধান পেলে নিয়ে আস। কিন্তু খোদায়ী এলহাম إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين স্মরণ করে করে সান্ত্বনা নিচ্ছিলেন। এ আল্লাহরই কার্য ছিল যে, তিনি মায়ের মনকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিলেন, যাতে সময়ের পূর্বে খোদায়ী রহস্য প্রকাশ না পায় এবং যাতে একটু পরেই মূসা-জননীর এই চাক্ষুষ ইয়াকীন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ যখন ফেরাওনের অন্দর মহলে সিন্দুকটি খোলা হল এবং তা থেকে একটি শিশু বের হল, তখন শহরে জানাজানি হয়ে গেল। মূসা-জননী নিজ কন্যাকে (মূসার বোনকে) হুকুম দিলেন, শিশুর খোঁজ নেওয়ার জন্য যাও এবং দূর থেকে দেখ, কী ঘটনা ঘটে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী ছিল। সে শিশুর আশেপাশে যেখানে ভিড় ছিল, সেখানে অপরিচিতের ন্যায় তাকে দূর থেকে দেখতে থাকে। কেউ বুঝতে পারেনি, সে শিশুর বোন।

يَكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ

তোমাদের খাতিরে লালন-পালন করবে, আর তারা হবে এর হিতাকাঙ্ক্ষী[১]?

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

১৩. এভাবে আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ না করে এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য[২]। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৩]।

---

১. অর্থাৎ ফেরাওনের স্ত্রী যখন স্বামীকে শিশু পালনে রাযী করলেন, তখন শিশুকে দুধ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রীদের ডাকা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরত, শিশু মূসা নিজ মাতা ছাড়া আর কারো দুধ মুখে নেবে না বলে প্রথম থেকেই সাব্যস্ত ছিল। সে মত শিশু কোন নারীরই দুধ পান করছিল না। ফলে ফেরাওনের লোকেরা উৎকণ্ঠিত হল এবং চিন্তায় পড়ল– কীভাবে এমন কোন ধাত্রী খুঁজে পাওয়া যায়, যার দুধ শিশু পান করবে।

এ অবস্থায় মূসার বোন বলল, আমি আপনাদের এমন এক পরিবারের ঠিকানা বলতে পারি, যারা এ শিশুকে পালন করবে বলে আশা করি এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যতখানি জানি তাতে আশা করি, তারা হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে পরম আদরযত্নের সাথে লালন-পালন করবে। কেননা একে তো সম্ভ্রান্ত পরিবার, তদুপরি রাজার বাড়ী থেকে মর্যাদা ও পুরস্কারের আশা! ফলে শিশুর লালন-পালনে কোনই ত্রুটি হওয়ার কথা নয়।

ফলকথা, বালিকার পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মূসার জননীকে তলব করা হল। শিশুকে বুকে লাগানো মাত্র দুধ পান করতে আরম্ভ করল। ফেরাওন পরিবার অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করল যে, শিশু একটি নারীর দুধ গ্রহণ করেছে। এতে তারা আনন্দিত হল এবং বহু পুরস্কার বিতরণ করা হল। কিন্তু ধাত্রীরূপী মূসা-জননী আরজ করলেন, আমি এখানে থাকতে পারছি না, নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে শিশুকে লালন-পালন করতে চাই।

এভাবে মূসা আলাইহিস সালাম নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পুনরায় মাতৃকোলে ফিরে গেলেন, উপরন্তু মুফতে তাঁর মাতার জন্য ফেরাওনের কাছ থেকে ভাতা নির্ধারিত হল!

২. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ — এতে যে দুটি ওয়াদা আল্লাহ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে একটি তো তিনি চোখে দেখে নিলেন যে, কী বিস্ময়কররূপে তা পূরণ হল। আর এতে অনুমান করা যায়, নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টিও যথাসময়ে পূর্ণ হবেই হবে।

৩. অর্থাৎ এ কথা জানে না যে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ হয়েই থাকে। হাঁ, মাঝখানে বড় বড় সাময়িক বাধা এসে পড়ে। তাতে অনেক মানুষ বিশ্বাসহারা হতে শুরু করে।

[রুকূ - ২]

১৪. যখন মূসা পরিণত বয়সে উপনীত হলেন এবং হলেন পরিপক্ক, তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি[১]।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৫. (একদা) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার বাসিন্দারা ছিল অসচেতন[২]। তিনি সেখানে দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত পেলেন— একজন তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের এবং দ্বিতীয়জন তাঁর শত্রুদলের। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল তাঁর শত্রুদলের লোকটার বিরুদ্ধে। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন আর তা তাকে খতম করে দিল! তিনি বললেন, 'এটা হয়েছে শয়তানের কর্মের দ্বারা*। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, গোমরাহকারী।'

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৬. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি আমার নিজের অনিষ্ট করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।' ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

---

১. অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে অনেক হেকমতের কথা এবং বিশেষ ইলম ও বুদ্ধি দান করলাম। কেননা, শৈশব থেকেই তিনি পুণ্যবান ছিলেন। এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারীকে আমি এভাবেই অনুগ্রহ-ধন্য করে থাকি।

২. অর্থাৎ হযরত মূসা যৌবনকালে একদা শহরে এমন সময়ে পৌছলেন, যখন লোকেরা অসচেতন হয়ে ঘুমাচ্ছিল। সম্ভবত রাতের বেলা বা দুপুর বেলা ছিল।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'এ শয়তানের কাজ'।

৩. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রেক্ষাপটসহ**

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যুবক বয়স থেকেই ফেরাওন সম্প্রদায়ের প্রতি ওদের জুলুম ও কুফরের কারণে অসন্তুষ্ট থাকতেন এবং মজলুম বনী ইসরাঈল তাঁকে ঘিরে থাকত। তাঁর মাতার বাসস্থান শহরের বাইরে ছিল। হযরত মূসা কখনো সেখানে যেতেন, কখনো ফেরাওনের বাড়ি আসতেন। ফেরাওন-জাতি (কিবতীরা) তাঁর শত্রু ছিল। কারণ, তিনি বিজাতীয় ব্যক্তি। না জানি, শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিনা।

১৭. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব আমি কিছুতেই অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না[১]।'

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ فَلَنۡ اَكُوۡنَ ظَهِیۡرًا لِّلۡمُجۡرِمِیۡنَ ⑰

একদিন তিনি দেখলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর লড়াই করছে– একজন ইসরাঈলী, দ্বিতীয়জন কিবতী। মূসাকে দেখে ইসরাঈলী ফরিয়াদ করল, আমাকে এই কিবতীর নির্যাতন থেকে বাঁচান। কথিত আছে, উক্ত কিবৃতী ফেরাওনের বাবুর্চিখানার লোক ছিল। মূসা পূর্ব থেকেই কিবতীদের জুলুম-নির্যাতনের কথা জানতেন। তখন স্বচক্ষে ওর বাড়াবাড়ি দেখে তাঁর মধ্যে আত্মসম্ভ্রমবোধ জেগে উঠল। হতে পারে, বোঝানোর সময় মূসা আলাইহিস সালামকেও কিবতী কোন শক্ত কথা বলে থাকবে, যেমন কোন কোন তাফসীরে আছে। যা হোক, সতর্ক-সংশোধন করণার্থে তিনি ওকে একটি ঘুষি মারলেন। মাশাআল্লাহ, খুব শক্তিশালী যুবক ছিলেন। এক ঘুষিতেই কিবতীর জীবননাশ হয়ে গেল। স্বয়ং মূসা আলাইহিস সালামেরও ধারণা ছিল না, এক ঘুষিতেই হতভাগার কাজ সারা হয়ে যাবে!

মূসা (আ)-এর অনুশোচনা

অনিচ্ছাজনিত হত্যার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, কিবতী কাফের হরবী ছিল, অত্যাচারী ছিল, অধিকন্তু নিয়তও ছিল শুধু আদব দেওয়া– জানে মারা নয়। কিন্তু জানা কথা, সময়টি তো জেহাদ-যুদ্ধের ছিল না। মূসা আলাইহিস সালাম কিবৃতী জাতিকে কোন চরমপত্রও দেননি। বরং শুরু থেকেই মিসরে তাঁর চলা-ফেরার যে ধরন ছিল, তাতে তিনি কারো জান-মালের ক্ষতি করবেন না বলেই তারা আশ্বস্ত ছিল।

তদুপরি চিন্তা করলেন, রাগ ও ক্রোধের আতিশয্যে হয়ত ঘটনার আগ-পাছ ভাল করে দেখা হয়নি। আর ঘুষি মারার সময় ভাল করে এও অনুমান করা যায়নি যে, কতটুকু ওর সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। আবার এ অনিচ্ছাকৃত হত্যার কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার এবং অপরাপর ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই সব কারণে তিনি নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং এতে কিছুটা শয়তানের হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে ভাবলেন।

নবী-রাসূলগণের ফিতরাত (স্বভাব) এতই পাক-সাফ হয়ে থাকে যে, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্মেরও হিসাব-নিকাশ করেন এবং সামান্য বিচ্যুতি বা ইজতেহাদী ত্রুটির জন্যও আল্লাহ তাআলার নিকট কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম নিজ ভুল-ত্রুটি স্বীকার করত মাফ চান এবং মাফ পান। আর এই ক্ষমা প্রদানের কথা সম্ভবত এলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে জেনেছেন। বলা বাহুল্য, পয়গম্বরগণ নবুওয়াতের পূর্বে ওলী তো হনই।

১. অর্থাৎ আপনি যেমন নিজ কৃপায় আমাকে মর্যাদা, সুখ-শান্তি ও শক্তি দান করেছেন এবং আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেছেন, এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভবিষ্যতেও আমি অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।

১৮. অতঃপর সেই শহরে তাঁর প্রভাত হল ভীত, উৎকণ্ঠিত অবস্থায়[১]। হঠাৎ তিনি দেখলেন, যে ব্যক্তি গতকাল তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, (আজ আবার) সে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে[২]। মূসা তাকে বললেন, 'নিশ্চয় তুমি এক প্রকাশ্য বিপথগামী[৩]।'

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝

১৯. অতঃপর তিনি যখন যে তাদের উভয়ের শত্রু ছিল তার উপর হাত তুলতে চাইলেন, তখন ফরিয়াদকারী বলে উঠল, 'হে মূসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান, যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন[৪]?

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ

المجرمين- দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?

সম্ভবত সাহায্যপ্রার্থী ইসরাঈলীর কোন অন্যায় তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাই অপরাধী বলতে তাকে বুঝিয়েছেন। অথবা مجرمين বলতে কাফের ও জালেম লোকেরা উদ্দেশ্য –অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য কখনো ওদের সাহায্য-সহযোগিতায়ব্যয় করব না। অথবা مجرمين দ্বারা শয়তানরা উদ্দেশ্য– অর্থাৎ শয়তানদের মিশনে আমি সাহায্যকারী কখনো হব না। ওরা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করত আমার দ্বারা এমন কাজ করাবে, যার কারণে পরে আমাকে আফসোস করতে হয়— এমন আর হবে না। অথবা ইসরাঈলীকে এ হিসাবে অপরাধী বলা হয়েছে যে, সে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে। والله تعالى أعلم

১. অর্থাৎ তিনি এ উৎকণ্ঠায় ছিলেন যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ফেরাওনের নিকট অভিযোগ নিয়ে গিয়ে থাকবে। এখন দেখা যাক, কে অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং আমার প্রতি কী আচরণ করা হয়।

২. অর্থাৎ সেই ইসরাঈলীরই লড়াই আজ অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে হচ্ছিল।

৩. অর্থাৎ প্রতিদিন (কিবৃতী) জালেমদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাও, আর আমাকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ কর।

৪. হাত তুললেন জালেম কিবতীকে মারতে, আর এ কথা বলে উঠল ইসরাঈলী মজলুম। সে ভাবল, মূসা আমার প্রতি মুখে রাগ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমার প্রতি হাতও চালাবেন। সে আগের দিনের হত্যার কথা গোপন রেখেছিল যে, কে করেছে। কিন্তু আজ তার মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেল। (মুজেহুল কুরআন)

إِنْ تُرِيدُ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

আপনি তো পৃথিবীতে অত্যাচারীই হয়ে থাকতে চান, আর মীমাংসাকারীদের দলভুক্ত হতে চান না[১]।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২০. শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। সে বলল, 'হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। অতএব তুমি (শহর থেকে) বের হয়ে যাও। নিশ্চয় আমি তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী[২]।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং তিনি সেই শহর থেকে বের হয়ে গেলেন ভীত, উৎকণ্ঠিত অবস্থায়। তিনি বললেন, 'হে আমার রব! (এই) জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

[রুকূ - ৩]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ

২২. তারপর যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমুখে রওনা হলেন, তিনি বললেন, 'আশা করি, আমার রব

---

১. অর্থাৎ বলপ্রয়োগে হত্যা করাই আপনার কাজ। বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়ার কাজ আপনার দ্বারা হয় না।

২. অর্থাৎ হত্যার সংবাদ ফেরাওন পেয়ে গেল। রাজদরবারে পরামর্শ হল, বিজাতীয় মানুষটার এত বড় স্পর্ধা যে, রাজার জাতির লোকদের এবং সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে ফেলে! সুতরাং সিপাহীদের পাঠানো হল, মূসাকে ধরে আনতে। সম্ভবত পেলে মেরে ফেলত।

দরবারের একজন ভাল মনের লোকের অন্তরে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার হিতাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দিলেন। তিনি সত্বর সংক্ষিপ্ত পথে ছুটে গেলেন এবং হযরত মূসাকে ঘটনা জানিয়ে শহর থেকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা শুনিয়ে আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশারা করলেন যে, লোকেরা তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করবে এবং তিনিও দেশ থেকে বের হবেন। সে মত (মক্কার) কাফেররা সকলে মিলে তাঁর উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছিল। সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে গেলেন।'

اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

আমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন[১]।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً
مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ
دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ
الرِّعَآءُ ٞ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

২৩. অতঃপর যখন মাদয়ানের কুয়ার নিকট পৌছলেন, সেখানে একদল মানুষ দেখতে পেলেন, যারা (তাদের পশুকে) পানি পান করাচ্ছে[২]। এবং তাদের পিছনে দুজন মেয়েকে পেলেন, যারা (তাদের ছাগল-বকরিকে) আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, 'তোমাদের কী ব্যাপার?' তারা বলল, 'আমরা পানি পান করাই না যতক্ষণ না রাখালেরা (পশুকে) পানি পান করিয়ে চলে যায়[৩]। আর আমাদের পিতা বৃদ্ধ, বয়স্ক[৪]।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ

২৪. সুতরাং তিনি তাদের উপকারার্থে (তাদের পশুগুলিকে) পানি পান করিয়ে দিলেন[৫]। তারপর ছায়ার কাছে সরে এলেন এবং

---

১. হযরত মূসা মিসর থেকে বের হয়ে পড়লেন। পথ চিনতেন না। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলেন, সোজা পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'মাদয়ানে' যাওয়ার প্রধান পথ ধরিয়ে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, মাদয়ানে পৌছিয়ে তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পারিবারিক জীবন দান করবেন। শুধু তাই নয়, বরং তাঁকে সোজা বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া খোদার মর্জি ছিল।

২. মিসর থেকে মাদয়ান আট দশ দিনের পথ। তিনি ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত অবস্থায় সেখানে পৌছে দেখেন, কুয়ার ধারে লোকেরা নিজেদের জীবজন্তুকে পানি পান করাচ্ছে।

৩. তারা লজ্জায় ছাগল-বকরী নিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়েছিল। ভিড় দূর করার অথবা নিজেরা ভারী বালতি তুলে পানি পান করানোর শক্তি তাদের ছিল না। সম্ভবত অন্যদের বেঁচে যাওয়া পানি এরা পান করাত।

৪. অর্থাৎ আমাদের পিতা জওয়ান ও সবল হলে আমাদের আসতে হত না, তিনি নিজে এসে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করতেন।

৫. পয়গম্বরদের মন-মানসিকতা ও প্রবণতা এ রকমই হয়ে থাকে। তিনি নিজে ক্ষুধার্ত-পিপাসিত ও ক্লান্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে এই দুর্বল অবলারা সহানুভূতি থেকে মাহরূম থাকবে–এতে তাঁর লজ্জা হল। উঠে গিয়ে ভিড় ঠেলে নতুবা তা কমার পর কুয়া থেকে তাজা পানি তুলে মেয়ে দুটির পশুকে পান করালেন।

فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ ﴿۲۴﴾

বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী[১]।'

فَجَآءَتۡهُ اِحۡدٰىهُمَا تَمۡشِیۡ عَلَی اسۡتِحۡیَآءٍ ۫ قَالَتۡ اِنَّ اَبِیۡ یَدۡعُوۡكَ لِیَجۡزِیَكَ اَجۡرَ مَا سَقَیۡتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَیۡهِ الۡقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفۡ ٝ نَجَوۡتَ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۲۵﴾

২৫. অতঃপর সেই নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত ভঙ্গিতে হেঁটে[২] তাঁর নিকট আসল। সে বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের উপকারার্থে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য[৩]।' তার পর যখন মূসা তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তিনি বললেন, 'ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ[৪]।'

---

১. অর্থাৎ আয় আল্লাহ! মানুষের কাছে কোন কাজের পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে কোন কল্যাণ এলে সর্বদা আমি তার ভিখারী।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "মেয়ে দুটি মূসাকে ছায়ায় বিশ্রাম নিতে দেখে বুঝতে পারল, ইনি মুসাফির– দূর থেকে আগত, ক্লান্ত, ভুখা। তারা বাড়ি গিয়ে পিতাকে জানাল। (তিনি ছিলেন হযরত শু'আয়ব আলাইহিস সালাম।) ছাগল-বকরী পালার জন্য ও মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর একজন সরল, ভাল পুরুষের দরকার ছিল।

২. যেমনটি সম্ভ্রান্ত ও সতী-সাধ্বী নারীদের রীতি ও স্বভাব। বলা হয়, লজ্জার আতিশয্যে মেয়েটি মুখ ঢেকে কথা বলেছিল।

৩. হযরত মূসা আল্লাহ তাআলার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছিলেন। আল্লাহ নিজ দয়ায় ধারণাতীত উপায়ে কল্যাণ প্রেরণ করলেন। অতএব তা কবূল করতে আপত্তি কী? তিনি উঠে মেয়েটির সঙ্গে চললেন।

মুফাসসিরগণ লেখেন, হযরত মূসা (আ) মেয়েটিকে উপদেশ দিলেন, 'আমি আগে চলব, তুমি পিছনে আসবে', যাতে আজনবী মেয়ের প্রতি স্বেচ্ছায় দৃষ্টি পড়ার অবকাশ না থাকে। সে মত সে পিছনে থেকে পথ বলে বলে মূসা (আ) কে বাড়ি নিয়ে আসল।

৪. মূসা আলাইহিস সালাম হযরত শো'আইবকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি সান্ত্বনা দিলেন, তুমি সেই জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বের হয়ে এসেছ। ইনশাআল্লাহ এখন আর ওরা তোমার কিছুই করতে পারবে না।—মাদ্‌য়ান ফেরাওনের সাম্রাজ্যের সীমার বাইরে ছিল।

২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, 'হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। আপনি কাউকে মজুর নিযুক্ত করতে চাইলে এর জন্য উত্তম হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত[১]।'

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝

২৭. তিনি বললেন, 'আমি তোমার নিকট আমার এ কন্যা দুটির একজনকে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমাকে শ্রম দেবে[২]। আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে[৩]। আর আমি তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে একজন নেক মানুষ পাবে[৪]।'

قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

২৮ মূসা বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তি হল। আমি দুটি মেয়াদের যে কোনটিই পূর্ণ করি, আমার উপরে কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ

---

১. অর্থাৎ মূসার মধ্যে উভয় গুণ বর্তমান। কুয়া থেকে ভারী বালতি দ্বারা পানি তোলা অথবা লোকের ভিড় হটানো দ্বারা শক্তির পরিচয় মিলেছে। আর নির্লোভ ও পবিত্র হওয়ার কারণে বোঝা গেছে– ইনি বিশ্বস্তও বটে।

২. সম্ভবত এ খেদমতই কন্যার মহর ছিল। আমাদের হানাফী মাযহাবে এখনো এর সুযোগ আছে। যদি সাবালিকা মেয়ে সম্মত হয়, তবে তার নিকটাত্মীয়দের, যেমন পিতা-মাতার খেদমত (যা স্বামী করবে) মহররূপে সাব্যস্ত হতে পারে। (كذا نقله الشيخ الأنور)

এখানে শুধু বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, হযরত শো'আইব বিবাহ দেওয়ার সময় এক মেয়ে নির্ধারণ করে থাকবেন এবং তার সম্মতি নিয়ে থাকবেন।

৩. অর্থাৎ আমার খেদমতে কমপক্ষে আট বছর থাকতে হবে, আর দু'বছর বেশি থাকলে তা তোমার উদারতা হবে।

৪. অর্থাৎ তোমার দ্বারা কোন কঠিন কাজ করাব না। আমার নিকট অবস্থান করে ইনশাআল্লাহ তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, আমি মন্দ স্বভাবের মানুষ নই, বরং আল্লাহ তাআলার ফযলে আমি ভাল মানুষ। আমার সাহচর্যে তুমি অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং উত্তম স্বভাবের কারণে স্বস্তি ও শান্তি বোধ করবে।

وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

আর আমরা যা বলছি, আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা*[১]।

[রুকূ - ৪]

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর যখন মূসা মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং আপন পরিবার নিয়ে রওনা হলেন, তখন তূর পর্বতের দিকে একটি আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, 'তোমরা (এখানে) অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের নিকট সেখান থেকে কোন খবর আনতে পারব অথবা আগুনের একটি অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤى اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. তারপর তিনি যখন তার কাছে আসলেন, তখন বরকতময় ভূমিতে (অবস্থিত) উপত্যকার ডান কিনারার এক বৃক্ষ থেকে[২] তাকে ডাক দিয়ে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ– সমগ্র বিশ্বের প্রভু।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**–'সে বিষয়ে আল্লাহ সাক্ষী'।

১. অর্থাৎ আট বছর থাকি অথবা দশ বছর, তা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হবে। যা হোক, আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হল, আল্লাহর উপর ভরসা করত আমি তা মঞ্জুর করলাম এবং আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে এ বিষয় শেষ করছি।

হাদীসে আছে, হযরত মূসা বড় মেয়াদটি (অর্থাৎ দশ বছর) পূর্ণ করেছিলেন। (তাফসীরে তবারী ১৮/২৩৬-২৩৭)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আমাদের হুজূরও (সা) দেশ থেকে হিজরত করেন। অতঃপর আট বছর পর এসে মক্কা জয় করেন। ইচ্ছা করলে তিনি তখনি মক্কা নগরী কাফেরমুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজ খুশীতে (দু'বছর পর) মোট দশ বছর পরে শহরটি কাফেরদের থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করেন।'

২. এ ছিল সেই বৃক্ষ, যার উপর আগুন প্রজ্বলিত হতে দেখা গিয়েছিল।

৩১. 'আরো বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' তারপর তিনি যখন এটাকে ছিপছিপে সাপের ন্যায় ছোটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি পিছন ফিরে দৌড় দিলেন এবং ফিরেও তাকালেন না। (তাঁকে বলা হল), 'হে মূসা! সামনে আস এবং ভয় পেয়ো না, তুমি তো নিরাপদ।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝

৩২. 'তুমি তোমার হাত (স্বীয় জামার) গলায় ঢোকাও, তা কোন ত্রুটি ছাড়া শুভ্র হয়ে বের হয়ে আসবে[১]। আর ভয় (দূর করার) জন্য আপন বাহু নিজের (পার্শ্বদেশের) সাথে মেলাও[২]। এ দুটি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ– ফেরাওন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি[৩]। নিশ্চয় ওরা ছিল নাফরমান সম্প্রদায়।'

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৩৩. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো ওদের একজনকে হত্যা করেছি। সুতরাং আমার ভয় হয়, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে[৪]।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝

৩৪. 'আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে অধিক প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাঁকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে পাঠান, যেন সে আমার সমর্থন করে। আমি আশঙ্কা করি, ওরা আমাকে অস্বীকার করবে[৫]।'

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝

---

১. রুকূর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে সূরা 'তা-হা' প্রভৃতি স্থানে গত হয়েছে– সেখানে দেখুন।

২. অর্থাৎ বাহুকে পার্শ্বদেশের সাথে মেলাও। সাপ প্রভৃতির ভয় দূর হয়ে যাবে। সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্য ভয়-ভীতি দূর করার এই উপায় বলে দেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ عصا (লাঠি) ও يد بيضاء (সাদা হাত) -এর মুজেযা নবুওয়াতের প্রমাণ হিসাবে দেওয়া হল, যাতে ফেরাওন ও তার জাতির পক্ষে কোন ওজর-আপত্তি না থাকে।

৪. অর্থাৎ পৌছামাত্রই যদি হত্যা করে ফেলল, তবে আপনার দাওয়াত কীভাবে পৌছাব?

৫. অর্থাৎ কোন সাহায্য-সমর্থনকারী সঙ্গী হলে স্বভাবতই মন স্থির ও সবল থাকে। তাছাড়া ওরা অস্বীকার করার কারণে যদি তর্কবিতর্কের পালা আসে, আর তাতে আমার তোতলামীহেতু

৩৫. আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিব এবং তোমাদের প্রাবল্য দান করব, ফলে ওরা তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাদির ওসীলায় তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই প্রবল থাকবে*১।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ ۝٣٥

৩৬. অতঃপর যখন মূসা ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি নিয়ে পৌছলেন, তখন ওরা বলল, 'এ তো বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়২। আমরা এ কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে শুনিনি৩।'

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۝٣٦

৩৭. মূসা বললেন, 'আমার রব উত্তমরূপে জানেন, কে তাঁর নিকট থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য আখেরাতে হবে শুভ পরিণতি। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না৪।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝٣٧

বক্তব্য পেশ করতে অসুবিধা হয়—তাহলে হারূনের সাহচর্য কাজে আসবে। কারণ, তার মুখ অধিকতর পরিষ্কার ও চালু।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'আমার নিদর্শনাদি (নিয়ে যাও)– তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই প্রবল থাকবে'।

১. অর্থাৎ উভয় প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল। হারূন তোমার বাহুবল হিসাবে সঙ্গে থাকবে এবং ফেরাওনের দল তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আমার নিদর্শনের বরকতে তুমি ও তোমার সঙ্গীরাই বিজয়ী ও প্রবল থাকবে।

২. অর্থাৎ মুজেযাসমূহ দেখে ওরা বলতে লাগল, এ যাদু ছাড়া কিছু নয়। এবং যেসব কথা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলছে, তাও যাদুরই কথাবার্তা। এসব নিজেই রচনা করে এনেছে আর দাবি করছে, আমার প্রতি আল্লাহ ওহী পাঠিয়েছেন। বস্তুত এসব ওহী ইত্যাদি কিছু নয়, নিতান্ত যাদুকরের কল্পনা ও মিথ্যা উদ্ভাবনমাত্র।

৩. অর্থাৎ যেসব কথা মূসা বলে (যথা: এক আল্লাহ সমগ্র দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং এক সময় তিনি সকলকে ধ্বংস করে পুনরায় জীবিত করবেন, তারপর হিসাব-কিতাব হবে, আর তিনি তাকে পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন, ইত্যাদি)— এসব বিষয় আমরা কখনো আমাদের পূর্ববর্তী মুরব্বীদের থেকে শুনিনি।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন, আমি নিজ দাবিতে সত্য এবং তাঁরই নিকট থেকে হেদায়াত এনেছি। এজন্য আমারই পরিণাম ভাল হবে। আর যারা আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ
عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ
اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ
الْكٰذِبِيْنَ ۝

৩৮. ফেরাওন বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন প্রভু আছে বলে আমি তো জানি না। অতএব হে হামান! আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি পোড়াও (অর্থাৎ ইট তৈরি কর)। তারপর আমার জন্য একটি উঁচু ভবন নির্মাণ কর, যাতে আমি উঁকি মেরে মূসার রবকে দেখে নিতে পারি। তবে আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি[১]।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝

৩৯. সে ও তার বাহিনীগুলো পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল, ওরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪০. অতঃপর আমি ওকে এবং ওর বাহিনীগুলোকে পাকড়াও করলাম এবং ওদের সাগরে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখে নাও, জালেমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল[২]।

নিদর্শনাদি দেখেও এবং সত্যতার দলীল-প্রমাণ শুনেও অন্যায়ভাবে সত্যকে অস্বীকার করে, তারা সফল হতে পারে না। পরিণামে তাদের লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার মুখ দেখতে হবে।

১. অর্থাৎ সে নিজের উযীর হামানকে বলল– আচ্ছা, ইট পোড়ানোর একটা ভাটি তৈরি কর, যাতে পাকা ইটের সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা যায়, আর তাতে চড়ে আমি আসমানের নিকটবর্তী হয়ে মূসার খোদাকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি যে, তিনি কোথায় ও কেমন? কারণ, পৃথিবীর বুকে তো আমি ভিন্ন আর কোনো খোদা আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। অনুরূপ আসমানেও কোন খোদা নেই বলেই ধারণা। তবুও এতে মূসার কথার উত্তর হয়ে যাবে।

হতভাগা ফেরাওন এ কথা হয় বিদ্রূপ ও উপহাসস্বরূপ বলেছিল, অথবা সম্ভবত সে এমনি পাগল হয়ে গিয়েছিল যে, এ ধরনের নিরর্থক ও হাস্যকর চিন্তা-ভাবনাও সে করছিল!

২. অর্থাৎ ওরা পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাজ্যের মধ্যে গর্বে মেতে ওঠে। বুঝতে পারছিল না, ওদের মাথা অবনত এবং দর্প চূর্ণ করে দেওয়ারও কেউ আছেন। অবশেষে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা ওকে বাহিনীসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেন, যাতে সে স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং মানুষকে মনে করিয় দেয় যে– পরিণতি সম্বন্ধে গাফেল, হতভাগা, জালেমদের এরূপ পরিণামই হয়ে থাকে।

সাগরে ডুবে মরার ঘটনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে।

৪১. আমি ওদের এমন নেতা বানিয়েছিলাম, যারা দোযখের দিকে আহ্বান করত[১]। আর কিয়ামতের দিন ওদের সাহায্য করা হবে না[২]।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. এবং এ দুনিয়াতে আমি লা'নতকে ওদের অনুগামী করে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন ওরা তাদের দলভুক্ত হবে, যাদের অবস্থা হবে মন্দ*[৩]।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

[রুকূ - ৫]

৪৩. নিশ্চয়ই আমি পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৪], যা ছিল মানবজাতির জন্য জ্ঞানগর্ভ কথামালা,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে গোমরাহী ও নাফরমানীতে সবার আগে ছিল। লোকদেরও দোযখের দিকে ডাকত। সুতরাং আখেরাতেও ওদেরকে দোযখীদের অগ্রভাগে রাখা হবে- يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (ফেরাওন কিয়ামতের দিন নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে। অতঃপর ওদের আগুনে অবতরণ করাবে। আর তা অতি নিকৃষ্ট ঘাট, যাতে ওরা অবতরণ করবে। -সূরা হূদ, আয়াত ৮)

২. অর্থাৎ এখানকার বাহিনী সেখানে কাজে আসবে না, অন্য কোন দিক থেকেও কোনো সাহায্য আসতে পারবে না। বরং নিজের বাহিনীসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, কোনই রক্ষাকারী পাওয়া যাবে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা-** 'কিয়ামতের দিন ওরা হবে (আল্লাহর রহমত থেকে) বিতাড়িত লোকদের অর্ন্তভুক্ত'।

৩. অর্থাৎ আখেরাতের অকল্যাণ ও মন্দ পরিণতি তো আছেই। দুনিয়াতেও কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ এরূপ লোকদের উপর অভিসম্পাৎ পাঠাতে থাকবে।

৪. তাওরাত অবতরণের পূর্বে তো বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তবে তা নাযিলের পর দুনিয়ায় এরূপ ধ্বংসকর আযাব কম এসেছে। আসমানী আযাব দ্বারা ধ্বংস করার পরিবর্তে জেহাদের বিধান দেওয়া হয়। কেননা, যুগে যুগে কিছু লোক শরী'য়তের আহকাম পালনে যত্নবান থেকেছে।

পথনির্দেশ ও রহমত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে[১]।

وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৪. আর আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না[২] যখন আমি মূসার কাছে বিধান পাঠিয়েছিলাম এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যেও ছিলেন না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৪৫. তবে (মূসার পর) আমি সৃষ্টি করেছি বহু মানবগোষ্ঠী। অতঃপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে[৩]। আর আপনি

وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ

---

১. অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত তাওরাত ছিল প্রজ্ঞা ও আলো দানকারী, লোকদের হেদায়াতের পথে পরিচালনাকারী এবং রহমতের যোগ্য করে তোলার কিতাব– যাতে লোকেরা এ কিতাব পড়ে আল্লাহকে স্মরণ রাখে, আল্লাহ তাআলার আহকাম শিক্ষা করে এবং উপদেশ হাসিল করে।

সত্য কথা এই যে, হেদায়াতের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের পরই তাওরাত শরীফের স্থান। বর্তমানে যখন তাওরাতের অনুসারীরা তা বিনষ্ট করে ফেলেছে, তখন কুরআনই তার জরুরী জ্ঞানরাজি ও হেদায়াতসমূহ সংরক্ষণ করছে।

২. অর্থাৎ তূর পর্বতের পশ্চিম দিকে, যেখানে মূসা (আ) নবুওয়াত ও তাওরাত লাভ করেছিলেন।

৩. অর্থাৎ আপনি সেই সময়ের ঘটনাবলি এমন সঠিক ও নিখুঁত এবং বিশদ ও বিস্তারিতভাবে বয়ান করছেন, যেন আপনি সেখানে 'তূর' এর নিকট দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছেন। অথচ জানা কথা, আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এও সবাই জানে, আপনি নিরক্ষর। কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সাহচর্যেও থাকেননি। এমনকি, সঠিক ও বিশুদ্ধ ঘটনাবলি উত্তমরূপে জানে এমন কোন জ্ঞানী মক্কায় ছিল না। সুতরাং চিন্তা করার বিষয়– আপনার কাছে এ ইলম কোথা থেকে এল?

আসল কথা এই যে, বিশ্বের জাতিসমূহের উপর দিয়ে বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। কালের গতিতে মূসাকে প্রদত্ত সেসব ইলম বিকৃত ও বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এবং সেসব হেদায়াত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন, একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ দিয়ে ভুলে যাওয়া সবকসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেইসব শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক ঘটনাবলির এমন বাস্তব চিত্র দুনিয়ার সামনে পেশ করবেন, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানতে হয় যে, এই চিত্রকর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনাবলির সকল দিক প্রত্যক্ষভাবে দেখছিলেন।

বলা বাহুল্য, আপনি তো সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং এ ছাড়া কী আর বলা হবে যে, এই বয়ান ও বর্ণনা সেই আল্লাহর, যিনি আপনার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন এবং যাঁর সম্মুখে প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয়ও সমুপস্থিত।

مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলেন না যে, তাদের আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাতেন। কিন্তু আমি রাসূল প্রেরণ করতে থেকেছি[১]।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৬. আর আপনি তূর পর্বতের পাশে ছিলেন না যখন আমি (মূসাকে) ডাক দিয়েছিলাম। তবে আপনার রবের অনুগ্রহে (তিনি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন)[২], যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে[৩]।

---

১. অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম 'মাদ্য়ান' গিয়ে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেসবের এরূপ বিশুদ্ধ ও উত্তম বর্ণনা তো এটাই প্রকাশ করে যে, সে সময় আপনি যেন পয়গম্বররূপে সেখানে বাস করতেন এবং আজ যেভাবে মক্কায় আল্লাহ তাআলার আয়াত পড়ে শোনাচ্ছেন, সে সময় মাদ্য়ানবাসীদের শোনাতেন। অথচ এরূপ আদৌ ঘটেনি।

কথা এই যে, আমি আবহমানকাল থেকে পয়গম্বর প্রেরণ করে আসছি, যারা দুনিয়াকে গাফলত ও উদাসীনতা থেকে সচেতন করতে থেকেছেন এবং অতীতের শিক্ষামূলক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী আমি বর্তমান কালে আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেন ওহীর মাধ্যমে অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন এবং মাখলুককে গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন।

এ জন্যই ঘটনাসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান আপনাকে প্রদান করা হয়েছে এবং আপনার মুখে সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ আমি যখন মূসা আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বললাম– اني انا الله رب العالمين তখন আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন না। এ আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাকে এইসব ঘটনা ও সত্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং আপনার সঙ্গেও তেমন আচরণই করেছেন, যেমন মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে করেছিলেন। এভাবে যেন 'জাবালে নূর' (যেখানে গারে হেরার অবস্থান) ও মক্কা-মদীনায় 'জাবালে তূর' ও মাদ্য়ানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

৩. অর্থাৎ আরবের লোকদের এসব ঘটনা ইত্যাদি শুনিয়ে ঈমান না আনার ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে দিন, সম্ভবত শুনে স্মরণ রাখবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে।

৪৭. এবং (এ জন্যও আপনাকে পাঠিয়েছেন), যাতে এমন না হয় যে, ওদের উপর ওদেরই কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ পতিত হল আর তখন বলা শুরু করল– হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের প্রতি কোন রাসূল পাঠালে না? এমন হলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[১]।'

وَلَوْ لَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

৪৮. কিন্তু যখন ওদের কাছে আমার নিকট থেকে সত্য আসল, ওরা বলতে লাগল—'এ রাসূলকে ঐরূপ বস্তু কেন দেওয়া হল না যেরূপ বস্তু দেওয়া হয়েছিল মূসাকে[২]?' কাফেররা কি ইতিপূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা অস্বীকার করেনি[৩]? এরা বলেছে, '(তাওরাত ও কুরআন) উভয়ই যাদু, যার

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْ لَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا

১. অর্থাৎ ওদের মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ ওদেরই জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। পয়গম্বর না পাঠিয়েও যদি আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ও ঈমানহীনতার কারণে ওদের শাস্তি দিতেন, তবু জুলুম হত না। কিন্তু আল্লাহ (রাসূল প্রেরণ করে) অনুগ্রহ করেছেন এবং ওদের জন্য কোন রকমের ওজর-আপত্তির সুযোগ রাখেননি। নতুবা রাসূল পাঠানো ব্যতিরেকে শাস্তি প্রদান করা হলে ওদের পক্ষে এরূপ বলার সম্ভাবনা ছিল, 'আমাদের নিকট নবী তো পাঠাননি, যিনি কমপক্ষে আমাদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে অবহিত করতেন। তা না করে সহসা আমাদের ধরে টেনে-হেঁচড়ে আযাবে নিক্ষেপ করলেন? কোন পয়গম্বর আসলে দেখতেন, আমরা কীরূপ পুণ্যবান ও ঈমানদার প্রমাণিত হতাম।' (রাসূল (সা) কে পাঠানোর পর এখন এরূপ বলার আর কোন সুযোগ নেই।)

২. অর্থাৎ রাসূল না পাঠালে বলত, রাসূল পাঠালেন না কেন? এখন যখন রাসূল তশরীফ এনেছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, তখন ওরা বলছে— আমরা মানতাম যদি দেখতাম যে, তাঁর দ্বারাও মূসা আলাইহিস সালামের মত عصا (লাঠি) ও يد بيضاء (শুভ্রহস্ত) প্রভৃতি মুজেযা প্রকাশ পাচ্ছে এবং তাঁর নিকটও তাওরাতের ন্যায় একটি কিতাব একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কেমন কথা যে, দুটি-চারটি আয়াত পেশ করছেন?

৩. অর্থাৎ মূসার মুজেযা ও কিতাবকে সকলে মানল কোথায়? সন্দেহবাদীরা এসবকেও অলীক যাদু বলেছে, যেমন: পূর্বে গত হয়েছে। আসল কথা হল, যাদের মানার ইচ্ছা নেই, তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন না কোন সন্দেহ খুঁজে নেয়।

وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ۝

একটি অপরটির সমর্থক।' আরো বলেছে, 'আমরা প্রত্যেকটিই অস্বীকার করি[১]।'

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

৪৯. আপনি বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন কিতাব আন, যা পথ প্রদর্শনে এ দু'টি থেকে উত্তম; তাহলে আমি তা অনুসরণ করব[২]।'

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

৫০. অতঃপর ওরা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে নিন, ওরা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর ওর চেয়ে বড় গোমরাহ কে, যে আল্লাহর পথনির্দেশ ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না[৩]।

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, মক্কার কাফেররা হযরত মূসার মুজেযার কথা শুনে বলতে লাগল, ঐ রকম মুজেযা এই নবীর নিকট আসলে আমরা মানতাম। কিন্তু যখন ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করল এবং তাওরাতের বিষয়াদি এই নবীর পক্ষে ও নিজেদের মর্জির খেলাফ বলে শুনল (কারণ, তাতে আছে– মূর্তিপূজা কুফরী, পুনরুত্থান সত্য, গাইরুল্লাহর নামে যবেহকৃত জন্তু মৃতবৎ এবং এই এই নিদর্শনবিশিষ্ট সর্বশেষ নবীর আরবে আগমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি)— তখন উভয়কেই মন্দ বলতে শুরু করল যে, তাওরাত ও কুরআন উভয়ই যাদু এবং মূসা ও মুহাম্মদ (আলাইহিমাস সালাম) উভয়ই যাদুকর, যাঁরা একে অপরের সমর্থন করে।

২. অর্থাৎ আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ হল এ দুটি কিতাব, যেগুলির সমকক্ষতা কোন কিতাবই করতে পারে না। যদি এ দুটি কিতাবই যাদু হয়, তবে এদের চেয়ে উত্তম ও অধিক হেদায়াতকারী কোন খোদায়ী কিতাব তোমরা পেশ কর। অসম্ভব হলেও ধরে নিই– যদি এমন কিতাব আনতে পার, তবে আমি তারই অনুসরণ করব। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা আনতে পারবে না।

সুতরাং এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, তোমরা নিজেরা খোদায়ী হেদায়াত থেকে একেবারে শূন্যহস্ত, তা সত্ত্বেও হেদায়াতের শ্রেষ্ঠ কিতাবকে যাদু বলে অগ্রাহ্য করছ। (তোমাদের দাবি অনুসারে) এ যখন মানুষের তৈরি করা যাদু, অতএব তোমরা সারা জগতের যাদুকরদের সমন্বয়ে এরচে' বড় যাদু তৈরি করে নিয়ে আস। যাদু তো আর এমন কিছু নয়, যার মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ এ লোকগুলো যখন হেদায়াতও কবুল করে না এবং এর কোন বিকল্পও পেশ করতে পারে না, তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে, হেদায়াতের পথে চলার কোন ইচ্ছা এদের নেই।

[রুকূ - ৬]

৫১. আমি তো ওদের নিকট অনবরত (আমার) বাণী পৌছিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে[১]।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫২. আমি যাদের কুরআনের পূর্বে কিতাব দিয়েছি, তারা তার প্রতি ঈমান আনে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫৩. আর যখন তা তাদের পড়ে শোনানো হয়, তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। নিশ্চয় এ সত্য, আমাদের রবের নিকট থেকে (অবতীর্ণ)। আমরা তো এর পূর্বেও অনুগত ছিলাম[২]।'

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝

এরা চায় কেবল নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে। যাকে মন চাইল মেনে নিল, যা নিজ মর্যি ও প্রবৃত্তির বিপরীত হল, বর্জন করল।

বলুন, এরূপ প্রবৃত্তি-পূজারি জালেমদের কি হেদায়াত হতে পারে? কখনই না। আল্লাহ তাআলা এমন জাতিকেই হেদায়াত করে থাকেন, যারা হেদায়াত পাওয়ার ইচ্ছা করে এবং প্রবৃত্তি ও লালসাকে সত্যের মানদণ্ড বানায় না।

১. অর্থাৎ আমার ওহীর ধারা পূর্ব থেকে চলে আসছে, এক ওহীর সত্যায়ন ও সমর্থনে দ্বিতীয় ওহী পাঠিয়ে আসছি। আর কুরআনও আমি ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছি, এক আয়াতের পর দ্বিতীয় আয়াত আসতে থেকেছে। যাতে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার অবকাশ হয় এবং স্মরণ রাখা সহজ হয়।

২. অর্থাৎ জাহেল মুশরিকদের অবস্থা এই যে, ওরা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহও মানে না, পরবর্তীগুলিও মানে না। আর ওদের মোকাবেলায় ন্যায়নিষ্ঠ আহলে কিতাবদের দেখ, তারা উভয় প্রকার কিতাব মানে।

তারা পূর্ব থেকে তাওরাত ও ইনজীলের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। যখন কুরআন আসল তখন বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এই কিতাব সত্য, আমাদের রব কর্তৃক অবতারিত, আমরা এর প্রতি আমাদের ঈমান ও আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমরা তো পূর্বেও আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করতাম, আজো কবুল করলাম। বস্তুত আমরা এখন থেকেই মুসলমান নই, বহু পূর্ব থেকে মুসলমান। কেননা পূর্ববর্তী কিতাবগুলির উপর আমাদের ঈমান ছিল। সেগুলির মধ্যে সর্বশেষ পয়গম্বর ও কুরআন কারীম সম্বন্ধে পরিষ্কার সুসংবাদ ছিল। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৫৪. তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ, কেননা তারা অবিচল থেকেছে[১] এবং তারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে*[২] আর আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে[৩]।

প্রথম থেকেই আমাদের মৌলিক ঈমান ছিল– আজ তার বিস্তারিত অবস্থা নিজেদের চোখে দেখে নিলাম।

১. অর্থাৎ অহংকারী ও বেপরোয়া হয়ে সত্য গ্রহণ থেকে পলায়ন করেনি, বরং যখন যে সত্য পৌছেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। (এভাবে তারা সত্যের উপর অবিচল থেকেছে।)

বি. দ্র. শাইখে আকবর (র) তাঁর 'ফুতূহাত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই আহলে কিতাবগণ স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি দুবার ঈমান এনেছে। প্রথমবার প্রত্যক্ষভাবে। দ্বিতীয়বার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী সকল নবীগণকে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ঈমান রাখাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন।

আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তারা দুবার ঈমান এনেছে– এক, বর্তমানে সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে; দুই, ইতিপূর্বে স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে। কেননা, প্রত্যেক পয়গম্বরই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আগাম সমর্থন দিয়ে গেছেন।— এ জন্যই তারা প্রতিফলও দুবার লাভ করবে।'

তবে হাদীসে (বুখারী : ৩০১১) যে আছে- ثَلَاثٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ — এস্থলে তার বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আল্লাহর ফযলে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তফসীল লিখেছি এবং সংশয়সমূহের উত্তর দানের চেষ্টা করেছি। فلله الحمد والمنة

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'তারা মন্দ দূর করে ভাল দিয়ে (অর্থাৎ কোন গোনাহ হয়ে গেলে তার বিপরীতে সৎকর্ম করে)'।

২. অর্থাৎ কেউ তাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে তারা প্রত্যুত্তরে ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করে এবং সদ্ব্যবহার করে। অথবা অর্থ এই যে, কখনো তাদের দ্বারা মন্দকাজ হয়ে গেলে এর প্রতিষেধক হিসাবে সৎকর্ম করে নেয়, যাতে মন্দকাজের চেয়ে সৎকাজের পাল্লা ভারী থাকে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের যে হালাল মাল দান করেছেন, তা থেকে তারা যাকাত দেয়, দান করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করে। মোটকথা, বান্দাদের হকসমূহ বিনষ্ট করে না।

৫৫. আর তারা যখন নিরর্থক কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞ লোকদের সাথে জড়াতে চাই না[১]।'

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ۝

৫৬. আপনি যাকে চাইবেন তাকেই সৎপথে আনতে পারবেন না, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন[২]।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

---

১. অর্থাৎ কোন মূর্খ লোক নিরর্থক, বাজে কথা বললে তার সাথে ঝগড়া করে না, বরং বলে দেয়- ভাই, তোমাদের কথাবার্তার প্রতি আমাদের সালাম। মূর্খতার এই কথা তোমাদের কাছেই রাখ, আমাদেরকে আমাদের কাজে থাকতে দাও। তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের এবং আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। তোমাদের ন্যায় নির্বোধ লোকদের সাথে আমাদের ঝগড়ার প্রয়োজন নেই।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) সীরাতের কিতাবে (পৃ. ২৫২) লিখেছেন, মক্কী জীবনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের খবর পেয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য হাবশা থেকে বিশজন লোকের একটি কাফেলা তাঁর খেদমতে আগমন করে। হুযূরের সঙ্গে তারা কথা বলে। তিনি তাদের কুরআন পড়ে শোনান। এতে তারা অশ্রুবিগলিত হয় এবং দৃঢ়ভাবে হুযূরের সত্যতা ঘোষণা করে।

ঈমান গ্রহণে ধন্য হয়ে প্রত্যাবর্তনকালে আবু জাহল প্রভৃতি মুশরিকরা তাদের ঠাট্টা করে বলে, এমন আহমকদের দল আর কখনো দেখা যায়নি। কারণ, একজন লোকের অবস্থা জানতে এসে সকলে তার দাস হয়ে এবং নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করছে। উত্তরে তারা বলে- سلام عليكم لانجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا (ব্যস, আমরা তোমাদের সালাম জানাই, মাফ কর- আমরা তোমাদের মূর্খতার জওয়াব মূর্খতা দিয়ে দিতে চাই না, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে যেই অবস্থায় আছি, তাই তার অংশ ও প্রাপ্য। আমরা নিজেদের মঙ্গল কামনায় কোন ত্রুটি করিনি।) এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়। والله تعالى أعلم

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে মূর্খ সম্পর্কে আশঙ্কা আছে যে, বুঝালে অহংকার করবে, তাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম।'

২. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চাচা (আবু তালেব) -এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যাতে মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ে নেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। এতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারী, হাদীস : ৩৮৮৪) মর্ম এই যে— যার সঙ্গে আপনার স্বাভাবিক মহব্বত হয় অথবা মন চায় যে, অমুকের হেদায়াত হয়ে

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۝

আর তিনিই ভাল জানেন, কারা সৎপথে আসবে[১]।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

৫৭. ওরা বলে, 'আমরা যদি তোমার সঙ্গে সৎপথের অনুসরণ করি, তবে আমাদের দেশ থেকে আমাদের উৎখাত করা হবে[২]'। আমি কি ওদের এমন সম্মানিত, নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি করা হয়? কিন্তু ওদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[৩]।

যাক, তার হেদায়াত হওয়া জরুরী নয়। আপনার কাজ শুধু পথ বাতানো। অতঃপর কে পথে চলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, কে না পৌঁছে, তা আপনার আওতাবহির্ভূত। এ আল্লাহর ইখতিয়ার– তিনি যাকে ইচ্ছা সত্যগ্রহণ ও লক্ষ্যস্থলে পৌছার তাওফীক দান করেন।'

বি. দ্র. হযরত শাহ সাহেব (র) যা কিছু লিখেছেন, তা সহীহ হাদীসসমূহে রয়েছে। এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা এবং আবু তালেবের ঈমান-কুফরকে বিশেষ বিতর্কের বিষয় বানানো নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও নাজুক বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম।

১. অর্থাৎ কারো কাছে কাউকে পথে আনার ক্ষমতা থাকা তো দূরের কথা, তার তো এও জানা নেই যে, কে পথে আসবে বা কার পথে আসার যোগ্যতা আছে?

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আপনি জাহেলদের আজে-বাজে কথায় এবং শত্রুতামূলক শোরগোলে চিন্তিত হবেন না এবং নিজের বিশেষ প্রিয়জন ও আত্মীয়রা ইসলাম গ্রহণ না করায় দুঃখিত হবেন না। আপনার দায়িত্ব যতটুকু, তা আপনি পালন করে যান। মানুষের যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের মধ্য থেকে কাকে পথে আনা হবে, তা আল্লাহরই ইলম ও এখতিয়ারে রয়েছে।

২. যেসব বিষয় মানুষকে হেদায়াত থেকে বাধা দিয়ে রাখে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা। এজন্যই মক্কার কতক মুশরিক এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, আপনি সত্যের উপর আছেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে আমরা আপনার দলভুক্ত হয়ে গেলে আশেপাশের সমস্ত আরব গোত্র সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে আমাদের গ্রাস করে ফেলবে। জান-মাল কোন কিছুরই নিরাপত্তা থাকবে না।

সামনে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মক্কাবাসীরা বলতে লাগল, আমরা মুসলমান হয়ে গেলে সমস্ত আরব আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে।' আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন,

৫৮. আমি এমন কত জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, যা(-র অধিবাসীরা) নিজেদের জীবনোপকরণ নিয়ে দম্ভ করেছিল। ওই তো ওদের ঘরবাড়ী, যেগুলো ওদের পর আবাদ করা হয়নি, তবে অল্পই[১]। আর (পরিশেষে) আমিই উত্তরাধিকারী হয়েছি[২]।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

৫৯. আপনার রব জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান[৩]।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ

'এখন তাদের শত্রুতার কবল থেকে রক্ষা পেতে কার আশ্রয়ে আছ? এই হরম শরীফের মর্যাদার কারণেই তো বাইরের লোকেরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে চরম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও আক্রমণ করে তোমাদের মক্কা থেকে বহিষ্কার করতে পারে না।' যে আল্লাহ তাআলা এ স্থানকে হরম বানিয়েছেন, তিনিই তখনো আশ্রয় দেবেন (মূজেহুল কুরআন)।

শিরক ও কুফর সত্ত্বেও তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ঈমান ও তাক্ওয়া অবলম্বনের পর কি আশ্রয় দেবেন না? অবশ্য যদি ঈমান ও তাক্ওয়া যাচাই করার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ সাময়িক কোন বিপদ আসে, তবে তাতে ঘাবড়াতে নেই- فَاِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ('কেননা, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।')

১. অর্থাৎ আরবদের শত্রুতায় ভয় কর কেন, আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় কর। তোমরা কি দেখ না, কত কত জাতি গত হয়েছে, যারা নিজেদের ভোগবিলাসে মেতে অহংকারী হয়ে উঠেছিল। যখন ওরা গর্ব ও অবাধ্যতা অবলম্বন করল, আল্লাহ তাআলা এমনভাবে ওদের সমূলে ধ্বংস করে দিলেন যে, ইতিহাসের পাতা থেকে ওদের নাম-নিশানা মুছে গেছে। ওদের জনপদগুলোর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে, তাতে কোন বসবাসকারী নেই। (الا قليلا) তবে কোন ভ্রমণকারী যদি কিছু সময় সেখানে বিশ্রাম নেয়, অথবা আল্লাহ তাআলার কুদরতের শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখার জন্য যদি সেখানে গিয়ে অবতরণ করে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা।

২. অর্থাৎ সকলেই মরে শেষ হয়ে গেল, কোন উত্তরাধিকারীও রইল না। রইল শুধু আল্লাহর সত্তা।

৩. আল্লাহ তাআলা জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না সেগুলির কেন্দ্রীয় স্থানে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরণ করেন। (কেন্দ্রীয় স্থানের প্রভাব বহু দূর পর্যন্ত পৌছে এবং তার অধিবাসীরা তুলনামূলকভাবে অধিক সুস্থবুদ্ধি ও জ্ঞানী হয়। সম্ভবত এ কারণেই কেন্দ্রীয় স্থানের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।)

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ۝

আর আমি জনপদসমূহ তখনই ধ্বংস করি, যখন তার অধিবাসীরা অপরাধে লিপ্ত হয়[১]।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের সম্ভোগ ও তার শোভা মাত্র। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী। তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই[২]?

[রুকূ - ৭]

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ۝

৬১. আচ্ছা ওই ব্যক্তি, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা লাভও করবে– সে কি তার সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ্য-সামগ্রী দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের গ্রেপ্তার করে হাযির করা হবে[৩]?

সমস্ত পৃথিবীর বুকে মানব বসতিগুলির কেন্দ্রীয় স্থান ছিল মক্কা মুআজ্জমা। এজন্যই সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী প্রেরিত হন।

১. অর্থাৎ সতর্ক করার পরও যখন লোকেরা বিরত হয় না, উল্টো জুলুম ও অবাধ্যতায় চরম বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেন।

২. অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষের এ কথা বোঝা উচিত যে, দুনিয়ায় কত দিনই বা থাকা যাবে এবং এখানকার শোভা-সৌন্দর্য ও সুখ-সম্পদ কত দিন পর্যন্ত ভোগ করা যাবে। মনে কর, দুনিয়ায় আযাব যদি নাও আসে, তবু মৃত্যু তোমাদের থেকে এসব উপকরণ ছিনিয়ে নিবে। অতঃপর খোদার সামনে হাযির হতে হবে এবং ছোট ছোট আমলেরও হিসাব দিতে হবে। সেখানে যদি আরাম-আয়েশ লাভ হয়ে যায়, তবে তার সামনে এখানকার সুখ-সম্পদ নিতান্তই নিকৃষ্ট ও নগণ্য। কোন্ বুদ্ধিমান এমন হবে, যে অনায়াস ও নির্ঝঞ্ঝাট যিন্দেগীর মোকাবেলায় নোংরা ও কদাকার যিন্দেগীকে এবং পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী নে'য়ামতসমূহের মোকাবেলায় অপূর্ণ ও অস্থায়ী ভোগবিলাসকে অগ্রাধিকার দেবে?

৩. অর্থাৎ পরিণামের দিক থেকে মুমিন ও কাফের উভয়ে কী করে সমান হতে পারে? একজনের জন্য রয়েছে অনন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি, যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আর দ্বিতীয় জনের জন্য রয়েছে কয়েক দিনের ভোগ-বিলাসের পর গ্রেফতারী পরোয়ানা ও চির জেলখানা (আল্লাহর পানাহ!)।

৬২. (স্মরণ করুন), যেদিন আল্লাহ ওদের ডাক দিয়ে বলবেন, 'কোথায় আমার শরীকরা, যাদের তোমরা (শরীক বলে) দাবি করতে[১]?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

৬৩. যাদের বিরুদ্ধে (আমার) বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই তারা, (যাদের) আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম। আমরা ওদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমন আমরা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে (তাদের সঙ্গে) সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। ওরা আমাদের উপাসনা করত না[২]।'

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উদাহরণ

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, তার মাথার উপর রাজমুকুট রাখা হয়েছে, খাদেম ও সেবকরা কাতার বেঁধে সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দস্তরখানে সাজানো রয়েছে এবং সে সেসব ভোগ করছে। এ অবস্থায় তার চোখ খুলে গেল আর দেখল—পুলিশ ইন্সপেক্টর গ্রেফতারী পরোয়ানা ও বেড়ি-হাতকড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে নিয়ে গেল এবং আজীবন কারাবন্দীর শাস্তি দেওয়া হল। এখন বলুন, ওই স্বপ্নের রাজত্ব ও পোলাও-কুরমার স্বাদ তার কি মনে থাকবে?

১. অর্থাৎ যাদের খোদায়ী কাজকর্মে অংশীদার মনে করতে, তারা আজ কোথায়? তোমাদের সমর্থন ও সহায়তার জন্য তাদের একটু আন দেখি।

২. অর্থাৎ উপরোক্ত প্রশ্ন তো ছিল মুশরিকদের প্রতি। কিন্তু বিভ্রান্তকারী শরীকরা বুঝে ফেলবে যে, বস্তুত এই ধমক তাদেরও দেওয়া হয়েছে। সেজন্য আগে বেড়ে তারা উত্তর দেবে- আয় আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা ওদের (মুশরিকদের) বিভ্রান্ত করেছিলাম এবং বিভ্রান্তকরণ এমনি ছিল, যেমন আমরা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। অর্থাৎ বিভ্রান্ত হওয়ার সময় যে ভুল হয়েছিল, বিভ্রান্ত করার দ্বারা তারই পূর্ণতা সাধন হল। কারণ, বিভ্রান্তকরণ বিভ্রান্ত হওয়ার শেষ স্তর। অতএব বিভ্রান্ত করার এই অপরাধ আমরা স্বীকার করি। তবে এই মুশরিকদের উপর আমাদের এমন জোরজবরদস্তি ছিল না যে, আমাদের কথা মানতে বলপ্রয়োগে ওদের বাধ্য করেছি। আসলে ওরা নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় আমাদের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এই হিসাবে ওরা আমাদের পূজা করেনি, বরং নিজেদের প্রবৃত্তি ও কল্পনার পূজা করত। আজ আমরা আপনার সামনে ওদের পূজার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।— (কোন কোন তাফসীরকার এ ব্যাখ্যা করেছেন ।)

আর হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, শয়তানরা এ কথা বলবে। বিভ্রান্ত তো করেছে তারাই, কিন্তু পুণ্যবানদের নাম নিয়ে। এ কারণেই বলেছে- 'আমাদের পূজা করেনি।'

৬৪. (ওদের) বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক।' সুতরাং তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না[১]। আর ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আহ! ওরা যদি পথপ্রাপ্ত হত[২]।

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. (আরো স্মরণ করুন), যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, 'তোমরা পয়গম্বরদের কী জওয়াব দিয়েছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. সেদিন ওদের পক্ষে সকল কথা রুদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব ওরা পরস্পরকেও জিজ্ঞাসা করতে পারবে না[৩]।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে– আশা করা যায়, সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে[৪]।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

বি. দ্র. حق عليهم القول এ القول দ্বারা আল্লাহর এ বাণী উদ্দেশ্য– لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (নিশ্চয় আমি জিন ও মানব উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব)।

১. অর্থাৎ বলা হবে, এখন সাহায্যের জন্য তাদের ডাক। কিন্তু তারা সাহায্য করবে দূরের কথা, নিজেরাই মুসিবতে ধৃত হবে (মুফাসসিরগণ এমনই বলেছেন)।

আর হযরত শাহ সাহেব (র)-এর ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, শয়তানরা যখন নেক লোকদের নাম নেবে তখন মুশরিকদের বলা হবে, সেই নেক লোকদের ডাক। কিন্তু ওদের ডাকে তারা কোন সাড়া দেবেন না। কেননা, তারা এসব শিরেকী কর্মকাণ্ডে রাযী ছিলেন না, অথবা এর খবরও রাখতেন না।

২. অর্থাৎ তখন আযাব দেখে এই আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি সরল পথে চলতাম, তবে এই মুসিবতের সম্মুখীন হতে হত না।

৩. পূর্বের প্রশ্ন ছিল তাওহীদ সম্পর্কে। আর ماذا اجبتم المرسلين – এ প্রশ্ন রেসালাত সম্পর্কে। অর্থাৎ নিজ আকল-বুদ্ধিতে তোমরা সত্যকে না বুঝে থাকলে পয়গম্বরদের কথায় বুঝতে। তাঁদের সঙ্গে তোমরা কী আচরণ করেছিলে, বল। তখন কারো মুখে উত্তর আসবে না এবং কথা বলার পথসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ পরকালের সফলতা একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের দ্বারা লাভ হবে। এখনো যে কেউ কুফর ও শিরক থেকে তওবা করত ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী গোনাহ-খাতা মাফ করে তাকে সফল করবেন।

৬৮. আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) মনোনীত করেন। ওদের এখতিয়ারে নয় মনোনয়ন[১]। আল্লাহ পবিত্র এবং ওরা যা কিছুকে শরীক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে[২]।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৯. আপনার রব জানেন, যা কিছু ওদের অন্তর গোপন করে রাখে এবং যা কিছু ওরা প্রকাশ করে[৩]।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৭০. আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসা তাঁরই

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ؗ

বি. দ্র. عسى أن يكون من المفلحين –এতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) রাজকীয় ভঙ্গিতে ওয়াদা রয়েছে, অর্থাৎ সে ব্যক্তির সফলতার আশা রাখা উচিত, যদিও আমার উপর কারো জবরদস্তি নেই। অর্থাৎ আমি এমনটি করতে বাধ্য নই, বরং নিছক রহমত ও দয়াবশত এর ওয়াদা করা হচ্ছে।

১. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি যেরূপ তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ কোন বস্তুকে পছন্দ করা অথবা নির্বাচন করার অধিকারও তাঁরই। যে বিধি-বিধান তাঁর পছন্দ হয়, তাই তিনি পাঠান। যে ব্যক্তিকে তিনি সংগত মনে করেন, তাকে বিশেষ মর্যাদা ও পদবী দান করেন। যার মধ্যে যোগ্যতা দেখেন, তাকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে সফল করে দেন। সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে শ্রেণীকে অথবা কোন শ্রেণীর যে সদস্যকে ইচ্ছা করেন, নিজ হেকমত অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণী ও সদস্যবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট বানিয়ে দেন। তিনি ছাড়া আর কারো এ ধরনের এখতিয়ার ও অধিকার নেই।

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম তাঁর زاد المعاد গ্রন্থের শুরুর দিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২. অর্থাৎ সৃষ্টিকরণ ও শরী'য়ত প্রদান এবং উল্লিখিত এখতিয়ারের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নেই। লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার দ্বারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করেছে, তা সবই ভ্রান্ত ও সনদহীন।

৩. অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যেসব ভুল আকীদা বা খারাপ নিয়ত পোষণ করে এবং মুখ ও হাত-পা প্রভৃতি দ্বারা যেসব কাজ করে, সবই আল্লাহ তাআলার জানা আছে। আর তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত। সে হিসাবেই তিনি যা করার করবেন।

وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

এবং বিধান দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁরই, আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ۝

৭১. আপনি বলুন, 'আচ্ছা, তোমরা বল তো, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন প্রভু আছে কি, যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে[২]? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না[৩]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۝

৭২. আপনি বলুন, 'আচ্ছা, বল তো, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন প্রভু আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দিতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম কর? তবে কি তোমরা দেখতে পাও না[৪]?

---

১. অর্থাৎ সৃষ্টিকরণ, সর্বময় ক্ষমতা ও সর্বব্যাপী ইলমে তিনি যেমন একক, তদ্রূপ ألوهيت (ইবাদতের উপযুক্ত হওয়া)-তেও তিনি অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী হতে পারে না। কেননা, তাঁর সত্তাই সকল গুণের উৎস। তাঁর মধ্যেই আছে সমস্ত সৌন্দর্যের সমাবেশ। দুনিয়া ও আখেরাতে যে প্রশংসাই হোক, তা যার নামেই হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা তাঁরই প্রশংসা। সর্বত্র তাঁরই প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান এবং পরিশেষে সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সম্মুখে বলা হচ্ছে, রাত-দিনে যত নে'য়ামত ও কল্যাণ তোমরা লাভ কর, তা তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহ। বরং রাত ও দিনের পরিবর্তনও তাঁরই স্বতন্ত্র অনুগ্রহের ফসল।

২. অর্থাৎ সূর্যকে যদি তিনি উদিত হতে না দেন অথবা তার আলো কেড়ে নেন, তবে নিজেদের কায়-কারবারের জন্য এরূপ আলো কোথা থেকে আনতে পারবে?

৩. অর্থাৎ এ বিষয়টি এতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, শোনামাত্র বুঝে এসে যায়। তবে কি তোমরা শোনও না?

৪. অর্থাৎ সূর্যকে যদি অস্ত যেতে না দেন, সর্বদা তোমাদের মাথার উপর রেখে দেন, তবে রাতের আগমনে যে শান্তি ও আরাম এবং অপরাপর ফায়দা হাসিল হয়, তার ব্যবস্থা কোন্ শক্তি করতে পারবে? এরূপ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বিষয়ও তোমাদের নজরে আসে না?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

৭৩. তিনি আপন মেহেরবানীতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা রাতে বিশ্রাম কর এবং (দিনে) তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর[১]।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ۝

৭৪. (স্মরণ করুন), যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, 'কোথায় আমার শরীকরা, যাদের তোমরা (শরীক বলে) দাবি করতে?'

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۝

৭৫. আর আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদানকারী বের করে আনব[২], অতঃপর বলব, 'আন তোমাদের দলীল-প্রমাণ'[৩]। তখন ওরা উপলব্ধি করবে যে, সত্য কথা আল্লাহরই এবং ওদের কাছ থেকে ওদের মনগড়া কথা-বার্তা উধাও হয়ে যাবে[৪]।

বি. দ্র. إن جعل الله عليكم النهار سرمدا → أفلا تبصرون এর সাথে বেশি সংগতিপূর্ণ। কারণ, চোখে দেখা স্বাভাবিকভাবে আলোর উপর নির্ভরশীল, যা দিনের বেলা পূর্ণমাত্রায় থাকে। রাতের আঁধারে যেহেতু দেখার উপায় নেই, অবশ্য শোনা সম্ভব, সেজন্য إن جعل الله عليكم الليل سرمدا এর সাথে أفلا تسمعون বলাই সংগত ছিল। والله اعلم।

১. অর্থাৎ তিনি রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন, যাতে রাতের আঁধার ও নির্জনতায় শান্তি–আরামও হাসিল কর এবং দিনের আলোতে কায়-কারবারও চালু রাখতে পার, আর দিন-রাতের বিভিন্ন ধরনের নে'য়ামতের জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে থাক।

২. সাক্ষ্যদানকারী বলতে পয়গম্বরগণ বা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা উদ্দেশ্য, অথবা উদ্দেশ্য উম্মতের নেককারগণ (মুজেহুল কুরআন)। তাঁরা সাক্ষ্য দিবেন, লোকেরা আসমানী শরী'য়ত ও খোদায়ী বিধানের সাথে কেমন আচরণ করেছিল।

৩. অর্থাৎ কোন্ সনদ ও দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করেছিলে এবং হালাল ও হারাম ইত্যাদি বিধান কোন্ সহীহ উৎস থেকে গ্রহণ করেছিলে? পয়গম্বরদের তো তোমরা মাননি। সুতরাং তোমাদের কে বলে দিল– এটা আল্লাহর হুকুম, ওটা নয়?

৪. অর্থাৎ তখন বুঝে আসবে, আল্লাহর কথাই সত্য এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। দুনিয়াতে পয়গম্বরগণ যা বলতেন তাই সত্য। মুশরিকরা যেসব মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস রচনা করেছিল এবং যেসব কথা তাদের মনগড়া ছিল, সবই সেদিন ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

[রুকূ - ৮]

৭৬. কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ের একজন; কিন্তু সে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করল* ১।	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ

* দ্বিতীয় তরজমা–'অহমিকা প্রকাশ করল'।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

পূর্ববর্তী রুকূর শুরুতে আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হয়েছিল। অতঃপর আখেরাতের আলোচনা প্রসঙ্গে পরজীবনের কিছু হাল-অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান রুকূতে পুনরায় সেই মূল আলোচ্য-বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্ব বোঝানোর জন্য কারূনের ঘটনা শোনানো হচ্ছে।

কারূনের বৃত্তান্ত

কথিত আছে, কারূন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই ছিল এবং ফেরাওনের সেবাদাস ছিল। জালেম সরকাররা যেমন প্রতিপক্ষের রক্ত চোষার নিমিত্ত তাদের মধ্য থেকেই ব্যক্তি বিশেষদের নিজেদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, তদ্রূপ ফেরাওন বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে এই অভিশপ্ত লোকটিকে নির্বাচন করেছিল। কারূনও তখন সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দুই হাতে ধন-সম্পদ কামাই করে এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে।

বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ)-এর শাসনাধীনে এল এবং ফেরাওন পানিতে ডুবে ধ্বংস হল, তখন কারূনের আর্থিক উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেল এবং তার সরদারী বিনষ্ট হতে শুরু করল। ফলে সে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অন্তর্জ্বালায় ভুগছিল। তবু প্রকাশ্যে সে মুমিন হওয়ার ভান করছিল– তাওরাত খুব পড়ত এবং ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকত। কিন্তু অন্তর পরিষ্কার ছিল না বলে হযরত মূসা ও হারূনের খোদাপ্রদত্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখে জ্বলত এবং বলত, আমিও তো তাদেরই চাচার পুত্র। এ কেমন কথা যে, তারা দুজন নবী ও ধর্মীয় প্রধান হয়ে যাবে, আর আমি কিছুই হব না? কখনো হতাশ হয়ে অহংকার দেখাত এবং বলত, তারা নবুওয়াত লাভ করেছে তাতে কী? আমার কাছে ধন-সম্পদের এত এত ভাণ্ডার রয়েছে, যা আর কারো নেই।

একদা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিলে সে লোকদের বলল, এত দিন পর্যন্ত তো তোমরা ও আমরা মূসার সব বিধান সহ্য করেছি, কিন্তু তিনি আমাদের ধন-সম্পদও আমাদের নিকট থেকে হরণ করবেন– এও কি তোমরা সহ্য করবে? উত্তরে কিছু লোক বলল, না, আমরা সহ্য করতে পারি না।

অবশেষে অভিশপ্ত কারূন হযরত মূসা (আ)-কে দুর্নাম করার একটি জঘন্য ফন্দি আঁটে। সে একটা মেয়েকে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে রাযি করল যে, জনসমাবেশে যখন মূসা আলাইহিস সালাম যিনার শাস্তি বয়ান করবেন, তখন অভিযোগ করবে যে, তিনি নিজেই তোমার সাথে ব্যভিচার করেছেন। সে উঠে সমাবেশে তাই বলে বসল। মূসা (আ) তাকে আল্লাহর গযবের ভয় দেখালেন এবং আল্লাহর নামে শক্ত শপথ দিলেন। তার অন্তর কেঁপে উঠল এবং সত্য কথা বলে দিল যে, কারূন আমাকে এরূপ শিখিয়েছিল। তখন মূসা (আ) বদ্‌দো'য়া করলেন। ফলে কারূনকে ঘর-বাড়ি ও ধন-দৌলতসহ মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হয়।

আর আমি ওকে এত ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য হত[১]। (স্মরণ কর), যখন ওর সম্প্রদায় ওকে বলল, 'দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না[২]।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝

৭৭. 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের নিবাস কামাই কর[৩] এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলো না এবং (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন[৪]। আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয়-সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না[৫]।'

وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

---

১. পূর্ববর্তী কোন কোন মুফাসসিরের মতে مفاتح বলতে ধন-ভাণ্ডারসমূহ উদ্দেশ্য– অর্থাৎ এত অর্থ-সম্পদ ছিল যে, শক্তিশালী লোকদের একটি দলের পক্ষেও তা বওয়া কঠিন হত। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির مفاتح এর ব্যাখ্যা করেছেন- চাবিগুচ্ছ। অর্থাৎ ধন-সম্পদের সিন্দুক এত পরিমাণ ছিল, যার চাবিসমূহ বহন করতে একটি শক্তিশালী দলও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। আর এ কোন অসম্ভব ব্যাপার না, বরং কোন কোন তাফসীরে এর বাস্তবতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ এই নশ্বর ও অস্থায়ী সম্পদের উপর এত বড়াই কেন, আল্লাহর নিকট যার মূল্য একটি মশার পাখার সমানও নয়? উত্তমরূপে বুঝে নাও, আল্লাহ তাআলার নিকট অহংকারী বান্দারা মোটেই পছন্দনীয় নয়। আর যে জিনিস আল্লাহর পছন্দের নয়, তার পরিণাম ধ্বংস ও নিপাত ছাড়া আর কী?

৩. অর্থাৎ খোদাপ্রদত্ত সম্পদের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তা দিয়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করবে। এটা নয় যে, তার মোহে পড়ে আখিরাত ভুলে যাবে এবং গর্ব ও অহংকারের চালচলন অবলম্বন করবে।

৪. অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাও ও পর। এর সাথে সাথে সম্পদের দ্বারা বেশি বেশি আখেরাত অর্জন কর এবং সৃষ্টিজীবের সঙ্গে সদ্ব্যবহার (অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে তাদের খেদমত) কর।

৫. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধিতা করো না। আল্লাহর পৃথিবীতে সোজাভাবে থাক, অযথা দেশে গোলমাল করা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা ভাল নয়।

৭৮. সে বলল, 'এ ধন-সম্পদ তো আমি লাভ করেছি আমার বিশেষ যোগ্যতাবলে*১।' সে কি জানে না, আল্লাহ ওর পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল ওর চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং বেশি সঞ্চয়কারী**২? আর অপরাধীদের স্বীয় অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না৩।

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ۚ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৭৯. একবার ও ওর সম্প্রদায়ের সামনে জাঁক-জমকসহ বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলতে লাগল, 'আহা! আমাদেরও যদি অনুরূপ থাকত, যা কারূনকে দেওয়া

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ

---

* দ্বিতীয় তরজমা– 'জ্ঞানবলে'।

১. অর্থাৎ আমি যোগ্য-বুদ্ধিমান ছিলাম, কামাই করার যোগ্যতা ও বিদ্যা-বুদ্ধি আমার রয়েছে। আমি নিজ যোগ্যতা বা কোন বিশেষ জ্ঞানবলে এই সম্পদ লাভ করেছি। আল্লাহও আমার যোগ্যতা দেখে এবং আমাকে উপযুক্ত মনে করে এসব দিয়েছেন। এ কি বিনা পরিশ্রমে লাভ হয়েছে যে, মূসার হুকুমে এবং তোমাদের পরামর্শে খোদার নামে ব্যয় করে ফেলব?

** দ্বিতীয় তরজমা– 'বেশি জনবলের অধিকারী'।

২. অর্থাৎ সম্পদ কামাই করার যোগ্যতা কে দিল? আফসোস, সে প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে ভুলে তাঁরই দেওয়া সম্পদ ও যোগ্যতা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করেছে। সে কি এ ধন-সম্পদকেই নিজ মুক্তির ওসীলা মনে করে রেখেছে? ওর কি জানা নেই, কত কত লোক নিজেদের দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার কারণে ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে? ওদের নিকট রাজত্ব ছিল এবং ওরা এই অভিশপ্ত লোকটার চেয়ে বেশি ধনবল ও জনবলের মালিক ছিল। ওদের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে ওর শিক্ষা হল না?

৩. কারণ, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কী? আল্লাহ তাআলা ওদের প্রতিটি গোনাহ জানেন, ফেরেশতাদের নিকট সবই লিখিত রয়েছে। অবশ্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কাররূপে কখনো জিজ্ঞাসা করা হলে তা ভিন্ন কথা।—অথবা এতে গোনাহর আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, অর্থাৎ তা এত বেশি হবে যে, এক একটি সম্বন্ধে আলাদা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না।

আর হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'গোনাহর কারণ সম্বন্ধে ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। কারণ, কারো বিচারবুদ্ধি ঠিক থাকলে সে গোনাহ করতেই পারে না। আর যদি বিচারবুদ্ধিই নষ্ট হয়ে গেল, ফলে গোনাহ করল, তবে এ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে কী লাভ যে, এই গোনাহ করলে কেন? ক্ষতি বোঝনি?

হয়েছে। নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান[১]।'

إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

৮০. আর যাদের গভীর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের, আল্লাহ প্রদত্ত ছওয়াবই তাদের জন্য উত্তম, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে[২]। তবে এ কথা শুধু ধৈর্যশীলদেরই অন্তরে সঞ্চার করা হয়[*৩]।'

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝

৮১. অতঃপর আমি ওকে ও ওর ঘরবাড়ী ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তখন সে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল পায়নি, যারা ওকে সাহায্য করতে পারত। আর সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি[৪]।

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝

---

১. অর্থাৎ মহামূল্যবান পোশাক পরে চাকর-বাকরের সাথে বিরাট শান-শওকতসহ বের হল। তা দেখে দুনিয়ালোভী মানুষের চোখ ঝলসে গেল। ওরা বলতে লাগল, 'আহা! আমরাও যদি দুনিয়াতে এরূপ উন্নতি ও মর্যাদা লাভ করতে পারতাম! নিঃসন্দেহে সে অতি বড় ভাগ্যবান।'

২. অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বলল, হতভাগারা! এই নশ্বর চাকচিক্যে কী আর আছে যে, এরূপ পাগল হয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ তাআলার নিকট পুণ্যবান মুমিনগণ যে মহাপ্রতিদান লাভ করবে, তার সামনে এই জাঁকজমক কিছুই নয়, নিতান্ত অপদার্থ। সূর্যের তুলনায় বিন্দুর যে মূল্য, তাও না।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'এ প্রতিদান ধৈর্যশীলদেরই দেওয়া হয়'।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকে তারাই উত্তম মনে করে, যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে। পক্ষান্তরে, যাদের ধৈর্য-সহ্যের ক্ষমতা নেই, তারা লোভের বশে দুনিয়ার মোহে পতিত হয়। দুনিয়াদারের সচ্ছলতা দেখে নির্বোধ ব্যক্তি মনে করে, তার কত বড় ভাগ্য! কিন্তু তার দিনরাতের চিন্তা-ভাবনা, অস্থিরতা, মাথাব্যথা, পরকালের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং শত জায়গায় মানুষের তোষামোদ যে করা লাগে তা লক্ষ করে না। আর এও দেখে না যে, দুনিয়াতে কিছুটা আরাম-আয়েশ থাকলেও তা দশ-বিশ বছরের, অথচ মৃত্যুর পর আযাবে থাকতে হবে অনন্তকাল। (মূযেহুল কুরআন থেকে গৃহীত)

৪. অর্থাৎ অন্য কেউ নিজ থেকে তার সাহায্যে আসেনি এবং সে নিজেও কাউকে ডাকতে পারেনি। নিজের শক্তিও কাজে আসেনি, অন্যদের শক্তিও উপকারে আসেনি।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর যারা গতকালও তার মত সম্মান-মর্যাদা কামনা করেছিল, আজ তারাই বলতে লাগল, (দেখলে তো), আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন[১]। যদি না আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করতেন, তবে অবশ্যই আমাদেরও ধসিয়ে দিতেন। হাঁ, দেখলে তো, কাফেররা সফলকাম হয় না[২]।'

---

১. অর্থাৎ যারা কারূনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে গতকালও এই আকাঙ্ক্ষা করছিল যে, হায়! আমাদেরও যদি এরূপ উন্নতি হত— আজ তারাই কারূনের এই মন্দ পরিণাম দেখে তওবা করতে লাগল। তাদের চৈতন্য হল যে, এরূপ ধন-দৌলত বস্তুত সুন্দরাকৃতির বিষধর সর্পতুল্য। কারো পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখেই কখনো এ ফয়সালা করা উচিত নয় যে, আল্লাহ তাআলার নিকটও সে মর্যাদার অধিকারী। এটি কোন বান্দার প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার মানদণ্ড হতে পারে না। এ আল্লাহ তাআলার হেকমত যে, তিনি কারো জন্য রিযকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং কারো জন্য তা সংকীর্ণ করেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মকবূলিয়ত ও শুভ পরিণতির প্রমাণ নয়, বরং অনেক সময় এর পরিণাম ধ্বংস ও চরম বিনাশের আকারে প্রকাশ পায়। কবি সত্যই বলেছেন-

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبُه ÷ وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا

هذا الذي ترك الأوهام حائرة ÷ وصير العالم النحرير زنديقًا

এমন কত বুদ্ধিমান আছে, রুজি-রোজগারের পথে যে ব্যর্থকাম হয়েছে। আবার কত মূর্খ-জাহেলকে দেখবে বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক। এ দেখলে বোধ-বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। কত বিদ্বান-পণ্ডিত এ কারণে হয়েছে ঈমানহারা।

২. আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, তিনি আমাদের কারূনের ন্যায় বানাননি। নতুবা আমাদেরও এ পরিণতিই হত। আমরা তো লোভের বশবর্তী হয়ে يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنَ বলেই ফেলেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের এহেন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করে আমাদের মঙ্গল করেছেন। এমনকি, আমাদের লোভের জন্য তিনি শাস্তি দেননি। বরং কারূনের পরিণতি স্বচক্ষে দেখিয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন।

এখন আমাদের খুব বুঝে এসেছে, শুধু সম্পদের উন্নতি দ্বারা প্রকৃত সফলতা ও কামিয়াবী হাসিল হতে পারে না এবং এও বুঝে এসেছে যে, অকৃতজ্ঞ কাফেরদের জন্য আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি নেই।

[রুকূ - ৯]

৮৩. ওই পরকালীন নিবাস আমি তাদের দেব, যারা যমীনের বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য[১]।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۝

৮৪. যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে[২]। আর কেউ মন্দ কর্ম নিয়ে আসলে— যারা মন্দকর্ম করেছে, তাদেরকে তারই শাস্তি দেওয়া হবে যা তারা করত[৩]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ নির্বোধেরা কারূনের ধন-ঐশ্বর্য দেখে বলেছিল, তার পরম সৌভাগ্য। অথচ পরম সৌভাগ্য এটা নয়, বরং আখেরাতে জান্নাত লাভ করাই পরম সৌভাগ্য। আর তা তাদের জন্য, যারা আল্লাহর যমীনে দুষ্কর্ম করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না এবং নিজ সত্তাকে সকলের ঊর্ধ্বে রাখার চিন্তায় থাকে না, বরং তারা বিনয়, নম্রতা ও পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করে। নিজ সত্তাকে উপরে রাখার পরিবর্তে নিজের দীন-ধর্মকে উপরে রাখতে, সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করতে এবং মুসলিম জাতিসত্তার উন্নয়ন ঘটাতে ও তার শির সমুন্নত করতে হিম্মতের সাথে শ্রম-সাধনায় রত থাকে। তারা দুনিয়া-লোভী হয় না, আখেরাত-প্রেমিক হয়। দুনিয়া নিজেই তাদের পদচুম্বন করে।

এখন চিন্তা করে দেখ, দুনিয়া যাদের চায় ও কামনা করে, তারা কি সেই লোকদের চেয়ে শ্রেয় নয়, যারা নিজেরা দুনিয়ার পেছনে ছোটে? সাহবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের প্রতি লক্ষ করে দেখ, তাঁরা সর্বাপেক্ষা দুনিয়া-বিরাগী (تارك الدنيا) ছিলেন, দুনিয়া-বিবর্জিত (متروك الدنيا) ছিলেন না। যা হোক, আখেরাতই মুমিনের আসল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দুনিয়া যতটুকু সহায়ক হয়, ততটুকুই মুবারক। এর বেশি নিষ্প্রয়োজন।

২. অর্থাৎ যে দুনিয়াতে পুণ্য করবে, তার চেয়ে অনেক উত্তম ফল আখেরাতে তাকে দেওয়া হবে। একটি নেকীর প্রাপ্য যা, কমপক্ষে তার দশগুণ ছওয়াব লাভ করবে।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পুণ্যের বিনিময়ে আল্লাহপাক উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পাবে। আর মন্দের বদলে মন্দের ওয়াদা করেননি যে, তা পেতেই হবে। কারণ, তা মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এতটুকু বলে দিয়েছেন যে, নিজ কৃতকর্মের অধিক শাস্তি দেওয়া হবে না।'

৮৫. যিনি আপনার উপর কুরআন (এর বিধান) আবশ্যিক করেছেন*[১], তিনি অবশ্যই আপনাকে পূর্বের স্থানে** ফিরিয়ে আনবেন। আপনি বলুন, 'আমার রবই উত্তমরূপে জানেন, কে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে আছে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে[২]।

اِنَّ الَّذِیۡ فَرَضَ عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍ ؕ قُلۡ رَّبِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَنۡ جَآءَ بِالۡهُدٰی وَ مَنۡ هُوَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۸۵﴾

---

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন'।

১. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে– والعاقبة للمتقين, শুভ পরিণাম পরহেজগারদের জন্য, অর্থাৎ আখেরাতে। এখন বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতেও শেষ পর্যন্ত সফলতা পরহেজগাররাই লাভ করে থাকে। দেখুন, আজ কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আপনাকে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যে আল্লাহ আপনাকে পয়গম্বর বানিয়েছেন এবং কুরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থ দান করেছেন, তিনি আপনাকে চরম সফলতার সাথে সেই স্থানেই ফিরিয়ে আনবেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'এ আয়াত হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। এতে সান্ত্বনা দান করা হয় যে, আপনি পুনরায় মক্কায় আসবেন। সে অনুযায়ী তিনি পূর্ণ বিজয়ী হয়ে উত্তমরূপে মক্কায় ফিরে আসেন।'

অন্যান্য ব্যাখ্যা

কোন কোন মুফাসসির معاد এর অর্থ মৃত্যু করেছেন। আর কেউ আখেরাত, কেউ জান্নাত, কেউ শামদেশ (যেখানে তিনি পূর্বে একবার মেরাজ-রজনীতে গমন করেছিলেন) উদ্দেশ্য করেছেন।

প্রখ্যাত মুফাসসির হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র) উল্লিখিত উক্তিগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও গভীর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে– এস্থলে معاد দ্বারা মক্কা শরীফ উদ্দেশ্য كما في البخاري। তবে মক্কা-বিজয় নবীজির মৃত্যু-নিকটবর্তীতার আলামত ছিল, যেমন: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও উমর (রা) إذا جاء نصر الله والفتح–এর তাফসীরে বলেছেন। আর মৃত্যুর পর 'হাশর', হাশরের পর 'আখেরাত' এবং আখেরাতের সর্বশেষ মনযিল জান্নাত।

সারাসার এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে আপনাকে অতি সমারোহে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন, এর কিছুদিন পর মৃত্যু সংঘটিত হবে। এরপর শামদেশের দিকে হাশর হবে (যেমন: হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)। [জামে তিরমিযী, হাদীস ২২১৭] অতঃপর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আখেরাতে তশরীফ আনবেন এবং সর্বশেষে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে সর্বদার জন্য অধিষ্ঠিত হবেন।

** **দ্বিতীয় তরজমা**– 'প্রত্যাবর্তনস্থলে'।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমার হেদায়াত সম্পর্কে এবং আমাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী ও অবাধ্যদের গোমরাহী সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞাত। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে যথাযোগ্য

৮৬. 'আপনি তো এ আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, তবে আপনার রবের মেহেরবানীতে (তা অবতীর্ণ হয়েছে)[১]। অতএব আপনি কাফেরদের সহযোগী হবেন না[২]।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৭. আপনার প্রতি আল্লাহর বিধানাবলি অবতীর্ণ হওয়ার পর ওরা যেন আপনাকে তা থেকে কিছুতেই বিমুখ করতে না পারে। এবং আপনি আপনার রবের প্রতি আহ্বান করতে থাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[৩]।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮. আর আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকবেন না। তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই[৪]। তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল[৫]।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

আচরণ করবেন। এ হতেই পারে না যে, তিনি আমার চেষ্টা-সাধনা বিনষ্ট করে দেবেন, আর পথভ্রষ্টদের লাঞ্ছিত করবেন না।

১. অর্থাৎ আপনি আগে থেকে মোটেই পয়গম্বরীর অপেক্ষায় ছিলেন না। এ নিতান্তই আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাকে পয়গম্বরী ও ওহী দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। আর তিনিই নিজ মেহেরবানী ও রহমতে আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল করবেন। সুতরাং তাঁরই সাহায্যের উপর সর্বদা ভরসা রাখবেন।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ নিজের জাতিকে আপন মনে করবেন না, যারা আপনার সঙ্গে এই অশুভ আচরণ করেছে যে, আপনাকে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। এখন যারা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করছে, তারাই আপনার আপনজন।'

৩. অর্থাৎ দীন-ধর্মের ব্যাপারে স্বজাতির তোয়াক্কা করবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও আপনি নিজেকে তাদের মধ্যে গণ্য করবেন না। হাঁ, তাদের নিজ প্রভুর দিকে ডাকতে থাকুন এবং আল্লাহর বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকুন।

৪. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে অন্যদের শোনানো উদ্দেশ্য। কোন কোন মুফাসসির আগের দুই আয়াতের ব্যাপারেও একই কথা লিখেছেন।

৫. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আপন সত্তার দিক দিয়ে যেন অস্তিত্বহীন এবং প্রায় সকল বস্তুকেই একদিন না একদিন বিলীন হতে হবে। কিন্তু আল্লাহর সত্তা কখনো অস্তিত্বহীন ছিল না, আর কখনো

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

হুকুম তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

লয়প্রাপ্ত হবেও না। কবি সত্যিই বলেছেন- ألا كل شيء ما خلا الله باطل ('শোন! আল্লাহ ছাড়া সবই মিছা।')— আর আল্লাহ তাআলা বলেন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ {পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তা সবই নশ্বর, আর অবিনশ্বর একমাত্র আপনার রবের মহিমময় ও সম্মানিত সত্তা। -সূরা রহমান, আয়াত ২৬-২৭}

আর কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী আয়াতাংশের এ অর্থ করেছেন যে, সমস্ত আমলই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ফানা হয়ে যাবে। তবে সেই আমল নয়, যা প্রকৃতই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।

১. অর্থাৎ সকলকে তাঁর দরবারে হাযির হতে হবে, যেখানে একমাত্র তাঁরই হুকুম চলবে, বাহ্যিকভাবেও কারো হুকুম ও আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে না।

আয় আল্লাহ! সেই সময় এই পাপী বান্দার (ও পাপী অনুবাদকের) উপর দয়া করবেন এবং নিজ ক্রোধ থেকে আশ্রয় দেবেন।

সূরা আনকাবূত

সূরা ২৯ । ৬৯ আয়াত । ৭ রুকূ । মক্কী

سُوۡرَةُ الۡعَنۡکَبُوۡتِ مَکِّیَّةٌ

آیاتہا ۶۹، رکوعاتہا ۷

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১. আলিফ-লাম-মীম।

الٓـمّٓ ۚ﴿۱﴾

২. মানুষ কি মনে করে, এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না[১]?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ یُّتۡرَکُوۡۤا اَنۡ یَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ هُمۡ لَا یُفۡتَنُوۡنَ ﴿۲﴾

৩. অথচ আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি[২]। অতএব আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদের[৩]।

وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَیَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَیَعۡلَمَنَّ الۡکٰذِبِیۡنَ ﴿۳﴾

১. অর্থাৎ ঈমানের দাবি করাটা কোন সহজ কথা নয়। কারণ, যে ব্যক্তি এ দাবি করবে, তাকে পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এটিই কষ্টিপাথর, যার দ্বারা খাঁটি ও ভেজাল প্রমাণিত হয়।

হাদীসে আছে, সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের। তাঁদের পর পুণ্যবানদের, তারপর ধাপেধাপে যারা তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে তাদের (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৪৮১, তাফসীরে ইবনে কাসীর)। অনুরূপ, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার দীনী অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি দীনে যতটা মজবুত ও শক্ত হবে, তার পরীক্ষাও সেই পরিমাণ কঠিন হবে।

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী ছিল যারা, তাদের বড় বড় কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। বুখারী শরীফে (হাদীস ৬৯৪৩) আছে, একদা সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফরিয়াদ করলেন, 'হুজূর! আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন ও দো'য়া করুন।' এ তখনকার কথা, যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন ও জুলুম-অত্যাচার করছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের পূর্বে একজন মানুষকে মাটি খুঁড়ে তাতে গেড়ে দেওয়া হত এবং তার মাথায় করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হত। কারো কারো দেহে লোহার চিরুনী চালিয়ে হাড় থেকে চামড়া-গোশত বিচ্ছিন্ন করা হত। কিন্তু এত নির্মম অত্যাচার-নিপীড়নও তাদের ধর্মত্যাগী করতে পারেনি।'

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেবেন এবং বাহ্যিকভাবে দেখে নেবেন যে, ঈমানের দাবিতে কে সত্য আর কে মিথ্যা। সে মতই প্রত্যেককে প্রতিফল দেওয়া হবে।

৪. যারা মন্দ কাজকর্ম করে, তারা কি মনে করে যে, আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? ওরা যে ফয়সালা করে, তা কত মন্দ[১]!

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৫. যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তো আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।* আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬. যে সাধনা করে, সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই সাধনা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ববাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষী[৩]।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

বি. দ্র. فليعلمن الله الخ দ্বারা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের অনিত্যতার যে সন্দেহ হয়, তার অত্যন্ত তাত্ত্বিক জওয়াব বিজ্ঞ মুতারজিম (র) সূরা বাকারার আয়াত ১৪৩: اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ এর অধীনে দিয়েছেন। তা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে তাফসীরকারগণের লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের প্রতি আমরা ইঙ্গিত করে দিয়েছি।

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, '(সূরার) প্রথম দুটি আয়াত ছিল সেই মুসলমানদের সম্বন্ধে, যারা কাফেরদের নির্যাতনের শিকার ছিল। আর এই আয়াতটি সেই কাফেরদের সম্বন্ধে, যারা মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছিল।

অর্থাৎ, মুসলমানদের পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট দেখে এরা যেন মনে না করে যে, আমরা সানন্দে তাদের নির্যাতন করতে থাকব এবং নিজেরা বিপদাপদ থেকে বেঁচে যাব। কাফেররা আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোথায় যেতে পারবে? যে কঠিন শাস্তি ওদের জন্য অপেক্ষমান, তার সামনে মুসলমানদের পরীক্ষার কঠোরতা কিছুই নয়।'

দুনিয়ার সাময়িক অবকাশ দেখে কাফেররা যদি মনে করে থাকে যে, আমরা সর্বদা নিরাপদ থাকব এবং শাস্তি দেওয়ার সময় হলে আমরা খোদার মুঠিতে আসব না, তবে তাদের এ ধারণা অতি মন্দ। এহেন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ধারণা আসন্ন মুসিবতকে প্রতিহত করতে পারবে না।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে'।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই আশায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে যে, একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, যেখানে প্রতিটি বিষয়ে হিসাব নেওয়া হবে। তখন অকৃতকার্য হলে এখানকার দুঃখ-কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্ট সইতে হবে, আর সফল হলে সকল কষ্ট দূর হয়ে যাবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর দীদার নসীব হবে— এমন ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহর ওয়াদা ঘনিয়ে আসছে। কোন শক্তিই তা রোধ করতে পারবে না। তার উচ্চ আশা-ভরসা পূর্ণ হবেই এবং তার চোখ অবশ্যই শীতল হবে। আল্লাহ সবার কথা শোনেন ও জানেন। তিনি কারো পরিশ্রম ব্যর্থ হতে দেবেন না।

৩. অর্থাৎ কারো পুণ্য-সাধনায় আল্লাহ তাআলার কী লাভ, আর অবাধ্যতায় কী ক্ষতি? তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। হাঁ, বান্দা নিজ প্রভুর ইবাদত-বন্দেগীতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবে,

৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের থেকে তাদের গোনাহসমূহ দূর করে দেব এবং তাদের দান করব তাদের উত্তম আমলগুলির প্রতিদান*[১]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

৮. আমি মানুষকে স্বীয় পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ করেছি। আর তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য, যার সম্পর্কে তোমার মোটেই জানা নেই[২]— তবে তাদের কথা মান্য করো না[৩]।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ

তার সুফল দুনিয়া ও আখেরাতে সেই পাবে। সুতরাং পুণ্য-সাধনাকারীরা কখনো যেন এ ধারণা না করে যে, আমরা খোদার পথে এত পরিশ্রম করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করছি। বরং এ তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে নিজেদের উপকারার্থে ইবাদত -বন্দেগী ও সাধনা-পরিশ্রমের তাওফীক দান করেছেন-

من نہ کردم خلق تا سودے کنم ÷ بلکہ تا بندگاں جودے کنم

('আমি নিজের কোনো লাভের জন্য বিশ্বজগত সৃষ্টি করিনি, বরং বান্দার প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনের জন্য তা সৃষ্টি করেছি।')

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'তাদের দান করব– তারা যেসব আমল করত তার উত্তম প্রতিদান'।

১. অর্থাৎ বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ নিজ রহমত ও মায়া-মমতার কারণে তোমাদের পরিশ্রম সফল করেন ও তার মূল্যায়ন করেন। হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ঈমানের বরকতে পুণ্যফল লাভ হবে এবং গোনাহ-খাতা মাফ হবে।' (মুযেহুল কুরআন)

২. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতে এমন কিছু নেই, যা আল্লাহর শরীক (সমকক্ষ) হতে পারে। সুতরাং এমন বিষয় কারো জানা থাকার প্রশ্নই আসে না। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, তারা নিতান্তই জাহেলী ও সনদহীন ধেয়ান-ধারণার কারণে তা করে। প্রকৃত বাস্তবতার খবর ওদের মোটেই নেই।

৩. দুনিয়াতে (সন্তানের উপর) পিতামাতার চেয়ে বেশি হক কারো নেই, কিন্তু আল্লাহর হক তাদের চেয়েও বেশি। তাদের খাতিরে আল্লাহর দীন ত্যাগ করবে না। ('মূযেহুল কুরআন'।)

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করতে তা জানিয়ে দেব[১]।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করব[২]।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ

১০. মানুষের মধ্যে কতক এমন যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।' অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে[৩]। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে

একটি বর্ণনা

হাদীসে আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের মুশরিক মাতা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে শপথ করল, সা'দ ইসলাম থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত দানা-পানি কিছুই খাবে না, ছাদের নীচে আরামও করবে না। সে মত সে পানাহার বর্জন করল এবং একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। লোকেরা জোরপূর্বক হা করিয়ে মুখে দানা-পানি দিত। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৪৬৬; তাফসীরে তবারী ১৮/৩৬৩)

এতে যেন বলে দেওয়া হল, পিতামাতার পক্ষে মুমিন সন্তানকে সত্যের পরিপন্থী কাজে বাধ্য করার চেষ্টাও সন্তানের জন্য একটি পরীক্ষা। মুমিনের উচিত, এ অবস্থায় দৃঢ়পদ থাকা, বিচলিত না হওয়া।

১. অর্থাৎ সকলকে আল্লাহর আদালতে হাযির হতে হবে, তখন জানিয়ে দেওয়া হবে, সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে কে বাড়াবাড়ি করেছিল আর কে হক ও ন্যায়ের উপর ছিল।

২. অর্থাৎ যারা এরূপ কঠিন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ঈমান ও নেকীর পথে কায়েম থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাদের হাশর তাঁর বিশিষ্ট নেক বান্দাদের সঙ্গে করবেন। ইবনে কাছীর (র) লেখেন- 'সন্তান-সন্ততি যদি বাতিল বিষয়ে পিতামাতার কথা অমান্য করে আর পিতামাতা বাতিলের উপর কায়েম থাকে, তবে সন্তানসন্ততির হাশর পুণ্যবানদের সাথে হবে, পিতামাতার সাথে হবে না- যদিও জন্মগত ও বংশীয় সম্পর্কের কারণে তারা সন্তানের সব চেয়ে নিকটবর্তী ছিল।'

এতে বোঝা গেল, المرء مع من أحب হাদীসে (বুখারী : ৬১৬৮) দীনী মহব্বত উদ্দেশ্য, জন্মগত, রক্তসম্পর্কিত প্রভৃতি মহব্বত উদ্দেশ্য নয়।

৩. এটা সেই লোকদের কথা, যারা মুখে নিজেদের মুমিন বলত, কিন্তু অন্তরে ঈমান পাকা ছিল না। আল্লাহর পথে যখন ওরা কোন কষ্টে পতিত হত অথবা দীন-ধর্মের কারণে লোকেরা

কোন সাহায্য এসে পৌছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলতে শুরু করবে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ছিলাম[১]।' তবে কি আল্লাহ বিশ্ববাসীদের অন্তরে কী আছে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত নন[২]?

مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَٰلَمِينَ ۝

১১. আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই জেনে নেবেন মুনাফেকদের[৩]।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَٰفِقِينَ ۝

১২. কাফেররা ঈমানদারদের বলে, 'তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের গোনাহ বহন করে নেব[৪]।' অথচ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ وَمَا

নির্যাতন করত, তখন এ পরীক্ষাকে খোদায়ী আযাব বলে জ্ঞান করত। মানুষ যেমন আল্লাহর আযাবের মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষার জন্য নিজের পূর্ববর্তী দাবিদাওয়া বিসর্জন দিতে শুরু করে এবং অগত্যা স্বীকার করে যে, আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম— ঠিক এ অবস্থা ছিল উক্ত দুর্বলচিত্ত লোকগুলোর। দীনের কারণে কোন বিপদ এল, অমনি ঘাবড়ে গিয়ে ঈমানের দাবি বিসর্জন দিতে শুরু করল এবং মুখে বা কাজের মাধ্যমে যেন স্বীকার করতে শুরু করে নিল যে, আমরা এই দাবি করে ভুল করেছিলাম কিংবা এমন দাবি আদৌ করিনি।

১. অর্থাৎ যদি মুসলমানদের কোন সফলতা ও অগ্রগতি দেখে, তখন কথা বানাতে শুরু করে। বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ছিলাম এবং এখনো তোমাদের মুসলমান ভাই। বিশেষত মুসলমানদের যদি বিজয় হয় এবং ঘটনাক্রমে কাফেরদের সহযোগিতা করতে গিয়ে এরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, তখন তো আর মুনাফেকী ও কপটতার কোন সীমা থাকে না।

২. অর্থাৎ এই লোকেরা কতটুকু মুসলমানদের সঙ্গে আছে, তা আল্লাহর খুব জানা আছে। মুখে খুব দাবি করে কি ওরা আল্লাহর নিকট থেকে অন্তরের অবস্থা গোপন করতে পারবে?

৩. অর্থাৎ তিনি তো প্রথম থেকেই সব কিছু জানেন, কিন্তু এখন তিনি কার্যত তোমাদের আমল দেখে নেবেন যে, কে নিজেকে কর্মের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন প্রমাণিত করে এবং কে মিথ্যাবাদী- মুনাফিক প্রমাণিত করে।

বি. দ্র. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনের স্থানে ليعلمن الله এর অর্থ ليرين (আল্লাহ দেখিয়ে দেবেন)— (তাফসীরে ইবনে কাছীর)।

৪. মুসলমানদের উচিত ঈমানের উপর মজবুত থাকা। কোন দুঃখ-কষ্টই যেন তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচলিত না করতে পারে এবং কাফেরদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রস্তাবেও যেন তারা প্রভাবিত না হয়। যেমন: কাফেররা মুসলমানদের বলে, তোমরা ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায়

ওরা তাদের গোনাহের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় ওরা মিথ্যাবাদী।

هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

১৩. নিশ্চয় ওরা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝা[১] এবং কিয়ামতের দিন অবশ্যই ওদেরকে ওরা যে মিথ্যা রচনা করত তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে[২]।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

নিজেদের আত্মীয়স্বজনের দলে এসে যাও এবং আমাদের পথের অনুসরণ কর, তাহলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। অযথা কেন বিপদাপদ সহ্য করছ? আর এমন করাকে যদি গোনাহ মনে কর এবং জবাবদিহিতার আশঙ্কা কর, তবে খোদার নিকট আমাদের কথা বলবে যে, তারা আমাদের এ পরামর্শ দিয়েছিল। যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমরা বহন করব এবং তোমাদের পাপের বোঝা আমরা নিজেদের মাথায় নেব। কবির ভাষায়—

تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

('তুমি আনন্দ-ফুর্তি কর, যা কিছু হয় সব কিছুর বোঝা আমার ঘাড়ে।')

১. অর্থাৎ ওরা মিথ্যাবাদী– তোমাদের বোঝা তিল পরিমাণও হালকা করতে পারবে না। হ্যাঁ, নিজেদের বোঝা ভারী করছে। একে তো ছিল নিজস্ব পাপের বোঝা, এখন অন্যদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার গোনাহ তার সাথে যুক্ত হল।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বন্ধুত্বের খাতিরে কেউ অন্যের গোনাহ নিজ মাথায় নিতে চাইলেও তা হবে না। তবে সে যাকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তার বিভ্রান্তির ফলে গোমরাহ ব্যক্তি যে গোনাহ করেছে, সেই গোনাহর বোঝা উভয়ের উপর থাকবে।'

যেমন : হাদীসে এসেছে, দুনিয়াতে যে কেউ অন্যায় (নাহক) কতল করে, তার গোনাহর অংশ আদমের প্রথম পুত্র (কাবিল)-এর উপরও বর্তায়, কেননা সে-ই এ মন্দ পথ বের করেছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮৬৭)

২. অর্থাৎ ওরা মুমিনদের বোঝা বহন করবে বলে যেসব মিথ্যা কথা বানায়, তা স্বতন্ত্র গোনাহ। তার জন্য ওরা ধৃত হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সামনে কতিপয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের মোকাবেলায় মিথ্যাবাদীরা চিরকাল বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতি করে এসেছে এবং সত্যবাদীদের যুগ যুগ ধরে পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে

[রুকূ - ২]

১৪. নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। আর তিনি তাদের মাঝে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন[১]। অতঃপর ওদের পাকড়াও করল প্লাবন, আর ওরা ছিল অপরাধী[২]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ۝

১৫. তখন আমি তাঁকে ও নৌযাত্রীদের রক্ষা করলাম[৩] এবং নৌযানটিকে বানিয়ে দিলাম বিশ্ববাসীদের জন্য একটি নিদর্শন[৪]।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۝

শেষ পরিণাম তাদেরই উত্তম হয়েছে। অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিকারীরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সত্যবাদীরা সফল ও বিজয়ী হয়েছে। দুর্ভাগাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মত দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে।

১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন, সাড়ে নয় শ' বছর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংশোধনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর প্লাবন আসে, প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন। এভাবে তাঁর মোট বয়স এক হাজার পঞ্চাশ বছর হয়েছিল। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ৩৪৬১৯)

২. অর্থাৎ ওরা যখন পাপাচার ও অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত হল না, তখন প্লাবন ওদের গ্রাস করল এবং স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই ধ্বংস হল।

৩. অর্থাৎ যেসব মানুষ ও পশু-পাখি নৌকায় আরোহী ছিল, তাদের আমি নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে হেফাজত করি। সূরা 'হূদে' এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. কথিত আছে, হযরত নূহ (আ)-এর জাহাজটি দীর্ঘকাল যাবৎ 'জুদী' পাহাড়ে নোঙর করেছিল, যাতে দর্শকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়। বর্তমান কালে যে নৌকা ও জাহাজ রয়েছে, তাও এমন এক নিদর্শন, যা দেখে নূহ (আ)-এর জাহাজের স্মৃতি তাজা হয় এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের নমুনা নজরে আসে। আর এই অর্থও হতে পারে যে, নৌযানের এ কাহিনীকে আমি সর্বদার জন্য শিক্ষার বিষয় বানিয়ে দিয়েছি।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, যে সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন হুজুর (স.) এর বহু সাহাবী কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে একটি নৌকায় চড়ে হাবশা রাজ্যের দিকে চলে গিয়েছিলেন। হুজূর যখন হিজরত করে মদীনায় গেলেন, তখন সেই সাহাবীরাও নিরাপদে মদীনায় গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলেন। এভাবে যেন নূহ (আ) ও নূহের জাহাজের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

১৬. এবং (পাঠিয়েছিলাম) ইবরাহীমকে, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় করতে থাক। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখ।

وَاِبۡرٰهِیۡمَ اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوۡهُ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিদেরই উপাসনা কর, আর রচনা কর মিথ্যা[১]। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করছ, নিশ্চয় তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। অতএব রিযিক অন্বেষণ কর আল্লাহর নিকটে এবং তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে[২]।

اِنَّمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا وَّتَخۡلُقُوۡنَ اِفۡکًا ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَا یَمۡلِکُوۡنَ لَکُمۡ رِزۡقًا فَابۡتَغُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزۡقَ وَاعۡبُدُوۡهُ وَاشۡکُرُوۡا لَهٗ ؕ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۷﴾

১৮. 'আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে তোমাদের পূর্বেও বহু সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া[৩]।'

وَاِنۡ تُکَذِّبُوۡا فَقَدۡ کَذَّبَ اُمَمٌ مِّنۡ قَبۡلِکُمۡ ؕ وَمَا عَلَی الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِیۡنُ ﴿۱۸﴾

১৯. ওরা কি দেখে না, আল্লাহ কেমন করে সৃষ্টির সূচনা করেন? অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন[৪]।

اَوَلَمۡ یَرَوۡا کَیۡفَ یُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُهٗ ؕ

---

১. অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস রচনা করছ এবং মিথ্যা ধারণা ও কল্পনার অনুসরণ করছ। যেমন : তোমরা নিজ হাতে এসব মূর্তি তৈরি করে নিয়েছ এবং এসবকে অন্যায়ভাবে খোদা বলছ।

২. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অধিকাংশ মানুষ জীবিকার পিছনে ঈমান নষ্ট করে। অতএব জেনে রাখ– আল্লাহ ছাড়া কেউ রিযিক দেন না। তিনিই নিজ খুশী মত দেন।'

সুতরাং কৃতজ্ঞ বান্দা হও এবং তাঁরই বন্দেগী কর। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তখন কী জবাব দেবে?

৩. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকৃতিতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি সুস্পষ্টরূপে তাবলীগ ও নসীহত করে নিজ দায়িত্ব পালন করেছি, ভাল-মন্দ বুঝিয়েছি। না মানলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমনটি হয়েছিল তোমাদের পূর্বে 'আদ', 'ছামূদ' প্রভৃতি জাতির।

৪. অর্থাৎ তোমরা আপন অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা কর। পূর্বে তোমরা কিছুই ছিলে না, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই মৃত্যুর পর তিনি তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

নিশ্চয় এ আল্লাহর জন্য সহজ[১]।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২০. আপনি বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, তিনি কেমন করে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা দয়া করবেন[৩]। এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

২২. তোমরা (আল্লাহকে) যমীনেও অক্ষম করতে পারবে না এবং আকাশেও না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, সাহয্যকারীও নেই[৪]।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'সৃষ্টির সূচনা তো দেখ, এ থেকেই দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি বুঝে আসবে।"

১. অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তো কোন বিষয়ই কঠিন নয়। তোমরাও সামন্য চিন্তা করলে তা বুঝতে পারবে, বিশেষত পুনর্বার সৃষ্টি করার বিষয়টি। কারণ, যিনি প্রথমবার নমুনা ছাড়াই একটি জিনিস সৃষ্টি করলেন, নুমনা কায়েম হওয়ার পর তাঁর পক্ষে সেই বস্তু সৃষ্টি করা সহজতর হওয়ার কথা।

২. অর্থাৎ নিজেদের অস্তিত্বের সাথে সাথে অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারেও ভেবে দেখ। এবং ঘুরে ফিরে দেখ যে, কেমন কেমন মাখলূক আল্লাহ তাআলা পয়দা করেছেন। এ থেকেই পুনর্জীবনের বিষয়টি বুঝে নাও। তাঁর কুদরত তো এখন সীমিত হয়ে যায়নি।

৩. অর্থাৎ পুনর্জীবিত করার পর তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যার প্রতি ইচ্ছা নিজ দয়ায় মেহেরবানী করবেন।

৪. অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিতে চান, সে যমীনের কোন ছিদ্র বা ফাটলে ঢুকে পড়লেও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না, আকাশে উড়ে গিয়েও না। (আকাশের) উচ্চতা বা (যমীনের) নিম্নতা কোন কিছুই আল্লাহর অপরাধীকে আশ্রয় দিতে পারে না এবং কোন শক্তিই তার সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে না।

[রুকূ - ৩]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

২৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, ওরাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে[১]। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

২৪. তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ওরা (পরস্পরকে) বলল, 'তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে জ্বালিয়ে দাও[২]।' তখন আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন[৩]। নিশ্চয় এতে ঈমানদার লোকদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন[৪]।

---

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহর বাণী অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা পরিত্যাগ করেছে (কেননা, ওরা মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাসীই না), ওরা আল্লাহর রহমতের আশা কী করে করতে পারে? অতএব ওরা আখেরাতে বঞ্চিত ও নিরাশই থাকবে। এ যেন- من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت {যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তো, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। -আনকাবুত : ৫} —এর বিপরীত চিত্র।

২. অর্থাৎ যখন ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তিসংগত কথাবার্তা ও দলীল-প্রমাণাদি শুনে তাঁর জাতি উত্তর দানে অপারগ হল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা ব্যবহারের ইচ্ছা করল। ওরা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করল যে, হয় হত্যা করে তার দফা রফা করে দাও, না হয় আগুনে জ্বালাও- হয় কষ্ট অনুভব করে নিজ কথাবার্তা থেকে বিরত হবে, তখন আগুন থেকে তাকে বের করে আনব। নতুবা তাতেই পড়ে থাকবে এবং পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ পরামর্শ করে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগুনকে আরামদায়ক করে দিলেন, যেমন: সূরা 'আম্বিয়া'-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে (আয়াত ৬৮-৭০)।

৪. অর্থাৎ উক্ত ঘটনার দ্বারা দেখিয়ে দেওয়া হল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্যবাদী বান্দাদের কীভাবে রক্ষা করেন এবং বাতিলপন্থীদের কী করে ব্যর্থ ও ধ্বংস করেন। আরো জানা গেল, প্রত্যেক জিনিসের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর হুকুমের নিয়ন্ত্রণাধীন। হুকুম না হলে আগুনের ন্যায় বস্তুও জ্বালাতে পারে না।

২৫. ইবরাহীম আরো বললেন[১], 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিদেরকে (উপাস্য বানিয়েছ), কেবল দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পরস্পরের বন্ধুত্বের কারণেই[২]। তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে[৩]।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ

১. অর্থাৎ আগুন থেকে বের হয়ে পুনরায় নসীহত করা শুরু করলেন।

২. অর্থাৎ মূর্তিপূজাকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে? মূর্তিপূজকরাও অন্তরে স্বীকার করে যে, এটা অত্যন্ত নিরর্থক কাজ। কিন্তু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার উদ্দেশ্যে ওরা একে একটি ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, যাতে এর নামে এবং একে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে, যেমন বর্তমানে আমরা ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিগুলোর অবস্থা দেখি।

অথবা অর্থ এই যে, মূর্তিপূজার উদ্ভব ও প্রচলন এ জন্য হয়নি যে, এ কোন যুক্তিসংগত বিষয়। বরং অন্ধ অনুসরণ, সামাজিক উদারতা এবং পরস্পর সম্পর্ক রক্ষার অদম্য প্রেরণাই এর বড় কারণ।

অথবা উদ্দেশ্য এই যে, মূর্তিপূজার আসল ভিত্তি ছিল পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। অর্থাৎ, কোনো জাতির মধ্যে কিছু জনপ্রিয় পুণ্যবান মানুষের যখন মৃত্যু হয়ে গেল, তখন লোকেরা ভালবাসার আতিশয্যে তাদের ছবি বানিয়ে স্মৃতিস্বরূপ সংরক্ষণ করে। এরপর সেই ছবিগুলোর ভক্তি-শ্রদ্ধা শুরু করে দেয়, এই ভক্তি-শ্রদ্ধাই বাড়তে বাড়তে পরিশেষে পূজায় পরিণত হল।

তাফসীরকারগণ আয়াতের তাফসীরে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই উল্লেখ করেছেন। আর হতে পারে- مودة بينكم দ্বারা মূর্তিসমূহের প্রতি পূজারীদের যে ভালবাসা, তা উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ মূর্তির ভালবাসার কারণে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে), যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে- أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ {অন্যদের আল্লাহর এমন সমকক্ষ মনে করে যে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদের ভালবাসে। -বাকারা : ১৬৫}

৩. অর্থাৎ এসব বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কয়েক দিনের। কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে এবং কতক কতকের উপর অভিশাপ করবে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ যেসব শয়তানের উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চনা করে, তারা আল্লাহর সম্মুখে অস্বীকার করে বলবে, আমরা ওদের বলিনি যে, আমাদের পূজা কর। তখন এ পূজারীরা ওদের অভিশাপ করবে আর বলবে, আমাদের নেয়ায-নজরানা (উৎসর্গকৃত বস্তু) নিয়ে এই কঠিন দুঃসময়ে আমাদের থেকে মুখ ফিরিয় নিলি!

وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই[১]।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৬. আর লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। এবং ইবরাহীম বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।'

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর আমি তাঁকে ইসহাক ও ই'য়াকূব দান করলাম[৩], তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব (-এর ধারা) জারি রাখলাম[৪] এবং দুনিয়াতে তাঁকে দিলাম তাঁর প্রতিদান। আর আখেরাতে অবশ্যই তিনি পরম পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন[৫]।

---

১. অর্থাৎ তোমাদের এমন সাহায্যকারীরা নেই, যারা দোযখের আগুন থেকে তোমাদের রক্ষা করবে– কিন্তু আমার প্রভু তোমাদের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

২. হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা ছিলেন। হযরত ইবরাহীমের প্রতি তাঁর জাতির কোন পুরুষই ঈমান আনেনি, কিন্তু লূত (আ) অবিলম্বে ঈমান আনলেন। উভয়ের জন্মভূমি ছিল ইরাকের 'বাবেল' শহর। আল্লাহর উপর ভরসা করে উভয়ে এখান থেকে বের হলেন। আল্লাহ তাঁদের শামে পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁরা সেখানকার অধিবাসী হয়ে গেলেন।

৩. অর্থাৎ পুত্র ইসহাক ও নাতি ইয়াকূব দান করলেন, যাঁর বংশ 'বনী ইসরাঈল' বলে খ্যাত।

৪. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর তাঁর সন্তানসন্ততি ছাড়া আর কাউকে আসমানী কিতাব ও নবুওয়াত দেওয়া হবে না। সে অনুযায়ী তাঁর পর যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে তশরীফ এনেছেন, তাঁরা সকলে তাঁরই সন্তানাদির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ জন্যই তাঁকে أبو الأنبياء (নবীদের পিতা) বলা হয়।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততি, মান-মর্যাদা ও সর্বদার জন্য নেক নাম দান করলেন এবং শামদেশ সর্বদার জন্য তাঁর সন্তানসন্ততিকে দিলেন (মূযেহুল কুরআন)।

এ ছাড়া তাঁকে পরকালে সর্বোচ্চ স্তরের পুণ্যবানদের জামাতভুক্ত করলেন অর্থাৎ মহামর্যাদাবান নবী-রাসূলের জামাতভুক্ত।

২৮. এবং (পাঠিয়েছিলাম) লূতকে, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা তো অশ্লীল কাজ কর, তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের কেউ তা করেনি[১]।

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝

২৯. 'তোমরা কি পুরুষের কাছে গমন কর এবং রাহাজানি কর[২] আর নিজেদের মজলিসে জঘন্য কর্ম কর[৩]? তখন তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তর এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ওরা বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদী হও[৪]।'

اَئِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ وَتَقۡطَعُوۡنَ السَّبِيۡلَ ۙ وَتَاۡتُوۡنَ فِىۡ نَادِيۡكُمُ الۡمُنۡكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا ائۡتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ۝

---

১. অর্থাৎ এ জঘন্য অশ্লীলকর্ম তোমাদের পূর্বে কেউ করেনি। এতে প্রমাণ হয় যে, মানব স্বভাবের কাছে এ অত্যন্ত ঘৃণিত। স্বভাব ও শরী'য়ত-পরিপন্থী এহেন কাজ তোমরাই প্রথম চালু করেছ।

২. تقطعون السبيل -এর অর্থ সম্ভবত ডাকাতি করা। এও ওদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে থাকবে। অথবা উক্ত কুকর্মের দ্বারাই পথিকদের পথে বাধার সৃষ্টি করত– এরূপে যে, ভয়ের কারণে পথিকরা সেই দিক দিয়ে যেত না। অথবা تقطعوا السبيل এর অর্থ এই যে, স্বাভাবিক ও অভ্যাসগত পথ ছেড়ে তোমরা বংশ বৃদ্ধি ও সন্তান জন্মানোর পথ বন্ধ করছ।

৩. সম্ভবত উক্ত কুকর্মই প্রকাশ্যে মানুষের সামনে করত, বিন্দুমাত্র লজ্জাও ওদের ছিল না। অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অন্য কোন নির্লজ্জতার কাজ (লোকের সামনে) করত, منكر দ্বারা তাই উদ্দেশ্য।

৪. অর্থাৎ আপনি যদি সত্য নবী হন এবং আপনার এ কথা সত্য হয়ে থাকে যে, আমাদের এ কর্ম মন্দ ও শাস্তিযোগ্য— তবে দেরি কেন? সেই আযাব এখনি নিয়ে আসুন।

একটি প্রশ্নের উত্তর

অন্যত্র বলা হয়েছে— وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (তখন তাঁর সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোনো উত্তর ছিল না যে, ওরা বলল, 'তোমাদের শহর থেকে এদের বের করে দাও, এরা খুব বেশি পবিত্র থাকতে চায়।' –সূরা আ'রাফ, আয়াত ৮২) (তো, দুই আয়াতে দু' ধরনের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে?)

সম্ভবত লূতের জাতির কেউ কেউ এ উত্তর, আর কেউ কেউ সে উত্তর দিয়েছে। অথবা এক সময় এ কথা, অন্য সময় দ্বিতীয় কথা বলে থাকবে। অর্থাৎ প্রথমে আযাবের হুমকি শুনে উপহাস করেছে এবং বলেছে– পারলে আযাব আন! পরে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাদের লোকালয় থেকে বের করে দেওয়া হোক।

৩০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! (এই) দুষ্কৃতিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন[১]।'	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

[রুকূ - ৪]

৩১. আমার প্রেরিত ফেরেশতারা যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'আমরা অবশ্যই এই জনপদবাসীদের ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা অপরাধী[২]।'	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾

লূত-জাতির জঘন্য অবস্থা

যা হোক, এতে প্রমাণিত হয় যে, লূত- জাতি এ জঘন্য কর্মের শুধু প্রবর্তকই ছিল না, বরং এ কুকর্ম জারি রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। এমনকি নসীহতকারী পয়গম্বরকেই নিজেদের লোকালয় থেকে বহিষ্কার করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ওদের স্বভাব ও প্রকৃতি এমনই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, অন্তরে আল্লাহ-ভীতির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, ফলে আযাবের হুমকি শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং পয়গম্বরের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে উদ্যত ছিল। পাপাচারের এ ভয়াবহ অবস্থাই ওদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। সেই সাথে যদি তাওহীদের দাওয়াতকেও অস্বীকার করে থাকে, তবে তো অধিকতর ধ্বংসযোগ্য ছিল।

মনে হয়, তাওহীদের দাওয়াত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ থেকে প্রচারিত হতে হতে ওদের কাছেও পৌঁছেছিল। এজন্য লূত আলাইহিস সালামকে কেবল এ জঘন্য কুকর্ম থেকে বারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর এমনও হতে পারে, তিনি তাওহীদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের দাওয়াতও দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

১. ওদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে এ দো'য়া করলেন। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন যে, এদের ভবিষ্যত বংশধরও সংশোধন হওয়ার নয়। ওরাও এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে, যেমন পূর্বে নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (আপনি যদি ওদের ছেড়ে দেন, তবে ওরা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু পাপাচারী ও (সত্যের) অস্বীকারকারী। -সূরা নূহ, আয়াত ২৭) كذا قال النيشا بوري في تفسيره

২. লূত আলাইহিস সালামের দো'য়ার কারণে ফেরেশতাদের সেই বসতি ধ্বংস করে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণ প্রথমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট আসেন। তাঁরা তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের সুসংবাদ শুনালেন এবং জানালেন, 'আমরা ঐ (সাদূম) বসতি ধ্বংস ও নিপাত করতে যাচ্ছি। কেননা, সেখানকার লোকেরা কোনভাবেই

৩২. তিনি বললেন, 'সেখানে তো লূতও আছে'[১]। তাঁরা বলল, 'আমরা ভাল করে জানি, সেখানে কে আছে। আমরা অবশ্যই তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব- তবে তাঁর স্ত্রী ছাড়া। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে যাবে[২]।

قَالَ اِنَّ فِيۡهَا لُوۡطًا ؕ قَالُوۡا نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَنۡ فِيۡهَا ٝ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ٝ كَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. অতঃপর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের নিকট আসলে তাদের কারণে তিনি বিব্রত হলেন এবং তাঁর অন্তর কুণ্ঠিত হল[৩]।

وَلَمَّاۤ اَنۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا

নিজেদের জঘন্য কর্ম থেকে বিরত হচ্ছে না।' উল্লেখ্য, এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আ'রাফ, হূদ, হিজর প্রভৃতিতে গত হয়েছে।

বি. দ্র. ধ্বংসের সংবাদের সাথে পুত্রের সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, যদিও একটি জাতি থেকে আল্লাহর পৃথিবী শূন্য করা হচ্ছে, তবে অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা এক বিরাট মর্যাদাশালী জাতি 'বনী ইসরাঈল'এর ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছেন। (نَبَّهَ عليه النيشابورى في تفسيره)

১. অর্থাৎ লূতের বর্তমানেই কি বসতি ধ্বংস করা হবে, না তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আযাব নাযিলের আদেশ কার্যকর করা হবে?

খুব সম্ভব স্নেহবশত হযরত ইবরাহীম (আ) ধারণা করে থাকবেন যে, লূতের চোখের সামনে যদি এ বিপদ নাযিল হয়, তবে আযাবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হয়ত সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এ কারণে তিনি কথাটি বললেন। ফেরেশতাগণ আযাব নাযিলের ঘোষণায় কাউকেই বাদ রাখার কথা বলেননি। এতে তাঁর মনে এ ধারণা এসে থাকবে যে, লূত (আ)-এর বর্তমানেই হয়ত তারা বসতি ধ্বংস করবে।

২. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ অভয় দান করত বললেন, সেখানে কারা থাকে এবং তাদের মধ্যে কারা আল্লাহর অবাধ্য, কারা ফরমাবরদার—সবই আমরা জানি। ভয় নেই, শুধু লূতই নন, বরং তাঁর পরিবারবর্গও অক্ষত থাকবে। সকলকেই আযাবের স্থান থেকে সরিয়ে নেব, কেবল তাঁর স্ত্রী সেখানে থেকে যাবে। কারণ, তার উপরও আযাব আসবে।

৩. ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুশ্রী কিশোর আকৃতি ধারণ করে সেখানে যান। হযরত লূত প্রথমে তাঁদের চিনতে পারেননি। তাঁর জাতির হাত থেকে এদের কী করে রক্ষা করবেন- এই চিন্তায় তাঁর মন খুবই কুণ্ঠিত হল এবং তিনি বিব্রত বোধ করলেন। তাঁদেরকে বাড়িতে স্থান না দিলে ভদ্রতা ও আতিথেয়তার পরিপন্থী হবে, আর অবস্থান করতে দিলে এই দুর্বৃত্ত জাতির হাত থেকে সম্মান কীভাবে রক্ষা পাবে—এসব ভেবে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন।

وَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۟ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۳﴾

তারা বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না এবং চিন্তিত হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে রয়ে যাবে।

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. 'আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব অবতীর্ণ করব, কেননা ওরা নাফরমানি করছে[১]।

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আর আমি তো বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য এ জনপদের স্পষ্ট নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি[২]।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. এবং মাদয়ানবাসীদর প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে (পাঠিয়েছিলাম)। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর এবং কিয়ামত দিবসের প্রত্যাশা কর[৩] আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না[৪]।'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. কিন্তু ওরা তাঁকে অস্বীকার করল, ফলে ওদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প। আর ওরা নিজেদের ঘরবাড়ীতে অধোমুখে পড়ে রইল।

---

১. অর্থাৎ স্বজাতির দুষ্কৃতির ভয়ে শঙ্কিত হবেন না, এরা কিছুই করতে পারবে না। আর আমাদের আত্মরক্ষার চিন্তাও করবেন না। আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। আমরা আপনাকে ও আপনার সমমনা পরিবারবর্গকে রক্ষা করে এ জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসেছি।

এ কাহিনী ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে গত হয়েছে।

২. কারণ, লূত-সম্প্রদায়ের উল্টে যাওয়া বসতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ শামে যাওয়ার পথে মক্কাবাসীদের চোখে পড়ে।

৩. অর্থাৎ আখেরাত সম্বন্ধে উদাসীন হয়ো না, আর একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী কর।

৪. 'বিপর্যয় সৃষ্টি করা' বলতে সম্ভবত লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা, সুদখোরী ও চাঁদাবাজি উদ্দেশ্য, যা ওদের অভ্যাস ছিল। হতে পারে, ওরা দস্যুবৃত্তিও করত। (এ ছাড়া আরো বিভিন্ন মত فساد-এর বিষয়ে বর্ণিত আছে।)

৩৮. এবং (ধ্বংস করেছি) 'আদ ও ছামূদকে। আর তোমাদের কাছে তো ওদের বাড়ী-ঘর দ্বারাই (ওদের অবস্থা) স্পষ্ট হয়ে গেছে[১]। শয়তান ওদের আমলাদিকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, আর এভাবে সৎপথ থেকে ওদের নিবৃত্ত করেছিল, অথচ ওরা ছিল বিচক্ষণ[২]।

وَعَادًا وَثَمُودَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

৩৯. এবং (ধ্বংস করেছি) কারূন, ফেরাওন ও হামানকে। ওদের নিকট মূসা এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে। কিন্তু ওরা যমীনে বড়াই করল, অথচ আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা ওদের ছিল না[৩]।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

৪০. মোটকথা, আমি সকলকে নিজ নিজ অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি[৪]: ওদের কেউ তো এমন, যার প্রতি আমি প্রস্তর বর্ষণকারী তীব্র বাতাস পাঠিয়েছি[৫]। কেউ এমন, যাকে ভয়ঙ্কর গর্জন পাকড়াও করেছে[৬]। কেউ এমন, যাকে আমি ধসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে[৭]। আর কেউ এমন, যাকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি[৮]। আল্লাহ ওদের প্রতি আদৌ জুলুম করার ছিলেন না, বরং ওরা

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ

---

১. অর্থাৎ ওদের লোকালয়সমূহের ধ্বংসাবশেষ তোমরা দেখেছ, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

২. অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে বিচক্ষণ ছিল এবং নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করত। কিন্তু শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

৩. অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখেও সত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি এবং গর্ব ও অহংকার ওদের মাথা অবনত হতে দেয়নি। অতঃপর ফল কী হল? বড়াই করে কি শাস্তি থেকে রক্ষা পেল, অথবা আল্লাহকে হারিয়ে দিতে পারল? বিলকুল না।

৪. অর্থাৎ ওদের প্রত্যেককে স্বীয় অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়।

৫. এরা লূত-সম্প্রদায়। কেউ কেউ 'আদ' সম্প্রদায়কেও এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৬. এরা ছিল 'ছামূদ' জাতি ও 'মাদ্য়ান'বাসীরা।

৭. অর্থাৎ কারূনকে, যেমন: সূরা কাসাস-এ বর্ণিত হয়েছে।

৮. এরা হল ফেরাওন ও হামান। আর কেউ কেউ নূহের জাতিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত[১]।

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৪১. যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য অভিভাবক অবলম্বন করেছে, ওদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন মাকড়সা— সে একটি ঘর বানিয়েছে, আর নিশ্চয়ই সকল ঘরের মধ্যে দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর। আহা! ওরা যদি বুঝত[২]।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪২. নিশ্চয় আল্লাহ জানেন- ওরা তাঁর পরিবর্তে কোন কোন বস্তুকে ডাকে[৩]। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৪]।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪৩. আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি। তবে তা তারাই বোঝে যারা জ্ঞানী[৫]।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শান এমন নয় যে, তিনি কোন অবিচার বা অহেতুক কাজ করতে পারেন। তাঁর সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তাঁর ক্ষেত্রে অবিচারের কল্পনাই করা যায় না। হাঁ, মানুষ নিজেদের উপর অবিচার করে অর্থাৎ এমন কাজ করে, যার ফল আদৌ ওদের পক্ষে কল্যাণকর হয় না।

২. অর্থাৎ ঘরের প্রয়োজন তো এ কারণে হয় যে, তাতে ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে। তাই তা মাকড়সার জালের ন্যায় হলে চলে না, যা হাতের সামান্য ঝটকায় ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক এ অবস্থা সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে নিজের হেফাজতকারী মনে করে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা করতে পারে না।

৩. শ্রোতার এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, কী আশ্চর্য! সকলকে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, কাউকেই বাদ দেওয়া হল না? অথচ কেউ মূর্তি পূজা করে। কেউ আগুন ও পানিকে পূজে, কেউ আওলিয়া, নবী-রাসূল বা ফেরেশতাদের পূজা করে।

উত্তরে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ সকলকেই জানেন। তাদের মধ্যে কোনো একজনও স্বতন্ত্র ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অধিকারী নয়। হলে আল্লাহ সকলকে বাতিল সাব্যস্ত করতেন না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন বন্ধুর দরকার নেই, তিনি মহাশক্তিশালী। এবং তাঁর কারো পরামর্শেরও প্রয়োজন নেই, তিনি একচ্ছত্র হেকমতওয়ালা।

৫. মক্কার মুশরিকরা বলত, আল্লাহ তাআলা 'মাকড়সা', 'মাছি' প্রভৃতি তুচ্ছ প্রাণীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, এ তাঁর মর্যাদার পক্ষে অশোভন।

৪৪. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথার্থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন[১]। নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে[২]।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۴۴﴾

পারা- ২১ [রুকূ - ৫]

৪৫. আপনার নিকট যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা পাঠ করুন[৩] এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দকাজে বাধা প্রদান করে[৪]।

اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ ؕ

তদুত্তরে বলা হচ্ছে, এসব দৃষ্টান্ত নিজ নিজ ক্ষেত্র হিসাবে অত্যন্ত সংগত এবং উপমা দ্বারা যাদের অবস্থা তুলে ধরা উদ্দেশ্য (মূর্তি ইত্যাদি), তাদের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর অর্থ সঠিকভাবে বোঝে, মূর্খ ও নির্বোধেরা কী বুঝবে? উদাহরণের সামঞ্জস্য উপমাদাতার সাথে নয়, বরং যার অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে তার সাথে আছে কিনা তা লক্ষ কর। যদি সে তুচ্ছ ও দুর্বল হয়, তবে উদাহরণও তেমনি তুচ্ছ ও দুর্বল বস্তুর দ্বারা হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত। উদাহরণদাতার মর্যাদা কেমন, সে প্রশ্ন কেন হবে?

১. অর্থাৎ অত্যন্ত মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অযথা সৃষ্টি করেননি।

২. তা এই যে- যখন আকাশসমূহ ও পৃথিবী এক আল্লাহই সৃষ্টি করলেন, তখন ছোট ছোট কাজে তাঁর শরীক ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে কেন? প্রয়োজন হলে এই বিরাট কাজগুলোতে হত।

৩. অর্থাৎ আপনি কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন। এতে দিল মজবুত ও শক্তিশালী থাকে, আর তেলাওয়াতের ছওয়াব ও প্রতিদান তো স্বতন্ত্র আছেই। তিলাওয়াত দ্বারা কুরআনী জ্ঞানমালা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকবে, নতুন নতুন তত্ত্ব-তথ্য ও গভীর বিষয়াদি উদঘাটিত হতে থাকবে। সেই সংগে তা শুনে অন্যরাও কুরআনী ওয়াজ-নসীহত, জ্ঞানরাজি ও বারাকাত দ্বারা উপকৃত হবে। অন্য দিকে যারা মানবে না, ওদের উপর খোদার হুজ্জত কায়েম হবে, ওযরের পথ বন্ধ হবে। আর আপনার উপর দাওয়াত ও ইসলাহের যে দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, তাও যথাযথভাবে পালিত হতে থাকবে।

৪. **অশ্লীলতা ও মন্দকাজে নামাযের বাধা প্রদানের স্বরূপ**

অন্যায়-মন্দ কাজে নামাযের বাধাদান করার দুই অর্থ হতে পারে। **এক-** নামায এর কার্যকারণ, অর্থাৎ নামাযে আল্লাহ তাআলা এ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখেছেন যে, নামায নামাযীকে গোনাহ ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে, যেরূপ বিভিন্ন ওষুধের ব্যবহার জ্বর প্রভৃতি রোগ নিরাময় করে।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, মাত্র একবার ওষুধ সেবনের দ্বারা রোগ নিরাময় হওয়া জরুরী নয়; বরং কোন কোন ওষুধ বিশেষ পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সেবন করতে হয়। তখনই তার সুস্পষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তদুপরি শর্ত এই যে, রোগী এমন কোন পথ্য ব্যবহার করতে পারবে না, যা ওষুধের কার্যকারিতা ব্যাহত করে। তদ্রূপ, নামাযও নিঃসন্দেহে এমন একটি শক্তিধর ও কার্যকর ওষুধ, যা রূহানী রোগসমূহ নিরাময়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ— তবে শর্ত এই যে, সঠিক পরিমাণে, রূহানী চিকিৎসকদের সতর্কতাসহ, বিশেষ কাল পর্যন্ত, নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে। এরপর রোগী নিজেই উপলব্ধি করবে, নামায কীভাবে তার পুরাতন ব্যাধিসমূহ এবং বহু বছরের রোগগুলি দূর করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থ

দুই-অন্যায়-অশ্লীলকাজে নামাযের বাধাদান করার ২য় অর্থ হচ্ছে নামায এ দাবি জানায় যে, তা থেকে যেন নামাযী ব্যক্তি বিরত থাকে। অর্থাৎ নামাযের প্রত্যেকটি অবস্থা এবং তার সকল যিকিরের দাবি এই যে, যে ব্যক্তি এইমাত্র নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে (একদিকে) নিজের বন্দেগী, আনুগত্য, বিনয় ও কাকুতি প্রকাশ করেছে এবং (অন্যদিকে) আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়ত ও উপাস্যতা এবং রাজত্ব ও আধিপত্যের কথা স্বীকার করে এসেছে— সে যেন মসজিদের বাইরে এসেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে, দুষ্কর্মে লিপ্ত না হয় এবং একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর বিধান অমান্য না করে।

সত্য বলতে কি, নামাযের প্রত্যেকটি অংশ নামাযীকে পাঁচ ওয়াক্তে হুকুম দেয় যে, হে বন্দেগী ও গোলামীর দাবিদার! তুমি সত্যিকার বান্দা ও গোলামদের ন্যায় হয়ে যাও। এবং নামায স্বীয় অবস্থার ভাষায় দাবি করে যে, হে নামাযি! নির্লজ্জতা, দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

এখন কেউ মন্দ কাজ হতে বিরত হোক বা না হোক, নামায নিঃসন্দেহে তা থেকে বাধা দেয় ও নিষেধ করে, যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও তা থেকে বাধা দেন এবং নিষেধ করেন— إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, মঙ্গলসাধন ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করেন এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘন (নাহ্‌ল : ৯০)।'—এখন যেখানে অনেক হতভাগা আল্লাহ তাআলার বাধা দান ও নিষেধ করা সত্ত্বেও মন্দকর্ম থেকে বিরত হয় না, সেখানে নামাযের বাধা দান সত্ত্বেও অনেকে যদি তা থেকে বিরত না হয়, তবে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

নামাযের উপকারিতা আল্লাহর স্মরণ পরিমাণে হয়ে থাকে

উল্লেখ্য, মন্দ কাজ থেকে নামাযের বাধাদান ও নিষেধকরণ আল্লাহর স্মরণ পরিমাণে হবে। অর্থাৎ নামাযে আল্লাহর স্মরণ যত বেশি হবে আর গাফিলতি যত কম হবে, বাধা দানের মাত্রাও তত বেশি হবে। বস্তুত, নামায শুধু গোটা-কয়েক ওঠা-বসার নাম নয়। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। নামাযী নামাযের আরকান আদায় করার সময় এবং কেরাত পড়া বা দো'য়া ও তাসবীহ পড়ার অবস্থায় আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে যত বেশি মন-মস্তিষ্কে উপস্থিত রাখবে এবং মুখ ও অন্তরকে যত অধিক সমন্বিত রাখবে, ততই তার অন্তর নামাযের বাধাদানের শব্দ শুনতে পাবে এবং তার নামায সেই পরিমাণেই মন্দকাজ ছাড়াতে ভূমিকা

এবং নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড় জিনিস[১]।	وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ

পালন করবে। অপর দিকে যে নামায অন্যমনস্কতা ও অমনোযোগিতার সাথে আদায় করা হয়, তা মুনাফিকের নামাযের সদৃশ, যার ব্যাপারে হাদীসে (মুসলিম : ৬২২) বলা হয়েছে- لا يذكر الله فيها إلا قليلا ('সে তাতে আল্লাহকে অতি সামান্যই স্মরণ করে।') এবং এ নামায সম্পর্কেই সতর্কবাণী এসেছে- لم يزدد بها من الله إلا بعدا ('সেই নামায দ্বারা আল্লাহ থেকে দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।') (তাফসীরে তবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

১. **যিক্রুল্লাহর মাহাত্ম্য-গুরুত্ব**

অর্থাৎ নামায মন্দকর্ম থেকে কেন বিরত রাখবে না, যখন তা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায়, যেমন আল্লাহ বলেছেন- اقم الصلاة لذكري আর আল্লাহর স্মরণ অনেক বড় জিনিস। এটি সেই জিনিস, যাকে নামায ও জেহাদ প্রভৃতি সকল ইবাদতের প্রাণ বলা যেতে পারে। আল্লাহর স্মরণই যদি না হয়, তবে ইবাদত আর কোথায়? প্রাণহীন দেহ বা অর্থহীন শব্দমাত্র। হযরত আবুদ্ দারদা প্রমুখ বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে উলামায়ে কেরাম এ ফয়সালাই করেছেন যে, যিকরুল্লাহ (আল্লাহর স্মরণ) থেকে বড় ইবাদত আর নেই। আসল ফযীলত এরই।(জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৭) তবে সাময়িকভাবে অন্য কোন আমল যিকরুল্লাহকে ছাড়িয়ে গেলে তা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যাবে, সেই আমলটির মধ্যেও যিকরুল্লাহর বদৌলতেই ফযীলত এসেছে।

যা হোক, যিকরুল্লাহ সবচেয়ে শ্রেয় আমল। আর তা যখন নামাযের মধ্য দিয়ে হবে, তখন আরো শ্রেয় হবে। সুতরাং বান্দার উচিত, কোন সময় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়া, বিশেষত কোন মন্দকর্মের দিকে আকর্ষণ হলে তৎক্ষণাৎ খোদার বড়ত্ব ও পরাক্রমতা স্মরণ করত তা থেকে ফিরে আসা।

কুরআন ও হাদীসে আছে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে স্মরণ করেন। কোন কোন সালাফ (পূর্ববর্তী মনীষী) আয়াতের এ অর্থই করেছেন যে, নামাযের মধ্যে এদিক থেকে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে বলে নমায বড় জিনিস, কিন্তু এর উত্তরে ওদিক থেকে যে আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাকে স্মরণ করেন, এটা সবচেয়ে বড় জিনিস (অর্থাৎ তাঁদের নিকট لذكر الله اكبر-এর অর্থ হলো- বান্দার যিকিরের উত্তরে আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা, যা তার জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্য)। সুতরাং যিকরুল্লাহর খুবই কদর করা উচিত এবং এর মর্যাদা ও ফজীলত উপলব্ধি করে যিকরুল্লাহর প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

একটি হাদীস

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল, ইসলামের বিধানাবলি ও আমলসমূহ তো অনেক, আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সামগ্রিক আমল বলে দিন। উত্তরে হুযূর বললেন- لايزال لسانك رطبا من ذكر الله (তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকর দ্বারা তাজা থাকে।) (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৬৭১, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৮১৪)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন[১]।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ

৪৬. তোমরা কিতাবীদের সাথে এমন পন্থায়ই যুক্তি-তর্ক কর, যা উত্তম। তবে তাদের মধ্যে যারা বেইনসাফ (তাদের কথা ভিন্ন)[২]। আর তোমরা বল, আমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং (ঐ কিতাবের প্রতিও), যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে[৩]। আর

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যতক্ষণ বান্দা নামাযে থাকে, ততক্ষণ তো সে প্রত্যেক গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আশা করা যায় যে, নামাযের পরেও বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহর স্মরণের মধ্যে এর চেয়েও বেশি উপকারিতা ও কার্যকারিতা রয়েছে। কারণ, তার ফলে গোনাহ থেকে বাঁচবে এবং উচ্চ মর্যাদার স্তরসমূহে আরোহণ করবে।'

এটি لذكر الله أكبر -এর আরেকটি সূক্ষ্ম তাফসীর।

১. অর্থাৎ কে কতখানি আল্লাহকে স্মরণ করে বা করে না, আল্লাহ তাআলা তা সবই জানেন। এজন্য যাকের ও গাফেল– এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর আচরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

২. মুশরিকদের দীন-ধর্ম গোড়াতেই গলদ, আর আহলে কিতাবের দীন মূলে সত্য (অর্থাৎ তাদের কাছে নবীগণ সত্য দীন ও কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তারা তা বিকৃত করে ফেলে– অনুবাদক)। সুতরাং মুশরিকদের ন্যায় এদের সঙ্গে একইভাবে তর্ক-বিতর্ক করো না। যেমন ওদের দীনকে তো মূলেই ভ্রান্ত বলে খণ্ডন করো। এদের বেলায় তা করো না; বরং এদেরকে নম্রতা, ভদ্রতা, হিতাকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে জরুরী কথা বল। অবশ্য এদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিষ্কার অবিচার, অবাধ্যতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়, তার সাথে সমুচিত কঠোরতার আচরণ করা যেতে পারে, আর ভবিষ্যতে এরূপ লোকদের শাস্তি দেওয়া হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ ছিল। তা শুনে অবিশ্বাসীদের তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে, বিতর্কের সময় বিপক্ষের ইলমী ও দীনী অবস্থার খেয়াল রাখ। বিতর্কের জোশে এসে সততা ও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করো না, যেখানে যতটুকু সত্যতা আছে, তা মেনে নেবে।

৩. অর্থাৎ কুরআনের প্রতি আমাদের যেমন ঈমান আছে, তদ্রূপ এ ঈমানও আছে যে, আল্লাহ তোমাদের হেদায়েতের জন্য হযরত মূসা (আ), ঈসা (আ) ও অন্য নবীদের প্রতি যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলি অবশ্যই সত্য ছিল। তার একটি অক্ষরও ভুল ছিল না। যদিও তোমাদের হাতে সেই আসমানী কিতাবগুলি আপন আসল আকৃতি ও প্রকৃতিতে সংরক্ষিত থাকেনি।

আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ একই এবং আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী[১]।'

وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

৪৭. এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি[২]। সুতরাং যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে। এবং এদের (মক্কাবাসীদের) মধ্যেও কতক এমন, যারা এর প্রতি ঈমান রাখে। আর আমার আয়াতসমূহ তারাই অস্বীকার করে, যারা চরম নাফরমান[৩]।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ مِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ مَا یَجْحَدُ بِاٰیٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪৮. আপনি ইতিপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং নিজের ডান হাত দিয়ে তা লিখতেনও না। এমন হলে বাতিলপূজারীরা অবশ্যই সন্দেহ করতে পারত[৪]।

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِیَمِیْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের প্রকৃত মা'বূদ একজনই। পার্থক্য এতটুকু যে, আমরা একমাত্র তাঁরই হুকুম অনুসারে চলি, আর তোমরা তা থেকে সরে গিয়ে অন্যদেরও খোদায়ী অধিকার ও এখতিয়ার দিয়েছ!! যথা– হযরত মাসীহ (আ) বা হযরত উযায়র (আ)-কে, অথবা ধর্মযাজক ও রাহেবদের। তদুপরি আমরা আল্লাহর সকল হুকুম মেনেছি, সকল পয়গম্বরকে স্বীকার করেছি, সকল কিতাবকে সত্য বলে জ্ঞান করেছি, তাঁর সর্বশেষ দীনের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেছি। কিন্তু তোমরা কিছু মেনেছ, কিছু অস্বীকার করেছ, বিশেষত সর্বশেষ নবী ও তাঁর আনীত দীনকে অস্বীকার করেছ।

২. তো, এ কিতাবে তোমাদের কিতাবসমূহের তুলনায় এমন কী ত্রুটি ও কমতি রয়েছে, যার জন্য তা গ্রহণ করতে তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত? পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যেমন কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল, তদ্রূপ সর্বশেষ পয়গম্বরের প্রতিও এ অতুলনীয় অকাট্য কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং একে মানতে এত আপত্তি কেন?

৩. অর্থাৎ আহলে কিতাবের যারা নিজেদের কিতাব সঠিকভাবে পড়েছে ও বুঝেছে, তারা এ কিতাবও মানবে। আর ইনসাফ থাকলে মানা কর্তব্যও। এজন্যই তাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ, তারা অন্তর দিয়ে এর সত্যতাকে স্বীকার করে। আর শুধু আহলে কিতাবই নয়, বরং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোনই ইলেম রাখে না– আরবের এমন কতিপয় লোকও এ কুরআনকে স্বীকার করে নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণাদি এতই উজ্জ্বল যে, চরম সত্য-দ্রোহী নাফরমান ছাড়া কেউই তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

৪. অর্থাৎ কুরআন অবতরণের পূর্বে আপনার জীবনের চল্লিশটি বছর এই মক্কাবাসীদের মধ্যে কেটেছে। সকলেই জানে, আপনি এ সময়ের মধ্যে কোন উস্তাদের নিকট যাননি, কোন

৪৯. বরং কুরআন তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের সমষ্টি, যা ইলম দান করা হয়েছে- এমন লোকদের অন্তরে সংরক্ষিত*[১]। আর আমার আয়াতসমূহ কেবল জালেমরাই অস্বীকার করে[২]।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

৫০. ওরা বলে, 'তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনাদি কেন অবতীর্ণ করা হল না?' আপনি বলুন, 'নিদর্শনাবলি তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আর আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী[৩]।'

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾

কিতাবও পড়েননি, কখনো হাতে কলমও ধরেননি। এমনটি হলে এই বাতিলপূজারীদের এ সন্দেহ করার অবকাশ থাকত যে, সম্ভবত পূর্ববর্তী কিতাবাদি পড়ে এসব বিষয় নোট করে নিয়েছেন এবং তাই এখন ক্রমান্বয়ে নিজ ভাষায় সাজিয়ে শোনাচ্ছেন। তবে সেক্ষেত্রেও এরূপ বলা ভুল হত। কেননা, কোন লেখাপড়া জানা মানুষ, বরং দুনিয়ার সমগ্র সুশিক্ষিত মানুষ একত্র হয়েও এবং কুল মাখলুকের সাহায্য নিয়েও এমন অতুলনীয় কিতাব রচনা করতে পারবে না। তবুও তেমনটি হলে মিথ্যাবাদীর জন্য কথা বানানোর একটা সুযোগ হাতে এসে যেত। কিন্তু যেহেতু আপনার নিরক্ষর হওয়াটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য, সুতরাং এহেন সন্দেহের কোনই অবকাশ রইল না। কিন্তু হঠকারীরা এরপরও বলত- أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ('এসব পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী, যা সে লিখে নিয়েছে। এখন সেগুলোই তার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়া হয়।' –ফুরকান, আয়াত ৫)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এমন নিদর্শনাদির সমষ্টি, যা ইলম প্রদান করা হয়েছে এমন লোকদের অন্তরে সুস্পষ্ট।'

১. অর্থাৎ পয়গম্বর আলাইহিস সালাম কোন মানব শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া করেননি। বরং তাঁর নিকট আগত এই ওহী চিরকাল লেখার মাধ্যম ছাড়াও সিনা থেকে সিনার মাধ্যমে জারি থাকবে। আল্লাহর ফযলে আলেম, হাফেজ ও কারীদের অন্তর তার শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণ করবে। অন্যান্য আসমানী কিতাব হেফজ করা হত না, কিন্তু এই কিতাব হেফজের দ্বারাই সংরক্ষিত আছে। লেখার মাধ্যম এর অতিরিক্ত।

২. অর্থাৎ বে-ইনসাফীর তো কোন ওষুধ নেই। কোন লোক যদি সংকল্পই করে বসে যে, আমি কখনো সত্য কথা স্বীকার করব না, সে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর বিষয়ও অস্বীকার করবে।

৩. অর্থাৎ আমার হাতে এ ক্ষমতা নেই যে, তোমরা যে নিদর্শন তলব করবে তাই আমি দেখিয়ে দেব। কোন নবীরই সত্যতার স্বীকৃতি এর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। আমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় মন্দের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করতে থাকা। অবশ্য আল্লাহ তাআলা আমার সত্যতার সমর্থনে কোন নিদর্শন দেখাতে চাইলে দেখিয়ে দেবেন। এটি তাঁরই এখতিয়ার।

৫১. ওদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের পাঠ করে শোনানো হয়? নিশ্চয় এতে তাদের জন্য রহমত ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে[১]।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

[রুকূ - ৬]

৫২. আপনি বলুন, 'আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তিনি জানেন[২]। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত[৩]।'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبٰطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

৫৩. ওরা আপনার নিকট আযাব তাড়াতাড়ি চায়☆[৪]। আর যদি এক নির্ধারিত সময় না

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ

---

১. অর্থাৎ রাত-দিন ওদের যে কিতাব পড়ে শোনানো হচ্ছে, তার চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হবে? ওরা কি দেখে না, এ কিতাবের স্বীকারকারীরা তা থেকে কীভাবে উপদেশ হাসিল করছে এবং আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হচ্ছে?

২. অর্থাৎ আল্লাহর যমীনের উপর এবং তাঁর আসমানের নীচে আমি প্রকাশ্যে নবুওয়াতের দাবি করছি, যা তিনি দেখছেন ও শুনছেন। অতঃপর দিন দিন তিনি আমাকে ও আমার সঙ্গীসাথীদের অসাধারণ অগ্রগতি দান করছেন, সর্বদা আমার দাবি-দাওয়া কার্যকর হতে দিচ্ছেন। আমার মুখে ও হাতে কুদরতের এমন অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করছেন, সমগ্র জিন ও মানব জাতি যার নজীর পেশ করতে অক্ষম। তো, আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহর এই সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়?

৩. মানুষের জন্য অতি দুর্ভাগ্য ও সর্বনাশা ক্ষতি হচ্ছে, জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেওয়া, আর দিবালোকের মত সত্য বিষয়কেও অস্বীকার করতে থাকা। মানবের জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'আপনাকে আযাবের বিষয়ে তাড়া দেয়'।

৪. অর্থাৎ ওরা বলে– যদি আমরা বাতিলপন্থী হই, তবে আমাদের উপর দুনিয়ায় কোন বিপদ আসে না কেন?

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾

থাকত, তবে অবশ্যই ওদের উপর আযাব এসে যেত। তা তো ওদের উপর এমন আকস্মিকভাবে আসবে যে, ওরা (আগে থেকে) টেরও পাবে না[১]।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. ওরা আপনার নিকট আযাব তাড়াতাড়ি চায়[২], অথচ জাহান্নাম তো কাফেরদের পরিবেষ্টন করেই রেখেছে[৩]।

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. (সেদিন বুঝবে)– যেদিন আযাব ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে ওদের উপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে এবং বলবে, 'তোমরা যা কিছু করতে, তার শাস্তি আস্বাদন কর[৪]।'

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬. হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর[৫]।

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস তার নির্ধারিত সময়ে আসে। ব্যস্ত হয়ো না, সেই আযাবও নির্ধারিত সময়ে আসবেই আসবে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র.) লেখেন, 'মুসলমানদের হাতে নিহত ও ধৃত হওয়াই ওদের আযাব ছিল। সে মত মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার লোকেরা বেখবর ছিল, সহসাই মুসলিম বাহিনী এসে মাথার উপর উপস্থিত হয়।'

২. এখানে সম্ভবত আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য। আয়াতের পরের অংশ দ্বারা তাই প্রকাশ পায়।

৩. অর্থাৎ আখেরাতের আযাব খামোখাই চাচ্ছে, আযাবে তো ওরা পড়ে রয়েছে। এই কুফর ও পাপাচার দোযখ ছাড়া আর কী, যা ওদের ঘিরে রেখেছে? আর মৃত্যুর পরে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দোযখ কেমন করে জ্বালায়, যখন এসব আমলই জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে ওদের লেপটে ধরবে।

৪. এ কথা আল্লাহ তাআলা বলবেন, অথবা স্বয়ং আযাবই বলবে। যেমন: হাদীসে এসেছে, যাকাত দেয়নি এমন ব্যক্তির ধন-সম্পদ সাপ হয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে, গালে কামড় দেবে এবং বলবে– আমি তোমার ধন-সম্পদ, ধন-ভাণ্ডার।

৫. অর্থাৎ মক্কার এ কাফেররা যদি তোমাদের সংকীর্ণতায় ফেলে, তবে আল্লাহর পৃথিবী তো সংকীর্ণ নয়। অন্যত্র গিয়ে আল্লাহর ইবাদত কর।

৫৭. প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে[১]।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

৫৮. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের এমনসব বালাখানায় বসবাস করাব, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। কত উত্তম সেই কর্মশীলদের প্রতিদান—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

৫৯. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং যারা আপন রবেরই উপর নির্ভর করত[২]।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

৬০. এমন কত জীব রয়েছে, যারা নিজেদের খাদ্য তুলে রাখে না। আল্লাহই ওদের রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরও; এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৩]।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা যখন মক্কায় খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল, তখন মুসলমানদের প্রতি হিজরতের হুকুম হল। সে মত আশি-তিরাশিটি পরিবার হাব্‌শায় চলে গেল। এই প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে যে, কয়েক দিনের জীবন মাত্র, যেখানে সুযোগ হয় সেখানেই কাটিয়ে দাও। অতঃপর আমার নিকট সমবেত হবে।

এতে মুহাজিরদের সান্ত্বনা দেওয়া হল, যাতে দেশত্যাগ করা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দিলের উপর ভারী না লাগে। এর মাধ্যমে যেন জানিয়ে দেওয়া হল– দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ছোট-বড় সকল থেকে আজ না হোক, কাল বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। মনে কর, এখন মক্কা থেকে হিজরত করলে না, কিন্তু দুনিয়া থেকে একদিন হিজরত করতেই হবে এবং তা হবে বাধ্যতামূলক। অথচ আল্লাহর বন্দেগীর দাবি হচ্ছে, নিজ খুশী ও ইচ্ছায় সেসব জিনিস ত্যাগ করা, যেগুলি প্রকৃত প্রভুর বন্দেগীতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২. অর্থাৎ যারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ইসলাম ও ঈমানের পথে অবিচল থেকেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছে, তারা এ দেশের পরিবর্তে সে দেশ (জান্নাত) লাভ করবে এবং তাদেরকে এখানকার ঘরবাড়ি থেকে উত্তম ঘরবাড়ি দেওয়া হবে।

৩. এতে রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ নিশ্চিন্ত করে দিলেন যে, দেখো– অধিকাংশ জীবজন্তুর ঘরে আগামী দিনের খাদ্য থাকে না, নতুন দিনে নতুন রিযিক জোটে। যে আল্লাহ জীবজন্তুকে

৬১. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়ুক্ত করেছেন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। অতএব ওরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে*[১]?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৬২. আল্লাহ আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে মেপে দেন**[২]। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত[৩]।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৬৩. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর এর দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।' কিন্তু

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ

রিযিক পৌঁছান, তিনি তাঁর অনুগত প্রেমিক বান্দাদের পৌঁছাবেন না? অবশ্যই তিনি বান্দার অন্তরের এখলাস জানেন। প্রত্যেকের ভিতর-বাইর তাঁর সামনে, কারো মেহনত তাঁর দরবারে বিনষ্ট হতে পারে না। যারা তাঁর রাস্তায় ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয়েছে, তাদের তিনি ব্যর্থ ও বিফল করবেন না। তাই জীবিকার উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজেদের জীবিকা নিজেদের পিঠে বহন করে বেড়ায় না– কিন্তু প্রকৃত রিযিকদাতা প্রতিদিন ওদের রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'অতএব কীভাবে ওরা (সত্য থেকে তথা এক আল্লারহ ইবাদত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?

১. অর্থাৎ রিযিকের সমস্ত উপায়-উপকরণ, চাই আসমানী হোক বা যমীনের হোক, তা তিনিই যে পয়দা করেছেন, এ কথা সকলেই জানে। তা সত্ত্বেও বান্দা তাঁর উপর এ ভরসা করে না যে, তিনিই রিযিক পৌঁছিয়ে দিবেন। কিন্তু ততটুকু, যতটুকু তিনি চাইবেন। তোমরা যতটা চাইবে, তাই দেওয়া জরুরী নয়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টা বলে দেওয়া হয়েছে।

☆☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন।'

২. মেপে মেপে দেন। একেবারে দেন না, তা নয়।

৩. অর্থাৎ, এ কথা তাঁরই জানা আছে যে, কাকে কতটুকু দেওয়া উচিত।

ওদের অধিকাংশই বোঝে না[১]।

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

[রুকূ - ৭]

৬৪. এই পার্থিব জীবন তো আনন্দ-ফুর্তি ও খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর আখেরাতের জীবনই তো জীবন। আহা! ওরা যদি জানত[২]!

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ۚ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৫. যখন ওরা নৌযানে আরোহণ করে (এবং বিপদের সম্মুখীন হয়), তখন আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস রেখে☆। অতঃপর তিনি যখন ওদের রক্ষা করে স্থলের দিকে (নিয়ে আসেন), অমনি ওরা শরীক করতে শুরু করে—

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৬. যাতে আমি ওদের যা দান করেছি তা অস্বীকার করে এবং মজা লুটে। তো, ওরা শীঘ্রই জানতে পারবে[৩]।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ বৃষ্টিও সবার উপর সমভাবে বর্ষে না। আর তদ্রূপ অবস্থার পরিবর্তন হতেও সময় লাগে না। সামান্য সময়ের ব্যবধানে তিনি দরিদ্রকে ধনী বানিয়ে দেন।

২. অর্থাৎ মানুষের উচিত, দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের চেয়ে আখেরাতের ফিকির বেশি করা। কেননা, প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন তো তা-ই। দুনিয়ার খেল-তামাশায় মেতে পরিণামকে ভুলে যেয়ো না, বরং এখানে থেকে সেখানকার প্রস্তুতি নাও এবং আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–**‘ প্রার্থনাকে তাঁর জন্য নির্ভেজাল করে’।

৩. অর্থাৎ মানুষের উচিত ছিল, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মেতে আল্লাহ ও আখেরাতকে বিস্মৃত না হওয়া। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, যখন জলযান তুফানে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তখন খুবই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যেই না মাথার উপর থেকে বিপদ কেটে গেল এবং স্থলে গিয়ে পা রাখল, অমনি আল্লাহর সকল অনুগ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে মিথ্যা দেব-দেবীকে ডাকা শুরু করে দিল। যেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হল, আল্লাহর নে'য়ামতসমূহকে অস্বীকার করতে থাকা এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা। বেশ, কয়েক দিন মনের সাধ মিটিয়ে নিক। শীঘ্রই জানতে পারবে, এ অবাধ্যতা ও দুষ্কৃতি, অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামির ফল কী।

৬৭. ওরা কি দেখে না, আমি (ওদের শহরকে) সম্মানিত, নিরাপদ বানিয়েছি; অথচ ওদের আশপাশ থেকে লোকদের ছোঁ মেরে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তবে কি ওরা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে[১]?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, অথবা সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা ওর নিকট পৌঁছে? জাহান্নামই কি কাফেরদের আবাসস্থল নয়[২]?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. আর যারা আমার জন্য* সাধনা করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহের দিশা দেব[৩]। আর নিশ্চয় আল্লাহ আছেন সৎকর্মশীলদের সঙ্গে[৪]।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

---

১. মক্কার লোকেরা আল্লাহর ঘরের ওসীলায় শত্রু থেকে নিরাপদ ছিল। অথচ সমগ্র আরব দেশে মারামারি ও হানাহানির আগুন জ্বলছিল। ওরা দেব-দেবীর মিথ্যা অনুগ্রহ স্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহর এই সত্য অনুগ্রহ স্বীকার করে না।

২. অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম হচ্ছে, কাউকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা, বা তাঁর সাথে এমন বিষয়াদি সম্পৃক্ত করা, যা তাঁর শানের পরিপন্থী, অথবা পয়গম্বর যে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন তা শোনামাত্র মিথ্যা বলতে আরম্ভ করা। এই জালেমদের কি জানা নেই, কাফেরদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ? জানলে এরূপ নির্ভয় ও নির্লজ্জতার সাথে বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে পারত না এবং খোদা-দ্রোহীতায় লিপ্ত হত না।

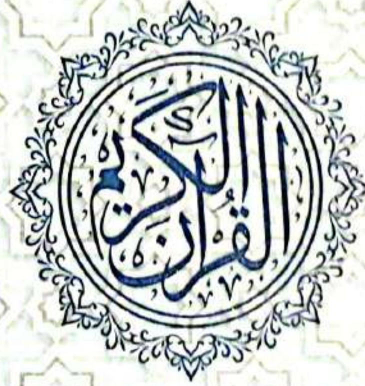
☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'আমার রাস্তায়...'।

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওয়াস্তে মেহনত করে, দুঃখ-কষ্ট বরণ করে এবং বিভিন্ন রকম সাধনায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের এক বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথের বুঝ-সমঝ দান করেন। তারা সাধনা ও মুজাহাদায় যতই উন্নতি করতে থাকে, ততই আল্লাহর মারেফত ও উপলব্ধির সোপানে আরোহণ করতে থাকে এবং এ পথের এমনসব নিগূঢ় রহস্য বুঝতে শুরু করে, যা অন্যরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা পুণ্যবানদের সঙ্গে রয়েছে।

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





রা
রাহনুমা
প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী



تفسير عثماني



প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

CamScanner